তাফসীরে মাযহারী

কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ)

নবম খন্ড

তাফসীরে মাযহারী

নবম খণ্ড

ঊনবিংশ, বিংশতিতম, একবিংশতিতম ও দ্বাবিংশতিতম পারা

(সূরা নমল থেকে সূরা ইয়া-সীন পর্যন্ত)

কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী র.

তাফসীরে মাযহারী ঃ কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী র.

অনুবাদ ঃ মাওলানা তালেব আলী

পুনর্লিখন ও সম্পাদনা ঃ মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

প্রকাশক ঃ হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভূঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ ঃ বিলু চৌধুরী

মুদ্রকঃ
শওকত প্রিন্টার্স
১৯০/বি, ফকিরেরপুল,
ঢাকা–১০০০।
মোবাইল ঃ ০১৭১১-২৬৪৮৮৭, ০১৭১৫-৩০২৭৩১

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর, ২০০০, জমাদিউস্ সানি, ১৪২১ হিজরী
হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ নকশ্‌বন্দি আহরারী রহঃ এর ইন্তেকাল দিবস উপলক্ষে
(ইন্তেকালের তারিখ পঁচিশে জমাদিউস্ সানি, হাজার বারো হিজরী)।

তৃতীয় প্রকাশঃ জানুয়ারী, ২০১২ ইং

বিনিময় ঃ পাঁচ শত কুড়ি টাকা মাত্র

TAFSIRE MAZHARI (Volume 9) Written by Hazrat Allama Kazi Sanaullah Panipathi (Rh.) Translated by Maulana Taleb Ali and Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia, Bhuigarh, Narayangonj, Bangladesh. Exchange : Taka Five Hundred Twenty only. US$ 20.00

ISBN 984-70240-0009-5

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ০

পাখি যখন আর নীড়ে ফিরতে চায় না, তখন সে কী চায়? কে জানে তখন তার বুকে কী কষ্ট, যখন সে আকাশ আর চায় না, চায় আকাশাধিকারীকে। তার বক্ষবেলাভূমির রহস্যময় মৃত্তিকায় তখন আছড়ে পড়ে কোন আকাশাতীত জলধির জ্যোতি-তরঙ্গ, কে জানে? কী হয় সে তখন? প্রশ্ন, না উত্তর? মগ্নতা, না মুখরতা? দিবস, না বিভাবরী? অশ্রু, না রহস্য? কোন ভাবনার ফুল ফোটায় সে তখন নিজেকে নিয়ে। নিজেকে হারিয়ে। আবার ফিরে পেয়ে। আবার হারিয়ে। কী হয় সে তখন? সংবেগ, না সমর্পণ? কারণ, না অকারণ? মরুমায়া, না কানন? প্রশ্নোত্তরাতীত যিনি, তখন তিনি তার কে হন? ভালোবাসা, না জ্ঞান? পালয়িতা, না প্রেম। সৃজয়িতা, না প্রাণ?

হে পাখি! হে বিচিত্রিত বিরহবিপ্লুত বিহঙ্গ! তোমার জয় হোক। তোমার অবুঝ, অবাক ও নির্বাক উড়াল জুড়ে ঝরে পড়ুক নৈপথ্যিক নির্ঝরের জলপাত। মেনে নাও, পানের পরিতৃপ্তি তোমার নিয়তি নয়। তুমি যে তৃষিত তিথির অতিথি। অভাবনীয় অরণ্যের নির্জনতা। অসম্ভব আততির দ্বীপ। পিপাসার প্রদীপ। জীবনের জবাব। মৃত্যুর প্রশ্ন। অভিমানের অয়ন। সমর্পণের শান্তি। পথের প্রয়াস। প্রেমের প্রণোদনা। তুমি যে মানুষ!

সুতরাং তুমি অন্য কারো মতো নও। অন্য কেউ নয় তোমার মতো। তুমিতো কেবল সূচনাভিসারী অনুসন্ধিৎসা। অদৃশ্যগামী অনল। আর এ সকল কিছুতো তোমার জন্য। এই আকাশ-পৃথিবী। এই মহাসৃজনায়োজন। এই নদী-বৃক্ষ-বিহঙ্গ। এই মেঘ। এই বৃষ্টি। এই উদয়াচল-অস্তাচল। এই বসন্ত। এই বরষা। এই শৈলশ্রেণী। এই সমুদ্র। তুমি পাঠ করবে বলেই তো রচিত হয়েছে এই সুবিশাল নিসর্গ-গ্রন্থ। তারপর খুঁজবে তাঁকে, যিনি অন্বেষণের অতীত। যিনি অদৃশ্যের অদৃশ্য। যিনি অপ্রতিরোধ্য অভিপ্রায়ধারী। যিনি সর্বজ্ঞ। সর্বশ্রুতিধর। সর্বদ্রষ্টা। সর্বশক্তিধর। দ্যাখো, তাঁর কতো দয়া, তিনি তোমাকে মানুষ বানিয়েছেন। দ্যাখো, তাঁর কতো অনুগ্রহ, তিনি তোমাকে ভালোবাসা দিয়েছেন। দ্যাখো দ্যাখো, তাঁর দান, দাক্ষিণ্য। যাচনাতিরিক্ত সৌভাগ্যের বর্ষণ। তুমি তো কখনো প্রার্থনা করোনি, আমি হতে চাই মানুষ। তাহলে ভাবো, যিনি যাচনাবিহনে তোমাকে করেছেন

সৃষ্টিশ্রেষ্ঠ, দিয়েছেন নিসর্গাধিনায়কত্ব, দিয়েছেন স্বজন-সম্পদ-সম্মান, তাঁর দিক থেকে তুমি মুখ ফেরাও কী করে? কী করে অবমাননা করতে পারো তাঁর ভালোবাসাকে? অপ্রার্থিত কল্যাণকে? অযাচিত অস্তিত্বকে?

তিনি তোমাকে দূরবর্তী করেছেন ঠিকই, কিন্তু সম্পর্কছিন্ন তো করেননি। মিলনের মূল্য বুঝবার জন্যই দিয়েছেন সাময়িক বিরহবৈভবিত দহন। বিপর্যায়িত পার্থিবতায় ছেড়ে দিয়েছেন বটে, কিন্তু পথপ্রদর্শকহীন তো করেননি। যুগে যুগে শতাব্দীতে শতাব্দীতে তোমার জন্যই তো প্রেরণ করেছেন প্রিয় পথাধিনায়কদেরকে, নিষ্পাপ নবীগণকে। তোমাদের জন্যই তো দিয়েছেন আকাশাগত বিধান। নভজ বার্তাসম্ভার।

অঙ্কুরিত বৃক্ষশিশু যেমন এক সময় হয় পরিণত বৃক্ষ, পূর্ণরূপে দল ম্যালে কাননের কুসুমকলি, তেমনি নবুয়তের প্রবহমান পুষ্প এক সময় দল মেলে দিলো পরিণতির গৌরবে। পূর্ণতার মহিমায়। এলেন মানুষের মূল সেনাপতি। উড়ালপ্রবণ ও পরিত্রাণপিয়াসী পাখিদের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সঙ্গে নিয়ে এলেন মহামানবতার মহান বিধান, মহামর্যাদামণ্ডিত আল কোরআন।

সে আলোর প্রবাহ এখনো বহ্নিমান। সে সুবাসের সমীভূত স্বনন এখনো মুহুর্মুহু গুঞ্জরমান। সে মহান বার্তাবলীর ব্যঞ্জনায়ন, ব্যাখ্যায়ন, সুনিশ্চিতি ও সুবিস্তারণের জন্যও পরবর্তী সময়ে আবির্ভূত হয়েছেন বিশুদ্ধচিত্ত ভাষ্যকারগণ, তাফসীরবেত্তা সমাজ।

আমরা সেরকম এক কালজ ও কালোত্তর গ্রন্থের বঙ্গায়নপ্রচেষ্টা নিয়েই বহুদিন ধরে পদবিক্ষেপ করছি এই বাংলায় যেখানে সকলে কেবল যায়, শুধু যায়— বাংলার মানুষ, পৃথিবীর অন্যান্য জনপদের মানুষের মতো। কেবল যেতেই পারে সকলে। ফিরে ফিরে আসে না কখনো।

মহাগ্রন্থ আল কোরআন তো সেই অনন্ত সম্মুখযাত্রার পার্থিব পাথেয়। অপার্থিব বিশ্বাস। সত্তার অন্তর ও বাহিরকে আলোকিতকারী চিরঅক্ষয় সূর্য। এ যে আল্লাহ্রই এক আনুরূপ্যহীন গুণবত্তার অলৌকিক প্রকাশ। বিশ্বাসবিধৌত পথের অনির্বাণ ও অফুরান বাতিঘর।

এই মহান বাণীবৈভবের ভাষ্যকার যাঁরা, তাঁদের মধ্যে এক অনন্যসাধারণ পুরুষপ্রবরের নাম কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী আলমোজাদ্দেদি আলহানাফী আলওসমানী রহমতুল্লাহি আলাইহিম আজ্মাইন। তিনি ছিলেন হানাফী মাজহাবের অনুগ। ইসলামের তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর অধস্তন পুরুষ। আর মোজাদ্দেদিয়া তরিকার জ্যোতিতে জ্যোতিস্নাত। তাঁর পীর ও মোর্শেদের নাম স্বনামধন্য আরেফসম্রাট শায়েখ মাযহারে শহীদ জানে জানা, তাঁর পীর-মোর্শেদ নূর মোহাম্মদ বদায়ুনী, তাঁর পীর মোর্শেদ শায়েখ সাইফুদ্দিন সেরহিন্দি, তাঁর পীর-মোর্শেদ খাজা মোহাম্মদ মাসুম, তাঁর পীর মোর্শেদ হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি রহমাতুল্লাহি আলাইহিম আজ্মাইন। এই তরিকাই উর্ধ্বতন আরো একুশজন সময়জয়ী আধ্যাত্মিক পুরুষের মাধ্যমে মিলিত হয়েছে ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লহু আনহুর সঙ্গে। তাই এর সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সূত্রশৃঙ্খলের মূল নাম নেসবতে সিদ্দীকী।

'তাফসীরে মাযহারী'র নামকরণ করেছেন তিনি তাঁর পীর-মোর্শেদের নামে। এটাই তাঁর অনন্যসাধারণ জ্ঞানের প্রধান পরিচয়। এতে করে আপন পীর-মোর্শেদের প্রতি প্রকাশ

পেয়েছে যেমন তাঁর প্রগাঢ় ভালোবাসা, তেমনি একথাটিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান (কলবী এলম)ই প্রকাশ্য জ্ঞানের (জবানী এলেমের) মূল ভিত্তি। যে অট্টালিকা যত উচ্চ, তার ভিত্তিও ততো অধিক গভীরে প্রোথিত— একথাটা ভুলে গেলে চলবে না। জ্ঞানের দর্প যাঁরা করেন, তাঁদেরকে কি এর পরেও জ্ঞানদান করতে হবে? যে জ্ঞানের মাধ্যমে দর্পচূর্ণ হয়, মুক্তিলাভ হয় সংকীর্ণতা ও প্রবৃত্তির পিঞ্জরাবদ্ধতা থেকে, সে জ্ঞানের ধারক, বাহক ও প্রচারক যে পীর-আউলিয়া সম্প্রদায়, সে কথা কি এর পরেও বিদ্বানগণকে সচকিত করে তুলবে না? আগ্রহী করে তুলবে না তালেবে এলেম হওয়ার পর তালেবে মাওলা হতে? অনেক হয়েছে। এবার সাড়া দিন। মেনে নিন পরিপূর্ণতার আমন্ত্রণকে।

পানিপথ নামের ঐতিহাসিক এক শহর ছিলো তাঁর জন্মভূমি ও কর্মভূমি। ওই শহরের স্বনামধন্য বিচারকর্তা ছিলেন তিনি। পুরুষাণুক্রমে এই গুরুদায়িত্ব আজীবন বহন করতে হয়েছিলো তাঁকে। তার সঙ্গে চালিয়ে যেতেন গ্রন্থরচনা ও নিরবচ্ছিন্ন উপাসনা। সেই প্রথিতযশাঃ তাপসপ্রবর প্রতিদিন পাঠ করতেন এক মঞ্জিল কোরআন এবং সম্পন্ন করতেন একশত রাকাত নামাজ। যাপিত জীবনকে এভাবেই তিনি করে নিয়েছিলেন কল্যাণায়িত ও সফলিত।

দিবস-বিভাবরীর আবর্তনাধীন এই পৃথিবীতে তাঁর শুভপদার্পণ ঘটেছিলো ১১৪৩ হিজরী সনে এবং ১২২৫ হিজরী সনের ১১ই রমজান গ্রহণ করেছিলেন চিরবিদায়। সংবেদনশীলতা ও মনীষা ছিলো তাঁর জন্মলগ্নগত প্রবণতা। তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন এই মহাপুরুষ মাত্র সাত বৎসর বয়সে স্মৃতিস্থ করেছিলেন সমগ্র কোরআন। হাদিস শাস্ত্র প্রধানত শিক্ষা করেছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ জ্ঞানতাপস শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভীর নিকট থেকে। সতীর্থ হিসেবে পেয়েছিলেন যুগজাগ্রত বিদ্বান শাহ আবদুল আজিজ দেহলভীকে। প্রথমোক্তজন বলতেন, ছানাউল্লাহ্কে ফেরেশ্তারাও সম্মান করে। শেষোক্ত জন তাঁকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'এ যুগের বায়হাকী '। আর তাঁকে 'পথের নিশান' (আ'লামুল হুদা) বলতেন তাঁর প্রাণপ্রিয় পীর ও মোর্শেদ। তিনি আরো বলতেন, মহাবিচারের দিবসে আমাকে যদি বলা হয় 'কী নিয়ে এসেছো', আমি বলবো 'ছানাউল্লাহ্কে'।

তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা তিরিশের অধিক। তার মধ্যে এই তাফসীরগ্রন্থটি সর্ববৃহৎ কলেবরের। দশ খণ্ডে সমাপ্ত। আরবী ভাষার ধ্রুপদী শৈলী ব্যবহৃত হয়েছে এর সর্বস্তরের উপস্থাপনায়। নিঃসন্দেহে অনিঃশেষ্য এর আবেদন। তাই প্রজ্ঞাপথের পথিকেরা ফিরে আসেন এর অপার্থিব আকর্ষণে। পান করেন পিপাসার পানি। চয়ন করেন অজস্র অসংখ্য পুষ্প। কৃতার্থ হন। হন কৃতজ্ঞ। বাংলার বর্ণমালা বহুকাল ধরে এই মহৎ ও বৃহৎ গ্রন্থের সেবা করবার বাসনায় ছিলো সতত ব্যাকুল। আমরা সে ব্যাকুলতাকে মান্য করেছি। বিদ্যা ও অন্যবিধ যোগ্যতার দীনতা সত্ত্বেও কুণ্ঠিত পদক্ষেপে কখন যেনো হয়ে গিয়েছি এর অক্ষরান্তরের রূপকার, বঙ্গবোধের বিচ্ছুরণ।

আমরা তো স্বশক্তিচালিত কেউ নই। আমাদের যুথবদ্ধতাও হয়তো নয় স্বেচ্ছানির্ণয়িত। পুষ্পোদ্যানের পরিপার্শ্ব যেমন বাধ্যগতভাবে সুবাসিত হয়, দিবসের ভূপ্রকৃতি যেমন হয় আপনাআপনি সূর্যকরোজ্জ্বল, তেমনি আল্লাহ্তায়ালার দয়ার্দ্র আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে আমাদেরকে অপসারিত করা হয়েছে আমাদের কাছ থেকে। আমাদের সত্তায়,

আত্মায় ও প্রচেষ্টায় জেগে রয়েছে কেবল তাঁর অভিপ্রায়। এ অনুমোদন, নির্বাচন ও বাস্তবায়নের সমস্ত কৃতিত্ব তাঁর। কেবলই তাঁর।

হে আমাদের মহান মার্জনাপরবশ মহাসৃজয়িতা ও মহাপ্রভুপালয়িতা! তুমি পুণ্যবান-পাপী সকলের প্রার্থনা শ্রবণকারী। তুমি রহমান। তুমি গফুর। তুমি হাকীম। তুমি আলীম। দুর্বৃত্তায়িত দুনিয়াকে করো পরিশুদ্ধতার প্রতীক। দাও তৌফিক তওবার। সানুতপ্ত ও সলজ্জিত প্রত্যাবর্তনের। দয়া করে তুমি মোচন করো আমাদের সকল কলংক। যাবতীয় গ্লানি। সতত নিরাপদ রাখো আমাদেরকে সীমাবদ্ধতার সংকট থেকে, অনৌদার্যের অক্ষপাত থেকে। পাপ থেকে। প্রবৃত্তিচারিতা থেকে। অহমিকা, অমমতা ও অসফলতা থেকে। এ নগণ্য ফকীরের আত্মিক আত্মজ অনুবাদক মাওলানা তালেব আলী, শ্রমপ্রেমিক তাফসীরকর্মীগণ, পাঠক-পাঠিকা, এই সুউচ্চ তরিকার সালেক-সালেকা, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সর্বপ্রকার সহযোগী-সহযোগিনী— আমরা তো সকলেই তোমার ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী। সকল প্রশংসা-বন্দনা, স্তব-স্তুতি, মহিমা-মহত্ত্ব, পরাক্রম-প্রতাপ, প্রজ্ঞা-অভিজ্ঞান তোমার। আমাদেরকে মার্জনা করো। ক্ষমা করো আমাদের কল্লোলিত ধৃষ্টতাকে, উচ্ছ্বসিত অনবধানতাকে। অন্তর্গত ও অপরিতৃপ্ত রোদনে ও রহস্যে আমাদেরকে করো ঋদ্ধ ও কৃতজ্ঞ। আমরা তো হতে চাই তোমার প্রেমের ও পরিচয়ের আত্মসত্তানাশী প্রেমিক। আমাদেরকে গ্রহণ করো ওই মহামানবের অসিলায়, যাঁকে তুমি মহাসম্মানিত করেছো 'অক্ষরের অমুখাপেক্ষী' (উম্মি) বলে। তাঁর প্রতি, তাঁর অন্যান্য বার্তাবাহক ভ্রাতৃবৃন্দ, তাঁর বংশধর, পরিবার-পরিজন-সহচর ও তাঁর একনিষ্ঠ অনুগামী আউলিয়া সম্প্রদায়ের প্রতি, বিশেষ করে আমাদেরকে যিনি সরাসরি আত্মপ্রসারিত হতে সাহায্য করেছেন, সেই মহান ব্যক্তিত্ব হাকিম আবদুল হাকিম আউলিয়ার প্রতি। আমিন। আল্লহুম্মা আমিন।

মান্যবর ও মাননীয়া পাঠক-পাঠিকাদের জ্ঞাতার্থে আর দু'একটি কথা আমরা বলে নিতে চাই। তা হচ্ছে— মূল তাফসীরে মাযহারী রচিত হয়েছে আরবীতে। আমরা এর বঙ্গায়ন ঘটিয়েছি দিল্লীর নাদ্ওয়াতুল মুসান্নিফের পরিচালক মাওলানা আবদুদ্ দাঈমের উর্দু তরজমা থেকে। তারপর আরবী অনুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি আদ্যোপান্ত। আর এর বঙ্গপক্ষ হয় যেনো অনাড়ষ্ট উড্ডয়নের উপযোগী, সেদিকে লক্ষ্য করেই ব্যাকরণগত ও শিল্পসুষমাগত দাবিটিকেও আমরা যুক্ত করেছি সততসতর্কতা ও শাণিত যত্নায়নের সঙ্গে। এরপরেও স্খলন ও অনবধানতা নয়নগোচর হলে জানাবেন। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণের প্রতি এটা আমাদের সংবেদনময় উপরোধ। আশা করি আমরা প্রত্যাখ্যাত হবো না এবং হারিয়ে ফেলবো না সংশোধনায়নের সুযোগ। ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের 'কুরআনুল করীম' থেকে গ্রহণ করেছি আমরা আয়াতের সরাসরি বঙ্গানুবাদ। এজন্য জানাই কৃতজ্ঞতা।

শান্তিবারতা— সূচনায় ও সমাপ্তিতে।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

সূচীপত্র

ঊনবিংশ পারা¾ সূরা নমল ঃ আয়াত ১ ¾ ৫৯

বিংশতিতম পারা¾ সূরা নমল ঃ আয়াত ৬০¾৯৩

সূরা ক্বসাস ঃ আয়াত ১¾৮৮

সূরা আনকাবুত ঃ আয়াত ১ ¾ ৪৪

একবিংশতিতম পারা ঃ সূরা আনকাবুত ঃ আয়াত ৪৫ ¾ ৬৯

সূরা রূম ঃ আয়াত ১ ¾ ৬০

সূরা লোকমান ঃ আয়াত ১ ¾ ৩৪

সূরা সাজদা ঃ আয়াত ১ ¾ ৩০

সূরা আহ্যাব ঃ আয়াত ১ ¾ ৩০

দ্বাবিংশতিতম পারা ঃ সূরা আহ্যাব ঃ আয়াত ৩১ ¾ ৭৩

সূরা সাবা ঃ আয়াত ১¾৫৪

সূরা ফাতির ঃ আয়াত ১¾৪৫

সূরা ইয়া-সীন ঃ আয়াত ১¾২১

তাফসীরে মাযহারী

নবম খণ্ড

ঊনবিংশ, বিংশতিতম, একবিংশতিতম ও দ্বাবিংশতিতম পারা
(সূরা নমল থেকে সূরা ইয়া-সীন পর্যন্ত)

ঊনবিংশ পারা

সূরা নমল আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○

طٰسٓ قف تِلۡكَ اٰيٰتُ الۡقُرۡاٰنِ وَ كِتَابٍ مُّبِيۡنٍ ۙ﴿۱﴾ هُدًى وَّ بُشۡرٰى
لِلۡمُؤۡمِنِيۡنَ ۙ﴿۲﴾ الَّذِيۡنَ يُقِيۡمُوۡنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤۡتُوۡنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمۡ
بِالۡاٰخِرَةِ هُمۡ يُوۡقِنُوۡنَ ﴿۳﴾ اِنَّ الَّذِيۡنَ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡاٰخِرَةِ زَيَّنَّا
لَهُمۡ اَعۡمَالَهُمۡ فَهُمۡ يَعۡمَهُوۡنَ ؕ﴿۴﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ لَهُمۡ سُوۡٓءُ الۡعَذَابِ
وَ هُمۡ فِى الۡاٰخِرَةِ هُمُ الۡاَخۡسَرُوۡنَ ﴿۵﴾ وَ اِنَّكَ لَتُلَقَّى الۡقُرۡاٰنَ مِنۡ
لَّدُنۡ حَكِيۡمٍ عَلِيۡمٍ ﴿۶﴾

r ত্ব, সীন; এইগুলি আল- কুরআনের আয়াত,— আয়াত সুস্পষ্ট কিতাবের;

r পথ-নির্দেশ ও সুসংবাদ বিশ্বাসীদিগের জন্য।

r যাহারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় ও পরলোকে নিশ্চিত বিশ্বাসী।

r যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাহাদিগের দৃষ্টিতে তাহাদিগের কর্মকে আমি শোভন করিয়াছি, ফলে উহারা বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়ায়;

r ইহাদিগের জন্য আছে কঠিন শাস্তি এবং ইহারাই পরকালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

r নিশ্চয় তোমাকে আল-কোরআন দেওয়া হইতেছে প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ আল্লাহের নিকট হইতে,

---

ত্ব, সীন হচ্ছে বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি। কোরআন মজীদে কোনো কোনো সুরার প্রথমে এরকম বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজির সন্নিবেশ পরিদৃষ্ট হয়। এগুলোর মর্ম চিরদুর্জ্ঞেয় ও চিররহস্যাচ্ছন্ন। আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলই এ বিষয়ে সম্যক অবগত। আর অবগত অতি অল্পসংখ্যক আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন, যাঁরা জ্ঞানে সুগভীর (ওলামায়ে রসিখীন)।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিলকা আয়াতুল কুরআনি ওয়া কিতাবিম মুবীন' (এগুলো আল কোরআনের আয়াত, আয়াত সুস্পষ্ট কিতাবের)। এখানে 'তিলকা' (এগুলো) দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে আলোচ্য সুরার আয়াত সম্ভারের প্রতি।

'কুরআন' ও 'কিতাব' সমঅর্থসম্পন্ন। দু'টোই আল্লাহ্ কর্তৃক প্রত্যাদেশিত বাণীবৈভবের নাম। আর নামপদ হওয়ার কারণেই শব্দ দু'টো কখনো ব্যবহৃত হয় নির্দিষ্টার্থক অব্যয় 'আল' সহযোগে। আবার কখনো এমতো নির্দিষ্টার্থকতা ছাড়াই। শব্দ দু'টো এখানে ব্যবহৃত হয়েছে আল্লাহ্র বাণীসম্ভারের বৈশিষ্ট্য প্রকাশার্থে। তাই বলা হয়, আল্লাহ্র বাণীর পঠিতরূপ 'কুরআন' এবং লিখিতরূপ 'কিতাব'।

'কিতাবিম মুবীন' অর্থ সুস্পষ্ট বা সমুজ্জ্বল কিতাব, যা লিপিবদ্ধ রয়েছে লওহে মাহফুজের সুরক্ষিত ফলকে। উল্লেখ্য, ওই সুরক্ষিত ফলকে কেবল কোরআন নয়, লিপিবদ্ধ রয়েছে মহাসৃষ্টির আদিঅন্তের সকল বিবরণ। ওই সুরক্ষিত ফলককেই আল্লাহ্তায়ালা এখানে চিহ্নিত করেছেন 'মুবীন' (সুনিশ্চিত, সুস্পষ্টরূপ বা সমুজ্জ্বল) অভিধায়।

কোরআনের পঠিত ও লিপিবদ্ধরূপের সঙ্গে আমরা অধিকতর ঘনিষ্ঠ। সুরক্ষিত ফলকে মুদ্রিত 'কিতাব' বা গ্রন্থের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এতোখানি ঘনিষ্ঠ নয়। তাই প্রত্যাদেশের লক্ষ্য যেহেতু আমরা, তাই এখানে 'কোরআনে'র উল্লেখ এসেছে কিতাবে'র পূর্বে। অথবা বলা যেতে পারে 'কিতাবুম মুবীন' বলে এখানে বোঝানো হয়েছে আমাদের এই কোরআনকেই। কারণ এই মহাগ্রন্থেই মুদ্রিত হয়ে রয়েছে আল্লাহ্র সত্তা-গুণাবলী ও নির্দেশ- নিষেধাজ্ঞাসমূহের সবিস্তার বিবরণ। এর অলৌকিকত্ব এবং অসাধারণ তত্ত্ব সতত-সুস্পষ্ট, সদা-সমুজ্জ্বল।

পরের আয়াতদ্বয়ের (২, ৩) মর্মার্থ হচ্ছে— কোরআনের আহ্বান স্বতঃস্ফূর্ত ও সার্বজনীন হলেও কেবল বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীরাই এ আহ্বানে সাড়া দেয়। জীবনকে অর্থবহ করে তোলে এর অন্তহীন আলোকে। তাই তাদের জন্যই কোরআন পথনির্দেশ ও শুভসমাচার। আর বিশ্বাসী তারাই যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, জাকাত দেয় এবং প্রত্যয় রাখে মৃত্যু-পরবর্তী অনন্তজীবনের প্রতি। অর্থাৎ যারা তাদের পরলোকের প্রতি বিশ্বাসকে প্রকাশ করে নামাজ প্রতিষ্ঠা ও জাকাত প্রদানের ঐকান্তিকতায়।

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (৪, ৫) মর্মার্থ হচ্ছে— যারা পরকাল বিশ্বাস করে না তাদের প্রতি আমি অপ্রসন্ন। তাই তাদেরকে আমি করেছি শুভচেতনাচ্যুত। তাদের অপকর্মগুলোকেই তাদের দৃষ্টিতে করে দিয়েছি শোভন। ফলে তাদের আচরণ ও বিচরণ হয় উদভ্রান্ত ও বিভ্রান্তদের মতো স্বস্তিহীন। এদের জন্যই পরবর্তী পৃথিবীতে নির্ধারিত রয়েছে সুকঠোর শাস্তি। আর তারাই তো সেখানে হবে সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

শেষোক্ত আয়াতে(৬) বলা হয়েছে— 'নিশ্চয় তোমাকে আলকোরআন দেওয়া হচ্ছে প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র নিকট থেকে'। আলোচ্য আয়াতটি বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত প্রথমোক্ত আয়াতের সঙ্গে। কারণ সেখানেও বলা হয়েছে কোরআনের কথা। আর এখানে বলা হলো— হে আমার রসুল! আপনাকে এই মহাগ্রন্থ দেওয়া হলো আপনার মহাপ্রভুপালক আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যিনি প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ। অর্থাৎ যে আনুরূপ্যহীন সত্তার জ্ঞানের অন্তহীনতা ও প্রজ্ঞার উত্তুঙ্গ শিখরকে স্পর্শ করার সাধ্য কারো নেই, সেই চিরদুর্জ্ঞেয় সত্তাই আপনার উপরে অবতীর্ণ করেছেন এই কোরআন।

'আলীম' অর্থ জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময় এবং 'হাকীম' অর্থ প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। সাধারণ জ্ঞান, বিশেষ জ্ঞান অথবা সাধারণ প্রজ্ঞা, বিশেষ প্রজ্ঞাকেই এখানে প্রকাশ করা হয়েছে আল্লাহ্‌তায়ালার এ দু'টো বিশেষ নামের মাধ্যমে। এভাবে এখানে আল্লাহ্ তাঁর দু'টো বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রকাশের মাধ্যমে একথাই বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, অতুলনীয়রূপে যিনি মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাময়, তিনি ব্যতীত এরকম অক্ষয় বাণী সম্ভার রচনা করার সাধ্য কারোই নেই। অথবা বলা হয়েছে, এই মহাগ্রন্থে বিধৃত বিষয়াবলীর কোনো কোনোটি সাধারণ প্রজ্ঞাজাত। আবার কোনো কোনোটিতে রয়েছে বিশেষ প্রজ্ঞায়নের প্রকাশ। অর্থাৎ এতে রয়েছে কতিপয় ইতিবৃত্ত প্রকাশক সরল বিবরণ এবং কতিপয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বের সারাৎসার। আর এগুলোই হচ্ছে আল্লাহ্‌র মহাজ্ঞান ও মহাপ্রজ্ঞার নিদর্শন। সম্ভবতঃ তার মহাজ্ঞানের দৃষ্টান্তরূপেই পরবর্তী আয়াত থেকে শুরু হয়েছে মহাপ্রেমিক মুসা নবীর ইতিকাহিনী। বলা হয়েছে—

সূরা নমল ঃ আয়াত ৭, ৮

اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖۤ اِنِّیْۤ اٰنَسْتُ نَارًا ؕ سَاٰتِیْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ اٰتِیْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ﴿۷﴾ فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِیَ اَنْۢ بُوْرِكَ مَنْ فِی النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ؕ وَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۸﴾

r স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন মূসা তাহার পরিবারবর্গকে বলিয়াছিল, 'আমি আগুন দেখিয়াছি, সম্ভবতঃ আমি সেথা হইতে তোমাদিগের জন্য কোন খবর আনিতে পারিব, অথবা তোমাদিগের জন্য আনিতে পারি জলন্ত কাষ্ঠখণ্ড, যাহাতে তোমরা আগুন পোহাইতে পার।'

r অতঃপর সে যখন আগুনের নিকট আসিল তখন তাহাকে ডাকিয়া বলা হইল, 'ধন্য তাহারা যাহারা আছে অগ্নি দ্বারা আলোকিত স্থানে এবং উহার চতুষ্পার্শ্বে, বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্ পবিত্র ও মহিমান্বিত।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন মুসা তার পরিবারবর্গকে বলেছিলো, আমি আগুন দেখেছি'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! বনী ইসরাইলের নবী মুসার কথা স্মরণ করুন। তিনি মাদিয়ান থেকে সপরিবারে মিসর গমনকালে হারিয়ে ফেললেন পথ। তখন ছিলো শীতকাল। দিবাবসানে নেমে এলো শীতার্ত রাত্রি। প্রয়োজন দেখা দিলো আগুনের। এদিকে ওদিকে পতিত হলো তাঁর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিপাত। সহসা দেখলেন, দূরবর্তী এক শৈলশিখরে জ্বলছে আগুন। তৎক্ষণাৎ স্ত্রীকে বললেন, ওইতো আমি আগুন দেখতে পাচ্ছি। উল্লেখ্য, হজরত মুসা 'আগুন দেখতে পাচ্ছি' কথাটি বলেছিলেন তাঁর মাতৃভাষায়। এখানে তাঁর ওই বক্তব্যটি উল্লেখিত হয়েছে আরবী বচনে। এতে করে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, রসুল স. এর বক্তব্য যে কোনো ভাষায় অক্ষরান্তরিত করা যায়। সুতরাং বুঝতে হবে, যে কোনো ভাষায় বিবাহ-শাদী পড়ানো সিদ্ধ, যদি ওই সকল ক্ষেত্রে পরিপূরিত হয় বিবাহের শর্তসমূহ।

এরপর বলা হয়েছে— 'সম্ভবতঃ আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোনো খবর আনতে পারবো'। একথার অর্থ— হজরত মুসা তাঁর পরিবারবর্গকে আরো বললেন, তোমরা এখানেই অবস্থান করো। দূর করো পথশ্রান্তি। আমি আগুনের কাছে যাই। সেখানে নিশ্চয় পাবো মানুষের উপস্থিতি, অথবা লোকালয়। তাদের কাছে হয়তো পাবো হারানো পথের সন্ধান। সেই সংবাদ পৌঁছাতে পারবো তোমাদের কাছেও।

এখানে 'সাআতীকুম' অর্থ সংবাদ আনতে পারবো। আর সুরা ক্বাসাসে এই কথাটি উল্লেখিত হয়েছে এভাবে— 'লাআ'ললি আতীকুম' (সম্ভবতঃ আমি আনব)। বাক্য দু'টোর একটিতে প্রকাশ পেয়েছে দৃঢ়তাব্যঞ্জকতা, আর একটিতে আশাবাদ।

'বি খবারিন' অর্থ বিজ্ঞপ্তি, সংবাদ, পথনির্দেশনা। শীতার্ত নিশীথে বিজন প্রান্তরে হজরত মুসা হারিয়ে ফেলেছিলেন পথ। তাই এখানে শব্দটির মর্মার্থ হবে 'পথের সন্ধান'। আর এখানে 'সাআতীকুম' (সম্ভবতঃ কোনো সংবাদ আনতে পারবো) কথাটির মধ্যে একই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে দৃঢ়তা ও অজুহাত। অর্থাৎ প্রত্যাবর্তনের দৃঢ়তা ও বিলম্বের অজুহাত। কারণ প্রজ্বলিত অগ্নিটি ছিলো দূরে। তাই বিলম্বিত প্রত্যাবর্তন ছিলো অবধারিত। একই সঙ্গে অনিবার্য ছিলো তাঁর প্রত্যাবর্তনের বিষয়টিও।

এরপর বলা হয়েছে— 'অথবা তোমাদের জন্য আনতে পারি জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পারো'। একথার অর্থ— হজরত মুসা বললেন, অথবা কেবল পথের সংবাদই নয়, তোমাদের জন্য সম্ভব হলে আনতে পারি ওই অগ্নিকুণ্ডের কোনো জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড। তাহলে তোমরা আগুনও পোহাতে পারবে। দূর করতে পারবে শীতের কষ্ট।

কামুস রচয়িতা লিখেছেন, বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড থেকে আহরিত অগ্নিশিখাকে বলে 'শিহাব'। বাগবী লিখেছেন, 'শিহাব' ও 'ক্বাস' শব্দ দু'টো অনেকটা সমঅর্থসম্পন্ন। 'ক্বস' বলে ওই কাষ্ঠখণ্ডকে যার একাংশ অক্ষত এবং অপরাংশ দগ্ধমান।

'ইয়াসতালূন' অর্থ আগুন পোহাতে পারো। 'ইসতিলা' শব্দটি ধাতুমূল। 'সালইয়ুন' অর্থ আগুন জ্বালানো। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— তোমরা শৈত্যনিবারণের জন্য পোহাতে পারবে আগুন।

পরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'অতঃপর সে যখন আগুনের নিকটে এলো, তখন তাকে ডেকে বলা হলো, ধন্য তারা যারা আছে অগ্নি দ্বারা আলোকিত স্থানে আর তার চতুষ্পার্শ্বে'। এখানে 'যারা আছে অগ্নি দ্বারা আলোকিত স্থানে' অর্থ যারা বা যিনি উপস্থিত হয়েছেন অগ্নির নিকটে। উদ্দিষ্ট স্থলে উপনীত ব্যক্তিকে আরববাসীরা বলেন 'বালাগাল ফুলানুল মানযিলা'। নূদিয়া' অর্থ ডেকে বলা হলো। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং হাসান বসরী বলেছেন 'যারা আছে অগ্নি দ্বারা আলোকিত স্থানে এবং এর চতুষ্পার্শ্বে' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে আল্লাহ্পাকের আনুরূপ্যহীন উপস্থিতিকে। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— আল্লাহ্ স্বয়ং হজরত মুসাকে আহ্বান করলেন। তাঁর সাথে কথোপকথন করলেন। কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, ওই আগুন পার্থিব কোনো আগুন ছিলো না, ছিলো আল্লাহ্তায়ালার অলৌকিক জ্যোতিচ্ছটা। কিন্তু হজরত মুসা ওই জ্যোতির্ময়তাকে মনে করেছিলেন পার্থিব আগুন। তাই ওই জ্যোতিকে এখানে অভিহিত করা হয়েছে 'আগুন'।

ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু মুসা আশয়ারী বলেছেন, রসুল স. একবার আমাদের এক সমাবেশে দণ্ডায়মান হয়ে ভাষণ দিলেন পাঁচটি বিষয়ে। বললেন, আল্লাহ্ নিদ্রাভিভূত হন না। এরকম করা তাঁর জন্য সমীচীনও নয়। তিনি দাঁড়িপাল্লা ঊর্ধ্বগামী ও অধোগামী করেন। কাউকে করেন লাঞ্ছিত এবং কাউকে সম্মানিত। মানুষের রাতের কৃতকর্মের পূর্বেই তাঁর কাছে পৌঁছে যায় তাদের দিনের কৃতকর্ম এবং দিনের কার্যকলাপ পৌঁছে রাতের কার্যকলাপের পূর্বে। জ্যোতি তাঁর যবনিকা। ওই যবনিকা উন্মোচিত হলে ভস্মীভূত হয়ে যাবে সমগ্র সৃষ্টির সকল প্রকার পরিদৃশ্যমানতা।

সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, ওই আগুন ছিলো প্রকৃতই আগুন। অর্থাৎ ওই আগুন ছিলো আল্লাহ্তায়ালার আনুরূপ্যবিহীন সত্তার দৃষ্টান্তাতীত বেষ্টনী। কোনো কোনো বর্ণনায় তাই দেখা যায় 'জ্যোতির আড়ালে' এর স্থলে 'অগ্নির আড়ালে'র উল্লেখ। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয় আলোচ্য আয়াত রহস্যাচ্ছন্ন আয়াতের (আয়াতে মুতাশাবিহাতের) পর্যায়ভূত। যেমন অন্য এক আয়াতে এসেছে 'তারা তো অপেক্ষমাণ যে আল্লাহ্ তাদের নিকট আগমন করবেন মেঘের ছায়ায়'।

আল্লাহ্তায়ালা অবয়বাতীত ও স্থানাতীত। তিনি আকার ও প্রকার থেকে চিরমুক্ত ও চিরপবিত্র। এই ধারণাটিকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই আলোচ্য আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে 'বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্ পবিত্র, মহিমান্বিত'। অর্থাৎ হজরত মুসার দৃষ্টিতে প্রতিভাত ওই আগুন স্থানসম্ভূত অথবা কালজ নয়। বরং তা স্থান-কাল এবং আকার প্রকার থেকে সতত মুক্ত, চিরপবিত্র।

মুজাহিদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'বূরিকা মান ফিন্নারি' অর্থ ওই অগ্নিকে করা হয়েছে কল্যাণময়। সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি উবাই ইবনে কা'বকে বাক্যটি পাঠ করতে শুনেছি এভাবে— 'আন বূরিকাতিন নারু ওয়া মান হাওলাহা', যার অর্থ দাঁড়ায়— ওই অনল সুপ্রচুর কল্যাণপ্রাপ্ত এবং তার চতুষ্পার্শ্বও। 'মান' এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে অতিরিক্তরূপে। অবশ্য 'বূরিকান নারু' এবং 'বূরিকা ফিন্ নারি' সমার্থক। আরবীভাষীগণ বলেন' 'বারাকাল্লাহ্' 'বারাকাল্লাহু ফীহ্' 'বারাকাল্লহু আলাইহি', এই বাক্যগুলোও সমার্থক। এভাবে বক্তব্যটি মর্মার্থ পরিগ্রহ করে এরকম— ফেরেশতামণ্ডলী আছে অগ্নি দ্বারা আলোকিত স্থানে এবং হজরত মুসা আছেন তার সন্নিকটে।

ভূমিখণ্ডকে যেমন বলা হয় 'বুক্বআ'তুন মুবারাকাতুন' (কল্যাণময় ভূখণ্ড), তেমনি এখানকার 'আন্নারু মুবারাকুন' অর্থ বরকতময় অগ্নি। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ফীল বুক্বআতিল মুবারাকাতি' (পবিত্রতম ভূখণ্ডে, বরকতময় মৃত্তিকায়)। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'বূরিকা মান ফিন্নার' অর্থ অগ্নি-অন্বেষককে দেয়া হয়েছে বরকত। অথবা সুপ্রচুর কল্যাণ প্রদত্ত হয়েছে অনল-স্থলে উপস্থিতজনকে। অর্থাৎ ওই অলৌকিক অনলের সন্নিকটে ও চতুষ্পার্শ্বে সমবেত ফেরেশতামণ্ডলী এবং হজরত মুসা সাধুবাদ প্রাপ্তির যোগ্য। আর হজরতের প্রতি প্রেরিত সাধুবাদের বাহক হচ্ছেন ফেরেশতামণ্ডলী, যেমন ফেরেশতারা বাচনিক সাধুবাদ জানিয়েছিলেন নবী ইব্রাহিম ও তার পরিবারবর্গকে। বলেছিলেন— আল্লাহের আশীষ ও কল্যাণ আপনাদের উপর, হে গৃহবাসীগণ'!

কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'মান হাওলাহা' কথাটি সাধারণ অর্থবোধক। অর্থাৎ আলোকিত স্থান বলে এখানে বুঝানো হয়েছে সমগ্র সিরিয়া ভূমিকে, ওই অগ্নিদর্শনের স্থানও যার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতে এই শুভসমাচারটি নিহিত রয়েছে যে— হজরত মুসার জীবনের পরবর্তী অধ্যায় আল্লাহ্ প্রদত্ত সুপ্রচুর কল্যাণে ভরা। আর ওই কল্যাণময়তার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটবে পরবর্তী সময়ে সিরিয়ায়।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'মান ফিন নার' অর্থ যুথবদ্ধ ফেরেশতা এবং 'মানহাওলাহা' অর্থ হজরত মুসা। অর্থাৎ ওই অলৌকিক অনলে আল্লাহ্‌র গুণগানে রত ছিলো ফেরেশতারা এবং তার সমীপবর্তী ছিলেন হজরত মুসা। এ সকল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আয়াতের 'সুবহানাল্লাহি রব্বিল আলামীন' বাক্যটির অর্থ আপনাআপনিই উন্মোচিত হয়ে পড়ে। সহজেই বুঝতে পারা যায়, তাঁর পরবর্তী বিবরণ হবে অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর।

সূরা নমল ঃ আয়াত ৯, ১০, ১১

يٰمُوْسٰٓى اِنَّهٗٓ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٩ وَاَلْقِ عَصَاكَ ۭ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَاۗنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ۭ يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ ۣ اِنِّىْ لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُوْنَ ۝١٠ اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًۢا بَعْدَ سُوْۗءٍ فَاِنِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝١١

r 'হে মূসা! আমি তো আল্লাহ্, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়,'

r 'তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর।' অতঃপর যখন সে উহাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে দেখিল তখন পিছনে না তাকাইয়া সে বিপরীত দিকে ছুটিতে লাগিল। বলা হইল, 'হে মূসা! ভীত হইও না, আমার সান্নিধ্যে তো রসূলেরা ভয় পায় না;

r 'তবে যাহারা সীমালংঘন করিবার পর মন্দকর্মের পরিবর্তে সৎকর্ম করে তাহাদিগের প্রতি আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে মুসা! আমি তো আল্লাহ্, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'। একথার অর্থ— ওই অলৌকিক জ্যোতিস্নাত পরিবেশে আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবীকে ডেকে বললেন, হে মুসা! আমিই আল্লাহ্। আমার পরিচয় শোনো— আমি মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়। তাইতো আমি আমার চিরস্বাধীন সিদ্ধান্তানুসারে যা কিছু করি, তা হয় নিশ্চিত, নির্ভুল, নিখুঁত।

পরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ করো। অতঃপর সে যখন তাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখলো, তখন পিছনে না তাকিয়ে সে বিপরীত দিকে ছুটতে লাগলো'। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্ নির্দেশ করলেন, তুমি তোমার হস্তধৃত যষ্টিটি মৃত্তিকায় নিক্ষেপ করো। তিনি নির্দেশ পালন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে যষ্টিটি রূপান্তরিত হলো বিরাট এক অজগরে। বিশালদেহী অজগরটি ছুটাছুটি শুরু করলো। তাই না দেখে মুসা পিছন ফিরে দিলেন দৌড়। মুকাতিল বলেছেন, এখানকার 'আ'ক্বক্বিব' কথাটির অর্থ পলায়ন করার পর আবার প্রত্যাবর্তন করা।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলা হলো, হে মুসা! ভীত হয়ো না, আমার সান্নিধ্যে তো রসুলেরা ভয় পায় না'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ তখন বললেন, হে মুসা! তুমি তো আমার রসুল। আমার সান্নিধ্যে আমার রসুলেরা তো থাকে নিশঙ্কচিত্ত। তবে তুমি ভীত হচ্ছো কেনো? কেনো হতে চাইছো দূরবর্তী। এভাবে হজরত মুসাকে একথাটিই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে বা কোনো কিছুকে ভয় পাওয়া নবী-রসুলগণের স্বভাব নয়। সুতরাং অজগরকে তিনি ভয় পাবেন কেনো? নবী-রসুলগণ তো ভয় পাবেন কেবল আল্লাহ্কে। যেমন রসুল স. বলেছেন, আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহ্কে অধিক ভয় করি। অথবা আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ হবে এরকম— প্রত্যাদেশের প্রভাব তো কেবল আল্লাহ্র ভয় ছাড়া অন্য সকলের ও সকলকিছুর ভয় দূর করে দেয়। হে মুসা! এখন তো তুমি প্রত্যাদেশায়িত। তাহলে তুমি অজগর-ভীতিকে অনর্থক প্রশ্রয় দিতে চাও কেনো। শান্ত হও। অভিনিবেশী হও কেবল আমার দিকে। অথবা অর্থ হবে— নবী-রসুলগণের শুভপরিণাম সুনিশ্চিত। অতএব হে আমার নবী! তুমি চঞ্চল-বিহ্বল হবে কেনো?

এর পরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'তবে যারা সীমালংঘন করার পর মন্দকর্মের পরিবর্তে সৎকর্ম করে, তাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। এখানকার 'ইল্লা' (তবে) অব্যয়টি ব্যতিক্রমবোধক। অব্যয়টি এখানে হতে পারে পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্যপ্রবাহসংযুক্ত, অথবা বিচ্ছিন্ন। কেউ কেউ বলেছেন, সংযুক্ত। যদি তাই হয় তবে বুঝতে হবে, এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে কিবতী হত্যার প্রসঙ্গটির দিকে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— রসুলগণ কাউকে ভয় করে না। তবে তাদের দ্বারা সর্বোত্তমকে ছেড়ে অপেক্ষাকৃত কম উত্তমকে গ্রহণ করাও অসমীচীন। উল্লেখ্য, দুরাচার কিবতী লোকটি নিহত হয়েছিলো হজরত মুসার মুষ্টাঘাতে। কিন্তু তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্য তাঁর আদৌ ছিলো না। আরো উল্লেখ্য, এখানে 'সীমালংঘন' অর্থ অসমীচীনতা, লঘুক্রটি। বলা বাহুল্য, এরকম

লঘুত্রুটিও নবী-রসুলগণের মর্যাদার অনুকূল নয়। সুতরাং এরকম অনিচ্ছাকৃত ভুল থেকেও তাঁদের তওবা করা উচিত। আর তাঁদের মর্যাদার অনুকূল এরকম তওবা তাঁরা করেনও এবং অবশ্যই পান আল্লাহ্র অপার ক্ষমা ও দয়া। আর এখানে 'মন্দকর্মের পরিবর্তে সৎকর্ম করে' কথাটির মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, নবী-রসুলগণের পদস্খলন কখনোই ঘটে না। নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বেও নয়। আর তাঁদের পবিত্র স্বভাব হচ্ছে, অনিচ্ছাকৃত ও অনবধনতাজনিত অনুল্লেখ্য ত্রুটির কারণেও তাঁরা আল্লাহ্র সকাশে করেন সানুতপ্ত ও প্রেমময় প্রত্যাবর্তন।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'ছুম্মা বাদ্দালা' বাক্যটির সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে একটি লুপ্ত শব্দ। তারপর থেকে সূচিত হয়েছে একটি পৃথক বাক্য। অর্থাৎ 'মান জলামা' পর্যন্ত এসে বসবে একটি যতিচিহ্ন। তারপর শুরু হবে পৃথক বাক্য এভাবে— 'ফামান জলামা ছুম্মা বাদ্দালা' (যারা পাপ করেছে অতঃপর করেছে তওবা)। এমতাবস্থায়— এ বাক্যটি সম্পৃক্ত হবে সর্বসাধারণের সঙ্গে, কেবল নবী-রসুলগণের সঙ্গে নয়। অর্থাৎ নবী-রসুলগণ থাকবেন কথিত সীমালংঘন বা গুরু পাপ থেকে মুক্ত।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার ব্যতিক্রমবোধক 'ইল্লা' আলোচ্য আয়াতকে বিচ্ছিন্ন করেছে পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্য প্রবাহকে। কারণ, নবী-রসুলগণের দ্বারা 'জুলুম' বা সীমালংঘন সম্ভবই নয়। আল্লাহ্পাক তাদেরকে পাপ থেকে রাখেন সতত মুক্ত। তাই তাঁরা নিষ্পাপ। এমতাবস্থায় এখানকার 'ইল্লা' শব্দটির অর্থ 'লাকিন্না' (কিন্তু) এবং আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে— কিন্তু নবী-রসুল ব্যতীত অন্য কেউ যদি সীমালংঘন করবার পর তওবা করে এবং মন্দকর্মের স্থলে শুরু করে সৎকর্ম, তবে আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করেন। কারণ তিনি ক্ষমাপরায়ণ ও পরম দয়ার্দ্র। আর তাদের অন্তরে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের ভয় থাকে বলেই সীমালংঘনের সম্ভাবনা থেকে তারা মুক্ত নয়।

কেউ কেউ আবার মন্তব্য করেছেন, আলোচ্য আয়াতে প্রকাশ পেয়েছে আল্লাহ্র রোষজাত মহিমা। সুতরাং বুঝতে হবে নবী-রসুলগণের দ্বারা সীমালংঘন সম্ভব নয়, সম্ভব নয় বিশ্বাসগত কোনো ভুল, কিন্তু বুদ্ধিগত সাময়িক ভুল হওয়া তাঁদের জন্যও অস্বাভাবিক কিছু নয়। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়াবে— যে সকল নবী বুদ্ধিগত ভুল অনিচ্ছাসত্ত্বেও করে ফেলেন এবং অনতিবিলম্বে তওবা করে ওই ভুল পরিত্যাগপূর্বক আশ্রয় করেন শুভকর্মাবলীকে, তাদেরকেও আল্লাহ্ মার্জনা করে দেন। আর ওই নবীগণও আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে বা কোনোকিছুকে ভয় পান না।

বর্ণিত ব্যাখ্যাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, হজরত মুসা অজগর দেখে ভয় পাননি। কিন্তু বাস্তব অবস্থা এর বিপরীত। কারণ পূর্ববর্তী আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে 'হে মুসা! ভীত হয়ো না'। অতএব একথা না বলে উপায় নেই যে, ভয় তিনি ঠিকই পেয়েছিলেন। কিন্তু সে ভয় প্রকাশ্যত সাপের হলেও প্রকৃতপক্ষে তা ছিলো আল্লাহ্‌র ভয়। কারণ মৃত্তিকায় নিক্ষিপ্ত যষ্টি অজগরে পরিণত হয়েছিলো আল্লাহ্‌র নির্দেশ। তাই তার ভীতি ছিলো আল্লাহ্‌র নির্দেশের প্রতি, সাধারণ কোনো সাপের প্রতি নয়। যেমন হজরত ইব্রাহিম নমরুদের অগ্নিকুণ্ডকে ভয় পাননি। কারণ তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ছিলো না। আবার রসুলে পাক স. ঝড়-তুফানের সম্ভাবনা দেখলে ভীত হয়ে পড়তেন। কারণ ঝড়-ঝঞ্ঝা সৃষ্টির পক্ষ থেকে হয় না। হয় আল্লাহ্‌র নির্দেশানুসারে।

সূরা নমল ঃ আয়াত ১২, ১৩, ১৪

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ۖ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿١٢﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١٣﴾ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾

r এবং তোমার হাত তোমার বগলে রাখ। ইহা বাহির হইয়া আসিবে নির্মল উজ্জ্বল হইয়া। ইহা ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত। উহারা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

r অতঃপর যখন উহাদিগের নিকট আমার স্পষ্ট নিদর্শন আসিল, উহারা বলিল, 'ইহা সুস্পষ্ট যাদু।'

r উহারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করিল, যদিও উহাদিগের অন্তর এইগুলিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদিগের পরিণাম কী হইয়াছিল?

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং তোমার হাত তোমার বগলে রাখো'। একথার অর্থ— আল্লাহ্‌ বললেন, হে মুসা! এবার তোমার ডানহাত রাখো তোমার বাম বগলে বা জেবে। এখানে 'জাইব' অর্থ জেব বা বগল। 'কামুস' গ্রন্থে এরকমই

বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, অঙ্গাবরণকে বলে 'জাইব'। 'জওব' অর্থ কর্তন করা। যেহেতু কাপড় কেটে অঙ্গাবরণ প্রস্তুত করা হয়, তাই তার নাম 'জাইব'। বাগবী লিখেছেন, কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ বলেন, সে সময় হজরত মুসার শরীর আবৃত ছিলো একটি আস্তিন ও গলবন্ধবিহীন পশমী বস্ত্রে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তা বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল হয়ে'। একথার অর্থ— বগলে বা জেবে হাত রাখার পর তা বের করে আনলে ওই হাত থেকে বিচ্ছুরিত হবে শুভ্র-অভ্র ও নির্মল জ্যোতিচ্ছটা। অর্থাৎ ওই শুভ্রতা স্বেত-রোগের মতো অনির্মল ও অসুন্দর হবে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটা ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকটে আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত'। একথার অর্থ— হজরত মুসা যে নয়টি নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন, শ্বেত-শুভ্রহস্তের নিদর্শনও তার অন্তর্গত। তাঁর নয়টি নিদর্শন হচ্ছে— ১. যষ্টির সর্পরূপ ধারণ ২. শ্বেত-শুভ্র জ্যোতির্ময় হস্ত ৩. ঝড়-ঝন্ঝা ৪. পঙ্গপালের আক্রমণ ৫. জোঁকের আক্রমণ ৬. ভেকের প্রাবল্য ৭. পানির রক্ত হয়ে যাওয়া ৮. দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস এবং ৯. মাতৃস্তনের দুধ শুকিয়ে যাওয়া। উল্লেখ্য, যষ্টির আঘাতে সমুদ্রাভ্যন্তরের পথ প্রকাশিত হওয়ার নিদর্শনটি এখানে উল্লেখিত নয়টি মোজেজার অন্তর্ভূত করা হয়নি। কারণ এই নিদর্শনটি ছিলো ফেরাউন ও তার দল-বলের সলিল-সমাধি হওয়ার সময়ে। তাদের পথপ্রদর্শনের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। অথবা এখানকার 'ফীতিস্য়ি আয়াত' একটি পৃথক বাক্য। এর মর্মার্থ হবে 'ইজহাব ফী তিস্য়ি আয়াত' (নয়টি নিদর্শনসহ যাও)।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়'। এই বাক্যটিতে প্রকাশ করা হয়েছে হজরত মুসার মিসর গমনের কারণ। অর্থ্যাৎ ফিরাউন ও তার অনুসারীরা যেহেতু সত্যচ্যুত ও দুষ্কর্মপরায়ণ তাই তাদের পথ প্রদর্শনার্থে তাদের নিকটে প্রেরণ করা হলো রসুল মুসাকে।

পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'অতপর যখন তাদের নিকট আমার স্পষ্ট নিদর্শন এলো, তারা বললো, এতো সুস্পষ্ট যাদু'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ বলেন, যথাসময়ে হজরত মুসা তাঁর ভ্রাতা হজরত হারুনকে নিয়ে উপস্থিত হলেন মিসর রাজ্যের দরবারে। সেখানে প্রদর্শিত হলো নয়টি নিদর্শনের মধ্যে দু'টি নিদর্শন— যষ্টির সর্পরূপ ধারণ এবং শ্বেত-শুভ্র হস্তের জ্যোতির্ময় বিচ্ছুরণ। ভীত, বিস্মিত ও অভিভূত হলো সম্রাট, তার পারিষদবর্গ। তৎসত্ত্বেও বিদ্বেষবশতঃ বললো, এ যে দেখছি জলজ্যান্ত যাদু।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করলো, যদিও তাদের অন্তর এগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিলো'। একথার অর্থ ফেরাউন ও তার বংশধরেরা ছিলো অন্যায়াভ্যস্ত ও উদ্ধত তাই তারা হজরত মুসার অভূতপূর্ব নিদর্শনদ্বয়কে সত্য জেনেও গ্রহণ করলো না। প্রত্যাখ্যান করলো অন্যায়ভাবে, উদ্ধতভরে। এখানে 'ইস্তিক্বান' অর্থ মনে মনে সত্য জেনেও। আর 'জুলুম' অর্থ আত্মপীড়ন। অর্থাৎ তারা ওই নিদর্শনদ্বয়কে মনে মনে সত্য জানা সত্ত্বেও তার প্রতি প্রদর্শন করেছিলো দুর্বিনয় ও ঔদ্ধত্য। এভাবে নিজের জন্য তারা নির্ধারণ করে নিয়েছিলো অনন্ত নরক।

শেষে বলা হয়েছে — 'দেখো, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কী হয়েছিলো'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল এবং হে শুভবোধসম্পন্ন মানবমণ্ডলী! অনুধাবন করো, ওই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম হলো কত ভয়াবহ। ইহজগতে সমুদ্র-সমাধি তো তাদের হলোই, পর জগতেও তারা হলো অনন্ত শাস্তির উপযোগী।

সূরা নমলঃ আয়াত ১৫

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَ سُلَيْمٰنَ عِلْمًا ۚ وَ قَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٥﴾

r আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তাহারা বলিয়াছিল, 'প্রশংসা আল্লাহের যিনি আমাদিগকে তাঁহার বহু বিশ্বাসী দাসের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান দান করেছিলাম'। একথার অর্থ— সাধারণ মানুষ যেমন তাদের আপন অস্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোত ও সততসম্পৃক্ত, তেমনি আমি আমার প্রিয় নবী দাউদ ও সুলায়মানের সঙ্গে স্থায়ী সম্পৃক্তি ঘটিয়েছিলাম আমার সত্তা-গুণবত্তা ও বিধানবিষয়ক জ্ঞানের। জ্ঞানরাজ্যের সঙ্গে এমতো সম্পর্কায়নের কারণে তাঁরা বুঝতে পারতেন অনেক কিছু। যেমন ভূচর ও খেচর প্রাণীকুলের ভাষা, গিরিমালার স্তব-স্তুতি। করতে পারতেন আরো অনেক অসম্ভব কর্ম। যেমন, কেবল হাতের সাহায্যে লোহাকে মোমের মতো গলিয়ে ফেলা, সিংহাসনারূঢ় হয়ে বাতাসে ভর করে উড়ে চলা ইত্যাদি।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তারা বলেছিলো, প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি আমাদেরকে তাঁর বহু বিশ্বাসী দাসের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন'। একথার অর্থ—

মানুষের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মান নবুয়ত ও অনন্যসাধারণ প্রজ্ঞা লাভ করে তাঁরা হয়েছিলেন বিনীত ও বিমোহিত। তাই সকৃতজ্ঞচিত্তে বলেছিলেন, প্রশংসা ও মহিমা কেবলই আল্লাহ্র। তিনিই তো তাঁর বিশ্বাসী দাসগণের মধ্যে আমাদেরকে করেছেন অনন্যবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, প্রজ্ঞা দিয়ে, অলৌকিকত্ব দিয়ে এবং মানুষের পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব দিয়ে।

আলোচ্য বাক্যের শুরুতে উল্লেখিত হয়েছে 'ওয়াও' (এবং)। এতে করে অনুমিত হয়, এর পূর্বে রয়েছে একটি বাক্যের প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি। ওই অনুক্ত বাক্যটি এরকম— তাঁরা আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন এবং কার্যক্ষেত্রে দেখেছিলেন তার সফল প্রয়োগ। তাই তাঁরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন আলোচ্য বক্তব্যের মাধ্যমে যথাযথরূপে। অথবা এখানকার 'ওয়াও' কে মেনে নিতে হবে 'ফা'। তাহলেই ফুটে উঠবে আলোচ্য বক্তব্যের সম্পূর্ণরূপ। এবং এর মর্মার্থ হবে অধিকতর স্পষ্ট। যেমন বলা হয়— 'আ'তাইতুহু ফাশাকারা' (আমি তাকে দান করেছি, তাই সে প্রকাশ করেছে কৃতজ্ঞতা)। আর আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথাও প্রতীয়মান হয় যে, জ্ঞান হচ্ছে আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ অনুদান। জ্ঞানই মানুষকে মহিমান্বিত করে।

রসুল স. বলেছেন, উপাসনাপ্রবণদের উপরে জ্ঞানীদের মর্যাদা নক্ষত্রপুঞ্জমধ্যে পূর্ণ শশী সদৃশ। জ্ঞানীরাই নবীগণের উত্তরাধিকারী। তাঁরা উত্তরাধিকাররূপে রেখে যান কেবল জ্ঞান। তাই যে তাঁদের জ্ঞান আহরণ করলো, সে-ই সৌভাগ্যশালী। সে-ই পেলো সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার। হাদিসটি আহমদ, তিরমিজি, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন কাছীর ইবনে কায়েস থেকে। তিরমিজি লিখেছেন, তাঁর নাম ছিলো কায়েস ইবনে কাছীর।

রসুল স. আরো বলেছেন, তাপসের উপরে বিদ্বানের মর্যাদা তোমাদের মধ্যে আমার মর্যাদার মতো। তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু উমামা থেকে।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আরো প্রমাণিত হয়, জ্ঞানরূপ বৈভবপ্রাপ্তির যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ অত্যাবশ্যক। এতে রয়েছে আর একটি শিক্ষণীয় বিষয়। সেটি হচ্ছে জ্ঞানপ্রাপ্তদেরকে হতে হবে বিনয়াবনত। তাঁদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে অনেক মানুষের মধ্যে আমরাও মানুষ। নিজেদের যোগ্যতায় নয়, আমাদেরকে জ্ঞানী করা হয়েছে আল্লাহ্র দয়ায়। আর আল্লাহ্ এক এক জনকে দিয়েছেন এক এক রকমের জ্ঞান। সুতরাং জ্ঞানীদের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণের দায়িত্ব দাতার, গ্রহীতার নয়। গ্রহীতার দায়িত্ব কেবল কৃতজ্ঞতা ও বিনয়াবনতা, নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা নয়।

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ؕ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ﴿١٦﴾

r সুলাইমান ছিল দাউদের উত্তরাধিকারী এবং সে বলিয়াছিল, 'হে মানুষ! আমাকে বিহংগকুলের ভাষা বুঝিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং আমাকে সবই দেওয়া হইয়াছে, ইহা অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সুলায়মান ছিলো দাউদের উত্তরাধিকারী'। একথার অর্থ— সুযোগ্য পিতা হজরত দাউদের সুযোগ্য পুত্র ছিলেন হজরত সুলায়মান। উত্তরাধিকারীরূপে তিনি তাঁর পিতার মতো লাভ করেছিলেন নবুয়ত, রাজত্ব ও প্রজ্ঞা। কাতাদা এরকম ব্যাখ্যা করেছেন। আর ব্যাখ্যাটি সূত্রায়িত হয়েছে আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেম থেকে।

বিভ্রান্ত শিয়া সম্প্রদায় আলোচ্য বাক্য থেকে আহরণ করেছে একটি অপধারণা ও ক্ষতিকর দলিল। সেটি হচ্ছে— নবীগণও তাঁদের উত্তরাধিকারী নির্বাচন করেন। কিন্তু এমতো অপবিশ্বাস অজ্ঞজনোচিত। এখানে উল্লেখিত উত্তরাধিকারকে যদি প্রচলিত উত্তরাধিকাররূপে গণ্য করা হয়, তবে বলতে হয়, হজরত সুলায়মান একাই লাভ করেছিলেন তাঁর পিতার উত্তরাধিকার। আর তাঁর অন্যান্য অষ্টাদশ ভ্রাতা হয়েছিলো বঞ্চিত। কিন্তু তা কী করে সম্ভব?

অংশীদারিত্বের বিধান হচ্ছে— ক্রয়-বিক্রয়, দান-প্রতিদান অথবা কোনো প্রকার চুক্তি ব্যতিরেকে একজনের অধিকারভূত হওয়া, তারা পরস্পরের আত্মীয় হোক অথবা না হোক। যেমন আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— 'আমি বনী ইসরাইলকে ওই ভূখণ্ডের অধিকারী করে দিলাম'। আরো এরশাদ করেছেন— 'আমি তোমাদেরকে তাদের ভূমি ও বাড়ীঘরের মালিক করে দিলাম'। রসুল স. বলেছেন, আমরা কোনো উত্তরাধিকার রাখি না। কথাটির অর্থ— নবীগণের মহাপ্রয়াণপরবর্তী সম্পদের কোনো উত্তরাধিকারী হয় না। যদি সেরকম কিছু থাকে, তবে তা হয় আল্লাহ্র সংরক্ষণভূত।

বাগবী লিখেছেন, আল্লাহ্পাক হজরত দাউদকে যে বিত্ত-বৈভব দান করেছিলেন, তা-ই তিনি প্রদান করেছিলেন হজরত সুলায়মানকে। বরং তিনি পেয়েছিলেন আরো কিছু বৈশিষ্ট্য। যেমন— বাতাস ও জ্বিনের উপরে প্রভুত্ব।

মুকাতিল বলেছেন, হজরত সুলায়মানের সাম্রাজ্য ছিলো হজরত দাউদের সাম্রাজ্যাপেক্ষা বৃহৎ। আর বিচারকরূপে তিনি ছিলেন তার পিতাপেক্ষা বিজ্ঞ। হজরত দাউদ ছিলেন অধিক ইবাদতকারী। আর হজরত সুলায়মান ছিলেন অধিক কৃতজ্ঞতাপ্রকাশকারী। আমি বলি, হজরত দাউদও ছিলেন এমনই।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং সে বলেছিলো, হে মানুষ! আমাকে বিহঙ্গকুলের ভাষা বুঝবার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে'। বাক্যটি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশক। এভাবে পাখিদের ভাষা বুঝবার ক্ষমতাপ্রাপ্তির কথা সকৃতজ্ঞচিত্তে প্রকাশ করে তিনি মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন পরম দয়ালু ও দাতা আল্লাহ্র দিকে।

'নুতক্ব' এবং 'মানতিক্ব' শব্দের দ্বারা প্রকাশ পায় মনের কথা, শব্দ একক বা যৌগিক, যেরকমই হোক না কেনো। 'কামুস' অভিধানে বলা হয়েছে, 'নুতক্ব' ও 'মানতিক্ব' অর্থ— এমন বর্ণসম্বলিত ধ্বনি, যা বোধগম্য। মানুষের ভাষার মধ্যেই ঘটে তার ভাবের প্রকাশ। তাই 'নুতক্ব' দ্বারা বুঝায় মানবোচ্চারিত শব্দ সম্ভারকে। মানুষ মানুষের ভাষা বুঝে, কিন্তু হজরত সুলায়মান বিহঙ্গকুলের ভাষাও বুঝতেন। তাদের কল-কাকলীর অর্থ করতে পারতেন যথাযথভাবে। সেকারণেই পাখির কুজনকেও এখানে বলা হয়েছে 'মানতিক্ব'।

বাগবী লিখেছেন, হজরত কা'ব বর্ণনা করেছেন, একবার এক সমাবেশে হজরত সুলায়মান তাঁর লোক জন নিয়ে বসেছিলেন। অদূরে একটি বন্য কবুতর চিৎকার করছিলো। তিনি জনতাকে জিজ্ঞেস করলেন, কবুতরটি কী বলছে জানো? লোকেরা বললো, না। তিনি বললেন, সে বলছে, মৃত্যুর জন্য জীবনকে এবং ধ্বংসের জন্য গৃহকে প্রস্তুত রাখো। আর একবার চিৎকার করছিলো একটি পক্ষীশাবক। তিনি সঙ্গীদেরকে বললেন, জানো, সে কী বলে চলেছে? তারা বললো, না। তিনি বললেন, সে বলছে, আক্ষেপ! এ বিশাল সৃষ্টিশালা যদি অস্তিত্বলাভ না করতো। ময়ূরের ডাক শুনে একবার তিনি বললেন, জানো, তার এ কেকার অর্থ কী? লোকেরা বললো, জানি না। তিনি বললেন, সে বলছে, অপরের জন্য যেমন আচরণ করবে, তেমনি আচরণ পাবে তুমিও। পেঁচকের ডাক শুনে বললেন, বলতো সে কী বলছে? উপস্থিত লোকেরা বললো, তার ভাষা তো আমরা জানি না। তিনি বললেন, পেঁচকটি বলছে, অন্যকে যে করুণা করে না, সে নিজেও করুণাসিক্ত হয় না। বাজপাখির চেঁচামেচি শুনে একবার জিজ্ঞেস করলেন, জানো সে কী বলে? লোকেরা বললো, না। তিনি বললেন, সে বলে, ওহে পাপী-তাপীর দল! আল্লাহ্ সকাশে ক্ষমা প্রার্থনা করো। আর একদিন তিতিরের কর্কশ স্বর শুনে তিনি তার সঙ্গীদের কাছে প্রশ্ন করলেন, বলতে পারো, তার এমতো উচ্চারণের মানে কী? সঙ্গীরা জবাব দিলো, না। তিনি বললেন, তার আওয়াজের

মানে— প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুপথগামী, আর প্রতিটি নতুন অবক্ষয়প্রবণ। আর একবার বললেন, বলো, ওই পাখিটির উচ্চারণে কী প্রকাশ পাচ্ছে? সম্বোধিতজনেরা বললো, বলতে পারবো না। তিনি বললেন, সে উপদেশ দিচ্ছে, পূর্বাহ্নে পুণ্য প্রেরণ করো, সবটাই পেয়ে যাবে। কবুতরের বাকবাকুম শুনে জিজ্ঞেস করলেন, বলো, সে কী জানাতে চায়? উপস্থিত জনেরা বললো, জানি না। তিনি বললেন, সে জানাতে চায়— আমার সুমহান প্রভুপালনকর্তার গুণকীর্তন দ্বারা আকাশ-বাতাস পূর্ণ করে দাও। একবার একটি কামারী পাখি শিস দিয়ে উঠলো। তিনি বললেন, বলো, তার শিসের মর্ম কী? লোকেরা বললো, আমাদের জানা নেই। তিনি বললেন, সে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে— বর্ণনা করো আমার মহামহিম প্রভুপালকের মহিমা। তিনি আরো বললেন, এক দশমাংশ কর সংগ্রহকারীকে কাকেরা অভিসম্পাত দেয়। আর চিলেরা বলে, আল্লাহ্ ব্যতীত সকল কিছুই ধ্বংসশীল। ফিঙ্গে বলে, স্বল্পবাকেরা নিরাপদ। তোতাপাখি সতর্ক করে দেয়— পার্থিবতা যাদের লক্ষ্য, তাদের পরিণাম অশুভ। ভেক ও তার সঙ্গিনী বলে, বর্ণনা করো আমার সুমহান আল্লাহ্র পবিত্রতা।

মাকহুলের বর্ণনায় এসেছে, একদা একটি তিতির পাখির ডাক শুনে হজরত সুলায়মান তাঁর সহচরদেরকে বললেন, বুঝতে পারছো তিতিরটি কী বলছে? সহচরেরা বললো, না। তিনি বললেন, সে বলছে 'আর রহমানু আ'লাল আরশিস্ তাওয়া' (দয়াময় আরশে অধিষ্ঠিত)। ফারকুদ সুবহীর বর্ণনায় এসেছে, বৃক্ষ শাখায় বসে একটি বুলবুলি এদিকে ওদিকে তার মস্তক আন্দোলিত করছিলো, আর চিৎকার করছিলো তার নিজের ভাষায়। হজরত সুলায়মান সে পথ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। সহযাত্রীদেরকে তিনি বললেন, বলতে পারো, পাখিটির চিৎকারের কী অর্থ? সহযাত্রীরা বললো, আল্লাহ্ এবং তাঁর নবীই অধিক অবগত। তিনি বললেন, সে বার বার বলছে, আমি ভক্ষণ করেছি একটি শীষের অর্ধেক। এখন পৃথিবীর দায়িত্ব শূন্য অর্ধাংশ পূর্ণ করা।

এক বর্ণনায় এসেছে, একবার একদল ইহুদী হজরত ইবনে আব্বাসের কাছে এসে বললো, আমরা আপনাকে সাতটি বিষয়ে প্রশ্ন করতে চাই। যদি আপনি প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব দিতে পারেন, তবে আমরা মুসলমান হয়ে যাবো। স্বীকৃতি দিবো আপনার জ্ঞানবত্তাকে। হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, কৌতুহল নিবারণের জন্য প্রশ্ন করতে পারো। জিগীর্ষার জন্য নয়। তারা বললো ১. চণ্ডাল পাখি সুমিষ্ট সূরে কী বলে? ২. ব্যাঙের ডাকের অর্থ কী? ৩. কী অর্থ মোরগের ডাকের? ৪. গর্দভের গর্জনে কী অর্থ প্রকাশ পায়? ৫. অশ্বের হ্রেষাধ্বনির মর্মার্থ কী? ৬. কী অর্থ গীত হয় তিতির পাখির গানে এবং ৭. কোন অর্থ বহন করে জর্জরপক্ষীর

কুজন? হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, চণ্ডাল পাখি বলে, হে আল্লাহ্! মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর বংশধরগণের প্রতি ঈর্ষাপোষণকারীদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করো। ভেক বলে, সেই উপাস্যই পবিত্রাতিপবিত্র, প্রোত্তাল পয়োধির গভীর অতল ও যার স্মরণে সতত মুখর। কুক্কুট বলে, হে উদাসীন! আল্লাহ্কে স্মরণ করো। গর্দভের গর্জনে প্রকাশ পায়— হে আল্লাহ্! এক দশমাংশ ওশর সংগ্রাহকদের উপরে বর্ষণ করো অভিশাপ। সমরপ্রতিযোগিতায় সমরাশ্বের হ্রেষারবে উচ্চারিত হয়— 'সুববুহুন কুদদুসুন রব্বুনা ওয়া রব্বুল মালায়িকাতি ওয়ার রূহ'। জর্জর পাখি বলে, হে জীবনোপকরণপ্রদাতা! তুমি প্রতিদিনের উপজীবিকা দাও প্রতিদিনে এবং তিতির পাখির জিকিরে উচ্চারিত হয়— আর রহমানু আ'লাল আরশিস্ তাওয়া। উল্লেখ্য, হজরত ইবনে আব্বাসের এমতো নির্ভুল জবাবে ওই ইহুদীরা মুসলমান হয়েছিলেন এবং জীবনপাত করেছিলেন মুসলমান হয়েই।

ইমাম জাফর সাদেক বলেছেন, আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতামহ বলেছেন, গর্দভ তার স্বভাষায় চিৎকার করে বলে, হে আদম সন্তান! যা খুশী করতে পারো, কিন্তু মনে রেখো, শেষ পরিণতি হচ্ছে মৃত্যু। ঈগল পাখির আওয়াজের অর্থ— মানুষ থেকে দূরে অবস্থান করার মধ্যেই রয়েছে নিরাপত্তা। চণ্ডাল পাখির কলগানে সমুচ্চারিত হয়, হে আল্লাহ্! অভিসম্পাতগ্রস্ত করো তাদেরকে যারা রসুল স. এর বংশধরগণের প্রতি ঈর্ষান্বিত। খাতাফ পাখির কুজনে প্রকাশ পায়— আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন। এভাবে পুরো সুরা আবৃত্তির শেষে এমনভাবে 'ওলাদ্দ্বললীন'কে দীর্ঘস্বরবিশিষ্ট করে, যেমন প্রলম্বিত লয়ে শব্দটি উচ্চারিত হয় একজন ক্বারীর কণ্ঠে।

আমি বলি, পশু-পাখির আওয়াজের অর্থসম্বলিত উপরে বর্ণিত বিবরণাবলী ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। ওই বিবরণসমূহ দৃষ্টে একথা মেনে নেয়া অত্যাবশ্যক নয় যে, তারা সব সময় এরূপ বলে। বরং বুঝতে হবে, হয়তো কখনো কোনো কারণে কোনো বিশেষ সময়ে তারা ওরকম করে বলে, তাদের সার্বক্ষণিক বুলি ওরকম নয়। লক্ষণীয়, আলোচ্য সুরায় হুদ্হুদ্ পাখি ও পিপীলিকার কথা বলার বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তাদের বক্তব্যগুলো ছিলো কয়েকটি বিশেষ ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ তাদের বক্তব্যগুলোও সার্বক্ষণিক নয়। অবশ্য এ প্রসঙ্গে ইহুদীদের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে হজরত ইবনে আব্বাসের জবাবদানের বিবরণটি নির্ভরযোগ্য। তবুও তার ঢালাও অর্থ করার ব্যাপারে রয়েছে যথাযথ ব্যাখ্যার অবকাশ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমাকে সবই দেয়া হয়েছে'। একথার অর্থ— এবং আমাকে দেয়া হয়েছে আরো অনেক কিছু। এটা ছিলো হজরত সুলায়মানের

অত্যধিক অনুগ্রহপ্রাপ্তির স্বীকৃতি। যেমন আরবী বাকরীতি অনুসারে বলা হয়— তার নিকটে সকলেই আসে। একথার অর্থ— তার নিকটে আসে অনেকেই।

এখানে 'উল্‌লিমনা' অর্থ বুঝবার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে বা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আর 'উতীনা' অর্থ দেওয়া হয়েছে। 'উতীনা' শব্দটি পুংলিঙ্গবাচক বহুবচন। তাই কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— দেয়া হয়েছে আমাদেরকে সবকিছু। সুতরাং বুঝতে হবে হজরত সুলায়মান একথার অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাঁর পিতা হজরত দাউদকেও। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আমি ও আমার পিতাকে দেয়া হয়েছে আরো অনেক কিছু। অথবা বলা যায়, তিনি তাঁর এই বক্তব্যটির অন্তর্ভূত করেছেন তাঁর অনুসারীদেরকে। বলা বাহুল্য তাঁর অনুসারীগণও তাঁর মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছিলেন আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানের অনেককিছু। কিংবা এরকমও বলা যেতে পারে যে, রাষ্ট্রীয় আচার পালনার্থেই তিনি ব্যবহার করেছিলেন পুংলিঙ্গবাচক ও বহুবচনার্থক শব্দরূপ 'ঊতীনা'। রাষ্ট্রনায়কগণ রাজমহিমা প্রকাশার্থে নিজের দিকে ইঙ্গিত করেন এরকম বহুবচনার্থক শব্দের মাধ্যমে। অর্থাৎ তারা 'আমি' এর স্থলে বলেন 'আমরা'।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'সবই দেওয়া হয়েছে' কথাটির অর্থ— দেয়া হয়েছে ইহকাল ও পরকালের অনেককিছু। মুকাতিল বলেছেন, কথাটির অর্থ— দেওয়া হয়েছে নবুয়ত, নৃনায়কত্ব, জ্বিন ও পবনের উপরে আধিপত্য।

শেষে বলা হয়েছে— 'এটা অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ'। একথার অর্থ— এ হচ্ছে পরম প্রাপ্তি,অযাচিত অনুগ্রহ, যা আমি লাভ করেছি কেবল আল্লাহ্পাকের দয়ায়, স্বীয় যোগ্যতায় নয়। অথবা এখানে 'সুস্পষ্ট অনুগ্রহ' অর্থ উন্মুক্ত মহিমা। অর্থাৎ আল্লাহ্পাকই তাঁর অপার মহিমায় এভাবে আমাকে করেছেন মহিমায়িত, অনুগ্রহায়িত। তাঁর পবিত্র অভিপ্রায় ছিলো এরকমই। উল্লেখ্য, হজরত সুলায়মানের এমতো উক্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিশেষরূপ। দর্পপ্রবণতা এভাবেই এখানে হয়েছে নিশ্চিহ্ন। রসুল স. বলেছেন, আমি আদমনন্দনদের অধিনায়ক। একথা আত্মম্ভরিতাপ্রকাশক নয়। মহাবিচারের দিবসে সকল মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করবে আমার পতাকাতলে। উল্লেখ্য, রসুল স. এর এমতো বাক্যাবলী ছিলো আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশানুসারে। যেমন আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন— 'আপনি আপনার প্রভুপালয়িতার অনুগ্রহসমূহ প্রকাশ করুন'।

বাগবী লিখেছেন, হজরত সুলায়মান রাজত্ব করেছিলেন সুদীর্ঘ সাড়ে সাত শত বছর ধরে। তাঁর কর্তৃত্ব ছিলো মানুষ, জ্বিন, পশু-পাখি ও পবনের উপরে। পশু-পাখিদের ভাষা তিনি বুঝতেন। আরো অনেক অভূতপূর্ব ও বিস্ময় উদ্রেকক ঘটনা ঘটেছিলো তাঁর শাসনামলে। নব নব বিস্ময়কর উদ্ভাবনে ভরে দিয়েছিলেন এ ধরা। ওই যুগ ছিলো প্রকৃতই স্বর্ণ-যুগ।

وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿١٧﴾ حَتّٰٓى اِذَآ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٨﴾ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٩﴾

r সুলাইমানের সম্মুখে সমবেত করা হইল তাহার বাহিনীকে—জিন, মানুষ ও বিহংগকুলকে, এবং উহাদিগকে বিন্যস্ত করা হইল বিভিন্ন ব্যূহে।

r যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছিল তখন এক পিপীলিকা বলিল, 'হে পিপীলিকা-বাহিনী! তোমরা তোমাদিগের গৃহে প্রবেশ কর, না করিলে, সুলাইমান এবং তাহার বাহিনী তাহাদিগের অজ্ঞাতসারে তোমদিগকে পদতলে পিষিয়া ফেলিবে।'

r সুলাইমান উহার উক্তিতে মৃদু হাস্য করিল এবং বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমকে সামর্থ্য দাও যাহাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করিয়াছ তাহার জন্য এবং যাহাতে আমি সৎকার্য করিতে পারি যাহা তুমি পছন্দ কর এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ণ দাসদিগের শ্রেণীভুক্ত কর।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সুলায়মানের সম্মুখে সমবেত করা হলো তার বাহিনীকে— জ্বিন, মানুষ ও বিহঙ্গকুলকে এবং তাদেরকে বিন্যস্ত করা হলো বিভিন্ন ব্যূহে'। এখানে ইয়ুযাউন' অর্থ ব্যূহ, বাধাপ্রদায়ক সারি বা সুশৃঙ্খল সমাবেশ। সৈনিকদের সারি বা ব্যূহগুলো থাকে পৃথক পৃথক অবস্থানে। তাদের সম্মিলনে রয়েছে নির্দেশায়িত অন্তরায়। তাই তাদের ব্যূহগুলোকে বলে 'ওয়াযেয়'। এরকম বলা হয়েছে কামুস অভিধানে। শব্দটির অর্থ পৃথকীকরণ এবং বণ্টনও হয়। মুকাতিল বলেছেন, এখানে 'ইয়ূযাউন' অর্থ তারা পরিচালিত হতো।

মোহাম্মদ ইবনে কা'ব বলেছেন, এক শত মাইল পরিসর জুড়ে অবস্থান করতো হজরত সুলায়মানের সেনাবাহিনী। ওই সুবিস্তৃত সেনানিবাসে মানব সেনাদের জন্য সংরক্ষিত ছিলো পঁচিশ মাইল, জ্বিন সেনাদের জন্য পঁচিশ এবং বিহঙ্গবাহিনীর জন্য পঁচিশ। অবশিষ্ট পঁচিশ মাইল ছিলো অন্যান্য প্রজাতির সৈন্যদের জন্য। তাঁর রাজপ্রাসাদ ছিলো একশত ভবনবিশিষ্ট। তাঁর তিনশত সহধর্মিণী বসবাস করতেন ওই সকল ভবনে। আর তাঁর সাতশত কিংকরী বসবাস করতো সাতশত পৃথক পৃথক প্রকোষ্ঠে। তার নির্দেশে তাঁর সুবৃহৎ সিংহাসনকে আকাশে উঠিয়ে নিতো বাতাস। তারপর ঝিরিঝিরি বাতাসে এগিয়ে চলতো তাঁর নভ-সিংহাসন। এভাবে এক আকাশযাত্রাকালে তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হলো, হে সুলায়মান! তোমার ক্ষমতা আরো বাড়িয়ে দিলাম। এখন থেকে তুমি শুনতে পারবে আমার সকল সৃষ্টির আওয়াজ, তারা যতদূরেই অবস্থান করুক না কেনো। এক আকাশবিহার শেষে তিনি উপনীত হয়েছিলেন পিপীলিকা অধ্যুষিত এক উপত্যকায়। পরবর্তী আয়াতদ্বয়ে (১৮, ১৯) দেয়া হয়েছে সেই ঘটনার বিবরণ।

বলা হয়েছে— 'যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছলো— এখানে 'আ'লা ওয়াদিন' অর্থ উপত্যকার উপর। একথায় প্রমাণিত হয় যে, হজরত সুলায়মান সেখানে স্থলপথে গমন করেননি, বরং অবতরণ করেছিলেন উপর থেকে। আরো জানা যায়, তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন, ওই বিস্তীর্ণ উপত্যকার সর্বশেষ প্রান্তে। পিপীলিকার রাজ্য ছিলো সেখানেই।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহের বর্ণনায় এসেছে, হজরত কা'ব বলেছেন, আকাশ বিহারকালে হজরত সুলায়মানের সঙ্গে থাকতো তাঁর পরিবার পরিজন, দাস-দাসী ও সিপাহী-সৈনিকের দল। আরো থাকতো আহারের আয়োজন, আসবাবপত্র ও তৈজসপত্র। আহার্য প্রস্তুত করবার জন্য সঙ্গে নেয়া হতো বৃহদাকৃতির নয়টি ডেকচি, যার একটিতেই রান্না করা যেতো নয়টি উটের গোশত। পশুপালের বিচরণের জন্য সেখানে থাকতো নাতি-হ্রস্ব প্রান্তর। এভাবে সকলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন তিনি আকাশযাত্রায়। সেখানে আহার্য প্রস্তুতের জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকতো রাজ-পাচকেরা। এভাবে একদিন মদীনা অতিক্রমকালে তিনি বললেন, এই স্থানেই ঘটবে শেষ জামানার নবীর মহাআবির্ভাব। তাদের জন্য শুভসমাচার, যারা হবে তাঁর প্রতি বিশ্বাসী ও অনুরাগী। কাবাগৃহের পাশ দিয়ে গমনকালে তিনি নিম্নে দৃষ্টিপাত করে দেখতে পেলেন সেখানে রয়েছে পৌত্তলিকদের প্রতিমাসমূহ। কাবাগৃহ নভপরিভ্রমণরত নবীকে দেখে কেঁদে উঠলো। আল্লাহ্পাক প্রত্যাদেশ করলেন, হে কাবা! তোমার রোদনের হেতু কী? কাবা বললো, হে চিরঅমুখাপেক্ষী মহাপ্রভুপালয়িতা! তোমার আকাশচারী নবী এইমাত্র আমার পাশ দিয়ে গেলেন,

অথচ আমার সন্নিকটে নামাজ পাঠ করলেন না। আমাকে ঘিরে চলছে ঘৃণ্য ও জঘন্য প্রতিমাপূজা। এ লজ্জা আমি রাখি কোথায়? আল্লাহ্পাক বললেন, প্রিয় কাবা! কেঁদো না। শান্ত হও। সেই সময় আসন্ন, যখন বিশ্বাসীগণের পদচারণায় তোমার অবস্থানস্থল হবে সতত মুখরিত। তোমাকে ঘিরে ফেলবে অসংখ্য নামাজী ও তাওয়াফকারী। দেখতে পাবে তোমারই সন্নিকটে অবতারিত হচ্ছে আমার সর্বশেষ নভজ গ্রন্থ। তোমার সান্নিধ্য ফুঁড়ে উদিত হবে সর্বশেষ নবুয়ত। ওই নবুয়ত-সূর্যের আলোকে যারা স্নাত হবে, তাদের মাধ্যমেই আমি পূর্ণরূপে প্রকাশ করবো তোমার মহিমা। তারা তোমার কাছে ছুটে আসবে তেমনি করে, যেমন করে ক্ষুধার্ত গর্দভ ছুটে আসে তার আহার্যের কাছে। যেমন ছুটে যায় মমতাময়ী উষ্ট্রী-মাতা তার প্রিয় শাবকের কাছে। কবুতর নীড়ে ফিরে আসে তার ডিমের টানে। তখন তুমি চিরদিনের জন্য মুক্ত হবে মূর্তিপূজার বিবমিষা থেকে।

হজরত সুলায়মান অবশেষে উপনীত হলেন তায়েফের একাংশে সদীর নামক বিস্তীর্ণ ভূভাগে। কাতাদা ও মুকাতিল বলেছেন, সদীর উপত্যকা রয়েছে সিরিয়ায়। কেউ কেউ বলেছেন, ওই উপত্যকা ছিলো জ্বিনদের বাসভূমি। আর পিপীলিকাবাহিনী ছিলো ওই জ্বিনদের বাহন। ফরক হুমাইদি বলেছেন, পিপীলিকাগুলো ছিলো মক্ষিকাসদৃশ। আবার কেউ কেউ বলেছেন উষ্ট্রসদৃশ। আর হজরত সুলায়মানের সঙ্গে কথোপকথনকারী পিপীলিকাটি ছিলো অতি ক্ষুদ্র। শা'বী বলেছেন, পিঁপড়াটির ছিলো দু'টি ডানা। কেউ কেউ বলেছেন, সে ছিলো খঞ্জ। জুহাক বলেছেন, তার নাম ছিলো তাহিয়্যা। মুকাতিল বলেছেন, নাম ছিলো তার হজমী।

এরপর বলা হয়েছে — 'তখন এক পিপীলিকা বললো, হে পিপীলিকাবাহিনী! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ করো, না করলে সুলায়মান এবং তার বাহিনী তাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পদতলে পিষে ফেলবে'।

আরবী ভাষায় 'নামলাতু' শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। তাই এখানে শব্দটির পরে স্ত্রীলিঙ্গবাচক 'উদ্খুলুনা' সন্নিবেশিত হওয়াই ছিলো ব্যাকরণ সম্মত। কিন্তু তা না করে এখানে বসানো হয়েছে পুংলিঙ্গবোধক সম্বোধন 'উদখুলূ'। এরকম করার অবশ্য যুক্তিসঙ্গত কারণও রয়েছে। কারণটি এই— আরবী ভাষায় বিবেকবিবর্জিত প্রাণীদেরকে করা হয় স্ত্রীলিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। জড়পদার্থের বেলাতেও প্রয়োগ করা হয় এই নিয়মটি। কিন্তু মানুষের মতো বাক ও বিবেকবান প্রাণীকে করা হয় পুংলিঙ্গভূত। পিপীলিকা বাক ও বিবেকবান। তাই তাদেরকে সম্বোধনার্থে এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে পুংলিঙ্গবাচক শব্দ 'উদ্খুলূ'।

জ্ঞাতসারে কোনো প্রাণীকে পদতলে পিষ্ট করা বৈধ নয়। অথচ এখানে দেখা যায় হজরত সুলায়মান ও তাঁর বাহিনীর প্রতি এমতো কর্মের কোনো নিষেধাজ্ঞা

নেই। বরং নেতা পিপীলিকা তার দলবলকে দিচ্ছে তাড়াতাড়ি আপনাপন গর্তে প্রবেশ করার হুকুম। এতে করে বুঝা যায়, আহারান্বেষণের অনিবার্য প্রয়োজন ব্যতিরেকে পিপীলিকাকুলের জন্য গর্তের বাইরে থাকা বৈধ নয়। কারণ এতে করে তারা মানুষ অথবা অন্য কোনো বৃহৎপ্রাণীর পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ হারাতে পারে। আর এরকম হতে পারে তাদের অজ্ঞাতসারেই। অর্থাৎ তারা বুঝতেই পারবে না, কখন পদপিষ্ট হলো এবং কখন মরে গেলো। বিষয়টি হজরত সুলায়মান ও তাঁর বাহিনীর কাছেও রয়ে যাবে অজ্ঞাত। অতিক্ষুদ্র পিপীলিকার প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ না হওয়াই স্বাভাবিক। প্রকৃত কথা হচ্ছে, নেতা-পিপীলিকার কথায় এখানে প্রকাশ পেয়েছে হজরত সুলায়মান ও তাঁর বাহিনীর পক্ষে অজুহাত। অজুহাতটি হচ্ছে —— অজ্ঞাতসারে তারা পিপীলিকাবধ করলে তারা দায়ী হবেন না। কিন্তু একই সঙ্গে এখানে এই সদুপদেশটিও নিহিত রয়েছে যে, জ্ঞাতসারে এমতো অপরাধ অসমীচীন।

একটি সন্দেহঃ হজরত সুলায়মান তখন ছিলেন ঊর্ধ্বগগনের পবনবিহারী। তাহলে তাঁর ও তাঁর বাহিনীর পদতলে পিপীলিকা নিষ্পেষণের অবকাশ কোথায়?

সন্দেহভঞ্জন ঃ উত্থাপিত সন্দেহের প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, হয়তো তখন তাঁর এক পদাতিক বাহিনী উপস্থিত হয়েছিলো ওই উপত্যকায়। অথবা ঘটনাটি ঘটেছিলো তখন, যখন তিনি লাভ করেননি বাতাসের কর্তৃত্ব। কোনো কোনো মর্মজ্ঞ বলেছেন, তখন নেতা-পিপীলিকা তার সতীর্থদেরকে ডেকে বলেছিলো, হে পিপীলিকাকুল! তোমরা মহাসম্রাট সুলায়মানের মহাআড়ম্বরপূর্ণ আকাশী রাজত্ব ও তার বাহিনীর জাঁক-জমক দেখে বিমোহিত হয়ে যেয়ো না। এরকম করলে তোমরা বিস্মৃত হবে আল্লাহ্র স্মরণ। আর ওই স্মরণচ্যুতিই তোমাদের জন্য ডেকে আনবে সর্বনাশা মৃত্যু। মুকাতিলের বর্ণনায় এসেছে, নেতা-পিপীলিকার আলোচ্য হুঁশিয়ারিটি হজরত সুলায়মান শুনতে পেয়েছিলেন তিন মাইল দূরে থেকে। কারণ আল্লাহ্ তাঁকে দিয়েছিলেন বহুদূরের প্রাণীর ভাষা বুঝবার ক্ষমতা।

এরপর বলা হয়েছে —— 'সুলায়মান তার উক্তিতে মৃদু হাস্য করলো'। একথার অর্থ—— নেতা-পিপীলিকার এরকম আত্মরক্ষাজ্ঞানবিশিষ্ট বক্তব্য শুনে হজরত সুলায়মান হলেন বিস্মিত, অভিভূত ও পুলকিত। বিস্মিত ও অভিভূত হলেন তাদের আত্মরক্ষার কৌশল দর্শনে। আর পুলকিত হলেন এই ভেবে যে, পিপীলিকাকুলও তাহলে তাঁর ও তাঁর বাহিনীর ন্যায়নিষ্ঠতার কথা জানে। সেকারণেই তো নেতা-পিপীলিকা বললো 'অজ্ঞাতসারে ও অকারণে তোমাদেরকে পদতলে পিষে ফেলবে'। অর্থাৎ জ্ঞাতসারে প্রাণীবধকে তাঁরা সমীচীন মনে করেন না। এরকম বোধ ও ভাবনার কারণেই তাঁর ওষ্ঠাধারে জেগে উঠেছিলো মৃদুহাস্য।

'তাবাসসুম' অর্থ মৃদু এবং 'দ্বাহিক্ব' অর্থ হাসি। দু'টো শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে এখানে। সেকারণেই বোঝা যায়, হজরত সুলায়মান ওই পিপীলিকার কথা শুনে হেসেই ফেলেছিলেন, যদিও সে হাসি ছিলো মৃদু ও মধুর। এমনও বলা যেতে পারে যে, প্রথমে তাঁর ওষ্ঠে প্রকাশ পেয়েছিলো মৃদু হাসির চিহ্ন। পরে সেই হাসিই পরিগ্রহ করেছিলো পূর্ণাঙ্গ হাসির রূপ। উম্মত-জননী হজরত আয়েশা বলেছেন, আমি রসুল স.কে কখনোই এমনভাবে হাসতে দেখিনি, যাতে প্রকাশ পায় তাঁর আল-জিহবা। তাঁর হাসি ছিলো মৃদু ও মধুর। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে হারেস বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স. এর চেয়ে অধিক মৃদু হাস্য করতে আর কাউকে দেখিনি। তিরমিজি।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং বললো, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছো তার জন্য'। আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে হজরত সুলায়মানের অনন্যসাধারণ বিনয়বনতা। নবীসুলভ বিনয়বনতা এরকমই হয়। এখানে তিনি নিজেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যোগ্যও মনে করেননি। সম্পূর্ণতই নির্ভর করেছেন আল্লাহ্র প্রতি। প্রার্থনা করেছেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সামর্থ্যপ্রাপ্ত অনুগ্রহসম্ভারের জন্য।

এখানকার 'আওযি'নী' শব্দটির বুৎপত্তি ঘটেছে 'ইযায়' থেকে। কামুস অভিধানে শব্দটির অর্থ করা হয়েছে— থামিয়ে দেয়া, বাধা দেয়া। বায়যাবী লিখেছেন, এখানকার বক্তব্যটি হবে— হে আমার প্রভুপালক! আমি তোমার অনুদানের কৃতজ্ঞতাকে আটকে রাখবো আমার মুখে ও বুকে। এ সম্পদকে কখনোই পরিত্যাগ করবো না। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা লিখেছেন, 'আওযি'নী' এর মর্মার্থ এরকম— হে আমার প্রভুপালনকর্তা! তুমি আমাকে এমন সামর্থ্য দাও, যার দ্বারা আমি প্রতিহত করতে পারি অকৃতজ্ঞতাকে। কেউ কেউ অর্থ করেছেন— আমার প্রবৃত্তিকে যেনো রাখতে পারি সকল অপরিচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত।

হজরত সুলায়মান এখানে তাঁর পিতামাতাকে প্রদত্ত অনুগ্রহরাজির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সামর্থ্য কামনা করেছেন। এতে করে প্রতীয়মান হয়, পিতামাতার জন্য দোয়া করা সন্তানদের জন্য অত্যাবশ্যক। পুণ্যবান সন্তানেরা এরকম করেও থাকেন। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— আর তাদের সাথে সংযুক্ত করেছি তাদের আত্মজদেরকে, আর তাদের কর্মের এতটুকুও হ্রাস করিনি।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি যা তুমি পছন্দ করো এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ণ দাসদের শ্রেণীভুক্ত করো'। এখানে 'সৎকর্মপরায়ণ দাস' অর্থ পূর্ববর্তী নবী হজরত ইব্রাহিম, হজরত

ইসমাইল, হজরত ইসহাক ও হজরত ইয়াকুব। আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে হজরত সুলায়মান তাঁর ওই সকল মহাসম্মানিত পূর্বসূরীগণের শ্রেণীভূত হবার অভিলাষ প্রকাশ করেছেন।

সূরা নমল ঃ আয়াত ২০, ২১

وَ تَفَقَّدَ الطَّيۡرَ فَقَالَ مَا لِیَ لَاۤ اَرَی الۡهُدۡهُدَ ۫ۖ اَمۡ کَانَ مِنَ الۡغَآئِبِیۡنَ ﴿۲۰﴾ لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِیۡدًا اَوۡ لَاۡاَذۡبَحَنَّهٗۤ اَوۡ لَیَاۡتِیَنِّیۡ بِسُلۡطٰنٍ مُّبِیۡنٍ ﴿۲۱﴾

r সুলাইমান বিহংগদলকে পর্যবেক্ষণ করিল এবং বলিল, 'হুদ্‌হুদ্‌কে দেখিতেছি না কেন? সে অনুপস্থিত নাকি?'

r 'সে উপযুক্ত কারণ না দর্শাইলে আমি অবশ্যই উহাকে কঠিন শাস্তি দিব অথবা হত্যা করিব।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সুলায়মান বিহঙ্গদলকে পর্যবেক্ষণ করলো এবং বললো হুদ্‌হুদ্‌কে দেখছিনা কেনো? একথার অর্থ— প্রার্থনা শেষে তিনি মনোসংযোগ করলেন তার বিহঙ্গবাহিনীর দিকে। লক্ষ্য করলেন সকলেই উপস্থিত। কিন্তু হুদ্‌হুদ্ পাখি নেই। বললেন, কী ব্যাপার? হুদ্‌হুদ্‌কে তো দেখতে পাচ্ছি না। সে কি অনুপস্থিত।

এখানকার 'তাফাক্কদা' অর্থ অনুসন্ধান করলেন, পর্যবেক্ষণ করলেন। হজরত সুলায়মানের নিয়ম ছিলো, আকাশ থেকে তিনি কোথাও অবতরণ করলে বিহঙ্গকুল পক্ষবিস্তার করে ছায়া দিতো তাঁকে ও তাঁর পুরো বাহিনীকে। আর হুদ্‌হুদ্ করতো পানির সন্ধান। ভূগর্ভ তার জন্য ছিলো আয়না সদৃশ। তাই সে কোথাও পানির সন্ধান পেলে ভূপৃষ্ঠে এঁকে দিতো চঞ্চুর চিহ্ন। ওই চিহ্নিত স্থানে তখন মৃত্তিকা খনন করতো জ্বিনেরা। খননকৃত কূপ থেকে বের করতো সুপেয় পানি। এরকম বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী শায়বা ও আবদ্ ইবনে হুমাইদ, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম ও হাকেম। হাকেম বলেছেন, বিবৃতিটি বিশুদ্ধ।

সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, একবার হজরত ইবনে আব্বাস এক সমাবেশে সুলায়মান নবীর ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করলেন। সেখানে উপস্থিত নাফে ইবনে আযরক বললেন, আপনি একি বলছেন? একটি বাচ্চা ছেলে ফাঁদ পেতে রেখে তার উপরে সামান্য মাটির আস্তরণ যদি দেয়, তবুও তো হুদ্‌হুদ্ পাখি সেই ফাঁদে ধরা পড়ে। মাটির নিচের ফাঁদ তো সে দেখতেই পায় না।

তাহলে সে ভূগর্ভস্থ পানির সন্ধান দিতে পারে কী ভাবে? হজরত ইবনে আব্বাস একথা শুনে তাঁকে বললেন, তোমার অমঙ্গল হোক। নির্বোধ তুমি, তাই জানো না, নিয়তি প্রবল হলে চক্ষু হয় দৃষ্টিবিবর্জিত। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি তখন বললেন, অদৃষ্টের অমোঘ বিধান যখন কার্যকর হয়, তখন দৃষ্টি হয় অবরুদ্ধ।

যাহোক, আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ এরকম— আকাশবিহারী বিশাল সিংহাসন নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করলেন হজরত সুলায়মান। সেখানে ছিলো একটি পান্থশালা। পাখিরা যথারীতি পক্ষবিস্তার করে আছে মাথার উপর। প্রয়োজন দেখা দিলো পানির। কিন্তু আশে পাশে কোনো পানি পাওয়া গেলো না। সেকারণেই তিনি বিশেষভাবে খোঁজ করলেন হুদ্‌হুদ্‌ পাখির। না দেখতে পেয়ে বললেন, হুদ্‌হুদ্‌ আবার কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো? রোষান্বিত নবীর এর পরের উক্তি উল্লেখিত হয়েছে পরবর্তী আয়াতে (২১) এভাবে—

‘সে উপযুক্ত কারণ না দর্শালে আমি অবশ্যই তাকে কঠিন শাস্তি দিবো অথবা হত্যা করবো’। একথার অর্থ— আমি তাকে এমন শাস্তি দিবো যাতে করে তার মৃত্যু হবে অবধারিত। নতুবা তাকে দেখাতে হবে অনুপস্থিতির উপযুক্ত কারণ।

এখানে ‘কঠিন শাস্তি দিবো’ অর্থ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিবো, যাতে করে তার স্বজাতিরা সাবধান হয়ে যায় বা শিক্ষা পেয়ে যায় । এখানকার ‘কঠিন শাস্তি’ কী, সে সম্পর্কে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন বিদ্বজ্জনেরা। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির অর্থ— আমি তার পালক উঠিয়ে দিগম্বর করে তাকে রেখে দিবো রোদে। কীট পতঙ্গেরা ভক্ষণ করবে তার অস্থি-মজ্জা-মাংস। মুকাতিল কথাটির অর্থ করেছেন— তার পালকবিহীন দেহকে আমি নিক্ষেপ করবো প্রখর রৌদ্রে। কেউ কেউ বলেছেন— তাকে করবো পিঞ্জরাবদ্ধ। আবার কেউ কেউ বলেছেন— চিরদিনের জন্য তাকে করবো কেন্দ্রচ্যুত। অথবা কথাটির মর্মার্থ হবে— আমি তাকে তার প্রতিপক্ষসহ বন্দী করে রাখবো। কিংবা তাকে করে দিবো তার সতীর্থদের অনুচর। উল্লেখ্য, হজরত সুলায়মানের জন্য হুদ্‌হুদ্‌ পাখির শাস্তিদান ছিলো সিদ্ধ।

‘আও লা ইয়া’তিইয়ান্‌নী বি সুলত্বনিম্‌ মুবীন’ অর্থ অবশ্যই সে উপস্থিত করবে উপযুক্ত কারণ। এখানে ‘আও’ অর্থ অথবা। শব্দটির অর্থ ‘ব্যতীত’, ‘কিন্তু’ ও ‘তাছাড়া’ও হয়। শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করলে কথাটি দাঁড়ায়— তাছাড়া সে স্পষ্ট কারণ দর্শাবে, তাহলে হয়তোবা অব্যাহতি পাবে শাস্তি থেকে। আরবীভাষীরা বলেন ‘লা আলযিমান্‌নাকা আও তু’তিয়ানী’ (আমি তোমার পিছু ছাড়ছিনা, কিন্তু যদি তুমি আমার অধিকারে সমর্পিত হও)। এখানে ‘আও’ ব্যবহৃত হয়েছে ‘ব্যতীত’ অথবা ‘কিন্তু’ অর্থে।

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَ جِئْتُكَ مِنْ
سَبَاٍ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ ﴿٢٢﴾ اِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَ اُوْتِيَتْ مِنْ
كُلِّ شَيْءٍ وَّ لَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٣﴾ وَجَدْتُّهَا وَ قَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ
لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ
عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٢٤﴾ اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ
الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَ مَا تُعْلِنُوْنَ
﴿٢٥﴾ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٦﴾ السجدة

r অনতিবিলম্বে হুদ্‌হুদ্ আসিয়া পড়িল এবং বলিল, 'আপনি যাহা অবগত নহেন আমি তাহা অবগত হইয়াছি এবং 'সাবা' হইতে সুনিশ্চিত সংবাদ লইয়া আসিয়াছি।

r 'আমি এক নারীকে দেখিলাম উহাদিগের উপর রাজত্ব করিতেছে। তাহাকে সবই দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার আছে এক বিরাট সিংহাসন।'

r 'আমি তাহাকে ও তাহার সম্প্রদায়কে দেখিলাম তাহারা আল্লাহের পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করিতেছে। শয়তান উহাদিগের কার্যাবলী উহাদিগের নিকট শোভন করিয়াছে এবং উহাদিগের সৎপথ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে; ফলে উহারা সৎপথ পায় না;'

r 'নিবৃত্ত করিয়াছে এই জন্য যে, উহারা যেন সিজদা না করে আল্লাহ্‌কে, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর লুক্কায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন, যিনি জানেন যাহা তোমরা গোপন কর এবং যাহা তোমরা ব্যক্ত কর।'

r আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি মহা আরশের অধিপতি।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'অনতিবিলম্বে হুদ্‌হুদ্ এসে পড়লো এবং বললো, আপনি যা অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি এবং সাবা থেকে সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি'। একথার অর্থ— অত্যল্পকালের মধ্যে সেখানে উপস্থিত

হলো অপরাধী হুদ্‌হুদ্‌। ভয়ে ভয়ে বললো, হে মহামান্য নবী! আমি অতি অবশ্যই অপরাধী। কিন্তু আপনি শুনলে হয়তো খুশী হবেন যে, আমি নিয়ে এসেছি এক চমকপ্রদ সংবাদ। জেনে এসেছি সাবা নামক নিকটবর্তী এক রাজ্যের সমুদয় বিবরণ। আপনি সে সাম্রাজ্য সম্পর্কে এখনো কিছুই জানেন না।

বিদ্বজ্জনগণের ভাষায় নেপথ্যের ঘটনা এরকম— হজরত সুলায়মানের তত্ত্বাবধানে এক সময় শেষ হলো বায়তুল মাকদিস নির্মাণের কাজ। হৃদয়ে জাগ্রত হলো বায়তুল্লাহ্‌ শরীফ দর্শনের বাসনা। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি কিছুদিন পর যাত্রা করলেন মক্কা অভিমুখে। সেখানে পৌঁছে অপেক্ষা করলেন কিছুকাল। প্রতিদিন সেখানে তিনি কোরবানী করতে লাগলেন পাঁচ হাজার উট; পাঁচ হাজার বলদ এবং পাঁচ হাজার মেষ। উপস্থিত জনতাকে একদিন বললেন, এই পবিত্র স্থানেই আবির্ভূত হবেন আরবী নবী। তাঁকে বিজয়ী করা হবে তাঁর প্রতিপক্ষের উপর। তাঁর রোষ প্রভাববিস্তারক হবে এক মাসের পথের দূরত্বের সমান দূরত্ব জুড়ে। দূর-অদূর হবে তাঁর কাছে এক বরাবর। আল্লাহ্‌পাক সম্পর্কিত বিষয়ে তিনি পরোয়া করবেন না নিন্দুকদের নিন্দার। জনতা জানতে চাইলো, তিনি প্রতিষ্ঠিত থাকবেন কোন ধর্মে? হজরত সুলায়মান বললেন, আল্লাহ্‌র এককত্বে, দ্বীনে হানীফে। অভিনন্দন তাঁর প্রতি, আর তার প্রতিও যে ইমান পাবে তাঁর মহান সান্নিধ্যে। জনতা আরো জানতে চাইলো, তাঁর মহাআবির্ভাবের আর কতো দেরী? তিনি বললেন, এক হাজার বৎসর। তোমরা আমার একথা পৌঁছে দিয়ো অনুপস্থিতজনদের কাছে। অবশ্যই তিনি হবেন রসুলগণের মহান অগ্রণী এবং সর্বশেষ রসুল।

বর্ণনাকারী বলেন, হজরত সুলায়মান মক্কা শরীফে পৌঁছে হজ সম্পাদন করলেন। তারপর যাত্রা করলেন ইয়েমেন অভিমুখে। সলিয়া নামক স্থানে যখন পৌঁছলেন, তখন দ্বিপ্রহর বিগত প্রায়। স্থানটি ছিলো শস্যশ্যামল ও নয়নাভিরাম। মনস্থ করলেন এই স্থানেই অবতরণ করবেন তিনি। এখানেই সমাধা করবেন পানাহার ও আসরের নামাজ। হুদ্‌হুদ্‌ পাখি কিন্তু অবতরণ করলো না। ভাবলো ইত্যবসরে আরো ঊর্ধ্বে উঠে পৃথিবীর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ একটু দেখে নেয়া যাক। ঊর্ধ্বাকাশে উড়াল দিলো হুদ্‌হুদ্‌। সেখান থেকে তার নজরে পড়লো সাবা রাজ্যের নয়নমুগ্ধকর দৃশ্যাবলী। রাজপ্রাসাদের চিত্তাকর্ষক পুষ্পোদ্যান। কৌতূহল নিবারণের জন্য সেদিকেই ছুটে গেলো সে। সেখানে সাক্ষাত হলো আর একটি হুদ্‌হুদ্‌ পাখির সঙ্গে। হজরত সুলায়মানের হুদ্‌হুদ্‌ পাখিটির নাম ছিলো ইয়াফুর। আর সাবা রাজ্যের ওই হুদ্‌হুদ্‌টির নাম ছিলো আনফীর। সে পথিক পাখিকে বললো, কোথা থেকে আসছো? ইয়াফুর বললো, আমি দাউদতনয় সম্রাট

সুলায়মানের আকাশ ভ্রমণের সঙ্গী। এখন আসছি সিরিয়া থেকে। আনফীর বললো, তিনি আবার কে? ইয়াফুর বললো, জানোনা, তিনি তো নবী এবং মহাপ্রতাপশালী সম্রাট। মানব-দানব, পাখি ও পবন তাঁর অনুগত। এবার বলো, তুমি কোন দেশের? আনফীর বললো, এই রাজ্যেই আমার বসবাস। এ দেশ রমণীশাসিত। এখানকার রাণীর নাম বিলকিস। বুঝলাম, তোমাদের সম্রাটের সাম্রাজ্য সুবিশাল। কিন্তু জেনে রেখো, আমাদের সম্রাজ্ঞীর রাজ্যও অবিশাল নয়। তাঁর অধীনস্থ সেনাধিনায়কদের সংখ্যা বারো হাজার। আবার তাদের প্রত্যেকের অধীনে আছে এক লক্ষ করে সৈন্য। এসো দেখবে আমাদের রাজ্য কতো সুন্দর। ইয়াফুর বললো, না, এখন যাই। সম্রাটের এখন নামাজের সময়। পানির খোঁজ করবেন তিনি। তখনই ডাক পড়বে আমার। আনফীর বললো, ভায়া, এসেছো যখন দেখেই যাওনা ভালো করে। রাণী বিলকিসের সংবাদ জানতে পেলে তোমাদের সম্রাট খুশীই হবেন। ইয়াফুর আর অমত করলো না। আনফীরের সঙ্গে ঘুরে ফিরে দেখলো রাজ প্রাসাদ ও রাজবাড়ীর মনোহর কুসুম কানন। তারপর অতি দ্রুত ফিরে আসতে লাগলো হজরত সুলায়মান সকাশে।

এদিকে ভূমি স্পর্শ করার পরক্ষণেই বিহঙ্গবাহিনীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন হজরত সুলায়মান। বিশেষভাবে খোঁজ করলেন হুদ্‌হুদের। কারণ আসর নামাজের সময় সমাগত প্রায়। পানির একান্ত প্রয়োজন। হুদ্‌হুদ্‌কে না দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হুদ্‌হুদ্ কোথায়? কোথায় গেলো সে? উপস্থিতদের কেউ এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারলো না। রোষান্বিত হলেন আল্লাহ্‌র নবী। বললেন, তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি অবশ্যই দেয়া হবে, যদি সে তার অনুমতিবিহীন অনুপস্থিতির উপযুক্ত কৈফিয়ত না দিতে পারে। বিহঙ্গবাহিনীর অধিনায়ককে তলব করে বললেন, এক্ষুণি যাও। যেখান থেকে পারো, সেখান থেকে যত দ্রুত পারো পাকড়াও করে আনো হুদ্‌হুদ্‌কে। সঙ্গে সঙ্গে আকাশে উড়াল দিলো বিহঙ্গাধিনায়ক। ঊর্ধ্বাকাশে উঠতেই দেখলো ইয়েমেনের দিক থেকে ছুটে আসছে হুদ্‌হুদ্। কাছে আসতেই আক্রমণোদ্যত হলো তার উপর। শংকিত হুদ্‌হুদ্ অনুনয় জানালো, নেতৃপ্রবর! সদয় হও। আল্লাহ্‌র শপথ দিয়ে বলি, আমাকে আঘাত কোরো না। আমাকে নিয়ে চলো মহামান্য সম্রাটের দরবারে। সেখানেই হোক আমার বিচার। বিহঙ্গাধিনায়ক বললো, হতভাগা; নিপাত যাও। সম্রাট তো তোমাকে শাস্তিদানের জন্য শপথ করেছেন। একথার পর দু'জনে দ্রুত উড়াল দিলো ফিরতি পথে। দরবারের কাছাকাছি আসতেই দেখা হলো শকুনের সাথে। সে বললো, হে হুদ্‌হুদ্! তুমি অপরাধী। সম্রাট রোষতপ্ত। মনে হয় এ যাত্রায় তোমার আর রক্ষা নেই। হুদ্‌হুদ্ বললো, তিনি কি শর্তযুক্ত শপথ করেছেন, না শর্তবিমুক্ত? অন্য পাখিরা সমস্বরে

বললো, হ্যাঁ। বলেছেন, তোমাকে উপযুক্ত কারণ দেখাতে হবে। না দেখাতে পারলে কঠিন শাস্তি অবধারিত। হুদ্‌হুদ্‌ বললো, তাহলে আশা রাখি আমি রেহাই পেয়ে যাবো।

সিংহাসনে সমাসীন হজরত সুলায়মানের সম্মুখে হাজির হলো হুদ্‌হুদ্‌। জানালো বিনয়াবনত অভিবাদন। কাছে এলে রোষতপ্ত নবী তাকে ধরে ফেললেন শক্ত হাতের মুঠোয়। বললেন, দুরাচার! কোথায় ছিলে এতক্ষণ? উন্মত্ত হস্তীর পদতলে আমি পিষ্ট করবো তোমাকে। হুদ্‌হুদ্‌ বললো, সম্রাটপ্রবর! মহাবিচারের দিবসের কথা স্মরণ করুন, যখন আপনি উপস্থিত হবেন জব্বার কাহ্‌হার আল্লাহ্‌র সকাশে। একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে রোষ অন্তর্হিত হলো নবীর। নম্রকণ্ঠে বললেন, তাহলে বলো, কোথায় গিয়েছিলে তুমি। হুদ্‌হুদ্‌ বললো, মহামান্য নবী! আমি গিয়েছিলাম রমণীশাসিত এক রাজ্যে। সে রাজ্যের নাম সাবা। আমি নিয়ে এসেছি সে রাজ্যের নিশ্চিত সংবাদ, যা আপনি জানেন না।

কোনো বিষয়ের পরিপূর্ণ ও সুনিশ্চিত জ্ঞান আহরণ করাকে বলে 'ইহাত্বা'। প্রকৃত অর্থে শব্দটি শোভন কেবল আল্লাহ্‌র বেলায়। কারণ তিনিই সকলকিছুর পরিপূর্ণ ও সুনিশ্চিত পরিজ্ঞাতা। অন্যদের বেলায় শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে কেবল রূপক অর্থে, প্রকৃত অর্থে নয়। কারণ সর্বজ্ঞ হওয়ার যোগ্যতা ও অধিকার অন্য কারোই নেই। সুতরাং এখানে হুদ্‌হুদের 'সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি' কথাটির অর্থ হবে— হে মহামান্য নবী! আমি ওই সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি, যা আপনি অবহিত নন। হুদ্‌হুদের একথার মধ্যে হজরত সুলায়মানসহ সকলের জন্য এই সদুপদেশটি নিহিত রয়েছে, মহাজ্ঞানীগণও যেনো সর্বজ্ঞ হওয়ার ধারণা থেকে সততমুক্ত থাকেন। দর্পাক্রান্ত যেনো না হন। যেনো মনে করেন, সৃষ্টির সকলকিছুর মধ্যেই রয়েছে জ্ঞানের পৃথক পৃথক অর্জন। তাই জ্ঞানার্জনের জন্য তাঁরা একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল। বিভ্রান্ত শিয়া সম্প্রদায়ের একটি অপবিশ্বাসের অপনোদন হয়ে যায় আলোচ্য বিবরণে। তারা বলে, আমাদের ইমাম সকল যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। তাই কোনো বিষয়ই তাঁদের কাছে গোপন নয়। কিন্তু উল্লেখিত ব্যাখ্যার মাধ্যমে একথাই সুপ্রমাণিত হয় যে, তাদের এমতো বিশ্বাস অযথার্থ ও বিভ্রান্ত।

সাবা ছিলো ইয়েমেন অঞ্চলের একটি জাঁকজমকপূর্ণ শহর। সান্‌য়া থেকে ওই শহরটির দূরত্ব ছিলো মাত্র ছত্রিশ মাইল। বাগবী লিখেছেন, একবার রসুল স. কে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানিয়েছিলেন, সাবা একজন মানুষের নাম। দশজন পুত্র ছিলো তার। তন্মধ্যে ছয়জন বসতি স্থাপন করেছিলো ইয়েমেনের দক্ষিণাঞ্চলে। আর অবশিষ্ট চারজন লোকালয় গড়ে তুলেছিলো উত্তরাঞ্চলে, সিরিয়ায়।

পরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'আমি এক নারীকে দেখলাম তাদের উপর রাজত্ব করছে। তাকে সবই দেওয়া হয়েছে এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন'।

সাবার রাণীর নাম ছিলো বিলকিস। তাঁর পিতার নাম শুরাহীল। তিনি ছিলেন তাঁর বংশের চল্লিশতম নৃপতি। তাঁর উর্ধ্বতন ঊনচল্লিশ পুরুষ সকলেই ছিলেন প্রতাপশালী সম্রাট। রাজত্বের প্রলম্বিত উত্তরাধিকারের কারণে শুরাহীলের ছিলো বিশেষ এক ধরনের অহংকার। তাই পার্শ্ববর্তী রাজ্যপালদেরকে তিনি তেমন গণ্য করতেন না। তাদের কারো কন্যার পানি গ্রহণকেও তিনি মনে করতেন অবমাননাকর। তাই তিনি পানি গ্রহণ করেছিলেন এক জ্বিন রমণীর। তার নাম ছিলো রায়হানা বিনতে সাকান। ওই জ্বিন রমণীর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন তাঁর প্রিয় পুত্রী বিলকিস। বিলকিসের মাতা ছিলো কাকবন্ধা। এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, বিলকিসের জনক-জননীর মধ্যে কোনো একজন ছিলেন জ্বিন বংশদ্ভূত। শুরাহীলের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরূঢ়া হলেন বিলকিস। কিন্তু দেশবাসীদের কেউ কেউ ছিলো রমণীশাসনের ঘোর বিরোধী। ফলে তাঁর রাজ্য হয়ে গেলো দ্বিখণ্ডিত। বিরোধীপক্ষীয়রা নির্বাচন করলো নতুন রাজা। তাদের ওই রাজা ছিলো দুরাচারী ও চরিত্রহীন। সাধারণ রমণীরাও তার লালসার আগুন থেকে অব্যাহতি পেতো না। জনতা ক্ষিপ্ত হলো। কিন্তু তাকে উৎখাত করার কোনো উপায় খুঁজে পেলো না। নারীপীড়ক রাজার প্রতি বিলকিসও ছিলেন ক্ষিপ্ত। তৎসত্ত্বেও তিনি কৌশল অবলম্বনকেই শ্রেয় মনে করলেন। তার নিকট পত্র প্রেরণ করলেন এই মর্মে যে, হে রাজা! তুমি আমার আত্মীয়স্বজনের কাছে আমাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব উত্থাপন করো। তুমি তো রাজা। সুতরাং এ বিয়েতে আমার আপত্তি থাকতে পারে না। আর আমাদের বিয়ে হলে দ্বিখণ্ডিত রাজ্য পুনরায় একত্রিত হবে। উৎকণ্ঠা অন্তর্হিত হবে প্রজাসাধারণের জীবন থেকে। আমরাও রাজ্যশাসন করতে পারবো নিশ্চিন্তে। রাজা ভাবলো এইতো সুযোগ। যথাসময়ে সে বিলকিসের আত্মীয়স্বজনের কাছে পাঠালো বিবাহের প্রস্তাব। তারা বললো, আমাদের এরকম সাহস নেই। মনে হয় বিলকিস এ প্রস্তাবে কুপিতা হবেন। রাজা বললো, তোমরা তাকে বলেই দেখো না। আমি নিশ্চিত, তিনি এ প্রস্তাব গ্রহণ করবেন। তাই হলো। আত্মীয়-স্বজনদের প্রস্তাব খুশীমনে গ্রহণ করলেন বিলকিস। কিছুকালের মধ্যে মহাসমারোহে সম্পন্ন হলো তাদের বিবাহ। নববধুকে নিয়ে রাজা ফিরে এলো স্বপ্রাসাদে। একান্ত মিলনের প্রাক্কালে বিলকিস তাকে পান করালেন শরাব। রাজাও আনন্দে বিভোর হয়ে বার বার গ্রহণ করতে লাগলেন প্রিয়তমার হাতের মদ্যপূর্ণ পেয়ালা। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে এক সময় সে হয়ে পড়লো ঘোর মাতাল। ওই সুযোগে বিলকিস করলেন তার শিরশ্ছেদ। কর্তিত মস্তক ঝুলিয়ে দিলেন ঘরের দরোজায়।

তারপর রাতের অন্ধকারেই চুপি চুপি ফিরে এলেন নিজের রাজপ্রাসাদে। সকাল হলো। সকলেই দেখলো রাজগৃহের দরজায় ঝুলছে রাজার ছিন্ন মস্তক। জনতা উৎফুল্ল হলো। বুঝলো, বিয়েটা ছিলো সাবার রাণী বিলকিসের একটি ছলনা। এভাবে বিলকিস হয়ে গেলেন সমগ্ররাজ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিনায়িকা।

হজরত আবু বকর বর্ণনা করেন, রসুল স. যখন অবগত হলেন, পারস্যবাসীরা একজন রমণীকে তাদের রাজ্যাধিকারিণী নির্বাচন করেছে, তখন মন্তব্য করলেন, যে জাতি রমণীশাসন মেনে নেয়, তারা কখনো সফল হয় না। বোখারী, আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ।

আলোচ্য আয়াতের 'তাকে সবই দেয়া হয়েছে' অর্থ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তার সবকিছুই দেয়া হয়েছে সাবার রাণীকে। অথবা 'সবই' অর্থ এখানে সর্বপ্রকার প্রাচুর্য। অর্থাৎ সেনাশক্তির প্রাচুর্য, সম্পদের প্রাচুর্য, রাষ্ট্রের আয়তনের প্রাচুর্য ইত্যাদি।

প্রকৃত অর্থেই রাণী বিলকিসের সিংহাসনটি ছিলো সুবিশাল। তাই এখানে বলা হয়েছে 'এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন'। ওই সিংহাসন ছিলো অলক্তরাগরঞ্জিত, ইয়াকুতশোভিত, জবরজদ-মর্মরখচিত এবং চোখ ধাঁধানো অলংকরণমুদ্রিত। পায়াগুলো ছিলো জমরুদ পাথরের। সাতটি প্রকোষ্ঠ ছিলো ওই সুবৃহৎ সিংহাসনের। প্রতিটি প্রকোষ্ঠের তোরণ ও বাতায়ন থাকতো নিয়ত অর্গলাবদ্ধ। যোবায়ের ইবনে মোহাম্মদের মধ্যস্থতায় ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, ওই প্রকাণ্ড রাজাসনটি ছিলো প্রধানত স্বর্ণের। তার সঙ্গে যুক্ত ছিলো ইয়াকুত ও জবরজদের সুষম মিশ্রণ। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ছিলো যথাক্রমে আশি ও চল্লিশ হাত। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রাণী বিলকিসের সিংহাসনের দৈর্ঘ্য ছিলো তিরিশ হাত। প্রস্থও তিরিশ।

এর পরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম, তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সূর্যকে সেজদা করছে। শয়তান তাদের কার্যাবলী তাদের নিকট শোভন করেছে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে, ফলে তারা সৎপথ পায় না'। একথার অর্থ— হুদ্‌হুদ্ আরো বললো, আমি দেখেছি সাবার রাণী সূর্যের উপাসিকা। তার প্রজারাও এ বিষয়ে তার একনিষ্ঠ অনুগামী। এক আল্লাহ্‌র ইবাদতের স্থলে এরকম জঘন্য অংশীবাদিতাকে শয়তানই তাদের দৃষ্টিতে করে রেখেছে শোভন ও হৃদয়গ্রাহী। সুতরাং তারা সৎপথ পাবেই বা কী করে।

এর পরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'নিবৃত্ত করেছে এ জন্য যে, তারা যেন সেজদা না করে আল্লাহ্কে, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর লুক্কায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন'। এখানকার 'আল্‌লা' শব্দটির মূলরূপ ছিলো 'আন্' (যেন) এবং 'লা' (না)। অর্থাৎ যেনোনা। আবার এর পূর্বে রয়েছে একটি উহ্য জের প্রদায়ক অব্যয় 'লি' (জন্য)। এভাবে শব্দটি দাঁড়ায় 'লি আন্ লা'। এমতাবস্থায় আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়ায়— শয়তান তাদেরকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করেছে, যেন তারা আল্লাহ্কে সেজদা করতে না পারে। অথবা বলা যেতে পারে, 'লা' এখানে অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত এবং এর সম্পর্ক রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের 'ইয়াহতাদুন' (সৎপথ) এর সঙ্গে। এমতাবস্থায় অর্থ দাঁড়ায়— তারা আল্লাহ্কে সেজদা করার পথও পায় না।

'খবআ' অর্থ লুক্কায়িত বা গোপন বিষয়। শব্দটি কর্মপদরূপী ধাতুমূল। 'ইখরাজ' অর্থ প্রকাশ করা। অধিকাংশ কোরআন ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানে আকাশের লুক্কায়িত বস্তু হচ্ছে বৃষ্টি এবং পৃথিবীর লুক্কায়িত বিষয় হচ্ছে উদ্ভিদের অদৃশ্য সূচনা। এরকমও বলা যেতে পারে যে, গগনমণ্ডলী ও ধরণীর লুক্কায়িত বিষয় হয়েছে অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা। 'খবআ' এবং 'ইখরাজ' শব্দ দু'টো সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় নক্ষত্রপুঞ্জের উদয়, বারি বর্ষণ, ভূপৃষ্ঠে সবুজের উত্থান ইত্যাদি সম্পর্কে। প্রতিটি সম্ভাব্য বস্তুর অনস্তিত্বকে অস্তিত্বায়িত করার ক্ষেত্রেও অবশ্য শব্দ দু'টো সমানভাবে উচ্চার্য। প্রকাশ পায় তো তাই-ই, যা গোপন। অর্থাৎ অনস্তিত্বের গোপনীয়তাই হচ্ছে অস্তিত্বের প্রকাশ্যমানতা। বলা বাহুল্য, এরকম অনির্দেশ্য কর্মকে উন্মোচিত করবার জ্ঞান, অধিকার ও ক্ষমতা রয়েছে কেবল আল্লাহ্র। স্বতিষ্ঠ ও সদাবিদ্যমান একমাত্র তিনিই। তাই তিনি সকলের সেজদা গ্রহণের একমাত্র, অসমকক্ষ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিকারী।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি জানেন, যা তোমরা গোপন করো এবং যা তোমরা ব্যক্ত করো'। একথার অর্থ— তোমরা যা মনে রাখো এবং যা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করো মুখে ও আচরণে তার সকলকিছুই আল্লাহ্ জানেন। সুতরাং তোমাদের জন্য প্রকাশ্য-গোপন সকল প্রকার অংশীবাদিতা থেকে মুক্ত থাকা অত্যাবশ্যক।

শেষোক্ত আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি মহা আরশের অধিপতি'। একথার অর্থ— যে আল্লাহ্ সকলের এবং সকলকিছুর প্রকাশ্য ও গোপন অবস্থা সম্পর্কে সতত অবগত, সেই আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো বা কোনোকিছুর উপাসনা চিরনিষিদ্ধ। সুতরাং চিরায়ত সত্যোচ্চারণ হচ্ছে; তিনি ব্যতীত উপাস্য কেউ-ই নেই। আর তিনি মহাআরশের মহামহিম প্রভুপালয়িতা।

নির্দেশনাঃ এই আয়াত যাঁরা আরবীতে পাঠ করেছেন, তাঁরা তেলাওয়াতের সেজদা করে নিবেন।

قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٢٧﴾ اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٨﴾ قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْۤ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ﴿٢٩﴾ اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَ اِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣٠﴾ اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿٣١﴾

r সুলাইমান বলিল, ‘আমি দেখিব, তুমি কি সত্য বলিয়াছ, না তুমি মিথ্যাবাদী?’

r ‘তুমি যাও আমার এই পত্র লইয়া এবং ইহা তাহাদিগের নিকট অর্পণ কর, অতঃপর তাহাদিগের নিকট হইতে সরিয়া পড় এবং দেখ, তাহারা কী উত্তর দেয়।’

r বিলকীস বলিল, ‘হে পারিষদবর্গ! আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেওয়া হইয়াছে;’

r ‘ইহা সুলাইমানের নিকট হইতে এবং ইহা এইঃ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহের নামে,’

r অহমিকা বশে আমাকে অমান্য করিও না, এবং আনুগত্য স্বীকার করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হও।’

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘সুলায়মান বললো, আমি দেখবো, তুমি সত্য বলেছো, না তুমি মিথ্যাবাদী’। ‘মিনাল কাজিবীন’ অর্থ মিথ্যাবাদীদের পর্যায়ভূত। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হজরত সুলায়মান হুদ্‌হুদের কথা শুনে বললেন, ঠিক আছে। তোমার কথা তো আমি শুনলাম। কিন্তু আমি পরীক্ষা করে ও ভেবে-চিন্তে দেখবো, তোমার কথা সত্য, না তুমি মিথ্যাবাদীদের পর্যায়ভূত। উল্লেখ্য, এরকম বক্তব্যে সন্দেহটাই প্রবল হয়ে দাঁড়ায়। সে কারণেই প্রয়োজন পড়ে পরীক্ষার। সেকারণেই পত্র প্রেরণের মাধ্যমে হুদ্‌হুদ্‌কে পরীক্ষা করেছিলেন হজরত সুলায়মান।

এরপর হুদ্‌হুদ্ পানির সন্ধান দিলো। তার চঞ্চু ও নখরচিহ্নিত স্থানে জনতা ও জ্বিনেরা মিলে অল্প সময়ের মধ্যে খনন করল বিশাল ও গভীর এক জলাশয়। প্রয়োজন মতো সকলে ওজু গোসল করলো। পানি পান করলো পরিতৃপ্তির সঙ্গে।

পশুপালকেও করলো পরিতৃপ্ত। ইত্যবসরে হজরত সুলায়মান রাণী বিলকিসের উদ্দেশ্যে একটি পত্র রচনা করলেন এভাবে— পরম করুণাময় আল্লাহ্তায়ালার নামে— আল্লাহ্র নগণ্য সেবক দাউদতনয় সুলায়মানের পক্ষ থেকে সাবার সম্রাজ্ঞী বিলকিসের প্রতি। সত্য পথের পথিকগণের প্রতি শুভাশীস। অহমিকাভরে আমাকে অস্বীকার কোরো না। অনুগত চিত্তে আমার নিকটে উপস্থিত হও।

ইবনে জুরাইজ লিখেছেন, হজরত সুলায়মানের ওই পত্রে উল্লেখিত হয়েছিলো এতটুকুই। আর ৩০ ও ৩১ সংখ্যক আয়াতে এতটুকুই উদ্ধৃত হয়েছে। কাতাদা বলেছেন, নবী-রসুলগণের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে বক্তব্যসংক্ষিপ্তকরণ।

পরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'তুমি যাও, আমার এই পত্র নিয়ে এবং এটা তাদের নিকট অর্পণ করো; অতঃপর তাদের নিকট থেকে সরে পড়ো এবং দেখ তারা কী উত্তর দেয়'।

হজরত সুলায়মানের পত্র নিয়ে হুদ্হুদ্ উড়ে চললো সাবা রাজ্যের দিকে। রাণী বিলকিস তখন অবস্থান করছিলেন সানআ থেকে তিন মঞ্জিল দূরে মারেবে। সেখানে গিয়ে হুদ্হুদ্ দেখলো, রাজপ্রাসাদের সকল তোরণ অর্গলাবদ্ধ। সে অনেক কৌশল করে শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে সমর্থ হলো রাণীর শয়নকক্ষে। দেখলো, শয্যায় পৃষ্ঠ স্থাপন করে রাণী বিশ্রামরতা। সে চঞ্চুধৃত চিঠিটি ফেলে দিলো রাণীর বুকের উপর। শিথিল সূত্র সংযোগে এরকম বর্ণনা করেছেন আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেম হজরত ইবনে আব্বাস থেকে।

ইবনে জায়েদ সূত্রে ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ বর্ণনা করেছেন, রাণী বিলকিসের একান্ত ব্যক্তিগত প্রকোষ্ঠে ছিলো পূর্বমুখী একটি জানালা। তিনি ছিলেন সূর্যপূজারিণী। প্রত্যুষের সূর্যদর্শন ও সূর্যের প্রতি প্রণিপাত করাই ওই গবাক্ষ নির্মাণের উদ্দেশ্য। ওই গবাক্ষ পথেই রাণীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করেছিলো হুদ্হুদ্। সূর্যোদয়ের পূর্বেই হুদ্হুদ্ তার পক্ষবিস্তার করে ঢেকে দিলো বাতায়নটি। ফলে সেদিন রাণীর ঘুম ভাঙলো সূর্যোদয়ের পর। সেদিন আর তার প্রথম সূর্যের পূজা করা হলো না। ঘুম ভাঙতেই বুঝতে চেষ্টা করলো সূর্যদর্শন না হওয়ার কারণ। ত্রস্ত পদে এগিয়ে গেলেন বাতায়নের দিকে। ঠিক তখুনি হুদ্হুদ্ পত্রটি নিক্ষেপ করলো তাঁর শরীরে। রানী বিলকিস পত্রটি উঠিয়ে নিয়ে মেলে ধরলেন চোখের সামনে। সবিস্ময়ে দেখলেন, সংক্ষিপ্ত পত্রটিতে মুদ্রিত রয়েছে সম্রাট সুলায়মানের সিলমোহর ও স্বাক্ষর। অপ্রস্তুত হলেন রাণী। সংকিতও হলেন কিছুটা। কারণ পত্রটিতে মুদ্রিত ছিলো সম্রাট সুলায়মানের বিশাল সাম্রাজ্যের মানচিত্রও।

বিচলিত রাণী তলব করলেন তাঁর সভাসদদেরকে। একত্র করলেন বারো হাজার সেনাপতিকে। তারা প্রত্যেকেই ছিলো একলক্ষ সুশিক্ষিত সৈনিকের

অধিকর্তা। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রাণীর ছিলো একলক্ষ নির্বাহী কর্মকর্তা। প্রত্যেকের অধীনে আবার ছিলো একলক্ষ করে রণনিপুণ যোদ্ধা। কাতাদা ও মুকাতিল বলেছেন, সাবা-রাজ্ঞীর ছিলো তিনশত সদস্যবিশিষ্ট পরামর্শসভা। ওই সভার প্রত্যেক সদস্যের অধীনে ছিলো দশ সহস্র করে সৈনিক।

এর পরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'হে পারিষদবর্গ! আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেয়া হয়েছে'। এখানে 'কিতাবুন কারীম' অর্থ সম্মানিত পত্র। আতা বলেছেন, পত্রটি ছিলো মোহরাঙ্কিত। তাই ওই পত্রকে রাজ্ঞী বলেছিলেন 'সম্মানিত পত্র'। মোহরাঙ্কিত পত্র সম্মানিতই হয়। রসুল স. বলেছেন, লিপিকার মর্যাদা নির্ভর করে মোহরমুদ্রিত হওয়ার উপর। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে শিথিল সূত্র সহযোগে হাদিসটি উপস্থাপন করেছেন তিবরানী।

ইবনে মারদুবিয়া ও জুজায বলেছেন, 'কারীম' অর্থ মোহরাঙ্কিত। ইবনে জুরাইজ শব্দটির অর্থ করেছেন— উৎকৃষ্ট। হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিরূপে এক বর্ণনায় এসেছে, 'কারীম' অর্থ মহান। কারণ এর প্রেরক ছিলেন এক মহান ব্যক্তিত্ব। কেউ কেউ পত্রটিকে এরকম অভিধায় চিহ্নিত করার কারণ সম্পর্কে বলেছেন, পত্র হস্তগত হওয়ার পরিবেশটি ছিলো বিস্ময়কর। সুরক্ষিত শয়নকক্ষে ওভাবে পত্র পৌঁছবার কোনো উপায়ই ছিলো না। তাই বিলকিস ওই ব্যতিক্রমী উপায়ে প্রাপ্ত পত্রটিকে বলেছিলেন 'কারীম'। কেউ কেউ আবার বলেছেন, পত্রের শুরুতে উৎকীর্ণ ছিলো 'বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম'। তাই রাণী ওই পত্রটিকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'সম্মানিত'।

এর পরের আয়াতদ্বয়ে (৩০, ৩১) বলা হয়েছে— 'এটা সুলায়মানের নিকট থেকে এবং এটা এই, দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে, অহমিকাবশে আমাকে অমান্য কোরো না এবং আনুগত্য স্বীকার করে আমার নিকট উপস্থিত হও'।

পত্রটি ছিলো অতি সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ। দয়ালু ও দাতা আল্লাহ্‌র নামে শুরু করে প্রথমেই বলা হয়েছে 'অহমিকাবশে আমাকে অমান্য কোরো না'। অহংকারই সকল পাপের মূল, সকল পতনের সূচনা। তাই প্রথমে উপদেশ দেয়া হয়েছে অহংকার পরিত্যাগের। তারপর দেয়া হয়েছে ইমান ও আনুগত্যের নিমন্ত্রণ। এখানে 'আমাকে অমান্য কোরো না' অর্থ অমান্য কোরো না আমার নবুয়তকে। আর রেসালাতের প্রমাণ স্বরূপ অসাধারণ উপায়ে প্রেরিত হয়েছে পত্র। সুরক্ষিত রাজপ্রাসাদের ততোধিক সুরক্ষিত শয়নকক্ষে পক্ষীদূতের মাধ্যমে পত্র প্রেরণ নিশ্চয় হজরত সুলায়মানের নবুয়তের এক অজেয় প্রমাণ।

قَالَتْ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ فِيْٓ اَمْرِيْ ۚ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ ﴿٣٢﴾ قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ ۙ۬ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِيْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ ﴿٣٣﴾ قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً ۚ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٤﴾ وَاِنِّيْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌۢ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٣٥﴾

r বিল্‌কীস বলিল, 'হে পারিষদবর্গ! আমার এই সমস্যায় তোমাদিগের অভিমত দাও। আমি যাহা সিদ্ধান্ত করি তাহা তো তোমাদিগের উপস্থিতিতেই করি।'

r উহারা বলিল, 'আমরা তো শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা' তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই, কী আদেশ করিবেন তাহা আপনি ভাবিয়া দেখুন।'

r সে বলিল, 'রাজা-বাদশারা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন উহাকে বিপর্যস্ত করিয়া দেয় এবং তথাকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদিগকে অপদস্ত করে; ইহারাও এইরূপই করিবে;

r 'আমি তাহার নিকট উপঢৌকন পাঠাইতেছি দেখি, দূতেরা কি উত্তর আনে।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বিলকিস বললো, হে পারিষদবর্গ! আমার এই সমস্যায় তোমাদের অভিমত দাও। আমি যা সিদ্ধান্ত করি, তা তো তোমাদের উপস্থিতিতেই করি'। এখানে 'আফতূনী' অর্থ অভিমত দাও। 'ফাতাওয়া' বা'ফুতইয়া' অর্থ সুচিন্তিত অভিমত, জটিল কোনো বিষয়ের সমাধান প্রদান। এভাবে 'আফতূনী' কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— যে জটিল বিষয়ের সম্মুখীন আমি হয়েছি, সে বিষয়ে তোমরা যথাযথ পরামর্শ দাও।

'হাত্তা তাশহাদূন' অর্থ যতক্ষণ তোমরা উপস্থিত থাকবে। অথবা যতক্ষণ তোমরা এই সমস্যার সমাধান না দিবে। অর্থাৎ তোমরা আছো বলেই আমি তোমাদের পরামর্শ কামনা করছি। না থাকলে তো করতাম না।

পরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, আমরা তো শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা; তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই, কী আদেশ করবেন, তা আপনি ভেবে দেখুন'। এখানে 'কুওত' অর্থ যুদ্ধ করার শক্তি, শৌর্য, বীর্য। 'বা'সিন শাদীদ' অর্থ রণনিপুণ যোদ্ধা। মুকাতিল বলেছেন, 'কুওত' শব্দটির মাধ্যমে এখানে বুঝানো হয়েছে সৈন্যের সংখ্যাধিক্যকে। আর 'বা'স' এর মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে অকুতভয় বীরত্বব্যঞ্জকতাকে। পূর্ববর্তী আয়াতে প্রকাশ পেয়েছে রাণী বিলকিসের বাকচাতুর্য। তিনি সেখানে কৌশলে জানতে চেয়েছেন, তাঁর পরামর্শসভার সদস্যরা কী চায়— সন্ধি না যুদ্ধ। আর আলোচ্য আয়াতে ফুটে উঠেছে তাঁর সভাসদদের অকুতোভয় মনোভাব। কিন্তু 'ক্ষমতা আপনারই' বলে তারা রাণীর উপরে ছেড়ে দিয়েছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার। এভাবে প্রকাশ পেয়েছে রাণী ও তাঁর সভাসদদের বুদ্ধিমত্তা ও সাহস। সভাসদদের এমতো মন্তব্য ছিলো বনী ইসরাইলদের মনোভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। হজরত মুসা যখন তাদেরকে যুদ্ধের আদেশ দিয়েছিলেন, তখন তারা বলেছিলো 'আপনি এবং আপনার প্রভুপালক অগ্রসর হোন, যুদ্ধ করুন, আমরা এখানেই বসে রইলাম'। আর এখানে দেখা যাচ্ছে, বিলকিসের পরামর্শদাতারা সরাসরি যুদ্ধের পক্ষে সায় দিচ্ছে। সেই সঙ্গে বলছে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রাণীর। অর্থাৎ এভাবে তারা তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছে যুদ্ধ অথবা সন্ধি উভয়টির পক্ষে।

'মাজা তা'মুরীন' অর্থ আপনি যা আদেশ করবেন। এখানকার 'মা' অব্যয়টি প্রশ্নপ্রকাশক। আর একবচনে সম্পাদিত শব্দটি এখানে 'উনজুরি' (ভেবে দেখুন) বাক্যের কর্মপদ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— মহামান্য সম্রাজ্ঞী! এবার আপনি নিজেই ভাবুন, বুঝুন, কী করবেন— যুদ্ধ, না সন্ধি। আপনার যে কোনো নির্দেশ পালন করতে আমরা সতত প্রস্তুত।

এর পরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'সে বললো, রাজা বাদশাহরা যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদেরকে অপদস্থ করে। এরাও এরকম করবে'। একথার অর্থ— রাণী বললো, কোনো রাজ্য বিজিত হলে সেখানকার ধন-সম্পদ লুটপাট করা হয়। সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদেরকে করা হয় লাঞ্ছিত। উৎসন্ন করা হয় জনগণের ঘরবাড়ী। এটাই বিজয়ী নরপতি ও তাদের বাহিনীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চিরাচরিত অভ্যাস। আমি ধারণা করি, বাদশাহ্ সুলায়মানের বাহিনীও এর ব্যতিক্রম নয়। উল্লেখ্য, আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে রাণী তাঁর পারিষদবর্গের মনে হজরত সুলায়মান সম্পর্কে ভীতির সঞ্চার করতে চেয়েছেন। প্রকারান্তরে একথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যুদ্ধ নয়, সন্ধিই উত্তম।

‘কাজালিকা ইয়াফআলুন’ অর্থ এরাও এরূপ করবে। অর্থাৎ আমার আশংকা এরকমই। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা যেতে পারে, এখানকার ‘এরা’ সর্বনামটি সাধারণভাবে অন্যান্য বিজয়ী নরপতিদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, বাদশাহ্ সুলায়মানের সঙ্গে নয়। অথবা বলা যেতে পারে, বাক্যটির অর্থ হবে— এরূপই তারা করে। এমতাবস্থায় উক্তিটি হবে আল্লাহ্পাকের। অর্থাৎ বিলকিসের বক্তব্যের সমর্থনে আল্লাহ্পাকই এখানে বলেছেন— রাজা বাদশাহ্দের কর্মকাণ্ডও এরকমই হয়।

এর পরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— ‘আমি তার নিকট উপঢৌকন পাঠাচ্ছি। দেখি, দূতেরা কী উত্তর আনে’। একথার অর্থ— সম্রাজ্ঞী শেষে বললেন, আমি সুলায়মানের নিকট উপঢৌকন প্রেরণ করে দেখি, কী ফলাফল হয়। প্রেরিত দূতেরা কী সংবাদ নিয়ে আসে।

বাগবী লিখেছেন, সম্রাজ্ঞী বিলকিস দূতের মাধ্যমে উপঢৌকন প্রেরণ করে প্রথমে এটাই পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন যে, হজরত সুলায়মান শুধুই সম্রাট, না আল্লাহ্র সত্য নবী। শুধু সম্রাট হলে উপঢৌকন নিয়েই তিনি পরিতুষ্ট হবেন। পরিত্যাগ করবেন যুদ্ধের সংকল্প। আর যদি সত্যি সত্যিই তিনি নবী হন, তবে উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান করবেন। কারণ নবীর নিকট বিশ্বাসী আনুগত্যই মূল বিবেচ্য বিষয়।

উপঢৌকন হিসেবে প্রেরিত হলো একদল ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই দাস-দাসীদের পোশাক ছিলো একই রকম। ফলে চেনা যেতো না কে দাস, আর কে দাসী। মুজাহিদ বলেছেন, রাণী বিলকিস পাঠিয়েছিলেন দুই শত দাস এবং দুই শত দাসী। মুজাহিদ ও মুকাতিল মন্তব্য করেছেন, দাসীদেরকে পরানো হয়েছিলো দাসের পোশাক, আর দাসদেরকে সজ্জিত করা হয়েছিলো দাসীর পরিচ্ছদে। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, দাস-দাসীদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিলো সুবর্ণখণ্ড ও রেশমীবস্ত্রসহ। কেউ কেউ বলেছেন, তাদের সঙ্গে দেয়া হয়েছিলো চারটি সুবর্ণ গোলক। ওয়াহাব ইবনে মুনাববাহ বলেছেন, রাণী বিলকিস দাসদেরকে সাজিয়েছিলো দাসীদের বস্ত্রে ও অলংকারে এবং দাসীদেরকে পরিয়েছিলেন দাসের পোশাক। দাসদের বাহুতে ছিলো বাজুবন্দ, কণ্ঠে কাঞ্চন মালা এবং কর্ণলতিতে দুল। আর দাসীদের গলায় লোহার বালা ও কটিদেশে পুরুষদের মতো কোমরবন্ধ। দাসেরা আরূঢ় ছিলো অশ্বের উপর, আর খচ্চরে সমারূঢ়া ছিলো দাসীরা। ওই বাহনগুলোর বলগা ছিলো সুবর্ণরঞ্জিত এবং তাদের পৃষ্ঠে স্থাপিত আসন ছিলো রঙ বেরঙের রেশমীসূত্রগ্রথিত।

দাস-দাসীদেরকে একত্রিত করার পর রাণী হাজির করলেন পাঁচশত রৌপ্যনির্মিত ও মুক্তাখচিত মুকুট। মেশক আম্বর ও চন্দনের একটি কৌটা। তার মধ্যে রাখলেন একটি মহামূল্যবান অক্ষত মুক্তা। কৌটাটি ঢেকে দিলেন একটি বঙ্কিম পুতুল দিয়ে। বাদশাহ্ সুলায়মানের উদ্দেশ্যে একটি পত্রও লিখলেন তিনি। পত্র ও উপঢৌকনাদি অর্পণ করলেন মুনজির ইবনে আমর নামক একজনকে। তার সঙ্গে দিলেন সদাসতর্ক প্রহরী দলকে। তারপর তার নেতৃত্বে সকলকে প্রেরণ করলেন বাদশাহ্ সুলায়মানের উদ্দেশ্যে। যাত্রার প্রাক্কালে মুনজিরকে ডেকে বললেন, তুমি আমার মুখপাত্র। বাদশাহ সুলায়মানের সম্মুখীন হয়ে বলবে, আপনি যদি নবী হন, তাহলে দাস-দাসীদেরকে পৃথক করে দিন। আর বলুন, এই কৌটার মধ্যে কী আছে? যদি তিনি বলতে পারেন, তবে বোলো, কৌটার ভিতরের মুক্তাটির যথাস্থানে ছিদ্র করে দিন। ওই ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিন সুতা। তবে একাজগুলো করবেন আপনি স্বয়ং। কোনো মানব-দানবের সাহায্য নিতে পারবেন না। দাসদেরকে বললেন, তোমরা কথা বলবে দাসীর মতো। আর দাসীদেরকে বললেন, তোমরা কথা বলবে দাসের মতো করে। মুখপাত্রকে পুনরায় বললেন, তুমি কিন্তু লক্ষ্য রেখো, তোমাদের সঙ্গে তিনি কেমন আচরণ করেন— রূঢ়, না কোমল। যদি তিনি রোষকষায়িত নেত্রে তোমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তবে বুঝবে তিনি নবী নন, কেবলই বাদশাহ্। এমতাবস্থায় তাঁকে ভয় করার কিছু নেই। কারণ আমরা তাঁর সমকক্ষ। আর যদি দেখো, তিনি প্রশস্তললাটধারী, শিষ্টাচারী ও ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের অধিকারী, তাহলে বুঝবে তিনি একজন প্রেরিত পুরুষ। তখন তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনো, অনুধাবন করতে চেষ্টা কোরো। যথাবিহিত সম্মানপ্রদর্শনপূর্বক ভেবে-চিন্তে উত্তর দিয়ো তাঁর কথার।

এদিকে আড়ালে থেকে হুদ্‌হুদ্ সবকিছু লক্ষ্য করলো। দূতবাহিনী পৌঁছানোর আগেই সে সকল সংবাদ জানালো হজরত সুলায়মানকে। তিনি তখন জ্বিনদেরকে নির্দেশ দিলেন, সুবর্ণইষ্টক প্রস্তুত করো। ওই ইষ্টক দিয়ে নির্মাণ করো সুদীর্ঘ সাতাশ মাইলের রাজ পথ। ওই পথ দিয়ে আমার কাছে আসবে রাণী বিলকিসের দূত ও তার বাহিনী। আর সোনার রাজপথ যেখানে এসে শেষ হবে, তৎসন্নিহিত প্রান্তরের সম্পূর্ণটাই ঘিরে ফেলো স্বর্ণইষ্টক নির্মিত দেয়াল দিয়ে। এরপর তিনি জানতে চাইলেন, জলচর ও ভূচর প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে বিচিত্র প্রাণী কোনটি? উপস্থিত জনতা বললো, মহামান্য নবী! আমরা অমুক স্থানে দেখেছি একটি বহুবর্ণচিত্রিত সমুদ্রচারী প্রাণী। দু'টি ডানা রয়েছে তার। আর তার গ্রীবাদেশে রয়েছে মোরগের মতো ঝুঁটি। ললাটদেশ পশমাচ্ছাদিত। হজরত সুলায়মান বললেন, এক্ষুণি ওই প্রজাতির একটি প্রাণীকে সমুদ্রাভ্যন্তর থেকে ধরে আনো।

আদেশ প্রতিপালিত হলো। ওই বিচিত্র প্রাণীটিকে মনিকাঞ্চনের পটভূমিতে বেঁধে রাখা হলো স্বর্ণ-ইট নির্মিত প্রাচীরের এক পাশে। তার সামনে রেখে দাও তার পছন্দের খাদ্য-বস্তু। এরপর জ্বিনদেরকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা তোমাদের ছেলেমেয়েদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে দাও রাজপথের দক্ষিণে ও বামে। এই নির্দেশটিও পালিত হলো যথারীতি। তিনি তখন গৌরবান্বিত করলেন তাঁর সিংহাসনকে। সিংহাসনের উভয় পাশে স্থাপন করলেন চার হাজার করে মঞ্চ।

রাণী বিলকিসের দূত ও তাঁর বাহিনী যতই নিকটবর্তী হচ্ছিলো, ততই হয়ে যাচ্ছিলো হতভম্ব ও বিস্ময়াহত। একি অভূতপূর্ব জৌলুস! স্বর্ণইষ্টক নির্মিত রাজপথ। দু'পাশে জনতার সুদীর্ঘ সারি। সোনার প্রাচীর ঘেরা প্রান্তর। প্রান্তরের পাশে অদ্ভূত সুন্দর এক প্রাণী। বিশাল নয়নাভিরাম ও সমীহউদ্রেকক সিংহাসন। দর্শনার্থীদের জন্য রক্ষিত হাজার হাজার মঞ্চ। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো রাণী বিলকিসের দূত ও তাঁর পুরোবাহিনী।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হজরত সুলায়মান যখন স্বর্ণ ও চাঁদির ইট প্রান্তরে বিছিয়ে দিতে বললেন, তখন খালি রাখতে বললেন, ওই পরিমাণ জায়গা, যা আচ্ছাদন করবার সমপরিমাণ স্বর্ণইট নিয়ে এগিয়ে আসছিলো রাণী কিলকিসের দূতেরা। তারা যখন আগমন করলো, তখন প্রান্তরের ইটশূন্য অংশ দেখে ঘাবড়ে গেলো। ভাবলো ইট চুরির অপবাদ যেনো আবার তাদের ঘাড়ে না পড়ে। তাই তারা ভয়ে ভয়ে আনীত ইটগুলো বিছিয়ে দিলো প্রান্তরের ইটবিহীন অংশে। তারপর রাজপ্রাসাদের দিকে যতই তারা অগ্রসর হতে লাগলো ততোই হতে লাগলো বিস্মিত ও ভীত। কী বিশাল আয়োজন! দু'পাশে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য মানুষ, জ্বিন ও হিংস্রপশু। তার সাথে সমবেত হয়েছে হাজার হাজার পাখির দল। জ্বিনদেরকে দেখেই তারা ভয় পেলো বেশী। জ্বিনেরা অভয় দিলো, ভয় পাবার কিছু নেই। তোমরা অতিথি। সামনে অগ্রসর হও। দূতেরা যখন হজরত সুলায়মান সকাশে উপস্থিত হলো তখন তিনি তাদের উপরে নিক্ষেপ করলেন সদয় দৃষ্টি। বললেন, বলো, কী সংবাদ নিয়ে এসেছো? প্রধান দূত অর্পণ করলো রাণীর চিঠি ও উপঢৌকন। হজরত সুলায়মান চিঠি খুলে পড়লেন। তারপর বললেন, কৌটাটি কোথায়। এবার কৌটাটিও অর্পণ করলো প্রধান দূত। তিনি বন্ধ কৌটাটি হাতে নিয়ে নাড়া দিলেন। ইত্যবসরে সেখানে হজরত জিব্‌রাইল উপস্থিত হয়ে হজরত সুলায়মানকে জানিয়ে দিলেন কী আছে কৌটায়। পরক্ষণেই তিনি বললেন, কৌটার মধ্যে আছে একটি অটুট মূল্যবান মুক্তা এবং একটি ছিদ্রযুক্ত পুতুল। দূত বললো, ঠিকই বলেছেন। এবার আপনি মুক্তাটি ছিদ্র করুন এবং ছিদ্রপথে সুতা ঢুকিয়ে এক সঙ্গে গ্রথিত করুন মুক্তা ও পুতুলকে। হজরত সুলায়ান উপস্থিত মানুষ ও ভালো জ্বিনদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কী মুক্তোটি ছিদ্র

করতে পারবে? তারা জবাব দিলো, না। তিনি তখন মন্দ জ্বিনদেরকে বললেন, তোমরা ? তারাও অক্ষমতা প্রকাশ করলো। বললো, মহামান্য সম্রাট! ঘুণ পোকা মনে হয় একাজ করতে পারবে। ঘুণ পোকাকে ডাকা হলো। সে এসে মুক্তাটি ছিদ্র করে ফেললো। তারপর সুতো মুখে নিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিলো মুক্তা ও পুতুলের ছিদ্রপথে। ফলে সহজে সূত্রবদ্ধ করা গেলো ওই দু'টো বস্তুকে। হজরত সুলায়মান বললেন, তুমি কি কিছু চাও? ঘুন পোকা বললো, হে আল্লাহ্‌র নবী! কাঠকে আমার উপজীবিকা নির্ধারণ করে দিন। তিনি বললেন, তথাস্তু। এরপর হজরত সুলায়মান প্রেরিত দাস-দাসীদেরকে হস্ত-পদ প্রক্ষালনের নির্দেশ দিলেন। পথশ্রান্ত দাস-দাসীরা হাত মুখ ধুতে শুরু করলো। দেখা গেলো দাসীরা এক হাতে পানি নিয়ে আর এক হাত দিয়ে পানি নিক্ষেপ করছে মুখমণ্ডলে। আর দাসেরা মুখে পানি দিচ্ছে দুই হাত দিয়ে এক সঙ্গে। দাসীরা হাতে পানি ঢালছে কনুইয়ের দিক থেকে এবং দাসেরা পানি ঢালছে কবজির দিক থেকে। এভাবে হাত মুখ ধোয়ার সময় পরিষ্কার বোঝা গেলো কারা দাস এবং কারা দাসী। ছদ্মবেশ দিয়ে তারা আর ঢেকে রাখতে পারলো না তাদের পরিচয়। তিনি এভাবে কৌশল করে পৃথক করে ফেললেন দাস-দাসীদেরকে। এরপর তিনি ফেরত দিলেন আনীত উপঢৌকনাদি। বিবরণটি সংগৃহীত হয়েছে বাগবীর বিভিন্ন সূত্রের বর্ণনা থেকে। কতক তথ্য আবার সুদ্দী সূত্রে বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী হাতেম। আবার কিছু তথ্য ইয়াজিদ ইবনে রুম্‌মান সূত্রে উপস্থাপন করেছেন যুগপৎ ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মুনজির।

সূরা নমল ঃ আয়াত ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ فَمَآ اٰتٰنِۦَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ
اٰتٰىكُمْ ۚ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ﴿٣٦﴾ اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ
فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَآ اَذِلَّةً وَّ
هُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٣٧﴾ قَالَ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا
قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿٣٨﴾ قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا
اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ
اَمِيْنٌ ﴿٣٩﴾ قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ

يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّیْ ۖ لِيَبْلُوَنِیْۤ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ؕ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّیْ غَنِیٌّ كَرِيْمٌ ﴿۴۰﴾

r দূত সুলাইমানের নিকট আসিলে সুলাইমান বলিল, 'তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ দিয়া সাহায্য করিতে চাহ? আল্লাহ্ আমাকে যাহা দিয়াছেন তাহা তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ, অথচ তোমরা তোমাদিগের উপঢৌকন লইয়া উৎফুল্ল বোধ করিতেছ।'

r 'উহাদিগের নিকট তোমরা ফিরিয়া যাও আমি অবশ্যই উহাদিগের বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী লইয়া আসিব যাহার মোকাবিলা করিবার শক্তি উহাদিগের নাই। আমি অবশ্যই উহাদিগকে তথা হইতে বহিস্কৃত করিব লাঞ্ছিতভাবে এবং উহারা হইবে অবনমিত।'

r সুলাইমান আরো বলিল, 'হে আমার পারিষদবর্গ! সে আত্মসমর্পণ করিয়া আমার নিকট আসিবার পূর্বে কে তাহার সিংহাসন আমাকে আনিয়া দিবে?'

r এক শক্তিশালী জিন বলিল, 'আপনি আপনার স্থান হইতে উঠিবার পূর্বে আমি উহা আনিয়া দিব এবং এই ব্যাপারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত।'

r কিতাবের জ্ঞান যাহার ছিল সে বলিল, 'আপনি চক্ষুর পলক ফেলিবার পূর্বেই আমি উহা আপনাকে আনিয়া দিব।' সুলাইমান যখন উহা সম্মুখে রক্ষিত দেখিল তখন সে বলিল, 'ইহা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, যাহাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করিতে পারেন, আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তাহা করে নিজের কল্যাণের জন্য এবং যে অকৃতজ্ঞ, সে জানিয়া রাখুক যে, আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মহানুভব।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'দূত সুলায়মানের নিকটে এলে সুলায়মান বললো, তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করতে চাও?' প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। সুতরাং এর সোজাসুজি অর্থ দাঁড়ায়— দূতের মাধ্যমে প্রেরিত উপঢৌকনাদি দেখে হজরত সুলায়মান বললেন, এসকল উপঢৌকনের কোনো আবশ্যকই আমার নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ আমাকে যা দিয়েছেন তা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা থেকে শ্রেষ্ঠ, অথচ তোমরা তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে উৎফুল্ল বোধ

করছো'। একথার অর্থ— হজরত সুলায়মান আরো বললেন, হে দূত! আল্লাহ্ আমাকে দিয়েছেন অপার্থিব ও অক্ষয় সম্পদ— সত্য ধর্ম, নবুয়ত, প্রজ্ঞা, তৎসহ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব। আর তোমাদের রাণী কেবলই অবক্ষয়প্রবণ পার্থিব মর্যাদা ও বিত্ত-বৈভবের অধিকারিণী। সুতরাং বুঝতেই পারছো আমার কাছে যা আছে, তা তোমাদের কাছে যা আছে, তা থেকে শ্রেষ্ঠ। উপঢৌকন পেয়ে তোমরা উৎফুল্ল হতে পারো, আমি কদাচ নয়। সুতরাং তোমরা আমাকে তোমাদের মতো করে দেখতে চেয়ো না। আমি যে তোমাদের প্রতি প্রেরিত নবী।

পরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'তাদের নিকট তোমরা ফিরে যাও, আমি অবশ্যই তাদের নিকট এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসবো যার মোকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই। আমি অবশ্যই তাদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কৃত করবো লাঞ্ছিতভাবে এবং তারা হবে অবনমিত'। একথা বলে দূতদেরকে ফেরত পাঠালেন হজরত সুলায়মান। এখানে 'আজিললাতুন' অর্থ লাঞ্ছিত। আর 'সগীরূন' অর্থ অবনমিত। কেউ কেউ বলেছেন, 'জিল্লত' (লাঞ্ছনা) এর বিপরীত শব্দ 'ইজ্জত' (সম্মান)। সুতরাং এখানে 'জিল্লত' অর্থ সম্মানহানি, ক্ষমতাচ্যুতি এবং 'সগীরূন' অর্থ বন্দীত্ব। অর্থাৎ রাণী বিলকিস ও তার সভাসদেরা যদি সত্যধর্মের আহ্বানে সাড়া না দেয়, তবে অবশ্যই তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করে বের করে দেয়া হবে ওই রাজ্য থেকে অথবা তাদেরকে করা হবে বন্দী।

ওয়াহাব ইবনে মুনাববাহ্ প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, প্রত্যাবর্তিত দূতদের মুখ থেকে হজরত সুলায়মানের সকল কথা শুনে রাণী তেমন বিচলিত হলেন না। পারিষদবর্গকে ডেকে বললেন, শপথ আল্লাহ্র! আমি তো প্রথমেই বুঝেছিলাম, সাধারণ কোনো নৃপতি তিনি নন। তিনি প্রেরিত পুরুষ। তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষমতা আমাদের নেই। সুতরাং সমর্পণই শ্রেয়। শেষে রাণী এই বলে হজরত সুলায়মানের নিকটে প্রস্তাব পাঠালেন যে, আমি আমার পারিষদবর্গ ও রাজ্যের নির্বাহী নেতৃবর্গসহকারে শীঘ্রই আপনার কাছে আসছি। যে ধর্মের প্রতি আপনি আমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন, সে ধর্মের স্বরূপ কী, তা আমরা স্বচক্ষে যাচাই করে দেখতে চাই।

যাত্রার প্রস্তুতি চললো। রাণী তাঁর সিংহাসন সাতটি প্রকোষ্ঠে সাজিয়ে রেখে প্রকোষ্ঠগুলো তালাবদ্ধ করে দিলেন। অথবা সাতটি পৃথক প্রকোষ্ঠে তিনি সংরক্ষণ করলেন সিংহাসনের বিশেষ বিশেষ অংশ। কিছু সংখ্যক দুর্ধর্ষ নিরাপত্তা প্রহরী নিযুক্ত করলেন সেগুলোর প্রহরায়। নির্দেশ দিলেন, সাবধান! কেউ যেনো আমার সংরক্ষিত সিংহাসনাংশগুলোর কাছে ঘেষতে না পারে। রাষ্ট্রীয় ঘোষককে নির্দেশ দিলেন, রাজ্যজুড়ে ঘোষণা করে দাও, আমরা বের হয়েছি এক বিশেষ অভিযানে। এভাবে সব কিছু গোছগাছ করার পর রাণী বিলকিস তাঁর বারো হাজার নির্বাহী নেতৃবর্গ নিয়ে যাত্রা করলেন নবী-নৃপতি সুলায়মানের দরবার অভিমুখে।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, হজরত সুলায়মান ছিলেন একাধারে মহাপ্রতাপশালী, ধর্মনিষ্ঠ, ন্যায়নিষ্ঠ ও শিষ্ট। তাঁর নবী ও নৃপতিসুলভ ব্যক্তিত্বের প্রখর প্রভাবে তাঁর সহচর ও অনুচরেরা হয়ে যেতো ম্রিয়মান। তাই তিনি তাদের কারো কাছে কোনো বিষয়ে জানতে চাইলে সে বলতো, আল্লাহ্‌র নবীই এ বিষয়ে সমধিক জ্ঞাত। একবার তিনি তাঁর আকাশী সিংহাসনে আরোহণ করে কোনো এক স্থানে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে একস্থানে যাত্রাবিরতি করলেন তিনি। ভূমিতে অবতরণ করার পর জানতে পারলেন, মাত্র মাইল তিনেক দূরে শিবির স্থাপন করছেন রাণী বিলকিস।

এরপরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'সুলায়মান আরো বললো, হে আমার পারিষদবর্গ! সে আত্মসমর্পণ করে আমার নিকট আসবার পূর্বে কে তার সিংহাসন আমার নিকট এনে দিবে'? হজরত সুলায়মানের উদ্দেশ্য ছিলো আল্লাহ্‌র শক্তিমত্তার নিদর্শন রাণী বিলকিসের সামনে মোজেজারূপে প্রকাশ করা। তাই তিনি তাঁর সিংহাসন আনবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর ধীশক্তি নিরীক্ষণ করাও ছিলো এমতো নির্দেশের আর একটি উদ্দেশ্য। অর্থাৎ রাণী অকল্পনীয় পরিবেশে তাঁর রূপান্তরিত সিংহাসন চিনতে পারেন কিনা, সেটাও তিনি দেখতে চেয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, হজরত সুলায়মানের নির্দেশ ছিলো আত্মসমর্পণ করার পূর্বে অর্থাৎ মুসলমান হওয়ার আগেই তিনি তাঁর সিংহাসন আনতে বলেছিলেন। এর কারণ হচ্ছে, বিনা অনুমতিতে এক মুসলমানের সম্পদ অন্য মুসলমানের হস্তগত হওয়া বৈধ নয়। তাছাড়া সিংহাসন অধিকার করা তাঁর উদ্দেশ্যও ছিলো না। উদ্দেশ্য ছিলো মোজেজা প্রদর্শন, যা নবীদের জন্য শোভন ও সঙ্গত।

এরপরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'এক শাক্তিশালী জ্বিন বললো, আপনি আপনার স্থান থেকে উঠবার পূর্বে আমি তা এনে দিবো এবং এ ব্যাপারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান ও বিশ্বস্ত'। এখানে 'ইফরীত' অর্থ শক্তিশালী। জুহাক বলেছেন— নিকৃষ্ট। ফাররা অর্থ করেছেন— প্রচণ্ডশক্তিধর। ইবনে কুতাইবা বলেছেন, যার সৃষ্টিগত অবয়ব সুদৃঢ়। শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'ইফর' থেকে। 'ইফর' অর্থ মৃত্তিকা। যেমন বলা হয় 'আফারাহু' (মল্লযুদ্ধের মাধ্যমে তাকে ভূপাতিত করা হয়েছে। এভাবে কথাটি দাঁড়িয়েছে— মহামান্যবর নবী! আপনি যে স্থানে এখন উপবিষ্ট সে স্থানে দণ্ডায়মান হওয়ার পূর্বেই আমি রাণী বিলকিসের সিংহাসন আপনার সম্মুখে উপস্থিত করতে পারি। এ ব্যাপারে আপনি আমার ক্ষমতা ও যোগ্যতার উপর পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেন। আর ওই সিংহাসনের রত্নরাজি আত্মসাৎ অথবা বিনষ্ট হওয়া কোনোটাই আমার দ্বারা হবে না। কারণ আমি বিশ্বস্তও।

ওয়াহাব বলেছেন, ওই জ্বিনটির নাম ছিলো লুজাই। কেউ কেউ বলেছেন সাখরজনী। আবার কেউ কেউ বলেছেন, জাকোয়ান। তার দেহাবয়ব ছিলো পর্বত সদৃশ বিশাল। দৃষ্টির শেষ সীমায় পড়তো তার প্রতিটি পদক্ষেপ।

এরপরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'কিতাবের জ্ঞান যার ছিলো, সে বললো, আপনি চক্ষুর পলক ফেলবার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দিবো'। একথার অর্থ— হজরত সুলায়মান চাইলেন, রাণী বিলকিসের সিংহাসন আরো দ্রুত তাঁর সামনে আসুক। তাই তিনি জ্বিনটির প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। বললেন, এর চেয়ে দ্রুত কে সম্পন্ন করতে পারবে এ কাজ? দরবারে উপস্থিত ছিলেন এক রহস্যময় পুরুষ। তিনি ছিলেন আকাশী গ্রন্থের জ্ঞানে সুগভীর। তিনিই তখন বলে উঠলেন, আমি। চোখের পলক ফেলার আগেই আমি আপনার সামনে হাজির করতে পারবো বিলকিসের রাজসিংহাসনটি।

ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, তিনি ছিলেন হজরত খিজির। ইবনে লেহিয়াও এরকম বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, চোখের পলক পড়ার পূর্বে সিংহাসন এনে দিতে চেয়েছিলেন হজরত জিব্রাইল। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি অন্য কোনো ফেরেশতাও হতে পারেন। কোরআন ব্যাখ্যাতাগণের অভিমত হচ্ছে, ওই রহস্যময় পুরুষের নাম ছিলো আসফ ইবনে বরখিয়া। তিনি ছিলেন সিদ্দীক (সত্যবাদী) আর তিনি জানতেন ইসমে আজম। ওই ইসমে আজমসহ দোয়া করলে তাঁর দোয়া গৃহীত হতো চোখের পলক পড়ার পূর্বেই। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে জুহাকের মাধ্যমে জুহাক ও মুকাতিল বর্ণনা করেছেন, হজরত সুলায়মান তখন দৃষ্টিপাত করলেন ইয়েমেনের দিকে। আসফ করলেন প্রার্থনা। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্পাকের নির্দেশে ফেরেশতারা রাণী বিলকিসের সিংহাসন এনে দিলো, মাটির নিচে সুড়ঙ্গপথ নির্মাণ করে সেই পথ দিয়ে। একেবারে হজরত সুলায়মানের সামনে।

কালাবী বর্ণনা করেছেন, আসফ সেজদায় পতিত হয়ে ইসমে আজমের সহায়তায় আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থী হলেন। তৎক্ষণাৎ রাণী বিলকিসের সিংহাসন মাটির ভিতর দিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে ছুটে আসতে শুরু করলো। শেষে মাটি ফুঁড়ে উপস্থিত হলো হজরত সুলায়মানের আসনের সামনে। কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেছেন, রাণী বিলকিসের সিংহাসন থেকে হজরত সুলায়মানের অবস্থানস্থলের দূরত্ব ছিলো দুই মাসের পথের দূরত্বের সমান। মুজাহিদ বলেছেন, আসফ সেজদায় পড়ে বলেছিলেন 'ইয়া জালজ্বালালি ওয়াল ইকরাম'। এটাই ইসমে আজম। আর কালাবী বলেছেন, 'ইয়া হাইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যুম'। এটাই ছিলো আসফের দোয়া।

জুহুরী বলেছেন, আসফ ছিলেন ইসমে আজমের অধিকারী। তিনি সেজদাবনত হয়ে পাঠ করেছিলেন এই দোয়াটি— 'ইয়া ইলাহানা ওয়া ইলাহা কুল্লি শাইইন ইলাহাঁও ওয়াহিদা লা ইলাহা ইল্লা আনতা ই'তীনী বিআ'রশিহা'।

মোহাম্মদ ইবনে মুনকাদির বলেছেন, এখানে 'কিতাবের জ্ঞান যার ছিলো' বলে বোঝানো হয়েছে হজরত সুলায়মানকে। আল্লাহ্পাক তাঁকে দান করেছিলেন প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা। আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে প্রজ্ঞার শ্রেষ্ঠত্ব। আর একথাটিও প্রকাশিত হয়েছে যে, হজরত সুলায়মানের মোজেজা ও মহিমার প্রেক্ষাপট ছিলো প্রজ্ঞাময়।

'আপনি চক্ষুর পলক ফেলবার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দিবো' কথাটি বলেছিলেন আসফ। তার উদ্দেশ্য ছিলো, ইফ্রিতসহ সকল শুভ-অশুভ জ্বিনকে পরাস্ত করা এবং হজরত সুলায়মানের অধিকতর শানিত মোজেজা প্রকাশ করা। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে বলতে হয়, এখানকার 'আলকিতাব' (কিতাবের) শব্দটির আলিফ লাম (আল) জাতিবাচক। অর্থাৎ এখানে 'কিতাবের জ্ঞান' অর্থ সকল আসমানী কিতাবের জ্ঞান, অর্থাৎ লওহে মাহফুজের জ্ঞান। 'ত্বরফ' অর্থ চোখের পলক। শব্দটির মাধ্যমে এখানে একথাই বুঝানো হয়েছে যে— মহামান্য নবী! আপনি কোনোকিছুর প্রতি দৃষ্টিপাত করার পরক্ষণে চোখের পলক ফেলবার আগেই আমি ওই সিংহাসন হাজির করবো।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুলায়মান যখন তা সম্মুখে রক্ষিত দেখলো, তখন সে বললো, এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন। আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ'। একথার অর্থ— হজরত সুলায়মান আসফের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। আসফ দোয়া করলেন। চোখের পলক ফেলার আগেই হজরত সুলায়মান সামনে দেখতে পেলেন মাটি ফুঁড়ে বের হয়েছে রাণী বিলকিসের সিংহাসন। তৎক্ষণাৎ বিস্ময়ে, আনন্দে ও কৃতজ্ঞতাভরে বলে উঠলেন, এ হচ্ছে আমার প্রভুপালয়িতার অনন্য অনুগ্রহ। আর এটা আমার জন্য অতি সূক্ষ্ম পরীক্ষাও বটে। পরীক্ষাটি হচ্ছে— আমি এ অনুপম অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞপরায়ণ হই, না হই অকৃতজ্ঞ।

'মিন ফাদ্বলি রব্বি' অর্থ আমার প্রভুপালনকর্তার অনুগ্রহ। এখানকার 'মিন' আংশিক অর্থ প্রকাশক। অর্থাৎ এ হচ্ছে আমার প্রভুপালনকর্তার অসীম অনুগ্রহের কিয়দংশ। 'লি ইয়াবলুআনী' অর্থ আমাকে পরীক্ষা করবার জন্য। 'আ আশকুরা আম আকফুরু' অর্থ আমি কৃতজ্ঞ, না অকৃতজ্ঞ। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার এই বিশেষ অনুগ্রহ সকৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করি, না মনে করি এ আমার নিজস্ব অর্জন।

এরপর বলা হয়েছে— 'যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তা করে নিজের কল্যাণের জন্য এবং যে অকৃতজ্ঞ সে জেনে রাখুক যে, আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মহানুভব'।

প্রাপ্ত অনুগ্রহের সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতিদানের ফলে অনুগ্রহ হয় প্রাচুর্যময় ও প্রলম্বিত। উন্মোচিত হয় অধিক অনুগ্রহ প্রাপ্তির দুয়ার। আর অনুগ্রহপ্রাপ্তদের জন্য এমতো স্বীকৃতি প্রদান একটি অত্যাবশ্যক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনকারীর পদমর্যাদা যেমন উন্নীত হয়, তেমনি সে লাভ করে পুণ্যপ্রাপ্তির যোগ্যতাও। তাই বলা হয়— 'আশশুকরু ক্বয়দুন নি'মাতিল মাওজুদাতি ওয়া স'য়দুন নি'মাতিল মাফকুদ' (বর্তমান অনুগ্রহ অটুট থাকে কৃতজ্ঞতার দ্বারা। আর ভবিষ্যতের অনুগ্রহও লাভ হয় ওই কৃতজ্ঞতা দ্বারাই)।

রসুল স. বলেছেন, আহারের পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ধৈর্যশীল রোজাদারের মতো। হজরত আবু হোরায়রা থেকে যথার্থ সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা ও হাকেম। ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, পানাহারকারীর পানাহারোত্তর কৃতজ্ঞতার জন্য নির্ধারিত রয়েছে তেমনি পুণ্য, যেমন পুণ্য নির্ধারিত রয়েছে একজন ধৈর্যধারণকারী রোজাদারের রোজার।

'গনিয়্যুন' অর্থ অভাবমুক্ত। আর 'কারীম' অর্থ মহানুভব। এভাবে শেষ বাক্যটির অর্থ দাঁড়িয়েছে— আল্লাহ্তায়ালা যেহেতু চির অভাবমুক্ত, তাই মানুষের কৃতজ্ঞতার মুখাপেক্ষী তিনি নন। আর তিনি মহানুভবও। তাই কারো কৃতজ্ঞতার পরোয়া না করেই তিনি বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে পূরণ করেন সকলের প্রয়োজন।

সূরা নমল ঃ আয়াত ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪

قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِيْۤ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿۴۱﴾ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ؕ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ ۚ وَ اُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَ كُنَّا مُسْلِمِيْنَ ﴿۴۲﴾ وَ صَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿۴۳﴾ قِيْلَ لَهَا ادْخُلِى الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّ كَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ؕ قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ؕ۬ قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَ اَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۴۴﴾ ع

r সুলাইমান বলিল, 'তাহার সিংহাসনের আকৃতি বদলাইয়া দাও; দেখি সে সঠিক দিশা পাইতেছে—না কি সে বিভ্রান্ত?'

r বিলকীস যখন পৌঁছিল তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, 'তোমার সিংহাসন কি এইরূপই? সে বলিল 'ইহা তো ঐরূপই।' আমরা ইতিপূর্বেই সমস্ত অবগত হইয়াছি এবং আত্মসমর্পণও করিয়াছি।'

r আল্লাহের পরিবর্তে সে যাহার পূজা করিত তাহাই তাহাকে সত্য হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিল, সে ছিল সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

r তাহাকে বলা হইল, 'এই প্রাসাদে প্রবেশ কর।' যখন সে উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল তখন তাহার মনে হইল ইহা এক স্বচ্ছ জলাশয় এবং সে তাহার কাপড় টানিয়া হাঁটু পর্যন্ত তুলিয়া ধরিল। সুলাইমান বলিল, 'ইহা তো স্বচ্ছ স্ফটিক-নির্মিত প্রাসাদ।' বিলকীস বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করিয়াছিলাম, আমি সুলাইমানের সহিত বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছি।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সুলায়মান বললো, তার সিংহাসনের আকৃতি বদলিয়ে দাও, দেখি সে সঠিক দিশা পাচ্ছে— নাকি সে বিভ্রান্ত'। একথার অর্থ— হজরত সুলায়মান রাণী বিলকিসের বুদ্ধিমত্তা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে নির্দেশ দিলেন, সিংহাসনটির আকৃতি পরিবর্তন করে দেয়া হোক। তারপর সে এলে পরীক্ষা করা যাবে, তার নিজের সিংহাসন সে সনাক্ত করতে পারে, না হয়ে যায় বুদ্ধিবিভ্রাটের শিকার। এখানে 'নাক্কিরু' অর্থ আকৃতি বদলিয়ে দাও। অর্থাৎ এমনভাবে আকৃতি পরিবর্তন করে দাও, যাতে সে তার নিজের সিংহাসন চিনতে না পারে। এক বর্ণনায় এসেছে, সিংহাসনটির ঊর্ধ্বাংশ নিম্নে এবং নিম্নাংশ ঊর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছিলো। আর লাল ও সবুজ মনিমুক্তাগুলো সন্নিবেশিত হয়েছিলো একে অপরের স্থানে।

'লা তাহতাদুন' অর্থ সঠিক দিশা পায় কিনা। অর্থাৎ আপন রাজাসনের সঠিক পরিচয় তার দৃষ্টিতে উন্মোচিত হয় কিনা।

হজরত সুলায়মানের এমতো নির্দেশ দানের কারণ সম্পর্কে ওয়াহাব ইবনে মনাব্বাহ বর্ণনা করেছেন জ্বিনেরা আশংকা করেছিলেন, হজরত সুলায়মান রাণী বিলকিসের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হবেন। কিন্তু তারা ছিলো এমতো পরিণয়ের ঘোর বিরোধী। কারণ বিলকিস ছিলেন, এক জ্বিন বংশদ্ভূতার পুত্রী। তাঁর ওই পরীমাতা জ্বিনদের অনেক গোপন রহস্য জানতো। সে গোপন রহস্য নিশ্চয় বিলকিসেরও অজানা নয়। আর পরিণয়াবদ্ধ হওয়ার পর হজরত সুলায়মানেরও তা

জানতে বাকী থাকবে না। আবার বিলকিসের সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে-ই হবে পরবর্তী সম্রাট। ফলে হজরত সুলায়মানের মহাঅন্তর্ধানের পরেও তাদেরকে অনুগত থাকতে হবে তাঁর পুত্রের। এভাবে পুরুষানুক্রম তাদেরকে করতে হবে হজরত সুলায়মানের বংশদ্ভুতদের দাসত্ব। তাই তারা রাণী বিলকিস সম্পর্কে হজরত সুলায়মানকে ভুল ধারণা দিতে চেষ্টা করেছিলো। বলেছিলো, বিলকিস ক্ষীণ বুদ্ধিসম্পন্না। তার পা গর্দভের ক্ষুরের মতো। আর পায়ের গোছায় রয়েছে রাজ্যের পশম। হজরত সুলায়মান তাই উপযুক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে ভুল প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন বিলকিসকে প্রদত্ত এমতো অপবাদ। সিংহাসনের আকৃতি বদল করার পরীক্ষাটি ছিলো তার মধ্যে একটি। আর একটি পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা হয়েছে ৪৪ সংখ্যক আয়াতে।

পরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'বিলকিস যখন পৌঁছলো, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তোমার সিংহাসন কি এরূপই? সে বললো, এটা তো এরূপই'। একথার অর্থ— হজরত সুলায়মান সকাশে উপনীত হলেন রাণী বিলকিস। তিনি তাঁকে বললেন, দ্যাখো ভালো করে, এই সিংহাসনটি তোমার কি না? মুকাতিল বলেছেন, বুদ্ধিমত্তা যাচাইয়ের জন্য এরকমই দ্বিধাদ্বন্দ্ববিজড়িত প্রশ্নই করা হয়ে থাকে। আর রাণী বিলকিস এ প্রশ্নের জবাবও দেয়েছিলেন সংশয়মিশ্রিতভাবে। বলেছিলেন, হ্যাঁ, এটাতো সেরকমই মনে হয়। কারণ যেমন প্রশ্ন তেমন জবাব দেয়াই বুদ্ধিমত্তার দাবি। অর্থাৎ প্রশ্ন যেমন ছিলো অনিশ্চিতার্থক, জবাবও ছিলো তেমনি। কেউ কেউ বলেছেন, আদতেই রাণী এ ব্যাপারে ছিলেন দোদুল্যমনা। তাই জবাব দিয়েছিলেন এভাবে, যাতে করে স্বীকৃতি-অস্বীকৃতি দু'দিকেরই থাকে সমান সম্ভাবনা। আর এর মধ্যেই হজরত সুলায়মান বুঝে নিয়েছিলেন তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমরা ইতোপূর্বেই সমস্ত অবগত হয়েছি এবং আত্মসমর্পণও করেছি'। একথার অর্থ— রাণী বিলকিস আরো বললেন, আপনার এরকম অলৌককত্ব আমরা ইতোপূর্বেই দেখেছি। অর্থাৎ হুদ্‌হুদ্ পাখির মাধ্যমে আমার শয়নকক্ষে প্রাপ্ত পত্র, আমার দূত কর্তৃক প্রেরিত উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান, দূত মারফত প্রেরিত আমন্ত্রণপত্র, ওগুলোও তো ছিলো অলৌকিক। ওগুলোর মাধ্যমে ইতোপূর্বেই আমাদের কাছে এই নিশ্চিতি প্রতিভাত হয়েছিলো যে, আপনি প্রেরিত পুরুষ। আর যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেন তাঁর শক্তিমত্তা অজেয় ও অসীম।

কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য উক্তিটি ছিলো হজরত সুলায়মানের সহচরবৃন্দের। অর্থাৎ রাণী বিলকিসের 'এটাতো এরূপই' বলার পর তাঁরাই সমস্বরে বলে উঠেছিলেন 'হ্যাঁ, আমাদের মহামান্য সম্রাট হচ্ছেন আল্লাহ্‌তায়ালার

প্রিয়ভাজন পয়গম্বর। সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর আল্লাহ্ই তাঁকে দিয়েছেন এমতো অলৌকিক ক্ষমতা। তাই আমরা তাঁর প্রতি আত্মসমর্পিত। অনুগত তাঁর আনীত ধর্মাদর্শের। আলোচ্য ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে বলতে হয়, হজরত সুলায়মানকে প্রদত্ত অনুগ্রহসম্ভারের স্বীকৃতি প্রদান এবং তাঁর নবুয়তের মর্যাদা উচ্চকিত করাই ছিলো তাঁর সহচরবৃন্দের এমতো অকুণ্ঠ বক্তব্যের উদ্দেশ্য। কেউ কেউ আবার বক্তব্যটির মর্মার্থ করেছেন এভাবে— তাঁর সহচরবৃন্দ তখন বললেন, সাবার সম্রাজ্ঞী এখানে আসার আগে থেকেই আমরা আমাদের নবীর মাধ্যমে প্রকাশিত আল্লাহ্র সর্বশক্তিমানতার পরিচয় জানি। সেকারণেই তো আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি, অনুসারী হয়েছি তাঁর ধর্মমতের।

এরপরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র পরিবর্তে সে যার পূজা করতো, তা-ই তাকে সত্য থেকে নিবৃত্ত করেছিলো, সে ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত'। একথার অর্থ— রাণী বিলকিস ছিলেন সূর্যপূজারীদের বংশদ্ভূতা। তাই অংশীবাদী পরিবেশেই বেড়ে উঠতে হয়েছিলো তাকে। ফলে আল্লাহ্র এককত্বের পরিচয় পায়নি। আর সেকারণেই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারিণী হওয়া ছাড়া তার কোনো উপায়ও ছিলো না। হজরত সুলায়মানই তাঁকে পথপ্রদর্শন করেন তওহীদের দিকে। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত অরুণোপসনার ঐতিহ্যই তাঁকে ফিরিয়ে রেখেছিলো এক আল্লাহ্র ইবাদত থেকে। ফলে এক আল্লাহ্র ইবাদত ত্যাগ করে যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী হয়েছে, ইতোপূর্বে তিনিও ছিলেন তার অন্তর্ভূতা। উল্লেখ্য, 'বিলকিস স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্না, সে কারণেই সূর্যপূজারিণী' জ্বিনদের এমতো যুক্তি অসঙ্গত। কারণ সত্য বিশ্বাসপ্রাপ্তি বুদ্ধিনির্ভর নয়। আল্লাহ্র দয়ানির্ভর। আর সে দয়া প্রকাশিত হয় নবী প্রেরণের মাধ্যমে।

এরপরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'তাকে বলা হলো, এই প্রাসাদে প্রবেশ করো'। একথার অর্থ— 'তার পায়ের গোছা পশম পূর্ণ' জ্বিনদের এ অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে হজরত সুলায়মান রাজপ্রাসাদের প্রবেশ পথে জ্বিনদের দ্বারা নির্মাণ করিয়ে নিয়েছিলেন শীশমহল। স্বচ্ছ কাঁচ নির্মিত ওই প্রবেশ পথটিকে দেখলে মনে হতো একটি স্বচ্ছ সলিলপূর্ণ জলাশয়। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন একটি কাঁচের অলিন্দ, যার নিম্নে প্রবাহিত ছিলো কাকচক্ষু পানি। ওই পানিতে খেলা করছিলো মৎস্য ও ভেক। তার উদ্দেশ্য ছিলো ওই অলিন্দের পাশে তিনি সভাসদসহ উপবিষ্ট থাকবেন, আর দেখবেন রাণী বিলকিসের পদবিক্ষেপের দৃশ্য। তাই করলেন তিনি। যথাআসনে ও যথাস্থানে উপবেশন করলেন তিনি। তাঁকে ঘিরে সমবেত হলো মানুষ, জ্বিন ও পশু-পাখিরা। তারপর রাণীকে নির্দেশ দিলেন, অলিন্দ দিয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করো। কারো কারো

ধারণা, তিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন কাঁচ বিছানো একটি অঙ্গন। নিচে স্থাপন করিয়েছিলেন মীন, ভেক ও জলজ উদ্ভিদ। তারপর রাণীকে দিয়েছিলেন ওই জলভ্রমসম্বলিত অঙ্গন অতিক্রমের নির্দেশ।

এরপর বলা হয়েছে— 'যখন সে উহার উপর দৃষ্টিপাত করলো, তখন তার মনে হলো, এটা এক স্বচ্ছ জলাশয় এবং সে তার কাপড় টেনে হাঁটু পর্যন্ত তুলে ধরলো। একথার অর্থ— রাণী বিলকিস মনে করলেন জলাশয় অঙ্গন অতিক্রম করতে গেলে ভিজে যাবে তার পরিধেয় বসন। তাই তিনি পদবিক্ষেপের পূর্বমুহূর্তে তাঁর বসন গুটিয়ে নিলেন হাঁটু পর্যন্ত। ফলে প্রকাশিত হয়ে পড়লো তার পায়ের গোছা।

এ সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে একটি দীর্ঘ বিবৃতি উল্লেখ করেছেন ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুনজির, আবদ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে আবী হাতেম। ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে— হজরত সুলায়মান নির্মাণ করিয়েছিলেন বহুমূল্যবান প্রস্তর ও স্ফটিক সম্বলিত একটি মনোহর প্রাসাদ। ওই প্রাসাদের গমন পথে নির্মাণ করিয়েছিলেন একটি কৃত্রিম জলাধার। ওই জলাধারটি সম্পূর্ণ আবৃত করেছিলেন স্বচ্ছ কাঁচ দ্বারা। কিন্তু স্বাভাবিক দৃষ্টিপাতে ওই কাঁচের অস্তিত্ব ধরা পড়তো না। মনে হতো জলাধারটির উপরিভাগে কোনোকিছুই নেই। স্বচ্ছ কাঁচের আবরণ বিশিষ্ট ওই জলাধারের উপর দিয়ে প্রাসাদে গমন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি রাণীকে। রাণী তখন কাপড় ভিজবে বলে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে নিয়ে পদবিক্ষেপ শুরু করেছিলেন। তাঁর গমন পথের একপাশে এক বিশেষ আসনে উপবিষ্ট হজরত সুলায়মান তখন দেখে নিয়েছিলেন তাঁর পায়ের গোছা। সুন্দর, কিন্তু লোমশ। একটু পরেই তিনি তাঁর দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন অন্য দিকে। উল্লেখ্য, পরনারীর প্রতি এরকম একবারের দৃষ্টিপাত অসিদ্ধ নয়। বিশেষ করে যাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হয়, তাকে এভাবে দেখা সিদ্ধ। আলেমগণ এরকমই বলেছেন।

রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা যদি কোনো রমণীকে বিবাহ করতে চাও, তবে সম্ভব হলে তার অনাবরণীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখে নিয়ো। হজরত মুগীরা ইবনে শোবা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা ও দারেমী এবং হজরত জাবের থেকে আবু দাউদ। হজরত মুগীরা বলেছেন, আমি এক রমণীকে পরিণয়-প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম। রসুল স. একথা শুনে বললেন, তুমি কি তাকে দেখেছো? আমি বলেছিলাম, না। তিনি স. বললেন, দেখে নাও। এরকম দর্শন সম্প্রীতিস্থাপনকে সাবলীল করবে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুলায়মান বললো, এটা তো স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত প্রাসাদ'। রাণীর এরকম বিব্রতকর অবস্থা দেখে হজরত সুলায়মান বলে উঠলেন, বিব্রত হবার কোনো কারণ নেই। শীশমহলের এই অলিন্দটিও স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত। সুতরাং স্বাভাবিক ছন্দে পদবিক্ষেপ করো।

শেষে বলা হয়েছে— 'বিলকিস বললো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করেছিলাম। আমি সুলায়মানের সঙ্গে বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করছি'। একথার অর্থ— হজরত সুলায়মানের এরকম অভূতপূর্ব অভ্যর্থনার আয়োজন দেখে রাণী বিলকিস হলেন যুগপৎ লজ্জিতা ও বিস্মিতা। বুঝতে পারলেন আল্লাহ্‌র নবীর এমতো বিস্ময়কর আয়োজনের মাহাত্ম্য। তাই আল্লাহ্‌ সকাশে নিবেদন জানালেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! ইতোপূর্বে আমি সূর্য পূজা করে মহা পাপ করেছি। করেছি আত্মঅত্যাচার। সেই জঘন্য বিশ্বাস থেকে আমি বিশুদ্ধ চিত্তে তওবা করছি। তোমার প্রিয় নবী সুলায়মানের আনুগত্য স্বীকার করে ইমান আনয়ন করছি তোমার প্রতি। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় এরকমও বলা হয়েছে যে, কৃত্রিম জলাধার অতিক্রম করার নির্দেশ পেয়ে রাণী মনে করলেন, এভাবে তাঁকে সলিল সমাধি দেয়াই হয়তো সুলায়মানের ইচ্ছা। কিন্তু বিষয়টির রহস্যউদঘাটনের পর তিনি তাঁর অপধারণার জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন। তাই নিজের দোষ স্বীকার করে বললেন, হে আমার প্রভুপালক! তোমার প্রিয় নবী সুলায়মান সম্পর্কে মন্দ ধারণা করে আমি নিজেই নিজের উপর অত্যাচার করেছি। সেই মহা অন্যায় থেকে আমি এখন প্রত্যাবর্তিতা। তোমার নবীর মাধ্যমে তোমারই প্রতি আত্মসমর্পিতা।

এভাবে মুসলমান হওয়ার পর রাণী বিলকিসের কী হয়েছিলো সে সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন প্রকার আলোচনা করেছেন। আউন ইবনে আবদুল্লাহ্‌ বলেছেন, জনৈক ব্যক্তি একবার আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উয়াইনাকে জিজ্ঞেস করলো, এরপর হজরত সুলায়মান কি রাণী বিলকিসকে বিয়ে করেছিলেন? তিনি বললেন, ব্যস, আমি সুলায়মানের সঙ্গে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করছি। এটাই ছিলো তাঁর শেষ কথা। এর পরের ঘটনা আমার জানা নেই।

কোনো কোনো তাফসীরকার মনে করেন, হজরত সুলায়মান তাঁকে বিয়ে করেছিলেন। ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় এসেছে, ইকরামা বলেছেন, হজরত সুলায়মান রাণী বিলকিসকে বিবাহ করতে মনস্থ করলেন। কিন্তু তাঁর পায়ের নিম্নাংশে লোমশ দেখে তাঁর আগ্রহে কিছুটা ভাটা পড়লো। তৎসত্ত্বেও এর একটা বিহিত করা যায় কিনা তিনি তা ভাবতে শুরু করলেন। এ ব্যাপারে পরামর্শ বিনিময় করলেন কারো কারো সঙ্গে। কেউ কেউ বললো লোম উৎপাটক অস্ত্র নির্মাণের কথা। কিন্তু রাণী বিলকিস এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন, লৌহনির্মিত কোনো অস্ত্র আমার শরীর স্পর্শ করতে পারবে না। হজরত সুলায়মানও প্রস্তাবটিকে ভালো মনে করলেন না। তিনি এবার শুভ জ্বিনদের কাছে জানতে চাইলেন, এ ব্যাপারে তোমরা কি কিছু জানো? তারা বললো, না। তখন তিনি অশুভ জ্বিনদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি এ ব্যাপারে কিছু

জানা আছে। অশুভ জ্বিনেরা বললো, হ্যাঁ। আমরা এমন পদ্ধতির কথা জানি যা অবলম্বন করলে রমণীদের ত্বক লোমমুক্ত তো হয়ই, অধিকন্তু হয় শুভ্র ও লাবণ্যময়। এরপর তারা পরামর্শ দিলো গোসলখানা নির্মাণের। আর চুন, হরিতাল ইত্যাদি দিয়ে প্রস্তুত করে দিলো লোমনাশক মলম। সেই থেকে মানুষের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে গোসলখানা ও লোমনাশক রসায়নের ব্যবহার। যথাসময়ে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হলো। হজরত সুলায়মান তাঁর নবপরিণীতা সহধর্মিণীকে রাজ্যচ্যুত করলেন না। ইয়েমেনেই রেখে দিলেন সে রাজ্যের সম্রাজ্ঞী হিসেবে। প্রতি মাসে তিনি তিন দিন সেখানে গিয়ে অবস্থান করতেন। যেতেন সকালবেলা। আসতেনও সকালে। জ্বিনদের দ্বারা তিনি সেখানে নির্মাণ করিয়েছিলেন তিনটি অদৃষ্টপূর্ব দুর্গ। সেগুলোর নাম ছিলো সালহুন, মিননুন ও আমাদান। সম্রাজ্ঞী বিলকিস হয়েছিলেন হজরত সুলায়মানের এক পুত্র সন্তানের জননী।

ওয়াহাব বলেছেন, ইতিহাসবেত্তাদের ধারণা এরকম— মুসলমান হওয়ার পর হজরত সুলায়মান রাণীকে বললেন, আপনি এবার আপনার সম্প্রদায়ভূত কাউকে পতিরূপে বরণ করুন। বিলকিস বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি তো জানেনই আমি ছিলাম রাণী। আমার রাজ্যে প্রতাপশালী ব্যক্তিরাও রয়েছেন। কিন্তু তাদের কাউকে আমি পছন্দ করতে পারিনি। হজরত সুলায়মান বললেন, সে কথা তো আমি জানিই। কিন্তু আল্লাহ্ যা বৈধ করেছেন, তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখা কি ঠিক? বিলকিস বললেন, ঠিক আছে। আপনার নির্দেশ শিরোধার্য। আপনি তাহলে হামাদান অধিপতি জীতারার সঙ্গে আমাকে বিবাহ দিয়ে দিন। হজরত সুলায়মান তাই করলেন। জীতারার সঙ্গে তাঁর শুভ বিবাহ সম্পন্ন করিয়ে দিলেন। ইয়েমেনের শাসনভারও অর্পণ করলেন জীতারার উপর। একদল জ্বিনকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা আমার হুকুমে জীতারার রাজ্য রক্ষা করো। এভাবে জ্বিনেরাই হলো জীতারার রাজ্যের প্রধান প্রতিরক্ষাবাহিনী। বয়ে চললো দিন। মাস। বছর। এক বছর পর হজরত সুলায়মান ডাক শুনতে পেলেন তাঁর পরম প্রেমময় প্রভুপ্রতিপালকের। চলে গেলেন নশ্বর ধরাধাম থেকে। জ্বিনেরা কিন্তু তাঁর মহা প্রস্থানের সংবাদ জানতেই পারলো না। জানতে পারলো আরো এক বছর গত হওয়ার পর। তেহামা প্রদেশে আবির্ভূত হলো এক অশুভ জ্বিন। সে-ই কথাটা সেখান থেকে বিরাট আওয়াজে ঘোষণা করলো। বললো, শুভ সংবাদ। শুভ সংবাদ। সম্রাট সুলায়মানের মহাপ্রয়াণ ঘটেছে। ভেঙে গিয়েছে তোমাদের দাসত্বের শৃঙ্খল। তোমরা এখন স্বাধীন। এখন তোমরা পৃথিবীতে করতে পারো যথেচ্ছ ভ্রমণ। সেই থেকে শেষ হয়ে গেলো মহাপ্রতাপশালী নবী সম্রাট সুলায়মানের শাসনকাল। একই সঙ্গে শেষ হয়ে গেলো জীতারার ও রাণী বিলকিসের রাজত্বও।

বর্ণিত হয়েছে, হজরত সুলায়মান সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন তের বছর বয়সে। আর তিপ্পান্ন বছর বয়সে করেছিলেন পরলোকগমন। এভাবেই এক সময় শেষ হয়ে যায় পুণ্যবান-পাপী সকল পরাক্রমশালী সম্রাটের সাম্রাজ্য। স্থায়ী থাকেন কেবল আল্লাহ্। আর সাম্রাজ্যাধিকার চিরপ্রবহমান থাকে কেবল তাঁর। তিনি যে চিরঞ্জীব, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর।

লা মুলকা সুলাইমান ওয়ালা বিলকিসা ওয়ালা আদামা ফীল কওনি ওয়াল ইবলীসা ওয়ালা কুল্লু ফতুরাতুন ওয়া আনতাল মা'না ইয়া মান হুয়ালিক্কুরুবি মাকনাতীসু।

অর্থঃ কারো রাজ্য চিরস্থায়ী নয়। না সুলায়মানের, না বিলকিসের। না আদমের, না ইবলিসের। হে চিরঅক্ষয় সত্তা! কেবল তোমার রাজত্বই চিরস্থায়ী। তুমি সত্য। তুমি অনিত্য। তুমি অনাদি, তুমি অনন্ত।

সূরা নমল ঃ আয়াত ৪৫, ৪৬, ৪৭

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ۗ قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ﴿٤٧﴾

r আমি অবশ্যই সামূদ সম্প্রদায়ের নিকট তাহাদিগের ভ্রাতা সালিহ্‌কে পাঠাইয়াছিলাম, এই আদেশসহ যে, 'তোমরা আল্লাহের ইবাদত কর,' কিন্তু উহারা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া বিতর্কে লিপ্ত হইল।

r সে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ ত্বরান্বিত করিতে চাহিতেছ? কেন তোমরা আল্লাহের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছ না যাহাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হইতে পার?

r উহারা বলিল, 'তোমাকে ও তোমার সংগে যাহারা আছে তাহাদিগকে আমরা অমংগলের কারণ মনে করি।' সালিহ্ বলিল, 'তোমাদিগের শুভাশুভ আল্লাহের এখতিয়ারে, বস্তুতঃ তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যাহাদিগকে পরীক্ষা করা হইতেছে।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি অবশ্যই ছামুদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভ্রাতা সালেহ্কে প্রেরণ করেছিলাম এই আদেশসহ যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো। কিন্তু তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হলো'। একথার অর্থ— ছামুদ সম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শনার্থে আমা কর্তৃক নবী সালেহ্কে প্রেরণের বিষয়টি সুনিশ্চিত। সালেহ্ ছিলেন ছামুদ সম্প্রদায়ের বংশীয় ভ্রাতা। তাঁকে আমি এই নির্দেশটি প্রচার করতে বলেছিলাম যে, তোমরা অংশীবাদিতা ও অহংকার পরিত্যাগ করো। ইবাদত করো কেবল আল্লাহ্র। কিন্তু অনেকেই তাঁর কথা মান্য করলোনা। মান্য করলো অল্পকিছু লোক। এভাবে ছামুদেরা বিভক্ত হলো দু'টি দলে। সত্যপন্থী ও মিথ্যানুসারীদের মধ্যে এভাবে শুরু হলো বিতর্ক, দ্বন্দ্ব। সুরা আ'রাফের যথাস্থানে এ দু'টো দলের বিশদ পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

পরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— 'সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেনো কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণকে ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছো'? একথার অর্থ— নবী সালেহের উদাত্ত আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করলো অধিকাংশ মানুষ। উলটা বরং বললো, আমরা তোমাকে মানি না। তোমার আল্লাহ্র শাস্তির ভয় দেখালেও না। আমরা যদি তোমাকে না মানলে শাস্তিযোগ্য হই, তবে সে শাস্তি আসে না কেনো? হজরত সালেহ্ দরদভরা কণ্ঠে বললেন, হে আমার স্বজাতি! সংযত হও। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ্তায়ালা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে শাস্তি দিতে অবশ্যই সক্ষম। নির্বোধ তোমরা। তাই শাস্তির জন্য উতলা হয়েছো। কল্যাণের পরিবর্তে কামনা করছো অকল্যাণকে। আর সে অকল্যাণকে আবার ত্বরান্বিতও করতে চাইছো। এখানে 'সাইয়্যিআহ' অর্থ অকল্যাণ, শাস্তি। আর 'হাসানা' অর্থ কল্যাণ, তওবা।

এরপর বলা হয়েছে— 'কেনো তোমরা আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছো না যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পারো'? একথার অর্থ— তিনি আরো বললেন, হে অবিমৃশ্য জনতা! ক্ষান্ত হও। যা বলেছো, বলেছো। এখন ক্ষতিপূরণ করতে চেষ্টা করো সত্যপ্রত্যাখ্যানের। তওবা করো। ক্ষমাপ্রার্থনা করো লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে। এরকম করলে তোমরা হবে আল্লাহ্র অনুগ্রহভাজন।

এরপরের আয়াতে (৪৭) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, তোমাকে ও তোমার সঙ্গে যারা আছে, তাদেরকে আমরা অমঙ্গলের কারণ মনে করি'। একথার অর্থ— অবাধ্যরা বললো, হে সালেহ্! আমরা দেখতে পাচ্ছি তুমি ও তোমার সঙ্গী সাথীরা অশুভ। যেদিন থেকে তোমরা নতুন ধর্মের প্রচার শুরু করেছো, সেদিন থেকেই ক্রমাগত আমাদের উপরে নেমে আসছে দুর্ভোগ। শুরু হয়েছে অনাবৃষ্টি, অজন্মা, খরা। দুর্ভিক্ষ বিস্তার করে চলেছে তার ক্রমপ্রসরমান থাবা। তোমাদের জন্যই আমরা আজ বিপন্ন, বিপর্যস্ত, দুর্দশাকবলিত।

এরপর বলা হয়েছে— 'সালেহ্ বললো, তোমাদের শুভাশুভ আল্লাহ্র এখতিয়ারে, বস্তুতঃ তোমরা এমন এক সম্প্রদায়, যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে'। একথার অর্থ— নবী সালেহ্ বললেন, শুভাশুভের একমাত্র নির্ণয়ক, নিয়ন্ত্রক ও বাস্তবায়ক কেবলই আল্লাহ্, অন্য কেউ নয়। তাই প্রকৃত কথা হচ্ছে, আল্লাহ্ই তোমাদেরকে এভাবে বিপদাপদের মাধ্যমে পরীক্ষা করতে চান— তোমরা নম্র হয়ে সত্যের দিকে ফিরো আসো কিনা, না রয়ে যাও চির অবাধ্যদের দলে। নিশ্চিত জেনো, তকদীরের বাস্তবায়ন অনিবার্য। কিন্তু কারণের উদয় ঘটায় মানুষ। তোমরাও তোমাদের উপর্যুপরি সত্যপ্রত্যাখ্যানের কারণে হয়েছো এমতো দুর্দশার শিকার।

'ত্বইরুকুম ইনদাল্লাহ্' অর্থ তোমাদের শুভাশুভ আল্লাহ্র এখতিয়ারে। তকদীরের লিখন অতিদ্রুত কার্যকর হয়। তাই তকদীরকে রূপকার্থে বলা হয়েছে 'ত্বইর'। মানুষের কৃতকর্মও অতি সত্বর উত্থিত হয় আকাশে। তাই কর্মফল বুঝাতেও শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কর্মযোগ তকদীর বাস্তবায়ন হওয়ার কারণ। আবার তকদীর ও বাস্তবায়নের কারণ দু'টোই অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন। তাই বলা হয় 'লা শাইয়া আস্‌রাউ মিন ক্বদ্‌রি মাহতুম' (নিয়তির চেয়ে অধিক দ্রুতগতিসম্পন্ন আর কিছু নেই)।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'ত্বইর' বলা হয়েছে দুর্বিনীত ছামুদদের অশুভ কর্মকে। তারা প্রবাস গমনকালে পাখিদের বিশেষ ওড়ার ভঙ্গি ও বিশেষ ধ্বনিকে অশুভ মনে করতো। তাদের ওই কুসংস্কারকেই আলোচ্য বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে 'ত্বইর' শব্দটির মাধ্যমে।

'ফিৎনা' অর্থ পরীক্ষা। 'তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে' অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানপ্রবণতার জন্যই তোমরা এভাবে পরীক্ষিত হচ্ছো। ক্রমাগত সম্মুখীন হচ্ছো বিপদাপদের। এভাবে পরীক্ষা করার কথা এসেছে অন্য এক আয়াতে এভাবে— 'সুখ দুঃখ দিয়ে আমি তোমাদেরকে যাচাই করি'।

সূরা নমল ঃ আয়াত ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩

وَ كَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَ لَا يُصْلِحُوْنَ ﴿٤٨﴾ قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَ اَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَ اِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَ مَكَرُوْا مَكْرًا وَّ مَكَرْنَا مَكْرًا وَّ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٠﴾ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

مَكْرِهِمْ ۙ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَ قَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥١﴾ فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوْا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٥٢﴾ وَ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٣﴾

r আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি যাহারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করিত, শান্তি প্রতিষ্ঠা করিত না।

r উহারা বলিল, 'চল, আমরা আল্লাহের নামে শপথ গ্রহণ করি যে, আমরা রাত্রিকালে তাহাকেও তাহার পরিবার পরিজনকে অবশ্যই হত্যা করিব; অতঃপর তাহার দাবীদারকে নিশ্চয় বলিব, 'তাহার পরিবার-পরিজনের হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই; আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।'

r উহারা চক্রান্ত করিয়াছিল এবং আমিও চক্রান্ত করিলাম, কিন্তু উহারা বুঝিতে পারে নাই।

r অতএব দেখ উহাদিগের চক্রান্তের পরিণাম কী হইয়াছে— আমি অবশ্যই উহাদিগকে ও উহাদিগের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করিয়াছি।

r এইতো ঘরবাড়ীগুলি— সীমালংঘন হেতু যাহা জনশূন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে; ইহাতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে।

r এবং যাহারা বিশ্বাসী ও সাবধানী ছিল তাহাদিগকে আমি উদ্ধার করিয়াছি।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আর সেই শহরে ছিলো এমন নয় ব্যক্তি যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো, শান্তি প্রতিষ্ঠা করতো না'। একথার অর্থ— ছামুদ সম্প্রদায়ের নয়জন দুর্বৃত্তের একটি দুর্ধর্ষ দল বাস করতো হিজর নামক শহরে। বিপর্যয় সৃষ্টি করাই ছিলো তাদের কাজ। শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা তারা ভাবতেও পারতো না। দল বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'রহাত্ব' শব্দটি। তিন অথবা নয়জনের অধিক জনসমষ্টিকে বলে 'রহাত্ব'। আর 'নফর' বলে তিন থেকে নয়জনের দলকে। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত নয়জন ছিলো ছামুদ জাতিগোষ্ঠীর গোত্রীয় নেতৃবর্গের সন্তান। তাই তারা ছিলো দুর্দান্ত স্বভাবের। কাজার ইবনে মালেক ছিলো তাদের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য। এরাই বধ করেছিলো হজরত সালেহের অলৌকিক উষ্ট্রীটিকে।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'তারা বললো, চলো, আমরা আল্লাহ্র নামে শপথ গ্রহণ করি যে, আমরা রাত্রিকালে তাকে এবং তার পরিবারপরিজনকে অবশ্যই হত্যা করবো; অতঃপর তার দাবীদারকে বলবো, তার পরিবার-পরিজনের

হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি; আমরা অবশ্যই সত্যবাদী'। একথার অর্থ— ওই নয়জন মহাদুর্বৃত্ত মিলিত হলো গোপন পরামর্শসভায়। বললো, চলো, আমরা সালেহ্ ও তার পরিবার-পরিজনকে রাতের আঁধারে হত্যা করার ব্যাপারে আল্লাহ্র নামে শপথ করি। পরে তাদের দাবিদারেরা যদি আমাদেরকে সন্দেহ করে, তবে আমরা বলবো, তাদের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তো আমরা কিছুই জানি না। আর আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।

এখানে 'ক্বলু' (তারা বললো) অর্থ তারা পরস্পরকে উদ্দেশ্য করে বললো। 'তাক্বাসামু' অর্থ শপথ গ্রহণ করি। শব্দরূপটিকে অতীতকালবোধক ধরে নিলে এরকমই অর্থ দাঁড়ায়। আর অনুজ্ঞাসূচক ধরে নিলে অর্থ দাঁড়ায়— তোমরা পরস্পরে শপথ গ্রহণ করো।

'লানুবাইয়্যিতান্নাহু' অর্থ তাকে অবশ্যই রাত্রিকালে হত্যা করবো। 'ওয়া আহলাহু' অর্থ— এবং হত্যা করবো তার পরিবার-পরিজনকে। অর্থাৎ তাকে বিশ্বাস করে যারা তার অনুসারী হয়েছে তাদেরকে। 'লিওয়ালিয়্যিহী' অর্থ অভিভাবকদেরকে। অর্থাৎ যেসকল নিকটাত্মীয় নিহত ব্যক্তিদের 'হত্যার বদলে হত্যা'র বা রক্তপাতের দাবিদার হয় তাদেরকে। 'মুহলিকা আহলিহী' কথাটির 'মুহলিকা' অর্থ হত্যার স্থান বা সময়। শব্দটি ক্রিয়ার আধাররূপে পরিগণিত। অথবা শব্দটি হতে পারে ধাতুমূল। এভাবে অর্থ হয়— হত্যা হতে, হত্যার ব্যাপারে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমরা নবী সালেহ্ ও তার অনুচরবর্গের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত তো নইই, অধিকন্তু সেখানে বা সে সময়ে আমরা উপস্থিতও ছিলাম না। আরববাসীগণ বলেন, 'মা রআইতু ছাম্মা রজুলান বাল্ রজুলাইনি' (আমি সেখানে একজনকে দেখিনি, বরং দেখিনি দু'জনকেও)।

এরপরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'তারা চক্রান্ত করেছিলো এবং আমিও চক্রান্ত করলাম, কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি'। একথার অর্থ— ওই নয়জন দুর্বৃত্ত যে চক্রান্ত করেছিলো, তার বিপরীতে আমি প্রয়োগ করেছিলাম এক অব্যর্থ কৌশল। ফলে তাদের ষড়যন্ত্র তো বিফল হয়েছিলোই, তদুপরি তারা নিজেরাই পড়ে গিয়েছিলো তাদের স্বসৃষ্ট ষড়যন্ত্রের ফাঁদে। অন্যকে ধ্বংস করতে গিয়ে নিজেরাই হয়ে গিয়েছিলো ধ্বংসের শিকার।

এরপরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে— 'অতএব দেখো, তাদের ধ্বংসের পরিণাম কী হয়েছে— আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি'। এখানে 'কাইফা কানা' (কী হয়েছে) প্রশ্নটি একটি বিস্ময়সুচক প্রশ্ন। এভাবে কথাটি দাঁড়িয়েছে— বিস্ময় বিস্ফরিত নেত্রে লক্ষ্য করো তাদের মর্মন্তুদ পরিণতির দিকে।

'আন্না দাম্মারনাহুম' অর্থ কীভাবে তাদেরকে ধ্বংস করেছি। এভাবে তাদের ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে সংক্ষিপ্তাকারে। কীভাবে কোন্ পদ্ধতিতে তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিলো তার বিবরণ এখানে নেই। তবে এই ধ্বংস সম্পর্কে পাওয়া যায় বিভিন্ন রকম বিবৃতি। যেমন হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, আল্লাহ্পাক হজরত সালেহ্ ও তাঁর গৃহবাসীদেরকে রক্ষার নিমিত্তে নিয়োজিত করেছিলেন ফেরেশতাদেরকে। গভীর নিশীথে ওই নয়জন দুরাচার যখন হজরত সালেহের বসতবাটি ঘিরে ফেললো, তখন ওই ফেরেশতারা ছুঁড়তে শুরু করলো বৃষ্টির মতো পাথর। দুরাচারেরা পাথর দেখতে পেলো কেবল। প্রস্তর নিক্ষেপকারীরা ছিলো অদৃশ্য। অল্পক্ষণের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হলো আক্রমণকারীরা।

মুকাতিল বলেছেন, পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে তারা জড়ো হয়েছিলো একটি পাহাড়ের পাদদেশে। কথা ছিলো, সেখান থেকে তারা একযোগে যাত্রা করবে হজরত সালেহের বসতবাটির দিকে। কিন্তু তারা একত্র হওয়ামাত্র পাহাড়টি ধসে পড়লো তাদের উপর। ফলে সেখানেই সমাধিপ্রাপ্ত হলো তারা। আবদুর রাজ্জাক, আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, কাতাদা বলেছেন, পাহাড় থেকে পতিত প্রকাণ্ড একটি পাথরের নিচে চাপা পড়ে মারা গিয়েছিলো তারা।

'ওয়া ক্বওমাহুম আজমাঈন' অর্থ এবং ধ্বংস করেছি তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে। উল্লেখ্য, ছামুদ সম্প্রদায়ের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সকলেই ধ্বংস হয়েছিলো আল্লাহ্র গজবে। অকস্মাৎ অদৃশ্য থেকে উত্থিত হয়েছিলো মহানাদ, বিকট, বীভৎস, ভয়ংকর গগনবিদারী আওয়াজ। ওই আওয়াজের আঘাতেই তারা মরে পড়ে রয়েছিলো আপনাপন বাসগৃহে।

এরপরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'এইতো ঘরবাড়ীগুলি— সীমালংঘন হেতু যা জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে; এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন আছে'। একথার অর্থ— অবাধ্যদের ধ্বংসের নিদর্শনরূপে এখানে মহাকালের সাক্ষী হয়ে আছে তাদের জনমানবহীন জনপদ। এই নিদর্শন দৃষ্টে জ্ঞানীগণ সহজেই অনুধাবন করতে পারেন আল্লাহ্তায়ালার মহাপরাক্রমের পরিচয়। একই সঙ্গে একথাও জানতে পারেন যে, আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষগণ এবং তাঁদের আনীত ধর্মমত সত্য।

এরপরের আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— 'এবং যারা বিশ্বাসী ও সাবধানী ছিলো, তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি'। একথার অর্থ— যারা আমার প্রিয় নবী সালেহের ধর্মমতে দীক্ষা গ্রহণ করে বিশ্বাসকে আশ্রয় করেছিলো এবং অবলম্বন করেছিলো সতর্কতা, তাদেরকে আমি আমার ওই মহাশাস্তি থেকে মুক্ত রেখেছিলাম। দিয়েছিলাম পরিত্রাণ ও কল্যাণ। উল্লেখ্য, হজরত সালেহের উম্মতের সংখ্যা ছিলো চার সহস্র।

وَ لُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَ اَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ﴿۵۴﴾ اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿۵۵﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا اَخْرِجُوْۤا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿۵۶﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ وَ اَهْلَهٗۤ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۫ قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿۵۷﴾ وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿۵۸﴾

r স্মরণ কর লূতের কথা, সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'তোমরা জানিয়া-শুনিয়া কেন অশ্লীল কাজ করিতেছ।'

r 'তোমরা কি কাম-তৃপ্তির জন্য নারীকে ছাড়িয়া পুরুষে উপগত হইবে? তোমরা তো এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।'

r উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলিল 'লূত পরিবারকে তোমাদিগের জনপদ হইতে বহিষ্কৃত কর, ইহারা তো এমন লোক যাহারা পবিত্র সাজিতে চাহে।'

r অতঃপর তাহাকে ও তাহার স্ত্রী-ব্যতীত তাহার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করিলাম। তাহার স্ত্রীকে করিয়াছিলাম ধ্বংসপ্রাপ্তদিগের অন্তর্ভুক্ত।

r তাহাদিগের উপর শাস্তিমূলক বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম; যাহাদিগকে ভীতিপ্রদর্শন করা হইয়াছিল তাহাদিগের জন্য এই বর্ষণ ছিল কত মারাত্মক।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'স্মরণ করো লুতের কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিলো, তোমরা জেনে শুনে কেনো অশ্লীল কাজ করছো?' বাক্যটির সম্পর্ক রয়েছে ৪৫ সংখ্যক আয়াতের 'আমি অবশ্যই ছামুদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভ্রাতা সালেহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম' কথাটির সঙ্গে। অথবা 'স্মরণ করো' কথাটি এখানে একটি উহ্য সম্বোধনের অনুবাদ। অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! স্মরণ করুন নবী লুতের ঘটনা। 'ফাহিশাতু' অর্থ অশ্লীল কর্ম। 'আতা'তুনা' অর্থ কেনো করছো? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিসূচক, অথবা তিরস্কারবোধক। আর 'ওয়া আনতুম তুবসিরূন' অর্থ জেনে শুনে। অর্থাৎ কর্মটি অশ্লীল সে বিষয়ের অবহিতি থাকা সত্ত্বেও। উল্লেখ্য, জ্ঞাতসারে কুকর্ম সম্পাদন অধিকতর নিকৃষ্ট।

অথবা কথাটির অর্থ— এতাদৃশ নির্লজ্জ কর্ম তোমরা সম্পন্ন করো প্রকাশ্যে। অবশ্য নবী লুতের অবাধ্য সম্প্রদায়ের স্বভাব ছিলো এরকমই। সমকামিতার মতো ঘৃণ্য কর্ম তারা সম্পাদন করতো একে অপরের সামনে। কিংবা বক্তব্যটি হতে পারে এরকম— ছামুদ সম্প্রদায়ের হত্যা ও ধ্বংসপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর দৃষ্টান্ত তোমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। সুতরাং দেখে শুনে বুঝেও কেনো তোমরা জড়িত হয়েছো এমতো অশ্লীলতায়।

পরের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— 'তোমরা কি কামতৃপ্তির জন্য নারীকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরা তো এক অজ্ঞ সম্প্রদায়'। আলোচ্য আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে হজরত লুতের অবাধ্য সম্প্রদায়ের জঘন্য কুকর্মটির কথা। বলা হয়েছে, তারা কামপরিতৃপ্তির জন্য রমণীর পরিবর্তে ব্যবহার করতো পুরুষকে। আর 'তোমরা তো এক অজ্ঞ সম্প্রদায়' বলে এখানে একথাটিও জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, কামপরিতৃপ্তির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈধ উপায়ে সন্তান লাভ। কারণ সন্তান উৎপাদন করতে পারে নারীরাই। গর্ভধারণ করে তারাই, পুরুষেরা নয়। অথবা কথাটির মাধ্যমে বলা হয়েছে, এরকম জঘন্য কাজ শুধুমাত্র আল্লাহ্র গজবকেই ডেকে আনে। এ বিষয়টি সম্পর্কে তোমরা সত্যিই অজ্ঞ।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আর একটি কথা প্রমাণিত হয় যে, বস্তুর উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা শরিয়ত নির্ভর নয়, বরং তার সৃষ্টিগত স্বভাব নির্ভর যদিও কোনো কোনো বস্তুর ভালো-মন্দ চিহ্নিত করে শরিয়ত।

এর পরের আয়াতে (৫৬) বলা হয়েছে— 'উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বললো, লুত-পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বহিষ্কৃত করো, এরা তো এমন লোক যারা পবিত্র সাজতে চায়'। এ কথার অর্থ— হজরত লুতের সদুপদেশকে কিছুতেই গ্রহণ করলো না তাঁর সম্প্রদায়। শুধু বললো, তার উপস্থিতিই আমাদের স্বেচ্ছাচরণের অন্তরায়। এতো ভালো মানুষের প্রয়োজন নেই আমাদের। সুতরাং তাকে তার পরিবার পরিজন সহকারে এদেশ থেকে বহিষ্কার করাই শ্রেয়। হে জনতা! তোমরা এখন এই কাজটিই করো।

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (৫৭, ৫৮) মর্মার্থ হচ্ছে— অতঃপর আমি চিরভ্রষ্ট লুতের সম্প্রদায়ের উপর আপতিত করলাম গজব। আমার প্রিয় নবী লুতকে নির্দেশ দিলাম, রাতের অন্ধকারে অন্যত্র গমন করো। তিনি ওই জনপদের সীমানা অতিক্রম করার পরক্ষণেই শুরু হলো ভয়াবহ প্রস্তর বৃষ্টি। ওই মারাত্মক বৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেলো অবাধ্যরা। লুতের এক স্ত্রী ছিলো অবাধ্যদের অন্তর্গত। সেও ধ্বংস হয়ে গেলো অবাধ্যদের সঙ্গে। নিরাপদ রইলেন কেবল আমার নবী ও তাঁর পরিবারের বিশ্বাসী অনুচরেরা।

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ط ءٰٓاللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٥٩﴾

r বল, প্রশংসা আল্লাহেরই এবং শান্তি তাঁহার মনোনীত দাসদিগের প্রতি! শ্রেষ্ঠ কে— আল্লাহ্, না উহারা যাহাদিগকে শরীক করে তাহারা?

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বলো, প্রশংসা আল্লাহ্রই এবং শান্তি তাঁর মনোনীত দাসদের প্রতি'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল মোহাম্মদ! শুনলেন তো এতক্ষণ ধরে বর্ণিত আপনার পূর্বসূরী নবী ও তাঁদের অবাধ্য সম্প্রদায়ের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার ইতিবৃত্ত। এখন আপনি মুক্তকণ্ঠে উচ্চারণ করুন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি তার প্রিয়ভাজন নবীগণের শত্রুকুলের যথোপযুক্ত শাস্তিবিধান করেন। আর শান্তি বর্ষণ করেন তাঁর মনোনীত দাসগণের প্রতি, যাঁরা নবুয়তের দায়িত্বপ্রাপ্তরূপে আপনার পূর্বসূরী।

মুকাতিল বলেছেন, 'আল্লাজী নাসত্বফা' (মনোনীত দাস) বলে এখানে বুঝানো হয়েছে নবী রসুলগণকে। তাঁদের প্রতিই এখানে বর্ষণ করা হয়েছে শান্তিবারতা।

ইমাম মালেকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আল্লাজী নাস্ত্বফা' বলে বুঝানো হয়েছে রসুল স. এর প্রিয়ভাজন সহচরবৃন্দকে। সুফিয়ান সওরীর অভিমতও এরকম। কালাবী বলেছেন, এখানকার শান্তিবারতার লক্ষ্য রসুল স. এর সমগ্র উম্মত। কেউ কেউ বলেছেন, পূর্বাপর সকল নবীর বিশ্বাসী উম্মতই আলোচ্য আয়াতে কথিত শান্তি ঘোষণার লক্ষ্যস্থল।

কোনো কোনো তাফসীরকার মনে করেন, আলোচ্য আয়াতটিও হজরত লুতের ইতিবৃত্তের অন্তর্ভূত। অর্থাৎ এখানে 'বলো' বলে নির্দেশ করা হয়েছে হজরত লুতকে। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে এর পূর্বে উহ্য রয়েছে 'কুলনা' শব্দটি। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমি লুতকে নির্দেশ করলাম, বলো, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে। আর শান্তি প্রার্থনা করো তাদের জন্য যাদেরকে আল্লাহ্ সুরক্ষিত রেখেছেন অশ্লীলতা ও ধ্বংস থেকে। তারাই আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন দাস। অথবা বক্তব্যটি হবে এরকম— হে আমার প্রিয় নবী লুত! তুমি শান্তি প্রার্থনা করো সর্বশেষ নবী মোহাম্মদ মোস্তফা এবং তাঁর উম্মতের প্রতি, যেহেতু ওই শেষ নবীর নূরের বরকতেই তুমিসহ

তোমার অন্যান্য সতীর্থ নবীকে রক্ষা করেছি আমি বিভিন্ন প্রকার বিপদাপদ থেকে এবং তোমাদের সকলকে করেছি মর্যাদামণ্ডিত। রসুল স. জানিয়েছেন, নবীরূপে আমার সৃষ্টি সর্বাগ্রে এবং আবির্ভাব সকলের শেষে। কাতাদা থেকে অপরিণত সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন নাঈম।

রসুল স. আরো ঘোষণা করেছেন, আমি তখনো নবী ছিলাম, যখন আদম ছিলেন দেহাবয়ব ও আত্মার মাঝামাঝি। হজরত মায়সারা থেকে বিশুদ্ধসূত্রে আবীল জাআদের মাধ্যমে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে সাআদ। আর হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন তিবরানী।

এরপর বলা হয়েছে— 'শ্রেষ্ঠ কে— আল্লাহ্, না তারা যাদেরকে শরীক করে তারা'? আলোচ্য বাক্যের সংযোগ রয়েছে ইতোপূর্বে উল্লেখিত 'ইন্নাল্লাজীনা লা ইউমিনূন বিল আখিরাতি..... হুমুল আকছারুন' এর সঙ্গে। অর্থাৎ আলোচ্য প্রশ্নাকারে একত্রিত করা হয়েছে অংশীবাদীদের নির্বুদ্ধিতাকে। বলা হয়েছে একথা যে, যে আল্লাহ্ তাঁর মনোনীত দাসগণকে সম্মানিত করেন এবং তাদের অরিকুলকে ধ্বংস করে দিয়ে যুগেযুগে সত্যের মহিমাকে সমুন্নত রাখেন, সেই আল্লাহ্ই সর্বশক্তির। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং ইবাদত করতে হবে কেবল তাঁর। অন্য কারো বা অন্য কোনোকিছুর নয়। আর একথাও নিশ্চিত যে, যারা অংশীবাদী, তারা নির্বোধতম।

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ اَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ
فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ؕ
ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ﴿٦٠﴾ اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّ
جَعَلَ خِلٰلَهَاۤ اَنْهٰرًا وَّ جَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَ جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ
حَاجِزًا ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾ اَمَّنْ يُّجِيْبُ
الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ
الْاَرْضِ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٢﴾ اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِيْ
ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَيْ
رَحْمَتِهٖ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٣﴾ اَمَّنْ يَّبْدَؤُا
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ ؕ ءَاِلٰهٌ
مَّعَ اللّٰهِ ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٦٤﴾

r অথবা তিনি, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ হইতে তোমাদিগের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি; অতঃপর উহা দ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করেন, উহার বৃক্ষাদি উদগত করিবার ক্ষমতা তোমাদিগের নাই। আল্লাহের সহিত অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? তবুও উহারা এমন এক সম্প্রদায় যাহারা সত্য বিচ্যুত হয়।

r কিংবা তিনি, যিনি পৃথিবীকে করিয়াছেন বাসোপযোগী এবং উহার মাঝে মাঝে প্রবাহিত করিয়াছেন নদী-নালা এবং উহাতে স্থাপন করিয়াছেন সুদৃঢ় পর্বত ও দুই দরিয়ার মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন অন্তরায়; আল্লাহের সহিত অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? তবুও উহাদিগের অনেকেই উহা জানে না।

r অথবা তিনি, যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন যখন সে তাঁহাকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন। আল্লাহের সহিত অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? তোমরা উপদেশ অতি সামান্যই গ্রহণ করিয়া থাক।

r কিংবা তিনি, যিনি তেমাদিগকে জলে ও স্থলে অন্ধকারে পথ প্রদর্শন করেন এবং যিনি স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন। আল্লাহের সহিত অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? উহারা যাহাকে শরীক করে আল্লাহ্ তাহা হইতে বহু ঊর্ধ্বে।

r অথবা তিনি, যিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর উহাকে পুনরায় সৃষ্টি করিবেন, এবং যিনি তোমাদিগকে আকাশ ও পৃথিবী হইতে জীবনোপকরণ দান করেন। আল্লাহের সহিত অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? বল, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদিগের প্রমাণ পেশ কর।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'অথবা তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী?' এখানে 'আম্' (অথবা) হচ্ছে সংযোজক অব্যয়। আর সংযোজ্য বাক্যটি এখানে রয়েছে প্রচ্ছন্ন। ওই প্রচ্ছন্ন বাক্যসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায় এরকম— বলো, সৃজনে অক্ষম তোমাদের বাতিল উপাস্যগুলোই উত্তম, না উত্তম মহাসৃজয়িতা আল্লাহ্, যিনি সৃজন করেছেন গগনমণ্ডল ও মেদিনী? কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, এখানকার 'আম' অর্থ 'বাল' (বরং)। কারণ একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, সকল কল্যাণ সমুদ্ভূত হয় আল্লাহ্ থেকে। পৌত্তলিকদের উপাস্যরা সম্পূর্ণরূপে কল্যাণবিচ্যুত। সুতরাং সৃজনকর্মের ব্যাপারে প্রশ্নাকারে আল্লাহ্র সঙ্গে পৌত্তলিকদের প্রতিমাগুলোকে সমান্তরাল করা নিতান্তই অশোভন। সেকারণেই পূর্ববর্তী আয়াতের প্রশ্নটির সঙ্গে আলোচ্য আয়াতটিকে পৃথক করা হয়েছে। সুতরাং বুঝতে হবে আলোচ্য বাক্যের প্রশ্নটি স্বীকৃতিসূচক ও দার্ঢ্য অর্থ প্রকাশক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যিনি গগন-ভূবনের সৃজয়িতা, তিনিই সর্বোত্তম।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি, অতঃপর তা দ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করেন, তার বৃক্ষাদি উদ্গত করবার ক্ষমতা তোমাদের নেই'। 'হাদাইক্ব' হচ্ছে 'হাদিক্বাতুন' এর বহুবচন। এখানে শব্দটির অর্থ উদ্যানসমূহ। ফাররা বলেছেন, 'হাদিক্বাহ্' বলে প্রাচীর বেষ্টিত বাগানকে। বায়যাবী বলেছেন, 'হাদিক্বাহ্' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'ইহ্দাক্ব' থেকে। এর অর্থ পরিবেষ্টিত।

‘জাতা বাহজাত’ অর্থ মনোরম, মনোহর, নয়নাভিরাম, অনিন্দ্যসুন্দর। ‘ফাআমবাতনাহু’ অর্থ আমিই উদগত করেছি। কথাটির মধ্যে রয়েছে সৃজনতত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত। এতক্ষণ ধরে বক্তব্যটি উপস্থাপন করা হয়েছে প্রশ্নাকারে উত্তমপুরুষে সে বা তিনি। এক্ষণে পুরুষান্তর ঘটিয়ে সরাসরি বলা হয়েছে ‘আমি’। অর্থাৎ আমিই বারিবর্ষণের মাধ্যমে সৃষ্টি করি নয়নাভিরাম কানন। বক্তব্যকে এভাবে তীক্ষ্ণিকৃত করার উদ্দেশ্য শ্রোতৃবর্গকে সচকিত ও সজাগ করা, যাতে তারা বুঝতে পারে, প্রতিটি উদ্ভিদের জন্মায়ন ও প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়া এক হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রকাশ ও বিকাশ বিভিন্ন প্রকৃতির। এভাবে সকল বৃক্ষের সমাবেশ ঘটিয়ে শ্যামল ও মনোমুগ্ধকর উদ্যান সৃষ্টি করা এক আল্লাহ্ ছাড়া আর করো পক্ষে কি সম্ভব? কখনোই নয়। অতএব হে মানুষ! স্বীকার করো, সৃজন সম্পূর্ণই আল্লাহ্র। অন্য কারো নয়।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহ আছে কি? তবু তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্যবিচ্যুত হয়’। একথার অর্থ— আল্লাহ্ যে সকলের ও সকলকিছুর একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী সৃজয়িতা ও পালয়িতা, সে কারণে একমাত্র সমকক্ষহীন উপাস্য, এই চিরন্তন সত্যটির বিকল্প তো কিছু নেই। অথচ উন্নাসিক ও অপবিত্র অংশীবাদীরা তাদের উপাসনা নিবেদন করে অপাত্রে। এভাবে হয়ে যায় বিভ্রান্ত, সত্যবিচ্যুত। এখানে ‘এমন এক সম্প্রদায়’ অর্থ মক্কার মুশরিকেরা।

পরের আয়াতে (৬১) বলা হয়েছে— ‘কিংবা তিনি, যিনি পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং এর মাঝে প্রবাহিত করেছেন নদী-নালা এবং এতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত ও দুই দরিয়ার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায়।’

এখানে ‘জ্বাআ’লাল আরদ্বা ক্বারারা’ অর্থ ভূপৃষ্ঠের কিছু অংশের পানি সরিয়ে দিয়ে সেই স্থানের মৃত্তিকাকে করেছেন মানুষের বাসোপযোগী। ‘ওয়াজ্বাআ’লা খিলালাহা আনহারা’ অর্থ ওই মৃত্তিকাখণ্ডে প্রবাহিত করে দিয়েছেন অসংখ্য জলবতী নদী। ‘ওয়া জ্বআ’লালাহা রাওয়াসিয়া’ অর্থ তার উপরে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত, যেনো ভূপৃষ্ঠ থাকে অচঞ্চল, সুস্থির। সেগুলো আবার করেছেন নদ-নদীর উৎস।

‘বাহরাইন’ অর্থ দুই দরিয়া বা দু’টি সাগর—একটি লবনাক্ত, আর একটি সুপেয়। ‘হাজ্বিয’ অর্থ অন্তরায়। অর্থাৎ ওই দুই সাগরের মধ্যে আবার সৃষ্টি করেছেন বাধা, প্রতিবন্ধকতা।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহ্ আছে কি? তবুও তাদের অনেকেই তা জানে না’। একথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালার এতোকিছু

নিদর্শন সতত দৃষ্টিগোচর হওয়া সত্ত্বেও একথা কি কেউ ভাবতে পারে যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্যের অস্তিত্ব আছে? অথচ অবিশ্বাসীরা কতো নিশ্চিন্ত, নির্লিপ্ত, উদাসীন। মোহাবিষ্ট অংশীবাদীদের অনেকে এই সরল রহস্যটি সম্পর্কে জানেই না। আবার জানিয়ে দিলেও মানতে চায় না।

এরপরের আয়াতে (৬২) বলা হয়েছে— 'অথবা তিনি, যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন'। একথার অর্থ— অথবা তিনি, যিনি আর্তের ডাক শোনেন ও পরিত্রাণার্থে সাড়া দেন, দূর করে দেন তাদের অসহায়ত্ব ও উপায়বিহীনতাকে। এভাবে উদ্ধার করেন বিপদকবলিত অবস্থা থেকে। এখানে 'দুররূন' অর্থ আর্ত, বিপদগ্রস্ত, আশ্রয়ার্থী, যারা নিরূপায় হয়ে আল্লাহ্র সকাশে পরিত্রাণ যাচ্না করে। এখানকার 'আলমুদ্বত্বররা' এর 'আলিফ লাম' (আল) জাতিবাচক। এর অর্থ সকল আর্ত জনগোষ্ঠী। 'ইজা দাআ'হু' অর্থ সাড়া দেন, অনুগ্রহ করে গ্রহণ করেন পরিত্রাণের প্রার্থনা।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন'। একথার অর্থ— এবং পৃথিবীতে তোমাদের উত্তরসূরীদেরকে করেন তোমাদের পূর্বসূরীদের স্থলাভিষিক্ত, এভাবে পৃথিবীতে তোমাদের বসবাসের অধিকার নিশ্চিত হয় প্রজন্মপরম্পরায়। কেউ কেউ কথাটির অর্থ করেছেন— তিনিই জ্বিন জাতির পরে তোমাদেরকে দান করেন পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব। আমি বলি, কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— তিনি তোমাদের মধ্যের কিছুসংখ্যককে করেন তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি। কথাটিতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে 'নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি প্রেরণ করবো' আয়াতের মর্ম।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহ্ আছে কি? তোমরা উপদেশ অতি সামান্যই গ্রহণ করে থাকো'। একথার অর্থ— তাহলে বলো, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্যের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব কি? অবশ্যই নয়। কিন্তু তোমরা এমনই অগভীর চিন্তা-চেতনা ও অসুন্দর মন মানসিকতা সম্পন্ন যে, এই মহাসত্যের স্বরূপ উদঘাটনে মনোনিবেশই করতে চাও না। কিছুতেই গ্রহণ করতে চাওনা কল্যাণকর উপদেশ। এখানে 'ক্বলীলাম মা' এর 'মা' অব্যয়টির অর্থ— অতি সামান্য, যৎকিঞ্চিত, অত্যল্প। অর্থাৎ একেবারেই না। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমাদের সত্য গ্রহণের যোগ্যতা এতো কম যে, তা মূলতঃ কল্যাণ বিবর্জিত।

এরপরের আয়াতে (৬৩) বলা হয়েছে— 'কিংবা তিনি, যিনি তোমাদেরকে জলে ও স্থলে অন্ধকারে পথ প্রদর্শন করেন এবং যিনি স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে

সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন। আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহ্ আছে কি?' একথার অর্থ— কিংবা ধরো, জলে ও স্থলের ঘোর অন্ধকার রজনীতে অথবা ঘন তমসাসদৃশ বিভিন্ন প্রকার বিপদ-আপদে তোমাদেরকে নির্দেশনা দানকারী নক্ষত্রের মাধ্যমে অথবা অন্যবিধ উপায়ে পথের সন্ধান জানান অথবা তোমাদেরকে উদ্ধার করেন কে? কে সৃষ্টির প্রতি অপার মমতাবশে প্রেরণ করেন সুমন্দ মলয়? তিনিই কি সেই মহাসৃজয়িতা ও মহাপালয়িতা এক ও অবিভাজ্য আল্লাহ্ নন? তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্যের অস্তিত্ব কি আদৌ সম্ভব? নিশ্চয় নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ্ তা থেকে বহু ঊর্ধ্বে'। একথার অর্থ— অংশীবাদীদের অংশীবাদিতার ভিত্তিহীন ও অপবিত্র ধারণা থেকে মহান আল্লাহ্ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, সতত বিমুক্ত।

এরপরের আয়াতে (৬৪) বলা হয়েছে— 'অথবা তিনি, যিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবং যিনি তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী থেকে জীবনোপকরণ দান করেন। আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহ্ আছে কি?' একথার অর্থ— কিংবা মনে করো তোমাদের নিজেদের ও সকল সৃষ্টির অস্তিত্বের কথা। তোমরা তো অস্তিত্বপ্রাপ্তির পূর্বে কিছুই ছিলে না। তোমাদের সকলের এবং সকলকিছুর অস্তিত্ব তো দিয়েছেন তিনিই। আকাশ ও পৃথিবী থেকে বিভিন্নভাবে জীবনোপকরণ সরবরাহ করেন তিনিই। আবার তিনিই তোমাদের অস্তিত্বকে করে চলেছেন পরিপুষ্ট ও পরিণতিমুখী। এভাবে এক সময় তোমাদের সকলকে গ্রহণ করতে হবে মৃত্যুর স্বাদ। তারপর এক সময় ঘটাবেন তোমাদের পুনরুত্থান। আর পুনরুত্থানের বিষয়টিও সুনিশ্চিত। কারণ প্রথমবারের সৃষ্টি দ্বিতীয়বারের সৃষ্টি অপেক্ষা নিশ্চয় সহজ। তবে এবার বলো, এমতো সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর মহাসৃজক ও মহাপালক ব্যতিরেকে অন্য কোনো উপাস্য থাকা কি সম্ভব? নিশ্চয় নয়।

উল্লেখ্য, মানুষের জীবনোপকরণ সৃষ্টিতে রয়েছে আকাশ ও পৃথিবী উভয়ের অংশগ্রহণ। যেমন আকাশের সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্র-মেঘমালা এবং পৃথিবীর মৃত্তিকা-সলিল-সমীরণ। শস্য উৎপাদনের সফল প্রক্রিয়ায় এগুলোর প্রত্যেকের রয়েছে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ অংশগ্রহণ। তাই এখানে বলা হয়েছে 'যিনি তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী থেকে জীবনোপকরণ দান করেন'।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ করো'। এখানে 'হাতু বুরহানাকুম' অর্থ প্রমাণ পেশ করো। অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্যকে মানতে চাও, তবে তার স্বপক্ষে

উপস্থাপন করো তার সৃজনায়ন ও প্রতিপালনায়নের এমতো বিস্ময়কর আয়োজনের প্রমাণ। মহামূর্খ ও মহানির্বোধ তোমরা, তাই দিবালোকের চেয়ে অধিক স্পষ্ট এই বিশ্বাসটিকে গ্রহণ করতে চাওনা যে, মহাসৃষ্টির অস্তিত্বায়ন ও প্রতিপালনের ক্ষমতা, যোগ্যতা ও অধিকার সবকিছুই এককভাবে সংরক্ষণ করেন আল্লাহ্। কেবলই আল্লাহ্।

আল্লামা বাগবী লিখেছেন, একবার মক্কার মুশরিকেরা রসুল স. এর কাছে জানতে চাইলো, মোহাম্মদ! বলো, কিয়ামত কখন হবে? তাদের এমতো প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত।

সূরা নমল ঃ আয়াত ৬৫, ৬৬

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ؕ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٦٥﴾ بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ ۫ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْهَا ۫ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

r বল, 'আল্লাহ্ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেহই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং উহারা জানে না উহারা কখন পুনরুত্থিত হইবে।'

r 'পরলোক সম্পর্কে তো উহাদিগের জ্ঞান নিঃশেষ হইয়াছে; উহারা তো এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ বরং এ বিষয়ে উহারা অন্ধ।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বলো, আল্লাহ্ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না'। এখানে 'মান ফীস্ সামাওয়াতি' (আকাশমণ্ডলীর কেউ) এবং 'মান ফীল আরদ্বি' (পৃথিবীর কেউ) বলে বুঝানো হয়েছে যথাক্রমে ফেরেশতামণ্ডলীকে এবং জ্বিন ও মানুষকে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি মানুষকে জানিয়ে দিন— ফেরেশতা-জ্বিন-মানুষ কেউই জানে না অদৃশ্যের সংবাদ। এ বিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞান সংরক্ষণকারী কেবল আল্লাহ্। কারণ তিনিই একমাত্র আ'লীমুল গইব (অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা)। এখানে 'আল্লাহ্ ব্যতীত' কথাটির মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্তায়ালা আকাশমণ্ডলী পৃথিবী অর্থাৎ সৃষ্টির অন্তর্ভূত বা সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত কোনো সত্তা নন। তিনি স্থানাতীত, কালাতীত। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'ইল্লাল্লহ্' (আল্লাহ্ ব্যতীত) বাক্যটি বিকর্তিত। আবার কেউ কেউ বলেছেন মিলিত। উল্লেখ্য, আল্লাহ্পাক দয়া করে তাঁর প্রিয়ভাজন নবী-রসুল এবং আউলিয়াকে কোনো কোনো অদৃশ্যের সংবাদ জানান। তাই আল্লাহ্র পক্ষ

থেকে প্রাপ্ত হিসেবে তারা অদৃশ্যের সংবাদ জানেন, একথা বলাতে কোনো দোষ নেই, কিন্তু সাথে সাথে এ বিশ্বাসটিও রাখতে হবে যে, তারা কেউ সত্তাগতভাবে 'আ'লীমূল গইব' নন।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তারা জানে না তারা কখন পুনরুত্থিত হবে'। একথার অর্থ— মহাপ্রলয় ও মহা পুনরুত্থান অবধারিত। কিন্তু তার সঠিক দিনক্ষণ সম্পর্কে তিনি কাউকেই জানাননি। সুতরাং তিনি ছাড়া এ বিষয়ে কেউ কিছু জানে না।

পরের আয়াতে (৬৬) বলা হয়েছে— 'পরলোক সম্পর্কে তো তাদের জ্ঞান নিঃশেষ হয়েছে'। এখানকার 'ইদ্‌দারাকা' শব্দটির মূল রূপ ছিলো 'তাদারুক'। এর অর্থ সম্পূর্ণরূপে জানা। অর্থাৎ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা পরকালের ধারণা পুরোপুরি লাভ করেছে নবীগণের মাধ্যমে। অথবা মর্মার্থ দাঁড়াবে— পরকালে যখন তারা বিচারপর্ব চাক্ষুষ করবে, তখন পুরোপুরি উন্মিলীত হবে তাদের জ্ঞান চক্ষু পৃথিবীতে যা সম্ভব নয়। 'তাদারকাল ফাকিহাতু' অর্থ ফল পেকে গিয়েছে, পৌঁছে গিয়েছে পক্কাবস্থার শেষ পর্যায়ে। অর্থাৎ ইহকালেই বিশ্বাসীগণ লাভ করেছে পরকাল সম্বন্ধীয় জ্ঞান। অবিশ্বাসীরাও একথা শুনেছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা তো এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ'। একথার অর্থ— রসুল স. সর্বসমক্ষে সত্যবাদী বলে স্বীকৃত। অথচ মক্কার মুশরিকেরা তাঁর পরকাল সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সংবাদে বিশ্বাস করে না। রয়ে যায় দোদুল্যচিত্ত।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানকার 'বাল ইদরাক' কথাটি প্রশ্নবোধকরূপে বিবেচ্য। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— পরলোক সম্পর্কে কি তাদের জ্ঞান পূর্ণ হয়েছে? না, তা হয়নি। পুনরুত্থানের জ্ঞানও অর্জিত হয়নি তাদের। আর মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত চেষ্টা করলেও তারা এ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে পারবে না। কারণ বিষয়টি তাদের যোগ্যতাবহির্ভূত। এমতো ব্যাখ্যার পরিপোষকতা রয়েছে হজরত ইবনে আব্বাসের উচ্চারণরীতিতে। তিনি পাঠ করতেন 'বালিদ্‌দারকা'। অর্থাৎ তিনি 'বাল' (বরং) এর স্থলে পাঠ করতেন 'বালা' (হ্যাঁ)। আর তাঁর 'আদ্দারকা' এর 'হামযা' (আ) অর্থ— 'কি' হচ্ছে প্রশ্নবোধক অব্যয়, যা মিলিত অবস্থায় পঠিত হয় 'বালিদ্‌দারকা'। ক্বারী উবাই পাঠ করতেন 'আমতাদারকা'। আরববাসীরা প্রায়শঃ 'বাল' ও 'আম' শব্দ দু'টো একে অপরের স্থলে ব্যবহার করে থাকেন।

আলী ইবনে ঈসা এবং ইসহাকের মতে এখানে 'বাল' ব্যবহৃত হয়েছে 'লাও' (যদি) অর্থে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— পরকালে তাদের যা জানবার, তা যদি তারা ইহকালেই জেনে নিতে পারতো, তবে তারা এভাবে সন্দেহে পতিত হতো না।

শেষে বলা হয়েছে— 'বরং এ বিষয়ে তারা অন্ধ'। এখানকার 'আ'মূন' 'উমউয়ুন' এর বহুবচন। এর অর্থ দৃষ্টিবিবর্জিত, অন্ধ। আর মর্মার্থ— অন্তর্দৃষ্টিবিবর্জিত। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের শুরুতে আল্লাহ্তায়ালা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন অদৃশ্যের জ্ঞান আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নেই। তাঁর বক্তব্যের এই নেতিবাচকতা প্রলম্বিত ও বেগমান হয়েছে পরবর্তী বাক্যগুলোতে। অর্থাৎ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন পুনরুত্থান সম্পর্কে তাদের অনুভূতিই নেই। এরপর বক্তব্যকে প্রবাহিত করেছেন ভিন্নখাতে। সোজাসাপটা বলে দিয়েছেন— প্রমাণপঞ্জির মাধ্যমে তোমাদের অর্জিত হয়েছে কেবল এইটুকু তথ্য যে, পুনরুত্থান হবেই হবে। কিন্তু কখন হবে সে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নিঃশেষ, অকার্যকর। এরপর বক্তব্যকে আরো কিছুটা প্রলম্বিত করে বলেছেন, মহাপুনরুত্থানান্তে মহাবিচারের বিষয়টির দলিল প্রমাণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তারা এ বিষয়ে দোদুল্যচিত্ত, সন্দিগ্ধ, যেনো তাদের হাতে কোনো প্রমাণপঞ্জিই নেই। সবশেষে কঠোর ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন— যাদের বিশ্বাস এরকম ভঙ্গুর ও বিকৃত, তাদের হৃদয় অবশ্যই দৃষ্টিহীন, অন্ধ।

উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতদ্বয় প্রধানতঃ উপস্থাপিত হয়েছে অংশীবাদীদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু এর বক্তব্যভূত করা হয়েছে জ্বিন-ইনসান-ফেরেশতাসহ সমগ্র সৃষ্টিকে। কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেছেন, এখানে 'বাল' (বরং) শব্দটির দ্বারা তারা যে পুনরুত্থানপর্ব সম্পর্কে অনবগত সে কথা অস্বীকার করা হয়েছে। বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে বলা হয়েছে— হ্যাঁ, হ্যাঁ। পুনরুত্থানপর্ব সম্পর্কে তাদের জ্ঞান টনটনে। কোনো কোনো ভাষ্যকারের মতে এখানকার 'ইদরাক' অর্থ শেষ স্তরে উপনীতি। এরকম চূড়ান্ত উপনীতির অর্থ জ্ঞানলোপ পাওয়া। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আখেরাতের ব্যাপারে বিলোপ হয়ে গিয়েছে তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি।

সূরা নমল ঃ আয়াত ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫

وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا وَّ اٰبَآؤُنَآ اَئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ ﴿٦٧﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦٨﴾ قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٦٩﴾ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ لَا تَكُنْ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾ وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ

صٰدِقِيْنَ ﴿٧١﴾ قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ
تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ
اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾ وَ اِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ
صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٤﴾ وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِى السَّمَآءِ وَ
الْاَرْضِ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٥﴾

r সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, 'আমরা ও আমাদিগের পিতৃপুরুষেরা মৃত্তিকায় পর্যবসিত হইয়া গেলেও কি আমাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে?'

r 'আমাদিগকে তো এ বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করা হইতেছে, পূর্বে আমাদিগের পূর্ব পুরুষগণকেও এরূপ ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল। তাহা তো সে কালের উপকথা ব্যতীত আর কিছু নহে।'

r বল, 'পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ অপরাধীদিগের পরিণাম কী হইয়াছে।'

r উহাদিগের আচরণে তুমি দুঃখ করিও না এবং উহাদিগের ষড়যন্ত্রে মনঃক্ষুণ্ন হইও না।

r উহারা বলে 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এই শাস্তি কখন ঘটিবে;

r বল, 'তোমরা যে-বিষয়ে ত্বরান্বিত করিতে চাহিতেছ সম্ভবতঃ তাহার কিছু শীঘ্রই তোমাদিগের উপর আসিয়া পড়িবে।'

r নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।

r উহাদিগের অন্তর যাহা গোপন করে এবং উহারা যাহা প্রকাশ করে তাহা তোমার প্রতিপালক অবশ্যই জানেন।

r আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন রহস্য নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নহে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! দেখুন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা কতো নির্বোধ। তারা বলে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা মরে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। আমরাও মরার পর মিশে যাবো মাটিতে। এটাই তো নিয়ম। মাটিতে মিশে যাওয়ার পরেও কি কারো পুনরুত্থান হয়? আলোচ্য আয়াতের প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। অর্থাৎ এমতো প্রশ্নের মাধ্যমে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা পুনরুত্থানের ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছে।

পরের আয়াতে (৬৮) বলা হয়েছে— 'আমাদেরকে তো এ বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে, পূর্বে আমাদের পূর্ব পুরুষগণকেও এরূপ ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিলো। এতো সে কালের উপকথা ব্যতীত আর কিছু নয়'। পূর্ববর্তী আয়াতে দেখা যায় তারা পুনরুত্থানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। এই আয়াতে আবার দেখা যায়, তারা বিষয়টিকে বিদ্রূপের ছলে অভিহিত করেছে উপকথা বা কল্পকথা বলে। বলেছে, পুনরুত্থানের এই কল্পকাহিনীটি নতুন কিছু নয়। আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও পুনরুত্থানের কথা বলে ভয় দেখানো হয়েছিলো। এখন আবার আমাদেরকেও দেখানো হচ্ছে ভয়। কিন্তু হে মোহাম্মদ আমরা কী এতোই বোকা যে, কিস্‌সা-কাহিনী শুনে ভয় পেয়ে যাবো?

এর পরের আয়াতে (৬৯) বলা হয়েছে— 'বলো, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো এবং দেখো অপরাধীদের পরিণাম কী হয়েছে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি ওই পুনরুত্থান-অস্বীকারকারীদেরকে বলুন, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে দেখো, তোমাদের পূর্ববর্তী অবাধ্যদের ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ দেখে শিক্ষা গ্রহণ করো। সাবধান হও। নিশ্চিত জেনো, এভাবে ক্রমাগত সত্যের বিরোধিতা করলে কিন্তু তোমাদের উপরেও নেমে আসবে আল্লাহ্‌র গজব। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে হুমকি দেয়া হয়েছে রসুল স. এর বিরুদ্ধবাদীদেরকে। আর এখানে একই সঙ্গে এই ইঙ্গিতটিও নিহিত রয়েছে যে, যারা রসুল স. এর অনুগত বিশ্বাসী তারা নিরপরাধ।

এরপরের আয়াতে (৭০) বলা হয়েছে— 'তাদের আচরণে তুমি দুঃখ কোরো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে মনোঃক্ষুণ্ন হয়ো না'। এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অস্বীকৃতির কারণে আপনি মনোক্ষুণ্ন হবেন না। তারা যতো ষড়যন্ত্র করুক না কেনো, তাতে করে উদ্বিগ্নও হবেন না। অবশেষে বিজয়ী হবেন তো আপনিই। আর তারা হবে পরাভূত। বাগবী লিখেছেন, মক্কার পৌত্তলিকেরা বিভিন্নভাবে রসুল স.কে উত্যক্ত করতো। তিনি স. এতে করে ব্যথিত হতেন। তাই তাঁকে সান্ত্বনা প্রদানার্থেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

এরপরের আয়াতে (৭১) বলা হয়েছে— 'তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বলো, এই শাস্তি কখন ঘটবে'? একথার অর্থ— ওই পৌত্তলিকেরা রসুল স. এবং তাঁর প্রিয় সহচরবৃন্দকে লক্ষ্য করে বলে, বার বার তোমরা শাস্তির কথা বলো। অথচ দ্যাখো, আমরা তো নিরাপদেই রয়েছি। সুতরাং এরকম মিথ্যা দাবি আর করো না। তোমরা যদি সত্যবাদীই হয়ে থাকো, তবে বলো কখন আসবে তোমাদের কথিত শাস্তি'?

এর পরের আয়াতে (৭২) বলা হয়েছে— বলো, তোমরা যে বিষয়ে ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছো, সম্ভবতঃ তার কিছু শীঘ্রই তোমাদের উপর এসে পড়বে'। একথার

অর্থ— হে আমার রসুল! ওই সকল দুর্বিনীতদেরকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিন, যে শাস্তির আপতন তোমরা কামনা করছো, মনে হয় সে শাস্তির কিছু অংশ প্রকাশিত হবে খুব শিগগিরই। আর তখন তোমরা সে শাস্তিকে প্রতিহতও করতে পারবে না।

উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত শাস্তি হচ্ছে বদর যুদ্ধের শাস্তি। আল্লামা বায়যাবী লিখেছেন, 'আ'সা' (সম্ভবতঃ), 'লায়াল্লা' (আশা করা যায়), 'সাওফা' (অচিরেই) এই কথাগুলোর মাধ্যমে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে রাজা-বাদশাহ্‌রা। বাহ্যত অদৃঢ় মনে হলেও কথাগুলো দৃঢ় অঙ্গীকারজ্ঞাপক। অর্থাৎ তাদের এমতো ইঙ্গিতার্থক বচনের বাস্তবায়ন অপ্রতিরোধ্য। আত্মমর্যাদা প্রকাশার্থেই তারা ব্যবহার করে এতাদৃশ ইঙ্গিত। এভাবে তারা এই উদ্দেশ্যটিই ব্যক্ত করতে চায় যে, তাদের ইশারা ইঙ্গিতও প্রকাশ্য নির্দেশের মতো অবশ্যপালনীয়। আল্লাহ্‌পাক তাঁর প্রবল পরাক্রম ও মর্যাদাপ্রকাশার্থে এখানে ব্যবহার করেছেন এমতো বাচনভঙ্গি। সুতরাং এখানকার 'সম্ভবতঃ তার কিছু তোমাদের উপর এসে পড়বে' কথাটির অর্থ হবে, শীঘ্রই শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার এই সংবাদটির বাস্তবায়ন অমোঘ, অনিবার্য। আরো উল্লেখ্য, বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে শাস্তির হুমকি পরিবর্তিত হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাক তওবার কারণে, অথবা বিনা তওবায় কেবল অনুগ্রহে তাদেরকে মার্জনাও করতে পারেন। কিন্তু অবিশ্বাসীরা ক্ষমার অযোগ্য। ফেরাউন সম্পর্কে হজরত মুসা ও হজরত হারুন এই মর্মে নির্দেশিত হয়েছিলেন যে— 'তোমরা তার সঙ্গে কথা বোলো নম্র স্বরে, যেনো সে উপদেশ গ্রহণ করে ও ভয় করে'। কথাটি ছিলো তিরস্কার প্রকাশক। তাই দেখা গিয়েছিলো, ফেরাউন উপদেশ তো গ্রহণ করেইনি, ভীতও হয়নি।

এরপরের আয়াতে (৭৩) বলা হয়েছে— 'নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ'। একথার অর্থ— এটা সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ্ মানুষের প্রতি মহাঅনুকম্পাপরবশ। তাই তিনি বিশ্বাসীদের স্খলন ক্ষমা করে দেন এবং বিলম্বিত করেন অবিশ্বাসীদের প্রাপ্য শাস্তিকে। এভাবে তাদেরকে দান করেন তওবার দীর্ঘ অবকাশ। মক্কার মুশরিকদের উপর শাস্তি বিলম্বিত হচ্ছে তো একারণেই। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন মুকাতিল।

'কিন্তু তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ' অর্থ— আল্লাহ্‌র দয়া ও দানের যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ যে অত্যাবশ্যক, অধিকাংশ মানুষ এ বিষয়টি জানে না। জানলেও বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয় না। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তো সম্পূর্ণ অকৃতজ্ঞ। তারা আল্লাহ্‌র দয়ার পরিবর্তে কামনা করে তার শাস্তির। বিষয়টিকে আবার ত্বরান্বিতও করতে বলে।

এরপরের আয়াতে (৭৪) বলা হয়েছে— 'তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং তারা যা প্রকাশ করে তা তোমার প্রতিপালক অবশ্যই জানেন'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! জেনে রাখুন, আপনার শত্রুরা তাদের মনের গহন কোণে আপনার প্রতি যে গোপন দুরভিসন্ধি পালন করে এবং প্রকাশ্যে যে শত্রুতার প্রকাশ ঘটায় তার সকলকিছুই আল্লাহ্ জানেন। আর এগুলোর জন্য তিনি যথাসময়ে যথোপযুক্ত শাস্তি বিধান করবেন। সুতরাং তারা যেনো একথা মনে না করে যে, আল্লাহ্র কাছে তাদের গোপনীয়তা অজানা।

এরপরের আয়াতে (৭৫) বলা হয়েছে— 'আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোনো রহস্য নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই'। একথার অর্থ— আকাশ ও পৃথিবীর সকল গোপন বিষয়াবলী লিপিবদ্ধ রয়েছে সুরক্ষিত ফলকে বা লওহে মাহফুজে। এখানে 'গইবাত' অর্থ দর্শনাতীত বিষয়, গোপন রহস্যাবলী। এখানে অনুক্ত রয়েছে একটি বিশেষণের বিশেষ্য। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— নিঃশব্দ নির্দেশ বা অদৃশ্য সিদ্ধান্তসমূহ। আর 'কিতাবুম মুবীন' অর্থ সুস্পষ্ট কিতাব— লওহে মাহফুজ।

সূরা নমল ঃ আয়াত ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ
يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٧٦﴾ وَاِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٧﴾ اِنَّ رَبَّكَ
يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ﴿٧٨﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى
اللّٰهِ ؕ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ﴿٧٩﴾ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ
الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٨٠﴾ وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِى الْعُمْيِ عَنْ
ضَلٰلَتِهِمْ ؕ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٨١﴾ وَ
اِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۙ
اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٨٢﴾

q এই কুরআন বনি ইসরাঈল যে সব বিষয়ে মতভেদ করে তাহার অধিকাংশের বৃত্তান্ত তাহাদিগের নিকট বিবৃত করে।

q এবং নিশ্চয়ই ইহা বিশ্বাসীদিগের জন্য নির্দেশ ও দয়া।

q তোমার প্রতিপালক নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উহাদিগের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবেন। তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ।

q অতএব আল্লাহের উপর নির্ভর কর; তুমি তো স্পষ্ট সত্যে প্রতিষ্ঠিত।

q মৃত ব্যক্তিকে তুমি তোমার কথা শুনাইতে পারিবে না, বধিরকেও পারিবে না তোমার আহ্বান শুনাইতে যখন উহারা মুখ ফিরাইয়া লয়।

q তুমি অন্ধদিগকে উহাদিগের পথভ্রষ্টতা হইতে পথে আনিতে পারিবে না। যাহারা আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে শুধু তাহারাই তোমার কথা শুনিবে। কারণ তাহারা আত্মসমর্পণকারী।

q যখন ঘোষিত শাস্তি উহাদিগের নিকট আসিবে তখন আমি মৃত্তিকা-গর্ভ হইতে নির্গত করিব এক জীব যাহা মানুষের সহিত কথা বলিবে। বস্তুতঃ উহারা আমার নিদর্শনে চির অবিশ্বাসী।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এই কোরআন বনী ইসরাইল যে সব বিষয়ে মতভেদ করে, তার অধিকাংশের বৃত্তান্ত তাদের নিকট বিবৃত করে'। একথার অর্থ— বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের ধর্মগ্রন্থের বিধানাবলীর বিষয়ে ছিলো বহু মতবিরোধ। এই কোরআন সে সকল বিষয়কে প্রকটিত করেছে, সেই সঙ্গে দিয়েছে সেগুলোর অধিকাংশের সুষ্ঠু সমাধান।

পরের আয়াতে (৭৭) বলা হয়েছে— 'নিশ্চয় এটা বিশ্বাসীদের জন্য নির্দেশ ও দয়া'। একথার অর্থ— কোরআন দ্বারা উপকৃত হতে পারে কেবল বিশ্বাসবানেরা। সেকারণেই কোরআন হচ্ছে তাদের জন্য যথানির্দেশনা ও করুণা। কিন্তু অবিশ্বাসীদের জন্য কোরআন এরকম উপকারী নয়, সে অবিশ্বাসী গ্রন্থধারী হলেও।

এরপরের আয়াতে (৭৮) বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন। তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ'। একথার অর্থ— আল্লাহ্পাক তাঁর চিরন্তন বিধানানুসারে ইহুদীদের বিরোধিতার ব্যাপারে যথোপযুক্ত মীমাংসা অবশ্যই করবেন। আর এ ব্যাপারে তারা কিছু বলবার বা করবার অবকাশও পাবে না। এমতো মীমাংসার সুফল, কুফল এবং গুঢ় তত্ত্ব জানেন কেবল তিনিই। কারণ তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞ। এখানে 'ইয়াক্বদ্বী' অর্থ মীমাংসা করবেন। অর্থাৎ চূড়ান্ত মীমাংসা করবেন মহাবিচারের দিবসে। 'বাইনাহুম' অর্থ ধর্মীয় বিষয়ে তাদের পারস্পরিক মতানৈক্যের।

একটি সন্দেহ ঃ 'ইয়াক্বদ্বী' অর্থ মীমাংসা করবেন। কথাটি ধাত্যর্থে দ্ব্যর্থবোধক। আর 'ক্বদ্বা'ও 'হুকুম' সমার্থক। অথচ, আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে 'ইয়াক্বদ্বী বি হুকমিহী'। যেমন বলা যেতে পারে 'ইয়াহকুমু বিহুকমিহী'। আর এরকম শব্দ বিন্যাস রীতিবিরুদ্ধ।

সন্দেহের অপনোদন ঃ 'হুকুম' অর্থ 'মাহকুম' (আদিষ্ট বিষয়)। যেমন 'সমাধানযোগ্য' অর্থ, যার সমাধান দেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় যদি এখানকার 'হুকুম' কে বলা হয় কোরআন নির্দেশিত সমাধান, তবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ মীমাংসা করবেন কোরআনের সমাধানানুসারে। কথাটির মর্মার্থ এভাবে দাঁড় করালে রীতিবিরুদ্ধতার সন্দেহ আর থাকেই বা কোথায়?

এরপরের আয়াতে (৭৯) বলা হয়েছে— 'অতএব আল্লাহ্র উপর নির্ভর করো, তুমি তো স্পষ্ট সত্যে প্রতিষ্ঠিত'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আল্লাহ্র উপরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে আপনি আপনার অগ্রযাত্রাকে রাখুন সতত সচল। বিরুদ্ধাচারীদের পরওয়া করবেনই না। আপনি তো দিবালোক অপেক্ষা অধিক স্পষ্টরূপে সত্যাধিষ্ঠিত। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, সত্যাশ্রয়ীদের উচিত সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্নির্ভর হওয়া।

এরপরের আয়াতে (৮০) বলা হয়েছে— 'মৃতকে তুমি তোমার কথা শোনাতে পারবে না, বধিরকেও পারবে না তোমার আহ্বান শোনাতে, যখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের হৃদয় মৃত। আর তাদের শ্রবণেন্দ্রিয় সত্যোচ্চারণ শ্রবণের অযোগ্য। সুতরাং আপনি তাদের মরমে কোরআনের বাণী প্রবেশ করাবেন কীভাবে? কীভাবেই বা কোরআন আবৃত্তির দ্বারা তাদের শ্রুতিকে করবেন সচকিত? অধিকন্তু যদি তাদের বৈমুখ্য হয় অনড়?

একটি প্রশ্নঃ বধিরেরা তো কোনো কিছু শুনতেই পায় না, তারা মুখ ফিরিয়ে নিক, অথবা না নিক। তবু এখানে 'যখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়'— এমন বলা হলো কেনো?

উত্তর ঃ বক্তব্যকে অধিকতর গুরুত্ব ও দৃঢ়তা প্রদানার্থেই এখানে ব্যবহার করা হয়েছে এমতো বক্তব্য ভঙ্গি। কেউ কেউ বলেছেন, বধিরেরা বক্তার মুখোমুখি হলে তাদের ওষ্ঠ সঞ্চালন, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদির মাধ্যমে অনেককিছুই বুঝে নিতে পারে। কিন্তু মুখ ফিরিয়ে নিলে সেটুকুও বুঝবার অবকাশ থাকে না। তাই 'যখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়' কথাটির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে চরম বীতশ্রদ্ধা প্রকাশক অভিব্যক্তিকে। অর্থাৎ তারা সত্যের আমন্ত্রণের প্রতি চূড়ান্ত পর্যায়ের বীতস্পৃহ।

এরপরের আয়াতে (৮১) বলা হয়েছে— 'তুমি অন্ধদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে পথে আনতে পারবে না। যারা আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে শুধু তারাই তোমার কথা শুনবে। কারণ তারা আত্মসমর্পণকারী'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! অবিশ্বাসীদের হৃদয়চক্ষু অন্ধ। সুতরাং আপনি তাদেরকে কখনোই দেখাতে পারবেন না সত্যের স্বরূপ। আপনার কোরআনের আবৃত্তি দ্বারা উপকার গ্রহণ করতে পারবে কেবল তারা, যারা বিশ্বাসী, আত্মসমর্পিত। সত্যের স্বরূপ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ হয় কেবল তাদেরই। কারণ তারা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন।

এরপরের আয়াতে (৮২) বলা হয়েছে— 'যখন ঘোষিত শাস্তি তাদের নিকট আসবে তখন আমি মৃত্তিকাগর্ভ থেকে নির্গত করবো এক জীব, যা মানুষের সঙ্গে কথা বলবে'।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আলী বলেছেন, 'দাব্বাতুল আরদ্ব' বা মৃত্তিকাগর্ভ থেকে নির্গত ওই জীবটি হবে শ্মশ্রুবিশিষ্ট এবং পুচ্ছহীন। একথায় প্রতীয়মান হয় যে. ওই অদ্ভুত প্রাণীটি হবে মনুষ্যজাতীয়। কিন্তু অধিকাংশ ভাষ্যকারের মতে প্রাণীটি হবে চতুষ্পদ পশুজাতীয়। আবদ ইবনে হুমাইদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, প্রাণীটি হবে পশম ও রঙবেরঙের পালকাবৃত এবং চতুষ্পদ। অকস্মাৎ একদিন তার অভ্যুদয় ঘটবে হজযাত্রীদের পশ্চাৎ দিক থেকে। ইবনে জুরাইজের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু যোবায়ের বলেছেন, তার মাথা হবে ষাঁড়ের মাথার মতো। চোখ শকুনের মতো। শিঙ হবে বারোটি শিঙের সমান। আর তার বক্ষদেশ হবে সিংহের বক্ষদেশের মতো। রঙ নেকড়ের রঙের মতো। মস্তিষ্কের আকৃতি বিড়ালের মাথার মতো। লেজ মেষের লেজের মতো এবং পা হবে উটের পায়ের মতো। গ্রন্থিগুলোর মধ্যে থাকবে বারো হাতের ব্যবধান। তার নিকট থাকবে হজরত মুসার যষ্টি এবং হজরত সুলায়মানের অঙ্গুরীয়। ওই যষ্টির অগ্রভাগ দিয়ে সে বিশ্বাসীদের ললাটদেশে দাগ এঁকে দিবে। ফলে তাদের মুখাবয়ব হয়ে উঠবে সমুজ্জ্বল। আর হজরত সুলায়মানের আঙটি দিয়ে সে দাগ দিবে অবিশ্বাসীদের কপালে। ফলে তাদের চেহারা ধারণ করবে কৃষবর্ণ। হাটে বাজারে ক্রয়-বিক্রয় কালে তখন একে অপরকে সহজভাবে সম্বোধন করবে 'হে মুমিন! এটার দাম কতো' অথবা 'ওহে কাফের! কতো মূল্য এই জিনিসটির'? আবার সে মানুষকে 'জান্নাতী এবং জাহান্নামী' অভিধায়ও চিহ্নিত করে ফেলবে।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, দাব্বাতুল আরদ্বের সমাগম ঘটবে কোনো এক গিরিপথ দিয়ে। তিনি আরো বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমর জানিয়েছেন, দাব্বাতুল আরদ্ব আত্মপ্রকাশ করবে সাফা-মারওয়া

পাহাড়ের মধ্যবর্তী এক ফাটল থেকে। মেঘের মতো উঁচুতে থাকবে তার মাথা, আর পা চারটি থাকবে মৃত্তিকায় প্রোথিত। নামাজ পাঠকারীদের পাশ দিয়ে গমনকালে সে বলবে, ওহে নামাজী! নামাজের আর কী প্রয়োজন? এরপর সে চিহ্ন এঁকে দিবে তাদের ললাটে ও নাসিকায়।

হজরত আবু শুরাইহা আনসারী থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, মোট তিনবার অভ্যুদয় ঘটবে দাব্‌বাতুল আরদ্বের । একবার সে বের হবে ইয়েমেন থেকে। তার আবির্ভাবের সংবাদে শোরগোল পড়ে যাবে পল্লীর প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতেও। মক্কা পর্যন্তও পৌঁছে যাবে তার আত্মপ্রকাশের সংবাদ। শেষে সে উপনীত হবে মসজিদে হারামে। মসজিদের সমবেত জনতা হঠাৎ দেখতে পাবে তাকে। বর্ণনাকারী বলেন, রুকনে আসওয়াদ ও বাবে বনী মাখজুমের মধ্যবর্তী স্থানে দৃষ্টিগোচর হবে তার উপস্থিতি। সে দৃষ্টিপাত করবে প্রত্যেকের দিকে। কেউ কেউ ভয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি শুরু করে দিবে। আবার কেউ কেউ তার সম্মুখেই গ্রহণ করবে দৃঢ় অবস্থান। তারা ধরেই নিবে, আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রায় অবশ্যই কার্যকর হবে, পালিয়ে গেলেও। সুতরাং স্বস্থানে অনড় থাকাই শ্রেয়। দাব্‌বাতুল আরদ্ব তার মাথার ধূলি ঝাড়তে ঝাড়তে ওই সকল লোকের দিকে অগ্রসর হবে। তাদের মুখমণ্ডলে এঁকে দিবে বিশেষ চিহ্ন। ফলে তাদের মুখাবয়ব সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে আকাশের তারকার মতো। এরপর দ্রুত পথ চলতে শুরু করবে মৃত্তিকা বিদীর্ণ করে। কেউ তাকে এড়াতেও পারবে না, আবার পালাতেও পারবে না কেউ তার খপ্‌পর থেকে। তাকে দেখলেই লোকজন দাঁড়িয়ে নামাজ শুরু করে দিবে। তৃতীয়বার সে নিজেকে প্রকাশ করবে একদল নামাজীর পিছন দিক থেকে। বলবে, হে নামাজীরা! তোমরা এতক্ষণে নামাজ আদায় করছো। এই বলে সে এগিয়ে যাবে তাদের সম্মুখে এবং তাদের কপালে এঁকে দিবে সৌভাগ্যের রাজটিকা। এরপর থেকে মানুষের বসবাসে নেমে আসবে শান্তি ও সম্প্রীতি। তারা পরস্পরের প্রতি হবে একান্ত আন্তরিক। কিন্তু স্পষ্টরূপে চিহ্নিত হয়ে পড়বে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীরা। বিশ্বাসীরা সরাসরি সম্বোধিত হতে থাকবে 'মুমিন' বলে, আর অবিশ্বাসীদেরকে ডাকা হবে 'কাফের' বলে।

হজরত হুজায়ফা ইবনে ইয়ামিন বর্ণনা করেন, একবার রসুল স. এর সম্মুখে দাব্‌বাতুল আরদ্বের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হলে তিনি স. বললেন, তার আবির্ভাব ঘটবে মহিমান্বিত মসজিদ থেকে। নবী ঈসা তখন থাকবেন তাওয়াফরত অবস্থায়। তাঁর অসংখ্য অনুচরের পদভারে তখন প্রদীপশিখার মতো কাঁপতে থাকবে সেখানকার মাটি। ঠিক তখনই সাফা পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্ত বিদীর্ণ করে বের হয়ে আসবে সে। প্রথমে বের হবে তার মাথা। তারপর সমস্ত শরীর। দেখা

যাবে তার সারা শরীর পশম ও পালকে আচ্ছাদিত। কেউ তার অগ্রযাত্রা রোধ করতে পারবে না। পালাতেও পারবে না কেউ তার আওতা থেকে। জনতাকে সে চিহ্নিত করবে 'মুমিন' ও 'কাফের' এই দু'টি দলে। মুমিনদের মুখাকৃতি হবে নক্ষত্রসদৃশ উজ্জ্বল, আর কাফেরদের মুখমণ্ডল ধারণ করবে কৃষ্ণবর্ণ। আলো ও অন্ধকার ছড়িয়ে পড়বে তাদের দুই চোখের মধ্যস্থলের চিহ্নিত দাগ থেকে। কপালে লেখা থাকবে যথাক্রমে 'মুমিন' ও 'কাফের'। এরকম বর্ণনা করেছেন বাগবী এবং ইবনে জারীর। সহল ইবনে সালেহ বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. একবার দুই অথবা তিনবার উল্লেখ করলেন, হান্নাদের পার্বত্যপথটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্বত্যপথ। নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! কী কারণে ? তিনি স. বললেন, ওখান থেকে অভ্যুদয় ঘটবে দাব্বাতুল আরদ্বের। আত্মপ্রকাশের পরক্ষণে সে হুংকার ছাড়বে তিনটি। সে হুংকার শুনতে পাবে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সকলেই। তার মুখাকৃতি হবে মানুষের মতো। আর অবশিষ্ট দেহ হবে পাখির দেহের মতো। যাকে সে সামনে পাবে, তাকেই বলবে, মক্কাবাসীরা তাদের রসুল এবং কোরআনের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখতো না।

'যা মানুষের সঙ্গে কথা বলবে' অর্থ ওই অদ্ভুত প্রাণীটি মানুষের সঙ্গে খোলামেলা কথাবার্তা বলবে। সুদ্দী বলেছেন, সে বলবে, ইসলাম ব্যতীত অন্য সকল ধর্ম বাতিল। কেউ কেউ বলেছেন, সে কাউকে দেখে বলবে, এ লোক বিশ্বাসী, আবার কাউকে দেখে বলবে, এই লোকটি হচ্ছে অবিশ্বাসী। কেউ কেউ আবার বলেছেন, তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে পরবর্তী বাক্যে।

এরপর বলা হয়েছে— 'বস্তুতঃ উহারা আমার নিদর্শনে ছিলো অবিশ্বাসী'। মুকাতিল বলেছেন, সে কথা বলবে আরবী ভাষায়। আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে ঘোষণা করবে, অবশ্যই জনতা ছিলো আমার নিদর্শনে অপ্রত্যয়ী। অতীতের প্রসঙ্গ তুলে সে বলবে, মক্কাবাসীরা কোরআন ও কিয়ামতে আস্থা রাখতো না।

এখানকার 'আন্না' উচ্চারণরীতিটি কুফাবাসীদের। মুকাতিলের উক্তি এই উচ্চারণরীতিনির্ভর। আর যারা আলোচ্য বচনটিকে দাব্বার বচন বলে থাকেন, তাঁরাও উচ্চারণ করেন 'আন্নান্নাসা'। তবে জমহুরের উচ্চারণ হচ্ছে 'ইন্নান্নাসা'। এই উচ্চারণটিকে গ্রহণ করলে বলতে হয়, আলোচ্য উক্তিটি একটি পৃথক বাক্য। এমতাবস্থায় এর মর্মার্থ দাঁড়ায় দাব্বাতুল আরদ্বের আবির্ভাবের পূর্বে মানুষ আমার নিদর্শনের উপরে বিশ্বাস রাখতো না। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'নিদর্শন' অর্থ দাব্বাতুল আরদ্বের অভ্যুদয়ন, যা কিয়ামতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, দাব্বাতুল আরদ্বের অভ্যুদয় ঘটবে তখন, যখন বন্ধ হয়ে যাবে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের কার্যক্রম।

শায়েখ জালালউদ্দিন মাহাল্লী বলেছেন, দাব্বাতুল আরদ্বের আত্মপ্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যাবে সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎকাজের নিষেধের প্রক্রিয়া। ওই সময়ের পর থেকে কোনো কাফের আর ইমান আনবে না, যেমন আল্লাহ্তায়ালা একসময় হজরত নুহকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, যারা বিশ্বাসী হওয়ার কথা, তারা বিশ্বাসকে গ্রহণ করেছে, এরপর থেকে কোনো অবিশ্বাসী আর বিশ্বাসী হবে না। আমি বলি, বিষয়টির নিষ্পত্তি ঘটেছে বিভিন্ন হাদিস ও আছারের (সাহাবীবচনের) মাধ্যমে। যেমন রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, ছয়টি বিষয়ের প্রকাশ হওয়ার পূর্বে তোমরা যতো বেশী পারো পুণ্য কর্ম করে নিয়ো। ওই ছয়টি বিষয়ের মধ্যে রয়েছে— ধোঁয়া, দাজ্জাল, দাব্বাতুল আরদ্ব এবং পশ্চিম দিকের সূর্যোদয়।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর বলেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, মহাপ্রলয়ের প্রথম আগমনী সংকেত হচ্ছে পশ্চিম দিগন্তের সূর্যোদয়। তারপর বেলা বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে ঘটবে দাব্বাতুল আরদ্বের আবির্ভাব। এ দু'টোর মধ্যে একটির পরক্ষণেই ঘটবে অপরটি। মুসলিম। হজরত হুজায়ফা ইবনে আসাদ গিফারী বলেছেন, আমরা কয়েকজন মিলে মগ্ন ছিলাম মহাপ্রলয় সম্পর্কিত আলাপচারিতায়। সহসা সেখানে উপস্থিত হলেন রসুল স. স্বয়ং। তিনি স. বললেন, তোমরা কী নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছো? আমরা বললাম, কিয়ামত সম্পর্কে। তিনি স. বললেন, জেনে রেখো, মহাপ্রলয়ের প্রাক্কালে সংঘটিত হবে দশটি বিষয়। সে দশটি বিষয় হচ্ছে— ১. ধুম্রমেঘে আচ্ছাদিত হবে আকাশ ২. আবির্ভূত হবে দাজ্জাল ৩. দাব্বাতুল আরদ্ব ৪. মরিয়মতনয় ঈসা ৫. ইয়াজুজ মাজুজ ৬. সূর্য উঠবে পশ্চিম দিকে ৭. ধস নামবে পৃথিবীর তিনটি স্থানে— প্রাচ্যে, পাশ্চাত্যে ও আরব উপদ্বীপে ৮. ইয়েমেন থেকে উদগত হবে একটি অগ্নি, ওই অগ্নি সকলকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে হাশর প্রান্তরের দিকে ৯. বর্ণনান্তরে উল্লেখ— অগ্নি পরিদৃশ্যমান হবে ইডেনের একটি কূপে এবং ১০. অপর বর্ণনানুসারে— একজন দৃষ্টিহীনকে নিক্ষেপ করা হবে সমুদ্রবক্ষে। মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ওই সময় আত্মপ্রকাশ করবে দাব্বাহ। তার কাছে থাকবে রসুল মুসার লাঠি এবং নবী সুলায়মানের আঙটি। ওই লাঠির ছোঁয়ায় জ্যোতির্ময় হবে বিশ্বাসীদের বদন এবং অবিশ্বাসীদের মুখমণ্ডল হবে কৃষ্ণাভ। তখন মানুষ একে অপরকে সম্বোধন করবে 'হে বিশ্বাসী' 'হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী'— এভাবে। আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, হাকেম।

হজরত আবু উমামা বাহেলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দাব্বাতুল আরদ্ব আবির্ভূত হয়ে মানুষের নাসিকায় এঁকে দিবে বিশেষ চিহ্ন। এরপরেও তারা পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে কিছুকাল। পশুক্রয়কারী কাউকে যদি কেউ প্রশ্ন করে, কার নিকট থেকে ক্রয় করলে? সে উত্তর দিবে, একজন চিহ্নিত লোকের কাছ থেকে।

এরকমই দাঁড়াবে তখনকার অবস্থা। আহমদ। হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, দাব্‌বাতুল আরদ্ব সমুদ্ভূত হবে শুক্রবার রাতে। সে অগ্রসর হতে থাকবে মীনা প্রান্তরের দিকে। ইবনে আবী শায়বা, আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হাসান বসরী বলেছেন, রসুল মুসা একবার দাব্‌বাতুল আরদ্ব দর্শনের প্রার্থনা করলেন। তাঁর প্রার্থনানুসারে তিন দিন তিন রাত্রির জন্য অভ্যুদয় ঘটেছিলো দাব্‌বাতুল আরদ্বের। সে ছিলো ভয়ংকরদর্শন ও বিশাল বপুধারী। রসুল মুসা তার অপসারণের জন্য পুনঃ প্রার্থনা জানালেন। আল্লাহ্‌পাকও তাকে উঠিয়ে নিলেন।

আমি বলি, এ সকল হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, দাব্‌বাতুল আরদ্ব ওই সময় প্রকৃত বিশ্বাসী ও কপটাচারীদেরকে সুচিহ্নিত করবেন। সে কাউকে ‘জাহান্নামী’ বললে তার জাহান্নামবাস হয়ে পড়বে অনিবার্য। কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে যে, তাদের ওই জাহান্নামবাস চিরস্থায়ী হবে না। কারণ তাদেরকে ‘কাফের’ বলা হবে রূপক অর্থে, প্রকৃত অর্থে নয়। অর্থাৎ তারা হবে কাফেরতুল্য, পাপী। কিন্তু প্রকৃত কাফের তারা হবে না। কারণ মক্কা বিজয়ের পর থেকে কোনো প্রকৃত কাফের মক্কাবাসী হয়নি, হবেও না। সুতরাং কাফের ও ইমানদারের প্রার্থক্যকরণের কাজটি সেখানে ঘটবে না। ঘটবে অন্যত্র।

সূরা নমল ঃ আয়াত ৮৩, ৮৪, ৮৫

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُّكَذِّبُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿٨٣﴾ حَتّٰۤى اِذَا جَآءُوْ قَالَ اَكَذَّبْتُمْ بِاٰيٰتِيْ وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا اَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿٨٥﴾

r স্মরণ কর সেই দিনের কথা, যেই দিন আমি সমবেত করিব এক একটি দলকে সেই সমস্ত সম্প্রদায় হইতে যাহারা আমার নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করিত এবং উহাদিগকে বিন্যস্ত করা হইবে বিভিন্ন ব্যূহে।

r যখন উহারা সমাগত হইবে তখন আল্লাহ্ উহাদিগকে বলিবেন, ‘তোমরা কি আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলে, যদিও এ বিষয় তোমাদিগের জ্ঞানগম্য ছিল না? না তোমরা অন্য কিছু করিতেছিলে?

r সীমালংঘন হেতু উহাদিগের উপর ঘোষিত শাস্তি আসিয়া পড়িবে; ফলে উহারা বাক-শক্তি রহিত হইয়া পড়িবে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! মহাবিচারের দিবসের সেই ভয়াবহ দিবসের কথা স্মরণ করুন। তখন আমি সকল মানুষকে একত্র করবো। আর যারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করতো তাদেরকে আবদ্ধ করে রাখবো দলে দলে।

এখানে 'উম্মাত' অর্থ যুগ, বিভিন্ন যুগের নবীগণের উম্মত। উল্লেখ্য, ওই সময় সকল মানুষকে সমবেত করার পর আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত আদমকে বলবেন, তুমি তোমার বংশধরদের মধ্যে জাহান্নামীদেরকে পৃথক করে ফেলো। সুরা হজের তাফসীরে যথাস্থানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

'ইয়ুযাউন' অর্থ সংঘবদ্ধ করা হবে বিভিন্ন ব্যূহে। বায়যাবী লিখেছেন, একথার অর্থ তাদের সংখ্যা হবে অত্যধিক। আর বিভিন্ন ব্যূহে আবদ্ধ ওই সংঘবদ্ধ দলগুলি বিস্তৃত হয়ে পড়বে বহুদূর পর্যন্ত।

পরের আয়াতে (৮৪) বলা হয়েছে— 'যখন তারা সমাগত হবে তখন আল্লাহ্ তাদেরকে বলবেন, তোমরা কি আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিলে, যদিও এ বিষয়ে তোমাদের জ্ঞানগম্য ছিলো না? না তোমরা অন্য কিছু করেছিলে?' এ কথার অর্থ— তখন আল্লাহ্ তাদেরকে বলবেন, তোমরা আমার নিদর্শনাবলীর বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা মাত্রই করবে না, এরকম চূড়ান্ত সিদ্ধান্তই কি পৃথিবীতে নিয়েছিলে? যদি এতটুকুও ভাবতে, তবে প্রকৃত তত্ত্ব হতো তোমাদের জ্ঞানায়ত্ব। অথবা মর্মার্থ হবে— তোমরা সরাসরি অস্বীকার করে বসেছিলে আমার নিদর্শনরাজিকে, অথচ একটি বারের জন্য ভেবে দেখলে না, সেগুলো গ্রহণযোগ্য না গ্রহণযোগ্য নয়? এখানকার প্রশ্নটি তিরস্কারসূচক। 'না তোমরা অন্য কিছু করেছিলে' প্রশ্নটিতেও রয়েছে ধমকের সুর। আলোচ্য আয়াতের কিছু কথা রয়েছে অনুক্ত। ওই অনুক্ত বক্তব্যসহ আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— সেদিন তাদেরকে বলা হবে, ধরা যাক তোমরা আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি অসত্যারোপ করোনি। যদি তাই হয়, তবে প্রশ্ন করি, তাহলে তোমরা করেছিলেটা কী? বলো, কী করেছিলে? উল্লেখ্য, এভাবে প্রশ্ন করা হবে বলেই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা হয়ে যাবে নিরুত্তর। এরকমও বলতে পারবে না যে, আমরা ঠিক অসত্যারোপ করিনি, ভেবেছিলাম .... ভেবেছিলাম.....।

এরপরের আয়াতে (৮৫) বলা হয়েছে— 'সীমালংঘন হেতু তাদের উপর ঘোষিত শাস্তি এসে পড়বে, ফলে তারা বাকশক্তি রহিত হয়ে পড়বে'। এ কথার অর্থ— এরপর তাদের উপরে আপতিত হবে ঘোষিত শাস্তি। ফলে তারা তখন আর কোনো অনুযোগই উপস্থাপনের অবকাশ পাবে না। হয়ে যাবে নির্বাক। অর্থাৎ

অনুযোগ উত্থাপনের কোনো অবলম্বনই তাদের থাকবে না। অথবা কৈফিয়ত প্রদর্শনের কোনো অনুমতিই তারা তখন পাবে না। কেউ কেউ বলেছেন, তাদের মুখে তখন সিলমোহর করে দেয়া হবে। তাই তখন তাদের রসনা হয়ে যাবে রুদ্ধ। কেউ কেউ আবার বলেছেন, তখন শাস্তির ভয়াবহতা দর্শনে অনুযোগ উত্থাপনের কোনো খেয়ালই তাদের আর থাকবে না। অবশ্য প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটিই অধিকতর প্রাসঙ্গিক ও পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সূরা নমল ঃ আয়াত ৮৬, ৮৭

اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٨٦﴾ وَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَ كُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ﴿٨٧﴾

r উহারা কি অনুধাবন করে না যে, আমি রাত্রি সৃষ্টি করিয়াছি উহাদিগের বিশ্রামের জন্য এবং দিবসকে করিয়াছি আলোকজ্জ্বল। ইহাতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে।

r এবং যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে সেই দিন আল্লাহ্ যাহাদিগকে ভীতিগ্রস্ত করিতে চাহিবেন না, তাহারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলেই ভীত-বিহ্বল হইয়া পড়িবে এবং সকলেই তাঁহার নিকট আসিবে লাঞ্ছিত অবস্থায়।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— দিবস-বিভাবরীর চক্রাবর্তনের নিখুঁত নিয়মটির ব্যাপারে তারা চিন্তা-ভাবনা করে না কেনো? আঁধার রাতের বিশ্রাম এবং আলোকজ্জ্বল দিনের কর্মযোগ— এ সকলকিছুর সুযোগ তো করে দিয়েছি আমিই। নির্বোধ তারা। সেই সাথে অবিশ্বাসীও। তাই এ অনন্য নিদর্শনের মাধ্যমে ও নিয়মে পথের স্রষ্টার পরিচয় পায় না। অথচ বিশ্বাসীরা জ্ঞানবান। তাই তারাই কেবল এ অনন্য নিদর্শন দর্শনে অভিভূত হয় এবং সন্ধান পায় প্রকৃত সত্যের।

এখানে 'আলাম ইয়ারাও' অর্থ তারা কি দ্যাখে না? অর্থাৎ তারা কি এই বিস্ময়কর নিদর্শনটি অবলোকন করা সত্ত্বেও প্রকৃত তত্ত্ব অনুধাবন করে না? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এমতো অস্বীকৃতিজ্ঞাপকতা বা নেতিবাচকতা থেকে উৎপত্তি ঘটে ইতিবাচকতার। অর্থাৎ তারা দেখেছে ও অনুধাবন করেছে ঠিকই, কিন্তু তাকে গ্রহণ করেনি।

'জ্বাআলনা' অর্থ এখানে 'খলাক্বনা' (আমি সৃষ্টি করেছি)। 'লি ইয়াসকুনু' অর্থ যেনো বিশ্রাম গ্রহণ করে, ঢলে পড়ে সুপ্তির ক্রোড়ে। 'মুবসিরান' অর্থ আলোকোজ্জ্বল, পরিদৃশ্যমান। দিবস নিজে দ্যাখে না, দেখতে সাহায্য করে। দিবসের আলোকোজ্জ্বলতা বিকাশ ঘটায় দৃষ্টিশক্তির। সেকারণেই দিবসকে করা হয়েছে আলোকোজ্জ্বল। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— তারা কি অবগত নয়, আলো-আঁধারের এই আশ্চর্যজনক চক্রাবর্তনের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চয় কেউ করেন। তিনিই তো প্রকৃত কর্তা, সমগ্রসৃষ্টির অধিকর্তা, স্রষ্টা। তিনিই তো সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিধর ও মহাপরাক্রমশালী। তাঁর উপাসনার প্রতি পথপ্রদর্শনার্থে তিনিই তো নবী-রসুল প্রেরণের একক ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন, করতে পারেন। তিনিই তো নির্ধারণ করতে পারেন যথোপযুক্ত পুরস্কার ও তিরস্কার। জীবন-মৃত্যু-মৃত্যুপরবর্তী জীবন এ সকল কিছু তো সম্পূর্ণতই তাঁর অমোঘ নির্ধারণ। এ সকল বিষয়ই তো প্রমাণ করে যে, তিনিই সত্য এবং সত্য তাঁর প্রেরিত পুরুষগণ। এভাবে সত্য প্রমাণিত হওয়ার পরেও কি তা প্রত্যাখ্যানের অবকাশ থাকে? থাকে কি সত্যবিমুখতার পক্ষের কোনো অনুযোগ? নিশ্চয় নয়। সুতরাং সত্যের স্বীকৃতি প্রদান একটি অনিবার্য দায়িত্ব। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা এ দায়িত্ব পালনে পরান্মুখ। আর বিশ্বাসীরা দায়িত্বসচেতন। তাই তো এমতো নিদর্শন কেবল তাদের জন্যই উপকারপ্রদায়ক।

পরের আয়াতে (৮৭) বলা হয়েছে— 'এবং যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে, সেদিন আল্লাহ্ যাদেরকে ভীতিগ্রস্ত করতে চাইবেন না, তারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলেই ভীতি-বিহ্বল হয়ে পড়বে'।

একবার এক বেদুইন রসুল স. সকাশে নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! বলুন, শিংগা কী? তিনি স. বললেন, শিংগা একটি শিঙ, যাতে ফুঁ দেয়া হবে। আবু দাউদ, তিরমিজি। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি উত্তমসূত্রসম্বলিত। এরকম বর্ণনা এসেছে নাসাঈ, ইবনে হাব্বান ও হাকেমের মাধ্যমেও। হজরত ইবনে মাসউদ থেকেও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন মুসাদ্দাদ।

হজরত যায়েদ ইবনে আরকাম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি স্বস্তি পাই কীরূপে। যখন শিংগাধারী তার শিংগা নিয়ে নির্দেশপ্রাপ্তির জন্য অপেক্ষিত ও উৎকর্ণ। উপস্থিত সাহাবীগণ এমতো বক্তব্যে বিষণ্ন হয়ে পড়লেন। এরপর রসুল স. পাঠ করলেন— 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল' (আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তিনি উত্তম আশ্রয়স্থল)। এই হাদিসটিই আহমদ, হাকেম, বায়হাকী ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। তিরমিজি, হাকেম ও বায়হাকী হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে এবং আবু নাঈম হজরত জাবের থেকে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে সাঈদ ইবনে মনসুর ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, শিংগাধারী ইস্রাফিলের দক্ষিণে ও বামে অবস্থান করে যথাক্রমে জিবরাইল ও মীকাইল। কুরতুবী লিখেছেন, সকল নবী রসুলের ঐকমত্য এই যে, শিংগায় ফুৎকার দিবেন হজরত ইস্রাফিল।

আল্লাহ্‌তায়ালা ইচ্ছাময়, চিরমুক্ত ও চিরস্বাধীন অভিপ্রায়ধারী। সকলে এবং সকলকিছুই তাঁর অভিপ্রায়ভূত। আর মহাপুনরুত্থানের সময় তিনি কাউকে কাউকে মুক্ত রাখবেন ভীতিপ্রদ অবস্থা থেকে। আর অবশিষ্টদেরকে করবেন ভীত-সন্ত্রস্ত ও লাঞ্ছিত। তাই এখানে বলা হয়েছে— আল্লাহ্ যাদেরকে ভীতিগ্রস্ত করতে চাইবেন না, তারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলেই সেদিন হয়ে পড়বে ভীত-সন্ত্রস্ত। আর তাদেরকে বিচারের ময়দানে আনা হবে চরম অপদস্থ অবস্থায়। অর্থাৎ ভীতিমুক্ত থাকবেন ফেরেশতা ও পুণ্যবান মানুষ। আর ভীত ও অপমানিত হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও পাপীরা।

শিংগার ফুৎকারের সংখ্যা সম্পর্কে বিদ্বজ্জনেরা একমত হতে পারেননি। কেউ কেউ বলেছেন, প্রথম ফুৎকার শুনে সৃষ্টিকুল হয়ে পড়বে ভীত-সন্ত্রস্ত। দ্বিতীয় ফুৎকার শুনে তারা হারিয়ে ফেলবে জ্ঞান, এভাবেই ঢলে পড়বে মৃত্যুর কোলে। তৃতীয় ফুৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ঘটবে তাদের পুনরুত্থান। সকলেই পুনর্জীবিত হয়ে উঠে দাঁড়াবে আপনাপন সমাধিস্থলে। আর আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে প্রথম ফুৎকারের কথা। অপর এক আয়াতে মৃত্যুপ্রদায়ক ও পুনরুত্থানসংঘটক ফুৎকারের কথা বলা হয়েছে এভাবে— 'আর ফুৎকার দেয়া হবে শিংগায়। ফলে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সকলে হারিয়ে ফেলবে জ্ঞান। তবে আল্লাহ্ যার প্রতি ইচ্ছা করবেন (সে থাকবে সজ্ঞান)। অতঃপর ফুৎকার হবে দ্বিতীয়বার। তখন দেখা যাবে তারা দণ্ডায়মান অবস্থায়'। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন ইবনে আরাবী। আর তিনটি ফুৎকারের বিবরণ এসেছে হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসে। অচিরেই আমরা হাদিসটি উপস্থাপন করবো।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, একই সঙ্গে শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে দু'বার। তার মধ্যে অধিকতর বিভীষিকাপূর্ণ ফুৎকারটি হবে মৃত্যুপ্রদায়ক ফুৎকার। তাঁদের ধারণা ফুৎকার হবে একটি, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া হবে দু'টি। কুরতুবী বলেছেন, সিদ্ধান্তটি যথার্থ। এর প্রমাণ হিসেবে তিনি বলেছেন, অতি বিভীষাকাপূর্ণ ফুৎকার থেকে পৃথক করা হয়েছে 'ইল্লা মা শাআল্লাহ্' (আল্লাহ্ যাদেরকে ভীতিগ্রস্ত করতে চাইবেন না) কথাটিকে। এতেকরে প্রমাণিত হয় যে, পৃথক পৃথক সময়ে ফুৎকার দেয়া হবে না। একই সঙ্গে ফুৎকার ধ্বনিত হবে দু'টি অথবা তিনটি।

আমি বলি, প্রমাণটি যথাযথ নয়। কারণ এতে করে একথা প্রমাণিত হয় না যে, দু'টি ফুৎকার পর্যবসিত হবে একটি ফুৎকারে। আবার বাক্য দুটির ব্যতিহার দু'টো এক, দুই নয়। তবে দু'টি স্থল থেকে পৃথক করার অর্থ আবার এমনও নয় যে, ব্যতিহার দু'টি একাকার।

বাগবী লিখেছেন, কারা এই ব্যতিক্রমের বৃত্তভূত হবেন, সে সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে রয়েছে মতদ্বৈধতা। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আল্লাহ্ সেদিন যাদেরকে ভীতিগ্রস্ত করতে চাইবেন না, তারা কারা? তিনি স. বললেন, শাহাদত বরণকারীরা, যেহেতু তারা আল্লাহ্‌র সন্নিধানধন্য চিরঞ্জীব। তাই ইসরাফিলের শিংগাধ্বনি তাদেরকে ভীতিগ্রস্ত করতে পারবে না। এ বিষয়ে কালাবী এবং মুকাতিলের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন বাগবী। একটু পরেই সে আলোচনা শুরু হবে। কিন্তু বাগবীর এখানকার এই বক্তব্যটির মাধ্যমে জানা গেলো, আতংকসঞ্চারক ও প্রাণ সংহারক ফুৎকার পৃথক পৃথক নয়, বরং একটি। তবে ফুৎকার যে আসলে দু'টি হবে, সে কথাও অস্বীকার করার জো নেই।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবু ইয়ালী, বায়হাকী ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এবং হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, একবার আমি ভ্রাতা জিবরাইলকে জিজ্ঞেস করলাম 'এবং যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন আল্লাহ্ যাদেরকে ভীতিগ্রস্ত করতে চাইবেন না, তারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলেই ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়বে' এই আয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করুন। তিনি বললেন, ভীতিগ্রস্ত হবে না বিদ্বানগণ ও শহীদগণ— তারা তখন আশ্রয় লাভ করবে ঝুলন্ত কৃপাণ বেষ্টিত আরশের। কারণ তারা পেয়েছে আল্লাহ্‌র সন্নিধানধন্য চিরন্তন জীবন। বিভিন্ন সাহাবীবচন থেকে বাগবী লিখেছেন, আল্লাহ্‌পাক স্বঅভিপ্রায়ে শহীদগণকে মুক্ত রাখবেন জ্ঞান বিলোপক শিংগা-হুংকার থেকে। সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে হান্নাদ ইবনে সাররা ও বায়হাকীও এরকম বর্ণনা করেছেন। আরো বর্ণনা করেছেন নুহাস তাঁর 'মানাযীলুল কোরআন' গ্রন্থে।

কালাবী ও মুকাতিল বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্‌পাক যাদেরকে সেদিন শিংগায় ভীতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখবেন, তাঁরা হচ্ছেন ত্রয়ী ফেরেশতা— জিবরাইল, আজরাইল ও ইসরাফিল। ফারইয়াবী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার এক সমাবেশে রসুল স. আলোচ্য আয়াত পাঠ করলেন 'ইল্লা মান শাআল্লাহ্' পর্যন্ত। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! ওই ভীতিবিমুক্ত কারা? তিনি স. বললেন, জিবরাইল, আজরাইল, মীকাইল, ইসরাফিল এবং আরশবাহী ফেরেশতারা। আল্লাহ্‌পাক যখন আত্মা আপন অধিকারভূত করবেন, তখন আজরাইলকে বলবেন, হে মৃত্যুদূত! আর কি কেউ অবশিষ্ট

রয়েছে? তিনি বলবেন, হে মহাবিশ্বের মহান অধিপতি, তুমি মহামঙ্গলময়। অবশিষ্ট রয়েছে কেবল মীকাইল, জিবরাইল ও আমি। আল্লাহ্ বলবেন, মীকাইলের প্রাণ বের করে নাও। আজরাইল নির্দেশ পালন করবেন। নিঃসাড় হয়ে পড়ে থাকবে মীকাইলের মরদেহ। আল্লাহ্ বলবেন, আর কে আছে? তিনি বলবেন, জিবরাইল ও আমি। আল্লাহ্ বলবেন, হে মৃত্যুদূত! তুমি মৃত হও। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করবে আজরাইল। তারপর আল্লাহ্ বলবেন, এবার? জিবরাইল বলবেন, আমি। আল্লাহ্ বলবেন, তোমারও নিস্তার নেই। সাথে সাথে সেজদাবনত হবেন জিবরাইল। কিছুক্ষণ ডানা ঝাপটাবার পর তিনিও হয়ে যাবেন মৃত লাশ। তিনি স. আরো বলেছেন, জিবরাইলের দেহাবয়বের তুলনায় মীকাইলের দেহ হবে বিশাল পর্বতের তুলনায় ছোট একটি টিলার মতো। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যাব্যপদেশে হজরত আনাস থেকে বায়হাকী উপস্থাপন করেছেন একটি সুপরিণত শ্রেণীর হাদিস। হাদিসটি এই— রসুল স. বলেছেন, ওই সময়ের আল্লাহ্র অভিপ্রায়াশ্রিত ভীতিমুক্ত ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন তিনজন— জিবরাইল, মীকাইল ও আজরাইল। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করবেন, হে আজরাইল! জানকবজ করা হয়নি এরকম কি কেউ বাকী আছে? আজরাইল বলবেন, হে আমার অবিনশ্বর, চিরঅক্ষয়, মহাকরুণাপরবশ আল্লাহ্! বাকী রয়েছে তোমার ত্রয়ী দাস জিবরাইল, মীকাইল ও আজরাইল। আল্লাহ্ বলবেন, মীকাইলের প্রাণ হরণ করো। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপালিত হবে নির্দেশ। আল্লাহ্ পুনরায় জিজ্ঞেস করবেন, আর বাকী রইলো ক'জন? আজরাইল বলবেন, তোমার নিরতিশয় নগণ্য দুই দাস— জিবরাইল ও আমি। আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা দু'জনেই মরে যাও। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ কার্যকর হবে। পড়ে থাকবে তাদের নিশ্চল মরদেহ। তখন আল্লাহ্ স্বগতঃ উক্তি করবেন, সৃজন আমার। ধ্বংসও আমার । পুনঃসৃজনও আমার। কোথায় আজ দর্প ও অহংকারের ধ্বজাধারীকুল। সব যে আজ মহানির্জনতা, মহা নিস্তব্ধতা। পুনরায় বলবেন, আজকার এ একচ্ছত্র রাজত্ব কার? জবাবহীন ওই মহামৌনতা ভেদ করে পুনরায় উচ্চারণ করবেন, চিরবিজয়ী, চিরঞ্জীব মহাসৃজয়িতার। এরপর শুরু হবে পুনরুত্থানপর্ব। শিংগায় ধ্বনিত হবে দ্বিতীয় মহানাদ। সর্ব প্রথম পুনরুত্থিত হবে জিবরাইল। তারপর অন্যেরা।

হজরত যায়েদ ইবনে আসলাম থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, মহাপ্রলয়কালীন ভয়ংকর শিংগাধ্বনি থেকে মুক্ত থাকবেন জিবরাইল, মীকাইল, ইসরাফিল, আজরাইল ও আরশ বহনকারী আটজন ফেরেশতা— এই বারো জন। বাগবী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে, প্রথমে জান কবজ করা হবে জিবরাইল ও মীকাইলের। তারপর আরশবাহক আটজন ফেরেশতার। তারপর ইসরাফিলের। শেষে আজরাইলের।

বাগবী আরো লিখেছেন, সকলের রূহ কবজ শেষ হলে রূহ কবজের নির্দেশ কার্যকর হবে আজরাইলের। আবু শায়েখ তাঁর কিতাবুল উজমা গ্রন্থে লিখেছেন, ওয়াহাব বলেছেন, আল্লাহ্পাক সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন জিবরাইল, মীকাইল, ইসরাফিল ও আজরাইল ফেরেশতা চতুষ্টয়কে। তাদের মৃত্যু ঘটাবেন সকলের শেষে। আবার প্রথমে পুনরুত্থিত হবে তারাই। সেকথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে 'ওয়াল মুদাববিরাতে আমরন' (কার্যনির্বাহী ফেরেশতা) এবং 'আলমুক্বাসসিমাতে আমরান'(কর্ম বণ্টনকারী ফেরেশতা) আয়াতদ্বয়ে। আল্লামা সুয়ূতি লিখেছেন, মহাপ্রলয়ের ভীতিউদ্রেককারী আওয়াজ থেকে পরিত্রাণ লাভকারীদের সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসগুলোর মধ্যে মূলতঃ কোনো বৈসাদৃশ্য নেই। হাদিসগুলোতে যাদের যাদের কথা বলা হয়েছে তারা সকলেই 'আল্লাহ্ যাকে ভীতিগ্রস্ত করতে চাইবেন না' কথাটির অন্তর্ভূত।

আমি বলি, শিংগাতে ফুৎকার দেওয়া হবে তিনবার। প্রথম আওয়াজে সকলে হয়ে পড়বে ভীত-সন্ত্রস্ত। দ্বিতীয় আওয়াজে ঘটবে সকলের মৃত্যু। আর শেষ আওয়াজে ঘটবে পুনরুত্থান। তারপর সকলে সমবেত হবে হাশর প্রান্তরে। অথবা শিংগা ধ্বনিত হবে দু'বার। প্রথম ধ্বনি শুনে মানুষ আতংকগ্রস্ত হয়ে বরণ করবে মৃত্যু। আর দ্বিতীয় ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ঘটবে সকলের পুনরুত্থান। এখন প্রশ্ন হচ্ছে— যাঁরা আতঙ্কগ্রস্ত হবেন না, তাঁরা কোন ফুৎকার ধ্বনির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট? মৃত্যু ধ্বনির সঙ্গে, না পুনরুত্থান ধ্বনির সঙ্গে? জবাবে বলা যেতে পারে, নিশ্চয়ই প্রথম ফুৎকার ধ্বনির সঙ্গে নয়। আর এটাও নিশ্চিত যে, ওই সৌভাগ্যশালীগণ হচ্ছেন পুণ্যবান বিশ্বাসী। যেমন এক আয়াতে ঘোষিত হয়েছে 'যারা পুণ্যসহ আগমন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে তদপেক্ষা উত্তম পরিণতি। অদ্যকার দিবসে তারা মহাত্রাস থেকে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। আর এক আয়াতে জানানো হয়েছে 'আমার পক্ষ থেকে যাদের জন্য প্রথম থেকে কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে, তারা দূরে থাকবে নরক থেকে, তার ক্ষীণতম আওয়াজও তারা শুনতে পাবে না, তারা তাদের মনের বাসনা অনুযায়ী জান্নাতে বসবাস করবে চিরকাল। মহাত্রাসের শব্দ তাদেরকে আতঙ্কগ্রস্ত করবে না। উল্লেখ্য, এ সকল আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, যারা দোজখ না দেখে সরাসরি বেহেশতেগমন করবে মহানিনাদে তারা এতটুকুও আতংকিত হবে না। আর মহানিনাদের সময় অবিশ্বাসীরা ছাড়া আর কেউই পৃথিবীতে থাকবে না।

রসুল স. বলেছেন, ধরাপৃষ্ঠে যখন 'আল্লাহ্' বলার কেউ থাকবে না, তখনই সংঘটিত হবে মহাপ্রলয়। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ ও মুসলিম। অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত আনাস থেকে আহমদ, মুসলিম ও তিরমিজি কর্তৃক। বলা হয়েছে, রসুল স. উল্লেখ করেছেন, পৃথিবীতে

'আল্লাহ্' উচ্চারণ করার কোনো লোক থাকবে না যখন, তখনই সংঘটিত হবে কিয়ামত। আবদুর রাজ্জাক তাঁর 'জামে' গ্রন্থে লিখেছেন, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন চালু থাকবে কাবা গৃহের হজ। হজরত ওমর থেকে মানজারী বর্ণনা করেছেন, যতদিন পর্যন্ত কোরআন ও কাবা উঠিয়ে না নেয়া হবে, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। এরকম হাদিস রয়েছে অনেক। একারণেই রসুল স. শহীদগণের আত্মাসমূহকে মহাত্রাসধ্বনির আতংক বহির্ভূত রেখেছেন। কেননা, তাঁরা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিশেষ ধরনের জীবনপ্রাপ্ত। উল্লেখ্য, নবীগণ ও বিশিষ্ট ফেরেশতাগণের আত্মাসমূহও মহাত্রাসধ্বনির আতংকবহির্ভূত।

ইবনে জারীরের তাফসীরে, তিবরানীর মুতাওয়ালাত 'গ্রন্থে, আবু ইয়ালীর মসনদে, বায়হাকীর 'আল বা'ছে', আবু মুসা মাদিনীর মুতাওয়ালাতে, আলী ইবনে মা'বাদের আত্ত্বয়াত ওয়াল ইস্ইয়ানে, আবু শায়েখের কিতাবুল আজমতে, হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবদ ইবনে হুমাইদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে একটি দীর্ঘ হাদিস। হাদিসটি এই— শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে তিনবার। প্রথম ফুৎকার ত্রাসসঞ্চারক, দ্বিতীয় ফুৎকার মৃত্যু প্রদায়ক এবং তৃতীয় ফুৎকার পুনরুত্থান সংঘটক। অবশ্য আল্লাহ্পাক কর্তৃক নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ মুক্ত থাকবে সেই মহাত্রাসের প্রভাব থেকে। অন্যেরা হবে মহাসন্ত্রাসের শিকার। ফলে স্তন্যদায়িনী মাতা ভুলে যাবে তার স্তন্যপানরত শিশুর কথা। অন্তঃসত্তা রমণীদের ঘটবে গর্ভপাত। শাদা হয়ে যাবে অপ্রাপ্তবয়স্কদের মাথার চুল। শয়তানেরা ভয়ে ছুটাছুটি করতে থাকবে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত। আর ফেরেশতারা বারবার চপেটাঘাত করতে থাকবে তাদেরকে। মানুষেরাও পলায়ন করতে থাকবে এদিকে ওদিকে। চিৎকার করে সাহায্য কামনা করতে থাকবে একে অপরের। আল্লাহ্পাক ওই দিনকেই বলেছেন 'ইয়াওমুত্তানাদ' (ডাকের দিন)। রসুল স. আরো জানিয়েছেন, কবরবাসীরা সেদিনের ভয়াবহতা সম্পর্কে কিছুই জানতে পারবে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! ওই সকল ব্যক্তি কারা, যাদেরকে আল্লাহ্ ভীতিগ্রস্ত করবেন না বলেছেন? তিনি স. বললেন, শহীদেরা। পৃথিবীর মানুষ সেদিন সকলেই হবে সন্ত্রস্ত। কিন্তু শহীদেরা সে সন্ত্রাসের কিছুই জানতে পারবে না। কেননা তারা আল্লাহ্র সন্নিধানে জীবিত। আর তারা জীবিকাও পেয়ে থাকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। শাস্তি আপতিত হবে কেবল নিকৃষ্টজনদের প্রতি। আল্লাহ্ তাই এরশাদ করেছেন 'হে মানবমণ্ডলী! ভয় করো তোমাদের প্রভুপ্রতিপালককে। অবশ্যই মহাপ্রলয়ের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার'। যতদিন আল্লাহ্ ইচ্ছা করবেন, ততদিন বিরাজ করবে ওই মহাআতঙ্ক। তারপর ধ্বনিত হবে শিংগার দ্বিতীয় ফুৎকার। ওই ফুৎকারে মৃত্যুমুখে পতিত হবে আকাশবাসী ও পৃথিবীবাসীরা। বেঁচে থাকবে কেবল তারা যাদেরকে আল্লাহ্

বাঁচিয়ে রাখবেন। মৃত্যুর ফেরেশতা বলবে, হে মহাবিশ্বের মহাঅধীশ্বর! সকলেই এখন মৃত, ব্যতিক্রম কেবল তারা, যাদেরকে তুমি কৃপা করেছো। হজরত আবু হোরায়রার এর পরের বর্ণনায় পরিবেশিত হয়েছে মহাসম্মানিত ফেরেশতা চতুষ্টয় ও আরশবাহক ফেরেশতাদের মৃত্যুর কথা, যেমন ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে।

একটি সন্দেহ ঃ শয়তান তো আকাশে থাকে না। আর সেদিন মহাসন্ত্রাসাক্রান্ত হবে কেবল মানুষ ও জ্বিন শয়তান। তাহলে আলোচ্য আয়াতে এরকম কেনো বলা হলো যে, আকাশবাসীরাও হবে মহাসন্ত্রাসের শিকার?

সন্দেহভঞ্জন ঃ আমার ধারণা, এরকম বলা হয়েছে কথার কথা হিসেবে। অর্থাৎ কথাটির অর্থ হবে— ধরা যাক শয়তান যদি আকাশেও অবস্থান গ্রহণ করে, তবুও সে সেখানে হবে মহাসন্ত্রাসাক্রান্ত। অথবা বলা যেতে পারে, অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানাহরণের জন্য তখন কিছু সংখ্যক শয়তান হয়তো আকাশচারী অবস্থায় থেকে যেতে পারে। কিংবা বলা যায়, আকাশ অর্থ এক্ষেত্রে মেঘপুঞ্জ। কেননা ঊর্ধ্বদেশের সকল কিছুকেই সাধারণতঃ আকাশ নামে অভিহিত করা হয়। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ফালইয়াম্‌দুদ্‌ বিসাবাবিন্‌ ইলাস্‌ সামায়ী' (তাদের উচিত ছাদ পর্যন্ত রশি টেনে নিক)। অথবা এরকমও হওয়া সম্ভব যে, এখানে 'মান্‌ফীস্‌ সামাওয়াত' অর্থ বিশ্বাসীগণের আত্মা। আর 'সাবাক্বাত মিনাল হুসনা' অর্থ নবী রসুল এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্যভাজনগণ।

সেদিনের সেই মহানাদ থেকে যারা মুক্ত থাকবেন, তাঁদের সম্পর্কে বিচক্ষণ ভাষ্যকারগণ বলেন, সাধারণভাবে 'সাআ'ক্ব' অর্থ অচৈতন্য ও মৃত্যু দু'টোই হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে, তখন পরলোকগতরা হয়ে পড়বে অচৈতন্য এবং জীবিতরা বরণ করবে মৃত্যু। আর ওই চেতনাহীনতা আরোপিত হবে অন্তরাল জগতের (আলমে বরজখের) সকল নবী-রসুলের প্রতিও। অবশ্য হজরত মুসা সেদিন চেতনা হারাবেন কিনা, সে বিষয়টি বির্তকাহত। কারণ তাঁর সম্পর্কে বোখারী, মুসলিম, তিরমিজি ও ইবনে মাজা কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, একদা এক ইহুদী বাজারে বলে বেড়াচ্ছিলো, আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি নবী মুসাকে মহিমান্বিত করেছেন সকলের উপর। জনৈক আনসারী সাহাবী একথা শুনেই তাকে চপেটাঘাত করলেন। বললেন, এতো বড় দুঃসাহস তোমার হলো কেমন করে, অথচ এখনো আমাদের মধ্যে রয়েছেন সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল। কথাটা কানে গেলো রসুল স. এর। তিনি স. বললেন, প্রথম শিংগার ফুৎকার ধ্বনিতে মহাত্রাস কবলিত হবে আকাশবাসী ও পৃথিবীবাসীরা। দ্বিতীয় ফুৎকার ধ্বনিতে ঘটবে সকলের পুনরুত্থান। সকলেই আপনাপন সমাধিতে

পুনরুত্থিত হয়ে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকাতে থাকবে এদিকে ওদিকে। আমিই পুনরুত্থিত হবো সর্বপ্রথমে। দেখতে পাবো, নবী মুসা দাঁড়িয়ে রয়েছেন আরশের পায়া ধরে। আমি বুঝতে পারবো না, তিনি কি আমার পূর্বেই চৈতন্যপ্রাপ্ত হয়েছেন, না আদৌ চৈতন্য হারাননি। মহাসন্ত্রাস বলতে যখন মৃত্যু ও চৈতন্যহীন দু'টোই বুঝায়, আর নবীগণও যখন অন্তরাল জগতে অচৈতন্য হয়ে পড়বেন, তখন শহীদগণ তো অচৈতন্য হয়ে পড়বেনই। ফেরেশতাদের অবস্থাও হবে তদ্রূপ। অবশ্য মহাসম্মানিত ফেরেশতা চতুষ্টয় এবং আরশবাহী ফেরেশতাদের মৃত্যু শিংগার ফুৎকারে হবে না। হবে অন্যভাবে, যেমন বলা হয়েছে ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদিসসমূহে।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং সকলেই তাঁর নিকট আসবে লাঞ্ছিত অবস্থায়'। একথার অর্থ— পুনরুত্থান সংঘটক শিংগাধ্বনি উচ্চারিত হওয়ার পর সকলেই আপন আপন সমাধিতে পুনর্জীবনপ্রাপ্ত হবে। তারপর সকলে সমবেত হবে হাশর প্রান্তরে। শুরু হবে মহাবিচারপর্ব। বিষয়টি অবধারিত, তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে সুনিশ্চিতার্থক অতীতকালবোধক 'আতাওহু'।

সূরা নমল ঃ আয়াত ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩

وَ تَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ؕ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْۤ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ؕ اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ﴿۸۸﴾ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ﴿۸۹﴾ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ ؕ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۹۰﴾ اِنَّمَاۤ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِيْ حَرَّمَهَا وَلَهٗ كُلُّ شَيْءٍ ۫ وَّ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿۹۱﴾ وَ اَنْ اَتْلُوَ الْقُرْاٰنَ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿۹۲﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۹۳﴾

r তুমি পর্বতমালা দেখিয়া অচল মনে করিতেছ কিন্তু সেই দিন উহারা হইবে মেঘপুঞ্জের মত সঞ্চরমান। ইহা আল্লাহেরই সৃষ্টি-নিপুণতা, যিনি সমস্ত কিছুকে করিয়াছেন সুষম। তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবগত।

r যে কেহ সৎকর্ম করিবে সে উৎকৃষ্টতর প্রতিফল পাইবে এবং সেই দিন উহারা শংকা হইতে নিরাপদ থাকিবে।

r যে কেহ মন্দকর্ম করিবে তাহাকে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হইবে অগ্নিতে এবং উহাদিগকে বলা হইবে 'তোমরা যাহা করিতে তাহারই প্রতিফল তোমরা ভোগ করিতেছ।'

r আমি তো আদিষ্ট হইয়াছি এই নগরীর রক্ষকের ইবাদত করিতে, যিনি ইহাকে করিয়াছেন সম্মানিত। সমস্ত কিছু তাঁহারই। আমি আরও আদিষ্ট হইয়াছি যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদিগের একজন হই।

r এবং আরও আদিষ্ট হইয়াছি কুরআন আবৃত্তি করিতে; অতএব যে ব্যক্তি সৎপথ অনুসরণ করে সে তাহা করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং কেহ ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করিলে তুমি বলিও 'আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী।'

r বল, 'প্রশংসা আল্লাহেরই, তিনি তোমাদিগকে দেখাইবেন তাঁহার নিদর্শন; তখন তোমরা উহা বুঝিতে পারিবে। তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নহেন।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তুমি পর্বতমালা দেখে অচল মনে করছো, কিন্তু সেই দিন তারা হবে মেঘপুঞ্জের মতো 'সঞ্চরমান'। একথার অর্থ— হে দর্শক! ওই মহাসন্ত্রাসের সময় তুমি পর্বতসমূহকে দেখে মনে হবে ওগুলো অচঞ্চল, অবিচল। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে, ওগুলো তখন হবে মেঘমালার মতো চলমান, সঞ্চরমান। অর্থাৎ ওগুলো দ্রুত ধাবমান হয়ে আছড়ে পড়বে ভূপৃষ্টে। উল্লেখ্য, সুবিশাল কোনোকিছুর দ্রুতধাবমানতা সাধারণতঃ অনুমানসাধ্য নয়। সেদিন শৈলশ্রেণীর ধাবনতাও তাই স্বাভাবিক দৃষ্টিতে ধরা পড়বে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটা আল্লাহ্র সৃষ্টিনিপুণতা। যিনি সমস্ত কিছুকে করেছেন সুষম। তোমরা যা করো, সে সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত'। একথার অর্থ— এ সকল কিছু হচ্ছে আল্লাহ্র সৃজন শৈলীর নিদর্শন, তিনিই তাঁর এই মহাসৃষ্টিকে করেছেন সুবিন্যস্ত, সুষম। আর তিনি তাঁর আনুগত্যপরায়ণ ও আনুগত্যবিমুখ দাসদের সকলকিছুই জানেন। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ। যথাসময়ে তিনি তাদেরকে যথোপযুক্ত বিনিময় প্রদান করবেনই। পরবর্তী আয়াতে (৮৯) কথাটি বলা হয়েছে আরো স্পষ্ট করে।

বলা হয়েছে— 'যে কেউ সৎকর্ম করবে, সে উৎকৃষ্টতর প্রতিফল পাবে'। মা'শার বর্ণনা করেছেন, ইব্রাহিম দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন, এখানে 'আল হাসানা' শব্দটির অর্থ— 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্'। কাতাদা বলেছেন, সুরা এখলাস। অথবা অনুপম আবরণ। কোনো কোনো আলেম অর্থ করেছেন— আনুগত্য।

'খইর' (উৎকৃষ্টতর) শব্দটি এখানে তারতম্যমূলক বিশেষণ নয়। আর 'মিনহা' এর 'মিন' (থেকে) অব্যয়টি হেতুবাচক। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়ায়— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র চেয়ে উৎকৃষ্টতর আর কিছু নেই। হতেও পারে না। সুতরাং বুঝতে হবে শব্দটি তারতম্যমূলক বিশেষণ নয়। বরং এটা বাস্তবসম্মত ভাবেই উত্তম, অতুলনীয়রূপে উৎকৃষ্ট। অর্থাৎ পুণ্যার্জন ও শাস্তি থেকে নিরাপত্তাপ্রাপ্তি লাভ হবে 'হাসানা' বা সৎকর্মের কারণে। আবার মোহাম্মদ ইবনে কা'ব এবং আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ বলেছেন, এখানকার 'মিন' অব্যয়টি তারতম্যমূলক, হেতুবাচক নয়। এমতাবস্থায় মর্মার্থ দাঁড়ায় সাতগুণ থেকে দশগুণ পর্যন্ত, আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায় হলে আরো অনেক গুণ। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'যে উত্তমকর্ম নিয়ে আসবে, তার জন্য থাকবে দশগুণ'।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং সেদিন তারা শংকা থেকে নিরাপদ থাকবে'। একথার অর্থ— সেই মহাসন্ত্রাসের দিবসেও তাদের কোনো ভয়-ভীতি থাকবে না। 'ফায্য়ীন' শব্দটি এখানে তানভীনযুক্ত অনির্দিষ্টবাচক, নিমজ্জনাত্মক সমষ্টিবাচকতাসম্পন্ন। আর 'আমীনূন' অর্থ— শংকাহীন ভয়-লেশশূন্য। যেহেতু শব্দটি অনির্দিষ্টবাচক হওয়ায় নিমজ্জনাত্মকতার অর্থবহ, তাই এর প্রকৃত অর্থ হবে— একেবারে ভয়-লেশশূন্য।

পরের আয়াতে (৯০) বলা হয়েছে— 'যে কেউ মন্দ করবে, তাকে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হবে অগ্নিতে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল তোমরা ভোগ করছো'। এখানে 'আস্সাইয়্যিআতু' অর্থ শিরিক। 'ফাকুব্‌রাত উজুহুহুম' অর্থ অধোমুখে। অর্থাৎ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে সেদিন অধোমুখে নিক্ষেপ করা হবে নরকাগ্নিতে।

'হাল তুজ্যাওনা' অর্থ তোমরা কি বিনিময় প্রাপ্ত নয়? শিরিক হচ্ছে সর্বনিকৃষ্ট পাপ। আর জাহান্নামবাস হচ্ছে সর্বোচ্চশাস্তি। তাই বলতে হয়, সর্বনিকৃষ্ট পাপীদেরকে সেদিন দেয়া হবে সর্বোচ্চ শাস্তি। অধোমুখে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামাগ্নিতে। তারা এমতো শাস্তিরই উপযোগী।

এরপরের আয়াতে (৯১) বলা হয়েছে— 'আমি তো আদিষ্ট হয়েছি এই নগরীর রক্ষকের ইবাদত করতে, যিনি একে করেছেন সম্মানিত। সমস্ত কিছু তাঁরই। আমি আরো আদিষ্ট হয়েছি যেনো আমি আত্মসমর্পণকারীদের একজন হই'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি মক্কাবাসীদেরকে বলুন, হে মক্কার জনতা! এই মহান নগরীকে যিনি মহাসম্মানিত করেছেন এবং যিনি একে করেছেন সুরক্ষিত, সেই পরম প্রভুপালকের ইবাদত করবার জন্যই তো আমি প্রত্যাদিষ্ট। সমস্ত কিছুই তাঁর। এই মহান নগরীরও তিনিই রক্ষাকর্তা। সেই অধিকর্তা ও রক্ষাকর্তার প্রতি সমর্পিত হওয়ার বিষয়েও আমি তো প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি।

এখানে 'হাজিহিল বালাদাতি' অর্থ এই নগরী। অর্থাৎ এই মক্কা নগরী। 'রব' অর্থ এখানে পালনকর্তা, রক্ষক। শব্দটিকে এভাবে এই নগরীর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে এখানে প্রকাশ করা হয়েছে মক্কাধামের অনন্য সাধারণ মর্যাদাকে। ইঙ্গিত করা হয়েছে এই বিষয়টির প্রতিও যে, এই শহর প্রতিনিয়ত স্নাত হয় আল্লাহ্‌র বিশেষ জ্যোতির সম্পাতে।

'আললাজী হাররমাহা' অর্থ যিনি একে করেছেন সম্মানিত। এখানে নিষিদ্ধ করেছেন উৎপীড়ন, শোণিতরঞ্জন, লুণ্ঠন। তাই এখানকার তৃণগুল্ম উৎপাটনও নিষিদ্ধ। এভাবে মক্কার কুরায়েশদেরকে একথাটিই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে— দ্যাখো, তোমাদের এই বসবাসকে আল্লাহ্‌তায়ালা করেছেন চিরনিরাপদ। সুতরাং তোমরা এর নিরাপত্তাপ্রদাতার নিকটে আত্মসমর্পণ করবে না কেনো? কেনো মেনে নিবে না তাঁর রসুল কর্তৃক আনীত পবিত্র ধর্মাদর্শকে?

'আল মুসলিমীন' অর্থ আত্মসমর্পণকারী, সমর্পিতপ্রাণ। এভাবে 'যেনো আমি আত্মসমর্পণকারীদের একজন হই' কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— এসো আমরা সকলে বিশ্বজগতের প্রভুপালক এবং এই মহান নগরীর রক্ষকের নির্দেশানুগত হয়ে যাই। হয়ে যাই ইসলামী মিল্লাতের একনিষ্ঠ ধারক, বাহক, সেবক ও প্রচারক।

এরপরের আয়াতে (৯২) বলা হয়েছে— 'এবং আরো আদিষ্ট হয়েছি কোরআন আবৃত্তি করতে'। একথার অর্থ— এই মর্মেও আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেনো মানুষকে কোরআন আবৃত্তি করে শোনাই। এখানে 'আতলু' অর্থ আবৃত্তি করি। অথবা শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'তিলবুন' থেকে। 'তিলবুন' শব্দটি ধাত্যর্থে পশ্চাদানুসরণ বা পশ্চাদানুগমন। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— এই মর্মে আমি আদিষ্ট যে, আমি যেনো হই কোরআনুসারী। বায়যাবী লিখেছেন, আল্লাহ্‌পাক মানবমণ্ডলীর সম্মুখে তুলে ধরেছেন পৃথিবী ও পরবর্তী

পৃথিবীর বাস্তবচিত্র। অতঃপর রসুলেপাক স. এর প্রতি আজ্ঞা করেছেন, হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি মানুষকে জানিয়ে দিন, সত্যপ্রচারের দায়িত্ব ভিন্ন অন্য কোনো দায়িত্ব আমার নেই। আমার মূল দায়িত্ব হচ্ছে ইবাদতেমগ্ন হওয়া এবং আমি আরো আদিষ্ট হয়েছি, কথাটির পূর্বে রয়েছে একটি উহ্য শব্দ 'কুল' (বলুন)। এভাবে পূর্ণ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! আপনি বলে দিন, আমি আরো আদিষ্ট হয়েছি নিবিষ্টচিত্ত ইবাদত করতে এবং কেবল তাঁর আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকতে।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতএব যে ব্যক্তি সৎপথ অনুসরণ করে, সে তা করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং কেউ ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করলে তুমি বোলো, আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! কারো পথপ্রাপ্তি ও পথভ্রষ্টতা নিশ্চিত করার দায়িত্ব আপনাকে দেয়া হয়নি। আপনি কারো জন্য জবাবদিহি করতেও বাধ্য নন। আপনার দায়িত্ব হচ্ছে শুভপথের সংবাদ প্রচার। এরপর যে আপনাকে বিশ্বাস করে আপনার আনুগত্যকে স্বীকার করবে, সে তো এরকম করবে তাঁর নিজের কল্যাণ নিশ্চিতার্থে। আর যে আপনাকে মানবে না, তাকে শুধু এতোটুকু জানিয়ে দিন যে— আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী।

শেষোক্ত আয়াতে (৯৩) বলা হয়েছে— 'বলো, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র' একথার অর্থ— হে আমার নবী! আপনি আরো বলে দিন, সত্য ধর্মপ্রচারের মহান দায়িত্ব যিনি আমাকে দিয়েছেন, যিনি আমাকে পরিচালিত করে চলেছেন, নিরবচ্ছিন্ন নিরাপত্তা সহকারে, সেই সুমহান আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা-প্রশস্তি-স্তবস্তুতি। আমি তাঁর প্রতি সতত কৃতজ্ঞ ও অনুগত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি তোমাদেরকে দেখাবেন তাঁর নিদর্শন'। এখানে নিদর্শন অর্থ— ইহজগতে প্রকাশিত মোজেজাসমূহ, যেমন চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, হস্তধৃত প্রস্তরকণার তসবীহ পাঠ, বদর যুদ্ধে প্রকাশিত অলৌকিকত্ব, দাব্বাতুল আরদ্বের আত্মপ্রকাশ ইত্যাদি। এরকম নিদর্শন প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে অন্য এক আয়াতেও। যেমন 'সত্বর আমি দেখাবো আমার নিদর্শনাবলী, সুতরাং ত্বরা কোরো না'। অথবা এখানে 'নিদর্শন' অর্থ পরকালের নিদর্শনসমূহ। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'সত্বর আমি প্রদর্শন করবো আমার জ্যোতির্ময় নিদর্শন তাদের বহির্জগতে ও সত্তায়'।

এরপর বলা হয়েছে— 'তখন তোমরা তা বুঝতে পারবে'। একথার অর্থ— যখন তোমরা আমার নিদর্শনরাজির প্রকৃত তত্ত্ব অনুধাবন করতে পারবে ঠিকই, কিন্তু সে উপলব্ধি তোমাদের কাজে আসবে না। কারণ তখন প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত ফলাফল।

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমরা যা করছো, সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় নবী! বিরুদ্ধবাদীদের অপআচরণের কারণে ব্যথিত হবেন না। তাদের উন্মাসিকতা, অবিমৃশ্যকারিতা ও সত্যপ্রত্যাখ্যান প্রবণতা সম্পর্কে আমি অনবগত নই। যথাসময়ে আমি তাদেরকে অবশ্যই প্রদান করবো যথোপযুক্ত শাস্তি।

সূরা ক্বসাস

৮৮ সংখ্যক আয়াত ও ৯ সংখ্যক রুকু সম্বলিত এই সুরা অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। তবে কেবল ৫২ থেকে ৫৫ আয়াত পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। আর ৮৫ সংখ্যক আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে হিজরতকালে জাহ্ফা নামক স্থানে। সুরা নমলের পরে অবতরণ ঘটেছে সুরা ক্বসাসের।

সূরা ক্বসাস ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ٥

طٰسٓمّٓ ۝١ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝٢ نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَ فِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝٣ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَ جَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَ يَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝٤ وَ نُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّ نَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ۝٥ وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَ نُرِىَ فِرْعَوْنَ وَ هَامٰنَ وَ جُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ۝٦

r ত্বা-সীন্-মীম;

r এইগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

r আমি তোমার নিকট মুসা ও ফিরাউনের বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বিবৃত করিতেছি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে।

r ফিরাউন নিজ দেশে পরাক্রমশালী হইয়াছিল এবং তথাকার অধিবাসীবৃন্দকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া উহাদিগের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করিয়াছিল; উহাদিগের পুত্রগণকে সে হত্যা করিত এবং নারীগণকে জীবিত রাখিত। সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।

r সে-দেশে যাহাদিগকে হীনবল করা হইয়াছিল আমি ইচ্ছা করিলাম তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিতে; তাহাদিগকে নেতৃত্বদান করিতে ও দেশের অধিকারী করিতে;

r ইচ্ছা করিলাম, তাহাদিগকে দেশে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং ফিরাউন, হামান ও তাহাদিগের বাহিনীকে তাহা দেখাইয়া দিতে যাহা সেই শ্রেণীটি হইতে উহারা আশংকা করিত।

প্রথমেই বলা হয়েছে— 'ত্ব-সীন-মীম'। এগুলো হচ্ছে বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি। কোরআন মজীদের কোনো কোনো সুরার প্রথমে উল্লেখিত এ সকল বিচ্ছিন্ন অক্ষরের মর্ম চিরদুর্জ্ঞেয়, চিররহস্যাচ্ছন্ন। আল্লাহ্তায়ালা এবং তাঁর রসুলই এগুলোর প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত। আর অবগত অল্পকিছু সংখ্যক আলেম, যারা জ্ঞানে সুগভীর (ওলামায়ে রসিখীন)।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত'। এখানে 'মুবীন' অর্থ সুস্পষ্ট। শব্দটির উৎসারণ ঘটেছে 'আবান'থেকে। 'আবান' ক্রিয়াটি সকর্মক ও অকর্মক উভয় অর্থে ব্যবহার্য। সকর্মক ধরে নিলে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— এই গ্রন্থ বিধানাবলী, উপদেশাবলী, ইতিবৃত্ত, পুরস্কার-তিরস্কার ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট আলোচনা উপস্থিত করে। আর অকর্মক ধরে নিলে অর্থ দাঁড়ায়— চির অজেয় হওয়ার কারণে এই মহাগ্রন্থটি এটাই প্রকাশ্যে প্রমাণ করে যে, এর আয়াতসমূহ অবশ্যই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'আমি তোমার নিকট মুসা ও ফেরাউনের বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বিবৃত করছি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে'। এখানে 'নাতলু' অর্থ বিবৃত করছি বা আবৃত্তি করছি। অর্থাৎ অবতীর্ণ করছি জিবরাইলের মাধ্যমে। 'মিননাবা' অর্থ কিছু ইতিকথা বা বৃত্তান্ত। এখানকার 'মিন' আংশিক অর্থ প্রকাশক। 'বিল হাক্বক্বি' অর্থ যথাযথভাবে নির্ভুল তথ্যসহকারে। 'লি ক্বওমিঁই ইয়ুমিনূন' অর্থ বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে। কারণ এ বৃত্তান্ত শুনে উপকৃত হবে কেবল তারাই। বিশ্বাসবিবর্জিতরা এ কাহিনী শুনে কোনোই উপকার পাবে না।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'ফেরাউন নিজ দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিলো এবং সেখানকার অধিবাসীবৃন্দকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে, তাদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করেছিলো'। এ কথার অর্থ— ফেরাউন ছিলো মিসর রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি। প্রবল প্রতাপশালী ও নিষ্ঠুর ওই ফেরাউন তার

সাম্রাজ্যের জনপুঞ্জকে বিভক্ত করে রেখেছিলো বিভিন্ন শ্রেণীতে, যেনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারা জোটবদ্ধ না হতে পারে। বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হলেও মূল দল ছিলো দু'টি — আদি অধিবাসী কিবতী এবং সিরিয়া থেকে আগত প্রায় চারশ' বছর পূর্বের অধিবাসী বনী ইসরাইল। এই দুই দলকে সে চিহ্নিত করেছিলো অভিজাত ও অনভিজাতরূপে। এখানে 'শীয়া' অর্থ শ্রেণী বা দল। কামুস প্রণেতা লিখেছেন, কারো অনুসৃত দলকে বলে শীয়া, যারা হয় ওই অনুসৃতের অনুগামী বা সাহায্যকারী। এর থেকে পৃথক দলকেও বলে শীয়া।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের পুত্রগণকে সে হত্যা করতো এবং নারীদেরকে জীবিত রাখতো। সে ছিলো বিপর্যয় সৃষ্টিকারী'। একথার অর্থ অনভিজাতরূপে চিহ্নিত ওই হীনবল জনগোষ্ঠীর শিশু পুত্রদেরকে সে দিয়েছিলো হত্যার নির্দেশ। সে নির্দেশ পালিতও হতো যথারীতি। আর তাদের কন্যা সন্তানকে সে হত্যা করাতো না। আর অত্যাচারিত ওই জনগোষ্ঠীর নারী-পুরুষকে সে বাধ্য করতো প্রায় দাস-দাসী রূপে জীবন যাপন করতে। সে ছিলো প্রকৃত অর্থেই এক নিষ্ঠুর নরপতি। বিপর্যয় সৃষ্টি করাই ছিলো তার শাসনকর্মের মূল কথা।

এখানে 'ইউজাববিহু আবনাআহুম' অর্থ— তাদের পুত্রগণকে হত্যা করতো। এরকম করার কারণ ছিলো এই যে, একদিন এক জ্যোতিষী ফেরাউনকে জানালো, বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করবে এক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন শিশু। সে-ই বড় হয়ে ধ্বংস করবে ফেরাউন ও তার সাম্রাজ্যকে। হজরত কাতাদা থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন আবদুর রাজ্জাক, আবদ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে মুনজির।

এখানে 'জীবিত রাখতো নারীদেরকে' অর্থ কন্যাসন্তানেরা ছিলো তার হত্যার নির্দেশ বহির্ভূত। 'কানা মিনাল মুফসিদীন' অর্থ সে ছিলো বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। অর্থাৎ তার কর্মকাণ্ড ছিলো ধ্বংসাত্মক। অসংখ্য শিশু হত্যাই ছিলো তার ওই ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের প্রধান প্রমাণ।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিলো, আমি ইচ্ছা করলাম তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে এবং দেশের অধিকারী করতে'। একথার অর্থ— নিগৃহীত বনী ইসরাইলকে আমি করুণাধন্য করবো বলে ইচ্ছা করলাম। আরো ইচ্ছা করলাম তাদেরকে দান করতে নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রাধিকার।

এখানে 'আইম্‌মাতুন' অর্থ নেতৃত্ব। মুজাহিদ বলেছেন, ধর্মীয় নেতৃত্ব। কাতাদা বলেছেন, শব্দটির অর্থ রাষ্ট্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'আর আমি তোমাদেরকে দিয়েছি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব'। 'আল ওয়ারিছীন' অর্থ উত্তরাধিকারী। অর্থাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত ফেরাউন ও তাঁর অনুসারীদের পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'ইচ্ছা করলাম, তাদেরকে দেশে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে এবং ফেরাউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে যা সেই শ্রেণীটি থেকে তারা আশংকা করতো'। একথার অর্থ— আমি আরো ইচ্ছা করলাম তাদেরকে সিরিয়া ও মিসরের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এবং বনী ইসরাইলের অভ্যুত্থানের যে আশংকা ফেরাউন, হামান ও তাদের লোকেরা করতো, তা তাদেরকে সত্যে পরিণত করে দেখাতে।

এখানকার 'নুমাক্‌কিনু' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'তামকীন' থেকে, যার ধাত্যর্থ কোনোকিছুকে স্থান করে দেয়া, সুপ্রতিষ্ঠিত করা। সুতরাং ধাত্যর্থে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তাদেরকে আমি তাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করি। আর রূপকার্থে কথাটি দাঁড়ায়— দান করি প্রশাসনাধিকার, বিজয়, আধিপত্য।

'হজর' অর্থ 'দ্বরর' বা অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণ লাভ। উল্লেখ্য, জ্যোতিষীর ভবিষদ্বাণী অনুসারে ফেরাউন, হামান ও তাদের বংশধরেরা সদাশংকিত থাকতো এই ভেবে যে, কখন না জানি বনী ইসরাইলের সফল অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উৎখাত হয়ে যায় তাদের সাধের সাম্রাজ্য। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এখানে বলা হয়েছে 'যা সেই শ্রেণীটি থেকে তারা আশংকা করতো'।

সূরা ক্বসাস ঃ আয়াত ৭, ৮, ৯

وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰۤى اُمِّ مُوْسٰۤى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَ لَا تَخَافِىْ وَ لَا تَحْزَنِىْ ۚ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَ جَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۷﴾ فَالْتَقَطَهٗۤ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّ حَزَنًا ؕ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هَامٰنَ وَ جُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِـِٕيْنَ ﴿۸﴾ وَ قَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّىْ وَ لَكَ ؕ لَا تَقْتُلُوْهُ ۖۗ عَسٰۤى اَنْ يَّنْفَعَنَاۤ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿۹﴾

r মূসা-জননীর অন্তরে আমি ইংগিতে নির্দেশ করিলাম, 'শিশুটিকে স্তন্যদান কর।' যখন তুমি ইহার সম্পর্কে কোন আশংকা করিবে তখন ইহাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করিও এবং ভয় করিও না, দুঃখও করিও না। আমি ইহাকে তোমার নিকট ফিরাইয়া দিব এবং ইহাকে রসূলদিগের একজন করিব।

r অতঃপর ফিরাউনের লোকজন মূসাকে উঠাইয়া লইল। ইহার পরিণাম তো এই ছিল যে, সে উহাদিগের শত্রু ও দুঃখের কারণ হইবে। ফিরাউন, হামান ও উহাদিগের বাহিনী ছিল অপরাধী।

r ফিরাউনের স্ত্রী বলিল, 'এই শিশু আমার ও তোমার নয়ন-প্রীতিকর। ইহাকে হত্যা করিও না, সে আমাদিগের উপকারে আসিতে পারে, আমরা তাহাকে সন্তান হিসাবেও গ্রহণ করিতে পারি।' প্রকৃতপক্ষে উহারা ইহার পরিণাম বুঝিতে পারে নাই।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'মুসা-জননীর অন্তরে আমি ইঙ্গিতে নির্দেশ করলাম, শিশুটিকে স্তন্য দান করো'। বাগবী লিখেছেন, রসুল মুসার জননীর নাম ছিলো ইয়ুখ্‌বিজ বিনতে লাবী। আর লাবী ছিলেন নবী ইয়াকুবের পুত্র।

এখানে 'অন্তরে ইঙ্গিতে নির্দেশ করলাম' বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে 'আওহাইনা' কথাটি, যার শাব্দিক অর্থ দাঁড়ায় প্রত্যাদেশ করলাম। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা ওহী বা প্রত্যাদেশ ছিলো না। কারণ প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয় কেবল নবী-রসুলগণের প্রতি। আর হজরত মুসার জনয়িত্রী নবী ছিলেন না। নারীরা কখনো নবী হনও না। কাতাদা তাই কথাটির অর্থ করেছেন— আমি মুসা-জননীর হৃদয়ে নির্দেশ দিলাম প্রক্ষেপনাকারে,ইঙ্গিতে। সুফি দার্শনিকেরা এমতো প্রক্ষেপণকে বলে থাকেন ইলহাম। ইলহাম বলে এক ধরনের শুভ স্বপ্নকেও। তাই বলা যেতে পারে, এখানকার 'আওহাইনা' অর্থ ইলহামের মাধ্যমে নির্দেশনা দিলাম, যেনো তার হৃদয়ে জন্মে প্রতীতি ও প্রশান্তি। আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথাও প্রতীয়মান হয় যে, ইলহামও জ্ঞানার্জনের একটি মাধ্যম, যদিও তা সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত নয়, বরং এর মাধ্যমে অর্জিত হয় অনুপ্রেরণা ও প্রণোদনা। আর ইলহাম প্রতিভাসিত হতে পারে ওই হৃদয়ে, যে হৃদয় পরিশুদ্ধ ও প্রশান্ত। শয়তানের কুমন্ত্রণাও প্রক্ষেপিত হয় হৃদয়ে। কিন্তু ওই কুমন্ত্রণা দ্বারা চিত্তপ্রশান্তি ঘটে না, ঘটে চিত্তচাঞ্চল্য। কিন্তু ইলহাম আনে চিত্তপ্রশান্তি ও প্রত্যয়।

এখানে 'শিশুটিকে স্তন্য দান করো' অর্থ যতক্ষণ পর্যন্ত সদ্যজাত শিশুটির জন্ম সংবাদ গোপন রাখা সম্ভব হয়, ততক্ষণ তাকে গোপনে গোপনে দুগ্ধপান করাও। শিশু মুসা কতোদিন পর্যন্ত মাতৃস্তন্য পান করেছিলেন, সে সম্পর্কে আলেমগণ মতপৃথকতা করেছেন। কেউ কেউ বেলছেন, আটমাস। কেউ বলেছেন চারমাস, আবার কেউ বলেছেন তিন মাস। তাঁর মাতা তাকে কোলে বসিয়ে দুধ পান করাতেন। আর তিনি কখনো কাঁদতেন না। প্রকাশও করতেন না কোনো চাঞ্চল্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'যখন তুমি এর সম্পর্কে কোনো আশংকা করবে, তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ কোরো এবং ভয় কোরো না, দুঃখও কোরো না। আমি তাকে তোমার নিকট ফিরিয়ে দিবো এবং একে রসুলগণের একজন করবো'।

একথার অর্থ— ইলহামের মাধ্যমে আমি তাকে আরো জানালাম, হে মুসা-জননী! যখন দেখবে ফেরাউনের শিশু হন্তারকেরা মুসার সন্ধানে ঘোরাফিরা করছে, তখন তাকে সিন্দুকে পুরে ভাসিয়ে দিয়ো নীল নদের তরঙ্গে। সে ডুবে মরবে, এরকম ভয় কোরো না। আর পুত্রবিরহে ব্যথিতও হয়ো না। যথাসময়ে আমি তাকে তোমার কোলেই ফিরিয়ে দিব এবং পরিণত বয়সে আমি তাকে করবো আমার প্রিয়ভাজন বার্তাবাহক।

এখানে 'ফীল ইয়াম্‌মি' অর্থ নদীবক্ষে। অর্থাৎ নীল নদীতে। আর 'ইন্‌না রদদুহু ইলাইকি' অর্থ অচিরেই আমি তোমার সন্তানকে ফিরিয়ে দিব তোমার নিকটে। তখন তোমার দুঃখ করার আর কিছুই থাকবে না।

আতা ও জুহাকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখন মিসরে বনী ইসরাইলের সংখ্যা বেড়ে গেলো, তখন তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হতে লাগলো জনবলের অহমিকা। বেপরোয়া হয়ে গেলো তারা। দুর্বলদের উপরে শুরু করলো অত্যাচার। আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে শুরু করলো শৈথিল্য। পরিত্যাগ করলো সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের দায়িত্ব। ফলে আল্লাহ্ তাদের উপরে কর্তৃত্ব দান করলেন কিবতীদের। কিবতীরা চূর্ণ করে দিলো তাদের দর্প ও প্রভাব-প্রতিপত্তি। দীর্ঘকাল ধরে নিগৃহীত হবার পর আল্লাহ্ তাদের উপরে দয়া বর্ষণ করলেন। আবির্ভূত হলেন হজরত মুসা। তাঁর মাধ্যমেই এক সময় তিনি কিবতী সম্রাটের কবল থেকে রক্ষা করলেন তাদেরকে। তিনি আরো বলেছেন, মুসা জননীর ছিলো এক ধাত্রী-বান্ধবী। সে ছিলো ফেরাউন পক্ষীয়। বনী ইসরাইলদের প্রসূতিদের খোঁজ নেয়াই ছিলো তার কাজ। সন্তানপ্রসবের প্রাক্কালে তিনি ডেকে আনলেন তাঁর ওই ধাত্রী-বান্ধবীকে। বললেন, আমার প্রসবকাল অত্যাসন্ন। ভালোবাসার দাবীতে এবার তোমার সহায়তা কামনা করি। ধাত্রী আন্তরিকভাবে তাঁর যত্ন-পরিচর্যা করলেন। যথাসময়ে জন্ম নিলো ফুটফুটে এক পুত্রসন্তান। শিশুটির ললাটদেশে প্রোজ্জ্বল ছিলো একটি অপার্থিব প্রভা। ওই প্রভা দেখে বিস্মিতা হলেন ধাত্রী। অতি অভিভূতির ফলে শুরু হলো তার হৃৎকম্পন। অল্প সময়ের মধ্যে তার হৃদয় ভরে গেলো নবজাতকের মায়ায়। তাঁর মাকে বললেন, আমি ভেবে এসেছিলাম, তোমার পুত্রসন্তান হলে আমি তাকে তুলে দিবো ফেরাউনের শিশু হন্তারকদের হাতে। কিন্তু এখন এ শিশুর মমতায় আমার হৃদয় পরিপূর্ণ। তাই আমার পরামর্শ, শিশুটির হেফাজত করো। একথা বলেই সে প্রস্থান করলো। একটু পরেই সেখানে উপস্থিত হলো এক রাজকর্মচারী। সে ছিলো শিশু হন্তারক। সে গৃহমধ্যে প্রবেশের উদ্যোগ করতেই হজরত মুসার বোন অতি দ্রুত তাঁকে কোলে নিয়ে নিক্ষেপ করলো পাশের ঘরের প্রজ্জ্বলিত উনুনে। কর্মচারীটি জিজ্ঞেস করলো, এখানে ধাত্রী কেনো এসেছিলো। মুসা-জননী বললেন, সে আমার

বান্ধবী। এসেছিলো সাক্ষাত করতে। কর্মচারীটি এদিক ওদিক তাকিয়ে কিছুটা সন্দেহ নিয়ে ফিরে গেলো। রাজকর্মচারী দেখে মুসা জননীর চেতনা লোপ হবার উপক্রম হয়েছিলো। সম্বিত ফিরে পেয়ে তিনি কন্যাকে ডেকে বললেন, কোথায় রেখেছো বাচ্চাকে। কন্যা বললো, উনুনে। এরকম করেছি আমি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। মাতা-কন্যা দু'জনেই পাগলের মতো ছুটে গেলেন পাশের ঘরে। দেখলেন, উনুনের আগুন অন্তর্হিত। সেখানে আপনমনে হাত পা নেড়ে খেলা করছেন শিশু মুসা। সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে প্রিয়তম আত্মজকে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন জননী। একটু পরেই আবার বিষণ্ন হয়ে গেলেন তাঁর নিরাপত্তাচিন্তায়। শিশু হন্তারকেরা বার বার এসে অনুসন্ধান চালায়। কতোদিন আর তিনি এভাবে আগলে রাখতে পারবেন তাঁর বুকের মানিককে? সহসা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শুভ ইঙ্গিত প্রক্ষেপিত হলো, ওকে নদীতে ভাসিয়ে দাও। তার অকল্যাণ হবে, একথা ভেবো না। কিছু কালের মধ্যেই তাকে ফিরে পাবে আপন ক্রোড়ে। আর যথাসময়ে তাকে আমি দায়িত্ব দান করবো আমার বাণীবাহকের। মুসা-জননী এবার ছুটে গেলেন এক সূত্রধরের কাছে। বললেন, আমাকে একটি ছোটো সিন্দুক বানিয়ে দাও। সূত্রধর বললো, সিন্দুক দিয়ে কী করবেন? তিনি তখন সূত্রধরকে অকপটে খুলে বললেন সব। সূত্রধর অল্পক্ষণের মধ্যে সিন্দুক বানিয়ে দিলেন। সিন্দুকটি নিয়ে মুসা জননীর প্রস্থানের পরক্ষণেই সে রওয়ানা দিলো রাজকর্মচারীর সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। কিন্তু রাজকর্মচারীর দেখা যখন পেলো সে তখন বাকশক্তিরহিত। ইশারায় কিছু বলতে চেষ্টা করলো। কিন্তু কর্মচারীটি কিছুই বুঝতে পারলো না। নিরুপায় হয়ে স্বগৃহে ফিরে এলো সূত্রধর। বাকক্ষমতা ফিরে পেলো আগের মতোন। তাই সে পুনরায় গমন করলো রাজকর্মচারীর কাছে। এবার হারালো বাকশক্তি ও দর্শনশক্তি দু'টোই। ফলে এবারো সে কর্মচারীটিকে কিছুই বোঝাতে পারলো না। কর্মচারীটি বিরক্ত হলো। উত্তম মধ্যম দিয়ে তাড়িয়ে দিলো সেখান থেকে। নিরুপায় সূত্রধর গমন করলো একটি উন্মুক্ত উপত্যকায়। সে এবার বুঝতে পারলো, ওই শিশুটি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। তাই অনুতাপে জর্জরিত হয়ে প্রার্থনা করলো, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমাকে ক্ষমা করো। সুস্থ করে দাও। সন্ধান দাও ওই মহান শিশুর। আমি এখন থেকে তার প্রহরী হবো। প্রার্থনা মঞ্জুর করা হলো। আল্লাহ্ তাকে জানালেন, শিশুনবীর পরিচয় ও তাঁর অবস্থানস্থলের বিবরণ।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ' বর্ণনা করেছেন, অন্তঃসত্ত্বা হবার পর থেকেই যথাসম্ভব আত্মগোপন করে রইলেন মুসা-জননী। আল্লাহ্ তাঁকে হেফাজত করলেন বিশেষভাবে। ফলে কেউ তাঁর সন্তানবতী হবার কথা জানতে পারলো না। অনুসন্ধানকারিণী ধাত্রীরা কেউই তাঁকে সন্তানসম্ভবা বলে সনাক্ত করতে পারলো

না। যথাসময়ে ভূমিষ্ঠ হলেন শিশু মুসা। ভূমিষ্ঠকালে তাঁর মাতার পাশে হাজির ছিলেন কেবল তাঁর এক বোন। তাঁর নাম ছিলো মরিয়ম। নবজাতককে দেখে তাঁর অমঙ্গলাশংকায় চিন্তিত হলেন মাতা। আল্লাহ্ই তাঁকে চিন্তামুক্ত করলেন। ইলহামের মাধ্যমে জানালেন, নির্ভয়ে তাকে স্তন্য দান করো। মন্দ কিছুর আশংকা করলে তোমার ওই পুত্রধনকে সিন্দুকে আবদ্ধ করে নীল নদের উত্তাল তরঙ্গে ভাসিয়ে দিয়ো। তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে, এমন ভেবো না। সে আমা কর্তৃক নিরাপত্তা প্রাপ্ত। অত্যল্পকাল পরে আমি তাকে তোমার বুকেই ফিরিয়ে দিবো। আর অদূর ভবিষ্যতে তাকে বানাবো আমার একান্ত আপন বচনবাহক। জননী তাঁর মহান আত্মজকে অতিসঙ্গোপনে দুধ পান করালেন তিন মাস ধরে। এরমধ্যে শিশু মুসা একবারের জন্যও কাঁদেননি। এরপর জননী-হৃদয় আশংকিত হলো, ধীরে ধীরে শিশু বড় হচ্ছে। আর তো তাকে গোপন করা যাবে না। তিনি তখন আল্লাহ্র ইলহাম অনুসারে তৈরী করিয়ে নিলেন একটি সিন্দুক। তারপর সিন্দুকে বুকের মানিককে পুরে তাকে ভাসিয়ে দিলেন নীল নদের তরঙ্গবিক্ষুব্ধ জলে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ফেরাউন ছিলো এক কন্যা সন্তানের জনক। আর কোনো সন্তান সন্ততি ছিলো না তার। তাই পিতৃস্নেহের পুরোটাই অধিকার করেছিলো রাজনন্দিনী একাই। কিন্তু তার শরীর ছিলো ধবলকুষ্ঠাক্রান্ত। ফেরাউন রাজ্যের বড় বড় চিকিৎসককে দিয়েও সে রোগ নিরাময় করতে পারেনি। শেষে সে শরণাপন্ন হলো জ্যোতিষীদের। তারা বললো, একটি মাত্র উপায় আছে। নীল নদের দিক থেকে যদি কোনো মনুষ্য আকৃতির প্রাণী ভেসে আসে এবং তার মুখের লালা যদি রাজনন্দিনীর শরীরে লেপন করা হয়, তবে তার রোগনিরাময় নিশ্চিত। সম্ভবতঃ অমুক দিন অমুক প্রহরে মানবাকৃতির কোনোকিছু ভেসে আসতে পারে। সেদিন থেকে ফেরাউন সতর্ক প্রহর গুণতে লাগলো। নির্দিষ্ট দিনে রাজমহিষী আসিয়াও প্রিয়তম কন্যাকে নিয়ে অবস্থান গ্রহণ করলেন নীলনদের তীরে নির্মিত প্রমোদপ্রাসাদে। সখীকুল সমভিব্যাহারে রাজনন্দিনী নেমে গেলো তটভূমিসংলগ্ন শান বাধানো ঘাটে। সহসা জলকেলিরতা ললনাদের চোখে পড়লো একটি ভাসমান সিন্দুক। মনে হচ্ছিলো নদীতরঙ্গে দোলায়মান সিন্দুকটি তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে যেনো। সঙ্গে সঙ্গে তারা ছুটে গিয়ে সংবাদটি জানালো প্রতীক্ষারত ফেরাউন ও সম্রাজ্ঞী আসিয়াকে। ফেরাউন নির্দেশ দিলো, সিন্দুকটি উঠিয়ে আনা হোক। নির্দেশ প্রতিপালিত হলো যথারীতি। মাঝিমাল্লার দল ঝাঁপিয়ে পড়লো নদীতে। একটু পরেই তারা ছোট্ট সিন্দুকটি হাজির করলো ফেরাউনের সামনে। ফেরাউনের পুনঃনির্দেশে তারা সিন্দুকটির ঢাকনা খোলার চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। এগিয়ে গেলেন সম্রাজ্ঞী আসিয়া। তাঁর সামান্য চেষ্টাতেই খুলে গেলো

ঢাকনাটি। সকলেই সবিস্ময়ে দেখলো, সিন্দুকের ভিতরে আপন মনে খেলা করছে একটি ফুটফুটে মানব শিশু। তার অবয়ব থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে অপার্থিব জ্যোতি। কিন্তু সে জ্যোতিচ্ছটা সম্রাজ্ঞী আসিয়া ছাড়া অন্য কেউ দেখতে পেলো না। তবে সকলে দেখলো এক অভূতপূর্ব দৃশ্য— শিশুটি তাঁর হাতের আঙুল চুষছে। আর সে আঙুল থেকে উদগিরিত দুধ পান করে সে পরিতৃপ্ত হচ্ছে। প্রথম দর্শনেই শিশুটিকে ভালোবেসে ফেললেন সম্রাজ্ঞী আসিয়া। তার রূপে মুগ্ধ হলো ফেরাউন নিজেও। আর রাজনন্দিনী কোনোকিছু না বলে শিশুটির মুখের লালা নিয়ে ঘষতে লাগলো শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেখা গেলো তার শরীরে ধবলকুষ্ঠের কোনো চিহ্নই আর নেই। রাজনন্দিনী আনন্দের আতিশয্যে বুকে জড়িয়ে নিলো শিশুটিকে। আদরে চুম্বনে ভরিয়ে দিলো তাকে। নিকটে দণ্ডায়মান রাজজ্যোতিষীরা এ দৃশ্য দেখে বলে উঠলো, মহামান্য সম্রাট! মনে হয় এই সেই শিশু, যার মাধ্যমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে আপনার সাধের সাম্রাজ্য। সম্ভবতঃ এ শিশু বনী ইসরাইল বংশদ্ভূত। আপনার শিশুহন্তারকদের ভয়ে নিশ্চয় তার মাতা-পিতা এভাবে একে ভাসিয়ে দিয়েছে নীল নদের জলে। ফেরাউন মনস্থির করলো, না কোনো দুর্বলতা নয়। এই মুহূর্তে হত্যা করতে হবে শিশুটিকে। সম্রাজ্ঞী আসিয়া তার মনোভাব বুঝতে পেরে মিনতি জানালো, মহামাননীয় সম্রাট! শিশুটি দেখুন কতো সুন্দর। দয়া করুন। এ নিষ্পাপ মানব সন্তানকে বধ করে আপনার অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাপ্রতাপের অমর্যাদা করবেন না। বরং ভাবুন, এ আমাদেরই সন্তান। আপনি তো পুত্রহীন। ফেরাউন সংযত হলো। সম্রাজ্ঞীর মনোরঞ্জনার্থে কেবল বললো, ঠিক আছে তুমিই রেখে দাও। ওর কোনো প্রয়োজন আমার নেই।

রসুল স. বলেছেন, ফেরাউন তখন যদি বলতো, শিশুটি তোমাকে যেমন মোহিত করেছে, তেমনি আমাকেও করেছে বিমোহিত। তবে সম্রাজ্ঞী যেমন হেদায়েত পেয়েছিলেন, তেমনি ফেরাউনও লাভ করতো হেদায়েত। সম্রাজ্ঞী আসিয়াই তাঁর নাম রেখেছিলেন মুসা। 'মু' অর্থ পানি। আর 'সা' অর্থ বৃক্ষ। যেনো তিনি নদী নামক বৃক্ষের পানিসদৃশ শাখা থেকে তুলে এনেছেন একটি বিস্ময়কর ভালোবাসার পুষ্প— মুসা।

পরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'অতঃপর ফেরাউনের লোকজন মুসাকে উঠিয়ে নিলো। এর পরিণাম তো এইছিলো যে, সে তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হবে। ফেরাউন, হামান ও তাদের বাহিনী ছিলো অপরাধী'। এ কথার অর্থ— ফেরাউন তার লোকজনের মাধ্যমে নীল নদ থেকে শিশু মুসাকে উঠিয়ে নিয়ে রাজপ্রাসাদে স্থান করে দিলো। এভাবে সে নিজেই বেছে নিলো আত্মসংহারের

পথ। সে বুঝতে পারলো না, তার শত্রু এখন থেকে বেড়ে উঠতে শুরু করবে তার গৃহেই। এভাবেই আল্লাহ্ ফেরাউন, হামান ও তাদের বশংধরদেরকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। কারণ তারা ছিলো সীমালংঘনকারী।

এখানে 'লিয়াকূনা' (যেনো হয়) কথাটির 'লাম' (যেনো) অব্যয়টি পরিণতি প্রকাশক। অর্থাৎ কোনো একটি ক্রিয়ার পরিণতি অপর একটি ক্রিয়ার কারণ বা সূচনা। 'আদুও্ওয়ান' অর্থ শত্রু, এমন শত্রু, যে হবে তাদের মহাদুঃখের কারণ।

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— ফেরাউনের স্ত্রী বললো, 'এই শিশু আমার ও তোমার নয়ন প্রীতিকর। একে হত্যা করো না'। একথার অর্থ— সিন্দুকটি উন্মোচন করা হলো। দেখা গেলো তার মধ্যে আপন মনে খেলা করছে এক জ্যোতির্ময় শিশু। সম্রাজ্ঞী আসিয়া প্রথম দর্শনেই তাকে ভালোবেসে ফেললেন। অভিভূত হয়ে বলে উঠলেন, হে সম্রাটপ্রবর! এ যে আমাদের পরম সৌভাগ্য। এ শিশু আমার ও আপনার নয়নমণি।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ বলেছেন, সিন্দুকটি খোলার পর তার ভিতরে একটি সুন্দর মানব শিশু দেখতে পেয়েই ফেরাউন চিৎকার করে বলে উঠলো, আরে এ যে দেখছি বনী ইসরাইলদের শিশু। এতো আমার শত্রু। আশ্চর্য! এ আমার লোকদের হাত থেকে বেঁচে গেলো কী করে। ফেরাউনের পত্নী আসিয়া ছিলেন বনী ইসরাইলের কোনো এক নবী বংশদ্ভূত। পতিপরায়ণা ওই মহীয়সী রমণী ছিলেন দরিদ্র-দুঃখীদের আশ্রয়স্থল। তিনি তখন ছিলেন ফেরাউনের পাশে উপবিষ্টা। ক্রোধান্বিত ফেরাউনকে তিনি সংযত করতে চেষ্টা করলেন। বললেন, হে সম্রাট! শান্ত হোন। আপনি বনী ইসরাইলদের শিশু হত্যার নির্দেশ জারী করেছেন বছর খানেক হলো। আর এ শিশুটির বয়স তো দেখা যায় এক বৎসরের বেশী। সুতরাং কোনো ভয় নেই। এতো আমার আপনার দু'জনেরই নয়ন শীতল করবে। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, সম্রাজ্ঞী আসিয়া তখন বলেছিলেন, শিশুটি সম্ভবতঃ উজানের কোনো দেশ থেকে ভেসে এসেছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সে আমাদের উপকারে আসতে পারে, আমরা তাকে সন্তান হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি'। একথার অর্থ— সম্রাজ্ঞী আরো বললেন, এ শিশু বড়ই সৌভাগ্যশালী। তার অবয়ব জুড়ে জ্বল জ্বল করছে মহাকল্যাণ। সুতরাং তার দ্বারা আমাদের উপকার ব্যতীত অন্যবিধ কিছু ঘটবে না। দেখুন না, আমাদের প্রিয়তমা দুহিতা তো নিরাময় লাভ করলো এর কারণেই। ভেবে দেখুন, আমরা তাকে তো পুত্রস্নেহে প্রতিপালন করতে পারি।

এরপর বলা হয়েছে— 'প্রকৃতপক্ষে তারা এর পরিণাম বুঝতে পারেনি'। একথার অর্থ— ফেরাউন তাঁর পত্নীর কথায় শান্ত হলো। আর কোনো উচ্চবাচ্য

করলো না। এভাবেই রাজপ্রাসাদে পাকাপোক্ত হয়ে গেলেন হজরত মুসা। কিন্তু ফেরাউন সেদিন ঘুণাক্ষরেও একথা জানতে পারলো না যে, ভবিষ্যতে এর পরিণাম তার জন্য হবে কতো ভয়াবহ।

পরিণতসূত্রে মোহাম্মদ ইবনে কায়েস থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, ফেরাউন তখন আসিয়াকে বলেছিলো, এ তোমার নয়নপ্রীতিকর হতে পারে, কিন্তু আমার নয়। কিন্তু সে যদি তখন আসিয়ার মতো বলতো, হ্যাঁ। এ শিশুটি তোমার আমার নয়ন-প্রীতিকর, তাহলে আল্লাহ্পাক আসিয়ার মতো তাকেও সৎপথ প্রদর্শন করতেন। মোহাম্মদ ইবনে ওয়াহাবের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্দ্রোহী ফেরাউন যদি সেদিন তাঁর পত্নীর এমতো উক্তি পুনরাবৃত্তি করতো, তবে সে-ও পেতো হেদায়েতের মতো মহাকল্যাণ। কিন্তু সে ছিলো চিরভ্রষ্ট। তাই ‘এ শিশু তোমার আমার নয়ন-প্রীতিকর’ এরকম মহাকল্যাণময় বচন উচ্চারণের সৌভাগ্য তার হয়নি।

সূরা ক্বসাস ঃ আয়াত ১০, ১১, ১২, ১৩

وَ اَصۡبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوۡسٰی فٰرِغًا ؕ اِنۡ کَادَتۡ لَتُبۡدِیۡ بِہٖ لَوۡ لَاۤ اَنۡ
رَّبَطۡنَا عَلٰی قَلۡبِہَا لِتَکُوۡنَ مِنَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ ﴿۱۰﴾ وَ قَالَتۡ لِاُخۡتِہٖ
قُصِّیۡہِ ۫ فَبَصُرَتۡ بِہٖ عَنۡ جُنُبٍ وَّ ہُمۡ لَا یَشۡعُرُوۡنَ ﴿۱۱﴾
وَ حَرَّمۡنَا عَلَیۡہِ الۡمَرَاضِعَ مِنۡ قَبۡلُ فَقَالَتۡ ہَلۡ اَدُلُّکُمۡ عَلٰۤی
اَہۡلِ بَیۡتٍ یَّکۡفُلُوۡنَہٗ لَکُمۡ وَ ہُمۡ لَہٗ نٰصِحُوۡنَ ﴿۱۲﴾ فَرَدَدۡنٰہُ اِلٰۤی
اُمِّہٖ کَیۡ تَقَرَّ عَیۡنُہَا وَ لَا تَحۡزَنَ وَ لِتَعۡلَمَ اَنَّ وَعۡدَ اللّٰہِ حَقٌّ
وَّ لٰکِنَّ اَکۡثَرَہُمۡ لَا یَعۡلَمُوۡنَ ﴿۱۳﴾

r মূসা-জননীর হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। যাহাতে সে আস্থাশীল হয় তজ্জন্য তাহার হৃদয়কে আমি দৃঢ় করিয়া না দিলে সে তাহার পরিচয় তো প্রকাশ করিয়াই দিত।

r সে মূসার ভগ্নিকে বলিল, ‘ইহার পিছনে পিছনে যাও।’ সে উহাদিগের অজ্ঞাতসারে দূর হইতে তাহাকে দেখিতেছিল।

r পূর্ব হইতেই আমি ধাত্রীস্তন্য পানে তাহাকে বিরত রাখিয়াছিলাম। মূসার ভগ্নি বলিল 'তোমাদিগকে আমি এমন এক পরিবারের কথা বলিব কি যাহারা তোমাদিগের হইয়া ইহাকে লালন-পালন করিবে এবং উহার মংগলকামী হইবে?'

r অতঃপর আমি তাহাকে ফিরাইয়া দিলাম তাহার জননীর নিকট যাহাতে তাহার চক্ষু জুরায়, সে দুঃখ না করে এবং বুঝিতে পারে যে, আল্লাহের প্রতিশ্রুতি সত্য; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই ইহা বুঝে না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'মুসা-জননীর হৃদয় অস্থির হয়ে পড়েছিল'। একথার অর্থ— প্রিয় আত্মজকে নীলনদের পানিতে ভাসিয়ে দেয়ার পর যখন ধীরে ধীরে সিন্দুকটি দৃষ্টির আড়াল হয়ে যাচ্ছিলো, তখন তাঁর জননী-হৃদয় হাহাকার করে উঠেছিলো। মস্তিষ্ক হয়ে গিয়েছিলো জ্ঞানশূন্য প্রায়। হয়ে গিয়েছিলেন তিনি হতবিহ্বল, চঞ্চল।

এখানে হৃদয়ের অস্থিরতা অর্থ অন্তরের শূন্যতা। প্রিয়তমজনকে হারালে এরকম শূন্যতাবোধ বিরাজ করে মানুষের মনে। হাসান বসরী বলেছেন, এখানকার অস্থিরতা বা শূন্যতার অর্থ— ওই সময় মুসা-জননী ভুলে গিয়েছিলেন ইলহামের মাধ্যমে প্রাপ্ত আল্লাহ্‌র অভয়-বাণীর কথা, যেমন বলা হয়েছে ৭ সংখ্যক আয়াতে 'ভয় কোরো না, দুঃখও কোরো না। আমি একে তোমার নিকট ফিরিয়ে দিবো এবং একে রসুলগণের একজন করবো'। এ অভয়বাণীর কথা তাঁকে ভুলিয়ে দিয়েছিলো ইবলিস। সেই সঙ্গে কুমন্ত্রণা দিয়েছিলো, মা হয়ে তুমি কী করে পারলে আপন আদরের সন্তানকে এভাবে ভাসিয়ে দিতে। ভেবে দ্যাখো তুমি নিজেই তোমার সন্তানের হন্তারক। ইবলিসের এমতো কুমন্ত্রণার কারণেই মুসা-জননী তখন হয়ে পড়েছিলেন চঞ্চলচিত্ত, হৃদয়ে তাঁর নেমে এসেছিলো সীমাহীন শূন্যতা। তারপর যখন জানলেন, সিন্দুকটি উঠিয়ে নিয়েছে ফেরাউন, তখন তিনি হয়ে পড়লেন আরো অধিক দুঃশ্চিন্তাগ্রস্তা, উম্মাদিনীপ্রায়। সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হলেন আল্লাহ্‌তায়ালার অঙ্গীকার। আমি বলি, ইলহামের কথা তিনি বিস্মৃত হননি, কিন্তু তাঁর বিশ্বাস হয়ে পড়েছিলো টলোমলো। কারণ ওলীগণের ইলহাম নবীগণের ওহীর মতো বিশ্বাসকে অটল রাখতে পারে না। নবীগণের প্রত্যাদেশ নির্ভুল এবং অবশ্য অনুসরণীয়। কিন্তু ওলীগণের ইলহাম কোনো কোনো সময় আস্থার্জক হলেও অধিকাংশ সময় হয় ভুল। কারণ নিজের ধারণার মিশ্রণ থেকে তা প্রায়শই মুক্ত নয়, নয় প্রত্যাদেশের মতো সম্পূর্ণরূপে স্বধারণার প্রভাবমুক্ত। তাই ইলহামে ভুলের সম্ভাবনা কিছু না কিছু থেকেই যায়।

আবু উবায়দা বলেছেন, এখানে হৃদয় শূন্য হওয়ার অর্থ হৃদয় মর্মপীড়াশূন্য হওয়া। অর্থাৎ এ বিষয়ে তাঁর সুদৃঢ় প্রতীতি ছিলো যে, আল্লাহ্‌পাক অবশ্যই তাঁর প্রিয়তম আত্মজের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করবেন। তাই তখন তাঁর অন্তর হয়ে

গিয়েছিলো দুঃশ্চিন্তাশূন্য। কুতাইবা বলেছেন, আবু উবায়দার এমতো ব্যাখ্যা যথাযথ নয়। কারণ পরবর্তী বাক্যে তাঁর হৃদয়ের অস্থিরতা বা শূন্যতাবোধের কথা বলা হয়েছে আরো স্পষ্ট করে।

বলা হয়েছে— 'যাতে সে আস্থাশীল হয় তজ্জন্য তার হৃদয়কে আমি দৃঢ় করে না দিলে সে তার পরিচয় তো প্রকাশ করেই দিতো'। একথার অর্থ— আমিই তখন তাঁর হৃদয়ে সহিষ্ণুতাকে দৃঢ়বদ্ধ করে দিয়েছিলাম। নতুবা চরম মানসিক চাপে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতো তাঁর পুত্রের পরিচয়। আর সে পরিচয় জানতে পারলে অবশ্যই ফেরাউন শিশু মুসাকে হত্যা করে ফেলতো। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, শোকাকুলা মুসা-জননী তখন চিৎকার করে বলতে উদ্যত হয়েছিলেন 'হায় আমার পুত্র'!

মুকাতিল বলেছেন, তরঙ্গবিক্ষুব্ধ নদীতে ভাসমান সিন্দুকটি দেখে মুসা জননীর মনে হচ্ছিলো, এই বুঝি ঢেউয়ের তলায় হারিয়ে গেলো তাঁর বুকের মানিক। সে দৃশ্য তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। মনে হচ্ছিলো, এক্ষুণি তিনি চিৎকার করে জানিয়ে দেন, ওই সিন্দুকটি আমার, আমার প্রিয়তম পুত্রের। কালাবী বলেছেন, মুসা-জননীর চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়েছিলো আরো পরে, যখন মুসা কিশোর অথবা যুবক। তখন সকলেই তাঁকে ফেরাউনের পুত্র বলতো। তিনি সে কথা সহ্য করতে পারতেন না। মনে হতো, এক্ষুণি চিৎকার করে সবাইকে জানিয়ে দেন, না, মুসা আমার।

কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, যখন মুসা জননী শুনতে পেয়েছিলেন, লোকে তাঁর পুত্রকে ফেরাউনের পুত্র বলে, তখন তাঁর উচ্চকিত কণ্ঠে বলতে ইচ্ছা হয়েছিলো, না, সে তো ফেরাউনের পালক পুত্র। আমিই তাঁর আসল জননী।

ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, আল্লামা সুদ্দী বলেছেন, নদীর পানি থেকে উদ্ধার করা শিশুটিকে অনেক চেষ্টা করেও কারো দুধ পান করানো গেলো না। বাইরে জমে ছিলো দুগ্ধদাত্রী রমণীদের ভিড়। ওই ভিড়ে মিশে ছিলেন হজরত মুসার বড় বোন মরিয়ম। তিনি বললেন, আমি এক ধাত্রীমাতার সন্ধান জানি। মনে হয় শিশুটি ওই রমণীর স্তন পান করতে অনাগ্রহী হবে না। রাজকর্মচারীরা তাকে অনুমতি প্রদান করলো। মরিয়ম অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁর মাকে হাজির করলেন সেখানে। মুসা-জননী অন্দর মহলে গিয়ে কোলে তুলে নিলেন প্রিয়তম পুত্রকে। শিশু মুসা পরম সুখে নিশ্চিন্তে পান করতে লাগলেন আপন জননীর দুধ। ওই সময় আনন্দে অস্থির হয়ে বলে উঠতে চাইলেন, দ্যাখো দ্যাখো, নিজের পেটের সন্তান না হলে কী এভাবে নিশ্চিন্তে মাতৃস্তন্য পান করে? কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং তাঁর ওই সময়ের এমতো চিত্তচাঞ্চল্য দূর করে দেন। তাঁর হৃদয়কে করেন সুদৃঢ়। এভাবে গোপন রাখেন শিশু মুসার প্রকৃত পরিচয়।

আবু উবায়দা কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— মুসা-জননী তখন ছিলেন নির্বিকার, নিশ্চিন্ত। কারণ আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে অভয় দিয়েছিলেন 'ভয় কোরো না, দুঃখও কোরো না'। তিনি একথার উপরে ছিলেন পূর্ণ আস্থাশীল। তাই তিনি তখন নির্ভয়ে বলতে চেয়েছিলেন এ সন্তান আমার। অথবা তিনি তখন অতিনিশ্চিতির সঙ্গে একথা সর্বসমক্ষে প্রকাশই করে দিতে চেয়েছিলেন যে, এ পুত্র আমার। আল্লাহ্ আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি আমার কোলেই ফেরত দিবেন একে। সে প্রতিশ্রুতি এখন পূর্ণ হলো। তিনি আমাকে আরো প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আমার এই মহাসৌভাগ্যশালী পুত্র ভবিষ্যতের নবী।

এখানে 'ইন' (যদি) অব্যয়টি ধাতুমূল শব্দটির মাধ্যমে একথাই বুঝিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে যে, স্বগৃহে শত্রুপালন একটি অসম্ভব ব্যাপার। আর আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায় এই অসম্ভবকে সম্ভব করার পক্ষে। সুতরাং বিষয়টির গোপনীয়তা সংরক্ষণ অত্যাবশ্যক। অথচ মুসা-জননী দুঃশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে অথবা আনন্দের আতিশয্যে এই রহস্যটি প্রকাশ করে দিতে চেয়েছিলো। কিন্তু পারেনি একারণে যে, তা ছিলো আমার অভিপ্রায়বিরোধী। আর আমার অভিপ্রায়ের বিপরীতে কোনো কিছু থাকে না। তাই তখন তিনি তার চিত্তচাঞ্চল্য দূর করে তদস্থলে দৃঢ়বদ্ধ প্রতীতি প্রতিষ্ঠা করে গোপন রহস্যকে গোপনই রেখে দিয়েছিলেন। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে এখানকার 'যাতে সে হয়' (লিতাকুনা) কথাটি সম্পর্ক 'মুসা-জননীর হৃদয় অস্থির হয়ে পড়েছিলো' কথাটির সঙ্গেও হতে পারে। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— মুসা জননীর হৃদয় তখন ছিলো ভয়-লেশশূন্য। কারণ সে ছিলো আমার অঙ্গীকারের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাশীলা। আর এমতো মানসিক দৃঢ়তা আমিই তখন দিয়েছিলাম তাঁকে। নতুবা তিনি তো গোপন রহস্যটি প্রকাশ করেই দিতেন।

উল্লেখ্য, আমরা যেভাবে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করলাম, তাতে করে আবু উবায়দাকৃত মর্মার্থের উপরে কুতাইবার সমালোচনার অবকাশ আর রইলো না। ইউসুফ ইবনে হোসাইন বলেছেন, মুসা জননীকে দেয়া হয়েছিলো দু'টি নির্দেশ। দু'টি নিষেধাজ্ঞা এবং দু'টি সুসংবাদ। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় ও স্বউদ্যোগে সেগুলোর একটি থেকেও উপকৃত হতে পারতেন না, যতক্ষণ না আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে সরাসরি সাহায্য না করেছেন। সেকারণেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 'তার হৃদয়কে আমি সুদৃঢ় করে না দিলে'।

পরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে—'সে মুসার ভগ্নিকে বললো, এর পিছনে পিছনে যাও। সে তাদের অজ্ঞাতসারে দূর থেকে তাকে দেখছিলো'। একথার অর্থ— মুসা জননী আল্লাহ্র ইলহাম অনুসারে শিশু মুসাকে সিন্দুকে পুরে নদীতে ভাসিয়ে দিলেন। তারপর কন্যাকে বললেন, সকলের অজ্ঞাতসারে দূর থেকে সিন্দুকটির গতিবিধির উপরে দৃষ্টি রেখো। কন্যা তাই করলো।

এরপরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'পূর্ব থেকেই আমি ধাত্রীস্তন্য পানে তাকে বিরত রেখেছিলাম'। একথার অর্থ— সম্রাজ্ঞী আসিয়া শিশু মুসাকে দুধ পান করানোর উদ্যোগ নিলেন। কিন্তু তিনি কোনো স্তন্যদায়িনীর দুধ পান করলেন না। এভাবে ব্যর্থ হয়ে গেলো অনেক স্তন্যদায়িনীর প্রচেষ্টা। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার ছিলো আমিই তাকে অন্যের দুধ পান থেকে বিরত রেখেছিলাম। উল্লেখ্য, এরকম করা হয়েছিলো স্বভাবগত কারণে, ধর্মীয় কারণে নয়। কারণ দুগ্ধপোষ্য শিশু ধর্মীয় বিধানবিমুক্ত। এখানকার 'মারদ্বিয়া' শব্দটির কয়েক রকমের অর্থ হয়। যদি শব্দটিকে 'মুরদ্বিউন' এর বহুবচন ধরা হয় তবে অর্থ হয়— ওই সময় ওই স্তন্যদায়িনীদের স্তনের দুগ্ধপ্রবাহ রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছিলো। এভাবে দুগ্ধপান থেকে বিরত রাখা হয়েছিলো হজরত মুসাকে। আর যদি শব্দটিকে ধরা হয় 'মরদ্বাউন' এর বহুবচন, তাহলে অর্থ দাঁড়ায়— তখন হজরত মুসার দুগ্ধপান শক্তিই রহিত করা হয়েছিলো। ফলে তিনি বাধ্য হয়ে বিরত ছিলেন দুধপানে। আবার যদি বলা হয়, শব্দটির একবচন 'মারদ্বিউন' তবে আধারাধিকরণে অর্থ দাঁড়ায়— মাতৃস্তনই ছিলো তখন দুগ্ধপ্রদানে অক্ষম। আর এটাই ছিলো তাঁর দুগ্ধপান থেকে বিরতির কারণ।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সম্রাজ্ঞী আসিয়া তখন শিশু মুসাকে দুগ্ধপান করানোর জন্য অনেক প্রচেষ্টা চালালেন। একে একে অনেক ধাত্রী তাঁকে দুধপান করাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি কারো স্তন মুখে নিলেন না। ওই ধাত্রীদের দলে মিশে গিয়েছিলেন তাঁর বড় বোন। তিনি বিষয়টি আগাগোড়া লক্ষ্য করে গেলেন। এভাবে অতিবাহিত হলো আটটি রাত।

এরপর বলা হয়েছে— 'মুসার ভগ্নি বললো, তোমাদেরকে আমি এমন এক পরিবারের কথা বলবো কি, যারা তোমাদের হয়ে এর লালন পালন করবে এবং এর মঙ্গলকামী হবে'? একথার অর্থ— হজরত মুসার বোন তখন বললেন, আমি এক মমতাময় পরিবারের কথা জানি। আমার মনে হয়, ওই পরিবারই শিশুটির লালনপালনের দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্য। একমাত্র তারাই হতে পারে এ শিশুর কল্যাণকামী এবং উপযুক্ত প্রতিপালক।

এখানকার 'নাসহুন' (কল্যাণকামনা) শব্দটি ক্রটি, কার্পণ্য ও হৃদয়হীনতার বিপরীতার্থক। কর্মকে ক্রটিমুক্ত রাখার নাম 'নাসহুন'। এভাবে 'হুমলাহু নাসিহুন' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— তারা হবে তার মঙ্গলকামী। ইবনে জুরাইজের বর্ণনায় এসেছে, সুদ্দী বলেছেন, যাদের সম্মুখে হজরত মুসার ভগ্নি এমতো প্রস্তাব উপস্থাপন করেছিলেন, তারা সকলেই ছিলো ফেরাউনের একনিষ্ঠ অনুসারী। তারা

তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে ঘিরে ফেললো। বললো, মনে হয় তুমি এ শিশুর পরিচয় জানো? বলো, এর মাতা-পিতা কে? তিনি বললেন, না, আমি এর পরিচয় জানি না। তবে এতটুকু জানি, যে পরিবারের কথা আমি বলেছি, তারা মহামান্য সম্রাটের হিতাকাংখী। ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেমও এরকম বলেছেন। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হজরত মুসার ভগ্নিকে যখন শাসানো হলো, তখন তিনি সম্রাটপক্ষীয়দের সন্তোষ আকর্ষণার্থে ওরকম কথা বলেছিলেন। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হজরত মুসার ভগ্নি বর্ণিত প্রস্তাব করলেন, তখন উপস্থিত সকলে কৌতূহলবশতঃ তাঁকে ঘিরে বললো, বলো, কে আছেন এমন মমতাময়ী ধাত্রী। তিনি বললেন, আমার মা। তারা বললো, তার কি কোনো সন্তান আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সন্তানটির নাম হারুন। তার জন্ম শিশুবধ আইন প্রয়োগের সময় বহির্ভূত। তারা বললো, তাহলে এক্ষুণি নিয়ে এসো তাকে। হজরত মুসার বোন সাথে সাথে রওয়ানা দিলেন বাড়ীর দিকে। মাকে খুলে বললেন সব। তারপর তাঁকে নিয়ে যথাসময়ে উপস্থিত হলেন রাজপ্রাসাদে। শিশুকে কোলে তুলে নিলেন মা। স্তন্য তুলে দিলেন শিশুর মুখে। শিশুও মাতৃসুরভিতে মোহিত হয়ে পরমানন্দে পান করতে লাগলেন তাঁর দুধ। সুদ্দী বলেছেন, ধাত্রী হিসেবে মুসা-জননীর পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয়েছিলো প্রতিদিন এক দীনার। তিনি ওই পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন একারণে যে, তা ছিলো অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের সম্পদ।

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম তার জননীর নিকট যাতে তার চক্ষু জুড়ায়। সে দুঃখ না করে এবং বুঝতে পারে যে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এটা বোঝে না'। একথার অর্থ— ফেরাউনের লোকেরা স্বচক্ষে দেখলো, কুড়িয়ে পাওয়া অবুঝ শিশুটি পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে তার ধাত্রীমাতার দুধ পান করছে। এভাবেই আমি মুসাকে ফিরিয়ে দিলাম তার মাতৃক্রোড়ে যাতে করে তার জননীর নয়ন শীতল হয়, উবে যায় তার দুঃখবোধের শেষ চিহ্নটুকু এবং সে ভালোভাবে এ বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার অতি অবশ্যই পরিপূরিত হয়ে থাকে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ যারা ফেরাউন ও তার অনুসারীদের মতো. তারা এবিষয়টি মোটেও উপলব্ধি করতে পারে না। কারণ তারা সত্যবোধবিচ্যুত। উল্লেখ্য, মুসা জননী তাঁর নয়নমণিকে নীলনদের উত্তাল তরঙ্গে ভাসিয়ে দিয়ে কিছুকালের জন্য হলেও আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার বিস্মৃত হয়েছিলেন। হয়েছিলেন শোকাকুলা ও বিরহকাতরা। তাঁর এমতো স্খলনের কারণেই এখানে স্নেহসিক্ত ভর্ৎসনা স্বরূপ বলা হয়েছে 'এবং বুঝতে পারে যে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য'।

এখানে ‘লা ইয়ালামূন’ অর্থ তারা বোঝে না। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার যে কতো অমোঘ ও অবশ্যকার্যকর সে সম্পর্কে ফেরাউন ও তার অনুসারীরা মোটেও জানে না। তারা তাই ধারণাও করতে পারেনি যে, মুসা প্রতিপালিত হয়ে চলেছেন আপন মাতৃক্রোড়ে। আর এ আয়োজন সুসম্পন্ন যিনি করেছিলেন, তিনি অন্য কেউ নন, হজরত মুসারই আপনবোন। যাহোক, এভাবে গড়িয়ে চললো দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। হজরত মুসা অতিবাহিত করলেন তাঁর দুগ্ধপানের বয়স। যথাসময়ে তাঁর মাতা তাকে তুলে দিলেন ফেরাউনের তত্ত্বাবধানে। তারপর পূর্ণ পরিতৃপ্তি ও নিশ্চিতি নিয়ে ফিরে এলেন স্বগৃহে।

সূরা ক্বাসাস ঃ আয়াত ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰۤى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّ عِلْمًا ؕ وَ كَذٰلِكَ
نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۴﴾ وَ دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ
اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ ۫ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَ هٰذَا
مِنْ عَدُوِّهٖ ۚ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِىْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِىْ مِنْ عَدُوِّهٖ ۙ
فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ ۫ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ
عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۱۵﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ
فَغَفَرَ لَهٗ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۶﴾ قَالَ رَبِّ بِمَاۤ اَنْعَمْتَ
عَلَىَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ ﴿۱۷﴾ فَاَصْبَحَ فِى الْمَدِيْنَةِ
خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِى اسْتَنْصَرَهٗ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهٗ ؕ
قَالَ لَهٗ مُوْسٰۤى اِنَّكَ لَغَوِىٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۱۸﴾ فَلَمَّاۤ اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِىْ
هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا ۙ قَالَ يٰمُوْسٰۤى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِىْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا

بِالْاَمْسِ ۖ اِنْ تُرِيْدُ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِى الْاَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ
اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿١٩﴾ وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ
يَسْعٰى ۫ قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنَّ الْمَلَاَ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ
اِنِّىْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٢٠﴾ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ ۫ قَالَ
رَبِّ نَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢١﴾

r যখন মূসা পূর্ণ যৌবনে উপনীত ও পরিণত বয়স্ক হইল তখন আমি তাহাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করিলাম; এইভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি।

r সে নগরীতে প্রবেশ করিল যখন ইহার অধিবাসীরা ছিল অসতর্ক। সেথায় সে দুইটি লোককে বিবাদমান দেখিল— একজন তাহার নিজদলের এবং অপর জন তাহার শত্রুদলের। মূসার দলের লোকটি উহার শত্রুর বিরুদ্ধে তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিল, তখন মূসা উহাকে ঘুষি মারিল; এইভাবে সে তাহাকে হত্যা করিয়া বসিল। মূসা বলিল, 'শয়তানের প্ররোচনায় ইহা ঘটিল। সে তো প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তকারী।'

r সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার নিজের প্রতি জুলুম করিয়াছি; সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর।' অতঃপর তিনি তাহাকে ক্ষমা করিলেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

r সে আরও বলিল,'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করিয়াছ, তাহার শপথ, আমি কখনও অপরাধীকে সাহায্য করিব না।'

r অতঃপর ভীত-শংকিত অবস্থায় সে নগরীতে তাহার প্রভাত হইল। হঠাৎ সে শুনিতে পাইল, পূর্বদিন যে ব্যক্তি তাহার সাহায্য চাহিয়াছিল সে তাহার সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতেছে। মূসা তাহাকে বলিল, 'তুমি তো স্পষ্টই একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি।'

r অতঃপর মূসা যখন উভয়ের শত্রুকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল তখন সে ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, 'হে মূসা! গতকল্য তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছ সেভাবে আমাকেও কি হত্যা করিতে চাহিতেছ? তুমি তো পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হইতে চাহিতেছ, শান্তি স্থাপনকারী হইতে চাহ না!'

r নগরীর দূর প্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিল ও বলিল, 'হে মূসা! ফিরাউনের পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে। সুতরাং তুমি বাহিরে চলিয়া যাও, আমি তো তোমার মংগলকামী।'

r ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় সে তথা হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি জালিম সম্প্রদায় হইতে আমাকে রক্ষা কর।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যখন মুসা পূর্ণ যৌবনে উপনীত ও পরিণত বয়স্ক হলো, তখন আমি তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম'। একথার অর্থ, মুসা যখন যৌবনপ্রাপ্ত হলেন ও পৌঁছলেন পরিণত বয়সে তখন আমি তাকে দান করলাম উচ্চতর প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'শিদ্দত' শব্দের বহুবচন 'আশুদ্দা'। এর অর্থ দৃঢ়, পাকাপোক্ত। অর্থাৎ হজরত মুসা যখন ওই বয়সে উপনীত হলেন, যে বয়সে প্রকাশ পায় পরিণত বুদ্ধিমত্তা। কালাবী বলেছেন, আঠারো থেকে কুড়ি বৎসর বয়সকে বলে 'আশুদ্দা'। মুজাহিদের মতে বয়সের পরিণতির শেষ সীমা হচ্ছে তেত্রিশ বৎসর।

'ইসতাওয়া' অর্থ জ্ঞানের পূর্ণত্ব, পরিণতি। অর্থাৎ যখন তাঁর বয়স হয়েছিলো চল্লিশ বৎসর। এরকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে সাঈদ ইবনে যোবায়ের। কারো কারো মতে 'ইসতাওয়া' বলে যৌবনের শেষসীমাকে।

'হুকমান' অর্থ উচ্চতর প্রজ্ঞা, নবুয়ত। আর 'ইলমান' অর্থ জ্ঞান, আল্লাহ্‌তায়ালার বিধানাবলীর পরিচিতি। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম' কথাটির মাধ্যমে তাঁর নবুয়তপ্রাপ্তির বিষয়টি প্রমাণিত হয় না। কারণ তিনি নবুয়ত পেয়েছিলেন আরো পরে, মিসর থেকে মাদিয়ান গমনের পর মিসরে পুনঃপ্রত্যাবর্তনের পথে। তাই এখানকার 'উচ্চতর প্রজ্ঞা' ও 'জ্ঞান' অর্থ হবে নবীসুলভ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও ধর্মবোধ। আমি বলি,'ওয়াও' (এবং) সংযোজক অব্যয়টি এখানে সাধারণ যোজনী হিসেবে ব্যবহৃত। পরম্পরাগত বিন্যাস এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য নয়। তাই বলতে হয়, যদিও তিনি নবুয়ত পেয়েছিলেন আরো পরে, তবুও এখানে সে প্রসঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে প্রসঙ্গক্রমে। কৃত প্রতিশ্রুতির অঙ্গ হিসেবে। কারণ তাঁকে নবুয়ত প্রদানের বিষয়টিও ছিলো হজরত মুসার জননীকে প্রদত্ত অঙ্গীকারভূত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি'। একথার অর্থ— যেভাবে আমি মুসা ও তাঁর জননীকে তাদের পুণ্যকর্মের প্রতিদান দিয়েছি, সেভাবেই আমি প্রতিদান দিয়ে থাকি অন্যান্য পুণ্যবানদেরকে।

পরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'সে নগরীতে প্রবেশ করলো যখন তার অধিবাসীরা ছিলো অসতর্ক'। সুদ্দী বলেছেন, মিসরের সীমান্তবর্তী ওই শহরটির

নাম ছিলো মাদিয়ান। মুকাতিল বলেছেন, এখানে 'শহর' অর্থ খানীনের একটি প্রদেশ, যার অবস্থিতি ছিলো রাজধানী থেকে ছয় মাইল ব্যবধানে। কেউ কেউ বলেছেন, ওই শহরটির নাম মদীনাতুশ্‌শামস। মাহাল্লী বলেছেন, মান্নাফ'।

এখানে 'হিনি গাফলাতিন' অর্থ অসতর্ক মুহূর্তে, দ্বিপ্রহরিক বিশ্রামের সময়। মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজী বলেছেন, মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়। ঘটনাটি ছিলো এরকম— হজরত মুসা পরিচিত ছিলেন ফেরাউনের পুত্র হিসেবে। তাঁর বাহন ছিলো ফেরাউনি বাহনের মতো। পোশাক পরিচ্ছদ ছিলো রাজকীয়। একদিন মিসর সম্রাট ফেরাউন তার দলবলসহ কোথায় ভ্রমণে বের হয়ে গেলো। হজরত মুসা তখন সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন। পরে এসে দেখলেন তাঁকে ছেড়েই সকলে রওয়ানা হয়ে গিয়েছে। তৎক্ষণাৎ তিনিও একটি বাহনে চড়ে বের হয়ে পড়লেন। দ্বিপ্রহরের সময় তিনি উপস্থিত হলেন মান্নাফ শহরে। শহরবাসীরা তখন স্ব স্ব গৃহে বিশ্রামরত। মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেছেন, ওই শহরের ইসরাইল বংশীয় কিছু সংখ্যক লোক ছিলো হজরত মুসার ভক্ত। তারা তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতো। আর অনুসরণ করতে চেষ্টা করতো তাঁর শুভ উপদেশের। যখন তাঁর অভ্যন্তরস্থিত সুপ্ত শুভবোধ জাগ্রত হতে শুরু করলো, তখন তিনি বিরোধী হয়ে উঠলেন ফেরাউন ও তার অনুসারীদের অশুভধর্মমতের। বিষয়টি সম্রাটের কানেও পৌঁছলো। অনেকে তাঁকে সতর্ক হবার পরামর্শ দিলো। তাই তিনি ওই শহরে যাতায়াত করতে শুরু করলেন গোপনীয়তা বজায় রেখে। ওই দিনও তিনি ওই শহরে প্রবেশ করলেন এমন সময় যখন অধিকাংশ শহরবাসী ছিলো বিভিন্নরকমের ক্রীড়াকৌতুকে মগ্ন। কারণ দিনটি ছিলে তাঁদের উৎসবের দিন।

এরপর বলা হয়েছে— সেখানে সে দু'টি লোককে বিবদমান দেখলো, একজন তার নিজ দলের এবং অপরজন তার শত্রুদলের'। এখানে 'ইয়াক্বতাতিলান' অর্থ বিতণ্ডারত বিবাদমান, 'মিন শীয়া'তিহী' অর্থ নিজ দলের। অর্থাৎ বনী ইসরাইলদের। আর 'মিন আ'দুউবিহী' অর্থ শত্রুদলের। অর্থাৎ ফেরাউনের দলের, যারা পরিচিত ছিলো কিবতী হিসেবে।

এরপর বলা হয়েছে— 'মুসার দলের লোকটি তার শত্রুর বিরুদ্ধে তার সাহায্য প্রার্থনা করলো'। একথার অর্থ— কিবতী ছিলো আক্রমণপ্রবণ। তাই ইসরাইলী লোকটি তার আক্রমণ থেকে অব্যাহতি কামনার্থে হজরত মুসার হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করলো।

এখানে 'ইসতাগাছাহু' অর্থ, সে সাহায্য প্রার্থনা করলো। ঘটনাটি এরকম— হজরত মুসা ভয়ে জড়সড় ইসরাইলী লোকটির সাহায্যার্থে এগিয়ে গেলেন। তাঁর মুসার পরিচয় কিবতীটির জানা ছিলো। সর্বসাধারণের মতো সে-ও জানতো তিনি

শিশুকালে দুধপান করেছেন এক বনী ইসরাইলী রমণীর। সেকারণেই হয়তো তাঁর মধ্যে দেখা যেতো তাদের প্রতি একধরনের পক্ষপাতিত্ব। সে কিছুটা থমকে গেলো। কিন্তু তার আক্রমণপ্রবণতা পরিত্যাগ করলো না। হজরত মুসা রাগান্বিত হলেন। কিবতীটিকে বললেন, ওকে ছেড়ে দাও। কিবতী বললো, কেনো ছাড়বো? আপনি জানেন না, ও হচ্ছে আপনার পিতার আহার্য্যশালার জ্বালানী সরবরাহকারী। অথচ সে তার দায়িত্ব পালনে নিস্পৃহ। হজরত মুসা তখন পূর্ণ যৌবনদীপ্ত বলিষ্ঠদেহী পুরুষ। তিনি তার মুখে মুখে তককরা সহ্য করতে পারলেন না।

এরপর বলা হয়েছে— 'তখন মুসা তাকে ঘুষি মারলো'। এইভাবে সে তাকে হত্যা করে বসলো'। এখানকার 'ওয়াকাযাহু' শব্দটিকে হজরত ইবনে মাসউদ পাঠ করতেন 'লাকাযাহু'। শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক। এর অর্থ— তাকে ঘুষি মারলেন। কেউ কেউ বলেছেন, বুকে ঘুষি মারাকে বলে 'ওয়াকাযা'। আর পিঠে ঘুষি মারাকে বলে 'লাকাযা'। ফাররা বলেছেন, এর অর্থ ধাক্কা দেয়া। আবু উবায়দা বলেছেন, 'ওয়াকাযাহু' অর্থ অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দিয়ে ধাক্কা দেওয়া। কোনো কোনো তাফসীরে পাওয়া যায়, হজরত মুসা ওই কিবতীর উপরে তখন প্রয়োগ করেছিলেন বিশাল ওজনের মুষ্টাঘাত।

'ফাক্বদ্বা আলাইহী' অর্থ সে অক্কা পেলো। অর্থাৎ হজরত মুসা তাকে বধ করলেন। মাহাল্লী লিখেছেন, নিহত কিবতীটিকে সেখানেই বালির মধ্যে পুঁতে ফেলেছিলেন হজরত মুসা। কিন্তু এভাবে সে নিহত হবে একথা ভাবতেই পারেননি তিনি। তাই তিনি এর জন্য হয়েছিলেন অতিশয় অনুতপ্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'মুসা বললো, শয়তানের প্ররোচনায় এরকম ঘটলো। সে তো প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তকারী'। একথার অর্থ— হজরত মুসা ঘটনার আকস্মিকতায় স্তম্ভিত ও অনুতপ্ত। বললেন, এরকম কাজ তো শয়তানের প্ররোচনাজাত। সেতো মানুষের নিশ্চিত শত্রু। এভাবেই সে তাদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়। উল্লেখ্য, হজরত মুসা তখনো কাফেরবধের নির্দেশপ্রাপ্ত হননি, সেকারণেই তিনি ওই হত্যাকে অভিহিত করেছিলেন শয়তানের কর্ম বলে। কিন্তু একথাও ঠিক যে, এভাবে কাউকে হত্যা করার পরিকল্পনা তাঁর আদৌ ছিলো না। বিষয়টি সম্পূর্ণতঃই ছিলো তাঁর অনিচ্ছাকৃত। সুতরাং এ ঘটনা তাঁর নিষ্পাপত্বের অন্তরায় নয়। কিন্তু যেভাবেই ঘটনাটি ঘটে থাকুক না কেনো, ঘটনাটি কোনো শুভ ঘটনা নিশ্চয়ই নয়। তাই তিনি কর্মটিকে চিহ্নিত করেছিলেন শয়তানী কর্ম বলে এবং এর জন্য যথারীতি প্রকাশ করেছিলেন আন্তরিক অনুতাপ।

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'সে বললো, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি; সুতরাং আমাকে ক্ষমা করো। অতঃপর তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— হজরত মুসা প্রার্থনা করলেন, হে আমার পরম প্রভুপালক! তোমার নির্দেশ

ব্যতিরেকেই আমার দ্বারা হত্যাকাণ্ড সাধিত হলো। নিশ্চয় এটা আমার চরম অপরাধ। সুতরাং তুমি কৃপাপরবশ হয়ে আমাকে ক্ষমা করো। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে মার্জনা করলেন। কারণ তিনি তো মার্জনা প্রার্থীদের প্রতি ক্ষমাপরবশ ও পরম দয়ার্দ্র। উল্লেখ্য, এখানে ঘোষিত হয়েছে আল্লাহ্র অধিকার খর্বের মার্জনা প্রদানের কথা। এরপর রইলো বান্দার অধিকার খর্বের কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে সে প্রশ্নের অবতারণা করার সুযোগও নেই। কারণ নিহত কিবতীটি ছিলো অংশীবাদী ও অপরাধী। সুতরাং কিসাস ও রক্তপণের অবকাশও এখানে অনুপস্থিত।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'সে আরো বললো, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছো, তার শপথ! আমি কখনো অপরাধীকে সাহায্য করবো না'।

আমি বলি, এখানকার 'বিমা আনআ'মতা' (তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছো) বাক্যটির 'বা' অব্যয়টি শপথার্থক। আর পরবর্তী বাক্যটি পরিণতি প্রকাশক। 'ফালান আকুনা' (আমি কক্ষনোই হবো না সাহায্যকারী) কথাটি সংযোজিত রয়েছে একটি অনুক্ত বাক্যের সঙ্গে। ওই অনুক্ত বাক্যটিসহ পূর্ণ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার প্রভুপালক! তুমি যে অনুগ্রহরাজি দ্বারা আমাকে ধন্য করেছো, তার শপথ করে আমি ঘোষণা দিচ্ছি, তোমার প্রতি অনুতপ্ত প্রত্যাবর্তনের। একথায় প্রকাশ করছি যে, আমি কখনোই সাহায্যকারী হবো না কোনো অন্যায়চারীর।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আলমুজ্‌রিমীন' অর্থ অবিশ্বাসীদের। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যার পক্ষে আমি দাঁড়িয়েছিলাম, সেই বনী ইসরাইল লোকটি ছিলো অবিশ্বাসী। এরকম অবিশ্বাসীর সাহায্যকারী আমি আর কখনো হবো না। কেউ কেউ বলেছেন, বক্তব্যটি হবে এরকম— আমি ভবিষ্যতে আর কখনো এরকম ব্যক্তিকে সাহায্য করবো না, যার ফলে আমিই হয়ে যাবো অপরাধীদের অন্তর্ভূত।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'অতঃপর ভীত-শংকিত অবস্থায় সে নগরীতে তার প্রভাত হলো। হঠাৎ সে শুনতে পেলো, পূর্বদিন যে ব্যক্তি তার সাহায্য চেয়েছিলো, সে তার সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে। মুসা বললো, তুমি তো স্পষ্টই একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি'। একথার অর্থ— যে শহরে হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছিলো ওই শহরেই হজরত মুসা রাত্রিযাপন করলেন। সারারাত কাটলো তাঁর ভয়ে ভয়ে। সকালে রাস্তায় বের হতেই দেখলেন, গতকাল যে লোকটি তাঁর সাহায্যার্থী হয়েছিলো, সেই লোকটিই আজ আবার সাহায্যের জন্য তাঁকে চিৎকার করে ডাকছে। তিনি বুঝলেন, মানুষের সঙ্গে কলহ বাধানোই তার স্বভাব। তাই তাকে বললেন, তুমি তো দেখছি অমানুষ, বিভ্রান্ত।

এখানে 'ইয়াস্‌তাসরিখুহু' অর্থ সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে। কথাটি নিষ্পন্ন হয়েছে 'সুরাখ' থেকে। এর অর্থ চিৎকার করা, চিৎকার করে সাহায্য প্রার্থনা করা।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখন ওই হত্যাকাণ্ডের কথা জানাজানি হয়ে গেলো, তখন একদল কিবতী ফেরাউনের দরবারে গিয়ে এই মর্মে অভিযোগ উপস্থিত করলো যে, জনৈক বনী ইসরাইল আমাদের একজন লোককে হত্যা করেছে। আমরা এর প্রতিকারার্থী। ফেরাউন বললো, সে লোককে খুঁজে বের করো এবং উপস্থিত করো চাক্ষুষ সাক্ষী। কিন্তু কিবতী জনতা দু'টোর একটিও করতে পারলো না। ওদিকে হজরত মুসা যখন ওই শহর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করলেন, তখন দেখলেন, আগের দিন যাকে সাহায্য করতে গিয়ে তিনি মহাঅনর্থ ঘটিয়েছিলেন সেই লোকটি আজ আবার বিতণ্ডা করছে আর একজন কিবতীর সঙ্গে। তাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সে আবার সাহায্যের জন্য চিৎকার শুরু করলো। হজরত মুসা বললেন, তুমি আসলে ভয়ানক দুষ্ট লোক। যার তার সাথে যখন তখন বিবাদ বাধাও। একথা বলেই তিনি লোকটির উপরে চড়াও হলেন।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'অতঃপর যখন মুসা উভয়ের শত্রুকে প্রহার করতে উদ্যত হলো, তখন সে ব্যক্তি বলে উঠলো, হে মুসা! গতকাল তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছো, সেভাবে আমাকেও কি হত্যা করতে চাও? তুমি তো পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হতে চাও, শান্তিস্থাপনকারী হতে চাও না'।

এখানে 'ওয়া আদুউল লাহুমা' অর্থ উভয়ের শত্রু। অর্থাৎ হজরত মুসা ও সাহায্যার্থী লোকটির শত্রু। কেননা সে ছিলো বিধর্মী। অথবা বলা যেতে পারে, কিবতীরা বনী ইসরাইলের জাতীয় শত্রু। পরের দিনেও ওই বনী ইসরাইলী হয়েছিলো আর এক কিবতীর দ্বারা আক্রান্ত। তাই হজরত মুসা তাকে 'বিভ্রান্ত' বললেও তার সাহায্যেই হস্ত প্রসারিত করে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু ওই ইসরাইলী ভাবলো, আজ মুসা তাকেই ঘুষি মেরে বসবে। তাই সে চিৎকার করে বললো, তুমি কি কালকের লোকটির মতো আমাকেও মেরে ফেলবে নাকি। অথবা বলা যায়, 'এরকম বলেছিলো তার প্রতিপক্ষ কিবতীটি। কারণ হজরত মুসা যখন বনী ইসরাইলীটিকে বিভ্রান্ত' বললেন, তখন সে ধারণা করলো এই লোকটিই তাহলে গতকালের হত্যাকাণ্ডের নায়ক। তবে প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটিই সুসঙ্গত।

এখানে 'জ্বাব্‌বারান' অর্থ স্বেচ্ছাচারী, দুর্ধর্ষ, বিশ্বসেরা খুনী। এভাবে এখানকার শেষ বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে মুসা! তুমি ঘোর স্বেচ্ছাচারীর মতো একের পর এক মানুষ খুন করতে চাও নাকি? সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করতে চাও তোমার অবাধ স্বেচ্ছাচরণ? অথচ তুমি ইচ্ছে করলেই তোমার শক্তিকে করতে পারো সংযত, সংহত। হতে পারো বিবদমান দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে শান্তিস্থাপয়িতা। সেরকম মহৎ ইচ্ছা কি তোমার আদৌ নেই?

এরপরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'নগরীর দূর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে এলো ও বললো, হে মুসা ফেরাউনের পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করছে। সুতরাং তুমি বাইরে চলে যাও। আমি তো তোমার মঙ্গলকামী।' একথার অর্থ— ওই কিবতী যখন বনী ইসরাইল লোকটিকে বলতে শুনলো 'গতকাল তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ, সেভাবে আমাকেও কি হত্যা করতে চাও' তখন সে নিশ্চিত হলো যে, মুসাই গতকালের হত্যাকাণ্ডের হোতা। তাই সে অতি দ্রুত যাত্রা করলো রাজধানীতে। ফেরাউনের দরবারে উপস্থিত হয়ে খুলে বললো সব। ফেরাউন তার পারিষদবর্গের সঙ্গে পরামর্শক্রমে ঠিক করলো, এর যথোপযুক্ত বিহিত অবশ্যই করতে হবে। হজরত মুসাও তখন রাজধানী অভিমুখী। নগরীতে প্রবেশের প্রাক্কালে তিনি দেখলেন, একজন লোক ছুটতে ছুটতে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। তিনি থমকে দাঁড়ালেন। লোকটি কাছে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বললো, হে মুসা! শিগগির এ নগরী থেকে পালাও। ফেরাউন ও তার সভাসদেরা তোমাকে হত্যা করতে চায়। সুতরাং তুমি আর দেরী কোরো না। এক্ষুণি চলে যাও। আমি তোমার কল্যাণকামী।

অধিকাংশ কোরআন ব্যাখ্যাতার মতে ওই লোকটির নাম ছিলো হুজাইল, কেউ বলেছেন শামউন, আবার কেউ বলেছেন সামআ'।। তিনি ছিলেন কিবতী কিন্তু বিশ্বাসী। অন্য এক আয়াতে এঁকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে 'মু'মিনুম মিন আলি ফিরআউন (কিবতীদের মধ্যে বিশ্বাসী)।

এরপরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় সে সেখান থেকে বের হয়ে পড়লো এবং বললো, হে আমার প্রতিপালক! তুমি জালিম সম্প্রদায় থেকে আমাকে রক্ষা করো'। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়, নবী-রসুলগণও আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের ভয়ে ভীত হন। অথচ অন্যত্র এরশাদ হয়েছে 'লা ইয়াখ্শাওনা আহাদান ইল্লাল্লহ্ (তারা এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় পায় না)। এই আয়াত বৈসাদৃশ্যের প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, ভয় সৃষ্টিকুলের স্বভাবজ বৃত্তি। এরকম স্বভাবজ বৃত্তির প্রকাশ নবী-রসুলগণের জন্য অশোভন অথবা অসমীচীন নয়। আর 'তাঁরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় পায় না' কথাটি প্রকৃত অর্থ হচ্ছে— তাঁরা আল্লাহ্র বিধান কার্যকর করার ব্যাপারে প্রাণনাশের আশংকা থাকলেও আদিষ্ট দায়িত্ব থেকে কখনো পশ্চাদপসরণ করেন না। আর তাঁরা আল্লাহ্র বান্দাদেরকে ভয় করেন একারণে যে, আল্লাহ্র রোষ অনেক ক্ষেত্রে তাঁর বান্দাদের দ্বারাই বাস্তবায়িত হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকেই কখনো কখনো করেন শাস্তিদানের মাধ্যম। সুতরাং এরকম বান্দার ভয় প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্রই ভয়।

এরপরের ঘটনা হচ্ছে— সেই মুহূর্তে হজরত মুসা যাত্রা করলেন মিসর ছেড়ে মাদিয়ান অভিমুখে। পেছনে পড়ে রইলো মাতৃস্মৃতি, কৈশোর ও যৌবনের এক কর্মকোলাহল অধ্যায়। পড়ে রইলো শতসহস্র স্মৃতি। পথ চলতে চলতে তিনি তাঁর প্রিয়তম প্রভুপালনকর্তা সমীপে প্রার্থনা করলেন, হে আমার পরম প্রভুপালক! আমি কেবল তোমার শরণ যাচনা করি। আমাকে পৌঁছে দাও নিরাপদ কোনো ভূখণ্ডে। সীমালংঘনকারীদেরকে আমার কাছে উপনীত হতে দিয়ো না।

সূরা ক্বাসাস ঃ আয়াত ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَآءَ
السَّبِيْلِ ﴿٢٢﴾ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ
يَسْقُوْنَ ۫ وَ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ ۚ قَالَ مَا
خَطْبُكُمَا ؕ قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ ٚ وَاَبُوْنَا شَيْخٌ
كَبِيْرٌ ﴿٢٣﴾ فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰۤى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّيْ لِمَآ
اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ﴿٢٤﴾ فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِيْ عَلَى
اسْتِحْيَآءٍ ۫ قَالَتْ اِنَّ اَبِيْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ؕ
فَلَمَّا جَآءَهٗ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۙ قَالَ لَا تَخَفْ ٚ نَجَوْتَ مِنَ
الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٥﴾ قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰۤاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ۫ اِنَّ خَيْرَ مَنِ
اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ﴿٢٦﴾ قَالَ اِنِّيْۤ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى
ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰۤى اَنْ تَاْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍ ۚ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ
عِنْدِكَ ۚ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ؕ سَتَجِدُنِيْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ

الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾ قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَ بَيْنَكَ ؕ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿٢٨﴾

r যখন মূসা মাদ্‌য়ান অভিমূখে যাত্রা করিল তখন বলিল, 'আশা করি, আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করিবেন।'

r যখন সে মাদ্‌য়ানের কূপের নিকট পঁহুছিল, দেখিল, একদল লোক তাহাদিগের জানোয়ার গুলিকে পানি খাওয়াইতেছে এবং উহাদিগের পশ্চাতে দুই জন রমণী তাহাদিগের পশুগুলিকে আগ্‌লাইতেছে। মূসা বলিল, 'তোমাদিগের কী ব্যাপার?' উহারা বলিল, 'আমরা আমাদিগের জানোয়ারগুলিকে পানি খাওয়াইতে পারি না, যতক্ষণ রাখালেরা উহাদিগের জানোয়ারগুলিকে লইয়া সরিয়া না যায়। আমাদিগের পিতা অতি বৃদ্ধ।'

r মূসা তখন উহাদিগের জানোয়ারগুলিকে পানি খাওয়াইল। তৎপর সে ছায়ার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করিবে আমি তাহার প্রার্থী।'

r তখন রমণীদ্বয়ের একজন শরম-জড়িত চরণে তাহার নিকট আসিল এবং বলিল, 'আমার পিতা তোমাকে পুরস্কৃত করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিতেছেন, কেন না তুমি আমাদিগের জানোয়ারগুলিকে পানি খাওয়াইয়াছ।' অতঃপর মূসা তাহার নিকট আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে সে বলিল, 'ভয় করিও না, তুমি জালিম সম্প্রদায়ের কবল হইতে বাঁচিয়া গিয়াছ।'

r উহাদিগের একজন বলিল, 'হে পিতা! তুমি ইহাকে মজুর নিযুক্ত কর, কারণ তোমার মজুর হিসাবে উত্তম হইবে সেই ব্যক্তি, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।'

r পিতা মূসাকে বলিল, 'আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সহিত বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বৎসর আমার কাজ করিবে যদি তুমি দশ বৎসর পূর্ণ কর সে তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তুমি আমাকে সদাচারী পাইবে।'

r মূসা বলিল, 'আপনার ও আমার মধ্যে এই চুক্তিই রহিল। এই দুইটি মিয়াদের কোন একটি আমি পূর্ণ করিলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিবে না। আমরা যে বিষয়ে কথা বলিতেছি আল্লাহ্ তাহার সাক্ষী।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত মুসা ছিলেন সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ্‌র প্রতি সমর্পিত। তাই তিনি মিসর থেকে নিরুদ্দেশ যাত্রার প্রাক্কালে বললেন, আমি দৃঢ় আশা রাখি, আল্লাহ্‌পাক অবশ্যই আমাকে দেখাবেন সরল পথ। জুজায

বলেছেন, তিনি যে পথ ধরে যাত্রা করেছিলেন ওই পথের শেষ গন্তব্য ছিলো মাদিয়ান। মাদিয়ান হজরত ইব্রাহিমের বংশধরগণের দ্বারা আবাদকৃত একটি বর্ধিষ্ণু জনপদ। আর সেখানে তিনি উপনীত হয়েছিলেন পদব্রজে। মিসর থেকে আটদিনের সময়ের দূরত্বের ওই জনপদটি ছিলো ফেরাউনের সাম্রাজ্যবহির্ভূত। হজরত মুসার ওই যাত্রা ছিলো অনির্দিষ্ট এক গন্তব্যের দিকে। মিসর রাজ্যের বাইরে গমন করার জন্যই তিনি ধরেছিলেন একটি অচেনা পথ। আর যখন তিনি বললেন 'আশা করি আমার প্রভুপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করবেন। তখন মানবাকৃতিতে আবির্ভূত হলো এক ফেরেশতা। তার হাতে ছিলো একটি বর্শা। মানবরূপী ওই ফেরেশতাই তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন মাদিয়ানে।

কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ লিখেছেন, ওই যাত্রায় হজরত মুসা ছিলেন পাথেয়হীন। পথিপার্শ্বের লতাপাতা ভক্ষণ করেই তাঁকে তখন নিবারণ করতে হয়েছিলো ক্ষুণ্নিবৃত্তি। দিনের পর দিন সবুজ লতাপাতা ভক্ষণ করে তাঁর পুরীষ ধারণ করেছিলো সবুজবর্ণ। আর ক্রমাগত পথ চলতে চলতে পায়ের নখগুলো পড়েছিলো খসে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত ওই ক্লেশকর অভিযাত্রাই ছিলো তাঁর জন্য প্রথম পরীক্ষা।

পরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'যখন সে মাদিয়ানের কূপের নিকট পৌঁছলো, তখন দেখতে পেলো, একদল লোক তাদের জানোয়ারগুলোকে পানি খাওয়াচ্ছে এবং তাদের পশ্চাতে দু'জন রমণী তাদের পশুগুলোকে আগলাচ্ছে'। এ কথার অর্থ— পথশ্রান্ত মুসা উপনীত হলেন মাদিয়ানের এক কূপের পাশে। দেখলেন, রাখালেরা ওই কূপ থেকে পানি তুলে নিজেরা পান করছে এবং পান করাচ্ছে তাদের পশুগুলোকে। আর একটু তফাতে তাদের পশুপাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন যুবতী। পিপাসিত পশুগুলো বার বার কূপের দিকে যেতে চাচ্ছে আর সেগুলোকে সামলে রাখছে তারা, যাতে সেগুলো অন্য রাখালদের পশুপালের সঙ্গে মিশে না যায়।

এরপর বলা হয়েছে— মুসা বললো, 'তোমাদের কী ব্যাপার'? একথার অর্থ— হজরত মুসা বুঝলেন, যুবতীদ্বয় সমস্যাক্রান্ত। তাই বললেন, তোমরা এভাবে দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছো কেনো? এখানে 'খাতাব' অর্থ সমাচার, বিষয়। এরকম বলা হয়েছে 'কামুস' নামক অভিধানগ্রন্থে। কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটি একটি মূল শব্দ এবং কর্মপদার্থক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমাদের উদ্দেশ্য কী?

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা বললো, আমরা আমাদের জানোয়ারগুলোকে পানি খাওয়াতে পারি না, যতক্ষণ রাখালেরা তাদের জানোয়ারগুলোকে নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ'। একথার অর্থ— তারা বললো, পুরুষ রাখালদের পশুগুলোর ভিড়ে আমরা কূপের কাছে ঘেঁষতে পারছি না। ওদের

পশুগুলো পরিতৃপ্ত হয়ে চলে গেলেই কেবল আমরা কূপের কাছে যেতে পারবো এবং পানি পান করাতে পারবো আমাদের পশুগুলোকে। এভাবে প্রতিদিনই সবার পরে আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করাতে হয়। বাড়ীতে রয়েছেন কেবল আমাদের বৃদ্ধ পিতা। তিনি তো অক্ষম।

এখানে যুবতীদ্বয়ের উদ্ধৃত বাক্যে ফুটে উঠেছে শালীনতা ও আভিজাত্যবোধ। পুরুষ রাখালদের ভিড় থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখাই তাদের আভিজাত্যবোধ ও সম্ভ্রমবোধের প্রমাণ।

'ওয়া আবুনা শাইখুন কাবীর' অর্থ আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ। বাহ্যত মনে হয় কথাটি অবান্তর। কারণ হজরত মুসা এ সম্পর্কে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করেননি। যুবতীদ্বয় একথা বলেছেন স্বতঃপ্রণোদিতা হয়ে। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যায়, কথাটি এখানে অবান্তর নয়। বরং হজরত মুসার উক্তিতে এই উত্তরের প্রশ্ন প্রচ্ছন্ন ছিলো। তাঁর 'তোমাদের কী ব্যাপার' কথাটির মর্মার্থ ছিলো এরকম— কূপ তো সামনেই। তবু তোমরা তোমাদের পশুগুলোকে সেখানে যেতে দিচ্ছো না কেনো? আর যুবতীদ্বয়ের উত্তর ছিলো, কেমন করে যেতে দিবো। আমরা তো নারী। পুরুষদের ভিড়ে আমরা যাই কি করে? আর আমাদের বাড়ীতে রয়েছেন কেবল আমাদের অতি বৃদ্ধ পিতা। তিনি যদি সক্ষম হতেন তবে আমাদেরকে আর এখানে আসতে হতো না। কাজেই এখন আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

আলোচ্য আয়াতে কথিত 'অতি বৃদ্ধ' ব্যক্তিকে সে সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। হাসান, মুজাহিদ,জুহাক ও সুদ্দী বলেছেন, তিনি ছিলেন মহামান্য নবী হজরত শোয়াইব। সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং ওয়াহাব বলেছেন, তাঁর নাম ছিলো শীবোয়ান। তিনি ছিলেন হজরত শোয়াইবের ভ্রাতুষ্পুত্র। হজরত শোয়াইবের মহাতিরোধান ঘটেছিলো এ ঘটনার আগে। আর তাঁকে সমাহিত করা হয়েছিলো মাকামে ইব্রাহিম ও জমজম কূপের মধ্যবর্তী স্থলে। কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেছেন, তিনি ছিলেন ভিন্ন এক বিশ্বাসবান ব্যক্তি, যিনি ইমান এনেছিলেন হজরত শোয়াইবের পবিত্র সান্নিধ্যে।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'মুসা তখন তাদের জানোয়ারগুলোকে পানি খাওয়ালো'। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে, হজরত মুসা যুবতীদ্বয়ের কথা শুনে এগিয়ে গেলেন। তাদের ছাগ-যুথকে নিয়ে পৌঁছলেন কূপের সন্নিকটে। তারপর রাখালদের পশুগুলোকে সরিয়ে দিয়ে ছাগগুলোকে পানি পান করালেন পরিতৃপ্তি সহকারে। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি তখন মেয়ে দু'টোর ছাগপালকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন নিকটবর্তী আর একটি কূপের দিকে। কূপটি ঢাকা ছিলো একটি বিশাল পাথর দিয়ে। তিনি একাই সেই

পাথরটি ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ফেললেন। তারপর ওই কূপ থেকে পানি তুলে পান করালেন তাদের ছাগলগুলোকে। ওই কূপের উপরের পাথরটি ছিলো প্রকাণ্ড। কয়েকজন মিলেও পাথরটি সরাবার ক্ষমতা রাখতো না। অথচ হজরত মুসা একাই সেই প্রকাণ্ড পাথরটি উঠিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন দূরে। কেউ কেউ আবার বলেছেন, রাখালদের কূপটি থেকেই কোনোক্রমে হজরত মুসা উঠিয়েছিলেন এক বালতি পানি। আর ওই সামান্য পানি দিয়েই তিনি পরিতৃপ্ত করিয়েছিলেন মেয়ে দু'টোর ছাগপালকে।

হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব থেকে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে— হজরত মুসা দেখলেন, পানি পানপর্ব শেষ করে রাখালেরা কূপটির মুখে পাথর চাপা দিলো। তারপর ধরলো যার যার বাড়ীর পথ। হজরত মুসা এগিয়ে গিয়ে কূপের মুখের পাথরটি সরিয়ে দিলেন। পাথরটি ছিলো প্রকাণ্ড। কয়েকজন মিলেও সেটিকে সরাবার সামর্থ্য রাখতো না। অথচ তিনি একাই সেটিকে সরিয়ে দিয়ে কূপ থেকে পানি তুললেন। তারপর পরিতৃপ্তির সঙ্গে পান করালেন যুবতীদ্বয়ের ছাগপালকে। পানি তিনি তুলেছিলেন মাত্র এক বালতি। আর তা দিয়ে পরিতৃপ্ত করেছিলেন তাদের সকল ছাগলকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তৎপর সে ছায়ার নিচে আশ্রয় গ্রহণ করে বললো, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবে আমি তার প্রার্থী'। হজরত মুসার এমতো প্রার্থনায় প্রচ্ছন্ন রয়েছে সুক্ষ্ম অনুযোগ। আর আপনতম প্রভুপালকের উদ্দেশ্যে এমতো অনুযোগ উত্থাপনের মধ্যে দোষের কিছু নেই। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হজরত মুসা ছিলেন পথশ্রান্ত। তদুপরি সম্পন্ন করলেন ছাগ-পালকে পানি পান করানোর মতো শ্রমসাধ্য কাজ। তাই তিনি বিশ্রাম যাপনার্থে বসে পড়লেন নিকটের এক বৃক্ষচ্ছায়ায়। তারপর বললেন, হে আমার প্রভুপালয়িতা! আমি পরিশ্রান্ত। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর। তাই আমি তোমার কাছে ওই অনুকম্পা যাচনা করি, যা তুমি নির্ধারণ করেছো তোমার একান্ত মুখাপেক্ষী এ দাসের জন্য।

বিদ্বজ্জনের মতে এখানকার 'লিমা আনযালতা' কথাটির 'লি' অব্যয়টি 'ইলা' (প্রতি) অর্থে ব্যবহৃত। আর 'ফক্বীরুন' অর্থ প্রার্থী, মুখাপেক্ষী। 'ইনযাল' অর্থ অবতরণ, প্রেরণ। এখানে অর্থ হবে— দান। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আনযালল্লাহু নিয়ামাহু আও নি'মাতাহু আ'লাল খলক্ব' (আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টিকে দান করেছেন অনুগ্রহরাজি)। উল্লেখ্য, আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহরাজি কখনো আসে সরাসরি। যেমন কোরআনের আয়াতের অবতরণ, বৃষ্টিবর্ষণ ইত্যাদি। আবার কখনো অনুগ্রহ সম্ভার আসে উপলক্ষ আকারে অপ্রত্যক্ষরূপে। যেমন এক আয়াতে ঘোষিত হয়েছে 'ওয়া আনযালনাল হাদীদা' (আর আমি অবতীর্ণ করেছি লৌহ)। অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে 'আমি তোমাদের জন্য অবতীর্ণ করেছি গাত্রাবরণ'।

এখানে 'আনযালতা' অর্থ তুমি অবতীর্ণ করেছো। কথাটি অতীতকালবোধক শব্দরূপে পরিবেশিত হলেও এর মর্মার্থ ভবিষ্যতকালার্থক। অর্থাৎ তুমি যা অবতীর্ণ করবে আমি তার মুখাপেক্ষী। অথবা এখানকার 'আনযালতা' অর্থ 'কুদ্‌দারতা'। এমতাবস্থায় অর্থ দাঁড়াবে— তুমি আমার জন্য যে অনুগ্রহ নির্ধারণ করেছো, আমি সে অনুগ্রহের প্রার্থী।

'মিন খয়রিন' অর্থ আহার্য, অধিক অথবা অনধিক। 'ফক্বীর' অর্থ মুখাপেক্ষী, যাচক, প্রার্থী। শব্দটির মধ্যে 'প্রার্থী' অর্থ নিহিত থাকার কারণেই কিন্তু এখানে 'ইলা' (প্রতি) এর স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে 'লি' (জন্য)।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত মুসা তখন আল্লাহ্‌র কাছে যাচ্‌না করেছিলেন এক মুঠো খাদ্য। ইমাম বাকের বলেছেন, সে সময় মুসার প্রয়োজন ছিলো এক টুকরো খেজুরের। হজরত ইবনে আব্বাস আরো বলেছেন, আলোচ্য প্রার্থনার কারণেই তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে লাভ করেছিলেন মহান মর্যাদা। কারণ চরমতম দাসত্ব প্রকাশ পায় এমতো সমর্পণ ও মুখাপেক্ষিতার মধ্যেই।

মুজাহিদ বলেছেন, তিনি তখন 'খইর' বা কল্যাণ ব্যতীত অন্য কিছুর প্রত্যাশী হননি। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার 'লিমা' পদটির 'লাম' কারণ নির্ণায়ক। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হে আমার প্রভুপালক! তুমি যেহেতু আমাকে দান করেছো 'খইর' (ধর্মবোধ ও প্রজ্ঞা), যার মুখাপেক্ষী আমি ছিলাম, সেকারণেই তো আমি বিরোধিতা করেছি ফেরাউনের ভ্রষ্ট ধর্ম মতের। আর সেই কারণেই এখন আমি বিপদগ্রস্ত। সহায়সম্বলহীন, স্বজন-নিকটজনহীন, অর্থ বিত্তহীন,অন্নহীন। রাজমহিমাচ্যুত হয়ে সেকারণেই তো আমি আজ পথের কাঙাল। সে জন্য কোনো দুঃখ নেই। এখন আমি তোমারই দরবারে প্রার্থী এক টুকরো খেজুরের অথবা একখণ্ড রুটির। উল্লেখ্য, হজরত মুসার এমতো আকুতির মধ্যে ফুটে উঠেছে পরম প্রাপ্তির এক প্রচ্ছন্ন আনন্দ এবং হৃদয়ভরা কৃতজ্ঞতা।

আমি বলি, এরকম ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে আবেগময় সংযোজ্য হিসেবে একথাগুলোকেও যোগ করা যেতে পারে যে, হজরত মুসা আরো বললেন, হে আমার প্রভুপালয়িতা! তুমি আমাকে ধন্য ও সৌভাগ্যবান করেছো দ্বীন ও হিকমত দিয়ে। তোমার এমতো দানের আধিক্য আমার কাম্য। আমাকে আরো দাও। 'রব্বি যিদনী ইলমান্'।

আমি আরো বলি, এখানকার 'আনযালতা' পদটি 'নুযুল' থেকেও সাধিত হয়ে থাকতে পারে। 'নুযুল' অর্থ আতিথেয়তা বা অতিথি আপ্যায়ন। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে সমূহ ঐশ্বর্যের অধিপতি! তুমি দয়া করে আমার জন্য যতটুকু আহার্য নির্ধারণ করেছো, আমি ততটুকুই যাচনা করি। তোমার অনুগ্রহমণ্ডিত নির্ধারণই আমার প্রার্থনা।

এর পরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'তখন রমণীদের একজন শরমজড়িত চরণে তার নিকট এলো এবং বললো, আমার পিতা তোমাকে পুরস্কৃত করবার জন্য আমন্ত্রণ করেছেন, কেননা তুমি আমাদের জানোয়ারগুলোকে পানি খাইয়েছো'।

হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন, ওই রমণীদ্বয় নির্বাক ছিলো না, আবার পুরুষদের সঙ্গে খোলামেলা মিশবার প্রবৃত্তিও তাদের ছিলো না। তাই তাদের একজন পুনরাগমন করে ছিলো সলজ্জ পদবিক্ষেপে। অধোবদনে দাঁড়িয়ে কেবল বলেছিলো, আমার পিতা আপনাকে ডেকেছেন। তিনি চান আপনাকে পুরস্কৃত করতে, যেহেতু আপনি আমাদের উপকার করেছেন।

বাগবী ও ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় এসেছে, আবু হাযেম সালমা ইবনে দীনার বলেছেন, হজরত মুসার আমন্ত্রণে সাড়া দেয়ার ইচ্ছা খুব একটা ছিলো না। কিন্তু তিনি ছিলেন তখন ক্ষুধার্ত। তাই নিরুপায় হয়ে তাঁকে ওই রমণীর অনুসারী হতে হলো। দমকা বাতাস বইছিলো তখন। সে কারণে রমণীটির বসন স্খলিত হচ্ছিলো বার বার। প্রকাশিত হচ্ছিলো তার পদযুগলের নিম্নাংশের শোভা। হজরত মুসা তাই তাকে বললেন, তুমি আমার পশ্চাদবর্তিনী হও। আমি পথ ভুল করলে পেছন থেকে বলে দিয়ো। রমণীটি তাই করলো। এভাবে দু'জনে একটু পরে উপস্থিত হলেন হজরত শোয়াইবের গৃহাঙ্গনে। পানাহারের আয়োজন তখন সম্পন্ন প্রায়। হজরত শোয়াইব তাঁকে আদর করে বসালেন। তারপর বললেন, হে যুবক অতিথি! আহার্য গ্রহণ করো। হজরত মুসা বললেন, আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয়ার্থী। হজরত শোয়াইব বললেন, এরকম বলছো কেনো? হজরত মুসা বললেন, আমি আপনার ছাগ-পালকে পানি পান করিয়েছিলাম। একি তার বিনিময়? আমি তো এমন পরিবারের সন্তান, যারা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে না। হজরত শোয়াইব বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! এ তোমার পারিশ্রমিক নয়। অতিথিসহ ভোজন করা যে আমার মহান পিতৃপুরুষগণের রীতি। হজরত মুসা আর দ্বিরুক্তি করলেন না। আদবের সঙ্গে উপবেশন পূর্বক পানাহারপর্ব সমাধা করলেন।

আমি বলি, আবু হাযেমের বিবরণটি আলোচ্য আয়াতের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল নয়। কারণ ওই রমণী প্রথমেই বলেছিলেন 'আমার পিতা আপনাকে পুরস্কৃত করবেন বলে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন'। আর এ কথা শুনে হজরত মুসা বিনা বাক্য ব্যয়ে সে আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছিলেন। তাহলে তার আমন্ত্রণ গ্রহণে খুব একটা আগ্রহ ছিলো না, এরকম কথা বলা যায় কীভাবে? তাছাড়া অপর এক আয়াতে দেখা যায়, হজরত মুসা নিজেই এক পুণ্যকর্মের পারিশ্রমিক গ্রহণের প্রস্তাব করেছিলেন। যেমন তিনি হজরত খিজিরকে বলেছিলেন 'যদি আপনি ইচ্ছা

করতেন তবে অবশ্যই আপনি আমাদের শ্রমের বিনিময় দাবি করতে পারতেন'। সুতরাং বলতেই হয়, আবু হাযেমের বিবরণটিকে আলোচ্য আয়াতের যথার্থ ব্যাখ্যারূপে গ্রহণ করা যায় না।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ এমন কোনো নবী প্রেরণ করেননি, যিনি ছাগল চরাননি। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! আপনিও কি? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ আমিও। আমিও একসময় মক্কাবাসীদের ছাগল চরিয়েছি কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। বোখারী।

উল্লেখ্য, যে সকল কর্ম ইবাদত এবং ইবাদতের পূর্বশর্তরূপে স্বীকৃত সে সকল কর্মের বিনিময় গ্রহণ সিদ্ধ নয়। যেমন কোরআন শিক্ষা দান, আজান প্রদান, ইমামের দায়িত্বপালন ইত্যাদি। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। কিন্তু যে সকল কাজ পুণ্যার্জক নয়, কিন্তু সৎউদ্দেশ্যে করলে যে সকল কাজে পুণ্যলাভ হয়, সেসকল কাজের বিনিময় গ্রহণ সিদ্ধ। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী আজান দেয়ার পারিশ্রমিক গ্রহণকে সিদ্ধ বলেছেন। পরবর্তী সময়ে হানাফী আলেমগণ আজানের মজুরী গ্রহণকে সিদ্ধ বলে রায় দিয়েছেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর মুসা তার নিকট এসে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে সে বললো, ভয় কোরো না। তুমি জালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে বেঁচে গিয়েছো।' একথার অর্থ— পানাহার পর্ব শেষে হজরত মুসা সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বললেন হজরত শোয়াইবকে। তিনি তখন সান্ত্বনা প্রদানার্থে হজরত মুসাকে বললেন, এখন আর কোনো ভয় নেই তোমার। এ অঞ্চল ফেরাউনের সাম্রাজ্য সীমাবহির্ভূত। এখন তুমি পূর্ণ নিরাপদ। আল্লাহ্ই তোমাকে ফেরাউনের মতো জালেমের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

'ফালাম্মা জাআহু' অর্থ যখন সে তার নিকট এলো। 'ক্বাস্সুন' বা 'ক্বাসাসুন' অর্থ পদাঙ্কানুসরণ। যেমন 'ক্বাস্সাল খবরু' অর্থ পুরো ঘটনা বিবৃত করলো। এভাবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— হজরত মুসা তখন হজরত শোয়াইবকে খুলে বললেন আনুপূর্বিক ইতিবৃত্ত। আর এখানে 'আজ্জলিমীন' (জালেম সম্প্রদায়) অর্থ ফেরাউন ও তার দোসরেরা।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'তাদের একজন বললো, হে পিতা! তুমি একে মজুর নিযুক্ত করো, কারণ তোমার মজুর হিসেবে উত্তম হবে সে-ই, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত'। একথার অর্থ— হজরত শোয়াইবের অন্য এক কন্যা বললেন, হে পিতা! তুমি তো কর্মক্ষম নও। তাই তোমার একজন শ্রমিকের নিতান্ত প্রয়োজন। আর এই যুবকই হতে পারে তোমার কর্মচারী, শ্রমিক। সে যোগ্যতা এর আছে। কারণ ইনি কর্মক্ষম এবং বিশ্বস্তও।

উল্লেখ্য, ‘শক্তিশালী’ ও ‘বিশ্বস্ত’ এ দু’টো গুণের পরিচয় হজরত শোয়াইবের কন্যা ইতোপূর্বেই পেয়েছিলেন। স্বচক্ষে দেখেছিলেন, তিনি সজোরে সরিয়ে দিয়েছিলেন কূপের উপরের প্রকাণ্ড পাথর। আর বিশ্বস্ততার পরিচয় পেয়েছিলেন পথিমধ্যে ও বাড়ীতে আগমনের সময়। হজরত মুসা পথ চলার সময় তাঁকে করে নিয়েছিলেন পশ্চাদবর্তিনী।

এখানকার ‘ইসতাজারতা’ কথাটি অতীতকালার্থক। অর্থাৎ তুমি তাকে মজুর করেই নিয়েছো। কিন্তু এর মর্মার্থ হবে— তুমি একে মজুর নিযুক্ত করো। তাই বুঝতে হবে এখানে নিশ্চিতার্থক শব্দ ব্যবহারের ফলে পরীক্ষিত হয়েছে তাঁর শক্তিমত্তা ও বিশ্বস্ততা।

খতীব বাগদাদী তাঁর ‘ইতিহাস’ গ্রন্থে হজরত আবু জর গিফারী থেকে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, হজরত শোয়াইব তখন তাঁর আদরের কন্যাকে প্রশ্ন করেছিলেন, সে যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত, একথা তুমি জানলে কেমন করে? কন্যা জবাব দিয়েছিলেন ‘কূপের উপরে ছিলো একটি প্রকাণ্ড পাথর, যা দশজন অথবা চল্লিশজন মিলেও সরাতে পারতো না। অথচ তিনি একাই পাথরটি সরিয়ে দিয়েছেন। আর পথ চলার সময় তিনি আমাকে রেখেছিলেন পশ্চাতে’।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, তিনজন মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন অসাধারণ সতর্ক। তার মধ্যে একজন ছিলেন হজরত শোয়াইব দুহিতা। দ্বিতীয় জন হচ্ছেন মিসরের আযীয। সে বালক নবী ইউসুফকে দেখে বলেছিলেন, ‘সম্ভবতঃ সে আমাদের উপকারে আসবে’। আর তৃতীয়জন হচ্ছেন ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর। দ্বিতীয় খলিফা ওমরের নির্বাচন ছিলো তাঁর অসাধারণ সতর্কতা ও দূরদর্শিতার প্রমাণ।

এরপরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— ‘পিতা মুসাকে বললো, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সঙ্গে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বৎসর আমার কাজ করবে, যদি তুমি দশ বৎসর পূর্ণ করো সে তোমার ইচ্ছা।’ আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে সদাচারী পাবে’।

শুয়াইব জাবায়ী বলেছেন, কন্যাদ্বয়ের একজনের নাম ছিলো সফুরা এবং অন্যজনের নাম লাইয়া। ইবনে ইসহাক বলেছেন, তাঁদের নাম ছিলো সফুরা ও শুরাক্বা। কেউ কেউ লিখেছেন, জ্যেষ্ঠার নাম ছিলো সফুরা এবং কনিষ্ঠার নাম সফীরা। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ বলেছেন, হজরত মুসার বিয়ে হয়েছিলো জ্যেষ্ঠা কন্যার সঙ্গে। কিন্তু অধিকাংশ ভাষ্যকারের মত হচ্ছে, হজরত মুসা পাণি গ্রহণ

করেছিলেন কনিষ্ঠা কন্যার। তাঁর নাম ছিলো সফুরা। তিনি আমন্ত্রণ জানাতে গিয়েছিলেন বৃক্ষছায়ায় উপবিষ্ট হজরত মুসাকে। হজরত আনাস থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন বায্যার ও তিবরানী। বাগবী লিখেছেন, হজরত আবু জরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, কেউ যদি জানতে চায়, নবী মুসা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন কোন ভাগ্যবতীর সঙ্গে, তবে তোমরা বোলো কনিষ্ঠার সঙ্গে। আর তিনি আমন্ত্রণ জানাতে গিয়েছিলেন নবী মুসাকে এবং তাঁর পিতাকে বলেছিলেন, 'হে পিতা! তুমি একে মজুর নিযুক্ত করো'।

'এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে' অর্থ আট বছর যদি তুমি আমার কর্মচারীরূপে থাকতে সম্মত হও, তবে আমি আমার কন্যাদ্বয়ের একজনের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে দিবো। এখানকার 'হিজ্বাজ্বিন' শব্দটি 'হুজ্জাতুন' এর বহুবচন। এর অর্থ বৎসর বা সাল।

'যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ করো সে তোমার ইচ্ছা' অর্থ আর যদি তুমি আট বৎসরের জায়গায় দশ বৎসর থাকতে সম্মত হও, তবে সেটা হবে তোমার পক্ষে সৌজন্যের নিদর্শন।

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত হজরত শোয়াইবের এরকম উক্তি দৃষ্টে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, এটা ছিলো তাঁর পক্ষ থেকে বিবাহের প্রস্তাব। পাকাপাকি বিবাহের কথা নয়। কারণ বিবাহ নির্ধারণ করা হলে নিশ্চয় কন্যাকেও নিদিষ্ট করা হতো। 'এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে' এরকম বলা হতো না। সুতরাং বুঝতে হবে, হজরত শোয়াইব বিবাহ নির্ধারণ করেছিলেন পরে অন্য কোনো কথার মাধ্যমে, যার উল্লেখ এখানে নেই। তবে এখানে এতটুকু বুঝা যায় যে, আট বৎসর কর্মচারী হিসেবে থাকার শর্তটি ছিলো বিবাহের মোহরানা স্বরূপ— আংশিক অথবা সম্পূর্ণ। হজরত উতবা ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এরকমই আভাস বিদ্যমান। যেমন— তিনি বর্ণনা করেন, একবার আমরা কয়েকজন উপবিষ্ট ছিলাম রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে। তিনি স. ত্ব-সিন-মীম পাঠ করলেন। পাঠ করতে করতে যখন নবী মুসার ইতিবৃত্তে পৌঁছলেন, তখন পাঠ সমাপ্ত করে বললেন, নবী মুসা তাঁর চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার্থে এবং জঠর জ্বালা নিবারণার্থে আট বছর শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে সম্মত হয়েছিলেন। আহমদ, ইবনে মাজা।

মাসআলা ঃ আলোচ্য আয়াত এবং উপরে বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমে বিধানবেত্তাগণ প্রমাণ করেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলার ছাগল চরানোর কাজকে মোহরানা নির্ধারণ করে তাকে বিবাহ করে, তবে বিবাহ হবে শুদ্ধ। আমরাও এরকম বলি। কারণ রসুল স. এ ঘটনা বিবৃত করেছেন, অথচ এর বিপক্ষে কিছু বলেননি। সুতরাং আমাদের শরিয়তে এ ধরনের বিবাহকে অসিদ্ধ

বলার কোনো কারণ নেই। ইমাম আবু হানিফার বক্তব্যরূপে ইবনে সিমাআর বর্ণনায় এসেছে, এবম্বিধ বিবাহ বিশুদ্ধ। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, অধিকাংশ বর্ণনায় এসেছে, এরকম বিবাহকে তিনি বিশুদ্ধ বলেননি। কারণ আলোচ্য আয়াতে বিবাহের ইতিবাচক প্রমাণ অনুপস্থিত। মোহরানার প্রাপিকা কন্যা। কিন্তু ছাগপালের মালিক তো কন্যা ছিলেন না; ছিলেন তাঁর পিতা। আর আমাদের শরিয়তের সুস্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে, মোহরানার মালিকানা কন্যার, তার অভিভাবকের নয়। সুতরাং বুঝতে হবে শোয়াইবি শরিয়তে এরকম বিবাহ বিশুদ্ধ হলেও আমাদের শরিয়তে সিদ্ধ নয়। আমরা এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছি সুরা নিসার 'উহিল্লা লাকুম মা ওয়ারাআ জালিকুম' আয়াতের তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

'আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে সদাচারী পাবে' অর্থ ইনশাআল্লাহ্ দেখবে তোমার প্রতি প্রসন্ন ও শুভদৃষ্টিসম্পন্ন। এখানে 'ইনশাআল্লাহ্' (আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে) কথাটিতে কোনো দোদুল্যচিত্ততা প্রকাশ করা হয়নি। বরং এর মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা হয়েছে আল্লাহ্র অভিপ্রায় ও আল্লাহ্ প্রদত্ত সামর্থ্যের উপর। অর্থাৎ 'ইনশাআল্লাহ্' এখানে কৃত প্রতিশ্রুতির উপক্রমণিকা স্বরূপ।

এরপরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'মুসা বললো, আপনার ও আমার মধ্যে এই চুক্তিই রইলো। এ দু'টো মেয়াদের কোনো একটি আমি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকবে না'। এ কথার অর্থ— হজরত মুসা বললেন, ঠিক আছে। তাহলে আপনার ও আমার মধ্যে এই কথাই পাকাপাকি হয়ে গেলো। আমি আট বছর ধরে আপনার কাজ করে দিতে পারি অথবা কাজ করতে পারি দশ বছর। যেটাই করি না কেনো, আপনি কিন্তু দু'টো মেয়াদের যে কোনো একটি শেষ হলে আমাকে আর কাজ করার কথা বলতে পারবেন না। কিংবা নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে কাজ ছেড়ে দিলেও আমাকে আর দায়ী করতে পারবেন না।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি আল্লাহ্ তার সাক্ষী'। একথার অর্থ আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। সুতরাং তিনিই সাক্ষী হয়ে রইলেন আমাদের এই চূড়ান্ত চুক্তির ব্যাপারে। 'ওয়াকীল'(রক্ষক) শব্দটির মর্মার্থ এখানে সাক্ষী।

হজরত শাদ্দাদ ইবনে আউস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, শোয়াইব নবী অত্যধিক ক্রন্দন করতেন। তাই তাঁর নয়নযুগল হয়ে গিয়েছিলো দ্যুতিহীন। আল্লাহ্ তাঁকে পুনরায় দৃষ্টিদান করলেন। কিন্তু তাঁর রোদন এতটুকুও কমলো না। ফলে পুনরায় দৃষ্টি হারালেন তিনি। আবারো আল্লাহ্ তাঁকে দান করলেন দৃষ্টি। বললেন, হে আমার নবী! তোমার এতো রোদনের হেতু কী? স্বর্গাশা, না

নরকাশংকা? তিনি বললেন, কোনোটাই নয়। আমি রোদন করি তো কেবল তোমার সন্দর্শনাপেক্ষায়। আল্লাহ্ বললেন, যদি তাই হয়, তবে তোমার পার্থিব দৃষ্টির আর প্রয়োজনই বা কী? তাহলে সন্দর্শনলগ্ন পর্যন্ত তুমি এভাবেই থাকো। হে বিরহী, তোমাকে জানাই সাধুবাদ। আর তোমার পার্থিব প্রয়োজনসমূহ পূরণ করবার জন্য মুসা হোক তোমার বিশ্বস্ত অনুচর।

চুক্তি সম্পাদন শেষে হজরত শোয়াইব কন্যাকে বললেন, মুসাকে এনে দাও একটি যষ্টি। সে ওই যষ্টি দিয়ে ছাগল চরাবে এবং সেগুলোকে রক্ষা করবে হিংস্রপশুদের আক্রমণ থেকে। এই যষ্টিটি সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য পরিলক্ষিত হয়। ইকরামার ধারণা— যষ্টিটি স্বর্গাগত। হজরত আদম বেহেশত থেকে এনেছিলেন লাঠিটি। তাঁর মহাপ্রস্থানের পর সেটি হস্তগত করেন হজরত জিবরাইল। আর একদা এক গভীর নিশীথে পারস্পরিক সাক্ষাতকালে তিনি ওই লাঠিটি দিয়ে দেন হজরত মুসাকে। কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, হজরত আদম ওই লাঠিটি জান্নাত থেকে আনেন এবং পরবর্তীতে তা বংশপরম্পরায় হাত বদল হতে থাকে। নবী ছাড়া অন্য কারো অধিকারভূত হয়নি লাঠিটি। হজরত নূহ এবং হজরত ইব্রাহিমের মাধ্যমে ওই লাঠির মালিক হন হজরত শোয়াইব। আর তাঁর কাছ থেকে পান হজরত মুসা। সুদ্দীর বর্ণনায় এসেছে, এক ফেরেশতা ওই লাঠি গচ্ছিত রেখেছিলো হজরত শোয়াইবের নিকটে। তিনি কন্যাকে লাঠি আনতে বললে কন্যাটি ওই লাঠিটিই গৃহকোণ থেকে নিয়ে এলেন। হজরত শোয়াইব বললেন, ঘরে তো আরো লাঠি আছে। সেগুলোর মধ্য থেকে একটি নিয়ে এসো। এটি রেখে এসো যথাস্থানে। কন্যা ঘরে গেলেন। কিন্তু অন্য লাঠি আনার চেষ্টা করেও পারলেন না। বার বার তার হাতে উঠে আসতে লাগলো ওই লাঠিটিই। তিনি উপায়ান্তর না দেখে গচ্ছিত লাঠিটি নিয়ে পুনরায় উপস্থিত হলেন পিতার সমীপে। পিতা বললেন, বললাম তো, এটা নয়, অন্য কোনো লাঠি আনো। এভাবে তিনবার ফেরত পাঠানো সত্ত্বেও কন্যা পূর্বের লাঠি ছাড়া অন্য কোনো লাঠি আনতে পারলেন না। উপায়ন্তর না দেখে শেষে ওই লাঠিটিই তিনি দিয়ে দিলেন হজরত মুসাকে। হজরত মুসা লাঠিটি হাতে নিয়ে ছাগল চরানোর উদ্দেশ্যে চলে গেলেন মাঠের দিকে। হজরত শোয়াইবের হঠাৎ মনে হলো, একি করলেন তিনি? গচ্ছিত বস্তু কি এভাবে কাউকে হস্তান্তর করা যায়? একথা মনে হতেই তিনি মাঠের দিকে গমন করলেন। যষ্টিধৃত মুসাকে পেয়ে গেলেন কিছুক্ষণ পথ চলবার পর। বললেন, লাঠিটি দাও। হজরত মুসা অস্বীকৃত হলেন। দু'জনের মধ্যে শুরু হলো মৃদু বিতর্ক। কেউ কারো প্রস্তাব মানতে চান না। শেষে দু'জনে একমত হলেন, কোনো আগন্তুক যদি এদিকে এসে পড়েন, তবে তাঁর মীমাংসাই হবে চূড়ান্ত। একটু পরেই সেখানে হাজির হলেন এক মানবাকৃতিবিশিষ্ট ফেরেশতা। দু'জনেই তাকে

উদ্ভূত সমস্যার মীমাংসা করে দিতে বললেন। আগন্তুক বললো, লাঠিটি মাটিতে ফেলে দেয়া হোক। তারপর যে লাঠিটি উঠিয়ে নিতে পারবে, সে-ই হবে ওটির মালিক। হজরত মুসা লাঠিটি মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। প্রথমে সেটিকে কুড়িয়ে নিতে গেলেন হজরত শোয়াইব। কিন্তু পারলেন না। কিন্তু হজরত মুসা লাঠিটিকে তুলে নিতে পারলেন সহজেই। অগত্যা হজরত শোয়াইব তাঁর দাবি পরিত্যাগ করলেন। আর সেই থেকে লাঠির অধিকারী হলেন হজরত মুসা।

দিন শেষে রাত এলো। রাতের আঁধার চিরে পুনরায় উদ্ভাস ঘটলো দিনের। এভাবে পালাক্রমে আবর্তিত বিবর্তিত হতে লাগলো রহস্যময় সময়। এভাবে চুক্তির সময় অতিক্রান্ত হলে হজরত শোয়াইব তাঁর আদরের দুলালীকে তুলে দিলেন হজরত মুসার হাতে। হজরত মুসা তাঁর নবপরিণীতা বধুকে বললেন, তোমার মান্যবর জনয়িতাকে জানাও, তিনি যেনো আমাদেরকে কিছু সংখ্যক ছাগল প্রদান করেন। মুসা-জায়া পিতার কাছে আবেদন জানালেন। হজরত শোয়াইবের ইচ্ছা ছিলো, আরো কিছুকাল দু'জনকে নিজের কাছে রাখবেন। তাই বললেন, এ বছর মনে হয় বিভিন্ন রকমের মেষ-ছাগল জন্মগ্রহণ করবে। সুতরাং কিছুকাল অপেক্ষা করো। যথাসময়ে আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিবো ওই শাবকগুলো। নবদম্পত্তি আর দ্বিরুক্তি করলেন না। অপেক্ষা করাকেই শ্রেয় মনে করলেন। ইত্যবসরে এক রাতে হজরত মুসা স্বপ্নে শুনলেন, তাঁকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে— তুমি তোমার হাতের লাঠি ছাগলগুলোর পান ঘাটের পানিতে চুবিয়ে দাও। হজরত মুসা নির্দেশ পালন করলেন। দেখা গেলো ওই ঘাটে পানি পানকারী ছাগলগুলো সে বৎসর প্রসব করলো বিচিত্র রঙের চিত্তহারী শাবক। হজরত শোয়াইব সেগুলোকে দেখে মুগ্ধ হলেন। বুঝলেন, আল্লাহ্ই মুসার জন্য এগুলোকে করেছেন এমন দৃষ্টিমনোহর।

সূরা ক্বাসাস ঃ আয়াত ২৯,৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖٓ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ﴿٢٩﴾ فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰٓى اِنِّيْٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ

الْعٰلَمِيْنَ ﴿۳۰﴾ وَ اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّ لَمْ يُعَقِّبْ ؕ يٰمُوْسٰۤى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۟ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ﴿۳۱﴾ اُسْلُكْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ۫ وَّ اضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلَا۟ئِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿۳۲﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ﴿۳۳﴾ وَ اَخِيْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِيْٓ ؗ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ﴿۳۴﴾ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَ نَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا ۚۛ بِاٰيٰتِنَآ ۚۛ اَنْتُمَا وَ مَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ﴿۳۵﴾

r মূসা যখন তাহার মিয়াদ পূর্ণ করিবার পর সপরিবারে যাত্রা করিল তখন সে তূর পর্বতের দিকে আগুন দেখিতে পাইল। সে তাহার পরিজনবর্গকে বলিল, 'তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখিয়াছি, সম্ভবতঃ আমি সেথা হইতে তোমদিগের জন্য কোন খবর আনিতে পারি অথবা একখণ্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড আনিতে পারি যাহাতে তোমরা আগুন পোহাইতে পার।'

r যখন মূসা আগুনের নিকট পঁহুচিল তখন উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বে পবিত্র ভূমিস্থিত এক বৃক্ষ হইতে তাহাকে আহ্বান করিয়া বলা হইল, 'হে মূসা আমিই আল্লাহ্, বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক;

r আরও বলা হইল, 'তুমি তোমার যষ্ঠি নিক্ষেপ কর।' অতঃপর, যখন সে উহাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে দেখিল তখন পিছনে না তাকাইয়া সে বিপরীত দিকে ছুটিতে লাগিল, তাহাকে বলা হইল, 'হে মূসা! ফিরিয়া আইস, ভয় করিও না; তুমি তো নিরাপদ।

r ‘তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, ইহা বাহির হইয়া আসিবে নির্মল উজ্জ্বল হইয়া। ভয় দূর করিবার জন্য তোমার হস্তদ্বয় বুকের উপর চাপিয়া ধর। এই দুইটি ফিরাউন ও তাহার পারিষদবর্গের জন্য তোমার প্রতিপালকপ্রদত্ত প্রমাণ। উহারা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

r মূসা বলিল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি তো উহাদিগের একজনকে হত্যা করিয়াছি। ফলে, আমি আশংকা করিতেছি উহারা আমাকে হত্যা করিবে।

r ‘আমা ভ্রাতা হারুন আমা অপেক্ষা বাগ্মী; অতএব তাহাকে আমার সাহায্যকারীরূপে প্রেরণ কর, সে আমাকে সমর্থন করিবে। আমি আশংকা করি উহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে।’

r আল্লাহ্ বলিলেন, ‘আমি তোমার ভ্রাতার দ্বারা তোমার বাহু শক্তিশালী করিব এবং তোমাদিগের উভযকে প্রাধান্য দান করিব। উহারা তোমাদিগের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। তোমরা এবং তোমাদিগের অনুসারীরা আমার নিদর্শন বলে উহাদিগের উপর প্রবল হইবে।’

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘মুসা যখন তার মেয়াদ পূর্ণ করবার পর সপরিবারে যাত্রা করলো, তখন সে তুর পর্বতের দিকে আগুন দেখতে পেলো’। একথার অর্থ— চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর হজরত মুসা যাত্রা করলেন মিসর অভিমুখে। চলতে চলতে পথ হারিয়ে উপনীত হলেন সিনাই উপত্যকায়। দিবাবসান হলো। চরাচর ঢেকে গেলো ঘনঘোর অন্ধকারে। তখন ছিলো শীতকাল। শীতার্ত নবীপরিবার আগুনের অভাব বোধ করলেন। কিন্তু দেখলেন, ধারে কাছে কোনো জনবসতির চিহ্ন মাত্র নেই। হঠাৎ নজরে পড়লো দূরের তুর পর্বতে আগুন জ্বলছে।

বাগবী লিখেছেন, সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, হিরা প্রদেশের এক ইহুদী একবার আমার নিকট জানতে চাইলো, নবী মুসা তখন কোন মেয়াদটি পূর্ণ করেছিলেন— আট বছরের না দশ বছরের? আমি বললাম, জানি না। তবে হজরত ইবনে আব্বাসের কাছে এর জবাব জেনে নিতে পারবো। তারপর আপনাকেও জানাতে পারবো সঠিক উত্তর। একদিন হজরত ইবনে আব্বাসের সঙ্গে দেখাও হলো আমার। আমি এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতেই তিনি উত্তরে জানালেন, তিনি ওই মেয়াদই পূর্ণ করেছিলেন, যা ছিলো তাঁর ও হজরত শোয়াইবের মনোপুত। আল্লাহ্র নবীগণের কথা ও কাজ সব সময় একই হয়। হজরত আবু জর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, নবী মুসা কোন মেয়াদটি পূর্ণ করে ছিলেন, তবে তোমরা বোলো, যা ছিলো কৃত অঙ্গীকারের সঙ্গে

অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। বায্‌যার। মুজাহিদ, বলেছেন, হজরত মুসা মেয়াদ পূর্ণ করেছিলেন দশ বছরের। এরপর শ্বশুরালয়ে অবস্থান করেছিলেন আরো দশ বছর। তারপর তিনি তাঁর মান্যবর শ্বশুরের অনুমতিক্রমে যাত্রা করেছিলেন মিসর অভিমুখে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সে তার পরিজনবর্গকে বললো, তোমরা অপেক্ষা করো, আমি আগুন দেখেছি, সম্ভবতঃ আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোনো খবর আনতে পারি, অথবা একটুকরো জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড আনতে পারি যাতে তোমরা আগুন পোয়াতে পারো'। এ কথার অর্থ— দূরের তুর পাহারের ওই আগুনের দিকে তাকিয়ে হজরত মুসা তাঁর প্রিয়তমা ভার্যাকে বললেন, আমি আগুন দেখতে পাচ্ছি। তোমরা এখানেই অবস্থান করো। মনে হয় আমি ওখান থেকে তোমাদের জন্য আগুনের সংবাদ আনতে পারবো, অথবা নিয়ে আসতে পারবো একখণ্ড অগ্নিময় কাষ্ঠখণ্ড। তোমাদেরকে তাহলে শীতের কষ্ট করতে হবে না।

বাগবী লিখেছেন, কাতাদা ও মুকাতিল বলেছেন, এখানকার 'জ্বাজওয়াতুন' অর্থ ওই কাষ্ঠখণ্ড যার কিয়দংশ দগ্ধমান। শব্দটির বহুবচন 'জ্বুজা'। কামুস অভিধানে রয়েছে, 'জ্বাজওয়া' অর্থ কাষ্ঠখণ্ড— দগ্ধমান হোক, অথবা না হোক। সে কারণেই এখানে পৃথকভাবে বলা হয়েছে 'মিনান্‌নার' (জ্বলন্ত)। আর এখানে 'তাসত্বলুন' অর্থ যাতে তোমরা আগুন পোয়াতে পারো।

পরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'যখন মুসা আগুনের নিকট পৌঁছলো, তখন উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বে পবিত্র ভূমিস্থিত এক বৃক্ষ থেকে তাকে আহ্বান করে বলা হলো, 'হে মুসা! আমিই আল্লাহ্, বিশ্বজগতের প্রতিপালক'।

'আলবুক্বআ'তিল মুবারাকাতু' অর্থ পবিত্র ভূমি। ওই পবিত্র ভূমিই ছিলো হজরত মুসা ও তাঁর পরম প্রেমময় প্রভুপালকের কথোপকথনের স্থান। রেসালাতের মহান দায়িত্ব তাঁকে দেয়া হয়েছিলো ওই কল্যাণময় ভূমিতেই। আতা বলেছেন, এখানে 'মুবারকা' অর্থ চিরপবিত্র। এরকমই মর্মার্থ উপস্থাপিত হয়েছে অন্য এক আয়াতে এভাবে— 'বিল ওয়াদিল মুকাদ্দাসি ত্বুয়া'।

'মিনাশ শাজারাতি' অর্থ সেই বৃক্ষ যা অবস্থিত ছিলো উপত্যকার পার্শ্বে। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, বৃক্ষটি ছিলো সতেজ ও সমুজ্জ্বল। কাতাদা, কালাবী ও মুকাতিল বলেছেন, সেটা ছিলো 'এওজানামীল' নামক এক বিশাল মহীরুহ। ওয়াহাব বলেছেন, বৃক্ষটি ছিলো অলৌকিক। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বৃক্ষটি ছিলো অজব বা নয়নাভিরাম বৃক্ষ।

'ইননী আনাল্লহ' অর্থ আমিই আল্লাহ্। সুরা ত্ব হা তে বলা হয়েছে 'আনা রব্বুকা' (আমি প্রভুপালনকর্তা)। সুরা নমলে বলা হয়েছে 'আনাল্লহুল আযীযুল

হাকীম' (আমি তো আল্লাহ্,পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়)। বাণীসমূহ সমার্থক, যদিও এগুলোর শব্দবিন্যাস ভিন্ন। এতদসত্ত্বেও বলতে হয় আলোচ্য আয়াতের 'ইননী আনাল্লাহু রব্বুল আ'লামীন' এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে আল্লাহতায়ালার সমষ্টিগত গুণবত্তার। এরকম সামগ্রিকতা অন্য উক্তিগুলোতে নেই। অন্যান্য আয়াতে রয়েছে বক্তব্যটির সংক্ষিপ্তায়নের নমুনা। যেমন সুরা 'ত্ব হা' র আরেক স্থানে বলা হয়েছে 'ফাখ্‌লা' না'লাইকা ইন্‌নাকা বিল ওয়াদি মুক্বাদ্দাসি তুয়া' (তোমার পাদুকাদ্বয় খুলে ফেলো, কেননা তুমি এখন পুণ্যভূমিতে)। সুরা নমলের এক স্থানে বলা হয়েছে 'বুরিকা মানফিন নারি ওয়ামান হাওলাহা' (ধন্য তারা যারা আছে অগ্নি দ্বারা আলোকিত স্থানে এবং তার চতুষ্পার্শে।

এর পরের আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে— 'আরো বলা হলো, তুমি তোমার যষ্টি নিক্ষেপ করো! অতঃপর সে যখন তাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখলো তখন পিছনে না তাকিয়ে বিপরীত দিকে ছুটতে লাগলো'। একথার অর্থ— পুনঃপ্রত্যাদেশ হলো, হে মুসা! এবার তোমার হাতের লাঠিটি মাটিতে ফেলে দাও। তিনি তাই করলেন। মাটিতে পড়ার সাথে সাথে লাঠিটি হয়ে গেলো ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন অজগর সাপ। হজরত মুসা চমকে উঠলেন। ভয়ে দৌড় দিলেন বিপরীত দিকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাকে বলা হলো, হে মুসা! ফিরে এসো, ভয় কোরোনা, তুমি তো নিরাপদ'। একথার অর্থ— ভীত-চকিত নবীর প্রতি উচ্চারিত হলো অভয়বাণী, হে মুসা! তুমি তো আমার নবী। আমার নবীগণ আমার সন্নিধানে সতত নিরাপদ। সুতরাং ভয় কোরো না। ফিরে এসো।

এরপরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'তোমার হাত তোমার বগলে রাখো, হাতটি বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল হয়ে। ভয় দূর করবার জন্য তোমার হস্তদ্বয় বুকের উপরে চেপে ধরো'।

আতার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা ভয় দূর করবার জন্য বুকের উপর হাত চেপে ধরতে বলেছেন। ভয় দূর করবার এটি একটি প্রকৃষ্ট উপায়। সকল ভীত-সন্ত্রস্ত ব্যক্তি এভাবে ভয়-ভীতি দূর করতে সক্ষম। মুজাহিদ বলেছেন, ভয়ার্ত ব্যক্তি যদি তার দুটো হাত বুকে চেপে ধরে, তবে ভয় মুক্ত হয়ে যায়।

'জ্বানাহ' বলে পুরো হাতকে, কেবল বাহুকে নয়। কেউ কেউ বলেছেন, কেবল বাহুর উপরের অংশের নাম 'জ্বানাহ'। বিদ্বজ্জনের বক্তব্য হচ্ছে, এখানে বুকের উপর হাত চেপে ধরার অর্থ কেবল ধাত্যর্থক নয়। বরং কথাটি এখানে রূপকার্থক।

এভাবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— তিষ্ঠ, সুস্থির, বলিষ্ঠ ও অনড় অবস্থান গ্রহণ করো। যেমন দেখা যায় ভয়ার্ত বিহঙ্গ ডানা প্রসারিত করে দেয়, আবার তা গুটিয়ে নেয় স্বস্তির আভাস পেলে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত মুসার প্রতি তখন আদেশ হয়েছিলো ভয় কোরো না, কারণ ভীতকম্পিত অবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ বাক্যালাপ চলে না। এক আয়াতে তাই বলা হয়েছে 'আর তোমার বাহুদ্বয় নম্র করো তাদের উপর যারা তোমার...... করে। অন্যত্র বলা হয়েছে 'ওয়াখফিদ্ব লাহুমা জ্বানাহাজ জুললি মিনার রহমাত'। অর্থাৎ তাদের প্রতি প্রদর্শন করো বিনম্র আচরণ। যারা বলেছেন, এখানে 'জ্বানাহা, অর্থ যষ্টি। অর্থাৎ এখানে নির্দেশ দেয়া হয়েছে— হে মুসা! তোমার যষ্টিটি তোমার নিজের দেহের সঙ্গে মিলিয়ে নাও।

কোনো কোনো অভিধানবেত্তা লিখেছেন, হুমাইর গোত্রের আঞ্চলিক ভাষায় জামার আস্তিনকে বলে 'রহব'। আনসারী বলেছেন, আমি আরববাসীদেরকে বলতে শুনেছি 'আ'তীনী মা ফী রহবিকা' (তোমার আস্তিনে যা আছে আমাকে দিয়ে দাও)। এখানে 'আস্তিন' অর্থ বুকপকেট। এমতো অর্থের প্রেক্ষিতে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়— বুকপকেট থেকে হাত নামাও, মিলিয়ে নাও শরীরের সাথে। অর্থাৎ হজরত মুসা তখন হাত রেখেছিলেন তাঁর জামার পকেটে। আর আল্লাহ্ বলেছিলেন, ভয় কোরো না, সাপটিকে (অজগরটিকে) ধরো। আমার মতে বক্তব্যটির মর্মার্থ হবে এরকম— ভীতি প্রশমনার্থে বাহুদ্বয় রাখো স্বীয় শরীরসংলগ্ন। এভাবে বলতে হয়, বাক্যটি একটি ব্যাখ্যামূলক পরিযোজনা। অর্থাৎ পূর্বোক্ত বাক্যের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণায়ন। যেহেতু 'জুনাহ' অর্থ হাত পকেটস্থ করণ। উল্লেখ্য, এখানকার পূর্বাপর বাক্যদুটোর বিষয়বস্তুর পরস্পরপরিপূরকতার মধ্যে রয়েছে দু'টি উপযোগিতা। একটি হচ্ছে— চিত্তচাঞ্চল্য বিদূরণপূর্বক চিত্তপ্রশান্তি আনয়ন। আর একটি হচ্ছে— আশংকা অপসারণ। অর্থাৎ সাহস সঞ্চার ও সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণের পরামর্শ প্রদান। এটাই আলোচ্য বক্তব্যের মূল মর্ম। বিষয়টির আরো সহজ ব্যাখ্য হতে পারে এরকম— হে মুসা! সর্পভয়ে ভীত না হয়ে তোমার হস্তদ্বয় পকেটের ভিতরে ঢোকাও। পুনরায় হস্তদ্বয় পকেট থেকে বের করে আনো। তাহলে প্রকাশিত হবে দ্বিতীয় মোজেজাটি। তোমার হস্তদ্বয় থেকে বিচ্ছুরিত হবে শুভ্র, উজ্জ্বল ও নির্মল আলো। সুরা 'ত্ব হা'য় বিষয়টিকে প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে— 'ওয়াদ্বমুম ইয়াদাকা ইলা জ্বানাহিকা তাখরুজ বায়দ্বআ মিন গইরি সূইন আয়াতান উখরা' (এবং তোমার হাত তোমার বগলে রাখো, হাত বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল হয়ে অপর এক নিদর্শন স্বরূপ)।

এরপর বলা হয়েছে— 'এ দু'টো ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের জন্য তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত প্রমাণ। তারা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়'। একথার অর্থ— এবার নির্দেশ প্রদান করা হলো, হে মুসা! লাঠির সর্পরূপধারণ ও হাতের শুভ্র-নির্মল বিকীরণ— এ দু'টো অলৌকিকত্ব নিয়ে তুমি এবার মিসরাধিরাজ ও তার পারিষদবর্গের নিকটে যাও। আহ্বান জানাও তাদের চিরন্তন সত্যধর্মের প্রতি। তারা তো সত্যবিচ্যুত।

'কামুস' অভিধানে রয়েছে 'বুরহান' অর্থ দলিল বা প্রমাণ। এর ধাতুমূল 'বরহুন'। যেমন বলা হয়েছে 'বারিহার রজুলূ' (লোকটি ফর্সা হয়েছে) সে কারণেই গৌরবর্ণা রমণীকে বলা হয় 'বুরাহাত'। কামুস গ্রন্থে আরো রয়েছে, 'আবরাহা' অর্থ সে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করেছে। অথবা চমকপ্রদ কথা বলেছে। অথবা সে মানুষের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করেছে।

এরপরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'মুসা বললো, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো তাদের একজনকে হত্যা করেছি। ফলে আমি আশংকা করছি তারা আমাকে হত্যা করবে'। এ কথার অর্থ— ফেরাউনের নিকট গমনের নির্দেশ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে হজরত মুসার স্মৃতি জাগ্রত হলো। মনে পড়ে গেলো নিহত কিবতীটির কথা। তাঁর মুষ্টাঘাতের ফলেই তো তাকে প্রাণ হারাতে হয়েছিলো। সে কথা স্মরণ হতেই হজরত মুসা বললেন, হে আমার প্রভুপালক! আমি তো ফেরাউনের সম্প্রদায়ের একজনকে হত্যা করার ব্যাপারে অভিযুক্ত। এমতাবস্থায় আমি ফেরাউনের দরবারে হাজির হলে আমি তোমার বাণী পৌঁছানোর পূর্বেই তো তারা আমাকে সেই অভিযোগে বধ করে ফেলবে। তাহলে তোমার বাণী প্রচারের প্রবহমানতা অক্ষুণ্ন থাকবে কী করে?

এরপরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'আমার ভ্রাতা হারুন আমা অপেক্ষা বাগ্মী, অতএব তাকে আমার সাহায্যকারীরূপে প্রেরণ করো, সে আমাকে সমর্থন করবে। আমি আশংকা করি তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে'।

শিশুকালে একবার হজরত মুসা জ্বলন্ত অঙ্গার তুলে মুখে পুরেছিলেন। ফলে দগ্ধ হয়ে গিয়েছিলো তাঁর রসনার কিয়দংশ। পরিণত বয়সেও তাই তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হতো উচ্চারণগত আড়ষ্টতা। সেকারণেই তিনি তাঁর আহ্বানকর্মের সহায়তাকারীরূপে পেতে চেয়েছিলেন। প্রাঞ্জলভাষী সহোদর হজরত হারুনকে। আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত প্রার্থনায় সে কথাই উপস্থাপিত হয়েছে।

এখানে 'রিদ্বউন' অর্থ সহায়তাকারী। যেমন 'আরদ্বাতুহু' অর্থ আমি তাকে সহায়তা করেছি। বস্তুত যার দ্বারা সহায়তা করা হয়, তাকেই বলে রিদ্বউন'।

'সে আমাকে সমর্থন করবে' অর্থ সে হবে আমার মুখপত্র, আমার বক্তব্যের সুদক্ষ ও শাণিত উপস্থাপয়িতা। স্পষ্ট বর্ণনাবিন্যাসের মাধ্যমে একথা প্রমাণ করবে যে, আমি সত্যবাদী। নতুবা তারা তো আমাকে প্রতিপন্ন করবে মিথ্যাচারীরূপে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে এরকম— তাঁর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দ্বারাই জনসমক্ষে দিবালোকের মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে আমার সত্যপরায়ণতা। মুকাতিল বলেছেন এখানকার 'সে' সর্বনামটি প্রযুক্ত হবে ফেরাউনের সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হে আমার প্রভুপালনকর্তা! তুমি যদি আমার সহকর্মীরূপে আমার ভ্রাতা হারুনকে মনোনয়ন প্রদান করো, তবে তার বাগ্মীতায় অভিভূত হবে ফেরাউন। হয়ে যাবে আমার সমর্থকদের একজন।

'ওয়াআখাফূ' অর্থ এবং আমি আশংকা করি। অর্থাৎ যেহেতু আমি স্পষ্টবাক নই, সেহেতু আমার মধ্যে এই আশংকা বিদ্যমান যে, ফেরাউন হয়তো আমার আড়ষ্ট বচনের মর্মার্থ উপলব্ধি না করেই আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করবে।

এরপরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ বললেন, আমি তোমার ভ্রাতার দ্বারা তোমার বাহুশক্তিশালী করবো এবং তোমাদের উভয়কে প্রাধান্য দান করবো। তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা আমার নিদর্শন বলে তাদের উপর প্রবল হবে'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন, হে মুসা! তুমি চিন্তা কোরো না। আমি তোমার ভ্রাতাকে প্রদান করবো নবুয়ত। সে তোমার সহপ্রচারক হবে নবী হিসেবেই। এভাবে আমি তোমার নবুয়তকে করবো দ্বিগুণ শক্তিশালী। তদুপরি তোমাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করবো মোজেজার মাধ্যমে। ফলে পরাক্রমশালী মিসরাধিরাজ তোমাদের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। এভাবে আমাপ্রদত্ত নিদর্শন বলে তোমাদের এবং তোমাদের অনুসারীদেরই লাভ হবে নিরঙ্কুশ বিজয়।

এখানে 'বি আয়াতিনা' অর্থ আমার নিদর্শন বলে। কথাটির সম্পৃক্তি রয়েছে 'নাজ্বআ'লু'(আমি দান করবো)। এর সঙ্গে। অথবা একটি অনুক্ত বাক্যের সঙ্গে রয়েছে কথাটির সংযোগ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তোমরা দু'জন আমা কর্তৃক প্রদত্ত অলৌকিক নিদর্শন সহ গমন করো। কিংবা বলা যেতে পারে কথাটির সংযোজন রয়েছে 'তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না' এর সঙ্গে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আমা কর্তৃক দানকৃত মোজেজাসমূহের কারণে মিসরপতি ও তার লোকেরা তোমাদের কাছে ঘেষতেও পারবে না। আবার 'তাদের উপরে প্রবল থাকবে এবং সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত হয়ে থাকতে পারে কথাটি। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটির মর্মার্থ হবে— আমার অলৌকিক নিদর্শন বলে তোমরা দু'জন যেমন নিরাপদ থাকবে, তেমনি নিরুপদ্রব থাকবে তোমাদের অনুসারীরা।

فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٦﴾ وَ قَالَ مُوْسٰى رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٣٧﴾ وَ قَالَ فِرْعَوْنُ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ ۚ فَاَوْقِدْ لِيْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى ۙ وَ اِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٣٨﴾ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَ جُنُوْدُهٗ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ ظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ ﴿٣٩﴾ فَاَخَذْنٰهُ وَ جُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٠﴾ وَ جَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿٤١﴾ وَ اَتْبَعْنٰهُمْ فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۚ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ﴿٤٢﴾

r মূসা যখন উহাদিগের নিকট আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলি আনিল, উহারা বলিল, 'ইহা তো অলীক ইন্দ্রজাল মাত্র! আমাদিগের পূর্ব পুরুষগণের কালে কখনও এইরূপ ঘটিতে শুনি নাই।'

r মূসা বলিল, 'আমার প্রতিপালক সম্যক অবগত কে তাঁহার নিকট হইতে পথনির্দেশ আনিয়াছে, এবং কাহার পরিণাম শুভ হইবে। সীমালংঘনকারীরা সফলকাম হইবেই না।'

r ফিরাউন বলিল, ' হে পারিষদবর্গ! আমি ব্যতীত তোমাদিগের অন্য কোন ইলাহ্ আছে বলিয়া জানি না! হে হামান! তুমি আমারজন্য ইট পোড়াও এবং এক

সুউচ্চ প্রাসাদ তৈয়ার কর; হয়ত আমি ইহাতে উঠিয়া মূসার ইলাহ্কে দেখিতে পারি। তবে, আমি মনে করি সে মিথ্যাবাদীই।'

r ফিরাউন ও তাহার বাহিনী অকারণে পৃথিবীতে অহংকার করিয়াছিল এবং উহারা মনে করিয়াছিল যে, উহারা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে না।

r অতএব আমি তাহাকে ও তাহার বাহিনীকে ধরিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলাম। দেখ, সীমালংঘনকারীদিগের পরিণাম কি হইয়া থাকে!

r উহাদিগকে আমি নেতা করিয়াছিলাম। উহারা লোকদিগকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করিত; কিয়ামতের দিন উহারা সহায় পাইবে না।

r এই পৃথিবীতে আমি উহাদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছিলাম এবং কিয়ামতের দিন উহারা হইবে ঘৃণিত।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— তারপর আমার নির্দেশানুসারে ফেরাউনের দরবারে হাজির হলো নবী ভ্রাতৃদ্বয়। হজরত মুসা ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গকে আহ্বান জানালেন আল্লাহ্র পথে। তাঁর নবুয়তের সত্যতা প্রমাণার্থে প্রকাশ করলেন যষ্টির সর্পরূপ ধারণ ও হাতের শুভ্র-উজ্জ্বল হওয়ার নিদর্শন। ফেরাউন ও তার লোকেরা হতচকিত হলো বটে, কিন্তু তাঁকে বিশ্বাস করলো না। বললো, এগুলো তো যাদুমন্ত্রের নিদর্শন মাত্র। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এরকম ইন্দ্রজাল কখনো দেখেনি। যদি দেখতো, তবে আমাদেরকে তা অবশ্যই জানাতো। সুতরাং এদের এ সমস্ত ভেলকিবাজি আমরা বিশ্বাস করি না।

এখানে 'এতো অলীক ইন্দ্রজাল মাত্র' অর্থ— হাতের লাঠির অজগর হয়ে যাওয়ার এই ব্যাপারটি যাদু ছাড়া অন্য কিছু নয়। উল্লেখ্য, ফেরাউন ও তার দরবারীদের সামনে হজরত মুসা মোজেজা প্রদর্শন করেছিলেন দু'টি— যষ্টির সর্পরূপ ধারণ এবং হাতের শুভ্রোজ্জ্বল বিকিরণ। 'মুফতারান' অর্থ এখানে অলীক, অভূতপূর্ব। অথবা এর মর্মার্থ— এ হচ্ছে হজরত মুসা কর্তৃক প্রদর্শিত ইন্দ্রজাল, মিথ্যা যাদু, যা প্রদর্শন করা হচ্ছে আল্লাহ্র নাম করে। কিংবা 'মুফতারান' শব্দটি এখানে যাদুর বিশেষণরূপে ব্যবহৃত, কেননা সকল যাদুর উৎপত্তি হয় মিথ্যা থেকে। আর 'বিহাজা' অর্থ এখানে এই যাদু অথবা নবুয়তের এই দাবি।

পরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'মুসা বললো, আমার প্রতিপালক সম্যক অবগত কে তাঁর নিকট থেকে পথনির্দেশ এনেছে এবং কার পরিণাম শুভ হবে। সীমালংঘনকারীরা সফলকাম হবেই না'। একথার অর্থ— হজরত মুসা তখন বললেন, আমার আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন যে, কে সত্যানুসারী এবং কার জন্য অপেক্ষা করছে শুভপরিণাম। আর সত্যবিমুখই বা কারা। মহাসত্যের প্রমাণ

প্রকাশিত হওয়ার পরেও যারা সত্যবিমুখতার উপরে অনড় অবস্থান গ্রহণ করে তারা অবশ্যই সীমালংঘনকারী। আর সীমালংঘনকারীরা কস্মিনকালেও সফল হয় না। দুনিয়াতে তো নয়ই, আখেরাতেও নয়।

এখানে 'আক্বিবাতুদ্ দার' অর্থ শুভ পরিণাম, পারলৌকিক আবাস বা সফলতা। বায়যাবী লিখেছেন, এখানে 'আদ্দার'অর্থ ইহজগতের কল্যাণ, যা পরিণত হবে পারলৌকিক সুখময় আবাসে বা সফলতায়। কেননা, ইহজগত হচ্ছে পরজগতের শস্যক্ষেত্র। 'পুণ্যার্জন'ই এখানে মূল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ পুণ্যাভিসারীরাই সফল। আর অসফল পুণ্যবিমুখেরা।

কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ বলেন, 'আক্বিবাত' এবং 'উক্ববা' শব্দদু'টো ব্যবহৃত হয় পুণ্য-প্রতিদানের ক্ষেত্রে। আর 'ইক্বাব' 'উক্বুবাত' এবং 'মুআক্বিবাত' ব্যবহৃত হয় পাপ-প্রতিফলের ক্ষেত্রে। কোরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে শব্দগুলো এরকমভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন 'খইরুন সওয়াবাঁও ও উক্ববা' (উত্তম পুরস্কার ও প্রতিদান), 'লাহুম উক্ববাদ্দার (তাদের জন্য পারলৌকিক নিবাস), 'নিমা উক্ববাদ্দার' (কতোইনা উত্তম পারলৌকিক আবাস), 'ওয়াল আক্বিবাতু লিল্ মুত্তাক্বীন' (আর সংযমীদের জন্য রয়েছে পারলৌকিক পুরস্কার)। আবার 'ফাহাক্বক্বা ইক্বাব' (শাস্তি প্রকটিত হলো), 'শাদীদুল ইক্বাব' (কঠোরতর শাস্তি), 'ওয়া ইন্ আক্বাবতুম ফাআক্বিবু বি মিছলি মা উক্বিবতুম বিহী' (যদি তুমি দণ্ড প্রদান করতে চাও, তবে তুমি অনুরূপ দণ্ড প্রদান কোরো, যেমন দণ্ড তুমি পেয়েছো তার দ্বারা) ইত্যাদি।

'সীমালংঘনকারীরা সফলকাম হবেই না' অর্থ তারা দুনিয়াতে যেমন পাবে না সৎপথ তেমনি আখেরাতেও থাকবে পুন্যবিবর্জিত। এভাবে দুনিয়া-আখেরাতে উভয় স্থানে তাদের অসফল হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত।

এরপরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'ফেরাউন বললো, হে পারিষদবর্গ! আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ্ আছে বলে জানিনা'। ফেরাউনের এ কথায় প্রতীয়মান হয় যে, সে ছাড়া অন্য কোনো প্রভুপ্রতিপালকের অস্তিত্ব - অনস্তিত্বের বিষয়ে সে নিশ্চিত নয়। তার 'জানিনা' কথাটিই এর প্রমাণ। পরবর্তী বাক্যেও তার এমতো সন্দেহের বিষয়টি সুপ্রকট।

এরপর বলা হয়েছে— 'হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং এক সুউচ্চ প্রাসাদ তৈয়ার করো, হয়তো আমি এতে উঠে মুসার ইলাহ্কে দেখতে পারি'। হামান ছিলো ফেরাউনের প্রধান মন্ত্রণাদাতা। আর এই হামানকেই সে সর্ব-প্রথম দিয়েছিলো মাটি পুড়িয়ে ইট প্রস্তুত এবং সেই ইট দিয়ে সুউচ্চ মিনার নির্মাণের নির্দেশ। এখানে 'সরহান' অর্থ সুউচ্চ অট্টালিকা, স্তম্ভ বা মিনার। এখানে

'তানভীন' ব্যবহৃত হয়েছে সম্ভ্রমার্থে। আর ফেরাউনের ধারণা ছিলো, মুসার উপাস্য যদি কেউ থেকেই থাকে তবে তার অবস্থান অবশ্যই আকাশে। কেননা পৃথিবীতে সেরকম কারো অস্তিত্ব তো নিরীক্ষ্য নয়।

এরপর বলা হয়েছে— ' তবে আমি মনে করি সে মিথ্যাবাদীই'। একথার অর্থ সন্দেহগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও ফেরাউন তখন জোর গলায় বললো, তবে এটা নিশ্চিত যে, আকাশ পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ্— মুসার এ দাবি সর্বৈবরূপে মিথ্যা। উল্লেখ্য, ফেরাউন ছিলো আসত্তা পথভ্রষ্ট। তার ধারণা ছিলো, তার মতো মহাসম্রাট যেহেতু এখন কেউই নয়, তাই সে-ই হচ্ছে পৃথিবীবাসীদের প্রতিপালক। অন্য কেউ নয়।

বাগবী লিখেছেন, সম্মানিত ভাষ্যকারগণ বলেন, ফেরাউনের নির্দেশ মোতাবেক হামান আশেপাশের রাজা-বাদশাহ ও শ্রমিকদেরকে একত্রিত করলো। একত্রিত করলো পঞ্চাশ হাজার রাজমিস্ত্রিকেও। ইটনির্মাতা, চুন প্রস্তুতকারী, জ্বালানী-যোগানদারও হাজির করলো অসংখ্য। তারপর বহু অর্থ ব্যয়ে নির্মাণ করলো পৃথিবীর সর্বোচ্চ অট্টালিকা। নির্মাণ সমাপনের পর ফেরাউন তার ঘনিষ্ট সহচরদের নিয়ে আরোহণ করলো অট্টালিকাটির সর্বোচ্চ কামরায়। এক তুখোড় তীরন্দাজকে হুকুম দিলো, এখান থেকে আকাশের দিকে তীর ছুঁড়তে থাকো। মুসার আল্লাহকে বধ করতেই হবে। তীরন্দাজ হুকুম তামিল করলো। সকলেই দেখতে পেলো তীরগুলো পুনরায় পতিত হচ্ছে তাদেরই সামনে। আল্লাহ্র নির্দেশে ফেরেশতারা তীরগুলোতে রক্ত মাখিয়ে দিয়েছিলো। ফেরাউন এ দৃশ্য দেখে প্রতারিত হলো। দর্পভরে বললো, দ্যাখো, মুসার আল্লাহ্ আর বেঁচে নেই। রক্তমাখা এই তীরগুলোই তার প্রমাণ। সে প্রাসাদে আরোহণ করেছিলো গাধায় চড়ে। আল্লাহ্র নির্দেশে হজরত জিবরাইল তার ডানার আঘাতে গাধাটিকে তিন টুকরা করে ফেললো। এক টুকরা আঘাত হানলো ফেরাউনের সেনাবাহিনীকে আর এক টুকরা ছিটকে পড়লো দূরবর্তী সমুদ্রের লোনা জলে। আর তৃতীয় টুকরাটি আঘাত হানলো ওই সকল শ্রমিককে, যারা ছিলো তার সাধের প্রাসাদটির নির্মাণকর্মী। ফলে দেখা গেলো বিশাল এলাকাজুড়ে মরে পড়ে রয়েছে ফেরাউন পক্ষীয় অসংখ্য লোক।

এরপরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'ফেরাউন ও তার বাহিনী অকারণে পৃথিবীতে অহংকার করেছিলো এবং তারা মনে করেছিলো যে, তারা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না'। 'হক্ব' অর্থ সত্য। এখানে শব্দটির মর্মার্থ— হকদার, অধিকারী, সত্যের দাবিদার। উল্লেখ্য, প্রকৃত অর্থে সত্যের দাবিদার হতে পারেন কেবল আল্লাহ্। কেননা তাঁর সত্তায় এবং গুণবত্তায় অপূর্ণতার কল্পনা অসম্ভব।

অহংকার কেবল তাঁর পক্ষেই শোভন। আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন, অহংকার আমার উত্তরীয় এবং মহিমা আমার পরিধেয়। যে আমার এ ভূষণ দু'টো দাবি করবে, তাকে আমি অবশ্যই নিক্ষেপ করবো নরকে। বিশুদ্ধসূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকে কেবল ইবনে মাজা। এই হাদিসটিই আবার হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাকেম বর্ণনা করেছেন এভাবে— অহমিকা আমার চাদর। যে আমার এ চাদর ধরে টান দিবে, আমি তাকে ধ্বংস করে দিবো। হজরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে সামুবিয়া বর্ণনা করেছেন, যে আমার পরিচ্ছদ দু'টোর যে কোনো একটি তার নিজের দিকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করবে, তাকে আমি শায়েস্তা করবো।

এর পরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'অতএব আমি তাকে ও তার বাহিনীকে ধরে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। দেখ, সীমালংঘনকারীদের পরিণাম কীরূপ হয়ে থাকে'। একথার অর্থ— আত্মম্ভরিতা ও সত্যপ্রত্যাখ্যানে সীমালংঘনের কারণে অবশেষে আমি ফেরাউন ও তার বাহিনীকে দান করলাম সলিল সমাধি। সুতরাং হে আমার রসুল! আপনি মক্কাবাসীদেরকে এই কাহিনিটি শুনিয়ে দিন এবং বলুন, তাহলে বুঝতে চেষ্টা করো, সীমালংঘনের পরিণাম কতো ভয়াবহ হয়। এখনো সময় আছে, সর্বান্তকরণে গ্রহণ করো মহাসত্য ইসলাম।

শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ের (৪১, ৪২) মর্মার্থ হচ্ছে— আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিপত্তি দিয়েছিলাম। করে ছিলাম মানবগোষ্ঠির অধিনায়ক। অথচ তারা মানুষকে শুভপথে পরিচালিত না করে নিয়ে গিয়েছিলো জাহান্নামের পথে। উত্থান দিবসে তাই তারা হবে সহায়হীন। পৃথিবীতে আমি তাদেরকে করেছিলাম অভিশপ্ত। আর পরবর্তী পৃথিবীতেও তারা হবে ঘৃণিত।

এখানে 'আইম্মাতান' অর্থ পথভ্রষ্টদের অধিনায়ক। অথবা বিত্ত-প্রতিপত্তিশালী, অভিজাত শ্রেণীর নেতা। 'ইলান নার' অর্থ নরকাগ্নির দিকে। অর্থাৎ ওই সকল কর্মকাণ্ডের দিকে যা জাহান্নামগমনের সহায়ক। 'লা ইয়ুনসারুন' অর্থ সহায় পাবে না। 'লা'নাতান' অর্থ অভিশাপ— আল্লাহ্র, ফেরেশতার ও বিশ্বাসীর। অর্থাৎ পৃথিবীতে তারা কুড়াবে আল্লাহ্র ফেরেশতামণ্ডলীর ও বিশ্বাসীগণের অভিসম্পাত। আর 'আলমাক্ববুহীন' অর্থ— ঘৃণিত, কৃষ্ণবর্ণ মুখাবয়ব ও কুৎসিতদর্শন নীল চক্ষু বিশিষ্ট। আরববাসীরা বলে থাকে 'ক্ববাহুল্লহু' (আল্লাহ্ তার আকৃতি বিকৃত করেছেন)। কল্যাণ বিচ্যুত যারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করেও আবরবাসীরা বলেন 'ক্ববাহাহুল্লহু ক্কবহান ও ক্কবুহান'।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٣﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَآ اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَلٰكِنَّآ اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِيْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۙ وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴿٤٥﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٦﴾

r আমি তো পূর্ববর্তী বহুমানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করিবার পর মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম মানবজাতির জন্য আলোকবর্তিকা, পথ-নির্দেশ ও দয়াস্বরূপ যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

r মূসাকে যখন আমি বিধান দিয়াছিলাম তখন তুমি পর্বতের পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলে না এবং তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলে না।

r বস্তুতঃ মূসার পর অনেক মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটাইয়াছিলাম; অতঃপর উহাদিগের বহু যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। তুমি তো মাদ্‌য়ানবাসীদিগের মধ্যে বিদ্যমান ছিলে না উহাদিগের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করিবার জন্য। আমিই তো ছিলাম রসূল প্রেরণকারী।

r মূসাকে যখন আমি আহ্বান করিয়াছিলাম তখন তুমি তূর পর্বত-পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না। বস্তুতঃ এই সংবাদ তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে দয়াস্বরূপ, যাহাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করিতে পার যাহাদিগের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসে নাই যেন উহারা উপদেশ গ্রহণ করে;

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি তো পূর্ববর্তী বহু মানবগোষ্ঠিকে বিনাশ করবার পর মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম মানবজাতির জন্য আলোকবর্তিকা, পথনির্দেশ ও দয়া স্বরূপ যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে'। এখানে 'পূর্ববর্তী বহু মানবগোষ্ঠী'

বলে বুঝানো হয়েছে হজরত মুসার জামানার পূর্বের হজরত নুহ, হজরত হুদ, হজরত সালেহ, হজরত লুত প্রমূখ নবীগণের সময়ের সীমালংঘনকারীদেরকে।

এখানকার 'বাসাইর' শব্দটি 'বাসীরাত' এর বহুবচন। এর অর্থ হৃদয়জ আলোকবর্তিকা, যার দ্বারা উদ্ভাসিত হয় প্রকৃত তত্ত্বের গুঢ় রহস্য এবং যার ফলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সত্য-মিথ্যার বিভাজনরেখা। 'হুদান' অর্থ পথনির্দেশ, যার মাধ্যমে অর্জিত হয় পরিত্রাণের উপায়, পৃথক হয়ে যায় ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কর্মকাণ্ডসমূহ। 'রহমাতান' অর্থ দয়াস্বরূপ। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার কৃপালাভের হেতুস্বরূপ। আর 'যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে' অর্থ যাতে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় উপদেশ লাভের যোগ্যতা। উল্লেখ্য, এমতো উপদেশ লাভের যোগ্যতা সৃষ্টি হয় তখন, যখন জাগ্রত হয় আল্লাহ্র স্মরণ ও ভয়। এরকম স্মৃতি ও ভীতি উৎসারিত হয় প্রজ্ঞা বা জ্ঞান থেকে। যেমন আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— 'অবশ্যই আমাকে ভয় করে তারা, যারা জ্ঞানী।

পরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'মুসাকে যখন আমি বিধান দিয়েছিলাম, তখন তুমি পর্বতের পশ্চিমপ্রান্তে উপস্থিত ছিলে না এবং তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলে না'।

এখানে 'বি জ্বানিবিল গরবিয়্যি' অর্থ পর্বতের পশ্চিম পার্শ্বে। কাতাদা ও সুদ্দী বলেছেন, পশ্চিম পর্বতের পাশে। কালাবী বলেছেন, পশ্চিম উপত্যকার ধারে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'পর্বতের পশ্চিম প্রান্তে' বলে ওই স্থানটিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যে স্থানে একান্ত আলাপন সম্পন্ন হয়েছিলো আল্লাহ্র সঙ্গে মহাপ্রেমিক মুসার। আর এখানে সর্বশেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স. কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে— তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলেনা' এবং 'তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলে না'। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! আপনিতো ওই সময়ে তুর পর্বতের পশ্চিমপ্রান্তে উপস্থিত ছিলেন না, যখন আমি মুসার সঙ্গে করেছিলাম বাক্যবিনিময়। আর ওই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীও তো আপনি নন। অথবা এখানে 'প্রত্যক্ষদর্শী' বলে বুঝানো হয়েছে বনী ইসরাইলের ওই সত্তরজন নেতাকে, যাদেরকে নিয়ে পরবর্তী সময়ে তওরাত শরীফ গ্রহণার্থে হজরত মুসা গমন করেছিলেন তুর পর্বতে। যদি তাই হয়, তবে শেষ বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— আর আপনি তো ওই সকল সাক্ষ্যদাতা ইসরাইলি নেতাদেরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, যারা অবলোকন করেছিলো তওরাত শরীফের অবতরণ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার মহাপ্রেমাস্পদ! মহাপ্রেমিক মুসার ইতিবৃত্ত ইতোপূর্বে কখনো শোনেননি। তাঁর জীবনে তুর পর্বতের বিস্ময়কর দৃশ্যাবলীই কখনো স্বচক্ষে দর্শন করেননি। ওই কাহিনী এখন আমিই আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি

এই কোরআনের মাধ্যমে। এটাই কী আমার পক্ষ থেকে প্রদত্ত আপনার রেসালতের পক্ষের প্রকৃষ্ট প্রমাণ নয়? তাহলে বিষয়টিকে আপনার স্বজাতি অনুধাবন করতে চেষ্টা করে না কেনো? কেনো আপনাকে বরণ করে না আল্লাহ্‌র সত্য রসুল হিসেবে?

এর পরের আয়াতে (৪৫) বলা হয়েছে— 'বস্তুতঃ মুসার পরে অনেক মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটিয়েছিলাম; অতঃপর তাদের বহুযুগ অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে'।

এখানে 'কুরুনান্' অর্থ অনেক যুগ বা বিভিন্ন যুগের মানুষ, অনেক মানবগোষ্ঠী। 'ফাতাওয়াললা আ'লাইহিমুল উমুরু' অর্থ তাদের বহুযুগ হয়েছে বিগত। অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে নবী প্রেরণবিষয়ক পরম্পরা। ফলে বিচ্ছিন্ন ও বিকৃত হয়ে পড়ছে তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থসমূহের মর্মবাণী। দেখা দিয়েছে শতসহস্র মতপ্রভেদ। সেকারণেই এখানকার এই কোরআনকে তাদের কাছে মনে হচ্ছে অতিনতুন ও অপরিচিত কোনো বাণী।

বাগবী লিখেছেন, আল্লাহ্‌পাক হজরত মুসা এবং তাঁর স্বজাতির কাছ থেকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন যে, যখন শেষ রসুলের মহাআবির্ভাব ঘটবে, তখন তাঁকে মেনে নিতে হবে সর্বান্তঃকরণে। কিন্তু সুদীর্ঘকাল পর তাদের সেই প্রতিশ্রুতির স্মৃতি বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলো তারা। তদস্থলে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলো ঔদাসীন্য, কেবলই ঔদাসীন্য। এভাবে বক্তব্যপরম্পরাটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! আপনার সম্পর্কে আমি প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলাম নবী মুসা ও তাঁর সহচরবৃন্দদের নিকট থেকে। ওই সময় তো আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। এ ব্যাপারে আপনি কখনো আবেদনও করেননি। বরং ওই সিদ্ধান্তটি ছিলো আমার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, নিছক করুণাসঞ্জাত। আর ওরকম করেছিলাম আমি এ জন্য যে, ভবিষ্যতে যেনো তারা কখনো প্রতিশ্রুতিভঙ্গের কোনো অজুহাত প্রদর্শন করতে না পারে। এরপর অতিবাহিত হতে লাগলো যুগের পর যুগ। শতাব্দীর পর শতাব্দী। এভাবে অনেক মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব— তিরোভাবের পর দেখা গেলো সেই প্রতিশ্রুতির কথা তাদের পরবর্তী প্রজন্মের আর স্মরণেই নেই। অন্য এক আয়াতে প্রতিশ্রুতির উল্লেখ এসেছে এভাবে— 'যখন আদম সন্তানদের নিকট থেকে আপনার প্রভুপালক প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন তাদের পিতাদের পৃষ্ঠদেশ থেকে..... যেনো তারা না বলতে পারে, নিশ্চয় আমরা এসম্পর্কে ছিলাম উদাসীন'।

এরপর বলা হয়েছে— 'তুমি তো মাদিয়ানবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেনা তাদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করবার জন্য'। একথার অর্থ— হে আমার

রসুল! আপনি তো মাদিয়ানবাসীদের সৎপথ প্রদর্শনের দায়িত্বপ্রাপ্তও ছিলেন না। মুকাতিল বক্তব্যটির অর্থ করেছে— 'আপনি তো মাদিয়ানবাসীদের ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শীও নন, যাতে করে মক্কাবাসীদের নিকটে বিবৃত করতে পারেন তাদের বিবরণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমিই তো ছিলাম রসুল প্রেরণকারী'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আমিই তো আপনাকে প্রেরণ করেছি আমার বার্তাবাহকরূপে। আর আপনার মাধ্যমে মক্কাবাসী ও জগতবাসীদের জানিয়ে দিচ্ছি পূর্ববর্তী মানবগোষ্ঠির উত্থান-পতনের বিলুপ্ত কাহিনী। আমি ছাড়া এ সকল কাহিনী যথাযথরূপে বর্ণনা করার সাধ্য রাখে কে? অতএব, একথা অবশ্য-বিশ্বাস্য যে, আমি যেমন আপনার পূর্বসূরী বার্তাবাহকগণের একমাত্র প্রেরক, তেমনি আপনারও। সুতরাং আপনাকে সত্য রসুল বলে তারা মেনে নিবে না কেনো?

এরপরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— 'মুসাকে যখন আমি আহ্বান করেছিলাম, তখন তুমি তুর পর্বত পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না। বস্তুতঃ এই সংবাদ তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে দয়াস্বরূপ, যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারো, যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসেনি যেনো তারা উপদেশ গ্রহণ করে'। একথার অর্থ— হে আমর রসুল! আপনি ওই সময় সেখানে ছিলেন না, যেখানে আমি মুসাকে ডেকে এনেছিলাম কথাবার্তা বলবার জন্য এবং তুর পর্বতের ওই স্থানটিতেও ছিলো আপনার অনুপস্থিতি, যেখানে আমি তাকে দান করেছিলাম নবুয়ত। বস্তুতঃ এ সম্পর্কিত তথ্যসমূহ অনুকম্পাপরবশ হয়ে আমিই আপনাকে জানাচ্ছি, যাতে আপনি যে সত্য পয়গম্বর সেকথা জনসমক্ষে প্রকাশ হয়ে যায় এবং আপনি হতে পারেন আপনার স্বজাতির দরদী পথপ্রদর্শক, যাদের প্রতি ইতোপূর্বে কখনো প্রেরিত হননি কোনো প্রেরিতপুরুষ। উল্লেখ্য, হজরত ইব্রাহিমের পরের নবী-রসুলগণ ছিলেন বনী ইসরাইল বংশদ্ভূত। বনী ইসমাইলদের অন্তর্ভূত ছিলেন কেবল শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স.। তাই তাঁর বংশভূতদের সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে 'যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারো যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসেনি'।

এখানে 'ইজ নাদাইনা' অর্থ যখন আমি মুসাকে আহ্বান করেছিলাম। অর্থাৎ যখন আমি নবী মুসাকে তুর পর্বতে ডেকে নিয়ে তওরাত প্রত্যর্পণ করেছিলাম এবং বলেছিলাম এ গ্রন্থ আঁকড়ে ধরো সুদৃঢ়রূপে। আর 'তুর পর্বত পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেনা' অর্থ উপস্থিত ছিলেন না ওই সময় যখন তাকে দান করেছিলাম নবুয়ত।

ওয়াহাব বলেছেন, একবার হজরত মুসা প্রার্থনা জানালেন, হে আমার প্রভুপালক! শেষ রসুলের সঙ্গে আমার সাক্ষাত ঘটিয়ে দিন। আল্লাহ্ বললেন, কখনোই নয়। তবে আমি তাঁর উম্মতের সঙ্গে তোমার সাক্ষাত ঘটিয়ে দিতে চাই। ওই শোনো তাদের জিকির আজকারের কলগুঞ্জন। এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে রূহানীভাবে উপস্থিত হলো অসংখ্য উম্মতে মোহাম্মদী। চতুষ্পার্শ্বে আওয়াজ উত্থিত হলো, লাব্বাইক, লাব্বাইক। আবু জারআ ইবনে আমর ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্ তখন সমবেত উম্মতে মোহাম্মদীকে লক্ষ্য করে বললেন, হে উম্মতে আহমদ! আমাকে আহ্বান করবার পূর্বেই আমি সাড়া দেই। আর আমি তোমাদেরকে দান করি যাচ্না্র আগে। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্ ডাক দিলেন, হে উম্মতে মোস্তফা! উম্মতে মোস্তফা পিতৃপৃষ্ঠ অথবা মাতৃজঠর থেকে জবাব দিলো, এই যে আমি, এই যে আমরা। হে আমাদের পরম প্রভুপালক! সকল স্তব-স্তুতি তোমার। কোনো বিষয়ে তোমার কোনো অংশীদার নেই। আল্লাহ্পাক বললেন, হে আমার শ্রেষ্ঠ রসুলের শ্রেষ্ঠ অনুগামীবৃন্দ। শোনো, আমার কোপ অপেক্ষা কৃপা অগ্রগামী। শাস্তি প্রদানপ্রবণতা অপেক্ষা প্রবল মার্জনাকাংখা। আমি তোমাদের প্রদান করি প্রার্থনার পূর্বে এবং সাড়া দেই আহ্বানের আগে। আর মার্জনা করি ক্ষমাপ্রার্থনার অপেক্ষা না করেই। মহা বিচার দিবসে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লহ' এর সাক্ষ্য নিয়ে যে আমার সকাশে উপস্থিত হবে তার স্বর্গবাস অবধারিত, যদিও তার পাপরাশি হয় সমুদ্রের ফেনপুঞ্জতুল্য।

সূরা ক্বাসাস ঃ আয়াত ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০

وَلَوْلَآ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَآ اُوْتِيَ مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى ؕ اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ۚ قَالُوْا سِحْرٰنِ تَظٰهَرَا ۗ وَقَالُوْٓا اِنَّا بِكُلٍّ كٰفِرُوْنَ ﴿٤٨﴾ قُلْ فَاْتُوْا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَآ اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٩﴾ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ

اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ ؕ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٠﴾

r রসূল না পাঠাইলে উহাদিগের কৃতকার্যের জন্য উহাদিগের কোন বিপদ হইলে উহারা বলিত, 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! তুমি আমাদিগের নিকট কোন রসূল প্রেরণ করিলে না কেন? করিলে, আমরা তোমার নিদর্শন মানিয়া চলিতাম এবং আমরা হইতাম বিশ্বাসী।'

r অতঃপর যখন আমার নিকট হইতে উহাদিগের নিকট সত্য আসিল উহারা বলিতে লাগিল, 'মূসাকে যেরূপ দেওয়া হইয়াছিল মুহাম্মদকে সেরূপ দেওয়া হইল না কেন?' কিন্তু পূর্বে মূসাকে যাহা দেওয়া হইয়াছিল তাহা কি উহারা অস্বীকার করে নাই? উহারা বলিয়াছিল, উভয়ই যাদু, একে অপরকে সমর্থন করে।' এবং উহারা বলিয়াছিল, 'আমরা উভয়কে প্রত্যাখ্যান করি।'

r বল, 'তোমরা সত্যবাদী হইলে আল্লাহের নিকট হইতে এক কিতাব আনয়ন কর যাহা পথ-নির্দেশে এতদুভয় হইতে উৎকৃষ্টতর হইবে; আমি সেই কিতাব অনুসরণ করিব।'

r অতঃপর উহারা যদি তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহা হইলে জানিবে উহারা তো কেবল নিজদিগের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে। আল্লাহের পথ-নির্দেশ অমান্য করিয়া যে-ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে তাহা অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে পথ-নির্দেশ করেন না!

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আমার চিরাচরিত নিয়ম এই যে, আমি রসুল প্রেরণের মাধ্যমে প্রথমে সতর্ক না করে কোনো সম্প্রদায়ের উপরে শাস্তি আরোপ করি না। যদি করতাম, তবে তারা এই অজুহাতটি খাড়া করতো যে, হে আমাদের প্রভুপালক! তুমি আমাদেরকে শাস্তি প্রদানের পূর্বে সতর্ক করলে না কেনো, কেনো আমাদেরকে সাবধান করে দিলে না তোমার কোনো বার্তাবাহকের মাধ্যমে। আমরা তা হলে সাবধান হতে পারতাম। তোমার নিদর্শনরাজির উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে আত্মরক্ষা করতে পারতাম তোমার শাস্তি থেকে। কিন্তু এরকম অজুহাতের অবকাশ আমি রাখিনি। আর এখন আপনাকে প্রেরণের মাধ্যমেও আপনার স্বজাতি ও সমকালের মানুষের জন্য রুদ্ধ করে দিয়েছি এমতো অনুযোগের সুযোগ। এভাবেই আমি পরিপূর্ণ করেছি মহাসত্যের পক্ষের দলিল প্রমাণ। অন্য এক আয়াতে বক্তব্যটি উপস্থিত করা হয়েছে এভাবে— 'যেনো তা রসুল প্রেরণের পর হয়ে যায় একটি অনস্বীকার্য দলিল। অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার স্বপক্ষে যেনো তারা কোনো অনুযোগ উত্থাপনের কোনো অবকাশই আর না পায়'।

পরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'অতঃপর যখন আমার নিকট থেকে তাদের নিকট সত্য এলো তারা বলতে লাগলো, মুসাকে যেরূপ দেয়া হয়েছিলো মোহাম্মদকে সেরূপ দেয়া হলো না কেনো'? একথার অর্থ— হে আমার রসুল! দেখুন মক্কাবাসীদের উক্তি কীরূপ জঘন্য। তারা বলে, রসুল মুসাকে যে রকম যষ্টির অলৌকিকত্ব ইত্যাদি দেয়া হয়েছিলো, সেরকম অলৌকিকত্ব আপনাকে দেয়া হলো না কেনো? অথবা এর মর্মার্থ হবে— তাঁর উপর তওরাত যেমন অবতীর্ণ হয়েছিলো একযোগে, তেমনি এক সঙ্গে আপনার উপর অবতীর্ণ হলো না কেনো কোরআন?

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু পূর্বে মুসাকে যা দেওয়া হয়েছিলো তাকি তারা অস্বীকার করেনি?' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, মুসার মোজেজাসমূহ অবলোকন করে কীইবা লাভ হয়েছিলো ওই সকল অবাধ্যদের? তারা কি সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে মহাশাস্তির উপযোগী হয়ে যায়নি?

আলোচ্য প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন। সুতরাং 'তা কি তারা অস্বীকার করেনি' অর্থ তারা ওই সকল অলৌকিকত্ব অবশ্যই অস্বীকার করেছিলো। অতএব, হে মক্কার মুশরিকেরা! তোমাদের সম্মুখে মোজেজা প্রদর্শন করেই বা কী লাভ? স্বভাবে-চরিত্রে তোমরা তো তাদেরই মতো।

কালাবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. যখন সত্যধর্ম ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করলেন তখন কুরায়েশ নেতৃবর্গ তাঁর রেসালাত সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ হবার অভিপ্রায়ে কিছুসংখ্যক লোককে প্রেরণ করলো মদীনার ইহুদী পণ্ডিতদের কাছে। তাদের কথা শুনে ওই পণ্ডিতেরা বললো, হ্যাঁ, আমাদের তওরাতে রয়েছে তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলীর বিবরণ। কিন্তু তারা মক্কায় ফিরে একথা জানানো সত্ত্বেও নেতারা তাদের কথাকে গ্রাহ্য করলো না। পূর্বের মতোই রয়ে গেলো অনড় বিরুদ্ধবাদী। এভাবে তারা কোরআনের সঙ্গে সঙ্গে অস্বীকার করে বসলো তওরাতকেও। পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে সেকথাই।

বলা হয়েছে— 'তারা বলেছিলো, উভয়ই যাদু, একে অপরকে সমর্থন করে। এবং তারা বলেছিলো, আমরা উভয়কে প্রত্যাখ্যান করি'। 'এখানে উভয়ই যাদু' অর্থ হজরত মুসা আ. এবং হজরত মোহাম্মদ স. দু'জনই যাদুকর। এরকম বলেছেন কালাবী। আর অন্যান্য ভাষ্যকারগণ বলেছেন, এখানে দু'জনেই যাদুকর বলে বুঝানো হয়েছে হজরত মুসা ও হজরত হারুনকে।

'একে অপরকে সমর্থন করে' অর্থ হজরত মুসা ও হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা দু'জনেই একে অপরের সমর্থক। অর্থাৎ তাদের উপরে অবতীর্ণ তওরাত ও কোরআন একে অপরের প্রত্যয়নকারী। অথবা কথাটির অর্থ হবে হজরত মুসা ও

হজরত হারুন একে অপরকে সমর্থন করেন। আর 'তারা বলেছিলো, আমরা উভয়কে প্রত্যাখ্যান করি' কথাটির অর্থ— মক্কার মুশরিকেরা বলেছিলো, আমরা প্রত্যাখ্যান করি মুসা ও মোহাম্মদ দু'জনকেই।

এরপরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা সত্যবাদী হলে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এক কিতাব আনয়ন করো যা পথনির্দেশে এতদুভয় থেকে উৎকৃষ্টতর হবে, আমি সেই কিতাব অনুসরণ করবো'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম নবী! আপনি ওই অংশীবাদীদেরকে বলুন, ঠিক আছে। তোমাদের কথা মতো মুসা ও মোহাম্মদ যদি যাদুকর হয়েই থাকেন, আর তাঁদের আনীত গ্রন্থদ্বয় যদি হয়েই থাকে যাদু প্রভাবিত, তবে আনো এ দু'টোর চেয়ে উত্তমতর কোনো গ্রন্থ, সে গ্রন্থের অনুসারী হবো আমিও। কিন্তু এমতো কর্মও তো তোমাদের সাধ্যবহির্ভূত।

'ইন্‌কুনতুম সদিক্বীন' অর্থ যদি তোমরা সত্যবাদী হও। 'ইন' (যদি) শব্দটি ব্যবহৃত হয় সন্দেহ প্রকাশার্থে। কিন্তু এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে উপহাস প্রকাশার্থে। এভাবে কথাটি দাঁড়িয়েছে— ঠিক আছে, দ্যাখো, যদি পারো।

এরপরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা যদি তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহলে জানবে তারা তো কেবল নিজেদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! উৎকৃষ্টতর গ্রন্থ আনয়নের যে প্রস্তাব আপনি তাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন, সে প্রস্তাবে যদি তারা সম্মত না হয়, তবে নিশ্চিত জানবেন তারা স্বকপোলকল্পনার অনুগামী। প্রকৃত সত্যের সঙ্গে তাদের চিন্তা ও কথার সম্পর্কমাত্র নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ আমান্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে, তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কে? আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না'। একথার অর্থ— আল্লাহ্‌র শুভনির্দেশনা পরিত্যাগ করে যে ব্যক্তি হয়ে যায় তার স্বপ্রবৃত্তির অনড় অনুগামী, তাকে আল্লাহ্ দান করেন না সৎপথ প্রাপ্তির সৌভাগ্য। কেননা সে চিরভ্রষ্ট। রসুল স. জানিয়েছেন, তোমাদের মধ্যে কেউই পূর্ণ ইমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অনুসারী হবে আমা কর্তৃক আনীত পথনির্দেশের। বাগবী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর শরহে সুন্নাহ্ গ্রন্থে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর থেকে। ইমাম নববী বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত।

এখানে 'আজ্‌জলিমীন' অর্থ আত্মঅত্যাচারী। অর্থাৎ যে জুলুম করে তার আপন সত্তার উপর। এভাবে হয়ে যায় সীমালংঘনকারী।

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥١﴾ اَلَّذِيْنَ
اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾ وَ اِذَا يُتْلٰى
عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ
مُسْلِمِيْنَ ﴿٥٣﴾ اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا
وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٥٤﴾
وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ
اَعْمَالُكُمْ ۫ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۫ لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ ﴿٥٥﴾

r 'আমি তো উহাদিগের নিকট বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছি। যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

r ইহার পূর্বে আমি যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছিলাম তাহারা ইহাতে বিশ্বাস করে।

r যখন উহাদিগের নিকট ইহা আবৃত্তি করা হয় তখন উহারা বলে, 'আমরা ইহাতে বিশ্বাস করি, ইহা আমাদিগের প্রতিপালক হইতে আগত সত্য। আমরা তো পূর্বেও আত্মসমর্পণকারী ছিলাম;

r উহাদিগকে দুইবার পুরস্কৃত করা হইবে, কারণ উহারা ধৈর্যশীল এবং উহারা ভালোর দ্বারা মন্দের মোকাবিলা করে ও আমি উহাদিগকে যে জীবনোপকরণ দিয়াছি তাহা হইতে উহারা ব্যয় করে।

r উহারা যখন অসাার বাক্য শ্রবণ করে তখন উহারা তাহা পরিহার করিয়া চলে এবং বলে, 'আমাদিগের কাজের জন্য আমরা দায়ী এবং তোমাদিগের কাজের জন্য তোমরা দায়ী; তোমাদিগের প্রতি 'সালাম'। আমরা অজ্ঞদিগের সংগ চাহি না।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি তো তাদের নিকট বাণী পৌঁছে দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে'।

‘লাক্বদ ওয়াস্‌সালনা’ অর্থ নিশ্চয় আমি মিলিয়ে দিয়েছি বা পৌঁছে দিয়েছি। ফাররা বলেছেন, কথাটির অর্থ— আল্লাহ্‌পাক বলেন, আমি তো কোরআনের বাণীসমূহ অবতীর্ণ করেছি একে একে, যাতে করে সেগুলো স্মৃতিপটে থাকে সতত জাগ্রত। অথবা অর্থ হবে এরকম— আমি অবতীর্ণ বিষয়াবলীর যোগসূত্র অক্ষুণ্ন রেখেছি, যেনো তা সত্যের আমন্ত্রণকর্মে আনে প্রমাণশোভিত শক্তিমত্তা ও সদুপদেশ। মাদারেক রচয়িতা লিখেছেন, এখানকার ‘তাওসীল’ অর্থ মিলন বা যোগসূত্রের অটুটতা। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে ‘ওয়াস্‌সালনা’ অর্থ ‘বাইয়্যান্‌না’। অর্থাৎ আমি তো প্রকাশ করেছি খোলাখুলিভাবে। এভাবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— আমার বাণীসম্ভারভূত এক আয়াতের বিষয়বস্তুকে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে অপর আয়াত। কাতাদা বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা অতীতকালের মানুষের সঙ্গে কী আচরণ করেছেন, কোরআনে তা উল্লেখিত হয়েছে বারংবার। মুকাতিল বলেছেন, কথাটির অর্থ— আল্লাহ্ বলেন, বার বার অতীতের অবাধ্যদের করুণ পরিণতির কথা আমি তো জানিয়ে দিয়েছি মক্কাবাসীদেরকে। ইবনে জায়েদ বলেছেন, বক্তব্যটির মর্মার্থ হবে— আল্লাহ্ বলেন, আমি তো আমার বাণীসম্ভারে ঘটিয়েছি ইহলৌকিকতা ও পারলৌকিকতার সেতুবন্ধন। সেকারণেই তো মানুষ ইহকালবাসী হয়েও লাভ করতে পারে পারত্রিক জ্ঞান। ইবনে জারীর ও তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত রেফায়া কারাজী বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে দশ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে, তার মধ্যে আমিও একজন। ইবনে জারীরের বর্ণনায় আরো এসেছে, আলী ইবনে রেফায়া বলেছেন, আহলে কিতাবগণের অন্তর্ভুক্ত ওই দশ জনের একজন ছিলেন আমার পিতা। দশজনের ওই দলটি সরাসরি রসুল স. এর পবিত্র সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সত্য ধর্ম ইসলামের পথে তাঁরা সহ্য করেছিলেন অনেক দুঃখ যাতনা।

পরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— ‘এরপূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম তারা এতে বিশ্বাস করে’।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত কাতাদা বলেছেন, রসুল স. এর মহাআবির্ভাবের পূর্বে ইহুদীদের মধ্যে দশ ব্যক্তি ছিলেন সত্যপ্রেমিক ও ন্যায়পরায়ণ। রসুল স. মদীনায় আগমন করার পর পরই তাঁরা একযোগে গ্রহণ করেছিলেন ইসলামের সুশীতল ছায়া। হজরত ইবনে সালাম ছিলেন তাঁদের অন্তর্ভূত। এরকম লিখেছেন বাগবীও। ইবনে মারদুবিয়াও এরকম বিবরণ উপস্থিত করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। তিবরানী তাঁর ‘আযীমাত’ গ্রন্থে

লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বাদশাহ নাজ্জাসীর দেশ থেকে মদীনায় আগমন করেছিলেন চল্লিশজনের একটি প্রতিনিধি দল। কিন্তু তাঁদের কেউই তখন শাহাদত বরণের সৌভাগ্য লাভ করেননি। খয়বর যুদ্ধের পর তাঁরা লক্ষ্য করলেন, মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বড়ই নাজুক। তাই তাঁরা রসুল স. সকাশে এই মর্মে আবেদন জানালেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমরা তো বিত্তশালী। আপনার সদয় অনুমতি যদি পাই, তবে আমরা আমাদের দেশ থেকে অর্থ-বিত্ত এনে আমাদের এখানকার মুসলিম ভাইদের খেদমতে লাগাতে চাই। তাঁদের এমতো প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

ইবনে আবী হাতিমের বর্ণনায় এসেছে, সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, ইসলামের প্রথম হিজরতকারী দলটি হজরত জাফরের নেতৃত্বে উপস্থিত হলেন আবিসিনিয়ায়। সেখানকার সদাশয় সম্রাট নাজ্জাশী তাঁদেরকে জানালেন সাদর অভ্যর্থনা। প্রদর্শন করলেন সহৃদয় আতিথ্য। কয়েক বৎসর সেখানে অতিবাহিত করার পর যখন তাঁদের প্রত্যাবর্তনের সময় হলো, তখন কতিপয় আবিসিনিয়াবাসী সম্রাটপ্রবর সকাশে নিবেদন করলো, আমরাও আমাদের এই দূরদেশী ভ্রাতাগণের প্রত্যাবর্তনসহচর হতে চাই। সমুদ্রভ্রমণে আমরা তাদেরকে সাহায়তা করতে পারবো। শেষে তাঁদের সঙ্গেই মিলিত হতে পারবো আখেরী জামানার পয়গম্বরের সঙ্গে। তাঁর ও আমাদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির নবায়নও নিশ্চিত করতে পারবো সে সময়। মহামান্য সম্রাট তাঁদের আবেদন মঞ্জুর করলেন। তাঁরা যথাসময়ে যাত্রা শুরু করলেন সকলে মিলে। রসুল স. তখন হিজরত করে চলে এসেছেন মদীনায়। সেখানেই সকলে মিলিত হলেন রসুল স. এর সঙ্গে। মুসলমানেরা তখন উপর্যুপরি যুদ্ধ করতে করতে পর্যুদস্ত প্রায়। বিশেষ করে তাঁদের আর্থিক অবস্থা হয়ে পড়েছিলো শোচনীয়। এমতো অবস্থা দেখে আবিসিনিয়ার প্রতিনিধিদল মর্মাহত হলেন। নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র বচনবাহক! মুসলিম জনগোষ্ঠী বিত্তবিপর্যয়গ্রস্ত। আর দেশে রয়েছে আমাদের অনেক অর্থ-বিত্ত। সদয় অনুমতি প্রদান করলে আমরা দেশে গিয়ে সে সম্পদগুলো এনে আমাদের ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে বণ্টন করে দিতাম। তাঁদের এমতো শুভনিবেদনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

সাঈদ ইবনে যোবায়ের প্রমুখের উদ্ধৃতি দিয়ে বাগবী লিখেছেন, ওই আবিসিনীয় প্রতিনিধিবৃন্দের বদান্যতার স্বীকৃতিরূপে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। তিনি আরো লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইসলাম গ্রহণকারী আশিজন গ্রন্থধারীদেরকে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি, তন্মধ্যে চল্লিশজন ছিলেন নাজরানবাসী। বত্রিশজন ছিলেন আবিসিনিয়ার এবং বাকি আটজন সিরিয়ার।

এর পরের আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— 'যখন তাদের নিকট এটা আবৃত্তি করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা এতে বিশ্বাস করি, এটা আমাদের প্রতিপালক থেকে আগত সত্য। আমরা তো পূর্বেও আত্মসমর্পণকারী ছিলাম'। একথার অর্থ— ইহুদী ও নাসারা সম্প্রদায়ভূত ওই সকল সত্যপ্রেমিকগণের সম্মুখে যখন সদ্য অবতীর্ণ কোরআনের বাণী আবৃত্তি করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা এই কোরআনকে এবং যাঁর প্রতি কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে সেই মহান রসুলকে বিশ্বাস করি। সর্বান্তঃকরণে একথা মানি যে, এই নভজ বাণীবৈভব আমাদের পরম প্রভুপালকের পক্ষ থেকে সমাগত মহাসত্য। আমাদের হৃদয়ে সতত লালিত এই বিশ্বাস নতুন নয়, চিরন্তন। পূর্বেও আমরা ছিলাম আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলগণের প্রতি আত্মসমর্পিত।

এখানে 'মুসলিমীন' অর্থ আত্মসমর্পিত, রসুল স. এর রেসালতের সত্যসাক্ষ্যদাতা। উল্লেখ্য, হজরত মুসা এবং হজরত ঈসার প্রতি যাঁরা আত্মসমর্পিত, রসুল স. এর প্রতি তাঁদের আত্মসমর্পিত না হওয়া অসম্ভব। কারণ, তাঁদের উপরে অবতীর্ণ তওরাত ও ইঞ্জিলে রসুল স. এর পরিচিতি সমুদ্ভাসিত। যেমন হজরত ঈসা বলেছেন— সুসমাচার শ্রবণ করো। নিশ্চয় আমার পর আসবেন একজন মহান রসুল, যাঁর নাম আহমদ। তওরাত শরীফেও বিধৃত হয়েছে রসুল স. এর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যাবলীর মনোমুগ্ধকর বিবরণ। সেকারণেই ওই সকল সৌভাগ্যবান গ্রন্থধারী বলতে পেরেছিলেন 'আমরা তো পূর্বেও আত্মসর্ম্পণকারী ছিলাম'। অর্থাৎ ইতোপূর্বে আমরা তাঁর পরিচয় জেনেছি এবং তাঁকে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেছি। এই উক্তিটি নতুন কোনো বাক্যের সূচনা নয়। বরং বলা যেতে পারে কথাটি পূর্ববর্তী বক্তব্যের প্রলম্বায়ন। আর এখানকার 'আমরা এতে বিশ্বাস করি' কথাটিতে রয়েছে পূর্বাপর দু'টি বিশ্বাসেরই সম্মিলিত প্রকাশ। বরং বুঝতে হবে, বিশ্বাস এখানে দু'টি নয়— একটি। 'আমরা তো পূর্বেও আত্মসর্ম্পণকারী ছিলাম' কথাটি এখানে নতুনতর বিশ্বাসের সম্ভাবনাকে তিরোহিত করেছে।

এরপরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে— 'তাদেরকে দু'বার পুরস্কৃত করা হবে'। একথার অর্থ— যেহেতু তারা ইতোপূর্বে বিশ্বাস করেছিলো তওরাত ও ইঞ্জিলে এবং এখন কোরআনে, তাই তাদের দুই দফা বিশ্বাসের জন্য তাদেরকে পুরস্কারও দেয়া হবে দুই বার।

এরপর বলা হয়েছে— 'কারণ তারা ধৈর্যশীল'। একথার অর্থ— কারণ তারা যেমন কোরআন বিশ্বাস করার সাথে সাথে ছিলো তাদের পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থের প্রতি একনিষ্ঠ, তেমনি আত্মসমর্পিত ছিলো পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে কোরআনের প্রতিও। এ হচ্ছে তাদের সত্যের প্রতি অবিচল ধৈর্যের অনন্য প্রকাশ। কিন্তু সকল ইহুদীরা

এরকম ছিলো না। তারা রসুল স.কে বিশ্বাস করতো বটে, কিন্তু তাঁকে চাক্ষুষ করবার পর হয়ে গেলো বিশ্বাসবিচ্যুত, বিদ্বেষায়িত। তাঁর মহাআবির্ভাবের আগে তারা বিধর্মীদের সঙ্গে যুদ্ধকালে তাঁকে ওসিলা করেই আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করতো। কিন্তু তাঁর মহান সাহচর্য পেয়ে হলো অবিশ্বাসী। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। এর মূলে ছিলো হিংসা। কেবলই হিংসা।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জ্ঞাপন করেছেন, তিন ধরনের লোক পাবে দ্বিগুণ প্রতিদান। ১. ওই গ্রন্থধারী, যে তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত নবীর উপরে ইমান এনেছে, তারপর ইমান এনেছে আমার উপর। ২. ওই ক্রীতদাস যে আল্লাহ্‌র অধিকার পরিপূরণের সাথে সাথে পরিপূরণ করেছে তার মালিকের অধিকার এবং ৩. ওই ব্যক্তি যে তার ক্রীতদাসীকে ধর্মজ্ঞান দানের পর করে দিয়েছে মুক্ত, তারপর তার সাথে আবদ্ধ হয়েছে পরিণয়সূত্রে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তারা ভালোর দ্বারা মন্দের মোকাবিলা করে'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের অর্থ— সকল মন্দের বিরুদ্ধে তওহীদের বাণীই তাদের শাণিত সঙ্গীন। মুকাতিল বলেছেন, কথাটির অর্থ— তারা অংশীবাদীদের ব্যঙ্গোক্তি শ্রবণের পরও তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়।

আমি বলি, আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ এরকমও হতে পারে যে— তারা শত্রুতার প্রতিকার করে শিষ্টাচারের মাধ্যমে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন— আপনার যারা শত্রু শিষ্টাচারের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে স্থাপিত হতে পারে অন্তরঙ্গতা। কথাটির অর্থ এরকম হওয়াও সম্ভব যে— তারা আনুগত্য দ্বারা প্রতিরোধ করে অনানুগত্যের। যেমন আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন— 'নিশ্চয় কল্যাণকর বিষয়ের মাধ্যমে বিলোপিত হয় অকল্যাণকর বিষয়'। রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, পাপ হয়ে গেলে ধাবিত হয়ো পুণ্যের দিকে। পুণ্য পাপকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে'। একথার অর্থ— তারা আমা কর্তৃক প্রদত্ত সম্পদ থেকে ব্যয় করে পুণ্য পথে।

এরপরের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— তারা যখন আমার বাক্য শ্রবণ করে, তখন তারা তা পরিহার করে চলে এবং বলে, আমাদের কাজের জন্য আমরা দায়ী এবং তোমাদের কাজের জন্য দায়ী তোমরা; তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ চাই না'। একথার অর্থ— বিশ্বাসবানেরা যখন অবিশ্বাসীদেরকে

কটুক্তি করতে শোনে, তখন তা উপেক্ষা করে এবং বলে, দ্যাখো, তোমাদের ও আমাদের ধর্মবিধান তো এক নয়, তোমাদের কাজের জন্য যেমন আমরা অভিযুক্ত হবো না, তেমনি আমাদের কর্মকাণ্ডের জন্যও দায়ী করা হবে না তোমাদেরকে। সুতরাং শান্তি,শান্তি। তোমাদের মতো অজ্ঞদের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িত হওয়ার প্রবৃত্তি আমাদের নেই।

এখানে 'লাগবু' অর্থ কটুক্তি, অসারবচন। বাগবী লিখেছেন, অংশীবাদীরা ইসলাম গ্রহণকারী ইহুদীগণকে গাল-মন্দ করতো। বলতো, তোমাদের মরণ হোক। তোমরা তোমাদের পিতৃধর্ম পরিত্যাগকারী। কিন্তু তাঁরা এ সকল গালি গায়ে মাখতেন না। বলতেন, তোমাদের প্রতি শান্তিসম্ভাষণ। উল্লেখ্য, তাঁদের এমতো শান্তি সম্ভাষণ ছিলো শুভাশিসবিবর্জিত। বরং এমতো সম্ভাষণকে বলা যেতে পারে বিদায়ী সালাম বা সম্পর্কচ্ছিন্নতার সম্ভাষণ। এমতাবস্থায় 'তোমাদের প্রতি সালাম, কথাটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কটুবচন ব্যবহার করলেও আমরা সেরকম করবো না। বরং আমরা কোনো প্রত্যুত্তরই করবো না।

'লা নাবতাগীল জাহিলীন' (আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ চাই না) কথাটির অর্থ এখানে— তোমাদের ধর্মমতের প্রতি আমরা আগ্রহান্বিত নই। কেউ কেউ কথাটির অর্থ করেছেন— তোমাদের মতো অর্বাচীনদের সতীর্থ হবার অভিলাষ আমাদের নেই। আবার কেউ কেউ অর্থ করেছেন— তোমাদের মতো অকাট্য মূর্খ আমরা হতে চাই না। অর্থাৎ তোমরা আমাদের গালি দাও আর যা-ই বলো, আমরা কিন্তু সেরকম কিছু করবো না। রয়ে যাবো প্রত্যুত্তরহীন। নতুবা আমরাও হয়ে যাবো তোমাদের মতো মূর্খ। আর মূর্খ সাজবার আকাংখা আমাদের আদৌ নেই। আমরা আল্লাহ্‌র আশ্রয়াকাংখী। তিনি যেনো আমাদেরকে এরকম মূর্খজনোচিত বচন থেকে রক্ষা করেন।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের বিধান কার্যকর ছিলো জেহাদ অপরিহার্য হওয়ার পূর্বে। কিন্তু আমার মতে বাগবীর এই মন্তব্যটি যথার্থ নয়। কারণ এর সঙ্গে জড়িত রয়েছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম প্রমুখ। তিনি ও তাঁর সাথীরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন জেহাদ ফরজ হওয়ার পর। অথবা বলা যেতে পারে, আলোচ্য আয়াতের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে আবিসিনীয় প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে। তাঁরাও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন খায়বর যুদ্ধের পর ষষ্ঠ হিজরীতে। কিংবা বলা যায়, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো চল্লিশজন নাজরানবাসী এবং আটজন সিরিয়াবাসী খৃষ্টানের ইসলাম গ্রহণের প্রাক্কালে। কিন্তু তাঁরাও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন রসুল স. এর হিজরতের পরে মদীনায়। আর তখন কার্যকর হয়েছিলো জেহাদের বিধান। সুতরাং বুঝতে হবে আলোচ্য আয়াতের বিধান রহিত নয়। বরং তা সাধারণভাবে এখনো পালনীয়।

اِنَّكَ لَا تَهۡدِیۡ مَنۡ اَحۡبَبۡتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ یَهۡدِیۡ مَنۡ یَّشَآءُ ۚ وَهُوَ اَعۡلَمُ بِالۡمُهۡتَدِیۡنَ ﴿۵۶﴾ وَقَالُوۡۤا اِنۡ نَّتَّبِعِ الۡهُدٰی مَعَكَ نُتَخَطَّفۡ مِنۡ اَرۡضِنَا ؕ اَوَلَمۡ نُمَكِّنۡ لَّهُمۡ حَرَمًا اٰمِنًا یُّجۡبٰۤی اِلَیۡهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَیۡءٍ رِّزۡقًا مِّنۡ لَّدُنَّا وَلٰكِنَّ اَكۡثَرَهُمۡ لَا یَعۡلَمُوۡنَ ﴿۵۷﴾ وَكَمۡ اَهۡلَكۡنَا مِنۡ قَرۡیَۃٍۭ بَطِرَتۡ مَعِیۡشَتَهَا ۚ فَتِلۡكَ مَسٰكِنُهُمۡ لَمۡ تُسۡكَنۡ مِّنۡۢ بَعۡدِهِمۡ اِلَّا قَلِیۡلًا ؕ وَكُنَّا نَحۡنُ الۡوٰرِثِیۡنَ ﴿۵۸﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهۡلِكَ الۡقُرٰی حَتّٰی یَبۡعَثَ فِیۡۤ اُمِّهَا رَسُوۡلًا یَّتۡلُوۡا عَلَیۡهِمۡ اٰیٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهۡلِكِی الۡقُرٰۤی اِلَّا وَاَهۡلُهَا ظٰلِمُوۡنَ ﴿۵۹﴾ وَمَاۤ اُوۡتِیۡتُمۡ مِّنۡ شَیۡءٍ فَمَتَاعُ الۡحَیٰوۃِ الدُّنۡیَا وَزِیۡنَتُهَا ۚ وَمَا عِنۡدَ اللّٰهِ خَیۡرٌ وَّاَبۡقٰی ؕ اَفَلَا تَعۡقِلُوۡنَ ﴿۶۰﴾

r কাহাকেও প্রিয় মনে করিলে তুমি তাহাকে সৎপথে আনিতে পারিবে না, তবে আল্লাহ্ই যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন এবং তিনিই ভাল জানেন কাহারা সৎপথ অনুসারী।

r উহারা বলে, 'আমরা যদি তোমার পথ ধরি তবে আমাদিগের দেশ হইতে আমরা উৎখাত হইব।' আমি কি উহাদিগের জন্য এক নিরাপদ 'হার্ম' প্রতিষ্ঠিত করি নাই যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয় আমার দেওয়া জীবনোপকরণ স্বরূপ? কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই ইহা জানে না।

r কত জনপদকে আমি ধ্বংস করিয়াছি যাহার বাসিন্দারা নিজদিগের ভোগসম্পদের জন্য মদমত্ত ছিল! এইগুলিই তো উহাদিগের ঘরবাড়ী; উহাদিগের পর এইগুলিতে লোকজন সামান্যই বসবাস করিয়াছে। আমি চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী!

r তোমার প্রতিপালক, জনপদ সমূহকে ধ্বংস করেন না উহার কেন্দ্রে তাঁহার আয়াত আবৃত্তি করিবার জন্য রসূল প্রেরণ না করিয়া এবং তিনি জনপদ সমূহকে তখনই ধ্বংস করেন যখন ইহার বাসিন্দারা সীমালংঘন করে।

r তোমাদিগকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা তো পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা এবং যাহা আল্লাহের নিকট আছে তাহা উত্তম এবং স্থায়ী। তোমরা কি অনুধাবন করিবে না?

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. তাঁর প্রিয় পিতৃব্য আবু তালেবকে বললেন, হে খুল্লতাত! আপনি অন্ততপক্ষে একবার উচ্চারণ করুন লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্। তাহলে আমি মহাবিচারের দিবসে আপনার পক্ষে সুপারিশ করতে পারবো। আবু তালেব বললেন, না, তা হয় না। কুরায়েশ রমণীকুল তাহলে আমাকে লজ্জিত করবে। বলবে, গোত্রপতি আবু তালেব মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে পিতৃধর্ম পরিত্যাগ করেছে। প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র আমার! এমতো অপযশের আশংকা যদি না থাকতো, তবে অবশ্যই আমি তোমার নয়নযুগলকে প্রশান্ত করতাম। তার এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে প্রথমোক্ত আয়াতখানি। বলা হয়েছে— 'কাউকে প্রিয় মনে করলে তুমি তাকে সৎপথে আনতে পারবে না, তবে আল্লাহ্ই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন এবং তিনিই ভালো জানেন কারা সৎপথ অনুসারী'।

এখানে 'মান আহ্বাবতা' অর্থ— যার সৎপথপ্রাপ্তি আপনার কাম্য। অথবা আত্মীয়তার বন্ধনে যে আপনার প্রিয়ভাজন।

'ওয়া হুয়া আ'লামু বিল মুহতাদীন' অর্থ এবং তিনিই ভালো জানেন কারা সৎপথ অনুসারী। মুজাহিদ ও মুকাতিল কথাটির অর্থ করেছেন— যাদের জন্য সুপথ লাভ নির্ধারিত, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। ইবনে আসাকের তাঁর 'দামেশকের ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আবু সাঈদ একবার হজরত ইবনে ওমরকে জিজ্ঞেস করলেন 'কাউকে প্রিয় মনে করলে তুমি তাকে সৎপথে আনতে পারবে না' এই আয়াত কি আবু জেহেল ও আবু তালেব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

বোখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম, আবু শায়েখ, ইবনে মারদুবিয়া এবং বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব উল্লেখ করেছেন, আমার পিতা বলেছেন, আবু তালেবের অন্তিমযাত্রার প্রাক্কালে তার শয্যাপাশে উপস্থিত হলেন রসুল স.। বললেন, চাচাজান! একবার অন্তত বলুন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্'। তাহলে আমি আল্লাহ্ সকাশে এই সত্যোচ্চারণের সাক্ষ্যদাতা হতে পারবো। আবু জেহেলও উপস্থিত ছিলো সেখানে। সে তৎক্ষণাৎ বলে বসলো, হে গোত্রাধিনায়ক! আপনি কি শেষকালে

পিতৃধর্ম পরিত্যাগ করবেন? ক্রমশঃ সংকীর্ণ হচ্ছিলো সময়। রসুল স. বার বার উচ্চারণ করে যাচ্ছিলেন পবিত্র কলেমা। কিন্তু আবু তালেবের কণ্ঠে শেষ বাক্য উচ্চারিত হলো, আবদুল মুত্তালিবের ধর্মাদর্শই আমার ধর্মাদর্শ। রসুল স. বললেন, আমাকে নিষেধ না করা পর্যন্ত আমি আমার প্রিয় পিতৃব্যের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতেই থাকবো। তখন অবতীর্ণ হলো 'কোনো নবী অথবা বিশ্বাসীদের জন্য এটা সমীচীন নয় যে, তারা অংশীবাদীদের পক্ষে ক্ষমাপ্রার্থনা করে'। তারপর অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত, যার মর্মার্থ— হে আমার রসুল! আপনি কাউকে ভালোবাসলেও তাকে সৎপথানুসারী করতে সক্ষম নন। বরং আমি যাকে ইচ্ছা তাকে সৎপথ প্রদান করি। আর আমি একথাও ভালোভাবে জানি যে, কারা সৎপথপ্রাপ্তির যোগ্য।

পরের আয়াতে (৫৭) বলা হয়েছে— 'তারা বলে, আমরা যদি তোমার পথ ধরি তবে আমাদের দেশ থেকে আমরা উৎখাত হবো'। বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হারেছ ইবনে ওসমান ইবনে নওফেল ইবনে আবদে মানাফের উদ্দেশ্যে। সে বলেছিলো, মোহাম্মদ! তোমার আহ্বান যথার্থ। কিন্তু তোমার কথামতো চললে যে মক্কাবাসীরা আমাদেরকে দেশান্তর করবে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে নাসাঈ এবং ইবনে মুনজিরও এরকম বর্ণনা করেছেন। তাঁর উদ্ধৃতি দিয়ে নাসাঈ বলেছেন, এরকম অপবচন উচ্চারিত হয়েছিলো হারেছ ইবনে ওসমানের কণ্ঠে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি কি তাদের জন্য এক নিরাপদ হারম প্রতিষ্ঠিত করিনি, যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয় আমার দেওয়া জীবনোপকরণ স্বরূপ? একথার অর্থ— হারেছের অপবচনের প্রতিবাদে আল্লাহ্ বলেন, আমি তো তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করেছি চিরশান্তির আবাস মক্কাধামে। এখানেই তো জীবনোপকরণস্বরূপ তোমাদের জন্য সরবরাহ করা হয় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত ফলমূলের।

আলোচ্য প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন। এর সঙ্গে প্রচ্ছন্নরূপে সংযুক্ত রয়েছে আরো কিছু কথা। ওই প্রচ্ছন্ন কথা সহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমি কি তাদেরকে মক্কা নগরীতে মহাসম্মানিত হেরেমের অভ্যন্তরে তাদেরকে নিরাপদে বসবাস করবার সুযোগ প্রদান করিনি? অথচ সমগ্র আরব কতো অশান্ত। চতুর্দিকে প্রতিনিয়ত সংঘটিত হয় হত্যা, লুণ্ঠন ও হানাহানি। সেকারণেই তো শান্তিভূমি মক্কার প্রতি রয়েছে সকলের সমীহবোধ। অর্থাৎ কেবল হেরেমের সম্মানের দিকে লক্ষ্য রেখে পৌত্তলিকেরাও যেহেতু এ ভূমিতে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, সেহেতু আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীরা এখানে নিরাপত্তাহীনতার আশংকা করবে কেনো? কেনো উত্থাপন করবে উৎখাত হয়ে যাওয়ার অনুযোগ?

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানে না'। একথার অর্থ এ পবিত্র শহর যে জীব-সম্পদ জীবনোপরকণ সকল দিক থেকেই নির্বিঘ্ন সেকথা এদের অধিকাংশই বুঝতে পারে না। একথাও হৃদয়ঙ্গম করতে চায় না যে, ভয় করা উচিত তো আল্লাহ্র অবাধ্যতাজনিত শাস্তির, যে শাস্তি অপ্রতিরোধ্য।

এরপরের আয়াতে (৫৮) বলা হয়েছে— 'কতো জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি যার বাসিন্দারা নিজেদের সম্পদের জন্য মদমত্ত ছিলো; এগুলোই তো তাদের ঘরবাড়ী; তাদের পর এগুলোতে লোকজন সামান্যই বসবাস করেছে। আমি চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী'। একথার অর্থ— হে মক্কাবাসী! ইতোপূর্বে আমি তোমাদের বর্তমান জনপদের মতো অনেক কোলাহলমুখর জনপদ ধ্বংস করে দিয়েছি। কারণ, তারা আমা কর্তৃক প্রদত্ত বিত্তবৈভব পেয়েও আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতো না। বরং জনবল ও ধনবলের জন্য অহংকার করতো। সময় কাটাতে আমোদ-প্রমোদে ও প্রতিমাপূজায়। এখনো তো রয়েছে তাদের বিরাণ ঘরবাড়ীগুলোর চিহ্ন। সেগুলোতে হয়তো থাকে কোনো নিরাশ্রয় নিরুপায় কিছু মানুষ, অথবা ক্ষণকালের জন্য ঠাঁই নেয় পরিশ্রান্ত পথিক। তোমরাও তো তাদেরই মতো অপরিণামদর্শী। তোমরা কি জানো না, যে কোনো মুহূর্তে তোমাদের উপরেও নেমে আসতে পারে আযাব। তোমরা কি এখনো বিশ্বাস করো না যে, সকল কিছুর চূড়ান্ত মালিকানা আমার?

এখানে 'বাত্বিরত' অর্থ যারা ছিলো অহংকারী, ছিলো ধনসম্পদের জন্য মদমত্ত, গর্বিত, ছিলো কৃতঘ্ন। আতা বলেছেন, তারা জীবনযাপন করতো আমোদ-প্রমোদ ও পূজা-অর্চনা নিয়ে। 'মায়ীশাতাহা' কথাটি এখানে কালাধিকরণ কারক। এর অর্থ বিনোদনকালে তারা থাকতো মদমত্ত। সেকারণেই আল্লাহ্ তাদেরকে বিনাশ করেছেন।

'ফা তিলকা মাসাকিনুহুম' অর্থ এগুলোই তো তাদের ঘরবাড়ি। অর্থাৎ এগুলোই তো তাদের বিরাণ বসতবাটি, যা এক সময় ছিলো তাদের কোলাহলমুখর প্রমোদভবন। 'মিম বা'দিহিম' অর্থ তাদের পর। অর্থাৎ তাদের বিনাশপ্রাপ্তির পর। 'ইল্লা ক্বলীলা' অর্থ সামান্যই । অর্থাৎ এই বিরাণ গৃহগুলোতে গৃহবাসীরা বসবাস করেছে সামান্য সময়ের জন্য। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বিরাণ বসতবাটিতে ক্ষণকালের জন্য আশ্রয় নেয় কেবল পথশ্রান্ত পথিক। চিরকাল তারা সেখানে থাকে না। কেউ কেউ কথাটির অর্থ করেছেন, অল্পসংখ্যক লোক ছাড়া অন্য কেউ সেখানে বসবাস করে না। এটা তাদেরই পাপের ফল।

'আমি চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী' অর্থ— মানুষ পৃথিবীতে আসে কিছুকালের জন্য। মালিক সাজে ধনসম্পদের ও বসতবাটির। তারপর চিরতরে মালিকানা হারিয়ে চলে যায় পরপারে। কিন্তু আমি দ্যাখো, সকল কিছুর চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।

এরপরের আয়াতে (৫৯) বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না, তার কেন্দ্রে তাঁর আয়াত আবৃত্তি করবার জন্য রসুল প্রেরণ না করে এবং তিনি জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করেন যখন তার বাসিন্দারা সীমালংঘন করে'।

এখানে 'মা কানা রব্বুকা' অর্থ প্রভুপালকের রীতি। 'আলক্বুরা' অর্থ অবাধ্যদের জনপদসমূহ। 'রসূলান' অর্থ আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক, যিনি পালন করেন সতর্ককারী ভূমিকা। অর্থাৎ যিনি মানুষকে এই মর্মে সতর্ক করে দেন যে, আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো, নতুবা অশুভ পরিণাম অনিবার্য। আর কেন্দ্রে আয়াত আবৃত্তি করার অর্থ হচ্ছে— সমাজ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থানরত শাসকবর্গ ও জননেতাদের সামনে আল্লাহ্‌র বার্তা পৌঁছিয়ে দেয়া। কেননা সাধারণ জনতা সাধারণতঃ শাসক নেতাদের অনুগামী। শেষ রসুলও তাই প্রেরিত হয়েছিলেন পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে মহাতীর্থ মক্কায়। আবার তিনি বার্তা প্রেরণ করেছিলেন রোমীয়দের দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী নৃপতি, পারস্যরাজ ও আবিসিনিয়ার সম্রাটের প্রতিও। রোম নরপতির নিকট লিখিত পত্রে তিনি স. জানিয়েছিলেন— ইসলাম গ্রহণ করো, লাভ করবে চিরন্তন শান্তি। অন্যথায় তোমাকেই বহন করতে হবে প্রজাসাধারণের পাপের বোঝা। মুকাতিল বলেছেন, এখানে আয়াত আবৃত্তি করার অর্থ একথা জানিয়ে দেয়া যে, ইমান আনো, অন্যথায় তোমাদের উপরে আপতিত হবে আল্লাহ্‌র শাস্তি। 'আহলুহা জলিমূন' অর্থ সীমালংঘনকারী, রসুলের বার্তা অগ্রাহ্যকারী।

এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! আপনি মানুষকে জানিয়ে দিন, আল্লাহ্‌র চিরাচরিত রীতি এরকম নির্মম নয় যে, তিনি কোনো জনপদের প্রধান নেতাদের নিকট রসুল প্রেরণের মাধ্যমে তাদের পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যতিরেকেই তাদের জনপদসমূহকে ধ্বংস করে দিবেন। বরং তিনি ধ্বংসের নির্দেশ দেন তখন, যখন সংশোধনের দীর্ঘ অবকাশ প্রদানের পরেও নেতা ও জনতার চৈতন্যোদয় না হয়, যখন লংঘিত হয় সহনীয়তার সর্বশেষ সীমা।

এরপরের আয়াতে (৬০) বলা হয়েছে— 'তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা তো পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা এবং যা আল্লাহ্‌র নিকট আছে তা উত্তম ও স্থায়ী। তোমরা কি অনুধাবন করবে না'?

এখানে 'মাতাউল হায়াতিদ্ দুনইয়া ওয়া যীনাতুহা ' অর্থ পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা। 'খইর' অর্থ উত্তম, উৎকৃষ্ট। 'আবক্ব' অর্থ স্থায়ী। আর 'আফালা তা'ক্বিলূন' অর্থ তোমরা কি অনুধাবন করবে না? এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে মানুষ! পৃথিবীতে যা কিছু তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, সে সকল

কিছু তো পার্থিব জীবনের সম্ভোগোকরণ ও সৌন্দর্য। আর আখেরাতের যে সকল কল্যাণসম্ভার আল্লাহ্ জমা রেখে দিয়েছেন তা সর্বোৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী। একথা বলার পরেও কি তোমরা জাগতিক ও পারত্রিক প্রাপ্তির তুলনামূলক মূল্যায়নকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারছো না?

সূরা ক্বসাস ঃ আয়াত ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭,

اَفَمَنْ وَّ عَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٦١﴾ وَ يَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٦٢﴾ قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰۤؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا ۚ اَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۚ تَبَرَّاْنَآ اِلَيْكَ ۫ مَا كَانُوْۤا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ ﴿٦٣﴾ وَ قِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ﴿٦٤﴾ وَ يَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَاذَاۤ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٦٥﴾ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْۢبَآءُ يَوْمَىِٕذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿٦٦﴾ فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ﴿٦٧﴾

r যাহাকে আমি উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়াছি, যাহা সে পাইবে সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যাহাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্ভার দিয়াছি, যাহাকে পরে কিয়ামতের দিন উপস্থিত করা হইবে অপরাধীরূপে?

r এবং সেই দিন উহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলা হইবে, 'তোমরা যাহাদিগকে আমার শরীক গণ্য করিতে, তাহারা কোথায়?'

r যাহাদিগের জন্য শাস্তি অবারিত হইয়াছে তাহারা বলিবে, 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! ইহাদিগকেই আমরা বিভ্রান্ত করিয়াছিলাম; ইহাদিগকে বিভ্রান্ত

করিয়াছিলাম যেমন আমরা বিভ্রান্ত হইয়াছিলাম; আপনার নিকট আমাদিগের নিবেদন এই যে, ইহাদিগের জন্য আমরা দায়ী নহি। ইহারা কেবল আমাদিগেরই ইবাদত করিত না।'

r উহাদিগকে বলা হইবে, 'তোমাদিগের দেবতাগুলিকে আহ্বান কর।' তখন ইহারা উহাদিগকে ডাকিবে। কিন্তু উহারা ইহাদিগের ডাকে সাড়া দিবে না। ইহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে। হায়, ইহারা যদি সৎপথ অনুসরণ করিত।

r এবং সেই দিন আল্লাহ্ ইহাদিগকে ডাকিয়া বলিবেন, 'তোমরা রসুলগণকে কী জবাব দিয়াছিলে?'

r সেদিন তাহাদিগের আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলিবার থাকিবে না। এবং ইহারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদও করিতে পারিবে না।

r তবে যে ব্যক্তি তওবা করে এবং বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, সে তো সফলকাম হইবে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যাকে আমি উত্তম পুরস্কার প্রদানের অঙ্গীকার করেছি, সে তো কখনো ওই ব্যক্তির সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে না, যাকে আমি পার্থিব ভোগসম্ভার প্রদানের পর মহাবিচারের দিবসে উপস্থিত করবো অপরাধীরূপে। 'আফামান' সম্বোধনসংযুক্ত আলোচ্য প্রশ্নটি সরাসরি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। অর্থাৎ অঙ্গীকৃত পুরস্কারের অধিকারীর সঙ্গে পার্থিব ভোগবিলাসে মত্ত অবিশ্বাসীর তুলনা হওয়া অসম্ভব। আর এখানে উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি অর্থ— জান্নাত প্রদানের অঙ্গীকার। কারণ পুরস্কার হিসেবে জান্নাত অত্যুত্তম। সুতরাং তার প্রতিশ্রুতিও অত্যুত্তম।

'ফাহুয়া লাক্বীহী' অর্থ যা সে পাবে। অর্থাৎ প্রতিশ্রুত পুরস্কার সে পাবেই। কারণ আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি পূরণ না হওয়া অসম্ভব। 'মাতাআ'ল হায়াতিদ্ দুনইয়া' অর্থ পার্থিব জীবনের ভোগসম্ভার। অর্থাৎ যে ভোগোপকরণ অবক্ষয় প্রবণ, নশ্বর এবং যা অর্জন করতে প্রয়োজন হয় অনেক কৌশল, পরিকল্পনা ও শ্রমের।

'আল মুহ্দ্বারীন' অর্থ ওইসব লোক যারা নীত হবে হিসাব অথবা শাস্তির জন্য। মুকাতিল বলেছেন, পার্থিব জীবনে বিশ্বাসী ও পুণ্যবানেরাও সম্পদাধিকারী হন। কিন্তু এর জন্য তাঁরা আখেরাতে অভিযুক্ত হবেন না। কেননা তাঁদের উপার্জন ও ব্যয় সিদ্ধসূত্রগত। সুতরাং তাঁদের পার্থিব সম্পদ উৎকৃষ্ট। আর অবিশ্বাসীদের পার্থিব সম্পদ তাদের অনন্ত দুঃখভোগের উপকরণ।

মুজহিদ সূত্রে বাগবী ও ইবনে জারীর বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে রসুল স. ও আবু জেহেলকে উপলক্ষ করে। অপর এক সূত্রে বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্য ছিলেন হজরত হামযা এবং আবু জেহেল।

মুকাতিল এবং মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজী সূত্রে বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো হজরত হামযা-আবু জেহেল অথবা হজরত আলী ও আবু জেহেলকে কেন্দ্র করে। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত আম্মার এবং ওলীদ ইবনে মুগীরা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

পরের আয়াতে (৬২) বলা হয়েছে— 'এবং সেই দিন তাদেরকে আহবান করে বলা হবে, তোমরা যাদেরকে শরীক গণ্য করতে, তারা আজ কোথায়'? আমি বলি, এখানে 'তোমরা যাদেরকে আমার শরীক গণ্য করতে বলে বুঝানো হয়েছে অংশীবাদীদের নেতৃবর্গকে। কারণ তাদের প্রভাবেই সাধারণ জনতা গ্রহণ করে অংশীবাদিতাকে। তাই এখানে বিদ্রূপার্থে তাদের সম্পর্কেই তখন বলা হবে 'তারা কোথায়'?

এরপরের আয়াতে (৬৩) বলা হয়েছে— 'যাদের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েছে তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এদেরকে আমরাই বিভ্রান্ত করেছিলাম। এদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম যেমন আমরা বিভ্রান্ত হয়েছিলাম, আপনার নিকট আমাদের নিবেদন এই যে, এদের জন্য আমরা দায়ী নই। এরা কেবল আমাদেরই ইবাদত করতো না'। একথার অর্থ— যাদের জন্য শাস্তি অনিবার্য, অবিশ্বাসীদের সেই সকল পথিকৃতেরা তখন বলবে, হে আমাদের প্রভুপালক! এরাই ওই সকল লোক যাদেরকে আমরা পথভ্রষ্ট করেছিলাম, যেমন আমরাও হয়েছিলাম বিপথগামী। আমাদের বিপথগামিতার পক্ষে অন্য কারো অভিপ্রায় কার্যকর ছিলো না। বরং আমাদের বিপথগমন ছিলো সম্পূর্ণতই আমাদের স্বেচ্ছাচরণের ফল। আর এদের অবস্থাও ছিলো সেরকমই। আমরা এদেরকে পথভ্রষ্ট হতে বাধ্যতো করিনি। করেছিলাম কেবল প্রলোভিত ও প্ররোচিত। কিন্তু আমাদের ও এদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলো তোমার বার্তাবাহকেরা। তাঁরা উপস্থিত করেছিলেন মহাসত্যের নানাবিধ প্রমাণ। শুনিয়েছিলেন তোমার প্রত্যাদেশিত বাণী। তবে তারা আমাদের প্রতারণাকে তখন পরিত্যাগ করেনি কেনো? সুতরাং আজ তোমা সকাশে আমাদের নিবেদন এই যে, এদের বিভ্রান্তির প্রকৃত কারণ আমরা নই। বরং আমরা আজ তাদের প্রতি বীতস্পৃহ, বিতৃষ্ণ। আর তারা বাহ্যত আমাদের অনুকারক হলেও প্রকৃত অর্থে তারা ছিলো তাদের নিজেদের আকাংখার উপাসক। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তুগত সাযুজ্য রয়েছে অপর একটি আয়াতের সঙ্গে। যেমন, 'আর শয়তান বললো, সমাধান.........'শেষ পর্যন্ত।

এখানে 'যাদের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েছে' একথা বলা হয়েছে অন্য এক আয়াতে এভাবে— 'আমি জ্বিন ও মানুষ দ্বারা নরক পরিপূর্ণ করবো'। এরকম শাস্তি অবধারিত হওয়ার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে আরো অনেক আয়াতেও। আর এখানে 'আগওয়াইনা' কথাটির কর্মপদের সর্বনাম রয়েছে উহ্য। এভাবে এর অর্থ দাঁড়িয়েছে— এরাই তারা যাদেরকে আমরা বিপথগামী করেছিলাম।

এরপরের আয়াতে (৬৪) বলা হয়েছে— 'তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের দেবতাগুলোকে আহ্বান করো। তখন তারা তাদেরকে ডাকবে। কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে না। এরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। হায়, এরা যদি সৎপথ অনুসরণ করতো'।

এখানে 'শুরাকাআকুম' অর্থ তাদের পূজিত দেবমূর্তিসমূহ, অযথার্থ উপাস্যকুল। 'ফাদাআ'ওহুম' অর্থ এরা ওইসকল উপাস্যদেরকে ডাকবে। অথবা অর্থ হবে— ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উম্মাদের মতো তারা তখন পরিত্রাণের আশায় ডাকাডাকি করতে থাকবে তাদের পূজিত দেবতাদেরকে। 'ফালাম ইয়াসতাজীবু' অর্থ তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে না। উপাসককুলের পরিত্রাণার্থে এক পা-ও অগ্রসর হবে না।

'ওয়ারাআউল আ'জাবা' অর্থ তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, যে শাস্তি থেকে তারা অবশ্যই অব্যাহতি লাভ করতো যদি পৃথিবীতে আনতো ইমান। আর 'লাও আন্নাহুম কানু ইয়াহ্তাদূন' অর্থ হায়, এরা যদি সৎপথ অনুসরণ করতো। এখানে 'লাও' অর্থ যদি। কথাটি বিফল আশামিশ্রিত আক্ষেপ প্রকাশক। অর্থাৎ তারা তখন আক্ষেপের সুরে বলবে, হায়, কতোই না ভালো হতো, যদি আমরা পৃথিবীতে সৎপথ অনুসরণ করে চলতাম।

এরপরের আয়াতে (৬৫) বলা হয়েছে— 'এবং সেই দিন আল্লাহ্ এদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা রসুলগণকে কী জবাব দিয়েছিলে'? আলোচ্য আয়াতে উত্থাপিত প্রশ্নটির মধ্যে রয়েছে দু'টি বিষয়। একটি শিরিক বা অংশীবাদিতা সম্পর্কে শাসনমূলক। আর একটি নবীগণকে অস্বীকার করার ব্যাপারে সতর্কবাণী।

এরপরের আয়াতে (৬৬) বলা হয়েছে— 'সেদিন তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলার থাকবে না। এবং এরা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না'। একথার অর্থ— সে দিন 'তোমরা রসুলগণকে কী জবাব দিয়েছিলে' প্রশ্নটির জবাবে তারা কিছুই বলতে পারবে না হয়ে যাবে স্থাণুবৎ, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আর নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করার ক্ষমতাও তখন হারিয়ে ফেলবে তারা। বাক্যটির মূল গঠন ছিলো এরকম— 'ফাআমু আনিল আমবায়ি' (তারা তখন হবে তথ্যপ্রকাশের ক্ষেত্রে দৃষ্টিহীন)। কিন্তু বাকরীতিটি ভঙ্গ করে এখানে বলা হয়েছে 'ফাআ'মিয়াত্ আ'লাইহিমুল আমবাউ'। এরকম করা হয়েছে অবশ্য বক্তব্যকে অধিকতর আবেদনময় করবার জন্য। এভাবে এখানে একথা জানিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে যে, পৃথিবীর কর্মকাণ্ডসমূহের কারণাবলী হচ্ছে বাহ্যিক অনুষঙ্গ মাত্র। প্রকাশ্য প্রভাবই পার্থিব বিষয়াবলীর পরিণতি নির্ণায়ক। কিন্তু পরবর্তী পৃথিবীতে

প্রকাশ্য প্রভাব অকার্যকর। সুতরাং পরিণতি নির্ণায়ন সেখানে অকার্যকর ও অনুপস্থিত। তাই তখন ওই সকল অংশীবাদী হয়ে যাবে নির্জবাব। এখানে 'আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলবার থাকবে না' অর্থ রসুলগণকে অস্বীকার করার কোনো কারণই তারা সেদিন খুঁজে পাবে না। মুজাহিদ বলেছেন, তারা তখন খুঁজেই পাবে না নবী-রসুলগণের প্রতি অসত্যারোপ করবার কোনো দলিল।

বায়যাবী লিখেছেন, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্পাকের জিজ্ঞাসাবাদের প্রকৃতি দেখে নবী রসুলগণ হয়ে পড়বেন বিব্রত ও ভীত। তাই তাঁরাও তখন কোনো প্রত্যুত্তর করবেন না। কেবল বলবেন, আল্লাহ্পাকই সমধিক জ্ঞাত। তাঁদের এমতো অবস্থা দেখে অবিশ্বাসীরা হয়ে যাবে বাকশক্তিহীন। তাই এখানে বলা হয়েছে 'এবং এরা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না'। অথবা পরিস্থিতি দৃষ্টে তারা তখন ভাববে, আমাদের সকলের অবস্থাই এখন সঙ্গীন। সকলেই অপরাধী। সুতরাং কার কাছে আর কী জিজ্ঞেস করবো। এরকম ভাবনার কারণেই তারা তখন হয়ে যাবে নির্বাক।

এরপরের আয়াতে (৬৭) বলা হয়েছে— 'তবে যে ব্যক্তি তওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে তো সফলকাম হবে'।

এখানকার 'আ'সা' (সম্ভবতঃ) শব্দটি নিশ্চিতার্থক। মহারাজাধিরাজেরাই এভাবে ব্যক্ত করেন তাদের দৃঢ় অভিপ্রায়। অর্থাৎ তাদের মুখনিঃসৃত 'সম্ভবতঃ' অর্থ 'অবশ্যই'। এ হচ্ছে তাঁদের মহাপরাক্রম প্রকাশের এক বিশেষ ভঙ্গি। আল্লাহ তায়ালার মহাপরাক্রম প্রকাশার্থেই তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে এ রকম বচন ভঙ্গি। অথবা আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে— তবে যে ব্যক্তি তওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে যেনো আশাধারী হয়ে থাকে যে, সে হবে সফল। অর্থাৎ এমতোক্ষেত্রে 'আ'সা' (সম্ভবতঃ, আশা করা যায়) শব্দটি সম্পৃক্ত হবে তওবাকারীর সৎকর্মশীলতার সঙ্গে, আল্লাহ্র সঙ্গে নয়।

সূরা ক্বসাস ঃ আয়াত ৬৮, ৬৯ ৭০

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ؕ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٦٩﴾ وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ۫ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٧٠﴾

r তোমার প্রতিপালক যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, ইহাতে উহাদিগের কোন হাত নাই। আল্লাহ্ পবিত্র, মহান এবং উহারা যাহাকে শরীক করে তাহা হইতে তিনি ঊর্ধ্বে।

r ইহাদিগের অন্তর যাহা গোপন করে এবং ইহারা যাহা ব্যক্ত করে তোমার প্রতিপালক তাহা জানেন।

r তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, ইহকাল ও পরকালে প্রশংসা তাঁহারই; বিধান তাঁহারই; তোমরা তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হইবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, এতে তাদের কোনো হাত নেই'।

এখানে 'যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন' অর্থ যাকে মনোনীত করাকে তিনি সঙ্গত মনে করেন। তিনি সকল মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রসুলরূপে মনোনীত করেছেন মোহাম্মদ মোস্তফা স.কে। এটাই ছিলো তাঁর চিরস্বাধীন ও চিরপবিত্র অভিপ্রায়। সুতরাং তাঁর এমতো অভিপ্রায় ছিলো অতি অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুসঙ্গত।

'মা কানা লাহুমুল খিয়ারাত' অর্থ এতে তাদের কোনো হাত নেই।' খিয়ারাত' শব্দটি ধাতুমূল। ভিন্নরূপে শব্দটি ব্যবহার্য। যেমন— মোহাম্মাদুন খিয়ারতুল্লহি মিন খলক্বিহী' (আল্লাহ্র সৃষ্টিকুলের মধ্যে মোহাম্মদ এক নির্বাচিত ব্যক্তিত্ব)। এখানে শব্দটি কর্মপদরূপে ব্যবহৃত। তাই এখানে এর অর্থ নির্বাচিত বা মনোনীত। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— মানুষের এমতো অধিকার নেই যে তারা বলবে, অমুককে নবী করলে ভালো হতো অথবা অমুককে নবী বানানো ঠিক হয়নি। এভাবে বলতে হয় 'এতে তাদের কোনো হাত নেই' কথাটি 'তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন' বাক্যটির বেগ ও আবেগ। বরং এখানে এ কথাটির মাধ্যমে প্রচণ্ড প্রতিবাদ করা হয়েছে মক্কার মুশরিকদের একটি অপউক্তির। তারা বলেছিলো, আমাদের নেতৃবর্গের মধ্যে ওলীদ ইবনে মুগীরা ও ওরওয়া ইবনে মাসউদ অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত। সুতরাং তাদের উপরে কোরআন অবতীর্ণ হলো না কেনো? তাদের এমতো অপবচনের পরিপ্রেক্ষিতেই অবশ্য অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

কোনো কোনো তাফসীরবেত্তা বলেছেন, এখানকার 'মা কানা লাহুম' এর 'মা' হচ্ছে সংযোজক অব্যয়, 'ইয়াখতারু' এর কর্মপদ। আর 'আলখিয়ারাত' অর্থ কল্যাণ। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়— বান্দার জন্য যা যথার্থ ও কল্যাণময়, আল্লাহ্পাক সেটাই অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রণ করেন। অর্থাৎ মোহাম্মদ মোস্তফা স.কে সর্বশ্রেষ্ঠ রসুলরূপে মনোনয়ন প্রদান যথার্থ ও কল্যাণকর। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, বান্দাগণ আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত মানতে

বাধ্য। তাই বলে মোতাজিলাদের মতো কোনো অসৎ বিশ্বাস আরোপের অবকাশ এখানে নেই। তাদের অপবিশ্বাসটি হচ্ছে— আল্লাহ্র পক্ষে তাঁর বান্দাদের জন্য অত্যুত্তম ও যথার্থ বিষয় সৃষ্টি করা ওয়াজিব। আর তাদের জন্য নিকৃষ্ট কোনো সৃষ্টি না করা তাঁর পক্ষে অনিবার্য। তাদের এমতো অপবিশ্বাস আহরণের স্থান এটা নয়। কারণ এখানকার বক্তব্য বিষয় হচ্ছে— বান্দার জন্য যা সমীচীন ও শোভন তা সৃষ্টি করবার অধিকার সংরক্ষণ করেন কেবল আল্লাহ্। বান্দাদের এমতো অধিকার আদৌ নেই। আর বান্দার জন্য কল্যাণকর কোনো কিছু সৃজন হচ্ছে তাদের প্রতি তাঁর অনুপম অনুকম্পা। কিন্তু এরকম দায়িত্ব পালন করতে তিনি বাধ্য নন।

কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেন, ওই আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ সর্ববিষয়ে নিরুপায়, একান্ত বাধ্য। কিন্তু একথাও ঠিক নয়। যদি তাই হতো, তবে এখানে 'আলখিয়ারাত' না বলে বলা হতো, 'খইরাত'। অর্থাৎ কোনো অধিকারই মানুষের নেই। এভাবে অভিপ্রায় ও অধিকারকে সম্পূর্ণরূপে নাকচ করে দেওয়া হতো। কিন্তু 'আল খিয়ারাত' বলে এখানে একথাই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মানুষের অভিপ্রায় ও অধিকার অচল। এভাবে এখানে মানুষের অধিকারকে করা হয়েছে সীমায়িত। অতএব বক্তব্যটি দাঁড়াবে— নবী নির্বাচনের ক্ষেত্রে মানুষের কোনো অধিকার নেই, অভিপ্রায় প্রয়োগের নেই কোনো সুযোগ। আলোচ্য আয়াতের অবতরণের প্রেক্ষিত এই ব্যাখ্যাটিকেই দৃঢ়বদ্ধ করে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ পবিত্র মহান এবং তারা যা শরীক করে তা থেকে তিনি ঊর্ধ্বে'। একথার অর্থ আল্লাহ্র সত্তা-গুণবত্তা-কার্যাবলী সবকিছুই এক, একক, অভিভাজ্য, মহান, মহানতম, পবিত্র ও পবিত্রতম। অংশীবাদীরা মনে করে তাঁর চিরমুক্ত অভিপ্রায় ও অধিকারের সঙ্গে অন্য কারো অভিপ্রায় ও অধিকারের সংমিশ্রণ হওয়া সম্ভব। কিন্তু তাদের এমতো ধারণা অযথার্থ, অপবিত্র। এরকম অংশীবাদ দুষ্ট ধারণা থেকে তিনি অনেক অনেক ঊর্ধ্বে।

পরের আয়াতে (৬৯) বলা হয়েছে— 'এদের অন্তর যা গোপন করে এবং এরা যা ব্যক্ত করে তোমার প্রতিপালক তা জানেন'। একথার অর্থ— রসুল স. সম্পর্কে যে হিংসা-বিদ্বেষ অংশীবাদীরা হৃদয়ে লালন করে এবং যে শত্রুতার প্রকাশ তারা ঘটায়, আল্লাহ্তায়ালা তার সকল কিছুই অবগত। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ।

এরপরের আয়াতে (৭০) বলা হয়েছে— 'তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই, ইহকাল ও পরকালে প্রশংসা তাঁরই, বিধান তাঁরই, তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে'। একথার অর্থ— যে সত্তা অদৃশ্য, অবোধ্য ও

আনুরূপ্যবিহীন, তিনিই আল্লাহ্। তিনি ভিন্ন উপাস্য কেউ নেই। ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে অতুলনীয়রূপে প্রশংসাভাজন। কারণ সুন্দরতম তিনি। আর স্রষ্টা সকল সৌন্দর্যের। বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীরা তাই কেবল তাঁরই প্রশংসা করে অহরহ ধন্য হয়। দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে। যেমন বেহেশতে প্রবিষ্ট হওয়ার পর তারা বলবে 'সকল স্তব-স্তুতি আল্লাহ্র, যিনি আমাদের নিকট থেকে চিরদিনের জন্য দূর করে দিয়েছেন আক্ষেপপ্রবণতাকে'। সকলের এবং সকল কিছুর উপরে তাঁর বিধান সতত ক্রিয়াশীল। যেমন অনুগতদের উপরে ক্রিয়াশীল মার্জনা এবং অননুগতদের উপর কার্যকর শাস্তি। আর সকলের অবশেষ প্রত্যাবর্তন তাঁর দিকে। কেবল তাঁরই দিকে।

সূরা ক্বাসাস ঃ আয়াত ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ؕ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ﴿۷۱﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿۷۲﴾ وَ مِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۷۳﴾ وَ يَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿۷۴﴾ وَ نَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا فَقُلْنَا هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوْا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿۷۵﴾

r বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি আল্লাহ্ যদি রাত্রির অন্ধকারকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন— আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন ইলাহ্ আছে যে তোমাদিগকে দিবালোক দান করিতে পারে? তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করিবে না?'

r বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি— আল্লাহ্ যদি দিবসকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন ইলাহ্ আছে যে তোমাদিগের জন্য রাত্রির আর্বিভাব ঘটাইবে যখন তোমরা বিশ্রাম করিতে পার। তবুও কি তোমরা ভাবিয়া দেখিবে না?'

r তিনিই তাঁহার দয়ায় তোমাদিগের জন্য করিয়াছেন রজনী ও দিবস, যাহাতে রজনীতে তোমরা বিশ্রাম করিতে পার এবং দিবসে তাঁহার অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

r সেই দিন উহাদিগকে আহবান করিয়া বলা হইবে, 'তোমরা যাহাদিগকে আমার শরীক গণ্য করিতে তাহারা কোথায়?'

r প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে আমি এক জন সাক্ষী দাঁড় করাইব এবং বলিব, তোমাদিগের প্রমাণ উপস্থিত কর।' তখন উহারা জানিতে পারিবে ইলাহ্ হইবার অধিকার আল্লাহেরই এবং উহারা যাহা উদ্ভাবন করিত তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইবে।

'আরাআইতুম' অর্থ হে মক্কাবাসী! তোমরা বলতে পারো কি? অর্থাৎ তোমরা ভেবে দেখেছো কি? 'সারমাদা' অর্থ চিরস্থায়ী। শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'সুরুদ' থেকে। এখানে 'মীম' অক্ষরটি সংযোজিত হয়েছে অতিরিক্ত হিসেবে, আধিক্য শব্দরূপে। এভাবে এর মর্মার্থ হয়েছে— রজনী যদি প্রলম্বিত হয় মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত। 'বিদ্বিয়াইন' অর্থ কে আছে এমন যে দিবালোক দান করতে পারে, যাতে তোমরা নিয়োজিত হতে পারো জীবিকান্বেষণ কর্মে। 'আফালা ইয়াসমাউন' অর্থ তবুও কি তোমরা চিন্তাভাবনা সহ সদুপদেশ শ্রবণ করবে না? এভাবে এখানকার প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হে মক্কাবাসী! তোমরা একথা কখনো ভেবে দেখেছো কি, আল্লাহ্ যদি রাতের আঁধারকে মহাপ্রলয়দিবস পর্যন্ত প্রলম্বিত করেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কে আছে, যে তোমাদের জীবিকান্বেষণকে নিশ্চিত করবার জন্য আনতে পারে দিনের আলো? তবুও কি আমার বার্তাবাহক কর্তৃক বারংবার উচ্চারিত সদুপদেশ তোমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করবে না?

বায়যাবী লিখেছেন, এখানে 'হাল ইলাহুন' (এমন কোন উপাস্য আছে) না বলে বলা হয়েছে 'মান ইলাহুন' (কে আছে এমন উপাস্য)। এরকম বলা হয়েছে অবিশ্বাসীদের আনুকূল্য রক্ষার্থে। কারণ এখানে সম্বোধিত হয়েছে তারাই।

পরের আয়াতে (৭২) বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা ভেবে দেখেছো কি, আল্লাহ্ যদি দিবসকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোনো ইলাহ্ আছে যে তোমাদের জন্য রাত্রি আবির্ভাব ঘটাবে যখন তোমরা বিশ্রাম করতে পারো। তবুও কি তোমরা ভেবে দেখবেনা'? একথার অর্থ— হে মক্কার মানুষ! একথাও কি তোমরা কখনো ভেবে দেখেছো কি, আল্লাহ্ যদি সূর্যকে মধ্যগগনে সুস্থির করে দিয়ে দিবসকে প্রলম্বিত করেন মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত, তবে

এমন কোনো উপাস্য কি কেউ আছে, যে তোমাদের আনতে পারবে বিশ্রামপ্রদায়ক রজনী? তবুও কি তোমরা আল্লাহ্‌র শক্তির সর্বত্রগামিতার এই মহানিদর্শনটির প্রকৃত তত্ত্ব অনুধাবন করতে সচেষ্ট হবে না?

রাত্রির আবির্ভাবজনিত উপকারের কথা বলা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। বলা হয়েছে 'যখন তোমরা বিশ্রাম করতে পারো। কিন্তু পূর্ববর্তী আয়াতে দিবসের আবির্ভাব ঘটে কেনো, সেকথা রয়েছে অনুক্ত। এতে করে একথাই প্রমাণিত হয় যে, দিবসের আলোক আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত এক বিশাল অনুগ্রহ, রাত্রির অন্ধকার তত্তুল্য নয়। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে 'তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করবে না'? আর এখানে বিষয়টির সপ্রমাণ উল্লেখের পর বলা হয়েছে 'তবুও কি তোমরা ভেবে দেখবে না'? এরকম বলার কারণ হচ্ছে, যেনো শ্রবণ জ্ঞানকে করে সচকিত এবং দর্শন ভাবনাকে।

এরপরের আয়াতে(৭৩) বলা হয়েছে— 'তিনিই তাঁর দয়ায় তোমাদের জন্য করেছেন রজনী ও দিবস, যাতে রজনীতে তোমরা বিশ্রাম করতে পারো এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো'। একথার অর্থ— জীবিকান্বেষণের কর্মমুখরতা শোভিত দিবস এবং শ্রান্তিনিরোধতামুদ্রিত বিভাবরী তো আল্লাহ্‌ই তোমাদেরকে দয়া করে দান করেছেন। সুতরাং তোমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না কেনো?

এখানে 'দিবসে তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো' অর্থ দিবসে সন্ধান করতে পারো ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ। এখানে 'ফিহী' শব্দটির 'হী' (তার) সর্বনামটি প্রযুক্ত হবে রজনী'র সঙ্গে। এমতোক্ষেত্রে বর্ণনার ধারাক্রমই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। প্রথমে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে 'রজনী ও দিবস'। তারপর এ দু'টোর বিষয়ে আলোচিত হয়েছে ক্রমান্বয়ে এভাবে— যাতে রজনীতে তোমরা বিশ্রাম করতে পারো এবং দিবসে সন্ধান করতে পারো তাঁর অনুগ্রহ'। অর্থাৎ লাভ করতে পারো ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ । জুজায বলেছেন, বক্তব্যটির মর্মার্থ এরকমও হতে পারে যে— তিনি তোমাদের জন্য রজনী-দিবস সৃষ্টি করেছেন একারণে যেনো, তোমরা এ দু'টোর একটিতে গ্রহণ করতে পারো বিশ্রাম এবং অন্য একটি ব্যবহার করতে পারো মহাকল্যাণ অন্বেষণার্থে।

এরপরের আয়াতে (৭৪) বলা হয়েছে— 'সেদিন তাদেরকে আহ্বান করে বলা হবে, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক গণ্য করতে তারা কোথায়'? একথার অর্থ— হে মক্কার জনতা! মহাবিচারের দিবসে অবশ্যই তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। বলা হবে পৃথিবীতে তোমরা যাদেরকে পরিত্রাতা বলে পূজো করতে, তারা আজকের এই ভয়ানক বিপদে তোমাদেরকে সাহায্য করতে আসে না কেনো?

এখানে এক হুমকির পর দেয়া হয়েছে অপর হুমকি। গুরুত্বসহকারে এই বিষয়টিকেই স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে যে, শাস্তি অবধারিত হওয়ার প্রধান উপলক্ষ হচ্ছে শিরিক বা অংশীবাদিতা। প্রথম হুমকির উদ্দেশ্য ছিলো একথা জানিয়ে দেওয়া যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে ছেড়ে আনুগত্য করেছিলে তোমাদের অংশীবাদ প্রিয় সমাজপতিদের। আর দ্বিতীয় হুমকিটি এরকম— তোমাদের বক্ষস্থিত বিশ্বাসই ডেকে এনেছে বিপর্যস্ত। তা না হলে তোমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত ছেড়ে দিয়ে বিগ্রহবন্দনার মতো ধ্বংসাত্মক আচরণকে গ্রহণ করবে কেনো?

এরপরের আয়াতে (৭৫) বলা হয়েছে— 'প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে আমি একজন সাক্ষী দাঁড় করাবো এবং বলবো, তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত করো। তখন তারা জানতে পারবে ইলাহ্ হবার অধিকার আল্লাহরই এবং তারা যা উদ্ভাবন করতো তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে'।

এখানে 'নাযা'না' অর্থ বের করে আনবো, দাঁড় করাবো সাক্ষীরূপে। অর্থাৎ সেদিন প্রত্যেক নবীকে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করবো তাঁদের আপনাপন সম্প্রদায়ের। এখানে 'বুরহানাকুম' অর্থ দলিল-প্রমাণ। অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা যে মতবাদের অনুসারী ছিলো, তার পক্ষের দলিল প্রমাণ। 'আন্নাল হাক্ক্বা লিল্লাহ' অর্থ সুনিশ্চিত সত্য আল্লাহ্র পক্ষে। অর্থাৎ আল্লাহ্রই রয়েছে একমাত্র উপাস্য হওয়ার অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিকার, যার মধ্যে কারো বা কোনোকিছুর অংশগ্রহণের অবকাশ মাত্র নেই। 'দ্বল্লা' অর্থ অপসৃত হবে, মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে। আর 'মা কানু ইয়াফতারূন' অর্থ তারা পৃথিবীতে যে সকল অলীক ধারণার উদ্ভাবন ঘটাতো। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— মহাবিচারের দিবসে আমি আমার নবীগণকে করবো তাঁদের আপনাপন সম্প্রদায়ের কৃতকর্মের সাক্ষী। বলবো, তোমরা পৃথিবীতে এঁদেরকে অমান্য করে যে সকল অপধারণা ও অপআচরণের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়েছিলে, সেগুলোর সপক্ষে প্রমাণ উপস্থিত করো। কিন্তু তারা তখন আমার এমতো প্রস্তাব পরিপূরণ করতে হবে সম্পূর্ণ অক্ষম। ফলে এ বিষয়টি আর তাদের কাছে অস্পষ্ট থাকবে না যে, উপাস্য হওয়ার একক ও অবিভাজ্য অধিকার সংরক্ষণ করেন কেবল আল্লাহ্। আর তাদের আল্লাহ্বিরোধী সকল উদ্ভাবনা ও কর্মকাণ্ড সর্বৈবরূপে মিথ্যা।

সূরা ক্বসাস ঃ আয়াত ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২

اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ ۖ وَ اٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَآ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓاُ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ ۚ اِذْ قَالَ

لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْفَرِحِیْنَ ﴿۷۶﴾ وَ ابْتَغِ فِیْمَاۤ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَ لَا تَنْسَ نَصِیْبَكَ مِنَ الدُّنْیَا وَ اَحْسِنْ كَمَاۤ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَیْكَ وَ لَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِی الْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْمُفْسِدِیْنَ ﴿۷۷﴾ قَالَ اِنَّمَاۤ اُوْتِیْتُهٗ عَلٰی عِلْمٍ عِنْدِیْ ؕ اَوَ لَمْ یَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّ اَكْثَرُ جَمْعًا ؕ وَ لَا یُسْـَٔلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿۷۸﴾ فَخَرَجَ عَلٰی قَوْمِهٖ فِیْ زِیْنَتِهٖ ؕ قَالَ الَّذِیْنَ یُرِیْدُوْنَ الْحَیٰوةَ الدُّنْیَا یٰلَیْتَ لَنَا مِثْلَ مَاۤ اُوْتِیَ قَارُوْنُ ۙ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِیْمٍ ﴿۷۹﴾ وَ قَالَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَیْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَیْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ۚ وَ لَا یُلَقّٰىهَاۤ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ ﴿۸۰﴾ فَخَسَفْنَا بِهٖ وَ بِدَارِهِ الْاَرْضَ ۫ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ یَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِیْنَ ﴿۸۱﴾ وَ اَصْبَحَ الَّذِیْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ یَقُوْلُوْنَ وَیْكَاَنَّ اللّٰهَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَ یَقْدِرُ ۚ لَوْ لَاۤ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَیْنَا لَخَسَفَ بِنَا ؕ وَیْكَاَنَّهٗ لَا یُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۸۲﴾ ع

r কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু সে তাহাদিগের প্রতি জুলুম করিয়াছিল। আমি তাহাকে দান করিয়াছিলাম ধনভাণ্ডার যাহার চাবিগুলি বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ কর, তাহার সম্প্রদায়

তাহাকে বলিয়াছিল, 'দম্ভ করিওনা, আল্লাহ্ দাম্ভিকদিগকে পছন্দ করেন না'।

r আল্লাহ্ যাহা তোমাকে দিয়াছেন তদ্বারা পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান কর। ইহলোকে তোমার বৈধ সম্ভোগকে তুমি উপেক্ষা করিও না; তুমি সদাশয় হও, যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি সদাশয়, এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে চাহিও না। আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভাল বাসেন না।'

r সে বলিল, 'এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হইয়াছি।' সে কি জানিত না আল্লাহ্ তাহার পূর্বে ধ্বংস করিয়াছেন বহু মানবগোষ্ঠীকে যাহারা তাহা অপেক্ষা শক্তিতে ছিল প্রবল, সম্পদে ছিল প্রাচুর্যশালী? অপরাধীদিগকে উহাদিগের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে না।

r কারূন তাহার সম্প্রদায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল জাঁকজমক সহকারে। যাহারা পার্থিব জীবন কামনা করিত তাহারা বলিল, 'আহা, কারূনকে যাহা দেওয়া হইয়াছে আমাদিগকে যদি তাহা দেওয়া হইত! প্রকৃতই তিনি মহা ভাগ্যবান।'

r এবং যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছিল তাহারা বলিল, 'ধিক তোমাদিগকে, যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগের জন্য আল্লাহের পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীল ব্যতীত ইহা কেহ পাইবে না।'

r অতঃপর আমি কারূনকে ও তাহার প্রাসাদকে ভূগর্ভস্থ করিলাম। তাহার সপক্ষে এমন কোন দল ছিল না যে আল্লাহের শাস্তির বিরুদ্ধে তাহাকে সাহায্য করিতে পারিত এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না।

r পূর্ব দিন যাহারা তাহার মত হইবার কামনা করিয়াছিল তাহারা বলিতে লাগিল, 'দেখ, আল্লাহ্ তাহার দাসদিগের মধ্যে যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং যাহার জন্য ইচ্ছা ইহা হ্রাস করেন। যদি আল্লাহ্ আমাদিগের প্রতি সদয় না হইতেন তবে আমাদিগকেও তিনি ভূগর্ভস্থ করিতেন। দেখ, সত্যপ্রত্যাখ্যনকারীরা সফলকাম হয় না।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'কারূন ছিলো মুসার সম্প্রদায়ভূত'। বাগবী লিখেছেন, কারূন ছিলো হজরত মুসার পিতৃব্যপুত্র। হজরত মুসার পিতা ইমরান এবং কারূনের পিতা ইয়াসহার ছিলেন কাহত ইবনে লাবী ইবনে ইয়াকুব আ. এর পুত্র। ইবনে জুরাইজ থেকে ইবনে মুনজিরও এরকম তথ্য উপস্থাপন করেছেন। আর ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, কারূন ছিলো হজরত মুসারই পিতৃব্য। তওরাত শরীফের প্রাজ্ঞ পণ্ডিত ছিলো সে। কিন্তু সামেরীর মতো সে-ও হয়ে পড়েছিলো কপটাচারী। জালালুদ্দিন মাহাল্লী লিখেছেন, কারূন ছিলো হজরত মুসার চাচাত ভাই। আর তার মা ছিলো হজরত মুসার খালা।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু সে তাদের প্রতি জুলুম করেছিলো। আমি তাকে দান করেছিলাম ধনভাণ্ডার। যার চাবিগুলি বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিলো'।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, ফেরাউন কারূনকে বানিয়েছিলো বনী ইসরাইলদের দলপতি। সে কারণে সে বনী ইসরাইলদের উপরে চালাতো অকথ্য উৎপীড়ন। সুতরাং এখানকার 'ফাবাগা আ'লাইহিম' কথাটির অর্থ হবে— সে বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠীর উপরে করেছিলো অবর্ণনীয় অত্যাচার। জুহাক বলেছেন, সে হয়ে গিয়েছিলো অংশীবাদী। তাই প্রতিপক্ষ হয়েছিলো স্ববংশীয়দের। কেউ কেউ বলেছেন, সে ছিলো উগ্র, দাম্ভিক। আবার কেউ কেউ বলেছেন, দারুন পরশ্রীকাতর ছিলো সে। শ্রেষ্ঠ বিত্তপতি হওয়াই ছিলো তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

আবদ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, কাতাদা বলেছেন, কারূন ছিলো হজরত মুসার চাচাত ভাই। বনী ইসরাইলদের সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার সময় সেত ছিলো তাদের অনুগামী। কিন্তু পরে সামেরীর মতো সে-ও হয়ে গিয়েছিলো কপটাচারী। ধনবল ও জনবলের গর্ব করতো সে। কারণ প্রচুর ধন সম্পদের মালিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ছিলো অনেক সন্তান-সন্ততির পিতা। তার দম্ভ চরমে পৌঁছলে আল্লাহ্পাক তাকে ধ্বংস করে দেন। সুরা মুমিনের বিবরণ অবশ্য অন্যরকম। সেখানে বলা হয়েছে 'আর এটা সুনিশ্চিত যে, আমি সুস্পষ্ট প্রমাণসহ মুসাকে পাঠিয়েছিলাম ফেরাউন, হামান ও কারূনের প্রতি। তারা বলেছিলো, তুমি তো স্পষ্ট মিথ্যাবাদী, যাদুকর'। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, কারূন কপটাচারী ছিলো না, ছিলো ফেরাউন ও হামানের মতো প্রকাশ্য সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। উল্লেখ্য, প্রকাশ্যতঃ ইমানদার, আর ভিতরে ভিতরে কাফের যারা তাদেরকে বলা হয় মুনাফিক বা কপট বিশ্বাসী। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী প্রকাশ্য গোপন উভয় অবস্থায় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী বা কাফের। শহর ইবনে হাওসাব বলেছেন, গর্বোন্মত্ত কারূনের পরিধেয় বসন আলুলায়িত হয়ে থাকতো মৃত্তিকা পর্যন্ত। অহংকারীদের পোশাক এরকমই হয়।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যার পরিধেয় বস্ত্রের নিম্নাংশে ভূমি স্পর্শ করে, আল্লাহ্ তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, যে ব্যক্তি তার উত্তরীয় আস্ফালন সহ উড়িয়ে বেড়ায়, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ তার দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেন না। সর্বোন্নত সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আহমদ ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ মহাবিচারের দিবসে ওই লোকের দিকে দয়ার্দ্র দৃষ্টিতে তাকাবেন না, যে লোক তার পরিধেয় বসন মাটির সঙ্গে হেঁচড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।

'মিনাল কুনুযী' অর্থ সঞ্চিত ধনভাণ্ডার। 'মাফাতিহাহু' অর্থ ওই ধনভাণ্ডারের সিন্দুকসমূহের চাবি। 'মাফাতিহ্' শব্দটি 'মিফতাহ্' এর বহুবচন। এর অর্থ কুঞ্জিকাসমূহ। এরকম বলেছেন কাতাদা, মুজাহিদ প্রমুখ। কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটির অর্থ সম্পদের খনি। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন— 'আর তাঁর নিকটে রয়েছে অদৃশ্যের ভাণ্ডার, যার সম্পর্কে তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানে না'।

এখানে বলা হয়েছে 'যার চাবিগুলো বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিলো। সুতরাং বুঝতে হবে, অপরিমিত সম্পদের খনি যাকে বলে, কারূন সে রকম অফুরন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী ছিলো না। কারণ চল্লিশ জন বলবান লোকের পক্ষেও চার লক্ষ দিরহামের সংরক্ষণাগারের চাবি বহন করা দুঃসাধ্য নয়।

মনসুরের মাধ্যমে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, খাইছামা বলেছেন, কারূনের ধনভাণ্ডারের চাবি বহন করতো চল্লিশটি গর্দভ। আর চাবিগুলো আকারে এক আঙুলের অধিক লম্বা ছিলো। প্রতিটি সিন্দুকের জন্য ছিলো একটি করে চাবি। আর চাবিগুলো ছিলো লোহার। লোহার চাবি অত্যধিক ভারী বলে পরে সে চাবি তৈরী করিয়ে নিয়েছিলো কাঠ ও গরুর চামড়া দিয়ে। সেগুলো বহন করতেও লাগতো চল্লিশটি খচ্চর। উল্লেখ্য, বর্ণনাটি কোরআনের বর্ণনার অনুকূল নয়। কারণ গাধা বা খচ্চর নয়, এখানে বলা হয়েছে একদল বলবান লোকের কথা।

'উ'সবাহ্' অর্থ একটি দল। বাগবী লিখেছেন, কতোজন লোকের সমষ্টিকে 'উ'সবাহ্' বলে, সে সম্পর্কে বিদ্বজ্জনের মধ্যে রয়েছে বিস্তর মতপৃথকতা। মুজাহিদ বলেছেন, 'উ'সবাহ্' বলে দশ থেকে পনেরো জনের দলকে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'উ'সবাহ্' হচ্ছে তিন থেকে দশ জনের সমষ্টি। কাতাদা বলেছেন, তিরিশ থেকে চল্লিশজনের জোটকে বলে 'উ'সবাহ্'। 'কামুস' অভিধানগ্রন্থেও এরকম বলা হয়েছে। কেউ কেউ আবার 'উ'সবাহ্'র সদস্য সংখ্যা নির্ণয় করেছেন সত্তর জন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কারূনের ধনভাণ্ডারের কুঞ্জিকাসমূহ বহন করতো চল্লিশজন শক্তিমান পুরুষ। আর এখানকার 'চাবিগুলো বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিলো' কথাটির অর্থ— অত্যধিক ভারী হওয়ার কারণে চাবিবহনকালে ওই শক্তিমান পুরুষেরা ঝুঁকে পড়তো মাটির দিকে।

আবু উবায়দা বলেছেন, অগ্রপশ্চাত ঘটেছে এখানকার বক্তব্যবিন্যাসে। বক্তব্যটি পরিবেশিত হওয়া সমীচীন ছিলো এভাবে— 'ইন্নাল উ'সবাতা লা তানুউলাহা' (উট দল তা উত্তোলন করতো)।

এরপর বলা হয়েছে— 'স্মরণ করো, তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিলো, দম্ভ কোরো না, আল্লাহ্ দাম্ভিকদেরকে পছন্দ করেন না'। একথার অর্থ— কারূনের স্বসম্প্রদায়ের পুন্যবানেরা তাকে এই মর্মে উপদেশ দিয়েছিলো, দ্যাখো কারূন! ধন ঐশ্বর্যের কারণে গর্বিত ও উল্লসিত হয়ো না। আল্লাহ্ এরকম উল্লাসপ্রবণ ঐশ্বর্যশালীর দাম্ভিকতাকে পছন্দ করেন না।

এখানকার 'ফরহুন' অর্থ উল্লসিত, আকাংখিত বস্তুলাভের কারণে অত্যধিক আনন্দিত। উল্লেখ্য গর্বোল্লাস নিষিদ্ধ। প্রাপ্তির সাধারণ ও স্বাভাবিক আনন্দ সে রকম নয়। তবে প্রায়শঃই দেখা যায়, ধনাঢ্য মানুষ হয় গর্বোন্মত্ত। এমতো উন্মত্ততা অবশ্যই নিষিদ্ধ। আল্লাহ্পাক এধরনের আচরণকে বলেছেন 'তুগইয়ান' (বিরুদ্ধাচরণ)। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'মানুষ যখন নিজেকে পেয়েছে বিত্তশালী হিসেবে, তখন সে অবশ্যই হয়ে উঠেছে বিরুদ্ধাচারী'। 'কামুস' গ্রন্থে রয়েছে 'ফারহুন' অর্থ উল্লাস, আত্মপ্রদর্শন।

সফলতার আনন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই প্রকাশ পায়। সুতরাং এরকম স্বভাবজ আনন্দ নিষিদ্ধ নয়। তবে আল্লামা বায়যাবী লিখেছেন, পার্থিব প্রাপ্তি জনিত আনন্দ পরিহরণীয় আর এতে করে প্রবল হয় পৃথিবীপ্রীতি, আর ঔদাসীন্যের আবরণ নেমে আসে পরকালপ্রীতির উপর। ফলে মানুষ ভুলে যায় যে, এ প্রাপ্তি নশ্বর। সুতরাং পার্থিব প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিকে সমতুল মনে করাই শ্রেয়। আল্লাহ্পাকের উপদেশও এরকম। যেমন— 'হৃত বিষয়ের জন্য আক্ষেপ প্রকাশ কোরো না, আবার প্রাপ্তিতে হয়ো না উল্লসিত'।

'লা তাক্বরাহ্' অর্থ উল্লসিত হয়ো না, দম্ভ কোরো না। অর্থাৎ বিত্ত-দম্ভের কারণে উচ্ছাস প্রকাশ কোরো না। কারণ, এমতো উচ্ছাস ক্ষতি করে আল্লাহ্ প্রীতির। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'যারা প্রতারণাপূর্ণ পার্থিব আস্বাদনে চঞ্চলিত হয়, তারা হয় মদগর্বিত। তারা আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, আল্লাহ্প্রেমিকও নয়'।

কোনো কোনো তাত্ত্বিক লিখেছেন, বিত্তোচ্ছ্বাস যে দূষণীয় সে কথার উল্লেখ রয়েছে কোরআন মজীদের অনেক স্থানে। যেমন— ১, যখন তাদের নিকট দলিল প্রমাণসহ রসুলগণ আগমন করলেন, তখনও তারা পূর্বধারণা নিয়েই মেতে রইলো ২. আর তারা উল্লসিত হয়েছে পার্থিব জীবনে ৩. তোমাদের এমতো অবস্থা এজন্য যে, অন্যায়ভাবে তোমরা মত্ত ছিলে ঘোরপার্থিবতায়। আবার কোনো স্থানে আনন্দ প্রকাশ করারও অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যেমন— ১. অনন্তর একারণেই তোমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত ২. আজ আল্লাহ্র সাহার্যপ্রাপ্তিতে বিশ্বাসবানেরা আনন্দ প্রকাশ করবে।

আমি বলি, প্রকৃত কথা এই যে, যে প্রাপ্তি পরকালে ফলপ্রদ, সে প্রাপ্তিতে উল্লসিত হওয়া প্রশংসনীয়। সেকারণেই এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'তোমরা আনন্দোল্লাস করো'। আবার জাগতিক প্রাপ্তির সকৃতজ্ঞ উচ্ছ্বাসও অপ্রশংসনীয় নয়। একারণেই রসুল স. বলেছেন, কৃতজ্ঞ ভোজনকারী ধৈর্যশীল রোজাদারদের মতো। আবার ধর্মপরায়ণতাজাত সাফল্য আস্বাদনে যদি প্রকাশ পায় অকৃতজ্ঞতা ও প্রদর্শনপ্রবণতা, তবে তাও নিন্দনীয়। অতএব বুঝতে হবে, সাফল্যের উচ্ছ্বাস প্রশংসনীয় না অপ্রশংসনীয়, তা নির্ভর করে কৃতজ্ঞতা এবং অকৃতজ্ঞতার উপর। আর আল্লাহ্ প্রেমিকেরা ওই সকল সাফল্যে অবশ্যই প্রীত হন, যা আল্লাহ্র পরিতোষ অর্জনের সহায়ক। তাঁরা উদ্দেশ্য সাধনে থাকেন সতত তৎপর। পক্ষান্তরে মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে যারা বেখবর, আল্লাহ্ প্রেমিক হওয়া তো তাদের পক্ষে সম্ভবই নয়।

পরের আয়াতে (৭৭) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যা তোমাকে দিয়েছেন, তদ্দ্বারা পরকালের কল্যাণ অনুসন্ধান করো। ইহলোকে তোমার বৈধ সম্ভোগকে তুমি উপেক্ষা কোরো না; তুমি সদাশয় হও, যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি সদাশয় এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালোবাসেন না'।

এখানে 'ফীমা আতাকাল্লহ্' অর্থ আল্লাহ্ যা তোমাকে দিয়েছেন। 'পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান করো' অর্থ অন্বেষণ করো জান্নাতের পথ। অর্থাৎ জান্নাত প্রাপ্তির নিশ্চয়তার্থে আল্লাহ্ প্রদত্ত অনুগ্রহরাজির জন্য প্রকাশ করো যথাকৃতজ্ঞতা। ব্যয় করো তাঁর সন্তোষের অনুকূলে। 'ওয়ালা তানসা' অর্থ উপেক্ষা কোরো না, পার্থিব সম্পদে তোমার বৈধ অংশের কথা ভুলে যেয়ো না, যে সম্পদ হতে পারে তোমার পরকালের সফলতার পাথেয়। মুজাহিদ ও ইবনে যায়েদ বলেছেন, যেহেতু এ জগত পরজগতের শস্যক্ষেত্র। তাই এজগতের প্রকৃত অর্জন সেটাই, যার দ্বারা লাভ হয় পরকালের সাফল্য।

সুদ্দী বলেছেন, এখানে 'ইহলোকে তোমার বৈধ সম্ভোগকে তুমি উপেক্ষা কোরো না' অর্থ এজগতে দান খয়রাত করার কথা ভুলে যেয়ো না, অপরিপূরিত রেখো না আত্মীয়-স্বজনের অধিকার। হজরত আলী বলেছেন, তুমি তোমার সুস্থতা, শক্তিমত্তা, যৌবন ও বিত্ত-বৈভব আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে পরলোকের কল্যাণ অর্জন করতে ভুলো না। রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, পাঁচটি বিষয়কে তোমরা আল্লাহ্র অযাচিত দান বলে ধরে নিয়ো— ১. মৃত্যু পূর্ব আয়ুষ্কাল ২. ব্যধিগ্রস্ত হওয়ার পূর্বের সুস্থতা ৩. কর্ম ব্যস্ততার পূর্বের অবকাশ ৪. বার্ধক্য কবলিত হওয়ার পূর্বের যৌবন এবং ৫. বিত্তহীন হওয়ার পূর্বের স্বচ্ছলতা। বিশুদ্ধ সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হাকেম ও বায়হাকী। আর 'জুহুদ' গ্রন্থে উল্লেখ

করেছেন ইমাম আহমদ। প্রায়োন্নত সূত্রে ওমর ইবনে মাইমুন থেকে এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন বাগবী, ইবনে হাব্বান এবং আবু নাঈম। হাসান বসরী বলেছেন, এরকম একটি নির্দেশও রয়েছে যে— প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করো, রেখে দাও ততটুকু, যতটুকু তোমার জীবন ধারণের জন্য যথেষ্ট। মনসুর ইবনে মাজান বলেছেন, এখানে 'ইহলোকে তোমার বৈধ সম্ভোগকে তুমি উপেক্ষা কোরো না' কথাটির অর্থ— নিজের ও পরিবারবর্গের প্রয়োজনীয় উপজীবিকাটুকু পরিত্যাগ কোরো না।

'ওয়া আহসিন্' অর্থ সদাশয় হও। আল্লাহ্‌র বান্দাদের উপকার করো। অথবা অর্থ হবে— আল্লাহ্‌র উপকার করো উত্তমরূপে। হৃদয়ে জাগ্রত রাখো তাঁর বিরতিহীন স্মরণ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো তাঁর প্রতি দানের। জীবনকে করো আনুগত্য শোভিত, কেননা আল্লাহ্ তোমার প্রতি সতত সদাশয়।

'ওয়ালা তাব্‌গিল ফাসাদ' অর্থ বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। বায়যাবী লিখেছেন, আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে নিষিদ্ধ হয়েছে উৎপীড়ন ও অনাচার। বাগবী লিখেছেন, যারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণ করে, তারাই পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।

এরপরের আয়াতে (৭৮) বলা হয়েছে— ' সে বললো, এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে পেয়েছি।' একথার অর্থ—তার সম্প্রদায়ের পুণ্যবানদের সদুপদেশের প্রতিবাদে কারূন বললো, আমাকে আবার কারো কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে কেনো? কেনোই বা অন্যের জন্য করতে হবে অর্থব্যয়? আমার মান-সম্মান, কর্তৃত্ব-নেতৃত্ব, বিত্ত-বৈভব এসব কিছু তো পেয়েছি আমার জ্ঞানবুদ্ধিবলে।

কোনো কোনো বিদ্বান এখানকার 'জ্ঞানবলে' কথাটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, কারূন ছিলো প্রাজ্ঞ রসায়নবিদ। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, হজরত মুসা ছিলেন রসায়ন শাস্ত্রে সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী। ওই বিদ্যা তিনি কিছু কিছু শিক্ষা দিয়েছিলেন হজরত ইউশা ইবনে নুনকে। কালেব ইবনে ইয়ুকনা এবং কারূনও পেয়েছিলো ওই বিদ্যার এক তৃতীয়াংশ করে জ্ঞান। কিন্তু সুচতুর কারূন ক্রমে ক্রমে ওই জ্ঞানের সবটাই রপ্ত করে ফেলে। প্রবঞ্চিত করে হজরত ইউশা এবং কালেবকে। তার অঢেল সম্পদ আহরণের উৎসই ছিলো তার অধিকৃত রসায়ন জ্ঞান। সেকারণেই সে বলেছিলো 'এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হয়েছি।'

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'জ্ঞানবলে' অর্থ ব্যবসায়িক বুদ্ধিবলে। কৃষিপণ্য উৎপাদনের কৌশলসহ অন্যান্য অর্থাগমের কলাকৌশল জানা ছিলো তার। ওই সকল কলাকৌশলের যথাযথ প্রয়োগের ফলে সে লাভ করেছিলো প্রচুর অর্থবিত্ত।

সহল বলেছেন, যে নিজের সাফল্যে গর্বিত, সে প্রকৃত অর্থে সফল নয়। বরং সফল সে-ই যে সুফল প্রাপ্তিতে থাকে কৃতজ্ঞচিত্ত। কেননা দর্পোন্মত্তরা অবশেষে কারূনের মতো ধ্বংস হয়ে যায়। আর টিকে থাকে কৃতজ্ঞচিত্তরা।

এরপর বলা হয়েছে— ' সে কি জানতো না, আল্লাহ্ তার পূর্বে ধ্বংস করেছেন বহু মানব গোষ্ঠিকে যারা তার চেয়ে শক্তিতে ছিলো প্রবল। সম্পদে ছিলো প্রাচুর্যশালী'।

এখানে 'আওয়ালাম ইয়ালাম' অর্থ সে-কি অবগত নয়? দান ও বঞ্চনা তাঁরী অভিপ্রায়াগত। তিনিই তো সকলের একমাত্র উপাস্য। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিধর, অধিকারী অতুলনীয় পরাক্রমের । আর এখানকার 'ধ্বংস করে দিয়েছেন বহু মানবগোষ্ঠীকে' বলে বুঝানো হয়েছে বিগত যুগের নবীগণের অবাধ্য সম্প্রদায়ের ধ্বংস হয়ে যাওয়াকে, যারা ছিলো কারূন অপেক্ষাও অধিক বলবান ও বিত্তবান। যেমন আদ, ছামুদ, হজরত নূহের সম্প্রদায় ইত্যাদি। আলোচ্য প্রশ্নটি বিস্ময়প্রকাশক, অথবা অস্বীকৃতি জ্ঞাপক।

এরপর বলা হয়েছে— 'অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না'। একথার অর্থ— আল্লাহতায়ালা সবজ্ঞ। তাই অপরাধীদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করার কিছুই নেই। সেকারণেই তো অতীতের অবাধ্যদেরকে ধ্বংস করেছে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ না করেই। পরিশেষে তাদেরকে দিয়ে পরিপূর্ণ করা হবে জাহান্নাম। এখানে আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথাই প্রকাশ করা হয়েছে যে, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত সকল কালের অপরাধীদের অপরাধের প্রকৃতি ও পরিমাণ সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। তাই তাদের শাস্তি যেমন অবধারিত, তেমনি প্রশ্নাতীত। হজরত কাতাদা বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের অর্থ—তাদেরকে নরকে প্রবেশ করানো হবে বিনা প্রশ্নে। মুজাহিদ বলেছেন, ফেরেশতারাও তাদেরকে তাদের পাপ সম্পর্কে কিছুই বলবে না। তারা যে শাস্তিযোগ্য অপরাধী সেকথা তারা বুঝতে পারবে তাদের আকৃতি দেখেই। হাসান বসরী বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে অভিযোগ প্রমাণ অথবা কোনোকিছু জানার জন্য তাদেরকে কিছুই বলা হবে না। কিছু কিছু প্রশ্ন করা হবে কেবল তাদেরকে ত্রাসিত করার জন্য, হুমকি প্রদানের জন্য।

এরপরের আয়াতে (৭৯) বলা হয়েছে— 'কারূন তার সম্প্রদায়ের সামনে উপস্থিত হয়েছিলো জাঁক-জমক সহকারে। যারা পার্থিব জীবন কামনা করতো তারা বললো, আহা! কারূনকে যা দেওয়া হয়েছে আমাদেরকে যদি তা দেওয়া হতো! প্রকৃতই সে মহাভাগ্যবান'।

ইব্রাহিম নাখয়ী বলেছেন, কারূন ও তার সম্প্রদায়ের লোকেরা পরিধান করতো লাল অথবা সবুজ রঙের পোশাক। একদিন সে তার সম্প্রদায়ের লোকের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলো মহাআড়ম্বর জাফরান রঙের পোশাক পরে। ওই সময় তার সঙ্গে ছিলো সত্তর হাজার সঙ্গী সাথী। সেদিনের ঘটনার কথাই বলা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

মুজাহিদ বলেছেন, জাফরানী রঙের রসনাচ্ছাদিত হয়ে লোহিত বর্ণের বিচিত্র গদি আঁটা ঘোড়ায় চড়ে বহু অনুরক্ত সমভিব্যাহারে উৎসবের মেজাজে সেদিন পথে নেমে এসেছিলো কারূন। মুকাতিল বলেছেন, সে প্রমোদভ্রমণে বের হতো শ্বেতখচ্চরের উপরে আরোহণ করে। খচ্চরটি সুসজ্জিত থাকতো সুবর্ণখচিত আসন দিয়ে। প্রমোদসঙ্গিনীরূপে তার সঙ্গে থাকতো তিনশত কিংকরী। তারা তার সঙ্গে সঙ্গে চলতো শ্বেতখচরে আরূঢ়া হয়ে। আর বলা বাহুল্য, তারা থাকতো সালংকারা ও সুসজ্জিতা।

বনী ইসরাইলদের বিশ্বাসবানেরাও সাধারণতঃ হতো অর্থ গৃধ্নু। কিন্তু তারা পরশ্রীকাতর ছিলোনা। তাই এখানে বলা হয়েছে 'যারা পার্থিব জীবন কামনা করতো তারা বললো, আহা! কারূনকে যা দেওয়া হয়েছে তা যদি আমাদেরকে দেওয়া হতো, প্রকৃতই সে ভাগ্যবান'। উল্লেখ্য, পরশ্রীকাতর যদি তারা হতো তবে কারূনের সম্পদ ধ্বংসের অভিলাষ প্রকাশ পেতো তাদের কথায়। এতে করে বোঝা যায় 'তারা বললো' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে বনী ইসরাইলদের কিছু সংখ্যক বিশ্বাসীকে, যারা পার্থিব প্রাচুর্য কামনা করলেও মেনে চলতো শরিয়তের বিধান। তাই তাদের কথায় শরিয়তনিষিদ্ধ পরশ্রীকাতরতা ফুটে ওঠেনি।

এর পরের আয়াতে (৮০) বলা হয়েছে— 'এবং যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিলো তারা বললো, ধিক তোমাদেরকে, যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র পুরস্কারই শ্রেয় এবং ধৈর্যশীল ছাড়া এটা কেউ পাবে না'।

এখানে 'উতুল ই'লমা' অর্থ যাদেরকে দেওয়া হয়েছে ধর্মজ্ঞান। অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ কর্তৃক সংরক্ষিত পুণ্যকর্মের বিনিময় সম্পর্কে জ্ঞাত, যে বিনিময় বা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ্ স্বয়ং। এখানে বলা হয়েছে, তারাই পার্থিব বিলাসাকাংখীদেরকে বললো, ধিক তোমাদের।

'ওয়াইলাকুম' কথাটির 'ওয়াইল' শব্দটি ধাতুমূল। এর অর্থ ধ্বংস। এখানে শব্দটি একটি অনুক্ত ক্রিয়ার সাধারণ কর্মপদ। এভাবে কথাটির মর্ম দাঁড়ায়— তোমরা নিপাত যাও, ধ্বংস হোক তোমাদের, ধিক তোমাদেরকে। অশুভ কামনাই এমতো শব্দ ব্যবহারের উদ্দেশ্য। কিন্তু এমতো সম্বোধন ব্যবহৃত হয় সাধারণতঃ অশোভন কর্ম থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে, অশুভ কিছু হয়েই যাক, এই উদ্দেশ্যে নয়। অর্থাৎ এ হচ্ছে এক ধরনের হুমকি বা সাবধানবাণী।

'ওয়া লা ইউলাক্কাহা ইল্লাস্ সবিরূন' অর্থ এবং ধৈর্যশীল ব্যতীত কেউ এটা পাবে না। অর্থাৎ আল্লাহ্প্রদত্ত পুরস্কারই যে সর্বোচ্চ ও সর্বোৎকৃষ্ট, সে কথা জানে ও মানে কেবল সহনশীলেরা। অথবা অর্থ হতে পারে এরকম— সহিষ্ণু যারা, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কেবল তাদেরকেই দেওয়া হবে পুণ্যের পুরস্কার। এখন প্রশ্ন— ধৈর্যশীলদের পরিচয় কী? এর জবাব এই যে, ধৈর্যশীল তারাই, যারা আল্লাহ্র আনুগত্যে সতত নিমগ্ন এবং যারা নিরবচ্ছিন্নরূপে মুক্ত ধনলিপ্সা ও পাপ পঙ্কিলতা থেকে।

এরপরের আয়াতে (৮১) বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভস্থ করলাম। তার সপক্ষে এমন কোনো দল ছিলোনা যে, আল্লাহ্র শাস্তির বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করতে পারতো এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিলো না'।

এখানকার 'ফিয়াতিন' শব্দটির ধাতুমূল 'ফাইউন'। এর অর্থ প্রত্যাবর্তন করা, ফিরিয়ে দেয়া। আর 'ফিয়াতুন' অর্থ ওই সাহায্যকারী, বিপদের সময় সাহায্যের আশায় যার দিকে বিপদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়। 'ইয়ানসুরূনাহু' অর্থ যে আল্লাহ্র শাস্তি প্রতিহত করতে সক্ষম। 'মিনাল মুনতাসিরীন' অর্থ সে নিজেও ভূমিধসের শাস্তি থেকে আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিলো না। 'নাসরাহু' অর্থ সে তাকে সাহায্য করেছে, আর 'ইনতাসরা' অর্থ সে সাহায্য পেয়েছে।

ইতিহাসবেত্তাগণ লিখেছেন, হজরত মুসা ও হজরত হারুনের পরে বনী ইসরাইলদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বিজ্ঞব্যক্তি ছিলো কারূন। তদুপরি সে ছিলো প্রিয়ংবদ, সুদর্শন ও বিত্তপতি। কিন্তু সে ছিলো দুর্নীতিপরায়ণ ও স্বেচ্ছাচারী। তার স্বেচ্ছাচারণ প্রবৃত্তির সূচনা ঘটেছিলো এভাবে—একবার হজরত মুসার প্রতি প্রত্যাদেশ হলো, হে আমার প্রিয় রসুল! তোমার উম্মতকে এই মর্মে নির্দেশ দাও, যেনো তারা তাদের উত্তরীয়ের চার কোণায় বেঁধে রাখে চারটি নীল রঙের সুতা। ওই নীল সুতা দেখলেই তাদের মনে পড়বে নীল আকাশের কথা, আকাশাধিপতির কথা। মনে পড়বে, আমাদের প্রতি প্রদত্ত প্রত্যাদেশসমূহ আকাশাগত। আর প্রত্যাদেশপ্রদাতা হচ্ছেন আল্লাহ্ মেহেরবান। হজরত মুসা নিবেদন জানালেন, হে আমার মহাকরুণাপরবশ প্রভুপালক'! আমাদের সম্পূর্ণ উত্তরীয় যদি নীল রঙের হয়, তাতে করে কি তোমার এই নির্দেশখানি প্রতিপালিত হবে না? বনী ইসরাইলেরা যে নীল সুতা পছন্দ করে না। আল্লাহ্ বললেন, বাহ্যত ক্ষুদ্র মনে হলেও আমার কোনো নির্দেশই তুচ্ছ নয়। তুমি তোমার লোকজনকে বলে দাও, তারা আমার ক্ষুদ্র নির্দেশ প্রতিপালনে যদি অনীহ হয়, তবে আমার বৃহৎ নির্দেশ প্রতিপালনে সক্ষম হবে কীরূপে? হজরত মুসা বনী ইসরাইল জনতাকে সমবেত করলেন, জানিয়ে দিলেন আল্লাহ্র আদেশ। এ আদেশ মেনেও নিলো সবাই।

কিন্তু কারূন মানল না। অবাধ্যতার সুরে সে বললো, মুসা আমাদেরকে ক্রীতদাস বানাতে চায়। এ নির্দেশ কার্যকর করে সে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তার প্রভূসুলভ প্রতিপত্তি। এভাবেই তো অন্যের দাস থেকে নিজের দাসকে পৃথক ভাবে চিহ্নিত করে নেয় ক্রীতদাসাধিকারীরা। কারূনের স্বেচ্ছাচারণ, আতম্ভরিতা ও অবাধ্যতার সূত্রপাত হয় এভাবেই।

এরপর তিনি একদিন বনী ইসরাইলদেরকে নিয়ে উপস্থিত হলেন সমুদ্রতীরে। সকলে মিলে সেখানে কোরবানী করাই ছিলো উদ্দেশ্য। কোরবানীর পশু রক্ষণাবেক্ষণ এবং সুচারুরূপে কোরবানী সম্পন্ন করবার দায়িত্ব ন্যস্ত হলো হজরত হারুনের উপর। তিনি অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন সুশৃঙ্খলরূপে। প্রতিটি পশুর কোরবানী শেষে আকাশ থেকে নেমে আসতে লাগলো শাদা আগুন। অত্যল্প সময়ের মধ্যে জবাই করা কোরবানীর পশু পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়ে সে আগুন উঠে যেতে লাগলো আকাশে। হজরত হারুনের এমতো সুশৃঙ্খল দায়িত্ব পালন দৃষ্টে কারূনের শুরু হলো গাত্রদাহ। হিংসায় জ্বলতে লাগলো সে। হজরত মুসার কাছে গিয়ে বললো, তুমি না হয় রেসালাতের দায়িত্ব পেয়ে আত্মপ্রসাদে মজে আছো। কিন্তু তুমি হারুনকে কোরবানী বিভাগের অধিনায়কত্ব দিতে গেলে কেনো? ওই দায়িত্ব তো আমিও পেতে পারি। পারি না? তুমি তো জানোই আমি তওরাত বোদ্ধা। হজরত মুসা বললেন, তুমি ভুল বুঝেছো। আমি নই, এ দায়িত্ব তাঁকে অর্পণ করেছেন আল্লাহ্ স্বয়ং। কারূন বললো, বিনা প্রমাণে তোমার এ কথা আমি মানি কী করে? হজরত মুসা জনতাকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা প্রত্যেকে একটি করে লাঠি নিয়ে আমার কাছে এসো। একটু পরে সবাই একটি করে লাঠি নিয়ে হাজির হলো। তিনি বললেন, সামনের ওই তাঁবুর পাশে সবাই নিজ নিজ লাঠি পুঁতে দাও। সবাই নির্দেশ পালন করলো। পরদিন সকালে দেখা গেলো, হজরত হারুন যে লাঠিটি পুঁতে ছিলেন, সেটি পরিণত হয়েছে একটি সবুজ কিশলয়বিশিষ্ট বৃক্ষে। কারূন বললো, ওহে মুসা! এটা কী কোনো প্রমাণ হলো? তুমি তো এর চেয়ে অনেক বিস্ময়কর অলৌকিকত্ব ইতোমধ্যে প্রকাশ করেছো। এই ঘটনার পর থেকেই কারূন হজরত মুসাকে এড়িয়ে চলতে লাগলো। হজরত মুসা তবুও তার সঙ্গে সৌজন্যমূলক আচরণ করতেন। কিন্তু সে তাঁর সঙ্গে করতো দুর্বিনীত ব্যবহার। ক্রমে ক্রমে ধন সম্পদ বৃদ্ধি পেতে লাগলো কারূনের । সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো তার উন্নাসিকতা ও অহমিকা। এক সময় সে ছিন্ন করলো হজরত মুসার সঙ্গে সকল প্রকার সম্পর্ক। নির্মাণ করলো একটি বিশাল ও সুদৃশ্য প্রাসাদ। প্রাসাদের প্রধান তোরণ ছিলো স্বর্ণমণ্ডিত। আর তার প্রাচীর প্রাকারগুলো ছিলো সুবর্ণ রঙের। বনী ইসরাইলের নেতৃবর্গের অনেকেই সকাল সন্ধ্যায় যাতায়াত করতে লাগলো তার প্রাসাদে। ওই প্রাসাদাভ্যন্তরে তারা মেতে

থাকতো ক্রীড়া-কৌতুক ও রঙ্গ-রসে। কারূন তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে আপ্যায়ন করতো। এভাবেই কেটে যাচ্ছিলো তাদের হরষিত দিবস এবং আনন্দোন্মত্ত রজনী।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত মুসা প্রত্যাদিষ্ট হলেন, জাকাত আদায় করো। তিনি এ নির্দেশ জানিয়ে দিলেন সকলকে। বললেন, সঞ্চিত সম্পদের জাকাত দিতে হবে এভাবে— প্রতি হাজার দিরহামে এক দিরহাম, প্রতি হাজার ছাগলে একটি ছাগল, অন্যান্য সম্পদের বেলায়ও প্রযোজ্য হবে একই নিয়ম, অর্থাৎ হাজার ভাগের এক ভাগ। কারূন হিসেব কষে দেখলো, এভাবে জাকাত দিলে তার অনেক সম্পদ বেরিয়ে যাবে। কিন্তু কী করবে সে ভেবে পেলো না। শেষে শুরু করলো ষড়যন্ত্র। বনী ইসরাইলদের নেতাদেরকে ডেকে বললো, দ্যাখো, মুসা এবার জাকাতের নাম করে তোমাদের ধন-সম্পদ হাতিয়ে নিতে চায়। এর একটি বিহিত করা যে জরুরী। নেতারা বললো, আপনি তো শ্রেষ্ঠ সম্পদপতি। আপনিই বলুন, কী করতে পারি আমরা। কারূন বললো, অমুক বারবণিতা তো রূপসী ও খ্যাতিবতী। তাকেই ডেকে আনো। সে বলবে, মুসা তার সঙ্গে গোপন সম্পর্ক রাখে। এর জন্য আমি অবশ্য তাকে মোটা দাগে অর্থ প্রদান করবো। এভাবে মুসাকে অপবাদগ্রস্ত করতে পারলে মানুষ তাকে পরিত্যাগ করবে। আমাদের উদ্দেশ্যও হবে সফল। রূপসী বারবণিতাটিকে ডেকে আনা হলো। কারূন তাকে বুঝিয়ে দিলো কী করতে হবে। তারপর বললো, এ কাজ করতে পারলে তোমাকে দান করবো এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা। কেউ কেউ বলেছেন, কারূন তাকে উপহার দিয়েছিলো একটি বৃহৎ স্বর্ণখণ্ড। আবার কেউ কেউ বলেছেন, কারূন তাকে বলেছিলো, এ কাজ করে দিতে পারলে তোমাকে আমি করে দিবো বিত্তশালিনী। আমার সহধর্মিনীরূপেও গ্রহণ করবো তোমাকে। এরপর কারূন পরদিন প্রাতে বনীইসরাইল জনতাকে একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে সমবেত হতে বললো। জানিয়ে দিলো, কাল সকালের সমাবেশে আমাদের নবী মুসা তোমাদেরকে হিতোপদেশ দান করবেন। হজরত মুসাকে বললো, তোমার হিতোপদেশ শুনবার জন্য কাল সকালে আমরা সমবেত হবো। যথাসময়ে তোমার সদয় উপস্থিতি আমাদের কাম্য। আর বারবণিতাকে বললো, তুমি ওই সমাবেশে প্রকাশ করে দিয়ো, মুসা তোমার গোপন প্রণয়ী।

পরদিন সকাল বেলা অপেক্ষমান জনতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে হজরত মুসা ভাষণ দিলেন, শোনো হে জনতা! অন্যায়াচরণ থেকে বিরত থেকো। যে চুরি করবে আমি তার হস্তচ্ছেদন করবো। যে কারো প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দিবে, তাকে করবো বেত্রাঘাত। অবিবাহিত ব্যভিচারী-ব্যভিচারীর শাস্তিও বেত্রাঘাত। আর বিবাহিত ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর শাস্তি সঙ্গেসার। তাদেরকে গলা পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে

প্রস্তরবর্ষণের মাধ্যমে হত্যা করা হবে। কারূন এবার মুখ খুললো। বললো, হে মুসা! এ বিধান কি সকলের জন্য? হজরত মুসা বললেন, অবশ্যই। কারূন বললো, তুমি যদি কোনো অপরাধ করো? হজরত মুসা বললেন, তাহলে দণ্ডাদেশ কার্যকর হবে আমার উপরেও। কারূন বললো, তবে লোকে যে বলে, তুমি অমুক রূপোপজীবিনীর গোপন প্রণয়ী। হজরত মুসা বললেন, সে একথা সর্বসমক্ষে বলতে পারবে? কারূন বললো, নিশ্চয়। একথা বলেই সে ঐ রূপোপজীবিনীকে সামনে এগিয়ে আসতে বললো। হজরত মুসা মনে মনে আল্লাহ্র একান্ত সাহায্য কামনা করলেন। মনে মনে প্রার্থনা জানালেন, হে আমার পরম প্রভুপালক! তুমি তোমার যে রসুলের অনুসারীদের পরিত্রাণের নিমিত্তে সমুদ্রের উত্তাল জলরাশির মধ্যে করে দিয়েছিলে শুষ্কপথ, যে রসুলকে তুমি তওরাত দান করে করেছো মর্যাদায়িত, তোমার সেই প্রিয় রসুল আজ অপবাদগ্রস্ত। তুমি প্রকৃত সত্য সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে দিয়ে তাকে অপবাদমুক্ত করো। প্রকাশ্যে বললেন, ঠিক আছে, ওই মেয়েটি যা বলবে, আমি তা-ই মেনে নিবো। অপরাধী যদি প্রমাণিত হই, তবে শাস্তিও নিবো মাথা পেতে। মেয়েটি শ্রোতাদের সম্মুখীন হলো। মুহূর্তমধ্যে বদলে গেলো তার মনোভাব। ভাবলো, আল্লাহ্র রসুলকে অপবাদ দেওয়ার মতো মহাপাপ আমি করি কী করে? তার চেয়ে তওবাই যে আমার জন্য সহজ। প্রকাশ্যে বললো, হে জনতা! কারূন যা আপনাদেরকে বলেছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি ভ্রষ্টা হতে পারি, কিন্তু আল্লাহ্র রসুলকে অপবাদ দিবার মতো পাপ কিছুতেই করতে পারি না। প্রকৃত কথা শোনো, কারূন আমাকে সম্পদের লোভ দেখিয়ে আমাদের প্রিয় রসুলের চরিত্র হননের ব্যাপারে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। আমাদের রসুল নিষ্পাপ। আর আমি পাপীয়সী। আর ততোধিক পাপিষ্ঠ কারূন।

হজরত মুসা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সঙ্গে সঙ্গে সেজদাবনত হলেন। সেজদারত অবস্থাতেই প্রার্থনা জানালেন, হে আমার আল্লাহ্! আমি তো তোমার বার্তাবাহক! তোমার বার্তাবাহকের সম্মান রক্ষার্থে কারূনের উপরে আপতিত করো মহাশাস্তি। প্রত্যাদেশ হলো, হে আমার প্রিয় রসুল। মৃত্তিকাকে করা হলো তোমার নির্দেশানুগত। এখন তুমি তাকে যে হুকুম করবে, সে তা তৎক্ষণাৎ প্রতিপালন করবে।

হজরত মুসা জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, আমাকে যেমন প্রেরণ করা হয়েছিলো ফেরাউনের নিকটে, তেমনি প্রেরণ করা হয়েছে কারূনের নিকটেও। কিন্তু সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সুতরাং তোমরাও তাকে প্রত্যাখ্যান করো। চলে এসো আমার সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে সকলে পক্ষ অবলম্বন করলো হজরত মুসার। কারূনের পক্ষে রয়ে গেলো কেবল তার অন্তরঙ্গ দু'জন সঙ্গী। হজরত মুসা আদেশ করলেন, হে মৃত্তিকা! কারূনকে গ্রাস করো। সঙ্গে সঙ্গে মাটি গ্রাস করলো তার দুই

পা। তার সঙ্গীদ্বয়ের পা-ও দেবে গেলো মাটিতে। হজরত মুসা পুনঃ নির্দেশ দিলেন, গ্রাস করো। মাটি এবার গ্রাস করলো তাদের কটিদেশ পর্যন্ত। হজরত মুসা পুনরায় বললেন, গ্রাস করো। এবার তাদের কণ্ঠদেশ পর্যন্ত প্রোথিত হলো মৃত্তিকায়। অপরাধীত্রয় অনেক কাকুতি মিনতি করলো। আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে কামনা করলো পরিত্রাণ। কিন্তু রোষতপ্ত নবী তখন নির্মম। তাই কারূনের সত্তরবার ক্ষমাপ্রার্থনাও তাঁর কর্ণকুহরে প্রবেশ করলো না। তাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করলেন না তিনি। পুনঃনির্দেশ দিলেন, আরো গ্রাস করো। এবার মৃত্তিকাভ্যন্তরে চিরদিনের জন্য আড়াল হয়ে গেলো অপরাধীরা।

ক্রমে ক্রমে অপসৃত হলো রসুল মুসার রোষ। আল্লাহ্তায়ালা বললেন, হে আমার রসুল! এমন নির্মম কেনো তুমি। সত্তরবার তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করলো তোমার কাছে। কিন্তু তুমি সে দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র করলে না। আমার মর্যাদা ও মহত্বের কসম! আমি তো একবারের ক্ষমাপ্রার্থনাকেই গ্রহণ করতাম। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্তায়ালা তখন বলেছিলেন, ভবিষ্যতে আমি আর কখনো মৃত্তিকাকে কারো অধীন করে দিবো না। হজরত কাতাদা বলেছেন, এখনো কারূনকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে চলেছে মৃত্তিকা। মহাপ্রলয় পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকবে তার অতল যাত্রা।

কারূন ও তার সঙ্গীদ্বয়ের এভাবে তলিয়ে যাওয়ার পর কেউ কেউ বলতে শুরু করলো, কারূনের প্রাসাদ, ধনভাণ্ডার সবকিছুই তো রয়ে গেলো। এগুলো আবার আত্মসাৎ করা হবে না তো। হজরত মুসার কানে গেলো এসব কথা। তিনি তৎক্ষণাৎ মাটিকে হুকুম করলেন, এই মুহূর্তে গ্রাস করো কারূনের প্রাসাদ, ধনভাণ্ডার ও তার সকল স্মৃতিচিহ্ন। আল্লাহ্র রসুলের নির্দেশের অন্যথা হলো না। মাটি এবার গ্রাস করে ফেললো কারূনের প্রাসাদ, ধনভাণ্ডার, সবকিছু। সে কথাই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে এভাবে— অতঃপর আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভস্থ করলাম'। অর্থাৎ আমি আমার রসুলের নির্দেশের মাধ্যমে মাটির মধ্যে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিলাম কারূনকে ও তার প্রাসাদ-ধনভাণ্ডার সবকিছুকে।

এরপরের আয়াতে (৮২) বলা হয়েছে— 'পূর্ব দিন যারা তার মতো হবার কামনা করেছিলো, তারা বলতে লাগলো, দ্যাখো, আল্লাহ্ তাঁর দাসদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করেন'। এখানে 'মা কানাহু' অর্থ গতকাল পর্যন্ত যারা কারূনের মতো সম্পদপতি হবার আকাংখা করেছিলো। অথবা এরকম যারা কামনা করেছিলো কিয়ৎকাল পূর্বেই। আর 'ওয়াইকাআন্না' 'ওয়াই' ও 'কাআন্না' সহযোগে গঠিত একটি যৌগিক শব্দ। এর অর্থ 'দ্যাখো'। এটি একটি বিস্ময়প্রকাশক পদ। আর 'কাআন্না' হচ্ছে এর উপমান।

'আল্লাহু ইয়াব্‌সুত্বুর রিয্‌ক্বা' অর্থ আল্লাহ্‌ই সকলের জীবনোপকরণের প্রসারক ও সংকোচক। রিজিকের প্রসরণ ও সংকোচন দু'টোই তাঁর অভিপ্রায়, অধিকার ও ক্ষমতাভূত। এর মধ্যে অন্য কারো অথবা কোনোকিছুর অংশগ্রহণের অবকাশ মাত্রই নেই। তার একথাটিও প্রণিধাননীয় যে, জীবনোপকরণের প্রাচুর্য তাঁর নিকটে সম্মানার্হ কিছু নয়। আবার জীবনোপকরণের স্বল্পতাও তাঁর নিকটে নয় নিন্দার্হ। খলিল বলেছেন, এখানে 'ওয়াই' শব্দটি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য। শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে বিস্ময় ও হীনতা প্রকাশার্থে। অর্থাৎ ক্ষণকাল পূর্বে কারূনের মতো সম্পদপতি হওয়ার কামনা করতো যারা, তারাই আবার আত্মধিক্কারের সুরে বলতে লাগলো, দ্যাখো, দ্যাখো (আমরা যা কামনা করতাম তা কতো ধিকৃত)। কুতরব বলেছেন, এখানকার 'ওয়াইকা' পদটির মূল রূপ ছিলো 'ওয়াইলাকা'। পরে এর 'লাম' অক্ষরটি হয়েছে অবলুপ্ত। অবশ্য দু'টো শব্দই সমঅর্থসম্পন্ন।

'আন্‌নাল্লাহা' কথাটি সুনিশ্চিতার্থক। এখানকার 'আন্‌না' একটি উহ্য ক্রিয়ার কর্মপদ। এভাবে ব্যাখ্যা করলে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আরো, জেনে রাখো, আল্লাহ্‌ই যাকে চান তার জন্য জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'ওয়াই কা আন্‌না' একটি সম্পূর্ণ বাক্য। বাক্যটি ব্যবহৃত হয় সতর্ক করণার্থে। হাসান বলেছেন, 'ওয়াইকা' কথাটি এখানে প্রারম্ভিকা। মুজাহিদ এর অর্থ করেছেন— তুমি কি জানো না? হজরত কাতাদা অর্থ করেছেন— তুমি কি দ্যাখোনি? ফাররা বলেছেন, কথাটি দৃঢ়তা প্রকাশক। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'তুমি কি আল্লাহ্‌র সদাশয়তা ও অনুগ্রহ লক্ষ্য করোনি? অর্থাৎ অবশ্যই তো তুমি এরূপ করেছো। ফাররা আরো বলেছেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, এক বেদুইন রমণী তার স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বললো, ছেলেটি কোথায়? তার স্বামী জবাব দিলো, 'ওয়াইকা আন্‌নাহু ওয়ারাআল বাইত' (তুমি কি দ্যাখোনি, সে তো রয়েছে গৃহের পশ্চাতেই)।

এরপর বলা হয়েছে— 'যদি আল্লাহ্‌ আমাদের প্রতি সদয় না হতেন, তবে আমাদেরকেও তিনি ভূগর্ভস্থ করতেন। দ্যাখো, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা সফলকাম হয় না'। একথার অর্থ— সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। তিনি আমাদের প্রতি সদয় না হলে আমরাও হয়ে যেতাম কারূনের মতো ভূপ্রোথিত। দ্যাখো, একথা প্রমাণিত সত্য যে, আল্লাহ্‌, আল্লাহ্‌র রসুল এবং পরকালে বিশ্বাসী যারা নয়, তারাই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা দুনিয়া-আখেরাত কোনো স্থানেই সফলকাম হয় না। উল্লেখ্য, এখানে কেবল উপমা ব্যতীত পূর্বের বাক্যের 'ওয়াইকাআন্‌নাহু' কথাটির সকল ব্যাখ্যা সমভাবে গ্রাহ্য।

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي
الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۸۳﴾ مَنْ جَآءَ
بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى
الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۸۴﴾ اِنَّ الَّذِىْ
فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ؕ قُلْ رَّبِّىْٓ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ
بِالْهُدٰى وَمَنْ هُوَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۸۵﴾ وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْٓا اَنْ
يُّلْقٰٓى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا
لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿۸۶﴾ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ
اِلَيْكَ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۸۷﴾ وَلَا
تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۘ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۣ كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ اِلَّا
وَجْهَهٗ ؕ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۸۸﴾

r ইহা পরলোক— যাহা আমি নির্ধারিত করি তাহাদিগেরই জন্য যাহারা এই পৃথিবীতে উদ্ধত হইতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে চাহে না। শুভ পরিণাম সাবধানীদিগের জন্য।

r যে কেহ সৎকর্ম করে সে তাহার কর্ম অপেক্ষা অধিক ফল পাইবে আর যে মন্দকর্ম করে সে তো শাস্তি পাইবে কেবল তাহার কর্মের অনুপাতে।

r যিনি তোমার জন্য কুরআনকে করিয়াছেন বিধান তিনি তোমাকে অবশ্যই ফিরাইয়া আনিবেন স্বদেশে। বল, 'আমার প্রতিপালক ভাল জানেন কে সৎপথের নির্দেশ আনিয়াছে এবং কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।'

r তুমি আশা কর নাই যে, তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হইবে। ইহা তো কেবল তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। সুতরাং তুমি কখনও সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদিগের সহায় হইও না।

r তোমার প্রতি আল্লাহের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর উহা যেন তোমাকে কিছুতেই সেগুলি হইতে বিমুখ না করে। তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর এবং কিছুতেই অংশীবাদীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

r তুমি আল্লাহের সহিত অন্য ইলাহ্কে ডাকিও না, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। আল্লাহের সত্তা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তাঁহারই এবং তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— পারলৌকিক সাফল্য আমি নির্ধারণ করে রেখেছি তাদের জন্য, যারা পৃথিবীতে উদ্ধত আচরণ করে না এবং সৃষ্টি করতে চায় না কোনো বিপর্যয়ের। আর পারত্রিক শুভ পরিণাম কেবল সংযমী ও সাবধানীগণের জন্য।

এখানে 'তিলকাদ্দারুল আখিরাত' অর্থ— এই সেই পারলৌকিক নিরুপদ্রব আবাস, যার কথা তোমরা শুনেছো তার প্রেরিত পুরুষগণের জবানীতে। 'উলুওওয়ান ফীল আরদ্ব' অর্থ যারা এই পৃথিবীতে উদ্ধত আচরণ করে না। মুকাতিল ও কালাবী কথাটির অর্থ করেছেন— যারা পৃথিবীতে প্রদর্শন করে না হঠকারিতা ও আত্মম্ভরিতা। আতা অর্থ করেছেন— যারা জনগণের উপরে চালায় না নিপীড়ন ও নির্যাতন। মানুষের প্রতি যারা প্রদর্শন করে না তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যভাব। হাসান অর্থ করেছেন— যারা যাচ্না করে না প্রশাসক ও সমাজপতিদের অনুকম্পা। হজরত আলী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্য ওই সকল প্রশাসক, যারা রাষ্ট্রের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হওয়া সত্ত্বেও প্রদর্শন করে বিনয়। অর্থাৎ এরকম বিনয়-নম্র নেতৃবর্গই বিরত থাকে উদ্ধত আচরণ প্রদর্শন থেকে।

'ওয়াল ফাসাদা' অর্থ বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। কালাবী বলেছেন, 'ফাসাদ' অর্থ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো অথবা অন্য কোনো কিছুর উপাসনার প্রতি আহ্বান জানানো। ইকরামা বলেছেন, অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ হস্তগত করার নাম ফাসাদ। ইবনে জুরাইজ ও মুকাতিল বলেছেন, 'ফাসাদ' অর্থ পাপ।

'আলআক্বিবাতু' অর্থ শুভপরিণাম। হজরত কাতাদা বলেছেন, শব্দটির অর্থ— জান্নাত। আমি বলি, পুণ্যকর্মের পরিণামের নাম 'আক্বিবাত'। আর পাপকর্মের প্রতিফলকে বলে 'ইক্বাব'।

পরের আয়াতে (৮৪) বলা হয়েছে— 'যে কেউ সৎকর্ম করে সে তার কর্ম অপেক্ষা অধিক ফল পাবে, আর যে মন্দকর্ম করে সে তো শাস্তি পাবে কেবল তার কর্মের অনুপাতে'। এখানে, 'সে তার কর্ম অপেক্ষা অধিক ফল পাবে, অর্থ সে পুণ্য লাভ করবে তার সৎকর্মের দশগুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাকে এরও বেশী পুণ্য প্রদান করতে পারেন।

উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে 'হাসানা' (সৎকর্ম) শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে একবার। আর 'সাইয়্যেআহ্' (মন্দকর্ম) উল্লেখিত হয়েছে দু'বার, যদিও শব্দটি একবার উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হতো। এরকম করার কারণ এই যে, মন্দকর্ম থেকে বিরত থাকার বিষয়টি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া মন্দ কর্মের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই শব্দটি এখানে পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা হয়ে থাকতে পারে।

এরপরের আয়াতে (৮৫) বলা হয়েছে— 'যিনি তোমার জন্য কোরআনকে করেছেন বিধান, তিনি তোমাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনবেন স্বদেশে'।

এখানে 'ফারাদ্বা আ'লাইকাল কুরআন' অর্থ যিনি আপনার উপরে অবতীর্ণ করেছেন কোরআন। অধিকাংশ তাফসীরবেত্তার অভিমত এরকমই। এরকম মন্তব্য করেছেন বাগবী। আর আতা বলেছেন, কথাটির মর্মার্থ হবে— যিনি আপনার উপরে অনিবার্য করেছেন কোরআনের আবৃত্তি, প্রচার ও এর বিধানানুসারে আমল।

'ইলা মাআ'দিন' অর্থ স্বদেশ, মক্কাধাম। এখানকার 'তিনি তোমাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনবেন' কথাটির মধ্যে রয়েছে মক্কাবিজয়ের অঙ্গীকার। বলা বাহুল্য, যথাসময়ে মক্কাবিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রিয় রসুলকে দিয়েছিলেন মক্কার সর্বময় কর্তৃত্ব। হজরত ইবনে আব্বাস এরকমই মন্তব্য করেছেন। আউফি এবং মুজাহিদও এরকম বলেছেন। আর কুতাইবি বলেছেন, স্ব স্ব আবাসে সকলেই ফিরে ফিরে আসে। কিন্তু এখানে প্রত্যাবর্তনের কথা বলা হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ রসুলের। তাই তাঁর সম্মানে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে 'তানভীন'। বলা হয়েছে 'মাআ'দিন'।

বাগবী লিখেছেন, রসুল স. রাতের অন্ধকারে অতি সঙ্গোপনে যাত্রা করলেন মদীনা অভিমুখে। পেছনে হননমত্ত শত্রুর দল। তাই তাঁকে গ্রহণ করতে হলো অপ্রচলিত পথ। কয়েক দিন পর শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনাশংকা যখন দূর হলো তখন তিনি উপস্থিত হলেন প্রচলিত পথে। ওই স্থানের নাম ছিলো জুহফা। সেখান থেকে দু'টি পথ মিশে গিয়েছে দুই দিগন্তে। একটি মক্কার দিকে। আর একটি মদীনার দিকে। রসুল স. মক্কার পথের দিকে দৃষ্টিপাত করে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন। জন্মভূমির বিচ্ছেদে মুচড়ে উঠলো তার হৃদয়। হজরত জিবরাইল আবির্ভূত হয়ে বললেন, ভ্রাতঃ মোহাম্মদ! আপনি কি জন্মভূমির জন্য আবেগাহত? রসুল স. বললেন, হ্যাঁ। হজরত জিবরাইল বললেন, আল্লাহ্পাক বলেছেন 'যিনি আপনার জন্য কোরআনকে করেছেন বিধান তিনি আপনাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনবেন স্বদেশে'।

সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'মাআ'দ' অর্থ মৃত্যু। আমি বলি, মৃত্যু অর্থ প্রকৃত অবস্থার দিকে ফিরে যাওয়া। সে

কারণে 'মাআ'দ'ই মৃত্যু। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— তোমরা তো ছিলে মৃত, তারপর তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করেছেন। অতঃপর তিনি পুনর্বার ফিরিয়ে দিবেন মৃত্যুর দিকে'।

জুহুরী ও ইকরামা বলেছেন, 'মাআ'দ' অর্থ মহাবিচারের দিবস। কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটির অর্থ জান্নাত। কেননা ইতোপূর্বে বলা হয়েছে 'শুভ পরিণাম সাবধানীদের জন্য'। তারপর বলা হয়েছে সৎকর্মের অধিক প্রতিদান এবং মন্দকর্মের সমানুপাতিক প্রতিফল প্রদানের কথা। তারপর এখানে বলা হলো রসুল স. এর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের কথা, যে চিরস্থায়ী স্বদেশে তাঁর জন্য অপেক্ষমান অফুরন্ত সম্মান, অপরিমেয় ভালোবাসা ও জান্নাত।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলো, আমার প্রতিপালক ভালো জানেন কে সৎপথের নির্দেশ এনেছে এবং কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে'। আলোচ্য বাক্য অবতীর্ণ হয়েছে মক্কার অংশীবাদীদের অপমন্তব্যের যথাউত্তর প্রদানার্থে। তারা বলেছিলো, মোহাম্মদ! তুমি তো জলজ্যান্ত বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছো। তাদের ওই জঘন্য উক্তির প্রতিবাদে আল্লাহ্তায়ালা জানালেন— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন, আমার প্রভুপ্রতিপালক ভালো জানেন কে সৎপথের নির্দেশ এনেছে, এবং কে বিভ্রান্তিতে আছে। অবশেষে কে হবে পুরস্কৃত এবং তিরস্কৃতই বা হবে কে? এখানে পুরস্কৃত ও তিরস্কৃত যে কে এবং কারা, তা বলাই বাহুল্য।

এরপরের আয়াতে (৮৬) বলা হয়েছে— 'তুমি আশা করোনি যে, তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। এতো কেবল তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ'। ফাররা বলেছেন, এখানকার 'ইললা'ব্যতিক্রমী অব্যয়টি বিকর্তিত এবং এর অর্থ হবে এখানে 'লাকিন্না' (কিন্তু)। এমতাবস্থায় উদ্ধৃত বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে— আপনার উপরে কিতাব অবতীর্ণ হবে, এমতো আশা তো আপনি করেননি, কিন্তু আপনার প্রভুপালকই কৃপা করে আপনাকে দিয়েছেন আল কোরআন। আবার ব্যতিক্রমী অব্যয়টি এখানে বিযুক্তও হয়ে থাকতে পারে। যদি তাই হয় তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আপনার প্রভুপালনকর্তা কোনোকিছুকে উপলক্ষ্য করে আপনাকে কোরআন দান করেননি, দান করেছেন নিতান্ত করুণাপরবশ হয়ে।

মুকাতিল বলেছেন, একবার অংশীবাদীরা রসুল স.কে তাঁর পিতৃপুরুষগণের ধর্মে ফিরে যাবার আহ্বান জানালো। তাদের ওই গর্হিত আহ্বানের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্পাক অবতীর্ণ করলেন পরবর্তী আয়াতদ্বয়।

বললেন, 'তোমার প্রতি আল্লাহ্র আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তারা যেনো তোমাকে কিছুতেই সেগুলি থেকে বিমুখ না করে। তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করো, এবং কিছুতেই অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না (৮৭)। তুমি

আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য ইলাহ্কে ডেকো না, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্ নেই। আল্লাহ্র সত্তা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তাঁরই এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে (৮৮)।

এখানে 'আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য ইলাহ্কে ডেকো না' অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদীদের অপঅভিলাষ চিরতরে নস্যাত করে দিন। 'আল্লাহ্র সত্তা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল' কথাটির অর্থ— আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সবাই ও সকলকিছু সম্ভাব্য জগতের বলয়ভূত। আর সম্ভাব্য জগত সত্তাগতভাবে অস্তিত্বায়িত নয়। বরং তা অনস্তিত্বনির্ভর। এ জগতকে আল্লাহ্পাকই দয়া করে অস্তিত্বায়িত করেছেন। নিতান্ত অনুকম্পাপরবশ হয়ে অনস্তিত্বের অন্ধকারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন অস্তিত্বের আলো। কেউ কেউ কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আল্লাহ্র পরিতোষ সাধন যে কর্মের উদ্দেশ্য হবে না, সে কর্ম হবে অবশ্যই ধ্বংসাত্বক, নিষ্ফল। এভাবে কথাটি হয়েছে পূর্ববর্তী বাক্য 'তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই' এর উপলক্ষ। 'বিধান তাঁরই, অর্থ সমগ্র বিশ্বজগতে কেবল তাঁরই বিধান প্রচলনযোগ্য ও কার্যকর। কেননা তিনিই একমাত্র ও একচ্ছত্র বিধানদাতা। আর 'তার নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে' অর্থ তোমাদের অবশেষ গমন তাঁরই সকাশে। আর তিনিই তোমাদের জন্য তখন নির্ধারণ করবেন চিরস্বস্তি অথবা চিরশাস্তি।

সূরা আন্কাবুত

৭ রুকু এবং ৬৯ আয়াত সম্বলিত সুরা আন্কাবুত অবতীর্ণ হয় মক্কায়। কিন্তু প্রথম থেকে ১১ সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ হয় মদীনায়। শা'বীর মতে মদীনায় অবতীর্ণ হয় প্রথম দশ আয়াত। এ সুরার অবতরণ শুরু হয় সুরা রূমের পরে।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, শা'বী বলেছেন, রসুল স. মদীনায় হিজরত করলেন। তারপর মক্কায় অবস্থানরত মুসলমানদের কাছে এই মর্মে সংবাদ পাঠালেন যে, যতক্ষণ তোমরা হিজরত করে মদীনায় চলে না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের ইসলাম গ্রহণ স্বীকৃত হবে না। এ সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মক্কার মুসলমানেরা মদীনাভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন। বিধর্মীরা সৃষ্টি করলো বাধা। তারা মদীনাভিমুখী বিশ্বাসীগণকে জোর করে ধরে নিয়ে এলো মক্কায়। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াতসমূহ।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ
الٓمّٓ ﴿۱﴾ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنۡ يُّتۡرَكُوۡۤا اَنۡ يَّقُوۡلُوۡۤا اٰمَنَّا وَهُمۡ لَا يُفۡتَنُوۡنَ ﴿۲﴾ وَلَقَدۡ فَتَنَّا الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ فَلَيَعۡلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيۡنَ صَدَقُوۡا وَ لَيَعۡلَمَنَّ الۡكٰذِبِيۡنَ ﴿۳﴾ اَمۡ حَسِبَ الَّذِيۡنَ يَعۡمَلُوۡنَ السَّيِّاٰتِ اَنۡ يَّسۡبِقُوۡنَا ؕ سَآءَ مَا يَحۡكُمُوۡنَ ﴿۴﴾ مَنۡ كَانَ يَرۡجُوۡا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ؕ وَهُوَ السَّمِيۡعُ الۡعَلِيۡمُ ﴿۵﴾ وَمَنۡ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفۡسِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ عَنِ الۡعٰلَمِيۡنَ ﴿۶﴾ وَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنۡهُمۡ سَيِّاٰتِهِمۡ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ اَحۡسَنَ الَّذِىۡ كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ ﴿۷﴾

q আলিফ্, লাম্, মীম্;

q মানুষ কি মনে করে যে, উহারা ‘আমরা বিশ্বাস করি’ এই কথা বলে বলিয়াই উহাদিগকে পরীক্ষা না করিয়া অব্যাহতি দেওয়া হইবে?

q আল্লাহ্ তো ইহাদিগের পূর্ববর্তীদিগকেও পরীক্ষা করিয়াছিলেন; আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করিয়া দিবেন কাহারা সত্যবাদী ও কাহারা মিথ্যাবাদী।

q যাহারা মন্দকর্ম করে তাহারা মনে করে যে, তাহারা আমার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে? তাহাদিগের সিদ্ধান্ত কত মন্দ!

q যে আল্লাহের সহিত সাক্ষাৎকার কামনা করে সে জানিয়া রাখুক আল্লাহের নির্ধারিত কাল আসিবেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

q যে কেহ সংগ্রাম করে সে তো নিজের জন্যই সংগ্রাম করে; আল্লাহ্ বিশ্ব-জগতের উপর নির্ভরশীল নহেন।

q এবং যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আমি নিশ্চয়ই তাহাদিগের মন্দকর্মগুলি মিটাইয়া দিব এবং তাহাদিগের কর্মের উত্তম ফল দান করিব।

প্রথমে বলা হয়েছে— আলিফ লাম মীম। দৃশ্যতঃ অবিন্যস্ত এই অক্ষরবিন্যাসের মর্ম রহস্যাচ্ছন্ন। আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলই এগুলোর মর্ম উত্তমরূপে অবগত। আর অবগত অল্প কিছুসংখ্যক সৌভাগ্যবান, যারা জ্ঞানে সুগভীর (ওলামায়ে রসিখীন)।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'মানুষ কি মনে করে যে, তারা 'আমরা বিশ্বাস করি' এই কথা উচ্চারণ করে বলে তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেওয়া হবে?' মদীনাবাসী সাহাবীগণ এই আয়াত লিখে পাঠিয়ে দিলেন মক্কাবাসী সাহাবীগণের নিকটে। তাঁরা সচকিত হলেন। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলেন, এবার আমাদেরকে অবশ্যই হিজরত করতে হবে। মুশরিকেরা বাধা দিলে আমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো। এই সিদ্ধান্তের পর সকলে একযোগে যাত্রা করলেন মদীনার দিকে। মুশরিকেরা তাঁদের পথরোধ করে দাঁড়ালো। শুরু হলো সংঘর্ষ। কেউ কেউ শহীদ হলেন। অবশিষ্ট মদীনাযাত্রীকে ফিরে আসতে বাধ্য করা হলো মক্কায়। তাঁদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হলো— এরপর সুনিশ্চিত আপনার পালনকর্তা তাদের সাথে যারা পরীক্ষিত হওয়ার পর হিজরত করেছিলো .....।

কাতাদা সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কাবাসী কিছুসংখ্যক মুসলমানকে উপলক্ষ করে, যাঁরা রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হওয়ার মানসে যাত্রা করেছিলেন মদীনাভিমুখে। যাত্রার শুরুতেই বাধাগ্রস্ত হয়েছিলেন তাঁরা । কেউ কেউ হয়েছিলেন শহীদ। অন্যরা বাধ্য হয়ে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন মক্কায়। তাঁদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হলো নতুন আয়াত। সে আয়াত মদীনা থেকে লিখে পাঠানো হলো মক্কায়। ফলে পুনরায় তাঁরা যাত্রা করলেন মদীনার দিকে। মুশরিকেরা তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করলো। শুরু হলো যুদ্ধ। মদীনাযাত্রীদের কেউ কেউ শাহাদত বরণ করলেন। অবশিষ্টরা কোনোক্রমে পৌঁছতে সমর্থ হলেন মদীনায়। তাঁদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হলো— 'যারা আমার নিকট পৌঁছতে চেষ্টা করে, আমি তাদেরকে প্রদর্শন করি সুপথ'।

হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'মানুষ' অর্থ রসুল স. এর হিজরতের পরে মক্কায় অবস্থানকারী মুসলমানগণ। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হজরত সালমা ইবনে হিশাম, হজরত আইয়াম ইবনে রবীয়া, হজরত ওলীদ ইবনে ওলীদ, হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসার প্রমুখ।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমাইর সূত্রে ইবনে সাঈদ, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসার সম্পর্কে। আল্লাহ্র পথে তাঁকে অপরিসীম দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিলো। ইবনে জুরাইজ সূত্রে বাগবীও এরকম বর্ণনা করেছেন। মুকাতিল

বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত মাহজা ইবনে আবদুল্লাহ্‌কে লক্ষ্য করে। উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে তিনিই ওই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, যাকে জান্নাতের দ্বারদেশে আহ্বান করা হবে সর্বপ্রথমে।

আমি বলি, হজরত মাহজা'ই বদর যুদ্ধ চলাকালে শত্রুব্যূহ ভেদ করবার জন্য ছুটে গিয়েছিলেন। আমর ইবনে হাজরামীর শরাঘাতে তাঁকে পান করতে হয়েছিলো শাহদতের সুধা। 'সাবীলুর রাশাদ' গ্রন্থে এরকমই বলা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে, যখন তাঁর মাতাপিতা তাঁর বিয়োগ ব্যথায় বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠেছিলেন, তখনই অবতীর্ণ হয়েছিলো এই আয়াত।

আলোচ্য আয়াত শুরু হয়েছে এভাবে— আ হাসিবান্‌নাস। এখানকার আদ্যাক্ষর 'আলিফ' (আ) প্রশ্নবোধক। সুতরাং বুঝতে হবে ১ সংখ্যক আয়াত (আলিফ লাম মীম) একটি পৃথক বাক্য। পরবর্তী আয়াত (২) এর সঙ্গে এর বক্তব্যগত যোগসূত্র নেই। যদি যোগসূত্র থাকতো, তবে প্রশ্নবোধক 'আলিফ' উল্লেখিত হতো সর্বপ্রথম, আলিফ লাম মীম এর পূর্বে।

'হাসিবা' পদটির ধাতুমূল 'হুসবান'। এর অর্থ ধারণা করা। সুতরাং এর পূর্বের প্রশ্নবোধক আলিফ (আ) হয় অস্বীকৃতিজ্ঞাপক, না হয় হুমকিপ্রদায়ক। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— মানুষ ভেবেছে কী? 'আমি ইমান এনেছি' একথা বললেই কি পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়া এমনি এমনি তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে? না, কখনোই তা নয়। তাকে তো অতিক্রম করতে হবে নানাবিধ দুর্বিপাক, বিপদ-মুসিবত। করতে হবে হিজরত, সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হবে শত্রুর সঙ্গে। বুক পেতে দিতে হবে জীবন, সম্পদ ও পরিবার পরিজনের উপর আপতিত অনেক সংকট। এভাবে সহিষ্ণুতার মাপকাঠিতে যাচাই করা হবে কে বিশুদ্ধ বিশ্বাসী, কে দোদুল্যচিত্ত। কে মুমিন, কে মুনাফিক। এ ভাবে ধৈর্যশীলেরাই অবশেষে হবে সফল।

বাগবী লিখেছেন, আল্লাহপাকের সর্বপ্রথম হুকুম ছিলো, ইমান আনো। তারপর একে একে দেওয়া হলো নামাজ, জাকাত ও অন্যান্য কর্তব্যকর্মের বিধান। কিছু সংখ্যক লোকের জন্য এগুলো হয়ে উঠলো অসহনীয়। তখন তাদেরকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। এমতো প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মানুষ কি মনে করে শরিয়তের বিধান কার্যকর না করা সত্ত্বেও ইমানের ঘোষণাদানকারীকে প্রকৃত ইমানদার বলে গণ্য করা হবে? যদিও একথা অনস্বীকার্য যে, কেবল 'ইমান' চিরস্থায়ী নরকবাস থেকে নিষ্কৃতিপ্রদায়ক এবং অবশেষে জান্নাত অর্জক, তবুও বুঝতে হবে মর্যাদা অর্জন ও সরাসরি জান্নাতগমন নির্ভর করে কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ ও শরিয়ত প্রতিপালনের উপরে।

এর পরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তো এদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলেন। একথার অর্থ— আল্লাহ্ তো পূর্ববর্তী যুগের নবী-রসুল এবং তাঁদের বিশ্বস্ত অনুচরবর্গকেও বিভিন্ন বিপদ-আপদের মাধ্যমে ইমানের পরীক্ষা নিয়েছেন। নবীগণের কাউকে কাউকে করা হয়েছে দিখণ্ডিত। আর কারো কারো করা হয়েছে জীবনসংহার। তাঁদের উম্মতগণকেও সহ্য করতে হয়েছে অনেক নিগ্রহ। যেমন বনী ইসরাইলদেরকে সহ্য করতে হয়েছে ফেরাউনপক্ষীয়দের অনেক অত্যাচার। এমতো পরীক্ষা চিরাচরিত। সুতরাং এখন এর ব্যত্যয় ঘটতে পারে না কিছুতেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী'। একথার অর্থ— এভাবে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ্পাক সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে দিবেন, কারা প্রকৃত বিশ্বাসবান এবং কারা তা নয়।

আল্লাহ্পাক সর্বজ্ঞ, আদি-অন্তের সকল জ্ঞান সম্পূর্ণতই তাঁর অধিকারায়ত্ত। সুতরাং পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে তার জ্ঞানার্জনের ধারণাটি অযৌক্তিক ও অপ্রাসঙ্গিক। সুতরাং বুঝতে হবে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করার জন্যই পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে পৃথক করে ফেলা হবে সত্য ও মিথ্যাকে। কারণ এর উপরেই নির্ধারণ করা হবে পুরস্কার ও তিরস্কার। কেউ কেউ আলোচ্য বাক্যের অর্থ করেছেন এভাবে— আল্লাহ্ অবশ্যই জানেন, কে ইমানের দাবীতে সত্যবাদী এবং কে নয়। তাঁর ওই সংগুপ্ত জ্ঞানেরই তিনি এ জগতে প্রকাশ ঘটাবেন বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে। মুকাতিল এখানকার 'ইলম' শব্দটির অর্থ করেছেন— পর্যবেক্ষণ। অর্থাৎ আল্লাহ্ পর্যবেক্ষণ করবেন, কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'জানবেন' বা 'প্রকাশ করবেন' অর্থ পৃথক করে দিবেন বিশুদ্ধাচারী ও অবিশুদ্ধাচারীকে।

এর পরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'যারা মন্দকর্ম করে, তারা মনে করে যে, তারা আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। তাদের সিদ্ধান্ত কতো মন্দ'। একথার অর্থ— অবাধ্যরা মনে করে, তারা আমার জ্ঞান ও ক্ষমতার বাইরে চলে যেতে পারবে। কিন্তু তাকি কখনো সম্ভব? এরকম অসম্ভব ধারণাকে তারা লালন করে কী ভাবে? এখানে 'মন্দকর্ম' অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যান, অবাধ্যাচরণ। উল্লেখ্য, শারীরিক বাধ্যতা-অবাধ্যতা যেমন 'কর্ম' পদবাচ্য, তেমনি হৃদয়ের বাধ্যতা-অবাধ্যতাবোধও। এখানে 'তারা আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে' অর্থ তারা আমাকে অতিক্রম করবে, অথচ আমি তার প্রতিকার করতে পারবোনা (এরকম তো অসম্ভব)।

এখানকার ‘আম’ হচ্ছে বিয়োজক অব্যয়। এখানে এই বিয়োজক অব্যয়টির মাধ্যমে পূর্ববর্তী আয়াতের বিষয়বস্তুকে ও আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তুকে পৃথক করে ফেলা হয়েছে, যেহেতু বক্তব্য দু’টো বিপরীতধর্মী। পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে বিশ্বাসীদের পরীক্ষা করার কথা। আর আলোচ্য আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অপধারণার স্বরূপ। কেউ কেউ বলেছেন, পূর্বোল্লিখিত আয়াতের ধারণকারী বিশ্বাসী, আর আলোচ্য আয়াতের ধারণকারীরা অবিশ্বাসী।

আমি বলি, ‘আম’ অব্যয়টি সংযোজক অব্যয় হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে একযোগে উভয় ধারণাকে নস্যাত করাই এখানে উদ্দেশ্য। এমতাবস্থায় উভয় আয়াতের সম্মিলিত মর্মার্থ দাঁড়াবে— ওহে বিশ্বাসীরা, তোমরা একথা মনে কোরো না যে, পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্যতিরেকেই তোমাদেরকে ইমানদার বলে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে তোমাদের শত্রু অবিশ্বাসীরাও যেনো এ ধারণাকে লালন না করে যে, তারা আমার শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবে।

এর পরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— ‘যে আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎকার কামনা করে, সে জেনে রাখুক আল্লাহ্‌র নির্ধারিত কাল আসবেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ’। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার ‘ইয়ারজু’ শব্দটির ধাতুমূল ‘রিজ্বা’। এর অর্থ আশা-আকাংখা। কিন্তু এখানে শব্দটির অর্থ হবে— ভীতি। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— যে ব্যক্তি মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্‌র সকাশে উপনীত হওয়ার ভয়ে ভীত, সে জেনে রাখুক, ওই নির্ধারিত সময় আগমন করবেই। তিনি তাঁর বান্দাগণের সকল কথাবার্তা শোনেন এবং জানেন তাদের বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে। কারণ তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, ‘রিজ্বা’ অর্থ কামনা করা, লালায়িত হওয়া। অর্থাৎ যে ব্যক্তি পুণ্যকামী, পুণ্যের জন্য লালায়িত।

আমি বলি, এখানে ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দর্শনের জন্য লালায়িত’— এরকম অর্থও হওয়া সম্ভব। এই অর্থটি গ্রহণ করা হলে প্রমাণিত হবে যে, ইহজগতে আল্লাহ-দর্শন সম্ভব নয়। রসুল স. অবশ্য তাঁর পৃথিবীর জীবনেই আল্লাহ্ দর্শন করেছিলেন। কিন্তু ওই দর্শনের স্থান পৃথিবী ছিলো না। ছিলো আখেরাত। মেরাজ রজনীতে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো আখেরাতে। আর সেখানেই সংঘটিত হয়েছিলো আল্লাহ্‌র দীদার। একারণেই আমরা বলতে পারি, এ পৃথিবীতে যারা আল্লাহ্‌দর্শনের দাবিদার, তারা মিথ্যুক।

এখানে 'আজ্বালাল্লহি' অর্থ আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলিত হওয়ার নির্ধারিত কাল। মুকাতিল বলেছেন, ওইসময় নির্ধারিত রয়েছে আখেরাতে। অর্থাৎ মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান ও মহাবিচারের দিবসের জনসমাবেশ অবধারিত। ওই সময়ই আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলিত হওয়ার সময়। সুতরাং পৃথিবীর জীবনে ওই সময়ের শুভপরিণামের জন্য যথাপ্রস্তুতি গ্রহণ অত্যাবশ্যক। অন্য এক আয়াতেও এরকম বলা হয়েছে । যেমন— 'যে ব্যক্তি তার প্রভুপালনকর্তার সন্দর্শনাকাংখী, সে যেনো পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে এবং তার প্রভুপালনকর্তার ইবাদতে কাউকে না করে অংশীদার'।

এর পরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'যে কেউ সংগ্রাম করে, সে তো নিজের জন্যই সংগ্রাম করে; আল্লাহ্ বিশ্বজগতের উপর নির্ভরশীল নন'। একথার অর্থ— যে ব্যক্তি সমরপ্রান্তরে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, অথবা সংগ্রাম করবে কুপ্রবৃত্তির কামনা বাসনা এবং শয়তানের অশুভপ্ররোচনার বিরুদ্ধে, সে-ই হবে লাভবান। তার ইবাদত-বন্দেগী ও পুণ্যকর্মের প্রতিফল ভোগ করবে সে নিজেই। আল্লাহ্ এতে করে লাভবান হবে, এমতো ধারণা করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ তিনি সকলকিছু থেকে চিরঅমুখাপেক্ষী। বান্দাগণের উপকারের জন্যই তিনি নিতান্ত অনুকম্পাপরবশ হয়ে তাদেরকে দিয়েছেন ইবাদত করার নির্দেশ ও সুযোগ।

এরপরের আয়াতে(৭) বলা হয়েছে— 'এবং যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আমি নিশ্চয়ই তাদের মন্দকর্মগুলি মিটিয়ে দিবো'। একথার অর্থ— আর যারা সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রসুল ও পরকালে বিশ্বাস করে, তার সঙ্গে সম্পাদন করে পুণ্যকর্ম, আমি তাদের ওই পুণ্যকর্মসমূহের আলো দ্বারা অপসারিত করে দিবো তাদের পাপরাশির অন্ধকারকে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ তাদের মধ্যবর্তী সময়ের, জুমআর নামাজ জুমা মধ্যবর্তী সপ্তাহের এবং রমজানের রোজা রমজান মধ্যবর্তী বছরের পাপরাশি বিলোপ করে দেয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাদের কর্মের উত্তম ফল দান করবো'। সর্বোৎকৃষ্ট কাজ হচ্ছে আনুগত্য। সুতরাং এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আমি তাদের আনুগত্যের প্রতিফল বিনষ্ট করবো না। কোনো কোনো তাফসীরবেত্তা বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের অর্থ— আমি তাদেরকে দান করবো তাদের কর্মাপেক্ষা অধিক— দশগুণ থেকে সাতশ'গুণ। অথবা ততোধিক, যেমন আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রায়। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'আহসান' শব্দটির অর্থ হাসান (উত্তম)।

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۚ وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝٨ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصّٰلِحِيْنَ ۝٩

r আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়াছি তাহার মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে; তবে উহারা যদি তোমাকে আমার সহিত এমন কিছু শরীক করিতে বাধ্য করে যাহার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নাই তুমি তাহাদিগকে মানিও না। আমারই নিকট তোমাদিগের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদিগকে জানাইয়া দিব তোমরা কী করিতেছিলে।

r যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আমি অবশ্যই তাহাদিগকে সৎকর্মপরায়ণদিগের অন্তর্ভুক্ত করিব।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে'।

'অসিয়ত' অর্থ উপদেশবাণী। এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'ওয়াস্‌সইনা'। এর অর্থ— নির্দেশ দিয়েছি। বিধান দিয়েছি। 'হুসনা' অর্থ এখানে সদ্ব্যবহার, এমন কর্ম যার মধ্যে রয়েছে মঙ্গল। এর শব্দমূল 'হাসান'। 'হুসুন' হচ্ছে 'হাসান' এর আধিক্যসূচক পদ। 'হুসনা' এখানে ব্যবহৃত হয়েছে সেই অর্থেই। সুতরাং এর অর্থ— বাধ্যানুগত হওয়া, অনুকম্পাপরবশ হওয়া, একান্ত বাধ্য হওয়া ইত্যাদি।

মুসলিম, তিরমিজি, বাগবী, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, বনী জাহরা গোত্রের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব মালেকের পুত্র হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ছিলেন বেহেশতের শুভসংবাদপ্রাপ্ত দশজন স্বনামধন্য সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত। ছিলেন পূর্বসূরী অগ্রগামী (সবিক্বীন)গণের দলভূত। অপরিসীম মাতৃভক্তি ছিলো তাঁর। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন তাঁর মাতা হাসনা বিনতে আবু সুফিয়ান অত্যন্ত অতুষ্ট হলেন। বললেন, সা'দ! শুনলাম, তুমি কী সব নতুন কথা বলছো। তুমি যদি এসব কথা পরিত্যাগ না করো, তবে আমি শপথ করে বলছি, আমি আর পানাহার করবো না, যদিও আমার মৃত্যু হয়। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তাঁর মা তখন বললেন, নতুন ধর্ম থেকে যতক্ষণ না তুমি প্রত্যাবর্তন

করবে, ততক্ষণ আমি আহার স্পর্শ করবো না। এ অবস্থায় আমি মরে গেলে লোকে তোমাকে মাতৃহন্তারক বলে লজ্জা দিতে থাকবে। তাঁর কথার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবে তারা যদি তোমাকে আমার সঙ্গে এমন কিছু শরীক করতে বাধ্য করে, যার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তুমি তাদেরকে মেনো না' একথার অর্থ— কিন্তু তোমার মাতাপিতা যদি তোমাকে আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কোনো উপাস্যকে শরীক করে নিতে বলে, যার সম্পর্কে তোমার বিশ্বাস বা জ্ঞান নেই, তাহলে এমতাবস্থায় তাদের আনুগত্য করা হবে তোমার জন্য অসমীচীন। অর্থাৎ মাতাপিতার শরিয়তসম্মত আনুগত্য অত্যাবশ্যক, কিন্তু বিশ্বাস ও শরিয়তবিরোধী আনুগত্য পরিত্যাজ্য।

রসুল স. বলেছেন, স্রষ্টার আনুগত্যের মধ্যে সৃষ্টির আনুগত্যের অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ। এরকম বর্ণনা করেছেন হজরত ইমরান থেকে ইমাম আহমদ ও হাকেম। হাকেম বলেছেন, বর্ণনাটি শুদ্ধসূত্রসম্বলিত। হজরত আলী থেকে বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সৃষ্টির আনুগত্যের মধ্যে আল্লাহ্র আনুগত্যের সংমিশ্রণ সিদ্ধ নয়। আর মাতাপিতার আনুগত্য করতে হবে পুণ্যকর্মের ক্ষেত্রে।

বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হজরত সা'দের জননী তিন দিন অভুক্ত অবস্থায় কাটালেন। হজরত সা'দ তাঁকে বললেন, মা! আপনি যদি একশ'টি প্রাণের অধিকারিণী হন এবং এভাবে একে একে প্রতিটি প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তবুও আমি আমার ধর্ম পরিত্যাগ করবো না। এখন আপনি ভেবে দেখুন, আহার গ্রহণ করবেন, না পরিত্যাগ করবেন? একথা শোনার পর তাঁর জননী হতাশ হয়ে যান। নিরুপায় হয়ে শুরু করেন পানাহার।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমার নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি জানিয়ে দিবো তোমরা কী করছিলে'? একথার অর্থ— তোমরা যা কিছুই করো না কেনো, নিশ্চিত জেনো আমার কাছে তোমাদেরকে ফিরে আসতেই হবে। তখন আমি তোমাদেরকে প্রদান করবো যথাপ্রতিফল— স্বস্তি অথবা শাস্তি।

পরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করবো'। এখানে 'আস্সলিহীন' অর্থ সৎকর্মপরায়ণ, সজ্জন— নবী, ওলী ও শহীদগণ। সুতরাং আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে— যারা ইমানদার ও সৎকর্মপ্রবণ, আমি তাদেরকে মহাবিচারের দিবসে জান্নাতে মিলিয়ে দিবো নবী, ওলী ও শহীদগণের সঙ্গে।

সৎকর্ম ও পুণ্যের পূর্ণত্ব হচ্ছে বিশ্বাসীগণের মর্যাদার সর্বোচ্চ স্তর। নবী-রসুলগণও ওই স্তরাভিলাষী। কারণ ওই পূর্ণ স্তর সকল প্রকার বিভ্রান্তি ও অপকৃষ্টতা থেকে মুক্ত। আবিলতা ও অপরিচ্ছন্নতা বলে সেখানে কোনোকিছুই নেই— না বিশ্বাসে, না কর্মে। না স্বভাবে, না জীবন যাপনে।

ইকরামা সূত্রে ইবনে জারীর ও ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মক্কার কিছু মুসলমান তাঁদের ইমানকে গোপন রেখেছিলেন। বদর যুদ্ধের সময় মুশরিকেরা তাদেরকে বাধ্য করলো রসুল স. ও তাঁর বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। যুদ্ধকালে তাঁদের মধ্যে নিহতও হলেন কেউ কেউ। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! ইমান গোপনকারী কিছুসংখ্যক লোক বদরে আমাদের প্রতিপক্ষে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিলো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিহতও হয়েছে। আপনি তাদের মার্জনার জন্য দোয়া করুন। তখন অবতীর্ণ হলো সুরা নিসার আয়াত। 'নিশ্চয় যাদেরকে ফেরেশতামণ্ডলী মৃত্যু দান করেছে, তারা পীড়ন করেছিলো স্বীয় সত্তার উপর'। সাহাবীগণ মদীনা থেকে এই আয়াত উদ্ধৃত করে একটি পত্র প্রেরণ করলেন মক্কার মুসলমানদের নিকটে। তিনি লিখলেন, এখন আর তোমাদের অজুহাত প্রদর্শনের কোনো অবকাশ নেই। হিজরত অত্যাবশ্যক। সুতরাং পত্রপাঠ মাত্র তোমরা মদীনায় চলে এসো। পত্র পাঠ করে তাঁরা আর বিলম্ব করলেন না। যাত্রা করলেন মদীনা অভিমুখে। মুশরিকেরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলো। বাধ্য করলো তাদেরকে মক্কায় ফিরে যেতে। তখন অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত। বলা হলো—

সূরা আন্‌কাবুত ঃ আয়াত ১০, ১১

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَآ اُوْذِىَ فِى اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ؕ وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ؕ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِىْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ ﴿١١﴾

r মানুষের মধ্যে কতক বলে, 'আমরা আল্লাহে বিশ্বাস করি', কিন্তু আল্লাহের পথে যখন উহারা কষ্ট পায় তখন উহারা মানুষের পীড়নকে আল্লাহের শাস্তির মত গণ্য করে এবং তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে কোন সাহায্য আসিলে উহারা বলিতে থাকে 'আমরা তো তোমাদিগের সংগেই ছিলাম'। মানুষের অন্তঃকরণে যাহা আছে আল্লাহ্ কি তাহা সম্যক অবগত নহেন?

r আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করিয়া দিবেন কাহারা বিশ্বাসী এবং কাহারা মুনাফিক।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'মানুষের মধ্যে কতক বলে, আমরা আল্লাহয় বিশ্বাস করি, কিন্তু আল্লাহ্র পথে যখন তারা কষ্ট পায়, তখন তারা মানুষের পীড়নকে আল্লাহ্র শাস্তির মতো গণ্য করে'। উল্লেখ্য, এখানে বর্ণনা করা হয়েছে কপটবিশ্বাসী বা মুনাফিকদের অবস্থা ।

এখানে 'ফীল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্র পথে। 'কাআজাবিল্লাহ' অর্থ আল্লাহর শাস্তির মতো। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— প্রকৃত বিশ্বাসীরা যেমন আল্লাহর শাস্তির ভয়ে পরিত্যাগ করে অবিশ্বাস ও অবাধ্যাচরণ, তেমনি কিছুসংখ্যক অপ্রকৃত বিশ্বাসী মুশরিকদের শাস্তির ভয়ে পরিত্যাগ করে ইসলাম। তাদের শাস্তিকে তারা গণ্য করে আল্লাহ্র শাস্তির মতো। আল্লাহর পথে তারা এতটুকুও দুঃখ ক্লেশ বরণ করতে সম্মত নয়।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়, তখন কিছুসংখ্যক মুসলমান মক্কায় বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছিলেন মুশরিকদের নজরবন্দী অবস্থায়। তাঁরা যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কথা জানতে পারলেন, তখন মরিয়া হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, এবার মদীনাযাত্রা আমরা করবোই। বাধা পেলে লড়বো। মরি বাঁচি যা হয় হবে। তখন অবতীর্ণ হলো— 'অবশ্যই আপনার প্রভুপালনকর্তা, যারা বিপদগ্রস্ত হওয়ার পর হিজরত করেছে......'। মদীনাবাসী মুসলমানগণ এই আয়াত লিখে জানিয়েছিলেন মক্কাবাসী মুসলমানদের নিকটে। তখন তাঁরা একযোগে নেমে পড়লেন মদীনার পথে। মুশরিকেরা বাধা দিলো। শুরু হলো সশস্ত্র সংঘর্ষ। কেউ কেউ শহীদ হলেন। অবশিষ্টরা কোনোক্রমে পৌঁছতে সমর্থ হলেন মদীনায়। আর কিছুসংখ্যক মুসলমান বন্দী হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন মক্কায়। হজরত কাতাদা বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ওই সকল মুসলমানকে লক্ষ্য করে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে কোনো সাহায্য এলে তারা বলতে থাকে, আমরা তো তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম। মানুষের অন্তঃকরণে যা আছে, আল্লাহ্ কি তা সম্যক অবগত নন'।

এখানে 'নাসরুন' অর্থ সাহায্য। মর্মার্থ— বিজয় ও গনিমত। কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, এখানে 'কোনো সাহায্য এলে' কথাটি বলা হয়েছে কপটাচারীদেরকে লক্ষ্য করে। তারা বাহ্যত মুসলমান হলেও প্রকৃত অর্থে অমুসলমান। সেকারণেই শেষে বলা হয়েছে 'মানুষের অন্তঃকরণে যা আছে আল্লাহ্ কি তা সম্যক অবগত নন'? এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার

রসুল! আপনার প্রভুপালনকর্তার পক্ষ থেকে যখন আপনাকে দেওয়া হয় বিজয় ও গনিমত তখন কপটাচারীরা বলে, আমরা তো তোমাদেরই সঙ্গী। কিন্তু তাদের এমতো উক্তি অসত্য। তারা কি ভেবেছে, আল্লাহ্ মানুষের মনের খবর রাখেন না?

এখানে 'আওয়ালাইসা' বলে শেষে যে প্রশ্নটি রাখা হয়েছে, সেই প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। কথাটির অন্তর্নিহিত বক্তব্য হচ্ছে— এমন তো নয় যে, আল্লাহ্ তাদের মনের খবর রাখেন না। তিনি যে অন্তর্যামী। মানুষের অন্তরের বিশুদ্ধতা অবিশুদ্ধতা সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানায়ত্ত। সুতরাং কপটাচারীরা যেনো এমন না মনে করে যে, শাস্তি থেকে তারা অব্যাহতি পাবে।

পরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা বিশ্বাসী এবং কারা মুনাফিক'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ অবশ্যই অন্তরের বিশ্বাসানুসারে প্রতিফল দিবেন। বিশ্বাসীগণকে করবেন পুরস্কৃত এবং তিরস্কৃত করবেন কপটাচারীদেরকে।

সূরা আন্‌কাবুত ঃ আয়াত ১২, ১৩

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ ؕ وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿۱۲﴾ وَ لَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ ۫ وَ لَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿۱۳﴾

r সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা বিশ্বাসীদিগকে বলে, 'আমাদিগের পথ ধর, আমরা তোমাদিগের পাপভার বহন করিব!' কিন্তু উহারা তো তোমাদিগের পাপভারের কিছুই বহন করিবে না। উহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

r উহারা নিজদিগের পাপভার বহন করিবে এবং তাহার সহিত আরও কিছু পাপের বোঝা; এবং উহারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে সে সম্পর্কে কিয়ামত দিবসে অবশ্যই উহাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বিশ্বাসীদেরকে বলে, আমাদের পথ ধরো। আমরা তোমাদের পাপভার বহন করবো'। একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, হে মুসলমানেরা! ইসলাম পরিত্যাগ করো। অনুসারী হও আমাদের মতবাদের। এতে যদি তোমাদের পাপ হয়, তবে সে পাপ বহন করবো আমরা। মুজাহিদ বলেছেন, এরকম কথা বলেছিলো, মক্কার পৌত্তলিকেরা।

কালাবী ও মুকাতিল বলেছেন, আবু সুফিয়ান মুসলমানদের মনে অবিশ্বাসের বীজ বপন করার মানসে বলেছিলো, তোমরা আমাদের রীতিনীতি ও আমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মাদর্শের উপরে চলো।

ফাররা বলেছেন, এখানকার 'ওয়াল নাহমাল' কথাটির অর্থ আমাদের উচিত হবে বহন করা। শাব্দিক দিক থেকে কথাটি অনুজ্ঞাসূচক। কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে একটি শর্তের ফলাফল। অর্থাৎ তোমরা যদি আমাদের পথে চলো, তবে আমাদের কর্তব্য হবে তোমাদের অপরাধের দায়ভার বহন করা। এরূপ অনুজ্ঞাসূচক ও শর্ত-ফলাফলজ্ঞাপক আয়াত উল্লেখিত হয়েছে অন্যত্রও। যেমন— 'ফাল্ ইয়ুলক্বিহীল ইয়াম্মু বিস্সহিল' (বীচিবিক্ষুব্ধ জলধির উচিত একে নিক্ষেপ করে তটভূমিতে)। অর্থাৎ তরঙ্গমুখর সাগর তার মরদেহ নিক্ষেপ করুক বেলাভূমিতে।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু তারা তো তোমাদের পাপভারের কিছুই বহন করবে না, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী'। একথার অর্থ— কিন্তু যারা এখন তোমাদের পাপের বোঝা বহন করার ঘোষণা দিচ্ছে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'তারা নিজেদের পাপভার বহন করবে এবং তার সঙ্গে আরো কিছু পাপের বোঝা'। একথার অর্থ— তারা নিজেদের পাপাভারই বহন করবে, তার সঙ্গে বহন করবে অন্যকে বিভ্রান্ত করার পাপ। কিন্তু এতে করে তাদের কথা শুনে যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তাদের পাপের বোঝাও কমবে না এতটুকুও।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, সে সম্পর্কে কিয়ামত দিবসে অবশ্যই তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে'। একথার অর্থ— মানুষকে পথভ্রষ্ট করার লক্ষ্যে তারা যে মিথ্যা রটনা করেছিলো, মহাবিচারের দিবসে সে সম্পর্কে তারা জিজ্ঞাসিত হবেই।

সূরা আন্কাবুত ঃ আয়াত ১৪, ১৫

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا ؕ فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿۱۴﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۵﴾

r আমি তো নূহকে তাহার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। সে উহাদিগের মধ্যে অবস্থান করিয়াছিল সাড়ে নয়শত বৎসর। অতঃপর প্লাবন উহাদিগকে গ্রাস করে; কারণ উহারা ছিল সীমালংঘনকারী।

r অতঃপর আমি তাহাকে এবং যাহারা তরণীতে আরোহণ করিয়াছিল তাহাদিগকে রক্ষা করিলাম এবং বিশ্বজগতের জন্য ইহাকে করিলাম একটি নিদর্শন।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! নূহ নবীর ইতিবৃত্ত স্মরণ করুন। আমি তাঁকে প্রেরণ করেছিলাম তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের পথপ্রদর্শনার্থে। তাঁকে আমি দিয়েছিলাম সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শত বৎসরের আয়ুষ্কাল। ওই দীর্ঘ সময় ধরে তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের সংশোধনের মানসে ভোগ করেছিলেন অনেক দুঃখ যাতনা। কিন্তু মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছাড়া অধিকাংশই রয়ে গিয়েছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানে অনড়। অবশেষে আমি তাদের উপরে আপতিত করেছিলাম মহাপ্লাবনের শাস্তি। ওই মহাবন্যায় চিরতরে সলিল সমাধি ঘটেছিলো তাদের। কেননা তারা ছিলো নিশ্চিত সীমালংঘনকারী।

এখানে 'ফালাবিছা' অর্থ অবস্থান করেছিলেন। কথাটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, নবুয়তের দায়িত্ব লাভের পর হজরত নুহ তাঁর স্বজাতির মধ্যে বসবাস করেছিলেন সাড়ে নয় শত বৎসর।

'তুফান' অর্থ ঝন্‌ঝাবায়ু। সীমাতিরিক্ত ঘূর্ণায়মান বায়ু অথবা পানিকে বলে তুফান। অর্থাৎ ঘূর্ণীবায়ু বা ঘূর্ণীস্রোত। তুফান বলে বিশাল বন্যাকেও। আবার ঘোর তমসাচ্ছন্ন রজনীকেও বলে তুফান। এখানে তুফান অর্থ মহাপ্লাবন বা বিশাল বান। ওই বিশাল বান গ্রাস করেছিলো হজরত নুহের অবাধ্য সম্প্রদায়কে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত নুহ নবুয়তের গুরু দায়িত্ব লাভ করেছিলেন তাঁর চল্লিশ বছর বয়ঃক্রমকালে। তারপর থেকে সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর ধরে নিয়োজিত ছিলেন তাঁর স্বজাতির হেদায়েত চিন্তায় ও প্রচেষ্টায়। মহাপ্লাবনে অবাধ্যরা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরেও তিনি প্লাবনোত্তর পৃথিবীতে বসবাস করেছিলেন আরো ষাট বছর। ক্রমে ক্রমে জনবিস্তার ঘটলো। নতুন প্রজন্ম ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো নতুন নতুন জনপদে। হজরত উপনীত হলেন এক হাজার পঞ্চাশ বছরে। শুনতে পেলেন পরম প্রভুপালকের ডাক। তারপর এক শুভক্ষণে পাড়ি দিলেন মহাপ্রস্থানের পথে। হজরত ইবনে আব্বাসের এই বিবৃতিটি উপস্থাপন করেছেন ইবনে আবী শায়বা, আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম, আবু শায়েখ ও হাকেম। হাকেম বলেছেন, বর্ণনাটি বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত। ইবনে মারদুবিয়া এবং বাগবীও বর্ণনাটির উপস্থাপক।

ওয়াহাব বর্ণনা করেছেন, হজরত নুহের বয়স যখন এক হাজার চারশত, তখন মৃত্যুর ফেরেশতা তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে বয়োপ্রবীণ মান্যবর নবী! এ পৃথিবীর জীবন সম্পর্কে আপনার অনুভূতি কী? তিনি জবাব দিলেন, যেমন এক লোক একটি গৃহ নির্মাণ করলো। তার দরজা নির্মাণ করলো দু'টি। তারপর এক দরোজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ করে বেরিয়ে গেলো অপর দরোজা দিয়ে।

আলোচ্য আয়াতে পৃথিবীতে হজরত নুহের হাজার বছর অবস্থানের কথা আছে। সরাসরি নয়শত পঞ্চাশ বছরের কথা এখানে বলা হয়নি। উল্লেখ্য, হাজার হচ্ছে একটি বিরাট অংকের একক। একক অথচ আধিক্যের অর্থবহ। এভাবে হাজারের উল্লেখের মাধ্যমে এখানে জানিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে যে, সুদীর্ঘ সময় ধরে তিনি তাঁর বিরূপ ও বিভ্রান্ত স্বজাতির অনেক দুঃখক্লেশ সহ্য করে জীবন যাপন করেছেন। স্থাপন করেছেন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। অথচ ওই সুদীর্ঘ সময় পরিসর ছিলো মহাকালের বিশাল পরিসরে একটি এককের মতো সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ততর।

পরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি তাকে এবং যারা তরণীতে আরোহণ করেছিলো তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং বিশ্বজগতের জন্য একে করলাম একটি নিদর্শন'। একথার অর্থ— সুদীর্ঘকালের মধ্যেও যখন ওই দুর্বিনীতের চৈতন্যোদয় হলো না, তাদের সীমালংঘনপ্রবণতা যখন অতিক্রম করল সকল সহনীয় সীমা, তখন আমি আমার প্রিয় নবী নুহের অপপ্রার্থনাকে গ্রহণ করলাম। তাঁকে জানালাম, অবাধ্যদেরকে বিনাশ করা হবে মহাপ্লাবনের মাধ্যমে। সুতরাং আত্মরক্ষার্থে তৈরী করো তরণী। যথাসময়ে শুরু হলো ভয়াবহ প্লাবন। আমার নির্দেশে নুহ ও তাঁর বিশ্বাসী অনুচরবর্গ আরোহণ করলো তরণীতে। মহাবন্যায় ডুবে গেলো চরাচর। সীমালংঘনকারী সে বন্যায় ডুবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো চিরতরে। রক্ষা পেলো আমার নবী ও তাঁর তরণীর বিশ্বাসী অনুচরেরা। আর একটি ঘটনার স্মৃতি আমি জাগ্রত রাখলাম মহামানবতার একটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে। যেনো তারা বুঝতে পারে আল্লাহ্‌র পরাক্রান্তির প্রকাশ কতো ভয়াবহ ও অমোঘ।

এখানে 'যারা তরণীতে আরোহণ করেছিলো' বলে বুঝানো হয়েছে হজরত নুহের পুত্রগণ ও তাঁর অন্যান্য বিশ্বাসী সহচরবর্গকে। হজরত নুহের সঙ্গে তাঁরাই ছিলেন তাঁর নৌকার সৌভাগ্যবান আরোহী। তাদের সংখ্যা ছিলো মোটমাট আশিজন। কেউ কেউ বলেছেন আটাত্তর জন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, দশজন। তাঁদের পুরুষ ও রমণীর সংখ্যা ছিলো সমান সমান। উল্লেখ্য মহাপ্লাবনের এই স্বনামধন্য নবীর ইতিবৃত্ত সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে সুরা হুদ ও সুরা আ'রাফে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

সূরা আন্‌কাবুত ঃ আয়াত ১৬, ১৭

وَ اِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۶﴾ اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ

اللّٰهِ اَوۡثَانًا وَّ تَخۡلُقُوۡنَ اِفۡكًا ؕ اِنَّ الَّذِيۡنَ تَعۡبُدُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ
لَا يَمۡلِكُوۡنَ لَكُمۡ رِزۡقًا فَابۡتَغُوۡا عِنۡدَ اللّٰهِ الرِّزۡقَ وَاعۡبُدُوۡهُ
وَاشۡكُرُوۡا لَهٗ ؕ اِلَيۡهِ تُرۡجَعُوۡنَ ﴿۱۷﴾

r স্মরণ কর, ইব্‌রাহীমের কথা, সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'তোমরা আল্লাহের ইবাদত কর এবং তাঁহাকে ভয় কর; তোমাদিগের জন্য ইহাই শ্রেয় যদি তোমরা জানিতে!

r 'তোমরা তো আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেবল প্রতিমার পূজা করিতেছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করিতেছ। তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত যাহাদিগকে পূজা কর তাহারা তোমাদিগকে জীবনোপকরণ দানে অক্ষম। সুতরাং তোমরা জীবনোপকরণ কামনা কর আল্লাহের নিকট এবং তাঁহারই ইবাদত কর ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমরা তাঁহারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'স্মরণ করো ইব্রাহিমের কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিলো, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো এবং তাঁকে ভয় করো; তোমাদের জন্য এটাই শ্রেয়'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! এবার স্মরণ করুন নবী এবং আপনার সম্মানিত পিতৃপুরুষ ইব্রাহিমের কথা, তিনি যখন লাভ করলেন পরিণত বোধ ও প্রজ্ঞা, লাভ করলেন সত্যের পরিচিতি, ওই সময় আমি তাঁকে অর্পণ করলাম নবুয়তের গুরু দায়িত্ব, আর ওই দায়িত্ব সম্পাদনার্থে তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, শোনো হে জনতা! তোমরা পৌত্তলিকতা ছেড়ে গ্রহণ করো এক আল্লাহ্‌র ইবাদতের পথ এবং সমীহ করো কেবল আল্লাহ্‌কেই, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম।

শেষে বলা হয়েছে— 'যদি তোমরা জানতে'। একথার অর্থ— যদি তোমরা বুঝতে ভালো ও মন্দ। পার্থক্য করতে পারতে সত্য ও অসত্যকে। অথবা মর্মার্থ হবে— যদি তোমরা হতে দূরদর্শী। তোমাদের চিন্তা ও দৃষ্টি মুক্ত হতো একদেশদর্শিতা ও কূপমণ্ডুকতা থেকে। কিংবা উদ্দেশ্য হবে— যদি তোমরা হতে ওই সকল শুভবোধসম্পন্ন ব্যক্তির মতো, যারা প্রজ্ঞাসম্পন্ন ও ভালো-মন্দের পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম, তাহলে সহজেই বুঝতে পারতে তোমাদের অংশীবাদিতাচ্ছন্ন বোধ ও বুদ্ধি অপেক্ষা আল্লাহ্‌র ইবাদত ও আল্লাহ্‌ভীতি অনেক উত্তম।

পরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'তোমরা তো আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেবল প্রতিমার পূজা করছো এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছো'। একথার অর্থ— হে অবিমৃশ্য

জনতা! তোমরা মহাবিশ্বের মহাসৃজয়িতা ও মহাপ্রতিপালয়িতাকে ত্যাগ করে এমন নিঃসাড় প্রতিমা পূজায় লিপ্ত হয়েছো, যারা উপকার অথবা ক্ষতি কোনো কিছুই করতে সক্ষম নয়। কতো নির্বোধ তোমরা। তোমরা আবার ধারণা করো ওই অপ্রাণ বিগ্রহগুলোই তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে করবে সুপারিশ। বলো, এভাবে তোমরা মিথ্যার উদ্ভাবক হলে কেনো?

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের পূজা করো, তারা তোমাদেরকে জীবনোপকরণ দানে অক্ষম'। একথার অর্থ— বৃথাই তোমরা দিনের পর দিন বিগ্রহবন্দনা করে চলেছো। ওই বিগ্রহগুলো তো তোমাদেরকে ন্যূনতম জীবনোপকরণ দান করতেও অক্ষম।

মানুষের কর্ম হয় দু'ধরনের— নিন্দনীয় ও অনিন্দনীয়। অনিন্দনীয় কর্মসম্পন্ন মানুষের জন্য কল্যাণ নির্ধারণ করা হয় বলেই তাকে বলে হাসান। আর যারা নিন্দনীয় কর্মের সম্পাদক, তাদের কর্ম কবীহ্। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদতকে নিন্দনীয় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর 'রিজিক' (জীবনোপকরণ) শব্দটি ধাতুমূল। এর অর্থ জীবনোপকরণ প্রদান। এরকমও হতে পারে যে, শব্দটি এখানে ধাতুমূল হওয়া সত্ত্বেও ধাত্যর্থে ব্যবহৃত না হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে কর্মপদার্থে। এমতাবস্থায় বুঝতে হবে শব্দটি এখানে 'যা দেওয়া হয়েছে' অর্থাৎ 'প্রদত্ত' অর্থে ব্যবহৃত। আবার 'রিজিক' এখানে তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়েছে 'তান্‌ভীন' ছাড়াই। অর্থাৎ ওই বিগ্রহগুলো এতটুকু জীবনোপকরণদানের অধিকারী নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং তোমরা জীবনোপকরণ কামনা করো আল্লাহ্‌র নিকটে এবং তাঁরই ইবাদত করো ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে'। একথার অর্থ— সুতরাং যিনি একমাত্র জীবিকাপ্রদাতা, সেই মহাপ্রতিপালয়িতার নিকটেই তোমরা প্রার্থি হও উপজীবিকার এবং তাঁরই প্রতি প্রকাশ করো যথাকৃতজ্ঞতা। এভাবে পরিচ্ছন্ন প্রার্থনা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রস্তুতি গ্রহণ করো তাঁর সন্দর্শনের। কারণ তোমাদের সকলের অবশেষ প্রত্যাবর্তন তাঁর দিকেই।

সূরা আন্‌কাবুত ঃ আয়াত ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২

وَاِنۡ تُكَذِّبُوۡا فَقَدۡ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنۡ قَبۡلِكُمۡ ؕ وَمَا عَلَى الرَّسُوۡلِ اِلَّا الۡبَلٰغُ الۡمُبِيۡنُ ﴿۱۸﴾ اَوَلَمۡ يَرَوۡا كَيۡفَ يُبۡدِئُ اللّٰهُ الۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيۡدُهٗ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيۡرٌ ﴿۱۹﴾ قُلۡ سِيۡرُوۡا فِى

الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ
الْاٰخِرَةَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۰﴾ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَ
يَرْحَمُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَ اِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ ﴿۲۱﴾ وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى
الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ۫ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا
نَصِيْرٍ ﴿۲۲﴾

r 'তোমরা যদি আমাকে মিথ্যাবাদী বল তবে জানিয়া রাখ, তোমাদিগের পূর্ববর্তীগণও নবীদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল। সত্যকে স্পষ্টভাবে প্রচার করিয়া দেওয়াই রসূলের কাজ।

r উহারা কি লক্ষ্য করে না কিভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, অতঃপর উহা পুনরায় সৃষ্টি করিবেন? ইহা তো আল্লাহের জন্য সহজ।

r বল, 'পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন?' অতঃপর আল্লাহ্ পুনর্বার সৃষ্টি করিবেন। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

r তিনি যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাহার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। তোমরা তাঁহারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।

r তোমরা আল্লাহ্কে ব্যর্থ করিতে পারিবে না স্থলে অথবা অন্তরীক্ষে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদিগের কোন অভিভাবক নাই, সাহায্যকারীও নাই।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমরা যদি আমাকে মিথ্যাবাদী বলো, তবে জেনে রাখো, তোমাদের পূর্ববর্তীগণও নবীগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিলো। সত্যকে স্পষ্টভাবে প্রচার করে দেওয়াই রসুলের কাজ'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি অবিশ্বাসীদেরকে বলুন, এই যে তোমরা এখন আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে চলেছো, এটা নতুন কোনো ঘটনা নয়। আমার পূর্বে আল্লাহ্র যে সকল বার্তাবাহক পৃথিবীতে এসেছিলেন, তাঁদেরকে তাদের স্বজাতিরাও এভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো। এ হচ্ছে সত্যপ্রত্যাখ্যানপ্রবণদের চিরাচরিত রীতি। আর আল্লাহ্র বার্তাবাহকগণের চিরাচরিত দায়িত্ব হচ্ছে মহাসত্যকে স্পষ্ট করে প্রচার করা। পথপ্রদর্শন করা সত্যের প্রতি। সত্যপথে কাউকে অধিষ্ঠিত করে দেওয়া তাঁদের সাধ্যের বাইরে।

এই আয়াত থেকে ২৪ সংখ্যক আয়াতের সংলাপ হতে পারে হজরত ইব্রাহিমের অথবা এখানে প্রসঙ্গান্তর ঘটিয়ে সংলাপগুলো সম্পৃক্ত করা হয়েছে রসুল স. এর সঙ্গে। অর্থাৎ এই উক্তিগুলো মক্কার কুরাইশদেরকে লক্ষ্য করে বলতে বলা হয়েছে রসুল স.কে। যাই হোক না কেনো, আয়াতগুলো অবতরণ করার উদ্দেশ্য যে রসুল স.কে সান্ত্বনা প্রদান করা, তা বলাই বাহুল্য। অর্থাৎ তাঁকে একথা বুঝিয়ে দেওয়া যে, হে আমার রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অপআচরণে মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। তাদের চিরাচরিত স্বভাব এরকমই। স্মরণ করুন আপনার মান্যবর পিতৃপুরুষ নবী ইব্রাহিমের কথা। তিনিও তো এরকম বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তৎসত্ত্বেও সতত নিয়োজিত ছিলেন সত্যধর্ম প্রচারে। তার মতো আপনিও যেহেতু আমার বার্তাবাহক, সেহেতু আপনিও প্রচারের দায়িত্বে থাকুন অবিচল।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'তারা কি লক্ষ্য করে না কিভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, অতঃপর তা পুনরায় সৃষ্টি করবেন'? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। সোজাসুজি এর অর্থ দাঁড়ায়— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তো লক্ষ্য করে আল্লাহ্তায়ালা এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করার পরেও অহরহ সৃষ্টি করে চলেছেন নতুন নতুন মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদ। একথাই তো প্রমাণ করে যে এগুলো ধ্বংস হওয়ার পরেও পুনরায় তিনি এগুলোকে সৃষ্টি করতে সক্ষম। কেননা প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা দ্বিতীয় সৃষ্টি অধিকতর সহজ। এখানে 'ছুমমা ইয়ুয়ী'দুহু' অর্থ পুনর্বার অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনর্বার জীবন প্রদান। আবার বক্তব্যটি এরকমও হতে পারে যে— তারা তো অবশ্যই এটা লক্ষ্য করে যে, এক মওসুমের ফল ও ফসল উৎপাদন শেষ হওয়ার পরেও পরের মওসুমে আল্লাহ্ উৎপাদন করেন নতুন ফল ও ফসল।

এরপর বলা হয়েছে— 'এতো আল্লাহ্র জন্য সহজ'। একথার অর্থ— পুনর্জীবন দান অথবা পুনরুৎপাদনের বিষয়টি তাঁর নিকট অতি সহজ। কেননা সকল প্রকার অক্ষমতা থেকে তিনি চিরমুক্ত, চিরপবিত্র। তিনি যে সর্বশক্তিধর।

এর পরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'বলো, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো এবং অনুধাবন করো কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি সকলকে জানিয়ে দিন, পৃথিবীতে ঘুরে ঘুরে দ্যাখো এবং অনুধাবন করতে চেষ্টা করো, কীভাবে অস্তিত্ব লাভ করে তাঁর নব নব সৃষ্টি। এখানকার বক্তব্যটি হজরত ইব্রাহিমের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে থাকতে পারে। যদি তাই হয়, তবে এখানকার 'বলো' সম্বোধনটির লক্ষ্য হবেন নবী ইব্রাহিম।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর আল্লাহ পুনর্বার সৃষ্টি করবেন'। একথার অর্থ— দ্যাখো, কীভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টির সূচনা করেছেন, অতঃপর জীবনের সমাপ্তি শেষে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার। এখানকার বক্তব্যটিতে রয়েছে বাক্য দু'টি। পুনঃসৃষ্টি

যে সহজতর, সে কথাকে বেগবান করবার জন্যই এমতো বাক্যবিভাজন করা হয়েছে এখানে। প্রথম বাক্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে প্রথম সৃষ্টি সম্পাদিত হয়েছে আল্লাহ্র দিক থেকে। সুতরাং একথা অবিসংবাদিত সত্য যে, দ্বিতীয় সৃষ্টিও সম্পাদিত হবে তাঁর দিক থেকেই। কারণ দ্বিতীয় সৃষ্টি প্রথম সৃষ্টিরই অনুরূপ। সুতরাং বুঝতে হবে, যিনি প্রথম সৃজন সম্পন্ন করতে সক্ষম, তিনি সম্পন্ন করতে সক্ষম দ্বিতীয় সৃষ্টিও। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— প্রথম সৃজন সূচনা করেছেন যিনি, পরের সৃজনও সম্পন্ন করবেন তিনিই।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান'। একথার অর্থ— নিশ্চয় আল্লাহ্তায়ালা সবকিছুর উপরে ক্ষমতাবান। অর্থাৎ প্রথম দ্বিতীয় সকল সৃষ্টিই তাঁর ক্ষমতায়ত্ত।

এরপরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন'। একথার অর্থ— আখেরাতে তিনি যাকে ইচ্ছা দান করবেন নরকাগ্নির শাস্তি। আর পৃথিবীতে ওই শাস্তির উপলক্ষ হিসেবে তাদেরকে দেয়া হবে কুস্বভাব, সত্যবিমুখতা, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা ইত্যাদি। আবার তিনি আখেরাতে জান্নাত প্রদান করে অনুগ্রহমণ্ডিত করবেন যাকে খুশী তাকে। আর পৃথিবীতে ওই অনুগ্রহপ্রাপ্তির উপলক্ষ হিসেবে তাদেরকে করা হবে আল্লাহ্প্রিয়, রসুল প্রেমিক, কৃতজ্ঞচিত্ত, অনুগত, সংযমী ইত্যাদি।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে'। একথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালার ওই শাস্তি ও অনুগ্রহ প্রাপ্তির জন্য মহাবিচারের দিবসে তোমাদেরকে তাঁর সকাশে উপনীত হতে হবেই।

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'তোমরা আল্লাহ্কে ব্যর্থ করতে পারবে না স্থলে অথবা অন্তরীক্ষে'। একথার অর্থ— হে মানুষ! তোমরা যদি আত্মগোপন করো পৃথিবীর কোনো গোপন বন্দরে অথবা পলায়ন করে আশ্রয় নাও আকাশমার্গের কোনো অচেনা গহ্বরে, তবু তোমরা হতে পারবে না আল্লাহ্র বিধানবর্হির্ভূত। এখানে 'অথবা অন্তরীক্ষে' অর্থ এরকমও হতে পারে যে— আকাশের দূরতম গ্রহাণুপুঞ্জে পালিয়ে গিয়েও তোমরা ব্যর্থ করতে পারবে না আমার আকাশচারী ফেরেশতামণ্ডলীর ব্যবস্থাপনাকে। যেমন কবি সাহাবী হজরত হাসান ইবনে সাবেতের কবিতায় বলা হয়েছে—

ফা মাঁই ইয়াহজু রসুলাল্লাহি মিনকুম
ওয়া ইয়ামদাহুহু ওয়া ইয়ানসুরুহু সাওয়া

অর্থঃ তোমরা রসুলের নিন্দাবাদ করো, অথবা করো স্তুতিবাদ, তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না। অর্থাৎ কেউই তাঁর অনিষ্ট করতে সক্ষম নয়।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই'। একথার অর্থ— অন্তরীক্ষ ও স্থলভাগের সকল প্রকার বিপদাপদের একমাত্র পরিত্রাতা তিনিই। একমাত্র অভিভাবক সকলের ও সকলকিছুর।

সূরা আন্‌কাবুত ঃ আয়াত ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَآئِهٖٓ اُولٰٓئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِيْ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٣﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا ۙ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۫ وَّمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٥﴾ فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّيْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّيْ ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٦﴾ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِي الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾

r যাহারা আল্লাহের নিদর্শন ও তাঁহার সাক্ষাৎ অস্বীকার করে তাহারাই আমার অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হয়। তাহাদিগের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

r উত্তরে ইব্‌রাহীমের সম্প্রদায় শুধু এই বলিল যে, 'ইহাকে হত্যা কর অথবা অগ্নিদগ্ধ কর।' কিন্তু আল্লাহ্ তাহাকে অগ্নি হইতে রক্ষা করিলেন। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য।

r ইব্‌রাহীম বলিল, 'পার্থিব জীবনে তোমাদিগের পারস্পরিক বন্ধুত্ব রক্ষার জন্য তোমরা আল্লাহের পরিবর্তে প্রতিমাগুলিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছ;

কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করিবে এবং অভিসম্পাত দিবে। তোমাদিগের আবাস হইবে জাহান্নাম এবং তোমাদিগের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না।'

r লূত তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিল। ইব্রাহীম বলিল, 'আমি আমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করিতেছি। তিনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

r আমি ইব্রাহীমকে দান করিলাম 'ইসহাক ও ইয়াকুব এবং তাহার বংশধরদিগের জন্য স্থির করিলাম নবুয়ত ও কিতাব এবং আমি তাহাকে দুনিয়ায় পুরস্কৃত করিয়াছিলাম; পরকালেও সে নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণদিগের অন্যতম হইবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন ও তাঁর সাক্ষাৎ অস্বীকার করে তারাই আমার অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়'। একথার অর্থ— বিশ্বজগতে সতত পরিদৃশ্যমান রয়েছে আল্লাহ্‌র এককত্বের অসংখ্য নিদর্শন। তৎসত্ত্বেও যারা এ নিদর্শনরাজিকে অস্বীকার করে এবং অস্বীকার করে আখেরাতে আল্লাহ্‌তায়ালার সন্দর্শনকে, তারা অবশ্যই নিরাশ হয়ে যাবে আল্লাহরঅনুগ্রহ থেকে। অথবা তারা অবশ্যই আশাহত হবে স্বর্গাস্বাদন থেকে। কারণ তারা অস্বীকার করে পারলৌকিক জীবনকেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি'। এখানকার এই বাক্যটি যদি হজরত ইব্রাহিমের বলে ধরে নেওয়া হয়, তবে বুঝতে হবে এখানে উহ্য রয়েছে 'ক্বলাল্লহ্' (আল্লাহ্ বলেছেন) কথাটি। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আল্লাহ্ বলেছেন, তাদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর যদি বক্তব্যটিকে হজরত ইব্রাহিমের উক্তির অংশ বলে মনে করা হয়, তবে বুঝতে হবে এখানে তাঁর উক্তির মাঝখানে ঘটেছে প্রসঙ্গান্তর। অতঃপর পরবর্তী আয়াত(২৪) থেকে প্রসঙ্গটি টেনে নেয়া হয়েছে সম্পূর্ণতই হজরত ইব্রাহিমের দিকে।

বলা হয়েছে— 'উত্তরে ইব্রাহিমের সম্প্রদায় শুধু এই বললো যে, একে হত্যা করো অথবা অগ্নিদগ্ধ করো'। একথার অর্থ— হজরত ইব্রাহিমের প্রতর্কবানে আহত হয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের পৌত্তলিকেরা হয়ে গেলো মহাক্ষিপ্ত, উত্তেজিত কণ্ঠে একে অপরকে বলতে শুরু করলো, একে বধ করো, অথবা করো ভস্মীভূত।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তাকে অগ্নি থেকে রক্ষা করলেন'। একথার অর্থ— পৌত্তলিকেরা একমত হলো নবী ইব্রাহিমকে অগ্নিদগ্ধ করতে হবে। শুরু হলো নবী ইব্রাহিমকে অগ্নিকুণ্ডে প্রজ্জ্বলনের আয়োজন। সেই লেলিহান আগুনে তারা নিক্ষেপ করলো তাঁকে। আল্লাহ্ নির্দেশ দিলেন, হে অগ্নি! ইব্রাহিমের জন্য তুমি শান্তিদায়ক শীতল হয়ে যাও। তাই হলো। এভাবে আল্লাহ্ রক্ষা করলেন তাঁর প্রিয় নবীকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের প্রতি'। একথার অর্থ— হজরত ইব্রাহিমের এই ঘটনাটির মধ্যে রয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য শিক্ষণীয় নিদর্শন। এতে করে তারা সহজেই অনুধাবন করতে পারবে যে, আল্লাহ্তায়ালার প্রজ্ঞা ও শক্তিমত্তা কীরূপ সর্বত্রগামী।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'ইব্রাহিম বললো, পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পারিক বন্ধুত্ব রক্ষার জন্য তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে প্রতিমাগুলিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছো; কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং অভিসম্পাত দিবে। তোমাদের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না'। এ কথার অর্থ— পৌত্তলিকেরা সবিস্ময়ে দেখলো, লেলিহান অগ্নিকুণ্ডে প্রক্ষিপ্ত নবী ইব্রাহিম সম্পূর্ণ অক্ষত। আগুন তাঁর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি। কিন্তু এমতো অলৌকিকত্বও তাদেরকে পৌত্তলিকতা থেকে টলাতে পারলোনা। অগ্নিমুক্ত নবী ইব্রাহিম তখন তাদেরকে বললেন, শোনো হে দুর্ভাগার দল! তোমরা তোমাদের পূজনীয় প্রতিমাগুলোকে গ্রহণ করেছো কেবল পার্থিব সম্প্রীতি বজায়ার্থে। কিন্তু মহাবিচারের দিবসে তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে ও অভিসম্পাত দিবে। জাহান্নামই হবে তখন তোমাদের চিরকালীন আবাস এবং তোমরা ওই ভয়াবহতম বিপদ থেকে কেউ কাউকে রক্ষা করতে পারবে না।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'লুত তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো। ইব্রাহিম বললো, আমি আমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করছি'। একথার অর্থ— তখন তাঁর প্রতি ইমান আনলেন কেবল তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র লুত ইবনে হারুন। হজরত ইব্রাহিম তাঁকে বললেন, শোনো লুত! আমি এবার আল্লাহ্র পরিতোষ লাভের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করবো। চলে যাবো আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দেশিত কোনো স্থানে।

উল্লেখ্য, পরবর্তী সময়ে হজরত লুতও লাভ করেছিলেন নবুয়তের গুরুদায়িত্ব। নবী-রসুলগণ সতত সত্যাধিষ্ঠিত। আল্লাহপাকের বিশেষ হেফাজত তাঁদের সার্বক্ষণিক সঙ্গী। আজন্ম সত্যাশ্রয়ী তাঁরা। সেকারণেই তাঁরা একে অপরকে সনাক্ত করতে পারেন সহজে। হন একে অপরের অকুণ্ঠচিত্ত সতীর্থ, সনাক্তক। হজরত লুতও তাই অবলীলায় বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন হজরত ইব্রাহিমের প্রতি।

এখানে 'ইলা রব্বী' অর্থ আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে, আল্লাহ্র পরিতোষ লাভের আশায়, অথবা আল্লাহ্র নির্দেশিত স্থানে। অর্থাৎ ওই স্থানে, যেখানে আল্লাহ্র ইবাদত সম্পন্ন হতে পারবে নির্বিঘ্নে। অথবা অর্থ হবে— যেখানে আমি হতে পারবো আমার স্বজাতিদের মতো পৌত্তলিকতাপ্রভাবিত পরিবেশ থেকে মুক্ত। হতে পারবো আল্লাহ্র উপাসনায় সনিষ্ঠ ও সততমগ্ন। সুফীসাধকগণ বলেন, এরকম

দেশান্তরের নামই হিজরত। ব্যাখ্যাতাগণ লিখেছেন, হজরত ইব্রাহিম হিজরত করেছিলেন কুফা অঞ্চলের কুছা নামক স্থানে। তারপর সেখান থেকে ইরানে। সেখান থেকে আবার সিরিয়ায়। তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন তাঁর প্রিয়তমা ভার্যা হজরত সারা এবং স্নেহাস্পদ ভ্রাতুষ্পুত্র হজরত লুত। ওইসময় তাঁর বয়স হয়েছিলো পঁচাত্তর বৎসর। পরে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন ফিলিস্তিনে। আর হজরত লুত সেখান থেকে চলে যান সাদুমে। নবী হিসেবে প্রেরিত হন সাদুমবাসীদের প্রতি।

জ্ঞাতব্য ঃ হজরত আসমা বিনতে আবু বকর বর্ণনা করেছেন, হজরত ওসমান যখন আবিসিনিয়ায় হিজরত করলেন, তখন রসুল স. বললেন, নবী ইব্রাহিম ও নবী লুতের পরে সর্বপ্রথম হিজরতকারী ওসমান। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুলেপাক স. এর পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম হিজরতকারী হজরত ওসমান, যেমন নবী ইব্রাহিমের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম হিজরতকারী ছিলেন নবী লুত। হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নবী লুতের পরে এবং ওসমান-রুকাইয়ার পূর্বে আর কোনো মুহাজির নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'। একথার অর্থ— নবী ইব্রাহিম শেষে বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী। অগ্নিকুণ্ড থেকে আমার পরিত্রাণ প্রাপ্তিই তার প্রমাণ। আর তিনি সুগভীর প্রজ্ঞাধিকারী, মহাকুশলী। তাই আমার কর্মকাণ্ড হয়েছে এতো সুসাধ্য ও শুভ।

এরপরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'আমি ইব্রাহিমকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং তাঁর বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নবুয়ত ও কিতাব'। একথার অর্থ— নবী ইব্রাহিম যখন ফিলিস্তিনের স্থায়ী অধিবাসী, তখন তিনি বয়োবৃদ্ধ। তাঁর প্রথমা পত্নী সারাও সন্তানবতী হওয়ার বয়স পেরিয়েছেন অনেক আগেই। তৎসত্ত্বেও আমি দয়া করে প্রবীণ নবীদম্পতিকে দান করলাম ইসহাক নামের এক পুত্ররত্ন। পরে আমি ইসহাক ও তাঁর প্রপৌত্র ইয়াকুবকে দান করেছিলাম নবুয়ত ও আকাশজ বাণীসম্ভার। এখানে 'কিতাব' অর্থ তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআন। উল্লেখ্য, কোরআন নাজিল হয়েছে রসুলেপাক স. এর উপরে। তিনি স. ছিলেন হজরত ইসমাইলের বংশধর। আর হজরত ইসমাইলও ছিলেন হজরত ইব্রাহিমের অন্য পত্নী হজরত হাজেরার সন্তান। সুতরাং তিনিও 'তাঁর বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নবুয়ত ও কিতাব' এই শুভসংবাদের অর্ন্তভুক্ত। সেই হিসাবে কোরআনও এখানকার 'কিতাব' এর মধ্যে পড়ে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমি তাকে দুনিয়ায় পুরস্কৃত করেছিলাম'। এবং আমি তার পৃথিবীর জীবনে সন্তানের পিতা হওয়ার বয়স পেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এবং তাঁর স্ত্রী বন্ধ্যা ও বয়ঃবৃদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে দান করেছিলাম পুণ্যবান পুত্র;

অতঃপর তাঁর বংশপরম্পরাকে করেছিলাম মহিমান্বিত। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন সুদ্দী। অন্যান্য ব্যাখ্যাতাগণ বলেছেন, এখানে দুনিয়ায় পুরস্কৃত করার অর্থ তাঁর বংশে নবুয়তের ধারা প্রবহমান করা। সেকারণেই ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমানদের সঙ্গে রয়েছে তাঁর সম্মানজনক সম্পর্ক। দরূদ ও সালাম তাঁর প্রতি প্রেরিত হতে থাকবে মহাপ্রলয় পর্যন্ত।

আমি বলি, সাধারণ জগদ্বাসী যেমন পার্থিব ভোগ সম্ভারের দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়, এই পৃথিবীতে হজরত ইব্রাহিমও তেমনি পরিতৃপ্তি লাভ করতেন জিকির, ফিকির ও ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে। তাঁর ওই পরিতৃপ্তিই ছিলো তাঁর দুনিয়ার পুরস্কার।

এরপর বলা হয়েছে— 'পরকালেও সে নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণগণের অন্যতম হবে'। এখানে 'আস্‌সলিহীন' অর্থ সৎকর্মপরায়ণগণ, পুণ্যবানগণ। কথাটির মাধ্যমে এখানে বুঝানো হয়েছে পরিপূর্ণরূপে বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিবর্গকে। অর্থাৎ হজরত ইব্রাহিম পরকালেও হবেন পরিপূর্ণরূপে বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিবর্গের অন্যতম।

সূরা আন্‌কাবুত ঃ আয়াত ২৮, ২৯, ৩০

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ ؗ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۸﴾ اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَ تَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ ۙ۬ وَ تَاْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ؕ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۲۹﴾ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۳۰﴾

r স্মরণ কর লূতের কথা, সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল,'তোমরা তো এমন অশ্লীল কর্ম করিতেছ, যাহা তোমাদিগের পূর্বে বিশ্বে কেহ করে নাই'।

r 'তোমরা কি পুরুষে উপগত হইতেছ না? তোমরা তো রাহাজানি করিয়া থাকো এবং নিজদিগের মজলিসে প্রকাশ্যে ঘৃণ্যকর্ম করিয়া থাক'। উত্তরে তাহার সম্প্রদায় শুধু এই বলিল যে, 'আমাদিগের উপর আল্লাহের শাস্তি আনয়ন কর— যদি তুমি সত্যবাদী হও।'

r সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর'।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! এবার স্মরণ করুন নবী লুতের কথা। আমি তাঁকে নবী হিসেবে প্রেরণ করেছিলাম সাদুমবাসীদের সংশোধনার্থে। তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের পথভ্রষ্টদেরকে বলেছিলেন, হে জনতা! দিনের পর দিন তোমরা অশালীন ও অশ্লীল কর্মে মজে আছো। এরকম জঘন্য অপরাধ পৃথিবীতে তোমাদের আগে আর কেউ করেনি। এখানে 'আলফাহিশাতা' অর্থ সীমাতিরিক্ত বেহায়াপনা।

পরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'তোমরা কি পুরুষে উপগত হচ্ছো না? তোমরা তো রাহাজানি করে থাকো'। সাদুমবাসীরা পথচারীকে পেলে ধরে নিয়ে যেতো। তাদেরকে ব্যবহার করতো নারীদের মতো যৌনসঙ্গিনীরূপে। তাই তাদের বসতির পাশ দিয়ে পথচারীরা পথ চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিলো। সে দিকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে— তোমরা কি পুরুষে উপগত হচ্ছো না? তোমরা তো রাহাজানি করে থাকো।

'তাক্বত্বাঊ'নাসা সাবীলা' এর ধাত্যর্থ হয়— পথ বন্ধ করে দেওয়া। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তারা নারীগমনের পথ বন্ধ করে দিয়েছিলো। তৎপরিবর্তে করতো নরসম্ভোগ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং নিজেদের মজলিশে প্রকাশ্যে ঘৃণ্যকর্ম করে থাকো'। প্রকাশ্য মজলিস বা জমজমাট সভাকে বলে 'নাদী'। আবু সালেহ সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত উম্মে হানী বলেছেন, আমি একবার রসুল স. সকাশে 'নিজেদের মধ্যে প্রকাশ্যে ঘৃণ্যকর্ম করো' কথাটির ব্যাখ্যা জানতে চাইলাম। বললাম, এখানে 'ঘৃণ্যকর্ম' অর্থ কী? তিনি স. বললেন, ওই নিন্দনীয় কর্ম যা নবী লুতের সম্প্রদায় করে থাকতো প্রকাশ্য সমাবেশে। তারা পথিপার্শ্বে জড়ো হতো এবং পথচারীদেরকে লক্ষ্য করে গালাগালি করতো অশ্রাব্য ভাষায়।

বাগবী আরো লিখেছেন, এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, হজরত লুতের সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রস্তরভর্তি পাত্র নিয়ে আড্ডা জমাতো পথিকদের গমনাগমনের পথে। কোনো পথিককে দেখলে তারা চিৎকার করে বলতো, 'ধরো'। সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতি শুরু হতো প্রস্তরবর্ষণ। যার নিক্ষিপ্তপাথর পথিককে স্পর্শ করতো, সেই হতো ওই পথিকের দাবিদার। প্রথমে সে তার মালমাত্তা লুণ্ঠন করতো। তারপর তাকে করতো সম্ভোগ। শেষে তাকে বিদায় করতো তিনটি দিরহাম দিয়ে। তাদের সমাজপতিদের নির্দেশ ছিলো এরকমই।

হজরত লুতের সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিলো চরম অভদ্র, অভব্য ও অসভ্য। সশব্দে বায়ু নিঃসরণ, থুথু ছিটানো, নগ্ননৃত্য মেহেদীচর্চিত আঙুলে চুটকি বাজানো, কামোত্তেজক অঙ্গভঙ্গি, শীস দেওয়া, তালি বাজানো, হই হল্লা ইত্যাদি অপকর্ম ছিলো তাদের নিত্ত নৈমিত্তিক কর্ম। এভাবে তারা তাদের জনপদকে বানিয়ে নিয়েছিলো অশ্লীলতা ও পৈশাচিকতার লীলাভূমি।

এরপর বলা হয়েছে— 'উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু এই বললো যে, আমাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি আনয়ন করো— যদি তুমি সত্যবাদী হও'। একথার অর্থ— হজরত লুতের সদুপদেশের প্রতি তারা প্রদর্শন করলো চরম অবজ্ঞা। বিদ্রূপের সুরে বললো, বুঝলাম আমরা অপরাধী। আর তুমি সত্যবাদী। তোমার নবুয়তও সত্য। যদি তাই হয়, তাহলে আল্লাহ্‌কে বলে আমাদের শাস্তির ব্যবস্থা করছো না কেনো? সত্যবাদী নবীই যদি তুমি হও, তাহলে তো তোমার এরকমই করা উচিত। বৃথা বাক্য ব্যয়ে কী লাভ?

এরপরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'হে আমার প্রতিপালক! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করো'। একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী দুর্বৃত্তদের বিদ্রূপবানে জর্জরিত নবী তাদের চৈতন্যোদয়ের আশায় ও অপেক্ষায় দিন গুণতে লাগলেন। এক সময় ভেঙে পড়লো তাঁর নবীসুলভ সহিষ্ণুতার সকল সীমানা। শেষে নিরুপায় হয়ে প্রার্থনা জানালেন, হে আমার প্রভুপালক! এরা প্রকৃতই বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। সুতরাং এদের বিনাশ সাধন করে আমাকে দান করো স্বস্তি ও বিজয়।

এখানে 'আলমুফসিদীন' অর্থ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। হজরত লুত তাঁর উদ্ধত প্রার্থনাকে আবেগঘন করার উদ্দেশ্যেই কথাটিকে ব্যবহার করেছেন এখানে। আর তারা সত্যিই ছিলো অবধারিত শাস্তির উপযোগী এক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়। ছিলো সমকামের মতো ঘৃণ্য অপকর্মের প্রথম প্রবক্তা।

সূরা আন্‌কাবুত ঃ আয়াত ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫

وَ لَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى ۙ قَالُوْۤا اِنَّا مُهْلِكُوْۤا
اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۚ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ۚۖ ﴿٣١﴾ قَالَ اِنَّ فِيْهَا
لُوْطًا ؕ قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا ۫ لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَ اَهْلَهٗۤ اِلَّا
امْرَاَتَهٗ ۫ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٣٢﴾ وَلَمَّاۤ اَنْ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا
سِیْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّ قَالُوْا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۫ اِنَّا
مُنَجُّوْكَ وَ اَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٣٣﴾ اِنَّا

مُنۡزِلُوۡنَ عَلٰۤی اَهۡلِ هٰذِهِ الۡقَرۡیَۃِ رِجۡزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوۡا یَفۡسُقُوۡنَ ﴿۳۴﴾ وَ لَقَدۡ تَّرَكۡنَا مِنۡهَاۤ اٰیَۃًۢ بَیِّنَۃً لِّقَوۡمٍ یَّعۡقِلُوۡنَ ﴿۳۵﴾

r যখন আমার প্রেরিত ফেরেশ্তাগণ সুসংবাদ সহ ইব্রাহীমের নিকট আসিল, তাহারা বলিয়াছিল, 'আমরা এই জনপদবাসীদিগকে ধ্বংস করিব, ইহার অধিবাসীরা তো সীমালংঘনকারী।'

r ইব্রাহীম বলিল, 'এই জনপদে তো লূত রহিয়াছে' উহারা বলিল, 'সেথায় কাহারা আছে তাহা আমরা ভাল জানি; আমরা তো লূতকে ও তাহার পরিজনবর্গকে রক্ষা করিবই তাহার স্ত্রীকে ব্যতীত; সে তো ধ্বংসপ্রাপ্তদিগের অন্তর্ভুক্ত।

r এবং যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূতের নিকট আসিল তখন তাহাদিগের আগমনে সে বিষণ্ন হইয়া পড়িল এবং নিজকে তাহাদিগের রক্ষায় অসমর্থ মনে করিল। উহারা বলিল, 'ভয় করিও না, দুঃখ করিও না; আমরা তোমাকে ও তোমার পরিজনবর্গকে রক্ষা করিব তোমার স্ত্রীকে ব্যতীত; সে তো ধ্বংসপ্রাপ্তদিগের অন্তর্ভুক্ত;

r 'আমরা এই জনপদবাসীদিগের উপর আকাশ হইতে শাস্তি নাজিল করিব, কারণ ইহারা সত্যত্যাগী।'

r আমি বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন রাখিয়াছি।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যখন পুণ্যবান পুত্রসন্তানের শুভসংবাদ নিয়ে দূত ফেরেশতারা হজরত ইব্রাহিমের নিকটে উপস্থিত হলো, তখন তারা তাঁকে বললো, হে আল্লাহ্র নবী! পুণ্যবান পুত্র ও মহিমান্বিত বংশপরম্পরার শুভসংবাদ জ্ঞাপনার্থে আমরা আপনাকে এ কথাটিও জানাতে চাই যে, সাদুমবাসীদের বিনাশ সাধন ও আমাদের আর একটি উদ্দেশ্য। কেননা তারা মহাপাপী ও সীমালংঘনকারী।

পরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'এই জনপদে তো লুত রয়েছে'। একথার অর্থ— হজরত ইব্রাহিম একথা শুনে শিউরে উঠলেন। নবীসুলভ মমতাবশে বললেন, কিন্তু সেখানে যে আল্লাহ্র নবী লুতও রয়েছেন। তিনি তো আর সীমালংঘনকারী নন।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা বললো, সেখানে কারা আছে তা আমরা ভালো জানি', আমরা তো লুত ও তার পরিজনবর্গকে রক্ষা করবোই'। একথার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, হজরত লুতের অবস্থান ও তাঁর নিরাপত্তাপ্রাপ্তির বিষয়টি ফেরেশতারা হজরত ইব্রাহিমের চেয়ে ভালো জানতো। তাই তারা হজরত ইব্রাহিমের দুর্ভাবনা দূরীকরণার্থে তখন বলেছিলো আমরা তো লুত ও তাঁর পরিজনবর্গকে রক্ষা করবোই, শাস্তি আপতিত করবো কেবল সীমালংঘনকারীদের উপর।

এরপর বলা হয়েছে— 'তার স্ত্রীকে ব্যতীত। সে তো ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত'। একথার অর্থ— শেষে ফেরেশতারা বললো, হজরত লুত ও তাঁর পরিজনবর্গ আল্লাহর আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাবে বটে, তবে তার স্ত্রী নিষ্কৃতি পাবে না। কারণ সে ওই বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের একনিষ্ঠ সমর্থক। সুতরাং সে-ও সীমালংঘনকারিণী। হজরত লুত যখন ওই জনপদ ছেড়ে রাতের আঁধারে স্থানান্তরে গমন করবেন, তখন সে পড়ে থাকবে পেছনে, সীমালংঘনকারীদের সঙ্গে। তাই তাকেও গ্রাস করবে সর্বগ্রাসী শাস্তি। এখানে 'ইললা' (ব্যতীত) অব্যয়টি ব্যতিক্রমী। অর্থাৎ তাঁর স্ত্রী হবে আল্লাহ্ প্রদত্ত নিরাপত্তার ব্যতিক্রম। আর 'সে তো ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত' কথাটিতে প্রকাশ করা হয়েছে তার এমতো ব্যতিক্রম হওয়ার কারণ। অর্থাৎ সে তখন হবে পশ্চাদবর্তিনী, শাস্তির সীমানাবাসিনী।

এরপরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'এবং যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লুতের নিকটে এলো, তখন তাদের আগমনে সে বিষণ্ন হয়ে পড়লো এবং নিজেকে তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করলো'। একথার অর্থ— এবং যখন দূত ফেরেশতারা নবী লুতের নিকট উপস্থিত হলো তখন তিনি এইভেবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে, এই সুদর্শন অতিথিবর্গকে কামোন্মত্ত দুরাচারদের হাত থেকে রক্ষা করবেন কেমন করে।

এখানে 'জারউন' অর্থ বল, শক্তি। যেমন বলা হয় 'ত্বীলুজ জাররায়ী' (অতিশয় বলশালী)। অর্থাৎ নবীবর তখন এই ভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও বলশালী সাদুমবাসীদের বিকৃত কামাক্রমণ থেকে তিনি এই সম্মানিত মেহমানদেরকে রক্ষা করবেন কেমন করে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা বললো, ভয় করো না, দুঃখ কোরো না; আমরা তোমাকে ও তোমার পরিজনবর্গকে রক্ষা করবো তোমার স্ত্রীকে ব্যতীত; সে তো ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত'। একথার অর্থ দুশ্চিন্তিত নবীকে দেখে তখন ফেরেশতারা বললো, মহামান্য নবী! শংকিত হবেন না। আমরা তো অপার্থিব অতিথি। প্রেরিত হয়েছি সাদুমবাসীদের শায়েস্তা করতে। তাদেরকে আমরা সমূলে বিনাশ করবো। আর রক্ষা করবো আপনাকে ও আপনার পরিজনবর্গকে। কেবল আপনার পত্নীকে

নয়। কেননা সে অবিশ্বাসিনী । সে রয়ে যাবে পশ্চাতে এবং ধ্বংস হবে ধ্বংসপ্রাপ্তদের সাথে। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— হে নবী! আপনি এমতো দুশ্চিন্তা ও শংকাকে প্রশ্রয় দিবেন না যে, আপনার জনপদবাসী আমাদেরকে বিপদে ফেলবে এবং আমরা হয়ে যাবো অসহায়। বরং আমরাই তো তাদেরকে ধ্বংস করবো। আর রক্ষা করবো আপনাকে ও আপনার পরিবারবর্গকে। সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের আগমন। তবে একথা ঠিক যে, আপনার স্ত্রী রক্ষা পাবে না। কারণ সে পড়ে থাকবে পেছনে এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে নিশ্চিহ্নিতদের সঙ্গে।

এরপরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'আমরা এই জনপদবাসীদের উপর আকাশ থেকে শাস্তি নাজিল করবো, কারণ এরা সত্যত্যাগী'। মুকাতিল বলেছেন, এখানকার 'রিজযুন' শব্দটির অর্থ ভূমিধস, তদুপরি প্রস্তরবর্ষণ। 'রিজযুন' অর্থ 'অশান্তি'ও হয়। আর অশান্তিও তো শাস্তি।

এরপরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— 'আমি বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন রেখেছি'। একথার অর্থ— আমি নবী লুতের সম্প্রদায়ের সমূলে ধ্বংস হওয়ার ঘটনাটিকে করেছি আমার চিরদুর্জয় শক্তিমত্তার একটি শিক্ষণীয় নিদর্শন। আর এ ঘটনা থেকে সত্যোপলব্ধি করতে পারে কেবল তারা, যারা বোধশক্তিসম্পন্ন।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'স্পষ্ট নিদর্শন' অর্থ অবাধ্য সাদুম জনপদের ধ্বংসস্তূপ। কাতাদা বলেছেন, কথাটির অর্থ তাদের উপরে বর্ষিত প্রস্তর খণ্ডগুলো, যা বহুকালধরে ছিলো পরিদৃশ্যমান। মুজাহিদ বলেছেন, তখনকার ভূগর্ভোৎসারিত কৃষ্ণসলিলকেই এখানে বলা হয়েছে 'স্পষ্ট নিদর্শন'। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'স্পষ্ট নিদর্শন' বলা হয়েছে এই কাহিনীটির প্রসিদ্ধিকে। অর্থাৎ নবী লুতের সম্প্রদায়ের মূলোৎপাটনের এই বিখ্যাত ইতিবৃত্তটিকে আমি উপজীব্য করে রেখেছি প্রকাশ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে।

সূরা আন্‌কাবুত ঃ আয়াত ৩৬, ৩৭

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱرْجُوا۟ ٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٦﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دَارِهِمْ جَٰثِمِينَ ﴿٣٧﴾

r আমি মাদ্‌য়ানবাসীদিগের প্রতি তাহাদিগের ভ্রাতা শোয়াইবকে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহের ইবাদত কর, শেষ দিবসকে ভয় কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইও না।'

r কিন্তু উহারা তাহার প্রতি মিথ্যা আরোপ করিল; অতঃপর উহারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হইল; ফলে, উহারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হইয়া গেল।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আর আমি মাদিয়ানবাসীদের নিকট তাদের সংশোধনার্থে প্রেরণ করেছিলাম তাদেরই স্বগোষ্ঠীভূত নবী শোয়াইবকে। তিনি বলেছিলেন, হে আমার স্বজাতি! তোমরা এক আল্লাহ্‌র ইবাদতে সমর্পিত হও। ভয় করো মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ সকাশে উপনীত হওয়ার বিষয়টিকে এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা উৎপাদন কোরো না।

কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানকার 'রিজা' এর শাব্দিক অর্থ 'আশা' হলেও এর মর্মার্থ 'ভয়'। অর্থাৎ তোমরা ভয় করো পরকালের শাস্তির এবং তার জন্য এমন পুণ্যকর্মে নিয়োজিত হও, যাতে করে পরকালে অব্যাহতি পেতে পারো শাস্তি থেকে। আর এখানকার 'লা তা'সাও' অর্থ 'লা তুফসিদু' (বিপর্যয় সৃষ্টি কোরো না)। উল্লেখ্য, কোনো জাতির উপর বিপর্যয় নেমে আসে দু'টি উদ্দেশ্যে— ১. সংশোধনার্থে ২. বিনাশ সাধনার্থে। এখানে উদ্দেশ্য করা হয়েছে শেষোক্তটিকে।

পরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'কিন্তু তারা তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো; অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হলো। ফলে, তারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেলো'। একথার অর্থ— কিন্তু তারা যখন নবী শোয়াইবের কথা মানলো না, তখন তাদের উপরে নেমে এলো শাস্তি। প্রচণ্ড ভূকম্পনের ফলে তারা তাদের আপনাপন গৃহে মুখ থুবড়ে মরে পড়ে রইলো।

এখানে 'রজফাতু' অর্থ প্রচণ্ড ভূকম্পন। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত জিব্‌রাইলের মহানাদ, যার ফলে কলিজা ফেটে মুখ থুবড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলো তারা। 'জাছিমান' অর্থ মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা। আর 'দার' অর্থ গৃহে। শব্দটি একবচন হলেও এখানে এটি বহুবচনার্থক। অর্থাৎ আপনাপন গৃহসমূহে।

সূরা আনকাবুত ঃ আয়াত ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪

وَ عَادًا وَّ ثَمُوْدَاْ وَقَدْ تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ ۗ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَ كَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ ﴿٣٨﴾ وَ قَارُوْنَ وَ فِرْعَوْنَ وَ هَامٰنَ ۗ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِي الْاَرْضِ وَمَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ ﴿٣٩﴾ فَكُلًّا اَخَذْنَا

بِذَنْۢبِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ
الصَّيْحَةُ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا ۚ
وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۴۰﴾
مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۖۚ
اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ؕ وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۘ لَوْ
كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿۴۱﴾ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ؕ وَ
هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۴۲﴾ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا
يَعْقِلُهَاۤ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ﴿۴۳﴾ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۴۴﴾

r এবং আমি আদ ও সামূদকে ধ্বংস করিয়াছিলাম; উহাদিগের বাড়ীঘরই তোমাদিগের জন্য ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ। শয়তান উহাদিগের কাজকে উহাদিগের দৃষ্টিতে শোভন করিয়াছিল এবং উহাদিগকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়াছিল, যদিও উহারা ছিল বিচক্ষণ।

r এবং আমি সংহার করিয়াছিলাম কারূন, ফিরাউন ও হামানকে; মূসা উহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিয়াছিল; তখন তাহারা দেশে দম্ভ করিত; কিন্তু উহারা আমার শাস্তি এড়াইতে পারে নাই।

r উহাদিগের প্রত্যেককেই তাহার অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়াছিলামঃ উহাদিগের কাহারও প্রতি প্রেরণ করিয়াছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড ঝটিকা, কাহাকেও আঘাত করিয়াছিল মহানাদ, কাহাকেও আমি প্রোথিত করিয়াছিলাম ভূগর্ভে এবং কাহাকেও করিয়াছিলাম নিমজ্জিত। আল্লাহ্ তাহাদিগের প্রতি কোন জুলুম করেন নাই; তাহারা নিজেরাই নিজদিগের প্রতি জুলুম করিয়াছিল।

r যাহারা আল্লাহের পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাহাদিগের দৃষ্টান্ত মাকড়সা, যে নিজের জন্য ঘর বানায়, এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম, যদি উহারা জানিত।

r উহারা আল্লাহের পরিবর্তে যাহা কিছুকে আহ্বান করে আল্লাহ্ তাহা জানেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

r মানুষের জন্য আমি এই সকল দৃষ্টান্ত দিই; কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই ইহা বুঝে।

r আল্লাহ্ যথাযথভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং আমি আদ ও ছামুদকে ধ্বংস করেছিলাম; তাদের বাড়ীঘরই তোমাদের জন্য এর সুস্পষ্ট প্রমাণ'। একথার অর্থ— আর আমি আদ ও ছামুদ জাতির মতো দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী সম্প্রদায়কেও ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। হে মক্কাবাসী! ওই ধ্বংসচিহ্নের প্রমাণ তো তোমরা স্বচক্ষেই দেখতে পাও, যখন গমানগমন করো তাদের উৎসন্ন জনপদের পাশ দিয়ে। এখানে 'আদ' ও 'ছামুদ' শব্দদ্বয়ের প্রারম্ভে প্রচ্ছন্ন রয়েছে একটি ক্রিয়াপদ। অবশ্য বাক্যটির অনুবাদ করা হয়েছে ওই প্রচ্ছন্ন ক্রিয়াপদ সহকারেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'শয়তান তাদের কাজকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিলো এবং তাদেরকে সৎপথ অবলম্বন করতে বাধা দিয়েছিলো'। একথার অর্থ— শয়তান হয়েছিলো তাদের সৎপথপ্রাপ্তির অন্তরায়। সে তাদের অপকর্মগুলোকেই তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে রেখেছিলো।

শেষে বলা হয়েছে— 'যদিও তারা ছিলো বিচক্ষণ'। মুকাতিল, কাতাদা ও কালাবী কথাটির অর্থ করেছেন— লোকগুলি তাদের অপবিত্র ধর্মধারণাকেই মনে করতো সত্য। মনে করতো, তারাই সরল সঠিক পথের অনুসারী। আর এমতো অপবিশ্বাস লালনের ক্ষেত্রে তারা ছিলো সতত সজাগ। ফাররা এর অর্থ করেছেন— তারা ছিলো তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন, বিচক্ষণ, বিজ্ঞ ও চিন্তাশীল। কিন্তু এমতোগুণবত্তাকে তারা কাজে লাগাতে চায়নি। কথাটিকে এভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে— তারা বুঝতে পেরেছিলো, শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। তদুপরি তাদের প্রতি প্রেরিত নবীও তাদেরকে এব্যাপারে পূর্বাহ্নে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সবকিছু জেনে বুঝেও তারা বোধ ও বিচক্ষণতাকে কাজে লাগাতে পারেনি। ফলে তারা উৎপাটিত হয়েছিলো সমূলে।

পরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'এবং আমি সংহার করেছিলাম কারূন, ফেরাউন ও হামানকে'। এখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হিসেবে কারূনের নাম এসেছে আগে। কারণ সে বংশগত দিক দিয়ে ছিলো ফেরাউন ও হামান অপেক্ষা কুলীন। আরো প্রণিধাননীয় যে, সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের অপরাধ অন্যাপেক্ষা অধিক জঘন্য। সেই হিসেবেও এখানে আগে এসেছে কারূনের নাম।

এরপর বলা হয়েছে— 'মুসা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলো; তখন তারা দেশে দম্ভ করতো; কিন্তু তারা আমার শাস্তি এড়াতে পারেনি'। একথার অর্থ— মহাসত্যের সুস্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে নবী মুসা তাদের সামনে প্রকাশ করেছিলেন বিস্ময়কর মোজেজা। যেমন যষ্টির সর্পরূপ ধারণ, নির্মল শুভ্রোজ্জ্বল হস্ত ইত্যাদি। তৎসত্ত্বেও তাদের বোধোদয় ঘটেনি। তারা সত্যগ্রহণের পরিবর্তে প্রদর্শন করতো আত্মম্ভরিতা। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেনি।

এখানে 'সবেক্বীন' অর্থ নিষ্ফলকারী, অক্ষমকারী। যেমন বলা হয় 'সাবাক্বা ত্বলিবাহু' (তার আক্রমণকারীকে নিষ্ফল করে সে এগিয়ে গিয়েছে)। অর্থাৎ তার আক্রমক তাকে ধরতেই পারেনি। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— তারা আমার শাস্তি থেকে অব্যাহতি পায়নি।

এরপরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'তাদের প্রত্যেককেই তাদের অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছিলামঃ তাদের কারো প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড ঝটিকা, কাউকে আঘাত করেছিলো মহানাদ, কাউকে আমি প্রোথিত করেছিলাম ভূগর্ভে এবং কাউকে করেছিলাম নিমজ্জিত'। এক কথায়— বিভিন্ন সময়ের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে আমি সংহার করেছিলাম বিভিন্ন প্রকার শাস্তির মাধ্যমে। যেমন প্রস্তর বৃষ্টির মাধ্যমে ধ্বংস করেছিলাম নবী লুতের সম্প্রদায়ের পাপিষ্ঠদেরকে। মহানাদের মাধ্যমে আপনাপন বসতবাটিতে কলিজা ফেটে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে হয়েছিলো নবী শোয়াইবের সম্প্রদায়ের দুর্বৃত্তদেরকে। কারূনকে গ্রাস করেছিলো মৃত্তিকা। মহাপ্লাবন নিশ্চিহ্ন করেছিলো নবী নুহের সম্প্রদায়ের সীমালংঘনকারীদেরকে এবং ফেরাউন ও তার পুরো বাহিনীকে বরণ করতে হয়েছিলো সমুদ্রাভ্যন্তরের সলিল সমাধি।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তাদের প্রতি জুলুম করেননি। তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিলো'। একথার অর্থ— ওই সকল দুর্বৃত্তকে আল্লাহ্তায়ালা শাস্তি দিয়েছিলেন সম্পূর্ণতই ন্যায়ানুগতার ভিত্তিতে। কারণ অন্যায়াচরণ থেকে তিনি সতত পবিত্র। বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি করেছিলো জুলুম। সত্তায় সত্যান্বেষণ পিপাসাকে করেছিলো দম্ভদলিত। আর এভাবেই হয়ে গিয়েছিলো শাস্তিযোগ্য অপরাধী।

এর পরের আয়াতে (৪১) বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সা, যে নিজের ঘর বানায় এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম, যদি তারা জানতো'। একথার অর্থ— যারা আল্লাহ্কে ছেড়ে অন্য কাউকে অথবা কোনোকিছুকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে, তাদের তথাকথিত ধর্মাদর্শ ঊর্ণনাভ নির্মিত জালসদৃশ। যা আশ্রয় হিসেবে

দুর্বলতম। বরং তাদের ওই অপবিশ্বাস ঊর্ণনাভের জালের চেয়েও অধিক অনুপকারী। কেননা কিছুক্ষণের জন্য ওই জাল হতে পারে তার নির্মাতার আশ্রয় ও আহার্যোপকরণ আহরণের মাধ্যম। কিন্তু অবিশ্বাসী ও পৌত্তলিকদের সে সুযোগও নেই। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— বিশ্বাসীদের আল্লাহ্র এককত্বনির্ভর বিশ্বাস এবং পৌত্তলিকদের অংশীবাদাশ্রিত ধারণার দৃষ্টান্ত হচ্ছে মনুষ্যগৃহ ও মাকড়সার জাল।

এখানে 'আন্কাবুত' অর্থ ঊর্ণনাভ, মাকড়সা। শব্দটি একবচন, বহুবচন, পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ সকল ক্ষেত্রে সমভাবে ও সমরূপে ব্যবহার্য। কখনো কখনো অবশ্য ব্যবহৃত হয় এর বহুবচনার্থক শব্দরূপ 'আনাকীর'

এরপর বলা হয়েছে—'এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম, যদি তারা জানতো'। একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা যদি বিশ্বাসের গ্রহণরহস্য সম্পর্কে জানতো, তবে ওই অক্ষয় গৃহ ছেড়ে কখনোই গ্রহণ করতো না মাকড়সার গৃহের মতো ক্ষণভঙ্গুরতাকে। পৌত্তলিকতা ও বিচক্ষণতাকে পরিত্যাগ করে কখনোই হতো না একদেশদর্শিতার অনুগ।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে স্মরণ করা যেতে পারে রসুল স. এর একটি হাদিস। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আলী— রসুল স. বলেছেন, হিজরতের প্রাক্কালে সওর পর্বতের গুহায় আত্মগোপন করলাম আমি ও আবু বকর। অকস্মাৎ একটি মাকড়সা এসে জাল বুনলো গুহামুখে। সুতরাং তোমরা তাকে সংহার কোরো না।

এর পরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যা কিছুকে আহ্বান করে আল্লাহ্ তা জানেন'। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন, তোমরা আল্লাহ্কে ছেড়ে দিয়ে যে সকল দেব-দেবীদের পূজা-অর্চনা করো, সে সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত। এখানকার 'মা' অব্যয়টি প্রশ্নবোধকও হয়ে থাকতে পারে। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তারা আল্লাহ্কে পরিত্যাগ করে কিসের অর্চনা করে? সে সম্পর্কে তো আল্লাহ্ জানেনই। ধাত্যর্থেও অব্যয়টি এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে বলা যায়। এমতাবস্থায় মর্মার্থ দাঁড়াবে— আল্লাহ্ তাদের গায়রুল্লাহ্র উপাসনা সম্পর্কে ভালো করেই জানেন। অথবা অব্যয়টি এখানে নেতিবাচক। এটাই যদি মেনে নেয়া যায়, তবে মর্মার্থ হয়— তারা আল্লাহ্র ইবাদত যে করে না, সেকথা আল্লাহ্র অজানা নয়। প্রতিমাপূজারীরা নির্বোধ। আর তাদের পৌত্তলিকতা মাকড়সার জাল সদৃশ ভঙ্গুর, একথাকে অধিকতর স্পষ্ট করার জন্যই অবতারণা করা হয়েছে এই আয়াতের।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ যেহেতু অতুলনীয়রূপে মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাসম্পন্ন, তাই তাঁকে ছেড়ে দিয়ে অন্যের বা অন্যকিছুর উপাসনা নিশ্চিত মূর্খতা ও হতভাগ্যতা। আর যারা এরূপ মূর্খ ও হতভাগ্য, তারা তো অবশ্যই শাস্তিযোগ্য।

এরপরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'মানুষের জন্য আমি এই সকল দৃষ্টান্ত দেই; কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এটা বোঝে'। একথার অর্থ— মানুষকে জ্ঞানদানের জন্যই আমি এরকম উপমা উপস্থাপন করি, কিন্তু একথা সকলে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। হৃদয়ঙ্গম করতে পারে কেবল তারা, যারা সত্যান্বেষী।

আতার ও আবু যোবায়ের সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত জাবের আয়াতখানি আবৃত্তি করার পর বলতেন, আল্লাহ্ যাকে শুভবোধ দান করেন, সে-ই কেবল বুঝে শুনে গ্রহণ করতে পারে আল্লাহ্র আনুগত্য। আত্মরক্ষা করতে পারে অনানুগত্য থেকে। ছা'লাবী এবং ওয়াহেদীও এরকম বলেছেন। আরো বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ ইবনে হারব তাঁর 'কিতাবুল আকল' গ্রন্থে হারেছ ইবনে উমামা থেকে এবং ইবনে জাওজী তাঁর 'মওজুয়াতে'।

এর পরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যথাযথভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য'। একথার অর্থ— আল্লাহ্র আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃজনৈপুণ্য নিখুঁত, অনবদ্য ও অভূতপূর্ব। তাঁর অভিপ্রায়, প্রজ্ঞা ও শক্তিমত্তার অতুলনীয় নিদর্শন সতত পরিদৃশ্যমান এই দুই মহা সৃষ্টিতে। এ অবাক নিদর্শন অবশ্যই এর মহাসৃজয়িতার দিকে পথপ্রদর্শন করে। কিন্তু সে পথের সন্ধান জানতে পারে কেবল বিশ্বাসীরা। অন্যেরা নয়।

একবিংশতিতম পারা

সূরা আন্‌কাবুত ঃ আয়াত ৪৫

اُتْلُ مَاۤ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ ؕ وَ لَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ﴿۴۵﴾

r তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব আবৃত্তি কর এবং সালাত কায়েম কর। সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দকার্য হইতে, আল্লাহের স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা জানেন।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব আবৃত্তি করো'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! এযাবতকাল পর্যন্ত আপনার উপর কোরআনের যে আয়াতসম্ভার প্রত্যাদেশরূপে অবতীর্ণ করা হয়েছে, আপনি সেগুলো নিয়মিত আবৃত্তি করতে থাকুন। উল্লেখ্য, কোরআনের তাৎপর্য ও গূঢ়তত্ত্বের পরিচয় পেতে হলে মনোযোগ ও মহব্বত সহকারে এর পৌনঃপুনিক আবৃত্তি অত্যাবশ্যক। এরকম আবৃত্তিকারীর হৃদয়পটে ভেসে ওঠে নভজ বাণীবৈভবের অপার্থিব সুষমা। ফুটে ওঠে এর মর্মার্থ। আর লাভ হয় কোরআনানুগ জীবনাচরণ। অর্জিত হয় মহান আল্লাহ্‌র একান্ত নৈকট্য ও প্রেম।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং সালাত কায়েম করো; সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দকর্ম থেকে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি নামাজ প্রতিষ্ঠা করুন, যা অশ্লীল ও অন্যায়াচরণের প্রতিরোধক। এখানে 'অশ্লীল' অর্থ ধর্মগত ও বুদ্ধিগতভাবে যা অশালীন। আর মন্দকর্ম অর্থ সকল প্রকার নিষিদ্ধ কাজ।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, এক আনসার যুবক রসুল স. এর সঙ্গে নিয়মিত নামাজ পাঠ করতো। কিন্তু পাপকর্মও করে যেতো অবলীলায়।

একথা রসুল স. এর গোচরীভূত হলে তিনি বললেন, এক সময় এই নামাজই তাকে পাপাচরণ থেকে নিবৃত্ত করবে। তাই হলো। কিছুদিন পর দেখা গেলো তার পাপাচরণ প্রবৃত্তি আর নেই।

ইসহাক তাঁর স্বরচিত গ্রন্থে এবং বায্যার ও আবু ইয়ালী হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, এক লোক রসুল স. এর পবিত্র সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করলো, অমুকব্যক্তি রাত জেগে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে, তারপর ভোররাতে বেরিয়ে যায় চুরি করতে। রসুল স. বললেন, ছেড়ে দাও তার কথা। অপেক্ষা করো, দেখবে, একসময় নামাজই মিটিয়ে দিবে তার অপহরণেচ্ছাকে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, নামাজ হচ্ছে অপরাধপ্রবণতার রক্ষাকবচ। যার নামাজ অপরাধ-বিদূরক নয়, সে অবশ্যই আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যচ্যুত।

হাসান ও কাতাদা বলেছেন, যার নামাজ কদর্যতা নিবৃত্তক নয়, তার ওই নামাজ অবশ্যই বিপদার্জক। কোনো কেনো আলেম বলেছেন, এখানে 'সালাত' (নামাজ) অর্থ কোরআন তেলাওয়াত। তবে একথাও অসত্য নয় যে, কোরআন তেলাওয়াতও পাপ-নিরোধক।

হজরত জাবের থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, এক লোক একবার রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, আমার পরিচিত এক ব্যক্তি রাতে কোরআন তেলাওয়াত করে। আর দিনে করে চুরি। রসুল স. বললেন, দেখবে শিগগিরই কোরআন পাঠ তাকে নিবৃত্ত করেছে চুরি থেকে। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, একবার রসুল স. সকাসে এই মর্মে অভিযোগ উত্থাপন করা হলো যে, জনৈক ব্যক্তি দিবাভাগে নামাজ পাঠ করে এবং নিশিযোগে করে তস্করতা। তিনি স. বললেন, দেখে নিয়ো, অতিসত্বর নামাজ তাকে পৃথক করে দিবে তাস্কর্যবৃত্তি থেকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌র স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ'। ইবনে আতা বলেছেন, আল্লাহ্‌র স্মরণের (জিকিরের) গুরুত্ব অপরিসীম। কোনো পাপই জিকিরের সম্মুখে তিষ্ঠাতে পারে না। আর এখানে 'জিকরুল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র স্মরণ) অর্থ ওই নামাজ যা পাপপ্রতিরোধক। নামাজ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। তাই এখানে নামাজকেই সরাসরি বলা হয়েছে 'জিকরুল্লাহ্'।

জিকিরের মাহাত্ম্যঃ জিকিরের মহিমা-মাহাত্ম্য সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে অসংখ্য হাদিস। তন্মধ্যে কিছুসংখ্যক নিম্নরূপঃ

হজরত আবু দারদার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. একবার উপস্থিত সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন কর্মের কথা

জানাবো না, যা তোমাদের কর্তা বিধাতার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়, পবিত্র ও সর্বোত্তম। যা আল্লাহ্‌র পথে স্বর্ণ-রৌপ্য দান করা অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ? এমনকি অধিক পুণ্যার্জক রণক্ষেত্রে শত্রুনিধনের চেয়েও? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! অবশ্যই দয়া করে বলুন। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্‌র জিকির। আহমদ, মালেক, তিরমিজি, ইবনে মাজা। ইমাম মালেক বলেছেন, হাদিসটি প্রায়োন্নত পর্যায়ের।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, আমি একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তম বাণীবাহক! আল্লাহ্‌র দাসদের মধ্যে তাঁর নিকট কে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন? তিনি স. বললেন, যারা আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করে। আমি বললাম, ধর্মযোদ্ধার চেয়েও কি? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ, যদিও সে ধর্মযোদ্ধা যুদ্ধ করতে করতে তার কৃপাণ ভেঙ্গে ফেলে এবং রক্তাক্ত হয় নিজে। আহমদ, তিরমিজি। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি দুষ্প্রাপ্য শ্রেণীর।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে বিশর বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রসুল স. সকাশে হাজির হয়ে বললো, হে দয়াল নবী! কোন ব্যক্তি সর্বাধিক সৌভাগ্যবান ? তিনি স. বললেন, যার আয়ুষ্কাল দীর্ঘ ও পুণ্যকর্মশোভিত। লোকটি পুনর্বার বললো, সর্বাধিক নন্দিত কর্ম কোনটি? তিনি স. বললেন, ওই জিকির যা অন্তিমযাত্রার প্রাক্কালে সিক্ত করে রাখে রসনা। আহমদ, তিরমিজি।

হজরত আবু হোরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার মক্কার জুমদান পাহাড়ের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। অতঃপর তিনি স. পাহাড়ের উপর দিয়ে অগ্রসর হলেন। চলতে চলতে সহচরবৃন্দকে বললেন, তোমরা আরও অগ্রসর হও। শোনো, এই পাহাড়ের নাম জুমদান। 'তাফরীদকারীরা' তো অগ্রগামী হয়ে গিয়েছে। সহচরবৃন্দ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! 'তাফরীদকারী' কারা? তিনি স. বললেন, অত্যধিক জিকিরকারী নারী-পুরুষ। মুসলিম।

হজরত আবু মুসা আশয়ারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যারা জিকির করে এবং যারা জিকির করে না, তাদের দৃষ্টান্ত— জীবিত ও মৃত। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র একদল ফেরেশতা আছে, যারা জিকিরকারীদের সমাবেশ সন্ধান করে ফেরে। কোথাও কোনো জিকিরের সমাবেশ দেখতে পেলে একজন আর একজনকে ডেকে বলে, এসো, এসো, এই যে এখানে। তখন সকলে সেখানে সমবেত হয়। ঘিরে ফেলে জিকিরের মজলিশ। একজনের উপরে একজন— এরকম করতে করতে ফেরেশতাযুথ পৌঁছে যায় আকাশের কাছাকাছি। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও প্রশ্ন করেন, আমার দাসেরা কী বলে? ফেরেশতারা জবাব দেয়, বর্ণনা করে তোমার পবিত্রতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা। আল্লাহ্ বলেন, তারা কী আমাকে দেখেছে?

ফেরেশতারা বলে, না। আল্লাহ্ বলেন, যদি দেখতো? ফেরেশতারা বলে, তবে তো তাদের জিকির ও ইবাদতে প্রকাশ পেতো আরো বেশী আবেগ, উদ্দীপনা ও উচ্ছ্বাস। তোমার পবিত্রতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা প্রকাশ করতো আরো অধিক উৎসাহভরে। আল্লাহ্ বলেন, তারা কী চায়? ফেরেশতারা বলে, জান্নাত। আল্লাহ্ বলেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফেরেশতারা জবাব দেয়, না। আল্লাহ্ বলেন, যদি দেখতো? ফেরেশতারা বলে, তাহলে তো তাদের জান্নাতলাভের কামনা হতো আরো অধিক প্রবল। জান্নাতের জন্য তারা হয়ে উঠতো আরো বেশী চঞ্চল। আল্লাহ্ আবার জিজ্ঞেস করেন, তারা পরিত্রাণার্থী হয় কোন বস্তু থেকে। ফেরেশতারা বলে, জাহান্নাম থেকে। আল্লাহ্ বলেন, তারা কি কখনো জাহান্নাম দেখেছে? ফেরেশতারা বলে, না। আল্লাহ্ বলেন, যদি দেখতো? ফেরেশতারা বলে, তাহলে তো তারা হয়ে যেতো আরো অধিক ভীত-সন্ত্রস্ত। আল্লাহ্ বলেন, হে ফেরেশতামণ্ডলী! তোমরা সাক্ষী থেকো, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। জনৈক ফেরেশতা বলে, কিন্তু তাদের মধ্যে একজন যে ঘটনাক্রমে অকস্মাৎ উপস্থিত হয়েছে। জিকিরের উদ্দেশ্য তার আদৌ নেই। আল্লাহ্পাক বলেন, তা হোক। আমার জিকিরকারী বান্দাগণের সঙ্গে যারা উপবেশন করে, তারা কখনো হতভাগ্য নয়। বোখারী। মুসলিমও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তার বর্ণনাটির শেষাংশ এরকম— জনৈক ফেরেশতা তখন বলে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! একজন পথিক ভুলক্রমে সেখানে বসে পড়েছে। আল্লাহ্ বলেন, আমি মার্জনা করলাম তাকেও। জিকিরকারীদের দলভুক্তরা সৌভাগ্যবঞ্চিত নয়।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, স্বর্গোদ্যানের পাশ দিয়ে গমন করার সুযোগ পেলে স্বর্গস্বাদ গ্রহণ না করে চলে যেয়ো না। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! স্বর্গোদ্যান আবার কী? তিনি স. বললেন, জিকিরের অধিবেশন। তিরমিজি।

হজরত মুয়াবিয়া থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, একবার সাহাবীগণের এক সমাবেশ দেখে রসুল স. থামলেন। বললেন, তোমরা এখানে সমবেত হয়েছো কেনো? সাহাবীগণ বললেন, আমাদেরকে প্রদত্ত অপরিমেয় অনুগ্রহের স্মৃতিচারণার্থে। আমরা অনুগ্রহদাতার স্তব-স্তুতি বর্ণনা করি। তিনিই দয়া করে আমাদেরকে বানিয়েছেন মুসলমান। এ যে তাঁর সীমাহীন কৃপা। রসুল স. বললেন, আল্লাহ্ তোমাদের মতো বান্দাকে নিয়ে গর্ব করেন।

ইমাম মালেক বলেছেন, আমার নিকট এই তথ্যটি পৌঁছেছে যে, রসুল স. বলেছেন, জিকিরমগ্ন ও জিকিরবিচ্যুতদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে যথাক্রমে সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের বিরুদ্ধে অকুতোভয় যোদ্ধা এবং ধর্মযুদ্ধ থেকে পলাতক কাপুরুষ।

বায়ীন বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে উদাসীন ব্যক্তিদের মধ্যে জিকিরকারী যেনো বিরস বৃক্ষকাণ্ডে পল্লবিত শাখা। যেনো অন্ধকার গৃহমধ্যে প্রদীপের আলো। যারা অমনোযোগীদের মধ্যে আল্লাহ্‌র স্মরণমগ্ন, মৃত্যুপূর্বেই আল্লাহ্‌ দেখিয়ে দেন তাদেরকে তাদের জান্নাতের ঠিকানা। তাদের পাপ সকল মানব-দানব-প্রাণী-পাখীর সমতুল হলেও আল্লাহ্‌ তা মাফ করে দেন।

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবালের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে নিষ্কৃতিপ্রদায়ক একমাত্র আমল হচ্ছে জিকির। মালেক, তিরমিজি, ইবনে মাজা।

হজরত আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, ফেরেশতারা জিকিরের সমাবেশকে বৃত্তাকারে ঘিরে রাখে। আল্লাহ্‌র করুণার বিরতিহীন বর্ষণ হয় ওই সমাবেশের উপর। অবতীর্ণ হয় সাকিনা (আত্মিক প্রশান্তি)। আর জিকিরকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ আলোচনা করেন তাঁর নৈকট্যভাজন ফেরেশতাদের সঙ্গে। মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌ বলেন, আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে, তার কাছে আমি তেমনই। আর আমাকে যখন সে স্মরণ করে তখন আমি হই তার সতীর্থ। যদি সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, তবে আমিও তাকে স্মরণ করি সঙ্গোপনে। আর যদি সে আমাকে স্মরণ করে যুথবদ্ধ হয়ে, তবে আমিও তাকে স্মরণ করি ফেরেশতাদের সঙ্গে যুথবদ্ধ হয়ে। বুখারী, মুসলিম।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানকার 'আল্লাহ্‌র স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ' কথাটির মর্মার্থ হচ্ছে— তোমরা আমাকে স্মরণ করলে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো। মানুষ মুখাপেক্ষী। তাই আল্লাহ্‌র জিকির তার কর্তব্য ও প্রয়োজন। কিন্তু আল্লাহ্‌ চিরঅমুখাপেক্ষী। সুতরাং তিনি অন্যের জিকির করবেন কেনো? সুতরাং বুঝতে হবে আল্লাহ্‌র জিকির করার বিষয়টিই সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ। এরকম তাফসীর বর্ণিত হয়েছে মুজাহিদ, ইকরামা ও সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকেও। আর এক বর্ণনানুসারে হজরত ইবনে আব্বাসের তাফসীরও এরকম।

বাগবী লিখেছেন, নাফেয়ের মধ্যস্থতায় মুসা ইবনে উকবার বিবরণে এসেছে, হজরত ইবনে ওমরও সর্বোন্নত সূত্রে রসুল স. থেকে সরাসরি এরকম ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। এমতাবস্থায় আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে এরকম— তোমরা আল্লাহ্‌র জিকির করতে কার্পণ্য কোরো না। কারণ জিকিরকারী আল্লাহ্‌র অতুলনীয় স্মৃতিসন্নিহিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে। সুতরাং মনে রেখো, তোমাদের স্মরণের তুলনায় আল্লাহ্‌র স্মরণ অনেক অনেক বেশী শ্রেষ্ঠ, মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত।

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমরা যা করো, আল্লাহ্ তা জানেন'। আতা বলেছেন, একথার অর্থ— তোমাদের কোনোকিছুই আল্লাহ্র কাছে গোপন নয়।

সূরা আন্‌কাবুত ঃ আয়াত ৪৬

وَلَا تُجَادِلُوٓا اَهۡلَ الۡكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِىۡ هِىَ اَحۡسَنُ ۖ اِلَّا الَّذِيۡنَ ظَلَمُوۡا مِنۡهُمۡ وَقُوۡلُوٓا اٰمَنَّا بِالَّذِىۡۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡنَا وَاُنۡزِلَ اِلَيۡكُمۡ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمۡ وَاحِدٌ وَّنَحۡنُ لَهٗ مُسۡلِمُوۡنَ ﴿۴۶﴾

r তোমরা কিতাবীদিগের সহিত তর্ক-বিতর্ক করিবে, কিন্তু সৌজন্যের সহিত তবে তাহাদিগের সহিত নহে যাহারা উহাদিগের মধ্যে সীমালংঘনকারী। এবং বল, 'আমাদিগের প্রতি ও তোমাদিগের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদিগের ইলাহ্ ও তোমাদিগের ইলাহ্ তো একই এবং আমরা তাঁহারই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমরা কিতাবীর সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে, কিন্তু সৌজন্যের সঙ্গে'। একথার অর্থ— তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদের সঙ্গে গায়ে পড়ে ধর্মালোচনা করতে যেয়ো না। কেননা তারা উন্নাসিক ও কুটিল। তবে যদি পারো, তবে শিষ্টাচার বজায় রেখে কোরআনের সুললিত বাণীর মাধ্যমে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা কোরো। উপস্থাপন করতে প্রয়াস পেয়ো কোরআনের দলিল-প্রমাণসমূহ।

এখানে 'ইল্লা' (তবে) ব্যতিক্রম বোধক অব্যয়টি বিচ্ছিন্নধর্মী, অথবা বিকর্তিত। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— কিতাবীদের উন্নাসিকতার বিপরীতে তোমরা প্রদর্শন কোরো নম্রতা। সহ্য কোরো তাদের আক্রমণাত্মক মনোভাবকে। তিক্ত বিতর্কের দিকে যেয়োই না। আর যেহেতু শুভকামনা ও সদুপদেশ বিতণ্ডার মধ্যে পড়ে না, তাই এখানকার ব্যতিক্রমটিকে বলা যেতে পারে বিকর্তিত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবে তাদের সঙ্গে নয়, যারা তাদের মধ্যে সীমালংঘনকারী'। একথার অর্থ— তবে তাদের মধ্যে যারা চুক্তিভঙ্গকারী এবং জিযিয়া কর দিতে অসম্মত, তাদের সঙ্গে কোনো তর্ক-বিতর্ক নয়, বরং তাদের বিরুদ্ধে কোরো সংগ্রাম। সমুচিত জবাব দিও অস্ত্রের মাধ্যমে। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন সাঈদ ইবনে যোবায়ের। তিনি আরো বলেছেন, বিধর্মী রাষ্ট্রের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে অবশ্য এ বিধানটি কার্যকর নয়। কারণ তাদের নিরাপত্তা মুসলিম রাষ্ট্রের দায়-দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। সুতরাং জিযিয়াও তাদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়।

উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতের বিধানটি জেহাদ অত্যাবশ্যক হওয়ার পূর্বের। কারণ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। আর জেহাদের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হিজরতের পরে মদীনায়। সুতরাং এখানকার 'সীমালংঘনকারী' কথাটির অর্থ হবে দুর্বিনীত, অবাধ্য অথবা শত্রু মনোভাবাপন্ন। কেউ কেউ মনে করেন, এখানে প্রতিবাদী হতে বলা হয়েছে ইহুদী-খৃষ্টানদের ওই সকল অপবচনসমূহের, যেগুলো চরম গর্হিত ও অংশীবাদীতাচ্ছন্ন। যেমন তাদের কেউ কেউ বলে আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ বলে 'আল্লাহ্ অভাবী, আর আমরা ধনী'। আবার কেউ কেউ বলে 'আল্লাহ্ কৃপণ এবং আমরা হচ্ছি দানশীল' ইত্যাদি। এ কারণেই আয়াতটিকে রহিত সাব্যস্ত করেছেন কাতাদা ও মুকাতিল।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং বলো, আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি'। একথার অর্থ— হে রসুলের সহচরবর্গ! তোমরা বলো, আমাদের প্রতি যে গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে, তার প্রতি আমরা তো বিশ্বাস স্থাপন করিই, তৎসঙ্গে বিশ্বাস করি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ তওরাত ও ইঞ্জিলকেও। সুতরাং তোমাদের সঙ্গে আমাদের মনোমালিন্য থাকবে কেনো?

বলা বাহুল্য, এমতো সৌজন্য শোভিত ভাষাতেই দূর করতে হয় মনোমালিন্য ও বিতর্ক। অথবা কথাটিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এভাবে— তওরাত ও ইঞ্জিলের কোনো বাণী যদি অবিকৃতরূপে তোমাদের সামনে পাঠ করা হয়, তবে তোমরা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে নিয়ো। কিন্তু তাদের মনগড়া কোনো কথা মেনো না। যেমন তারা বলে 'নবী মুসার শরিয়ত অনাগতকাল ধরে চলবে' 'নবী ঈসাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে' 'মসীহ হচ্ছেন আল্লাহর পুত্র' ইত্যাদি। এ সকল অসত্য কথনের ক্ষেত্রে হতে হবে প্রচণ্ড প্রতিবাদী। প্রয়োজনে করতে হবে মুবাহিলা। মুবাহিলা বলে 'আমার কথা সত্য না হলে আমার উপরে নেমে আসুক আল্লাহ্র অভিসম্পাত' এরকম শপথানুষ্ঠান। অর্থাৎ তোমরা একথা বোলো যে, আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থের উপরে আমরা অবশ্যই বিশ্বাস রাখি। কিন্তু তোমাদের স্বকপোলকল্পিত অপবচনগুলোকে কিছুতেই মানি না।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমাদের ইলাহ্ ও তোমাদের ইলাহ্ তো একই এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী'। উল্লেখ্য, ইহুদী-খৃষ্টানেরা তাদের বিদ্বজ্জন ও সন্ন্যাসীদেরকে এক ধরনের উপাস্য মনে করো। তাদের এমতো অপবিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ করা হয়েছে আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে। স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, উপাস্য কেবলই আল্লাহ্। অন্য কেউ নয়। আর আমরা কেবল তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পিত।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, ইহুদীরা হিব্রুভাষায় তওরাত আবৃত্তি করতো, তারপর তা বুঝিয়ে দিতো আরবী ভাষায়। ফলে আরবীভাষীরা একথা বুঝতে পারতো না যে, তারা ঠিকমতো ব্যাখ্যা করছে কিনা। এমতো দ্বিধাদ্বন্দ্বেই পতিত হতেন সাহাবীগণ। কারণ তাঁরা হিব্রু জানতেন না। রসুল স. তাই তাঁদেরকে বলতেন, তোমরা তাদের কথা বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কোনোটাই কোরো না। শুধু বোলো, তোমাদের ও আমাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, আমরা তা বিশ্বাস করি।

হজরত নামলা আনসারী বলেছেন, আমি একদিন উপবিষ্ট ছিলাম রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে। একটু পরে সেখানে উপস্থিত হলো একজন ইহুদী। পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো একটি মৃতের জানাযা। ইহুদীটি জিজ্ঞেস করলো, মোহাম্মদ! বলতে পারেন, লাশটি কী বলছে, রসুল স. বললেন, না। ইহুদীটি বললো, সে বলছে এই এই কথাগুলো। ইহুদীটির প্রস্থানের পর রসুল স. আমাদেরকে বললেন, গ্রন্থধারীদের বর্ণনা শরিয়ত বিরুদ্ধে না হলে তোমরা পক্ষে-বিপক্ষে কোনো মন্তব্য কোরো না। কেবল বোলো, আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ্‌কে, তাঁর রসুলগণকে এবং অবতারিত গ্রন্থসমূহকে। এরকম করলে তোমরা পাপ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে।

সূরা আন্‌কাবুত ঃ আয়াত ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَمِنْ هٰۤؤُلَآءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٤٨﴾ بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ؕ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥٠﴾

اَوَ لَمۡ یَکۡفِهِمۡ اَنَّاۤ اَنۡزَلۡنَا عَلَیۡکَ الۡکِتٰبَ یُتۡلٰی عَلَیۡهِمۡ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَرَحۡمَۃً وَّ ذِکۡرٰی لِقَوۡمٍ یُّؤۡمِنُوۡنَ ﴿۵۱﴾

r এইভাবেই আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং যাহাদিগকে আমি কিতাব দিয়াছিলাম তাহারা ইহাতে বিশ্বাস করে এবং ইহাদিগেরও কেহ কেহ ইহাতে বিশ্বাস করে। কেবল সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরাই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।

r তুমি তো ইহার পূর্বে কোন কিতাব পাঠ কর নাই এবং স্বহস্তে কোন কিতাব লিখ নাই যে, মিথ্যাবাদীরা সন্দেহ পোষণ করিবে।

r বস্তুতঃ যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে, তাহাদিগের অন্তরে ইহা স্পষ্ট নিদর্শন। কেবল সীমালংঘনকারীরাই আমার নিদর্শন অস্বীকার করে।

r উহারা বলে, 'তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহার নিকট অলৌকিক নিদর্শন প্রেরিত হয় না কেন?' বল, 'নিদর্শন আল্লাহের ইখ্‌তিয়ারে।' আমিতো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র।'

r ইহা কি উহাদিগের জন্য যথেষ্ট নহে যে, আমি তোমার নিকট কুরআন অবতীর্ণ করিতেছি যাহা উহাদিগের নিকট পাঠ করা হয়। ইহাতে অবশ্যই বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য অনুগ্রহ ও উপদেশ রহিয়াছে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এভাবেই আমি তোমার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করেছি'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনার পূর্বের নবী-রসুলগণের প্রতি আমি যেমন কিতাব অবতীর্ণ করেছিলাম, তেমনি আপনার উপরে অবতীর্ণ করেছি এই কোরআন। সুতরাং এই কোরআন ইতোপূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের প্রত্যয়ক।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম, তারা এতে বিশ্বাস করে'। একথার অর্থ— ইহুদী-খৃষ্টানদের মধ্য থেকে কেউ কেউ তাদের কিতাবকে যেমন বিশ্বাস করে, তেমনি বিশ্বাস করে আলকোরআনকেও। যেমন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম ও তাঁর সঙ্গীগণ। অথবা কথাটির মর্মার্থ হবে— গ্রন্থধারীরা রসুল স. এর মহাআবির্ভাবের পূর্বে কোরআনকে বিশ্বাস করতো।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং এদেরও কেউ কেউ এতে বিশ্বাস করে'। একথার অর্থ— আপনার স্বজাতি এই মক্কাবাসীদের মধ্যেও কেউ কেউ কোরআনকে বিশ্বাস করে। এভাবে হয়ে যায় মুসলমান এবং আপনার ঘনিষ্ঠ সহচর।

তারপর বলা হয়েছে— 'কেবল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাই আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে'। একথার অর্থ ইহুদী-খৃষ্টান-পৌত্তলিকদের কেউ কেউ কোরআনে বিশ্বাসী বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই আবার কোরআনের প্রতি অবিশ্বাসী। এরাই চিরহতভাগ্য, প্রকৃত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। এরা কেবল কোরআন থেকে বিমুখ তা নয়, একই সঙ্গে বিমুখ আল্লাহ্ ও আল্লাহ্ কর্তৃক অবতারিত অন্যান্য আকাশী গ্রন্থ থেকেও। কারণ কোরআন অস্বীকার করার অর্থ এর অবতারক আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা। আর আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করার অর্থ আল্লাহ্ কর্তৃক অবতারিত সমূদয় আকাশী গ্রন্থকে অস্বীকার করা, তওরাত-ইঞ্জিল যার অন্যতম। সুতরাং যারা দাবি করে 'আমরা তওরাত-ইঞ্জিলে বিশ্বাস করি, কিন্তু কোরআনে আমাদের বিশ্বাস নেই' তাদের দাবি অযৌক্তিক ও অগ্রহণীয়। কাতাদা বলেছেন, কোনোকিছুর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর তাকে অস্বীকার করার নাম 'জুহুদ'। ইহুদী-খৃষ্টানেরা রসুল স. এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কোরআন সম্পর্কে আগে থেকেই জানতো। তৎসত্ত্বেও তারা তাঁকে এবং কোরআনকে করেছিলো অস্বীকার। এটাই তাদের 'জুহুদ' বা অস্বীকৃতি।

পরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'তুমি তো এরপূর্বে কোনো কিতাব পাঠ করোনি এবং স্বহস্তে কোনো কিতাব লিখোনি যে, মিথ্যাবাদীরা সন্দেহ পোষণ করবে' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আমি আপনাকে করেছি উম্মি (অক্ষরের অমুখাপেক্ষী)। তাই তো গ্রন্থপঠন ও গ্রন্থরচনার দায় আপনার নেই। এমতো দায় যদি আপনার থাকতো, তবে তো ইহুদী-খৃষ্টান-পৌত্তলিকেরা এই মর্মে সন্দেহ পোষণ করতে পারতো যে, আপনি এই কোরআন রচনা করেছেন অধিত বিদ্যার উপরে ভর করে। কিন্তু সেরকম সন্দেহের অবকাশ তো এখানে নেই। সুতরাং যারা আপনাকে ও কোরআনকে অস্বীকার করে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

এখানে 'এর পূর্বে' অর্থ এই কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে। 'বি ইয়ামিনিকা' অর্থ স্বহস্তে, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা। লেখালেখি করা হয় সাধারণতঃ ডান হাত দিয়েই। তাই 'স্বহস্তে' কথাটির উল্লেখের প্রয়োজন এখানে ছিলো না। তৎসত্ত্বেও লিপিক্রিয়ার সন্দেহকে সম্পূর্ণ অপসারণার্থেই শব্দটিকে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে এভাবে।

'মিথ্যাবাদীরা' অর্থ এখানে মক্কার মুশরিকেরা। রসুল স.কে কখনো পড়তে এবং লিখতে না দেখা সত্ত্বেও যেহেতু তারা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশকে সন্দেহের চোখে দেখতো, তাই তাদেরকে এখানে বলা হয়েছে মিথ্যাবাদী। কাতাদার ব্যাখ্যা এরকমই।

মুকাতিল বলেছেন, এখানকার 'মুবত্বীলূন' অর্থ মিথ্যানুসারী ইহুদী-খৃষ্টান। তারা তাদের আপনাপন ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে পূর্বাহ্নেই একথা জানতে পেরেছিলো

যে, সর্বশেষ রসুল হবেন অক্ষরের অমুখাপেক্ষী— উম্মি। তৎসত্ত্বেও তারা ছিলো সন্দেহের আবর্তে ঘূর্ণায়মান। এমতো সচেতন সন্দেহ প্রকশ করার কারণেই তাদেরকে এখানে বলা হয়েছে 'মুবত্বীলূন' বা মিথ্যানুসারী।

এরপরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'বস্তুতঃ যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে এটা স্পষ্ট নিদর্শন'। একথার অর্থ— যাদেরকে দেওয়া হয়েছে বিশ্বাসজ জ্ঞান, তাদের হৃদয়েই কোরআন সুরক্ষিত ও সুমুদ্রিত। কোরআন যে রসুল স. কর্তৃক লিখিত, সম্পাদিত অথবা সংকলিত কোনো গ্রন্থ নয়, এ যে এক সুস্পষ্ট নিদর্শন— একথা সম্যক উপলব্ধি করতে পারে কেবল তারাই। কোরআন স্বমহিমায় সতত সত্যাধিষ্ঠিত। আর বিশ্বাসীরাই এর ধারক, বাহক, সংরক্ষক, প্রচারক ও বাস্তবায়ক। পরিযোজন, পরিবিয়োজন ও পরিবর্ধন থেকে এই কোরআন চিরসুরক্ষিত। অন্যান্য আসমানী গ্রন্থাবলীর এমতো বৈশিষ্ট্য নেই। এছাড়া এ অনন্য গ্রন্থ সর্বযুগে বহুসংখ্যক বিশ্বাসী সহজে স্মৃতিবদ্ধ করে রাখে। আর অন্যান্য গ্রন্থ স্মৃতিবদ্ধ হওয়ার ঘটনা বিরল। সেগুলো পঠিত হয় দেখে দেখে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'হুয়া' সর্বনামটির লক্ষ্য রসুল স. এর মহিমাময় সত্তা। আর 'যাদেরকে দেওয়া হয়েছে জ্ঞান' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে ইহুদী-খৃষ্টানদেরকে। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— তওরাত ও ইঞ্জিলে রয়েছে রসুল স. এর বৈশিষ্ট্যাবলীর বিশদ বিবরণ। সুতরাং তারা তাঁকে ভালো করেই চেনে। আর একথাও ভালো করে জানে যে কোরআন দিবালোকাপেক্ষা অধিক সুস্পষ্ট একটি নিদর্শন।

এরপর বলা হয়েছে— 'কেবল সীমালংঘনকারীরাই আমার নিদর্শন অস্বীকার করে'। 'জুলুম' অর্থ অপাত্রে স্থাপন। অর্থাৎ যথাসীমা উল্লংঘন। কোরআনের শব্দাবলী ও মর্ম স্বমহিমায় সতত সুস্পষ্ট ও সুপ্রকট। এতদসত্ত্বেও যে এই অপার্থিব নিদর্শনকে অস্বীকার করে সে সীমালংঘনকারী বৈকি।

এরপরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'তারা বলে, তার প্রতিপালকের নিকট থেকে তার নিকট অলৌকিক নিদর্শন প্রেরিত হয় না কেনো'? একথার অর্থ— মক্কার মুশরিকেরা বলে, মোহাম্মদ যদি নবীই হবেন, তবে পূর্ববর্তী নবীগণের মতো তার সঙ্গে অলৌকিকত্ব নেই কেনো? যেমন নবী সালেহের উষ্ট্রী, নবী মুসার যষ্টি, নবী ঈসার আসমানী আহার্যাধার।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলো, নিদর্শন আল্লাহ্‌র এখতিয়ারে। আমি তো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদীদের অপকথনের জবাবে জানিয়ে দিন, নিদর্শন তো সম্পূর্ণতঃই আল্লাহ্‌র

অভিপ্রায়াধীন বিষয়। আর আমি তো প্রেরিত হয়েছি মানুষকে সতর্ক করণার্থে। আমার কাজ শুধু এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করা যে, হে বিভ্রান্ত মানুষ! পরিত্যাগ করো আল্লাহ্দ্রোহিতার পথ। ফিরে এসো মহাসত্যের আশ্রয়ে। নতুবা পৃথিবীতে ও পরবর্তী পৃথিবীতে অথবা কেবল পরবর্তী পৃথিবীতে তোমাদের উপরে আপতিত হবে আল্লাহ্র আযাব।

এরপরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে— 'এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার নিকট কোরআন অবতীর্ণ করছি যা তাদের নিকট পাঠ করা হয়'। একথার অর্থ'— তারা কেবল নিদর্শন নিদর্শন করে চেঁচায়। কিন্তু এই সর্ববৃহৎ নিদর্শনটিকে কেনো উপলব্ধি করতে পারে না যে, সর্বজ্ঞানের আধার এই কোরআন যিনি তাদের সামনে প্রতিনিয়ত পাঠ করে চলেছেন, তিনি অক্ষরপরিচয়বিমুক্ত।

এখানে 'আল কিতাব' অর্থ কোরআন, যা একাধারে সুবৃহৎ নিদর্শন ও যাবতীয় জ্ঞানের আকর। আবার যা ধর্মবিধানের ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে অবতারিত গ্রন্থসমূহের সমান্তরাল।

জনৈক কবি বলেছেন—

লাম তাক্বতারিন বিযমানিন ওয়াহিয়া তুখবিরুহা
আনিল মাআ'দি ওয়া আ'ন আ'দিন ওয়া আন ইরামী
দামাত লাদাইনা ও ফাক্বত কুললা মু'জিযাতিন্
মিনান নাবীয়্যিনা ইজ জ্বাআত ওলাম তুদামী।

অর্থঃ যে সময় রসুল স. আবির্ভূতই হননি, কোরআন আমাদেরকে জানায় সেই সময়ের ইতিবৃত্ত— আ'দ জাতির ও সাবা নগরীর। আরো জানায় অনাগত ভবিষ্যতের সংবাদ— মহাপ্রলয়। এই অপার্থিব বাণীসম্ভার আমাদের জীবনে প্রবহমান রয়েছে কাল থেকে কালান্তরে। এই নিদর্শনটি সকল নবীর নিদর্শনরাজি অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ। কারণ এর অলৌকিকত্ব অবিনশ্বর। আর সকল নবীর অলৌকিকত্ব এর অন্তর্ভূত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এতে অবশ্যই বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য অনুগ্রহ ও উপদেশ রয়েছে।

এখানে 'ফী জালিকা' অর্থ এতে, এই কোরআনে। যা সকলের জন্য উন্মুক্ত একটি চিরন্তন মোজেজা। 'লিক্বওমিঁই ইয়ু'মিনূন' অর্থ বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য। অর্থাৎ তাদের জন্য, অবিশ্বাস, অপবিশ্বাস ও একদেশদর্শিতা যাদের স্বভাব নয়।

ইমাম দারেমীর মসনদে এবং আবু দাউদের মারাসীলে আমর ইবনে দীনারের পদ্ধতিতে ইয়াহ্ইয়া ইবনে যায়দার বরাতে প্রায়োন্নতরূপে ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার কিছুসংখ্যক মুসলমান একটি পশুর

উরুদেশের অস্থি নিয়ে উপস্থিত হলেন রসুল স. সকাশে। ওই অস্থিপটে লিপিবদ্ধ ছিলো ইহুদীদের নিকট থেকে শোনা কিছু কথা। রসুল স. তা দেখে বললেন, বিভ্রান্তিতে নিপতিত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, মানুষ তাদের নিজস্ব নবীর উপরে অবতারিত বিষয়াবলীকে উপেক্ষা করে অতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ করে অন্য কোনো নবীর বিষয়ে। একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো— আওয়ালাম ইয়াকফীহিম আন্না আনযালনা আলাইকাল কিতাবা ......(তাদের জন্য এটা কি যথেষ্ট নয় যে,— আমি আপনার উপর অবতীর্ণ করেছি কিতাব)। এক বর্ণনায় এসেছে, একবার ইহুদী কা'ব ইবনে আশরাফ বললো, মোহাম্মদ! আপনি যে রসুল সে বিষয়ে কোনো সাক্ষী আছে কী? তখন অবতীর্ণ হলো—

সূরা আন্‌কাবুত ঃ আয়াত ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِيْ وَ بَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ
الْخٰسِرُوْنَ ﴿۵۲﴾ وَ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ وَ لَوْ لَاۤ اَجَلٌ
مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ؕ وَ لَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّ هُمْ لَا
يَشْعُرُوْنَ ﴿۵۳﴾ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ ۢ
بِالْكٰفِرِيْنَ ۙ ﴿۵۴﴾ يَوْمَ يَغْشٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ
اَرْجُلِهِمْ وَ يَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۵۵﴾ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْۤا اِنَّ اَرْضِىْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّاىَ فَاعْبُدُوْنِ ﴿۵۶﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ
الْمَوْتِ ۟ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿۵۷﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿۵۸﴾ ۖۗ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَ عَلٰى
رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿۵۹﴾

r বল, 'আমার ও তোমাদিগের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তিনি অবগত এবং যাহারা অসত্যে বিশ্বাস করে ও আল্লাহ্কে অস্বীকার করে তাহারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।'

r উহারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করিতে বলে, যদি শাস্তির কাল নির্ধারিত না থাকিত তবে শাস্তি উহাদিগের উপর আসিত। নিশ্চয়ই উহাদিগের উপর শাস্তি আসিবে আকস্মিকভাবে, উহাদিগের অজ্ঞাতসারে।

r উহারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করিতে বলে, জাহান্নাম তো সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণকে পরিবেষ্টন করিবেই।

r সেইদিন শাস্তি উহাদিগকে গ্রাস করিবে ঊর্ধ্ব এবং অধঃদেশ হইতে এবং তিনি বলিবেন 'তোমরা যাহা করিতে তাহার স্বাদ গ্রহণ কর।'

r হে আমার বিশ্বাসী দাসগণ! আমার পৃথিবী প্রশস্ত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।

r জীব মাত্রই মরণশীল; অতঃপর তোমরা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।

r যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আমি অবশ্যই তাহাদিগের বসবাসের জন্য সুউচ্চ প্রাসাদ দান করিব জান্নাতে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে, কত উত্তম পুরস্কার সৎকর্মশীলদিগের,

r যাহারা ধৈর্য অবলম্বন করে ও তাহাদিগের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! যারা সাক্ষী তালাশ করে তাদেরকে বলুন, আল্লাহ্ই তো আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট। অন্য সাক্ষীর আর প্রয়োজন কী? আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত কিছুই তাঁর জ্ঞানায়ত্ত। আর যারা এই সত্যকে অবিশ্বাস করেছে ও আল্লাহর প্রতি জানিয়েছে অস্বীকৃতি, তারা জান্নাতের বদলে গ্রহণ করেছে জাহান্নাম। এভাবে চিরতরে হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে অসত্যে বিশ্বাস করে, অর্থ আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের উপাসনা করে। মুকাতিল বলেছেন, কথাটির অর্থ— তারা পূজা করে অন্যের।

পরের আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— 'তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, যদি শাস্তির কাল নির্ধারিত না থাকতো তবে শাস্তি তাদের উপর আসতো। নিশ্চয়ই তাদের উপর শাস্তি আসবে আকস্মিকভাবে, তাদের অজ্ঞাতসারে'।

নজর ইবনে হারেছ বলেছিলো, হে আল্লাহ্! মোহাম্মদের কথা যদি সত্যি হয়, তবে আকাশ থেকে আমার উপর প্রস্তর বর্ষণ করো। তার এ কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

হজরত ইবনে আব্বাস এখানকার 'আজ্বালুম মুসাম্‌মা' কথাটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় রসুলকে বলেছেন, 'আপনার জাতিকে সমূলে ধ্বংস করবো না' এরকম অঙ্গীকার যদি আপনার সঙ্গে আমার না থাকতো, তাহলে অবশ্যই তাদের উপর নেমে আসতো আমার সর্বগ্রাসী শাস্তি। একারণেই আমি মহাপ্রলয় পর্যন্ত আপনার উম্মতের উপর সর্বগ্রাসী আযাব স্থগিত রেখেছি। একথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে অন্য এক আয়াতেও। যেমন— 'বালিস সায়াতু মাওইদুহুম' (বরং মহাপ্রলয়ই হচ্ছে তাদের শাস্তির অঙ্গীকৃত সময়)।

জুহাক বলেছেন, 'আজ্বালুম মুসাম্মা' অর্থ এখানে আয়ুষ্কাল। অর্থাৎ নির্ধারিত আয়ুষ্কাল শেষে তাদের উপর নেমে আসবে শাস্তি। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'নির্ধারিত কাল' অর্থ বদর যুদ্ধ। অর্থাৎ বদর যুদ্ধই হচ্ছে তাদের শাস্তির নির্ধারিত সময়।

'লা জ্বাআ হুমুল আ'জাব' অর্থ নিশ্চয় তাদের উপর শাস্তি আসবে। 'লাইয়া'তিইয়ান্‌নাহুম' অর্থ অবশ্যই তাদের উপর আসবে। এখানকার 'হুম' সর্বনামটি যুক্ত হবে 'শাস্তি' অথবা 'সময়' যে কোনো একটির সঙ্গে।

'বাগতাতান্' অর্থ অকস্মাৎ। অর্থাৎ আকস্মিকভাবে এই পৃথিবীতেও কখনো কখনো শাস্তি এসে পড়তে পারে। যেমন এসে পড়েছিলো বদর যুদ্ধের সময়। আর স্থায়ী শাস্তি তো নির্ধারিত রয়েছে পরকালের জন্য। আর 'লা ইয়াশউ'রূন' অর্থ তাদের অজ্ঞাতসারে।

এরপরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে— 'তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে; জাহান্নাম তো সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে পরিবেষ্টন করবেই'।

এখানে 'আলকাফিরীন' (সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা) এর 'আলিফ লাম' অঙ্গীকৃত প্রকৃতির অব্যয়। এখানে সর্বনামের স্থলে প্রকাশ্যত নামপদ 'আলকাফিরীন' উল্লেখ থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, রীতিমতো আযাব তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেই। অথবা বলা যেতে পারে, 'আলিফ লাম' এখানে জাতিবাচক। এমতাবস্থায় সাধারণ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিধান বর্ণনা করে এখানে বিশেষ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকেও (নজর ইবনে হারেছকেও) এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এরপরের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— 'সেদিন শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে ঊর্ধ্ব ও অধঃদেশ থেকে এবং তিনি বলবেন, তোমরা যা করতে তার স্বাদ গ্রহণ করো'। একথার অর্থ— মহাবিচার পর্ব শেষ হবার পর শুরু হবে তাদের অন্তহীন

শাস্তি। সকল দিক থেকেই তারা হবে মহাশাস্তিপরিবেষ্টিত। আর আল্লাহ্ তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, পৃথিবীতে তোমরা যে মহাঅপরাধ করতে আজ ভোগ করো তার প্রতিফল।

এরপরের আয়াতে (৫৬)বলা হয়েছে— 'হে আমার বিশ্বাসীদাসগণ! আমার পৃথিবী প্রশস্ত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো'। একথার অর্থ— হে আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী ব্যক্তিবর্গ! তোমাদের স্বসমাজ ও স্বদেশ যদি আমার ইবাদতের অন্তরায় হয়, তবে তোমরা হিজরত করে চলে যাও অন্য কোনো দেশে, যেখানে রয়েছে আমার ইবাদত করার অবাধ সুযোগ। ভুলে যেয়ো না, আমার পৃথিবী প্রশস্ত।

এখানকার 'ইয়্যাইয়া' হচ্ছে একটি প্রচ্ছন্ন ক্রিয়ার কর্মপদ। ওই উহ্য পদসহ বাক্যাংশটি দাঁড়ায় 'উ'বুদূ ইয়্যাইয়া' (শুধু আমারই ইবাদত করে)।

মুকাতিল ও কালাবী বলেছেন, সামর্থ্যহীনতার কারণে যে সকল মক্কাবাসী মুসলমান হিজরত করতে পারেননি, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তাঁদের সম্পর্কে। একথার প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে দুর্বলচেতা মুসলমান! মক্কায় যদি তোমরা প্রকাশ্যে ইমানের ঘোষণা দিতে না পারো, তবে হিজরত করে গমন করো অন্য কোনো স্থানে, যেমন মদীনায়। সেখানে তোমরা ইমান ও ইবাদতের ব্যাপারে হতে পারবে অপ্রতিরোধ্য। মনে রেখো, আমার দুনিয়া অবিস্তৃত নয়।

মুজাহিদ বক্তব্যটির অর্থ করেছেন— আমার পৃথিবী সুবিস্তৃত। সুতরাং জন্মভূমি ছেড়ে চলে যাও নিরাপদ কোনো স্থানে। সেখানে গিয়ে ইবাদত বন্দেগী করো এবং শক্তি সঞ্চয় করো যুদ্ধের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করো হৃত জন্মভূমি। সাইদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, বক্তব্যটির মর্মার্থ হবে এরকম— কোনো জনপদে যদি ব্যাপকভাবে পাপের প্রসার ঘটে, তবে ওই জনপদ পরিত্যাগ করে অন্যত্র গমন করো। আতা অর্থ করেছেন— তোমার আপন বসতি যদি পাপেপাপে ছেয়ে যায়, তবে সেখান থেকে চলে যাও অন্য কোনো জায়গায়, সেখানে রয়েছে পুণ্যকর্ম সম্পাদনের অবাধ অবকাশ। কেননা আমার ভূপৃষ্ঠ এতো সংকীর্ণ নয়।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, কিছু সংখ্যক মুসলমান হিজরতের নিরুদ্দেশ যাত্রাকে মেনে নিতে পারলেন না। ভাবলেন, বিদেশ বিভুঁয়ে আমরা আবাস ও আহার্যের অভাবে ধুঁকে ধুঁকে মরবো। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁদের এমতো চিন্তাকে প্রশ্রয় দেননি। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে খণ্ডন করেছে তাঁদের অজুহাত।

মাতরাফ ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, এখানে 'আমার পৃথিবী প্রশস্ত' অর্থ আমার উপজীবিকা সুপ্রশস্ত। অর্থাৎ ধর্মরক্ষার জন্য তোমরা দেশত্যাগ করো। উপজীবিকা দেবো তো আমিই। রসুল স. জানিয়েছেন, কেবল ধর্মরক্ষার্থে যদি কেউ জন্মভূমি পরিত্যাগ করে স্থানান্তরে গমন করে, তবে সে হয়ে যায় জান্নাতের যোগ্য। এমতাবস্থায় এক বিঘত স্থান অতিক্রম করলেও সে হয়ে যায় মোহাম্মদ ও ইব্রাহিমের প্রিয়জন। প্রায়োন্নত সূত্র পরম্পরায় হাসান বাসরী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ছা'লাবী।

এরপরের আয়াতে (৫৭) বলা হয়েছে— 'জীব মাত্রই মরণশীল; অতঃপর তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে'। একথার অর্থ— তোমরা মৃত্যুভয়ে অন্যত্র গমনে অনীহ, কিন্তু মনে রেখো, মৃত্যুকে তোমরা কখনোই এড়াতে পারবে না। নির্ধারিত সময়ে সকলকেই গ্রহণ করতে হবে মৃত্যুর তিক্ততম আস্বাদ। সুতরাং সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করো নির্বিঘ্ন ইবাদতের বিষয়টিকে। হিজরত করো এভাবে যথাপ্রস্তুতি গ্রহণ করো মৃত্যুর জন্য। অবশেষে আমার কাছে তো তোমাদেরকে চূড়ান্ত জবাবদিহি করতেই হবে। তখন আমিই তোমাদের জন্য নির্ধারণ করবো চিরস্বস্তি অথবা চিরশাস্তি।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আমি অবশ্যই তাদের বসবাসের জন্য সুউচ্চ প্রাসাদ দান করবো জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। কতো উত্তম পুরস্কার সৎকর্মশীলদের (৫৮), যারা ধৈর্য অবলম্বন করে ও তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে (৫৯)।

এখানে 'আল্লাজিনা সাবারূ' অর্থ যারা ধৈর্য অবলম্বন করে। অর্থাৎ যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অত্যাচার, হিজরত এবং নানাবিধ দুঃখ যাতনা সহ্য করে নেয়, নির্ভর করে কেবল আপন প্রভুপালকের উপর। উল্লেখ্য, এধরনের ধৈর্যশীলদেরকে আল্লাহ্তায়ালা জীবনোপকরণ প্রদান করেন তাদের কল্পনাতীত সূত্রে।

বাগবী লিখেছেন, হিজরতের নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পর অনেকেই হিজরত করলেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক মুসলমান তখনো রয়ে গেলেন মক্কায়। তাঁরা বলতে শুরু করলেন, মদীনা তো আমাদের জন্য প্রবাস। সেখানে যে আমাদের ঘর দোর বিষয় সম্পত্তি কিছুই নেই। তাদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো—

সূরা আন্‌কাবুত ঃ আয়াত ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩

وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖ اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ ۖ

وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦٠﴾ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٦١﴾ اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَ يَقْدِرُ لَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٦٢﴾ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٣﴾

r এমন বহু জীব-জন্তু আছে যাহারা নিজদিগের খাদ্য মওজুদ রাখে না; আল্লাহ্ই জীবনোপকরণ দান করেন উহাদিগকে ও তোমাদিগকে; এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

r যদি তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, 'কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন?' উহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্।' তাহা হইলে উহারা কোথায় ফিরিয়া যাইতেছে।

r আল্লাহ্ তাঁহার দাসদিগের মধ্যে যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং যাহার জন্য ইচ্ছা উহা হ্রাস করেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

r যদি তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, ভূমি মৃত হইবার পর আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়া কে উহাকে সঞ্জীবিত করে? উহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্।' বল, 'প্রশংসা আল্লাহেরই' কিন্তু ইহা উহাদিগের অধিকাংশই অনুধাবন করে না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এমন বহু জীব-জন্তু আছে, যারা নিজেদের খাদ্য মওজুদ রাখে না; আল্লাহ্ই জীবনোপকরণ দান করেন, তাদেরকে ও তোমাদেরকে'। একথার অর্থ— বিহঙ্গকুল, অসংখ্য চতুষ্পদ জন্তু ও অন্যান্য প্রাণী পানাহারের মুখাপেক্ষী। তৎসত্ত্বেও তারা পানাহারসামগ্রী বয়ে নিয়ে বেড়ায় না। রিজিকের সঞ্চয়ও তাদের নেই। তাদেরকেও তো রিজিক আল্লাহ্ই দেন, যেমন দেন তোমাদেরকে। যারা সঞ্চয়প্রবণ।

সুফিয়ান ইবনে আলী ইবনে আরকাম বলেছেন, মানুষ, ইঁদুর ও পিপীলিকা ছাড়া অন্য কোনো প্রাণী আহার্যসঞ্চয়ী নয়। সুতরাং এমতাবস্থায় আলোচ্য উদ্ধৃতাংশের মর্মার্থ দাঁড়াবে— ভূচর, জলচর ও খেচর সকলেরই রিজিকের

প্রয়োজন। অথচ তারা সঞ্চয়ী নয়। তাদের রিজিকও তো আল্লাহ্ই সরবরাহ করেন। আর তোমরা যারা সঞ্চয় করে রাখো, তাদেরও একমাত্র রিজিকদাতা তো আমিই। সুতরাং এমন কেউই নেই, যারা আমা কর্তৃক প্রদত্ত জীবনোপকরণনির্ভর নয়। এভাবে এক সময় সকলেরই সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে পার্থিব জীবনোপকরণের সঙ্গে। তখন সকলকেই বরণ করতে হয় মৃত্যু— সঞ্চয়ীদেরকেও। অসঞ্চয়ীদেরকেও। যেখানেই তারা অবস্থান করুক না কেনো — গৃহে অথবা প্রবাসে। সুতরাং হে মানুষ! জীবনোপকরণ চিন্তা তো তোমাদের প্রয়োজন বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য নয়। তোমরা না বিশ্বাসী। তোমাদের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আল্লাহর নির্দেশানুগত হওয়া। তাঁর নির্বিঘ্ন ইবাদত করার বিষয়টিকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ'। একথার অর্থ— মনে রেখো আল্লাহ্ই সর্বশ্রোতা। সুতরাং হিজরত করার ব্যাপারে তোমরা যে বাচনিক অনাগ্রহ প্রকাশ করেছো, তা তিনি ঠিকই জানতে পেয়েছেন। আরো মনে রেখো, তিনি সর্বজ্ঞও। সুতরাং তোমাদের হৃদয়ের বিশ্বাসগত দুর্বলতার বিষয়টিকেও তিনি ভালো করেই জানেন।

শিথিল সূত্রে আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে আবী হাতেম, বায়হাকী, ইবনে আসাকের ও বাগবী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, আমি একবার রসুল স. এর সঙ্গে জনৈক আনসারের খেজুর বাগানে প্রবেশ করলাম। তিনি গাছ থেকে পাকা খেজুর ছিঁড়ে খেতে শুরু করলেন। বললেন, তুমিও খাও। আমি বললাম, হে আল্লাহের রসুল! আমার খেতে ইচ্ছে করছে না। তিনি স. বললেন, আমার খুব খেতে ইচ্ছে করছে। কারণ চার দিন ধরে আমি অভুক্ত। আমি নিবেদন করলাম 'ইন্না লিল্লাহিল মুসতাআন' (আমরা তো ওই সাহায্যদাতা আল্লাহ্র জন্য)। তিনি স. বললেন, শোনো আবদুল্লাহ্! আমি চাইলে আল্লাহ্ আমাকে দান করতেন পারস্যরাজ ও রোম সম্রাটের চেয়েও অধিক সম্পদ। কিন্তু আমি তো তা চাই না। চাই একদিন অভুক্ত থাকি। আর একদিন করি পানাহার। তোমার আয়ুষ্কাল যদি দীর্ঘ হয়, তবে তোমাদেরকে বাস করতে হবে ওই লোকদের সঙ্গে, যারা খাদ্যশস্য গুদামজাত করে রাখে। আল্লাহ্ যে সকল প্রাণীর রিজিকদাতা, সে বিশ্বাস তাদের থাকবে না। হজরত ইবনে ওমর বলেন, আমি ওই স্থান পরিত্যাগ করার আগেই অবতীর্ণ হলো— এমন বহু জীব-জন্তু আছে, যারা নিজেদের খাদ্য মওজুদ রাখে না.......।

হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. আগামী দিনের জন্য কোনো সঞ্চয় রাখতেন না। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি এবং বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত।

হজরত ওমর বলেছেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, তোমরা যদি আল্লাহ্‌র প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হতে, তবে তিনি তোমাদেরকে সেভাবেই রিজিক দিতেন, যেমন দিয়ে থাকেন পক্ষীকুলকে। তারা উষাকালে নীড় ত্যাগ করে শূন্য উদরে, আর সন্ধায় ফিরে আসে নীড়ে পরিতৃপ্ত হয়ে। তিরমিজি, ইবনে মাজা।

হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে আচরণ জান্নাতের সমীপবর্তী করে এবং দোজখকে করে দূরবর্তী, তার সংবাদ আমি তোমাদেরকে জানিয়েছি। জানিয়েছি ওই বিষয়াবলীর কথাও, যা দোজখকে নিকটবর্তী করে এবং দূরে রাখে জান্নাতকে। ভ্রাতা জিব্‌রাইল আমার হৃদয়ে আর একটি কথা উদয় করিয়ে দিয়েছে। কথাটি এই— নির্ধারিত রিজিক শেষ হওয়ার আগে কেউই মৃত্যুবরণ করবে না। অতএব তোমরা সতর্ক হও। ভয় করো আল্লাহ্‌কে। আর রিজিক অন্বেষণে অবলম্বন করো উত্তম পন্থা। বিলম্বিত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ধৈর্যচ্যুত হয়ে অবৈধ পথে রিজিক আহরণের চেষ্টা কোরো না। কারণ, আল্লাহ্‌র কাছে যা সংরক্ষিত, তা তাঁর আনুগত্য বিহনে অর্জিত হয় না। বাগবী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর 'শরহে সুন্নাহ্'য় এবং 'মারাসীল' রচয়িতা বর্ণনা করেছেন তাঁর নিজস্ব গ্রন্থে।

পরের আয়াতে (৬১) বলা হয়েছে— 'যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্। তাহলে তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছো? একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করে দেখুন— 'আকাশ-পৃথিবীর স্রষ্টা এবং চন্দ্র-সুর্যের নিয়ন্ত্রক কে? দেখবেন তারা দ্বিধাহীনভাবে উত্তর দিবে— আল্লাহ্। এরপরেও দেখুন তারা আল্লাহ্‌কে ত্যাগ করে গ্রহণ করেছে পৌত্তলিকতাকে। বিষয়টি বিস্ময়ের নয় কি?

এরপরের আয়াতে (৬২) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ তো সকলকেই রিজিক দেন। তবে কাউকে দেন অপরিমেয় এবং কাউকে পরিমিত। এমতো তারতম্য সম্পূর্ণতই তাঁর অভিপ্রায়াগত। আর কল্যাণকর-অকল্যাণকর সকল বিষয়ই তাঁর জ্ঞানায়ত্ত।

হজরত আনাস থেকে বাগবী কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসে এসেছে, আল্লাহ্‌পাক বলেন, আমার কোনো কোনো বান্দা অতিরিক্ত ইবাদতের অভিলাষ জানায়। কিন্তু আমি তাদেরকে সে সুযোগ দেই না। কারণ অতিরিক্ত ইবাদত তাদেরকে অহংকারী করবে। ফলে তার সবকিছু হয়ে যাবে বরবাদ। আবার আমার কোনো কোনো স্বচ্ছল দাস এমন, যাদের ইমান রক্ষা হয় ওই স্বচ্ছলতার

কারণেই। যদি আমি তাদেরকে বিত্তশূন্য করি, তবে তারা হয়ে যাবে ইমানহারা। কতক বান্দা আবার এমন যে, কপর্দকশূন্যতাই তাদের ইমানকে সতেজ রাখে। যদি আমি তাদেরকে বিত্তপতি করি, তবে তারাও হয়ে যাবে ইমানবিচ্যুত। আবার সুস্থতার কারণে ইমান রক্ষা করে চলেছে— এমন কিছু সংখ্যক বান্দাও আমার রয়েছে। তাদেরকে যদি আমি পীড়িত করি তবে তাদের ইমান রক্ষা করা হবে দুষ্কর। আবার কেউ কেউ এর বিপরীত। রোগগ্রস্ততাই তাদের ইমানকে সবল রাখে। তাদেরকে যদি আমি রোগমুক্ত করি, তবে তারা হারিয়ে ফেলবে ইমান। নিশ্চয় আমি আমার বান্দাগণের অন্তরের খবর জানি। তাই তাদের ইমান রক্ষার জন্য আমি করেছি যথাযথ ব্যবস্থা। আমি তো সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।

এরপরের আয়াতে (৬৩) বলা হয়েছে— 'যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো, ভূমি মৃত হবার পর আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করে কে তাকে সঞ্জীবিত করে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্'।

মক্কাবাসীরা একথা প্রকাশ্যে স্বীকার করতো যে, আল্লাহ্ই আকাশ পৃথিবীর স্রষ্টা, চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রণকারী এবং আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করে বিশুষ্ক মৃত্তিকাকে সঞ্জীবনকারী। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা মূর্তিপূজাকে মনে করতো ইবাদত। তাই ইতোপূর্বে উল্লেখিত ৬১ সংখ্যক আয়াতের শেষাংশে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে— তাহলে তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে। আলোচ্য উদ্ধৃতাংশের প্রশ্নোত্তরটিও সেরকম। অর্থাৎ এখানেও দেখা যাচ্ছে, তাদের পূজিত দেব-দেবীগুলোকে নয়, আকাশ থেকে বারিবর্ষণকারীরূপে এবং তার ফলে সঞ্জীবিত মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন রিজিকদাতা হিসেবে তারা মানে আল্লাহ্কেই। অথচ কী বিস্ময়ের ব্যাপার ! পৌত্তলিকতাকে তারা পরিত্যাগ করে না কিছুতেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলো, প্রশংসা আল্লাহ্রই'। একথার অর্থ— হে আমার বার্তাবাহক! আপনি এই ভেবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন যে, আল্লাহ্পাক আপনাকে অংশীবাদীদের অপধারণা থেকে সুরক্ষিত রেখেছেন। অথবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন একারণে যে, তাদের এমতো স্বীকৃতি হয়ে যায় আপনার পক্ষেরই প্রমাণ। আর আল্লাহ্ই এমতো প্রমাণকে করে দিয়েছেন প্রবলতর।

শেষে বলা হয়েছে— 'কিন্তু এটা তাদের অধিকাংশই অনুধাবন করে না'। একথার অর্থ— আল্লাহ্র মহাসৃজয়িতা ও মহাপালয়িতা হওয়ার বিষয়টি যখন সর্বজন স্বীকৃত তখন, একথা তো সহজেই অনুমেয় যে, ইবাদত করতে হবে কেবল তাঁর, অন্য কারো বা অন্য কোনোকিছুর নয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এই সহজসরল সত্যটি অনুধাবন করতে পারে না।

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّ لَعِبٌ ؕ وَ اِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿۶۴﴾ فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿۶۵﴾ لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۚ وَلِيَتَمَتَّعُوْا ٝ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿۶۶﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّ يُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ؕ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ ﴿۶۷﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهٗ ؕ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿۶۸﴾ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۶۹﴾

q এই পার্থিব জীবন তো ক্রীড়াকৌতুক ব্যতীত কিছুই নহে। পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন। যদি উহারা জানিত।

q উহারা যখন জলযানে আরোহণ করে তখন উহারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌কে ডাকে; অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়াইয়া উহাদিগকে উদ্ধার করেন তখন উহারা তাঁহার শরীক করে।

q ফলে, উহারা উহাদিগের প্রতি আমার দান অস্বীকার করে এবং ভোগবিলাসে মত্ত থাকে; অচিরেই উহারা জানিতে পরিবে।

q উহারা কি দেখে না আমি হারম্‌কে নিরাপদ স্থান করিয়াছি অথচ ইহার চতুষ্পার্শ্বে যেসব মানুষ আছে তাহাদিগের উপর হামলা করা হয়। তবে কি উহারা অসত্যেই বিশ্বাস করিবে এবং আল্লাহের অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

q যে-ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁহার নিকট হইতে আগত সত্যকে অস্বীকার করে তাহার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে? সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগের আশ্রয়স্থল তো জাহান্নামই।

q যাহারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাহাদিগকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করিব। আল্লাহ্ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদিগের সংগে থাকেন।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এই পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত কিছু নয়। পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন'।

এখানে 'হাজিহিল হায়াতুদ দুন্ইয়া' অর্থ পার্থিব তুচ্ছ জীবন। 'লাহ্বু' অর্থ ওই বস্তু যা কল্যাণকামিতার অন্তরায়। অর্থাৎ ওই সকল কর্মকাণ্ড যা আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের পথের প্রতিবন্ধক। 'লায়ী'ব' অর্থ অনর্থক ক্রীড়া-কৌতুক। পৃথিবী অবক্ষয়প্রবণ, অনিত্য ও নশ্বর। তাই পৃথিবীকে বলে দুনিয়া। পার্থিব সকল কিছুই উদ্দেশ্যহীন ক্রীড়া-কৌতুকের অর্ন্তভূত। কিন্তু পৃথিবীতে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সম্পাদিত ইবাদতসমূহ কিন্তু দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এগুলো আখেরাত। কারণ এগুলোর প্রতিফল পাওয়া যাবে আখেরাতেই।

'পারলৌকিক জীবনই প্রকৃত জীবন' অর্থ পারলৌকিক জীবন মৃত্যুহীন, পৃথিবীর জীবনের মতো তা জরা-মৃত্যুর অধীন নয়। আর এখানকার 'হায়াওয়ান' (জীবন) শব্দটি ধাতুমূল। এর মূল রূপ ছিলো 'হায়ায়ান্'। উল্লেখ্য, অর্থগত দিক দিয়ে 'হায়াত' অপেক্ষা হায়ায়ান' অধিক সঙ্গতিপূর্ণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'যদি তারা জানতো'। একথার অর্থ— পৃথিবী নশ্বর এবং আখেরাত চিরস্থায়ী, একথা যদি তারা জানতো, তবে আখেরাতকেই তারা প্রাধান্য দিতো পৃথিবীর উপর।

পরের আয়াতে (৬৫) বলা হয়েছে— 'তারা যখন জলযানে আরোহণ করে তখন তারা বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্কে ডাকে'। একথার অর্থ— যদি ওই অংশীবাদীরা জলযানারোহী হয়ে সমুদ্রযাত্রা করে এবং সমুদ্র মধ্যে হঠাৎ শুরু হয় ঝড়। তখন উত্তাল নীলাম্বরাশি দেখে মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে নিবিষ্টচিত্তে ডাকে কেবল আল্লাহ্কেই, দেব-দেবীদের কথা তখন আর তাদের মনে থাকে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখন তারা তাঁর শরীক করে'। একথার অর্থ— ওই ঝড়কবলিতদের জলযান তারপর আমি নিরাপদে ভিড়িয়ে দেই তীরে। কিন্তু তখন তারা আর আমার দয়ার কথা মনে রাখে না। পুনরায় ফিরে যায় অংশীবাদিতায়।

ইকরামা বলেছেন, মূর্খতার যুগে বিগ্রহ-অর্চকেরা সমুদ্রযাত্রার প্রাক্কালে সঙ্গে নিতো বিগ্রহ-মূর্তি। কিন্তু সমুদ্রবক্ষে অকস্মাৎ তুফান শুরু হলে তারা বিগ্রহগুলিকে ছুঁড়ে ফেলে দিতো সমুদ্রে। আর চিৎকার করে ডাকতো, হে আমাদের পালনকর্তা! হে আমাদের প্রভুপালক! বাঁচাও! বাঁচাও! তারপর তুফান থেমে গেলে নিরাপদে কুলে ওঠার পর পুনরায় অর্চনা শুরু করতো বিগ্রহমূর্তির।

এরপরের আয়াতে (৬৬) বলা হয়েছে— 'ফলে তারা তাদের প্রতি আমার দান অস্বীকার করে এবং ভোগবিলাসে মত্ত থাকে; অচিরেই তারা জানতে পারবে'। অংশীবাদীদেরকে আলোচ্য আয়াতে ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছে চরমভাবে। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'তোমরা যা খুশী তা করো, সুনিশ্চিত, আমি তার পরিদর্শক'। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— তারা এখন বিপদমুক্ত। সুতরাং তারা এখন আমার দয়া ও দান থেকে মুখ ফিরিয়ে তো নিবেই অংশীবাদিতা ও পার্থিব ভোগবিলাসে মত্ত তো হবেই। তারা যে অকৃতজ্ঞ। কিন্তু এখানেই তো শেষ নয়। অচিরেই তারা জানতে পারবে তাদের পরিণাম কতো অশুভ।

এরপরের আয়াতে (৬৭) বলা হয়েছে— 'তারা কি দেখেনা আমি হারামকে নিরাপদ স্থান করেছি, অথচ চতুষ্পার্শ্বে যে সব মানুষ আছে তাদের উপর হামলা করা হয়। তবে কি তারা অসত্যেই বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করবে'? একথার অর্থ— দাম্ভিক ও নির্বোধ মক্কাবাসীরা আল্লাহ্‌র এই অনন্য অনুগ্রহের প্রতি লক্ষ্য করে না কেনো যে, আমি তাদেরকে করেছি হেরেমবাসী, ফলে তাদের বসবাস হয়েছে পূর্ণ নিরাপদ, অথচ চতুর্দিকের অন্যান্য জনপদগুলো কতো অশান্ত— সেগুলোতে অহরহ চলেছে লুণ্ঠন, ছিনতাই ও রক্তপাত। তারা তো হেরেমবাসী বলে বহি-শত্রুর আক্রমণ থেকেও সুরক্ষিত। মুক্ত আ'দ ও ছামুদ জাতির উপরে আপতিত সর্বগ্রাসী আযাবের মতো আযাব থেকে। এভাবে আমার অনুগ্রহবেষ্টিত হয়ে থাকা সত্ত্বেও তাদের জন্য অংশীবাদিতা কি শোভন, না সমীচীন। এভাবে তারা কি ক্রমাগত আমার অনুগ্রহের অবমাননা করেই চলবে?

এখানে 'তবে কি তারা অসত্যেই বিশ্বাস করবে' কথাটির অর্থ— তবে কি তারা আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করে উপাস্যরূপে গ্রহণ করবে তাদের মিথ্যা মাবুদগুলোকে। উল্লেখ্য, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সকল কিছুই বাতিল (মিথ্যা)। যেমন রসুল স. সদয় মন্তব্য করেছেন, কবি লোবিদের পদ্যটি কতোই না সুন্দর। সে বলেছে— আলা কুললা শাইইন মা খালাল্লহু বাত্বিল (মনের কান দিয়ে শোনো, আল্লাহ্ ব্যতীত সকল কিছুই অবান্তর)।

'আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করে' অর্থ যেহেতু তারা আল্লাহ্‌র ইবাদতের ক্ষেত্রে তাদের পূজনীয় প্রতিমাগুলোকে সমকক্ষ হিসেবে দাঁড় করায় সেহেতু তারা অবলীলায় অস্বীকার করে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজিকে। কোনো কোনো জ্ঞানীজন বলেছেন, এখানে 'আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ' বলে বোঝানো হয়েছে রসুল স. এর সুমহান ব্যক্তিত্বকে, অথবা কোরআনকে।

এরপরের আয়তে (৬৮) বলা হয়েছে— 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর নিকট থেকে আগত সত্যকে অস্বীকার করে তার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে'? একথার অর্থ— যে ব্যক্তি আল্লাহ্পাকের সমকক্ষ হিসেবে মিথ্যা উপাস্য স্থির করে, অথবা তাঁর নিকট থেকে সমাগত মহাগ্রন্থ কোরআনের বাণীকে করে প্রত্যাখ্যান, তার চেয়ে অধিক সীমালংঘনকারী আর কেউ নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের আশ্রয়স্থল তো জাহান্নামই'। একথার অর্থ— অবশ্যই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের আসল ঠিকানা জাহান্নাম। এখানকার এই প্রশ্নটি স্বীকৃতিসূচক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যখন তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করলো, মহা সত্যের বাণীকে করলো অস্বীকার, তখন কি তারা জাহান্নামের উপযোগী হলো না? অবশ্যই হলো। অথবা মর্মার্থ হবে— জাহান্নাম যে তাদের স্থায়ী ঠিকানা তা কী তারা জানে না? তাহলে তাদের এতো বড় স্পর্ধা কেনো যে, তারা আল্লাহ্র সমকক্ষ দাঁড় করাবে এবং অস্বীকার করবে তার বাণীকে। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটিতে জাহান্নামই যে তাদের চিরস্থায়ী আবাস, সেকথাটাই প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে। আর শেষোক্ত ব্যাখ্যায় পরিস্ফুট হয়েছে তাদের অনপনেয় দাম্ভিকতার বিষয়টি।

শেষোক্ত আয়াতে (৬৯) বলা হয়েছে— 'যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করবো'। একথার অর্থ— যারা প্রবৃত্তির প্রতিপক্ষে দাঁড়ায় বিশুদ্ধচিত্তে মেনে চলে আমার আদেশ ও নিষেধাজ্ঞাসমূহের সীমানা, আমি অবশ্যই তাদেরকে সন্ধান দেই আমার সন্তোষার্জনের নির্ভুল পথের।

এখানে 'আল্লাজীনা জ্বাহাদু' (যারা সংগ্রাম করে) কথাটির 'জ্বাহাদু' (সংগ্রাম) অর্থ সথাসাধ্য চেষ্টা করা। এমতো প্রাণপন চেষ্টার নামই এখানে সংগ্রাম করা। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যারা সমর প্রান্তরে আল্লাহ্র শত্রুর বিরুদ্ধে মরণপন যুদ্ধ করে এবং শান্তির সময় করে প্রবৃত্তির কঠোর বিরুদ্ধাচরণ, তাদেরকেই আমি পরিচালিত করি আমার পথে।

'ফীনা' অর্থ আমার জন্য আমার পরিতোষ কামনায়। 'সুবুলানা' অর্থ আমার পথে, আমার সমীপবর্তী হওয়ার পথে। অথবা পুণ্যের পথে। অথবা তাদেরকে পরিচালিত করি পূন্যের পথে। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'যারা হেদায়েত চায়, আল্লাহ্ তাদেরকে অতিরিক্ত হেদায়েত দিয়েই দেন'।

হজরত আবু দারদা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, 'ফরমান' অর্থ যে ব্যক্তি তার পরিচিত পথে চলার চেষ্টা করে, আমি তাকে এমন পথের সন্ধান দেই, যা সে পূর্বে জানতো না।

আতা বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ— যে ব্যক্তি আমার পরিতুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করে, আমি তাকে দেই পুণ্যপথের সন্ধান। জুরাইজ বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করে, আল্লাহ্ তাকে প্রদর্শন করেন বিশুদ্ধপথ।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেছেন, যখন জনগণের মধ্যে বিস্তর মতপ্রভেদ দেখতে পাবে, তখন ধোরো সীমান্তপ্রহরীদের পথ। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন— যারা আমার পথে জেহাদ করে আমি তাদেরকে পথ দেখাই। সম্ভবতঃ তাঁর মতে এখনকার 'জ্বাহাদু' অর্থ জেহাদ (ধর্মযুদ্ধ)।

হাসান বলেছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রাম হচ্ছে কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম। ফজল ইবনে আয়াজ বলেছেন, যারা জ্ঞানান্বেষণের পথে চেষ্টা করেছে, আল্লাহ্ তাকে বলে দেন জ্ঞানানুযায়ী কর্ম সম্পাদনের পন্থা। সুহাইল ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, যারা সুন্নত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, আমি তাদেরকে জান্নাতের পথ বলে দেই।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির মর্মার্থ— যে ব্যক্তি আমার আনুগত্যের চেষ্টা চালায়, আমি তাকে সন্ধান দেই পুণ্যপথের ।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে থাকেন'। একথার অর্থ— যারা সৎকর্মপরায়ণ, ইহকালে তারা পায় আল্লাহ্র বিশেষ সাহায্য এবং পরকালে পায় মার্জনা ও পুণ্য।

সুফী দার্শনিকগণ বলেন, আল্লাহপাক মিতাচারীদের সঙ্গী। কিন্তু এমতো সঙ্গতা অননুভবনীয়। দিব্য দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণই কেবল পেতে পারেন এমতো অননুভবনীয় সাহচর্যের প্রচ্ছন্ন পরিচয়।

উল্লেখ্য, আলোচ্য কাব্যে সর্বনামের স্থলে সরাসরি নামপদ 'আল্লাহ্' ব্যবহার করা হয়েছে বক্তব্যটিকে অধিকতর বেগবান করার উদ্দেশ্যে।

সূরা রূম

মক্কায় অবতীর্ণ এই সুরাটি ৬ রুকু এবং ৬০ আয়াত বিশিষ্ট।

ইবনে শিহাব জুহুরী সূত্রে ইবনে আবী হাতেম, ইকরামা, ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াসার এবং কাতাদা সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর হিজরত পূর্ব সময়ের মক্কার মুসলমানেরা দিনাতিপাত করতো নিজগৃহে পরবাসীদের মতো। তাঁদেরকে নীরবে সয়ে যেতে হতো বিধর্মীদের ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও বিভিন্ন রকমের অত্যাচার। আর বাদানুবাদ, তর্কবিতর্ক তো ছিলো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সে

সময় পারস্য ও রোম এই দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ-সংঘর্ষ লেগেই থাকতো। পৌত্তলিকেরা ছিলো পারস্যের সমর্থক। আর মুসলমানেরা অনুরক্ত ছিলো রুমীয়দের। পৌত্তলিকেরা বলতো, তোমরা বলো রুমীয়রা আহলে কিতাব, আর পারস্যবাসীরা অগ্নিউপাসক। অথচ দ্যাখো পারস্যবাসীরাই এবার জয়ী হয়েছে। আর তোমরা যাকে নবী মানো, তার উপরেও তো কিতাব নাজিল হয়েছে বলে দাবি করো। একথাও বলো যে, ওই কিতাবের বদৌলতে তোমরাও আমাদের উপরে বিজয়ী হবে। কিন্তু দেখলে তো কিতাবী রোমীয়দের অবস্থা। সুতরাং বিজয়ের আশা আর কোরো না। পারস্যবাসী অগ্নিউপাসকেরা যেমন কিতাবী রোমীয়দের উপরে বিজয়ী হয়েছে, মনে রেখো তেমনি করে আমরাও তোমাদের উপরে থাকবো বিজয়ী।

উল্লেখ্য, নিম্নোক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে এই পটভূমিকায়।

সূরা রূম ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ﴿١﴾ غُلِبَتِ الرُّوْمُ ﴿٢﴾ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ
سَيَغْلِبُوْنَ ﴿٣﴾ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ؕ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ؕ وَ
يَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٤﴾ بِنَصْرِ اللّٰهِ ؕ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ
هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٥﴾ وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦﴾ يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖۚ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٧﴾

r আলিফ-লাম-মীম,

r রোমকগণ পরাজিত হইয়াছে, —

r নিকটবর্তী অঞ্চলে, কিন্তু উহারা উহাদিগের এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হইবে।

r কয়েক বৎসরের মধ্যেই। পূর্বের ও পরের সিদ্ধান্ত আল্লাহ্‌রই। আর সেই দিন মু'মিনগণ হর্ষোৎফুল্ল হইবে,

r আল্লাহ্‌র সাহায্যে। তিনি যাহাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

r ইহা আল্লাহ্‌রই প্রতিশ্রুতি; আল্লাহ্‌ তাঁহার প্রতিশ্রুতি ব্যতিক্রম করেন না, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

r উহারা পার্থিব জীবনের বাহ্য দিক সম্বন্ধে অবগত, আর আখিরাত সম্বন্ধে উহারা গাফিল।

প্রথমেই উল্লেখিত হয়েছে বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি আলিফ লাম মীম। এগুলোর মর্ম দুর্জ্ঞেয়। চিররহস্যাচ্ছন্ন এমতো অক্ষরবিন্যাস সন্নিবেশিত হয়েছে কোরআন মজীদের কোনো কোনো সুরার শীর্ষে। আল্লাহ্‌ এবং তাঁর প্রিয়তম রসুল এ সম্পর্কে সম্যক অবগত। আর তাঁদের এই অবগতির বৃত্তভূত হওয়ার সদয় অনুমতি লাভ করেছেন অল্পকিছুসংখ্যক সৌভাগ্যবান বিদ্বজ্জন। তাঁদেরকেই বলা হয় ওলামায়ে রসিখীন বা জ্ঞানে সুগভীর।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'রোমকগণ পরাজিত হয়েছে'।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'নিকটবর্তী অঞ্চলে'। এখানে 'আদনাল আরদ্ব' (নিকটবর্তী অঞ্চল) অর্থ আরব ভূখণ্ডের ওই এলাকা, যা রোমীয় রাজ্যের সন্নিকটবর্তী। এখানকার 'আলআরদ্ব' এর আলিফ লাম আকাংখা প্রকাশক। অর্থাৎ ওই ভূখণ্ড ছিলো আরববাসীদের কামনার বস্তু। কেননা ওই অঞ্চল তাদেরই ভূখণ্ডভূত। অথবা বলা যেতে পারে, 'আলিফ লাম' এখানে ব্যবহৃত হয়েছে সম্বন্ধপদের পরিবর্তে। একারণে দ্বিতীয় ভাষ্যটিই অধিকতর বিশুদ্ধ।

ইকরামা বলেছেন, এখানে 'আদনাল আরদ্ব' বলে বুঝানো হয়েছে সিরিয়ার আজরাত ও কাসকর অঞ্চলকে। মুজাহিদ বলেছেন, বুঝানো হয়েছে আরব উপদ্বীপকে। অপর এক বর্ণনানুসারে মুজাহিদ বলেছেন, শব্দটির উদ্দেশ্য জর্দান ও ফিলিস্তিন।

রোম ও পারস্যের জয়-পরাজয় নিয়ে মক্কার মুসলমান ও মুশরিকদের মধ্যে প্রায়শঃই তর্কবিতর্ক বেঁধে যেতো। এ সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিরমিজি ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এবং হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, মক্কার অংশীবাদীরা চাইতো পারস্যের বিজয়। কেননা পারস্যবাসীরা ছিলো তাদের মতোই অংশীবাদী। আর মুসলমানেরা চাইতো জয় হোক রোমের। কারণ রোমকরা ছিলো গ্রন্থধারী। কিন্তু দেখা গেলো এক যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে পারস্য। এ সংবাদ শুনে মক্কার অংশীবাদীরা উৎফুল্ল হলো খুব। তারা হজরত আবু বকরের বাড়ীতে যেয়ে শ্লেষাত্মক সুরে জানালো সংবাদটি। তিনি মনঃক্ষুণ্ন হলেন। বিষয়টি গোচরীভূত করলেন রসুল স. এর। রসুল স.

বললেন, খুব শিগগির রোমকরা বিজয়ী হবে। হজরত আবু বকর খুশী হলেন এবং এ কথা প্রচারও করলেন। মুশরিকেরা বললো, কিন্তু কতোদিনের মধ্যে। আমরা তো ভবিষ্যদ্বাণীতে আস্থাশীল নই। সুতরাং নির্দিষ্ট দিন তারিখ বলে দাও এবং এ ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে বাজী ধরো। নির্ধারণ করো কোনো কিছু সম্পদ। ওই সম্পদ পাবে তারাই, যারা জিতবে। শেষ পর্যন্ত চুক্তি হলো। সময় বেঁধে দেওয়া হলো পাঁচ বৎসর। কিন্তু পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও রোমকদের পুনর্বিজয়ের কোনো সংবাদ পাওয়া গেলো না। হজরত আবু বকর রসুল স.কে কথাটা জানালেন। রসুল স. তাঁকে বললেন, তুমি দশবছরের কথা বলে চুক্তিবদ্ধ হলে না কেনো? কিন্তু এরপর খুব বেশী দিন গত না হতেই এসে পড়লো রোমকদের বিজয়ের সংবাদ। এই বিজয়ের সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে পরবর্তী আয়াতসমূহে।

সুফিয়ান বলেছেন, আমি শুনেছি রোমকগণ বিজয়ী হয়েছে বদর যুদ্ধের সময়। হাদিসটি বিভিন্ন প্রসিদ্ধ পদ্ধতিতে অসংখ্যবার বিবৃত হয়েছে হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত বারা ইবনে আজীব ও হজরত লিয়ার ইবনে মুকরিম থেকে।

এর পরে বলা হয়েছে— 'কিন্তু তারা তাদের এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে'।

এর পরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'কয়েক বৎসরের মধ্যে'। এখানে 'বিদ্বউ'ন' অর্থ কয়েক বৎসর — এক থেকে সাত অথবা নয় বৎসর। জুহুরী বলেছেন দশের কম সংখ্যার উপরে প্রয়োগ করা হয় 'বিদ্বউ'ন' অথবা 'বিদ্বআ'তুন' দশের অধিক সংখ্যার ক্ষেত্রে শব্দটির ব্যবহার অপ্রচল। কিন্তু জুহুরীর এই অভিমতটি অযথার্থ। কারণ তা হাদিসের বিপরীত। যেমন রসুল স. বলেছেন— 'আল ইমানু বিদ্বউঁ ওয়া সাবউনা শু'বাহ্' (ইমানের শাখা কিঞ্চিদধিক সত্তরটি ।

বাগবী লিখেছেন, পারস্য ও রোমের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। মক্কার মুশরিকেরা কামনা করতো পারস্যের বিজয়। কেননা তারা ছিলো অংশীবাদী। আর রোমকরা বিজয়ী হোক এমতো আকাংখা করতো মুসলমানেরা। কারণ তারা ছিলো আহলে কিতাব খৃষ্টান। পারস্য সেনাধ্যক্ষ শাহরিয়াযাদ এবং রোমক সেনাপতি ইয়াহিসের বিশাল বাহিনী দু'টোর মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষের পর দেখা গেল বিজয়ী হয়েছে পারস্য বাহিনী। যুদ্ধ সম্পন্ন হয়েছিলো সিরিয়া ও বসরা অঞ্চলের আজরেআত নামক এক সুবিশাল প্রান্তরে। মক্কার মুসলমানেরা মর্মাহত হলেন। আর আনন্দে অধীর হয়ে গেলো মুশরিকেরা। মুসলমানদেরকে ব্যঙ্গ করে বলতে লাগলো, তোমাদের মতো গ্রন্থধারী খৃষ্টানেরা। অথচ বিজয়ী হয়েছে অগ্নি উপাসকেরা। সুতরাং বুঝে নাও, তোমরা যদি কখনো আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, তবে এমনি করেই পরাভূত হবে। তাদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিত

অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াতগুচ্ছ। রোমকদের বিজয় সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হজরত আবু বকর মুশরিকদেরকে ডেকে বললেন, আনন্দে আটখানা হয়ো না। আমাদের রসুল জানিয়েছেন, কিছুকাল পরে রোমকরা পরাস্ত করবে পারস্য বাহিনীকে। উবাই ইবনে খালফ একথা শুনে বললো, তোমরা অসত্যভাষী। হজরত আবু বকর বললেন, কখনোই নয়। উবাই বললো, তাহলে দশটি উটের বাজী ধরো। যার কথা ঠিক হবে সেই বাজী জিতবে। হজরত আবু বকর বললেন, আমি মেনে নিলাম। তিন বছরের চুক্তি সম্পাদিত হলো দু'জনের মধ্যে। রসুল স. একথা শুনে হজরত আবু বকরকে বললেন, আমি তো তোমাকে কোনো সময় নির্ধারণ করে দেইনি। কয়েক বছর (বিদ্বউন) অর্থ তো তিন থেকে নয় বৎসর। সুতরাং তুমি উবাইয়ের সঙ্গে পুনঃচুক্তি বদ্ধ হও। উটের পরিমাণ ও মেয়াদের বছর দু'টোই বাড়িয়ে নাও। হজরত আবু বকর উবাইয়ের সঙ্গে দেখা করলেন। উবাই বললো, নির্ঘাত পরাজয়ের কথা ভেবে কি তুমি ইতোমধ্যেই লজ্জিত হতে শুরু করলে নাকি? হজরত আবু বকর বললেন, আরে না। তবে বাজীর মাল ও মেয়াদ দু'টোই বাড়িয়ে দিলে ভালো হয়। উবাই একথায় সম্মত হলো। নির্ধারিত হলো, বাজী যে জিতবে সে পাবে একশত উট। আর সময় তিন বছর থেকে বাড়িয়ে করা হলো নয় বছর। কিছু দিন পর উবাইয়ের মনে হলো হজরত আবু বকর দেশত্যাগী হবেন। তাই সে বললো, হে আবু বকর! মনে হচ্ছে তুমি আর এখানে থাকবে না। সুতরাং এখনই তুমি তোমার একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করে রেখে দাও। হজরত আবু বকর বললেন, ঠিক আছে, আমি যদি অবর্তমান হই, তবে আমার প্রতিনিধি হবে আমার পুত্র আবদুল্লাহ্।

উহুদের রণক্ষেত্রে রসুল স. এর অস্ত্রের আঘাতে আহত হয়েছিলো উবাই। মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলো মক্কায় ফেরার পর। এরপর রোমকদের হাতে পারস্য পরাস্ত হয়েছিলো হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়। বর্ণনান্তরে বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে। বাজীর চুক্তি অনুসারে তখন অতিক্রান্ত হয়েছিলো সাত বছর। উল্লেখ্য, ঘটনাটি ঘটেছিলো বাজী-জুয়া নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে।

শা'বী লিখেছেন, বাজীর চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই রোমকরা পরাজিত করেছিলো পারস্য বাহিনীকে। রোমকরা তাদের যুদ্ধাশ্বগুলোকে বেঁধে রেখেছিলো পারস্যরাজের ইরাকস্থ রাজধানী মাদায়েনে। বিজয়ের সংবাদ শোনার পর হজরত আবু বকর দেখা করলেন উবাইয়ের উত্তরাধিকারীর সঙ্গে। তার কাছ থেকে বাজীর একশতটি উট আদায় করে হাজির হলেন রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে। রসুল স. আজ্ঞা করলেন, এগুলো আল্লাহ্র পথে দরিদ্র-মিসকিনদের মধ্যে বিলি-বণ্টন করে দাও। হজরত আবু বকর থেকে তিরমিজিও এরকম বর্ণনা করেছেন। আর ঘটনাটি ঘটেছিলো বাজী ধরা নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে।

মাসআলা ঃ এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম আবু হানিফা বলেন, যুদ্ধ বিগ্রহরত মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে অসিদ্ধ চুক্তি সিদ্ধ, এমনকি সুদের আদান প্রদানও। অর্থাৎ এমতাবস্থায় কাফেরদের সম্পদ অধিকার করাই মূল উদ্দেশ্য। তবে শর্ত একটিই— আমানতদারী যেনো বিপন্ন না হয়। কারণ জিযিয়া প্রদানের মাধ্যমে যে সকল বিধর্মী রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা (জিম্মি) লাভ করে, তাদের সম্পদ কৌশলে বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে করায়ত্ত করা কোনো অবস্থায় সিদ্ধ নয়।

বাগবী লিখেছেন, ইকরামার বর্ণনায় এসেছে, পারস্যরাজের সেনাধিনায়ক শাহরিয়াযাদ বিজয়ী হলো। দখল করলো রোম সাম্রাজ্যের বিশাল এলাকা। বিজিত জনপদগুলোর উপরে অবাধে চললো হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ। এভাবে এক সময় বিজয়ী বাহিনী উপস্থিত হলো উপসাগরের বেলা ভূমিতে। সেনাধিনায়কের সঙ্গে ছিলো তার কণিষ্ঠ সহোদর ফরমান। বিজয়ের আনন্দে সে হয়ে গেলো আত্মহারা। একদিন সে তার সতীর্থদেরকে নিয়ে মদ্যপানের আসর বসালো। এক সময় ঘোর মাতাল অবস্থায় বলে উঠলো, আমিই পারস্যের সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী। তার একথা পৌঁছে গেলো পারস্যরাজের কানে। রোষান্বিত রাজা শাহরিয়াযাদকে লিখলো তোমার উপ-সেনাধিনায়ক ফরমানের মস্তক আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। শাহরিয়াযাদ লিখলো, মহামান্য রাজা! শত্রুপক্ষ ফরমানের ভয়ে সদাশংকিত থাকে। এমন বীর দুর্লভ। সুতরাং আদেশ প্রত্যাহার করুন। রাজা এবার লিখলো পারসীয়রা বীরেরই জাতি। ফরমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বীরের অভাব পারস্যে নেই। সুতরাং এই মুহূর্তে নির্দেশ কার্যকর করো। কিন্তু শাহরিয়াযাদ পুনরায় নির্দেশ প্রত্যাহরের জন্য অনুরোধ জানালো। পারস্যরাজ হলো মহাক্ষিপ্ত। সে এবার নির্দেশ প্রেরণ করলো সরাসরি ফরমানের কাছে। লিখলো, আমি শাহরিয়াযাদকে পদচ্যুত করে তদস্থলে তোমাকে প্রধান সেনাধিনায়করূপে নিযুক্ত করলাম। যথাশীঘ্র সম্ভব দায়িত্ব বুঝে নাও। এই নির্দেশের সঙ্গে দূতের নিকট আরো একটি পত্র দিলো পারস্যরাজ। ওই পত্রে লিখিত ছিলো শাহরিয়াযাদের মৃত্যু-পরওয়ানা। দূতকে বললো, এই পত্রটি ফরমানকে দিয়ো সৈনাপত্যের দায়িত্ব বুঝে নেয়ার পর।

রাজার নির্দেশে শাহরিয়াযাদের নিকট থেকে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব বুঝে নিলো ফরমান। শাহবিয়াযাদও বিনা প্রতিবাদে অনুগত হলো অনুজের। এরপর দূত নতুন সেনাপতির হাতে তুলে দিলো দ্বিতীয় পত্রটি। ফরমান সঙ্গে সঙ্গে তলব করলো শাহরিয়াযাদকে। জল্লাদকেও ডেকে এনে বললো, একে এক্ষুণি বধ্যভূমিতে নিয়ে যাও। শাহরিয়াযাদ বললো, হে মহাসেনাপতি! কিঞ্চিত বিলম্ব করুন। আমাকে কমপক্ষে একটি অছিয়তনামা লিখবার অবকাশ তো দিন। ফরমান তার আবেদন মঞ্জুর করলো। ইত্যবসরে শাহরিয়াযাদ তার অবস্থানে ফিরে

গিয়ে নথিপত্র ঘেটে বের করলো পারস্যরাজের ওই পত্রদু'টো, যাতে ছিলো ফরমানের মস্তকছেদনের নির্দেশ। পত্রদু'টো নিয়ে সে পুনরায় হাজির হলো ফরমানের সামনে। পত্রদুটো তার হাতে তুলে দিয়ে বললো, আমিও তো এরকম নির্দেশ পেয়েছিলাম। কিন্তু অনর্থক ভ্রাতৃহন্তারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চাইনি। আর তুমি এখন তাই করতে চাও। ফরমান সম্বিত ফিরে পেলো। স্বেচ্ছায় পুনরায় প্রধান সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব অর্পণ করলো অগ্রজকে।

এরপর দুইভাই মিলে ভাবতে বসলো, কী করে রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করা যায়। দু'জনে পরামর্শক্রমে ঠিক করলো, রোমক সেনাপতিকে দলে ভেরাতে হবে। একথা ভেবেই একটি পত্র প্রেরণ করা হলো রোমক সেনাপতির কাছে। লেখা হলো— আমি পারস্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি শাহরিয়াযাদ। একটি বিশেষ ব্যাপারে আপনার ও আমার একান্ত সাক্ষাত নিতান্ত প্রয়োজন। তাই আমার প্রস্তাব— আপনি ও আমি দু'জনেই মাত্র পঞ্চাশ জন বিশ্বস্ত সৈন্য নিয়ে অন্য সকলের অজ্ঞাতে একস্থানে মিলিত হই। আপনি সম্মত থাকলে জানান। রোমক সেনাপতি গুপ্তচরের মাধ্যমে পরিস্থিতি আঁচ করে নিলো। সম্মতিপত্র প্রেরণ করলো তারপর। শুরু হলো একান্ত সাক্ষাতের আয়োজন। একটি নির্জন স্থানে মিলিত হলো একটি অস্থায়ী মিলনায়তনে। যথাসময়ে সেখানে দোভাষীসহ মিলিত হলো দুই রাজ্যের দুই প্রধান সেনাপতি। মাত্র একটি করে খঞ্জর তখন সঙ্গে ছিলো তাদের। শুরু হলো আলাপচারিতা। শাহরিয়াযাদ বললো, আমি ও আমার ভাই ফরমান আপনার সামাজ্যের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছি। বিজয় কেতন উড়িয়েছি আপনার সাম্রাজ্যের বিশাল এলাকায়। কিন্তু এখন আমরা দু'জনেই বিব্রত ও বিপর্যস্ত। পারস্যরাজ আমাদের কাউকেই আর বিশ্বাস করতে পারছে না। বার বার একজনের প্রতি নির্দেশ পাঠাচ্ছে আরেক জনের মস্তক ছেদনের। অথচ আমরা দু'জন জমজ। একজনের মৃত্যু হলে আরেকজনও বেশীদিন বাঁচবে না। এমতাবস্থায় রাজাকে উৎখাত না করা পর্যন্ত আমরা কেউই নিরাপদ নই। তাই আমরা উভয়ে মনস্থির করেছি, এবার তাকে উৎখাত করতেই হবে। কিন্তু ব্যাপরটা সহজ নয়। তাই আমরা এ ব্যাপারে আপনার সহায়তা চাই। এখন আপনি কী বলেন? রোমক সেনাপতি বললো, আপনার প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করলাম। যথাপ্রস্তুতি গ্রহণ করুন। বিষয়টি ছিলো অত্যন্ত গোপন এবং অতীব স্পর্শকাতর। তাই দুই সেনাপতির সিদ্ধান্তক্রমে হত্যা করা হলো দোভাষীদ্বয়কে। পারস্য ও রোমক সৈন্যের যৌথ আক্রমণে অবরুদ্ধ হলো পারস্যরাজ। প্রাণপনে বাধা দিলো তার অনুগত বাহিনী। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলোনা। নিহত হলো রাজা। এভাবে রোমকেরা লাভ করলো কাংখিত বিজয়। হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন এ সংবাদ পৌঁছলো রসুল স. সকাশে। মুসলমানেরা একথা শুনে আনন্দিত হলেন খুব। বাস্তবায়িত হলো রসুল স. এর ভবিষ্যদ্বাণী। অবতীর্ণ হলো— আলোচ্য আয়াতগুচ্ছ।

কোনো কোনো ক্বেরাত অনুসারে আলোচ্য আয়াতের শব্দবিন্যাস এরকম— 'গুলিবাতির রূম ওয়া মিম বা'দি গাল্‌বাতিহিম সাইউগলাবূন'। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— 'রোমকেরা পারস্যবাহিনীর উপরে বিজয়ী হয়েছে, কিন্তু অচিরেই তারা হবে পরাভূত'। অর্থাৎ তাদের উপর বিজয়ী হবে মুসলমানেরা। সেরকমই হয়েছিলো। রোমকদের বিজয়ের নয় বছর পর মুসলমানেরা দখল করে নিতে পেরেছিলো রোমসাম্রাজ্যের কিয়দংশ। এবম্বিধ ক্বেরাতের সমর্থন রয়েছে হাদিসেও। যেমন হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, বদর যুদ্ধের দিন রোমীয়রা পরাজিত করেছিলো পারসিকদেরকে। মুসলমানেরা এসংবাদ শুনে খুশী হয়েছিলেন খুব। অবতীর্ণ হয়েছে— গুলিবাতির রূম.......। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে ইবনে জারীরও এরকম বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ক্বেরাতটি বিরল। প্রথমোক্ত ক্বেরাতই সর্বজনবিধিত। সুতরাং বলতে হয় বিরল ক্বেরাতটি ছিলো প্রচার নির্দেশ বহির্ভূত প্রত্যাদেশাবলীর অন্তর্গত। রসুল স. হয়তো এমতো প্রত্যাদেশের মাধ্যমেই অবগত হয়েছিলেন যে, আজ রোমীয়রা বিজয়ী হয়েছে বটে, কিন্তু অচিরেই তারা পরাভূত হবে মুসলমানদের কাছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'পূর্বের ও পরের সিদ্ধান্ত আল্লাহ্‌রই আর সেইদিন বিশ্বাসীগণ হর্ষোৎফুল্ল হবে'। এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌র সাহায্যে'। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— পারস্য ও রোমের পারস্পরিক জয়-পরাজয়ের মতো অতীতের ও ভবিষ্যতের সকল জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয় আল্লাহ্ কর্তৃক। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কার্যকর হতে পারে কেবল তাঁরই সিদ্ধান্ত। এর বিপরীত হওয়া অসম্ভব। আর আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতিরেকে কোনো কিছুই বাস্তবের মুখ দেখে না।

'ইয়াওমাইজিন' (সেই দিন) অর্থ ওই দিন, যেদিন রোমকদের বিজয় সূচিত হবে পারসিকদের উপর। আর সে বিজয়ের সংবাদ শুনে হর্ষোৎফুল্ল হবে মুসলমানেরা।

'বিনাস্‌রিল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্‌র সাহায্যে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাহায্যেই রোমকরা বিজয়ী হতে পেরেছে পারসিকদের উপর। অথবা গ্রন্থধারীরা পরাজিত করতে পরেছে গ্রন্থহীনদেরকে। আর আল্লাহ্‌রই সাহায্যে মুসলমানেরা বাজিমাত করতে পেরেছে অংশীবাদীদের উপর। এতে করে মুসলমানেরা হয়েছে অধিকতর দৃঢ়চেতা, আর অংশীবাদীদের গর্ব হয়েছে খর্ব।

সুদ্দী বলেছেন, রসুল স. বদরের দিন এই ভেবে মহাআনন্দিত হয়েছিলেন যে, এদিকে মুসলমানেরা বিজয়ী হলো পৌত্তলিকদের উপর, আর ওদিকে কিতাবীদের বিজয় সংঘটিত হলো অগ্নিউপাসকদের উপর।

জালালুদ্দিন মাহাল্লী বলেছেন, রোমকদের বিজয় এবং পারসিকদের পরাজয় সংবাদ মুসলমানদের কাছে পৌঁছেছিলো বদরের রণক্ষেত্রে। একই সঙ্গে মুসলমান ও খৃষ্টানদের বিজয়ে হর্ষোৎফুল্ল হয়েছিলেন মুসলমানেরা। কারণ উভয়ের প্রতিপক্ষ ছিলো অংশীবাদী।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ আল্লাহ্ তাঁর অভিপ্রায় প্রয়োগের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন, চিরমুক্ত। তাই তিনি যাকে চান তাকে সাহায্য করেন, এভাবে দান করেন বিজয়। আর যাকে চান তাকে করেন সাহায্যবিচ্যুত। ফলে সে বহন করে পরাজয়ের গ্লানি। এভাবে মানবেতিহাসে পালাক্রমে আসে উত্থান ও পতন। জয় ও পরাজয়। কিন্তু চিরবিজয়ী কেবল আল্লাহ্। কারণ তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিহীন মহাপরাক্রমশালী। তাই পরাজয় বরণ তাঁর পক্ষে অসম্ভব। আর তিনি পরম দয়ালুও । তাই তো পরাজিত জাতিকে তিনি পুনরায় দান করেন বিজয়। একবার সাহায্যচ্যুত করার পর পুনরায় করেন সাহায্যশোভিত।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'এটা আল্লাহ্রই প্রতিশ্রুতি, আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না'। একথার অর্থ— রোমকদের ও মুসলমানদের এই হচ্ছে আল্লাহ্র অঙ্গীকারভূত। আর তিনি কখনোই অঙ্গীকার ভঙ্গকারী নন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ তত্ত্বটি সম্পর্কে অনবগত। কারণ তারা বিশ্বাসী ও বিচক্ষণ নয়।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'তারা পার্থিব জীবনের বাহ্য দিক সম্বন্ধে অবগত'। একথার অর্থ— প্রাত্যহিক প্রয়োজন সম্পাদন, উপার্জন, রমণ, সন্তান প্রতিপালন, ব্যবসা বাণিজ্য, চাষাবাদ— অবিশ্বাসীরা কেবল পার্থিব জীবনের এসকল বাহ্যিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানে। আর কিছু জানে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'আর আখেরাত সম্পর্কে তারা গাফেল'। একথার অর্থ— পরজগত সম্পর্কে অবিশ্বাসীরা একেবারেই উদাসীন। এখানকার দ্বিতীয় সর্বনাম 'হুম' (তারা) প্রথম সর্বনাম 'হুম' কে অধিকতর বেগবান করেছে। প্রকৃতপক্ষে আলোচ্য আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যটিই প্রথম বাক্যের বেগসঞ্চারক। এতে করে একথাটি অধিকতর দৃঢ়বদ্ধ হয় যে, পশুদের যেমন কোনো বোধ-বিবেক নেই, তারা বস্তুজগতের দিকে ভাবলেশহীন চোখে তাকায়, খায় এবং যত্রযত্র ঘুরে বেড়ায়, অবিশ্বাসীরাও তেমনই। বরং তারা পশুদের চেয়েও নিকৃষ্ট। তারা জানে কেবল পার্থিব জগতের বাহ্যিক দিকের কিছু অংশ সম্পর্কে। এ জগতের প্রকাশ্য দিকের কিছু কিছু তত্ত্ব, বিশেষত্ব, ক্রিয়া-বিক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পশুরাও কিছু কিছু জানে। কিন্তু ভোগোন্মত্ত এ নির্বোধেরা তাও জানে না।

তাহলে তারা পশুর চেয়ে অধম নয় তো কী? একারণেই এখানকার ‘জাহিরান’ (বাহ্যদিক) শব্দটিকে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে অনির্দিষ্টরূপে। আর এর অভ্যন্তরীণ দিক সম্পর্কে তারা একেবারেই হস্তীমূর্খ। অথচ তারা যেহেতু মানুষ, সেহেতু তাদের অন্ততঃ এতটুকু জানা উচিত ছিলো যে, ইহজগত হচ্ছে পরজগতের প্রস্তুতি ক্ষেত্র।

সূরা রূম ঃ আয়াত ৮, ৯, ১০

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ ۟ قف مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا
مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ﴿٨﴾ اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ
فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْۤا اَشَدَّ
مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَاۤ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا
وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ؕ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ
كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٩﴾ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوا
السُّوْۤاٰى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١٠﴾

r উহারা কি নিজদিগের অন্তরে ভাবিয়া দেখে না যে, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদিগের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন যথাযথভাবেই ও আর এক নির্দিষ্ট কালের জন্য? কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেকেই তাহাদিগের প্রতিপালকের সাক্ষাতে অবিশ্বাসী।

r উহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? তাহা ইহলে দেখিত যে, উহাদিগের পূর্ববর্তীদিগের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল। শক্তিতে তাহারা ছিল ইহাদিগের অপেক্ষা প্রবল, তাহারা জমি চাষ করিত, তাহারা উহা আবাদ করিত উহাদিগের আবাদ করা অপেক্ষা অধিক। তাহাদিগের নিকট আসিয়াছিল তাহাদিগের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ; বস্তুত আল্লাহ্ এমন নহেন যে, উহাদিগের প্রতি জুলুম করেন, উহারা নিজেরাই নিজদিগের প্রতি জুলুম করিয়াছিল।

r অতঃপর যাহারা মন্দ কর্ম করিয়াছিল তাহাদিগের পরিণাম হইয়াছে মন্দ; কারণ তাহারা আল্লাহ্র আয়াত প্রত্যাখ্যান করিত এবং উহা লইয়া ঠাট্টাবিদ্রূপ করিত।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তারা কি নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখে না'। একথার অর্থ— তারা তাদের জ্ঞানাশ্বকে ছুটায় মরীচিকাসম জাগতিক দৃশ্যমানতার দিকে। কিন্তু সত্তাভ্যন্তরের গোপন রহস্যের দিকে একবারও দৃকপাত করে না। গবেষণা করে না আত্মার ভাবনা-বেদনা ও চেতনা সম্পর্কে। যদি এরকম করতো, তবে তাদের অন্তর্দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হতো জীবন ও জগতের প্রকৃত রহস্য। বুঝতো প্রতিটি মানুষ এক একটি ক্ষুদ্র জগত, মহাবিশ্বের এক একটি ক্ষুদ্রায়তনিক নমুনা। সুতরাং কেনো তারা তাদের হৃদয়ের অলিন্দে বসে একথা ভাববার চেষ্টা করে না? 'যে আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাদের অন্তর্বর্তী সমস্তকিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবেই, আর এক নির্দিষ্ট কালের জন্য'? একথার অর্থ— নিজেদের অন্তরে যদি তারা সত্যোপলব্ধির প্রচেষ্টা চালাতো, তবে বুঝতে পারতো, আকাশসমূহ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সকল কিছুর মধ্যেই রয়েছে নিপুণতা, নির্ভুলতা ও সুপরিমিতি। আর এই বিশাল সৃষ্টি চিরন্তন যেমন নয়, তেমনি নয় উদ্দেশ্যবিহীন। নির্ধারিত কাল শেষে এর বিলুপ্তি সাধনের জন্য অবশ্যই এসে পড়বে মহাপ্রলয়। তারপর আসবে পুনরুত্থান পর্ব। মহাবিচারপর্ব। তখন সকলেই পেয়ে যাবে তাদের আপনাপন কর্মের চূড়ান্ত প্রতিফল। যেমন আল্লাহ্ অন্যত্র এরশাদ করেছেন— 'তোমরা কি ধারণা করেছো তোমাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি অকারণে? আমার নিকট কি তোমরা প্রত্যানীত হবে না?'

মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচনে ব্যাপৃত বিজ্ঞানী ও গবেষকগণ এমতো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য যে, সৃষ্টিই তার স্রষ্টার পরিচয়ের প্রমাণ। আর এই বিশাল সৃজনায়ন নিশ্চয় অকারণ ও উদ্দেশ্যবিবর্জিত নয়। সৃষ্টির পরতে পরতে নিদর্শন রয়েছে আল্লাহ্র সত্তার ও গুণবত্তার। রয়েছে সর্বত্র তাঁর আনুরূপ্যহীন উপস্থিতির প্রমাণ। আর এ সৃষ্টিও একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান শেষে শুরু হবে বিচারপর্ব। এরকম না হলে কীভাবে পার্থক্য সূচিত হবে সত্য ও মিথ্যার? আল্লাহ্র পরিচয় ধন্য এবং আল্লাহ্কে অমান্যকারীদের মধ্যে প্রভেদই বা তাহলে সৃষ্টি হবে কী করে? পুরস্কার ও তিরস্কারের বিষয়টি তো কেবল এভাবেই লাভ করতে পারবে বাস্তব রূপ। সুতরাং এমতো পরকাল ভাবনা মানুষের জন্য অত্যাবশ্যক বলে যদি বিবেচিত হয়, তবেই তো কেটে যেতে পারে তাদের অনভিপ্রেত ঔদাসীন্য। সত্যোন্মচন হতে পারে সহজ ও সাবলীল।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেকেই তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাতে অবিশ্বাসী'। একথার অর্থ মক্কাবাসীদের অনেকে অথবা সমগ্র মানবজাতির অনেকে ভাবে এই মহাবিশ্ব কখনোই ধ্বংস হবে না। সংঘটিত হবে না মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান, মহাবিচারপর্ব। হবে না হিসাব-কিতাব, পুরস্কার-তিরস্কার।

পরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? তাহলে দেখতো যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন হয়েছে।' একথার অর্থ— মক্কাবাসীরা কি পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে বাণিজ্য কিংবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে গমনাগমন করে না? নিশ্চয়ই করে। তাহলে তারা তো নিশ্চয় দেখেছে, কী হয়েছে তাদের পূর্বসূরী সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম। তাদের বিরাণ জনপদগুলো তো এখনো মহাকালের সাক্ষীরূপে সতত পরিদৃশ্যমান।

এরপর বলা হয়েছে— 'শক্তিতে তারা ছিলো এদের চেয়ে প্রবল, তারা আবাদ করতো এদের চেয়ে অধিক।' এখানে 'আবাদ করতো' অর্থ তারা চাষাবাদের জন্য খাল খনন করতো' জমিতে পানি সিঞ্চন করতো, ভূগর্ভ থেকে উত্তোলন করতো খনিজ সম্পদ। এ কারণেই এখানে বলা হয়েছে— শক্তিতে তারা ছিলো মক্কাবাসীদের চেয়ে প্রবল। মক্কাবাসীরা তো সেরকম কিছুই করে না। চাষাবাদের জমিই তাদের নেই। চতুর্দিকে কেবল ধুধু মরুভূমি এবং প্রস্তরসংকুল পর্বত। তাই তাদের জীবিকার সন্ধানে বাণিজ্যব্যপদেশে ইয়েমেন ও সিরিয়ার মতো দূরদেশে গমন না করলে চলে না। সুতরাং তারা যে তাদের পূর্বসূরীদের চেয়ে দুর্বল সেকথা বলাই বাহুল্য। এতদসত্ত্বেও পার্থিবতার মোহ তাদের কাটে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের নিকট এসেছিলো তাদের রসুলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ।' একথার অর্থ— ওই সকল দৈহিক ও বৈত্তিক শক্তিতে শক্তিমান জাতিগুলোর নিকটেও প্রকাশ্য মোজেজাসহ প্রেরিত হয়েছিলেন আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষগণ, যেমন এখন তোমাদের নিকটে প্রেরিত হয়েছেন সর্বশেষ রসুল। ওই দুর্বিনীত ও গর্বিত জাতিগোষ্ঠীগুলোর অধিকাংশই সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছিলো এবং যথারীতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো আল্লাহ্‌র গজবে। সুতরাং তোমরা এই মুহূর্তে সাবধান হয়ে যাও। অকুণ্ঠচিত্তে অনুগত হয়ে যাও সর্বশেষ বার্তাবাহকের।

এরপর বলা হয়েছে— 'বস্তুত তাদের প্রতি জুলুম করা আল্লাহ্‌র কাজ ছিলো না, তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিলো।' এ কথার অর্থ— জুলুমের মতো অপবিত্রতা থেকে আল্লাহ্ চিরমুক্ত, চিরপবিত্র। সুতরাং তিনি তাদের প্রতি অন্যায় আচরণ তো করতেই পারেন না। বরং তারা নিজেরাই সত্যপ্রত্যাখ্যান করে ও সীমালংঘন করে স্বেচ্ছায় শিকার হয়েছিলো আল্লাহ্‌র গজবের। নবী রসুলগণের পুনঃপুনঃ সতর্কবাণীর প্রতি তারা দৃকপাত মাত্র করেনি।

এখানে 'লিইয়াজলিমাহুম' কথাটির 'লাম' অব্যয়ের পর উহ্য রয়েছে 'আন্'। সুতরাং ওই উহ্য শব্দটি সহযোগে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়ায়— জুলুম করা আল্লাহ্র পক্ষে অশোভন ও অসম্ভব। তাইতো তিনি পূর্বাহ্নে তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলেন তাঁর বার্তাবাহকগণকে। তাঁরা তাদের যথাকর্তব্য পালন করেছিলেন সুচারুরূপে। কিন্তু তাঁদের কথায় তারা ভ্রূক্ষেপই করেনি। উল্টো তাদের উপরে অবলীলায় চালিয়েছিলো ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ ও নিগ্রহ। এমতো অবাধ্যতাই ডেকে এনেছিলো সর্বগ্রাসী আজাব। আর দুরাচারিতার শাস্তি নিশ্চয় অন্যায় নয়। বরং তা সম্পূর্ণ ন্যায়ানুগ। সুতরাং একথা অনস্বীকার্য যে আল্লাহ্ তাদের প্রতি জুলুম করেননি, তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিলো এবং যথাসময়ে পেয়েছিলো সে জুলুমের প্রতিফল।

এরপরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'অতঃপর যারা মন্দকর্ম করেছিলো, তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ।' এখানে 'আস্সূআ' (মন্দ) 'আসওয়াউ' এর স্ত্রীলিঙ্গরূপ এবং একই সঙ্গে তুলনামূলক বিশেষণের শব্দরূপ। যেমন 'আহসান' এর স্ত্রীলিঙ্গরূপ 'হুসনা'। অতএব, এখানে 'আস্সূআ' এর মর্মার্থ হবে— জঘন্য, নির্মম শাস্তি। কেউ কেউ বলেছেন, জান্নাতসমূহের নামগুলোর মধ্যে 'হুসনা' যেমন একটি নাম, তেমনি জাহান্নামের নামগুলোর একটি হচ্ছে 'সূআ'।

এরপর বলা হয়েছে— 'কারণ তারা আল্লাহ্র আয়াত প্রত্যাখ্যান করতো এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো।' কথাটির মর্মার্থ এরকমও হতে পারে যে— ওই হতভাগ্যদের শেষ পরিণতি ছিলো অত্যন্ত মন্দ। তাই তারা আল্লাহ্র নিদর্শনরাজিকে অস্বীকার করতো এবং তা নিয়ে নির্ভয়ে করতো ঠাট্টা-উপহাস।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, বিশ্বাসীরা পাপ করলে তার হৃদয় পটে মুদ্রিত হয় কালো দাগ। ওই দাগ দূরীভূত হতে পারে কেবল তওবার লজ্জা ও অনুতাপ দ্বারা। কিন্তু তওবা না করে যদি সে পাপমগ্ন হয়, তবে কালো কালো দাগে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত হয়ে যায় তার হৃদয়। কোরআন মজীদে এমতো আবিলতাকে বলা হচ্ছে 'রান'। যেমন— 'কাল্লা বাল রানা আলা কুলুবিহিম মা কানু ইয়াকসিবূন' (কক্ষণোই নয়, বরং তারা যে কর্ম করতো, তারই আবিলতা ছেয়ে ফেলেছে তাদের অন্তর্জগতকে)। আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ এবং আরো অনেকে। অথবা এখানকার বক্তব্যটি হবে এরকম— ওই পাপিষ্ঠদের হৃদয় ছিলো মোহরাঙ্কিত। তাই তো তারা অগ্র-পশ্চাত না ভেবেই প্রত্যাখ্যান করেছিলো আল্লাহ্র আয়াতকে এবং তাই নিয়ে মত্ত হয়েছিলো বিদ্রূপ-উপহাসে।

اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿١١﴾ وَ يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿١٢﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰٓؤُا وَ كَانُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ ﴿١٣﴾ وَ يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ ﴿١٤﴾

r আল্লাহ্ আদিতে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি ইহার পুনরাবৃত্তি করিবেন, তখন তোমরা তাঁহারই নিকট প্রত্যানীত হইবে।

r যেইদিন কিয়ামত হইবে সেইদিন অপরাধিগণ হতাশ হইয়া পড়িবে।

r উহাদিগের দেব-দেবীগুলি উহাদিগের সুপারিশ করিব না এবং উহারাই উহাদিগের দেব-দেবীগুলিকে অস্বীকার করিবে।

r যেইদিন কিয়ামত হইবে সেইদিন মানুষ বিভক্ত হইয়া পড়িবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ আদিতে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি এর পুনরাবৃত্তি করবেন, তখন তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যানীত হবে'। একথার অর্থ— সৃজনকর্মের সূচনা হয়েছে আল্লাহ্ কর্তৃক। তারপর এক সময় তিনি তাঁর এই বিশাল সৃষ্টি ধ্বংস করে দিবেন। তারপর ঘটাবেন তোমাদের পুনরুত্থান। তখন তোমাদেরকে ভালো অথবা মন্দ প্রতিফল গ্রহণের নিমিত্তে তাঁর সকাশে উপস্থিত হতেই হবে।

পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'যেদিন কিয়ামত হবে, সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে পড়বে'। কাতাদা ও কালাবী আলোচ্য আয়াতের অর্থ করেছেন এরকম— সকল কল্যাণ থেকে সেদিন কাফেরকুল হবে সম্পূর্ণ নিরাশ।

'কামুস' প্রণেতা লিখেছেন, 'বালাস' বলে ওই ব্যক্তিকে, যার মধ্যে কল্যাণের লেশমাত্র নেই। আর যে মনের কথা মনেই গোপন রাখে, তাকে বলে 'মুবলিস'। 'আবলাসা' অর্থ সে আশাহত হয়েছে। হয়েছে হতবাক। এখান থেকেই বুৎপত্তি 'ইবলিস্' শব্দটির। অথবা বলা যেতে পারে 'ইবলিস্' শব্দটি অনারব। নেহায়া প্রণেতা লিখেছেন, ভয়ে অথবা দুঃখ-যাতনায় যে ব্যক্তি নির্বাক হয়ে যায়, তাকে বলে 'মুবলিস' আর 'ইবলাস্' অর্থ হতভম্ব হওয়া।

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'তাদের দেব-দেবীগুলি তাদের সুপারিশ করবে না'। এ কথার অর্থ— দেব-দেবীরা আল্লাহ্র দরবারে সুপারিশ

করবে বলে যে প্রতিমাগুলোকে অংশীবাদীরা পৃথিবীতে পূজা করতো, সেগুলো সেদিনও থাকবে স্থানুবৎ নিশ্চল অকর্মন্য তখন তারা স্পষ্ট বুঝতে পারবে তাদের অংশীবাদিতা কতো ভ্রান্ত।

মহাবিচার দিবসের ঘটনা অতিনিশ্চিত। তাই এখানে বাক্যটি উপস্থাপিত হয়েছে অতীতকালবোধক শব্দরূপ সহযোগে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তারা তাদের দেব-দেবীগুলিকে অস্বীকার করবে'। একথার অর্থ— পৌত্তলিকেরা যখন দেখবে, তাদের পূজিত দেবমূর্তিগুলো নিঃসাড়, তখন তারাও ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করবে সেগুলোকে।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'যেদিন কিয়ামত হবে, মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে'। মুকাতিল কথাটির অর্থ করেছেন— বিচারপর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর মানুষ হয়ে পড়বে দ্বিধাবিভক্ত। একদল যাত্রা করবে চিরন্তন সুখের আলয় বেহেশতের দিকে। আর একদল পা বাড়াবে চিরদুঃখের আগার দোজখ অভিমুখে। ওই দলদু'টো আর কোনোদিনই একত্র হবে না। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে পরবর্তী আয়াতদ্বয়ে এভাবে—

সূরা রূম ঃ আয়াত **১৫, ১৬**

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ﴿١٥﴾ وَ اَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ لِقَآئِ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴿١٦﴾

r অতএব যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎকর্ম করিয়াছে তাহারা জান্নাতে আনন্দে থাকিবে;

r এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও পরলোকের সাক্ষাৎকার অস্বীকার করিয়াছে, তাহারাই শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'অতএব যারা ইমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা জান্নাতে আনন্দে থাকবে'। এখানে 'ফী রওদ্বাতিন' অর্থ জলবতী নদী বিধৌত কুসুমোদ্যানে।

'ইউহ্‌বারূন' অর্থ আনন্দে থাকবে। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন— বেহেশতবাসীরা হবেন মহাসম্মানিত। মুজাহিদ ও কাতাদা অর্থ করেছেন— তারা সেখানে থাকবে পরমানন্দে বিভোর হয়ে। আবু উবায়দা বলেছেন, তারা হবে চিরসুখী। 'হিবরাতুন' অর্থ আনন্দ, সুখ, চিত্তপ্রশান্তি। এমনও

বলা হয়েছে যে, যে কোন সুখের উপকরণই হচ্ছে 'হিবর' কোনো কিছুকে অনিন্দসুন্দররূপে গঠন করার নাম 'তাহবীর'। 'নেহায়া' রচয়িতা লিখেছেন, 'হাবরাতুন' অর্থ অনুগ্রহরাশি, আনন্দসম্ভার। আর রূপ-সৌন্দর্যকে বলে 'হিবরাতুন'। এরকম লিখেছেন 'কামুস' রচয়িতাও।

হজরত আবু মুসা বর্ণনা করেছেন, আমি একবার নিবেদন জানালাম, হে আল্লাহ্র প্রিয়তম রসুল! আমি যদি জানতাম আমার কণ্ঠস্বর আমার প্রিয়তম সখার শ্রুতিবদ্ধ হচ্ছে, তবে আমি আবৃত্তি করতাম 'তাহবীর'সহ। অর্থাৎ আমি কোরআন তেলাওয়াত করতাম অত্যধিক মধুর স্বরে। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, 'তাহবীর' অর্থ মধুর, সুন্দর।

ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাছীর থেকে আওজায়ী সূত্রে বাগবী লিখেছেন, জান্নাতের আকাশের নাম 'ইউহ্বারূন'। ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাছীরের এমতো উক্তি বর্ণিত হয়েছে হান্নাদ ও বায়হাকীর মাধ্যমেও।

আওজায়ী বলেছেন, হজরত ইসরাফিল একজন সুমধুর কণ্ঠস্বর বিশিষ্ট ফেরেশতা। তিনি যখন গান গাইতে শুরু করবেন, তখন জান্নাতের তরুলতায় উছলে পড়বে সবুজের তরঙ্গ। তিনি আরো বলেছেন, সমগ্র সৃষ্টিতে ইসরাফিলের মতো সুমিষ্ট কণ্ঠের অধিকারী আর কেউই নেই। যখন তিনি সঙ্গীত শুরু করবেন তখন তার সুরের মুর্ছনায় ম্লান হয়ে যাবে সপ্তাকাশের অধিবাসীদের স্তব-স্তুতি।

ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় এসেছে, আওজায়ী বলেছেন, 'ইউহ্বারূন' মূলতঃ সঙ্গীত। জান্নাতবাসীরা সঙ্গীত উপভোগ করতে চাইলে আল্লাহ্পাক 'ইফাফা' নামক বেহেশতের বাতাসকে জোরে প্রবাহিত হবার নির্দেশ দান করবেন। বাতাস তখন জীবন্ত মণিমুক্তার বাগানে প্রবেশ করে আলোড়িত হতে থাকবে। ফলে তরুরাজি হবে আন্দোলিত। তারা একে অপরকে জড়াজড়ি করে হতে থাকবে আন্দোলিত ও অনুরণিত। অনির্বচনীয় সেই বনন সুধা ঢেলে দিবে বেহশতবাসীদের শ্রবণবিবরে। আর বৃক্ষরাজির পল্লবনিচয়ও নাচতে থাকবে খুশীতে।

হজরত আবু উমামা থেকে তিবরানী ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কেউ জান্নাতে প্রবেশ করলে তাদের ক্রোড়ে ও পদযুগলে উপবেশন করবে দু'জন হুর। তারা পরিবেশন করবে অশ্রুতপূর্ব সঙ্গীত, যা কোনো মানব অথবা জ্বিন কল্পনাও করতে পারে না। আর সে সঙ্গীত কোনো শয়তানী সঙ্গীত নয়, সে সঙ্গীত হচ্ছে আল্লাহ্র সঙ্গীতময় গুণকীর্তন।

আমি বলি, পৃথিবীতে কাব্য ও সঙ্গীত উপভোগ্য হয় তিনটি কারণে— ১. তা হবে ছন্দময় ২. সুরেলা ও ৩. প্রিয়তমজনের স্মৃতিবিলোড়ক। কিন্তু জান্নাতবাসীদের হৃদয়ে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের প্রসক্তি হবে চিরতিরোহিত। আর সেখানে প্রতিভাত ও প্রতিভাসিত হতে থাকবে আল্লাহ্র পবিত্র জ্যোতিচ্ছটার

হৃদয়হারক সৌন্দর্য। কিন্তু আল্লাহ্র দীদারে যখন ছেদ পড়বে, তখন তারা হয়ে যাবে বিরহচঞ্চল। আর তখনই তারা সেই বিরহকাতরতাকে উপভোগ করবে সঙ্গীতের সুরমুর্ছনার মাধ্যমে।

কোনো কোনো হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, আয়তলোচনা রমণীকুল তখন তাদের দয়িতাপ্রবরকে শোনাবে মন মাতানো সঙ্গীত, যে সঙ্গীত অশ্রুতপূর্ব। আরো বর্ণিত হয়েছে, সঙ্গীতানুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে হুরদের কণ্ঠে তখন ধ্বনিত হতে থাকবে এই কথাগুলোও— আমরা অপরূপা, লাবণ্যময়ী। আমরা আমাদের সখাকুলের চোখে চিরসুন্দরী। চিরচিন্ময়ী। আমরা মৃত্যুহীনা। আমরা অক্ষয়া। আমাদের এ আবাসে বিরাজ করে শান্তি। কেবলই শান্তি। রাজরাণী বেশে আমরা এখানে থাকবো চিরকাল, এই অমরাবতীর কুলে, প্রমোদ বিহারে, নিত্য নতুন সাজে। হজরত ইবনে ওমর থেকে সর্বোন্নত সূত্রে তিবরানীও এরকম বর্ণনা করেছেন।

হজরত আনাস থেকেও এরকম বর্ণিত হয়েছে তিবরানী, বায়হাকী ও ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া কর্তৃক। ইমাম আহমদ তাঁর 'জুহুদ' পুস্তকে লিখেছেন, মালেক ইবনে দীনার বলেছেন, আল্লাহ্পাক তখন হজরত দাউদকে বলবেন, হৃদয় পাগল করা সুরে আমার মহিমা বর্ণনা করো। হজরত দাউদ শুরু করবেন মনমাতানো মহিমাসঙ্গীত। বেহেশতের বৈভবরাজির আকর্ষণ ম্লান হয়ে যাবে তাঁর ওই মহিমাসঙ্গীতের অভূতপূর্ব সুর লহরীর কাছে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে সর্বোন্নত সূত্রে ইসপাহানী বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ বেহেশতের বিটপীকুলকে আদেশ করবেন, তোমরা আমার ওই সকল বান্দাকে সঙ্গীত শোনাও যারা পৃথিবীতে আমার স্বরণে পরিত্যাগ করেছিলো সঙ্গীতের সুর। বিটপীকুল তখন আওয়াজ তুলবে এমন মোহনীয় সুরে, যে সুর কোনো কর্ণই আর কখনো শোনেনি।

এ প্রসঙ্গে হাদিস রয়েছে আরো অনেক। হাকেম তাঁর 'নাওয়াদিরুল উসুল' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত আবু মুসা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যারা পৃথিবীতে সঙ্গীতের ঝংকার উপভোগ করেছে, তারা বেহেশতের প্রাণদ ধ্বনি শ্রবণের অনুমতি পাবে না। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর বচনবাহক! প্রাণদ ধ্বনি কী? তিনি স. বললেন, বেহেশতবাসীদের সম্মানে যা আবৃত্তি করা হবে।

দাইনুরীর বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, যে ব্যক্তি অশ্লীল গান ও বাদ্য থেকে তার শ্রবণেন্দ্রিয়কে রেখেছে নিরাপদ, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ তাকে স্থান করে দিবেন কস্তুরীসুবাসিত উদ্যানে। ফেরেশতাদেরকে বলবেন, এদেরকে শোনাও আমার মহিমাসঙ্গীত, যেনো তারা হয়ে যেতে পারে চিরনির্ভয়। বিষণ্নচিত্ততা ও বিমর্ষভাবনা থেকে যেনো হয়ে যেতে পারে চিরমুক্ত। দায়লামীও এরকম বর্ণনা করেছেন হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে।

পরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'যারা কুফরী করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও পরলোকের সাক্ষাৎকার অস্বীকার করেছে, তারাই শাস্তি ভোগ করতে থাকবে'। এখানে 'পরলোকের সাক্ষাৎকার' বলে বোঝানো হয়েছে পুনরুত্থানপর্ব শেষে মহাবিচারের দিবসের উপস্থিতিকে। আর 'মুহদ্বারূন' অর্থ শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। অর্থাৎ পরলোকে তাদের শাস্তি হবে বিরতিহীন।

সূরা রূম ঃ আয়াত ১৭, ১৮, ১৯

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَ حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ﴿١٧﴾ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ عَشِيًّا وَّ حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ﴿١٨﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ وَ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ﴿١٩﴾

r সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় ও প্রভাতে—

r এবং অপরাহ্নে ও জুহরের সময়ে; আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তো তাঁহারই।

r তিনিই মৃত হইতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান এবং তিনিই জীবন্ত হইতে মৃতের আবির্ভাব ঘটান এবং ভূমির মৃত্যুর পর উহাকে পুনর্জীবিত করেন। এইভাবেই তোমরা উত্থিত হইবে।

'ফা সুবহানাল্লহ্' (সুতরাং আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো) বাক্যটি একটি উহ্য ক্রিয়ার সাধারণ কর্মপদ। আর এখানকার 'ফা' (সুতরাং) অব্যয়টি অগ্রে ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও এর প্রতিক্রিয়া পৌঁছেছে অন্তেও। এভাবে অর্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্ যেহেতু আদি অন্তের স্রষ্টা, সেহেতু পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো কেবল তাঁরই। আর এখানে 'পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো' অর্থ নামাজ পাঠ করো।

'হীনা তুমসূন' অর্থ সন্ধ্যায়। অর্থাৎ সন্ধ্যায় পাঠ করো মাগরিবের নামাজ। উল্লেখ্য, সন্ধ্যা থেকে শুরু হয় পরবর্তী দিবসের সূচনা। তাই এখানে প্রথমে উল্লেখিত হয়েছে মাগরিবের নামাজের নির্দেশ। আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপায় দিন যেমন কেটে গেলো, তেমনি এলো মঙ্গলময় আসন্ন রাত্রি— এরকম কৃতজ্ঞতাভরা মনোভাব নিয়ে পাঠ করা উচিত সন্ধ্যাকালীন নামাজ।

'ওয়াহীনা তুসবিহুন' অর্থ এবং প্রভাতে। অর্থাৎ প্রভাতে পাঠ করো ফজরের নামাজ। শ্রান্তি বিদূরক রাত্রি নির্বিঘ্নে অতিবাহিত হলো, শুরু হলো কর্মমুখর উপার্জনের সুযোগ, এরকম শান্তি ও শ্রমের সুযোগ যিনি দিলেন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে সম্পন্ন করা প্রয়োজন উষাকালীন প্রার্থনা। সন্ধ্যা-সকাল সতত বিপরীতমুখী। সেই সাতত্যকে মান্য করেই বাক্যবিন্যাস করা হয়েছে এখানে। বলা হয়েছে— সন্ধ্যায় ও প্রভাতে। পরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'ওয়ালাহুল হামদু ফীস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি' একথার অর্থ— আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তো তাঁরই। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন— আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অধিবাসীরা প্রতিনিয়ত ব্যাপৃত থাকে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনায়।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়াআ'শীয়্যান' এর অর্থ বেলা শেষে, অপরাহ্নে। অর্থাৎ পাঠ করো আসরের নামাজ। বেলা শেষে সূর্যালোক হয়ে আসে নিষ্প্রভ। তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'আ'শীয়্যান'। যেমন বলা হয় 'আ'শীয়্যাল আইনি' (চোখের জ্যোতি কমে গিয়েছে)। বিকেলে মানুষ ব্যস্ত থাকে বাজার ঘাট ও অন্যান্য ব্যতিব্যস্ততা নিয়ে। তাই স্বভাবতই তখন আল্লাহ্‌র স্মরণচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অত্যধিক। তাই এসময় এসেছে আসরের নামাজ পাঠের নির্দেশ। আর এই নামাজকে 'মধ্যবর্তী নামাজ' (সালাতুল উসতা)ও বলা হয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়াহীনা তুজহিরূন'। এর অর্থ— এবং জোহরের সময়। অর্থ দ্বিপ্রহরের পরক্ষণে, যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে, তখন পাঠ করো জোহরের নামাজ অর্থাৎ যে সময়ের প্রচণ্ড উত্তাপ স্মরণ করিয়ে দেয় অগ্নিতপ্ত জাহান্নামের কথা, সেই সময়ে জাহান্নামমুক্তির আশায় নিমগ্ন হও একান্ত প্রার্থনায়।

যে সময়গুলোতে নামাজ পাঠের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেই সময়গুলোতেই প্রকাশিত হয় আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ মহিমা। নবায়ন করা হয় তাঁর অনুগ্রহসম্ভারকে। তিনি যে চিরপবিত্র, সকল দোষ-ত্রুটি, ক্ষতি-বিনষ্টি ও অপকৃষ্টতা থেকে চিরমুক্ত তা বিশেষভাবে উপলব্ধ হয় ওই সময়গুলোতেই। একথাও হৃদয়ে অনুভূত হয় যে, সপ্তাকাশবাসী ও ধরাধামবাসী— সকলেই ওই ওয়াক্তগুলোতে হয় বিশেষভাবে আল্লাহ্‌র স্মরণমুখর।

লক্ষণীয়, এখানে উল্লেখ করা হয়েছে মাগরিব, ফজর, জোহর ও আসর এই চার ওয়াক্তের নামাজের। ইশার নামাজের উল্লেখ এখানে নেই। কিন্তু কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেছেন, ইশার নামাজের কথা এখানে প্রচ্ছন্নরূপে এসেছে, 'তুমসূনা' (সন্ধ্যায়) কথাটির মাধ্যমে। হজরত ইবনে আব্বাস, ইবনে জারীর, তিবরানী ও হাকেম এরকম অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ 'সন্ধ্যায়' কথাটির অর্থ এখানে— মাগরিব ও ইশা।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কেউ সকালে ‘হীনা তুমসূনা’ থেকে ‘ওয়া কাজালিকা তুখরাজূন’ পর্যন্ত পাঠ করলে ওই পাঠ হবে তার রাতের পাপকর্মের ক্ষতিপূরণ। আর কেউ সন্ধ্যায় এরকম করলে, মুছে যাবে তার দিবসের পাপের প্রভাব।

বাগবী লিখেছেন, নাফে ইবনে আজরক একবার হজরত ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন, কোরআন মজীদের কোথাও একসাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের উল্লেখ রয়েছে কি? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তারপর তিনি পাঠ করে শোনালেন এই সুরার ১৭ ও ১৮ সংখ্যক আয়াত।

হজরত আনাস থেকে শিথিল সূত্রে ছা'লাবী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পরিপূর্ণ পুণ্য দেওয়া হোক এরকম কামনা যদি কারো থাকে, তবে সে যেনো পাঠ করে ‘হীনা তুমসূনা’ থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দিবসে অথবা রজনীতে যদি কেউ ‘সুবহানাল্লহি ওয়া বিহামদিহি’ একশত বার পাঠ করে, তবে আল্লাহ্পাক তার সকল পাপ মাফ করে দেন, যদিও তা হয় সমুদ্রের ফেনপুঞ্জসম অপরিমেয়।

রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় একশত বার ‘সুবহানাল্লহি ওয়া বিহামদিহি’ পাঠ করবে, সে মহাবিচারের দিবসে দেখতে পাবে, তার চেয়ে পুণ্যবান আর কেউ নেই। আর যে এই আমল আরো অধিক করবে, সে হবে আরো অধিক পুণ্যশীল। এই হাদিসটিও এসেছে হজরত আবু হোরায়রা থেকে। আর বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় আরো এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দুই বাক্য এমন যা উচ্চারণে লঘু, কিন্তু ওজনে গুরু। আর বাক্য দু'টো পরমতম দয়ালু আল্লাহ্র অতীব প্রিয়। বাক্য দু'টো হচ্ছে ‘সুবহানাল্লহি ওয়া বিহামদিহি’ এবং ‘সুবহানাল্লহিল আ'জীম’।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, আমার শ্রদ্ধার্হ জনয়িতা একবার এক জনসমাবেশে বললেন, আমরা সকলেই জানি ‘আলহামদুলিল্লাহ’ অর্থ কী? কথাটি ব্যবহৃত হয় আমাদের পারস্পরিক সৌজন্য বিনিময়ের সময়। ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লহ’ এর অর্থ আমাদের অজানা নয়। একথার মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয় আমাদের প্রার্থনা। ‘আল্লাহু আকবার’ এর মর্মার্থও আমরা জানি। নামাজ পাঠকারীদের কণ্ঠে তো বারবার ধ্বনিত হয় এই আওয়াজ। কিন্তু তোমরা কি বলতে পারো ‘সুবহানাল্লহ্’ এর মর্মার্থ কী? জনৈক ব্যক্তি বললো, ‘আল্লাহু আ'লাম’ (আল্লাহ্ সমধিক জ্ঞাত)। হজরত ওমর বললেন, ওমর যদি এ কথা না জানে, তবে সে তো নিরেট হতভাগ্য (আরে ‘আল্লাহ্ সমধিক জ্ঞাত’ একথা তো আমিও জানি)। হজরত আলী তখন বললেন, হে বিশ্বাসবানগণের অধিনায়ক! এটা এমন এক নাম, যা কোনো সৃষ্টি

বহন করতে পারে না। ওই মহিমাময় নামের প্রতিই তো সকলের প্রত্যাবর্তন। তাঁর পরিতোষ অর্জনার্থেই তো আমাদের জন্য অপরিহার্য হওয়া উচিত ওই নামের উচ্চারণ।

মসজিদের অঙ্গনে অবস্থান করছিলেন হজরত জুয়াইরিয়া। তাঁর আর এক নাম ছিলো বাররা। রসুল স. তাঁর কাছ থেকে উঠে জরুরী কাজে বাইরে চলে গেলেন। বেশ কিছু পরে ফিরে এসে দেখলেন, হজরত জুয়াইরিয়া অজিফা করে চলেছেন। তিনি স. বললেন, তুমি তো এতক্ষণ ধরে অজিফা পাঠ করছিলে, তাই না? হজরত জুয়াইরিয়া বললেন, হ্যাঁ। তিনি স. বললেন, আমি তোমার চলে যাবার পর চারটি বাক্য পাঠ করেছি মাত্র তিনবার। আমার এই আমল তোমার এতক্ষণের অজিফার চেয়ে ওজনে ভারী। বাক্যচতুষ্টয় এই— সুবহানাল্লহি ওয়া বিহামদিহি; আদাদা খলক্বিহী, ওয়া রিদ্বাআ নাফসিহী ওয়া যীনাতা আরশিহী ওয়া মিদাদা কালিমাতিহী। মুসলিম।

হজরত সামুরা ইবনে জুনদুব বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, চারটি বাক্য সর্বোত্তম— সুবহানাল্লহ্, আলহামদুলিল্লাহ্, লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্ এবং আল্লাহু আকবার। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, সর্বাধিক প্রিয় বাক্যচতুষ্টয় হচ্ছে— সুবহানাল্লহ্, আলহামদুলিল্লাহ্, লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্ ও আল্লাহু আকবার।

হজরত আবু জর গিফারী বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. সকাশে জানতে চাওয়া হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! সর্বোৎকৃষ্ট বাক্য কোনটি? তিনি স. বললেন, ওই বাক্য যা আল্লাহ্ নির্ধারিত করেছেন ফেরেশতাদের আমলরূপে। সেটি হচ্ছে— সুবহানাল্লহি ওয়া বিহামদিহী। মুসলিম। হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি সুবহানাল্লহিল আ'জীম ওয়া বিহামদিহী পাঠ করে, আল্লাহ্ তার জন্য বেহেশতে উৎপন্ন করেন একটি বৃক্ষ। তিরমিজি।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'তিনিই মৃত থেকে জীবিতের আবির্ভাব ঘটান এবং তিনিই জীবন্ত থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটান এবং ভূমির মৃত্যুর পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ই দৃশ্যতঃ প্রাণহীন শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেন প্রাণবন্ত মানবশিশু। প্রকাশ্যতঃ নিষ্প্রাণ ডিম থেকে পক্ষীশাবকের আত্মপ্রকাশের বিষয়টিও এরকম আর জীবিত প্রাণীকুলকে মৃত্যুদানও করেন তিনি। এভাবে পুনরুত্থান দিবসে তিনিই দান করবেন মৃত্যু-উত্তর জীবন। জীবন-মৃত্যুর এমতো পালাবদল একথাই প্রমাণ করে যে, তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর। মৃত ভূমিকে সঞ্জীবিত করার বিষয়টি একথার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

শেষে বলা হয়েছে— 'এভাবেই তোমরা উত্থিত হবে'। একথার অর্থ— বর্ণিত দৃষ্টান্তের মাধ্যমে একথা অনস্বীকার্য যে, মহাপুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং হে

অংশীবাদী জনগোষ্ঠী! তোমরা এই মুহূর্তে মেনে নাও পুনরুত্থান দিবস ও তৎপরবর্তী ঘটনাবলীকে। পুনরুত্থান সংঘটক আল্লাহ্‌কে, তাঁর রসুলকে এবং তোমাদের সংশোধনার্থে অবতীর্ণ মহাগ্রন্থ কোরআনকে।

সূরা রূম ঃ আয়াত ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭

وَ مِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَ مِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾ وَ مِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ اخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَ اَلْوَانِكُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ﴿٢٢﴾ وَ مِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ ابْتِغَآؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٢٣﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّ طَمَعًا وَّ يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَ مِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَ الْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ؕ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ۖۗ مِّنَ الْاَرْضِ ۖۗ اِذَآ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ﴿٢٥﴾ وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَ هُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَ هُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ؕ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٧﴾

r তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে যে, তিনি তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার পর এখন তোমরা মানুষ, সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছ।

r আর তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদের সংগিনীদিগকে যাহাতে তোমরা উহাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রহিয়াছে।

r আর তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র। ইহাতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে।

r আর তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে রাত্রিতে ও দিবাভাগে তোমাদের নিদ্রা এবং তোমাদের অন্বেষণ তাঁহার অনুগ্রহ হইতে। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য।

r আর তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে, তিনি তোমাদিগকে প্রদর্শন করেন বিদ্যুৎ, ভয় ও ভরসা সঞ্চারকরূপে এবং তিনি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন ও তদ্দ্বারা ভূমিকে পুনর্জীবিত করেন উহার মৃত্যুর পর; ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য।

r আর তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে যে, তাঁহারই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি থাকে; অতঃপর আল্লাহ্ যখন তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে উঠিবার জন্য একবার আহ্বান করিবেন তখন তোমরা উঠিয়া আসিবে।

r আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই। সকলেই তাঁহার আজ্ঞাবহ।

r তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর তিনি ইহাকে সৃষ্টি করিবেন পুনর্বার; ইহা তাঁহার জন্য অতি সহজ। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁহারই; এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— তোমরা যে পুনরুত্থিত হবেই, তার আরো দৃষ্টান্ত দেখ। যে আদমের সন্তান তোমরা, সেই আদমকে আমিই সৃষ্টি করেছি নিশ্চেতন মৃত্তিকা থেকে। তারপরেই তো ঘটেছে তার বংশ বিস্তার। ফলে দ্যাখো, তোমরা মানুষেরা এখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছো সারা পৃথিবীতে।

পরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন'।

এখানে 'মিন আনফুসিকুম' (তোমাদের মধ্য থেকে) কথাটির 'মিন' অব্যয়টি সূচনা সূচক। অর্থাৎ নারীজাতিরও সূচনা হয়েছে হজরত আদম থেকে। তারপর থেকে মহামানবতার বিস্তৃতি ঘটেছে নারী-পুরুষের সম্মিলনের মাধ্যমে। অথবা 'মিন' এখানে বিবৃতিমূলক। সেক্ষেত্রে মর্মার্থ দাঁড়ায় নারীও নরের মতো মানবগোষ্ঠীভূত। অন্য কোনো সম্প্রদায়ভূত নয়।

'লি তাসকুনূ' অর্থ তোমরা একে অপরের প্রতি বোধ করো ভালোবাসা ও দয়া। উল্লেখ্য, জাতিগত ঐক্য মমতা প্রেম ও সহমর্মিতাকে অপরিহার্য করে। আর জাতিগত অনৈক্য সৃষ্টি করে বিরাগ।

'বাইনাকুম' অর্থ তোমাদের মধ্যে । অর্থাৎ নর-নারীর মধ্যে। অথবা শুধু নর বা শুধু নারীর মধ্যে নয়।

'মুওয়াদ্‌দাতাঁও ওয়া রহমাহ্' অর্থ নর ও নারীর পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া, যা সৃষ্টি হয় বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে। সম্প্রীতির ও আত্মীয়তার অন্যান্য শাখা প্রশাখাও সৃষ্টি হয় এই সম্পর্কের ভিত্তিতে। এভাবেই পারস্পরিক প্রেম-প্রণয়-প্রীতি-অনুরাগ ও সহযোগিতার মাধ্যমে প্রবহমান রয়েছে মহামানবতা।

এরপর বলা হয়েছে— 'চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে'। একথার অর্থ— যারা বিচক্ষণ ও ভাবুক, তারা মহামানবতার এমতো বন্ধন ও বিস্তারের মধ্যে খুঁজে পায় আল্লাহ্‌র সৃজননৈপুণ্য ও প্রজন্মপরম্পরাগত অনেক বিস্ময়কর উপাত্ত।

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে'।

এখানে 'ইখতিলাফি আলসিনাতিকুম' অর্থ— ভাষা বা বচনের বৈচিত্র্য। আল্লাহ্‌পাক বিভিন্ন জাতির জন্য সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন ভাষা। আর প্রতিটি ভাষার বর্ণমালা ভিন্ন ভিন্ন। অথবা ভাষার বৈচিত্র্য বলে এখানে বুঝানো হয়েছে বাকভঙ্গিমাগত বৈসাদৃশ্যকে, নানাবিধ স্বরভঙ্গিমাকে। সেকারণেই দেখা যায় একজনের কণ্ঠস্বর অন্যজনের কণ্ঠস্বর অপেক্ষা পৃথক।

'ওয়া আলওয়ানিকুম' অর্থ বর্ণের বৈচিত্র্য। অর্থাৎ মানুষের গাত্রত্বক ও দেহাবয়বের বর্ণগত তারতম্য। একারণেই দেখা যায় কেউ দীর্ঘ, কেউ হ্রস্ব, কেউ কৃশকায়, কেউ স্থূল। কেউ শ্বেতাভ, কেউ লোহিতাভ, কেউ আবার শ্যামল, কেউ শুভ্র। অর্থাৎ আকৃতিগত ও প্রকৃতিগতভাবে কারো সঙ্গে কারো হুবহু মিল নেই।

'জ্ঞানীগণের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে' অর্থ মানুষের ভাষা ও বর্ণবৈচিত্রের মধ্যে জ্ঞানান্বেষীরাই খুঁজে পায় আল্লাহ্‌র সৃজনরহস্যের বহুতর নিদর্শন ও নিগুঢ় দর্শন।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত্রিতে ও দিবাভাগে তোমাদের নিদ্রা ও তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য'।

এখানে 'ইবতিগাউ' ক্রিয়াটির কর্মপদ রয়েছে উহ্য। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— রাত ও দিনের নিদ্রা ও জীবনোপকরণান্বেষণজনিত কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে রয়েছে মহাকুশলী আল্লাহ্‌র প্রভূত পরিমিতি ও বিন্যাস-বিভঙ্গগত সময়াতিপাতের অনেক অবাক নিদর্শন। বিশেষ করে, নিদ্রা তো মহাবিস্ময়। নিদ্রা শ্রান্তিহরণ করে বলেই মানুষ ক্রমাগত উদ্দীপিত হয় নতুন প্রাণপ্রাচুর্যে। প্রবহমান থাকে কর্ম, ঘর্ম ও আবিষ্কার। এ বিষয়টি জ্ঞানায়ত্ত করা অসম্ভব। বরং এই জ্ঞান যেনো শ্রুতিনির্ভর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাই শেষে বলা হয়েছে— এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য।

অথবা বলা যেতে পারে, নিশীথের সুপ্তি ও দিবসের জীবিকান্বেষণের কর্মমুখরতা আল্লাহ্‌তায়ালার অতুলনীয় কর্মকুশলতা ও শক্তিমত্তার একটি বিস্ময়কর নমুনা। এখানে দু'টি সংযোজক অব্যয়ের সন্নিবেশনের মধ্যে এই ইঙ্গিতটি নিহিত রয়েছে যে, শ্রান্তিনিবারণ ও উপার্জন প্রচেষ্টা কর্ম দু'টো দিবস-রাত্রির যে কোনো সময়ে করা যেতে পারে। নিশীথে নিদ্রা, দিবসে কর্মযোগ, অথবা দিবসে নিদ্রা, নিশীথে কর্মসম্পাদন। এমতো ব্যাখ্যার পরিপোষণ রয়েছে অন্য এক আয়াতেও।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তিনি তোমাদেরকে প্রদর্শন করেন বিদ্যুৎ, ভয় ও ভরসাসঞ্চারকরূপে এবং তিনি আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করেন এবং তদ্দ্বারা ভূমিকে মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন, এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য'।

এখানে 'খওফান' অর্থ ভয়। অর্থাৎ বজ্রপাতজনিত ভীতি। 'খওফান ওয়া ত্বমআ'ন' এখানে উল্লেখিত অথবা উহ্য দু'টি ক্রিয়াপদের কারণপ্রকাশক কিংবা অবস্থাজ্ঞাপক। আর 'ভূমিকে তার মৃত্যুর পর' অর্থ এখানে— খরাদগ্ধ ভূমি বিশুষ্ক হওয়ার পর। আর 'পুনরুর্জীবিত করেন' অর্থ করেন শস্যশ্যামল।

'ইয়া'ক্বিলূন' অর্থ বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়। অর্থাৎ বোধশক্তিসম্পন্ন যারা তারাই কেবল অনুধাবন করতে পারে আল্লাহ্‌পাকের এসকল নিখুঁত ও নিপুণ কর্মকাণ্ডের মাহাত্ম্য।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি; অতঃপর আল্লাহ্ যখন তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে উঠবার জন্য একবার আহ্বান করবেন তখন তোমরা উঠে আসবে'। এখানে 'ছুম্‌মা' (অতঃপর) শব্দটি সময়ান্তরজ্ঞাপক অথবা মহাপ্রলয় বা মহাবিচার দিবসের মাহাত্ম্যপ্রকাশক।

বাগবী লিখেছেন, অধিকাংশ তাফসীর বেত্তার মতে এখানকার 'মিনাল আরদ্ব' (ভূমি থেকে) কথাটির সম্বন্ধ রয়েছে 'তাখরুজুন' এর সঙ্গে। অর্থাৎ তোমরা পুনরুত্থিত হবে ভূমি থেকে। তবে বায়যাবী লিখেছেন, সমাধানটি ভ্রমাত্মক। কারণ 'ইজা'র পূর্বের শব্দের সম্বন্ধ ইজার পরের ক্রিয়ার সঙ্গে সম্ভব নয়। একারণেই এখানে 'ইজা'র সম্বন্ধ হবে 'দাআ' শব্দটির সঙ্গে। এভাবে অর্থ দাঁড়াবে— যখন আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভূমির মধ্য থেকে আহ্বান জানাবেন।

ইবনে আসাকের লিখেছেন, জায়েদ ইবনে জাবের শাফেয়ী 'সেদিন আহ্বানকারী নিকটস্থ স্থান থেকে আহ্বান জানাবে' আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, সেদিন হজরত ইস্রাফিল বায়তুল মাকদিসের সন্নিকটবর্তী একটি প্রস্তরখণ্ডের উপরে দাঁড়িয়ে আহ্বান জানাবেন— ওহে বিগলিত অস্থি! ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বিলুপ্তপ্রায় বিবর্ণ চর্ম! ধুলিধূসরিত কেশগুচ্ছ! আল্লাহ্র আদেশ শোনো। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য একত্রিত হও। উল্লেখ্য, এখানকার দ্বিতীয় 'ইজা' (যখন) উল্লেখ করা হয়েছে কর্মের আকস্মিকতাকে বুঝানোর জন্য। অর্থাৎ তোমরা পুনরুত্থিত হবে আকস্মিকভাবে।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। সকলেই তাঁর আজ্ঞাবহ'। একথার অর্থ— আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীসহ সমগ্র সৃষ্টির উপরে রয়েছে নিরঙ্কুশ আধিপত্য। সকলেই এবং সকলকিছুই তাঁর নির্দেশানুগত।

কালাবী বলেছেন, এখানে 'সকলেই তাঁর আজ্ঞাবহ' অর্থ বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলেই তাঁর অনুগত। অবশ্য এখানে শরিয়তের আনুগত্যের কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে বিধানগত আনুগত্যের কথা। অবিশ্বাসীরা শরিয়তের বিধান লংঘন করতে পারে বটে, কিন্তু যে বিধানে সমগ্র সৃষ্টির অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও পরিণতি সতত সচল থাকে, সে বিধানের বাইরে যাবার ক্ষমতা তাদেরও নেই। হজরত ইবনে আব্বাস তাই বলেছেন, প্রত্যেকেই জন্ম, মৃত্যু, পুনরুত্থান ও মহাবিচার দিবসের আইনের দাস, যদিও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা হয়ে থাকে আল্লাহ্র ইবাদত বিমুখ।

ইকরামা সূত্রে ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান হবেই— একথা শুনে হতবাক হয়ে যেতো মক্কার পৌত্তলিকেরা। তাদের এমতো বিস্ময় নিরসনার্থে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত।

এরপরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর তিনি একে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার, এটা তার জন্য অতি সহজ'।

রবী ইবনে হাইছুম, হাসান, কাতাদা ও কালাবী বলেন, এখানকার 'আহওয়ান' (অতিসহজ) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'হাইয়্যেন' অর্থে। কেননা আল্লাহ্র পক্ষে অসহজ বলে কোনো কিছুই নেই। এখানকার— এই শব্দরূপটি তুলনামূলক বিশেষণ

হলেও একে গ্রহণ করতে হবে রূপক বিশেষণ অর্থে। আউফি বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসের ব্যাখ্যাও এরকম।

মুজাহিদ ও ইকরামা বলেছেন, এখানের 'আহওয়ান' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে দৃষ্টান্তরূপে। লক্ষ্যার্থে নয়, রূপকার্থে। অর্থাৎ দ্বিতীয় সৃষ্টি প্রথম সৃষ্টির তুলনায় সহজ। বক্তব্যের লক্ষ্য এখানে যেহেতু মানুষ, তাই যেনো এখানে বলা হয়েছে— দ্বিতীয় সৃষ্টি যে প্রথম সৃষ্টির চেয়ে সহজতর, একথা তোমরাও জানো। অর্থাৎ এই দৃষ্টান্তটিই তোমাদের জ্ঞানানুকূল।

কেউ কেউ কথাটির মর্মার্থ করেছেন— তোমাদের কাছে যেমন দ্বিতীয় নির্মাণ প্রথম নির্মাণাপেক্ষা সহজ, তেমনি আল্লাহ্‌র নিকটে এমতো সৃজন অতি অবশ্যই সহজ। কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেন, সৃষ্টিকুলের পক্ষে প্রথমবারের চেয়ে দ্বিতীয়বারের অস্তিত্বগ্রহণ সহজতর। কারণ দ্বিতীয়বার তারা স্বরূপ ধারণ করবে মাত্র একটি মহাধ্বনির প্রতিক্রিয়ায়। প্রথমবারের সৃষ্টি ছিলো সময়সাপেক্ষ, জটিল ও বিবর্তন প্রক্রিয়াভূত। যেমন শুক্রকণা-রক্তপিণ্ড-গোশতপিণ্ড-অস্থিপঞ্জরাবৃত হওয়া— তারপর পূর্ণ দেহাবয়ব, প্রবৃদ্ধি, পরিণতি ইত্যাদি। কিন্তু দ্বিতীয় বারের অস্তিত্বায়ন ঘটবে হজরত ইসরাফিলের মাত্র একটি ফুৎকারধ্বনির মাধ্যমে। কালাবীর সূত্রে বর্ণিত ইবনে হাব্বানের বক্তব্য এবং সালেহের মাধ্যমে উপস্থাপিত হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তির সারকথাও এরকমই।

এরপর বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই'। একথার অর্থ— মহাকাশমার্গে ও মেদিনীপৃষ্ঠে যা কিছু বিদ্যমান, সকলেই তাঁর মর্যাদা ও মহিমা মুখর। কথায় অথবা নীরবতায়। ভাষায় অথবা অভিব্যক্তিতে। কেননা তিনিই সর্বোচ্চ মর্যাদাধারী। এমতো মর্যাদা অন্য কারো বা অন্য কোনো কিছুরই নেই।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই' অর্থ— তাঁর দৃষ্টান্ত অনুপম'। কাতাদা সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, আবদুর রাজ্জাক বলেছেন, কলেমায়ে তাইয়্যেবার সাক্ষ্য দিয়ে বলছি, কথাটির অর্থ হবে— আল্লাহ্‌র এককত্বের দৃষ্টান্তই সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'। একথার অর্থ— সৃজনকর্মে ও প্রভুত্বে তিনি মহাপ্রতাপশালী ও সর্বশক্তিধর। সৃষ্টির সূচনা ও সমাপ্তি দু'টোর কোনো একটিও তাঁর পরাক্রম বহির্ভূত নয়। আর তাঁর সকল কর্মকাণ্ড প্রজ্ঞাবিমণ্ডিত।

তিবরানী বর্ণনা করেছেন, হজের সময় অংশীবাদীরাও তালবিয়া পাঠ করতো। কিন্তু সাথে সাথে একথাও বলতো যে, হে আল্লাহ্! তোমার তো কোনো সমকক্ষ নেই। তবে তুমি যাকে মনোনীত করেছো তোমার সমকক্ষরূপে। কিন্তু তুমি তারও প্রভুপালক। সে তোমার মালিক নয়। তাদের এমতো অংশীবাদিতামিশ্রিত অপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে পরবর্তী আয়াত। বলা হয়েছে—

সূরা রূম ঃ আয়াত ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২

ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ؕ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ
اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَآءَ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ
تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ
لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿۲۸﴾ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ
عِلْمٍ ۚ فَمَنْ يَّهْدِيْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَ مَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿۲۹﴾
فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ؕ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙۗ وَلٰكِنَّ
اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾ مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَ اَقِيْمُوا
الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۳۱﴾ مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا
دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا ؕ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ﴿۳۲﴾

r আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করিতেছেনঃ তোমাদিগকে আমি যে রিয্ক দিয়াছি, তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীগণের কেহ কি তাহাতে অংশীদার? ফলে তোমরা কি এই ব্যাপারে সমান? তোমরা কি উহাদিগকে সেইরূপ ভয় কর যেইরূপ তোমরা পরস্পর পরস্পরকে ভয় কর? এইভাবেই আমি বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের নিকট নিদর্শনাবলী বিবৃত করি।

r বরং সীমালংঘনকারীগণ অজ্ঞানতাবশত তাহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে; সুতরাং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করিয়াছেন, কে তাহাকে সৎপথে পরিচালিত করিবে? আর তাহাদের কোন সাহায্যকারী নাই।

r তুমি একনিষ্ঠ হইয়া নিজকে দীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহ্র প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন; আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নাই। ইহাই সরল দীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

r বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁহার অভিমুখী হইয়া তাঁহাকে ভয় কর, সালাত কায়েম কর এবং অন্তর্ভুক্ত হইও না মুশরিকদের ,

r যাহারা নিজেদের দীনে মতভেদ সৃষ্টি করিয়াছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ লইয়া উৎফুল্ল।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ এবার তোমাদের নিজেদের মধ্যে একটি আশ্চর্যজনক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছেন। উপমাটি এই— দ্যাখো, তোমরা ও তোমাদের ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীরা উভয়েই মানব হিসেবে সমতুল। তবুও তোমাদের সম্পদে তাদের অধিকার অস্বীকৃত। তোমরা অন্য মানুষকে ভয় করলেও তাদের আনুগত্য সম্পর্কে কেমন নিঃশঙ্কচিত্ত। এই যদি হয় অবস্থা, মানুষ হয়েও যদি তারা তোমাদের সমকক্ষতা দাবি না করতে পারে, তবে কোনো প্রস্তর প্রতিমা মহাবিশ্বের একক সৃজয়িতা ও পালয়িতার সমকক্ষ হতে পারে কীভাবে? আর কীভাবেই বা তোমরা আল্লাহ্কে পরিত্যাগ করে নিয়োজিত হতে পারো বিগ্রহবন্দনায়?

এখানে 'দ্বরাবা' অর্থ আল্লাহ্ উপস্থাপন করেন। 'লাকুম' অর্থ তোমাদের জন্য। 'মা মালাকাত আইমানাকুম' অর্থ তোমাদের ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী। 'ফীহি সাওয়াউন' অর্থ তোমাদের সম্পদের মালিকানা যথেচ্ছ ব্যবহারে সমতুল কি তারাও? তারাও কি ব্যয় করতে পারে তোমাদেরই মতো? 'তাখাফূনাহুম' অর্থ তোমরা তাদেরকে ভয় করো, কখন তারা তোমাদের সম্পদে হস্তক্ষেপ করে। 'কাখীফাতিকুম আনফুসাকুম' অর্থ তোমরা যেমন তোমাদের মতো স্বাধীন লোকদেরকে ভয় করো, তেমনি কি ভয় করো তোমাদের দাসদাসীদেরকে? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজা অর্থ তোমরা তাদের সম্পর্কে থাকো নির্ভয়। তাদেরকে মনে করো হেয়। তারা তোমাদের সম্পদের অংশীদারও নয়। তাই তোমাদের মতো যথেচ্ছ ব্যয়ের অধিকার তাদের নেই।

শেষে বলা হয়েছে— 'এভাবেই আমি বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের নিকট নিদর্শনাবলী বিবৃত করি'। একথার অর্থ— উল্লেখিত উপমা দ্বারা সত্যোপলব্ধি করতে পারে কেবল তারা, যারা শুভ বোধ ও বিশুদ্ধ বিবেকসম্পন্ন। আর আমি

তাদের উপকারের জন্যই বিবৃত করি এমতো দৃষ্টান্তমূলক নিদর্শন। তাই তো তারা এমতো দৃষ্টান্তের মধ্যে খুঁজে পায় তাদের চিন্তাগবেষণার প্রকৃষ্ট উপাত্ত। তিবরানী বলেছেন, জুয়াইবীর ও দাউদ ইবনে হিনদ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, আবু জাফর মোহাম্মদ ইবনে আলী জয়নুল আবেদীন আলোচ্য বাক্যের ব্যাখ্যা এভাবেই করেছেন।

পরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'বস্তুতঃ সীমালংঘনকারীগণ অজ্ঞানতাবশতঃ তাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে থাকে'। একথার অর্থ— প্রকৃত কথা হচ্ছে, আল্লাহ্র অংশী, সমকক্ষ অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী কেউই নেই, হতে পারেও না। সুতরাং যারা শিরিক করে তারা সীমালংঘনকারী। এই জঘন্য ও শাস্তিযোগ্য অমার্জনীয় পাপটি তাদেরই ধারণাপ্রসূত। তারা খেয়াল-খুশীর অনুসারক। আর এমতো অন্ধ অনুসরণ তারা করে অজ্ঞানতাবশতঃ।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, কে তাকে সৎপথে পরিচালিত করবে? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজা অর্থ— যারা তাদের স্বপ্রবৃত্তির উপাসক। অজ্ঞতা ও খেয়াল-খুশীর অনুসারক এবং যারা অবজ্ঞা ও অবহেলা ভরে পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত পথনির্দেশনাকে, তাদেরকে আবার পথ দেখাবে কে? তারা যে চিরভ্রষ্ট।

শেষে বলা হয়েছে— 'তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই'। একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানে যারা অনঢ় ও অবিচল, তাদেরকে পাপমুক্ত করার দায় কারো উপরেই বর্তেনা। সুতরাং তারা কোনো সাহায্যকারীও পায় না।

এরপরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত করো'। এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল। যখন একথা প্রমাণিত হলো যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা চিরঅজ্ঞ ও স্বেচ্ছাচারীতায় অবিচল, তখন তাদের জন্য আর অযথা আক্ষেপ করে সময় নষ্ট করবেন কেনো। আপনি তো আপনার আমন্ত্রণকর্তব্য যথাযথরূপে পালন করেছেনই। সুতরাং এবার সম্পূর্ণরূপে মনোনিবদ্ধ করুন ধর্মাচরণের প্রতি। ইবাদত-বন্দেগীকে করুন নৈষ্ঠিক, ঐকান্তিক এবং একাগ্রচিত্ততায়িক'।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র প্রকৃতির অনুসরণ করো, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন'। এখানে 'ফিতরাত' অর্থ প্রকৃতি বা স্বভাব। আর মর্মার্থ— ইসলাম। মানুষকে সৃজন করা হয়েছে ইসলামের স্বভাবের উপর। হজরত ইবনে আব্বাস সহ অধিকাংশ তাফসীরবেত্তা এরকমই বলেছেন।

এখানে সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স. এর প্রতি সরাসরি। কিন্তু সমগ্র মানবজাতি এ সম্বোধনের বৃত্তভূত। আর এর মর্মার্থ হচ্ছে— সমগ্র সৃষ্টির জন্যই

ইসলাম বা আনুগত্য অপরিহার্য। আর ফিতরতকে উপলব্ধি করার যোগ্যতাও সকলের রয়েছে, যদিও এ যোগ্যতাকে অনেকে স্বেচ্ছায় নষ্ট করে ফেলে। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে বলতে হয়, ফিতরত অর্থ স্বভাবজ সামর্থ্য বা সত্তাগত যোগ্যতা।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ফিতরত অর্থ ওই অঙ্গীকার যা আল্লাহ্তায়ালা সমগ্র মানবজাতির নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন। আলমে আরওয়াহে বলেছিলেন, আমি কি তোমাদের প্রভুপালক নই? সকলে সমস্বরে জবাব দিয়েছিলো, অবশ্যই। এরপর পৃথিবীতে সকল শিশুই জন্মগ্রহণ করে অঙ্গীকারের দায়িত্ব স্কন্ধে নিয়ে। হানাফী আলেমগণ এরকমই বলে থাকেন। সুরা আলে ইমরানের এ সম্পর্কিত এক আয়াতের ব্যাখ্যাসূত্রে হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, সকল মনুষ্যসন্তান জন্ম গ্রহণ করে ফিতরতের উপর। তারপর তাদের পিতামাতাই তাদেরকে বানিয়ে দেয় ইহুদী, খৃষ্টান অথবা অন্য কোনো ধর্মমতানুসারী। যেমন পশুশাবক, তাদের জন্ম আকৃতি নিখুঁত, কিন্তু পরবর্তীতে তাদের করা হয় অঙ্গছেদন। এরপর রসুল স. আবৃত্তি করলেন— আল্লাহ্র প্রকৃতির অনুসরণ করো, প্রকৃতি অনুসারে.......।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই'। একথার অর্থ— আল্লাহ্র ধর্মাদর্শে রূপান্তর ঘটিয়ো না। মুজাহিদ ও ইব্রাহিম নাখয়ী কথাটির অর্থ করেছেন— সুদৃঢ়রূপে অবস্থান গ্রহণ করো আল্লাহ্র ফিতরতের উপর। আল্লাহ্র এককত্বের বিশ্বাসকে বিমিশ্রিত কোরো না অংশীবাদিতার সঙ্গে।

এক বর্ণনায় এসেছে, প্রতিটি মানবশিশু জন্ম গ্রহণ করে ফিতরতের উপর। হাদিসটিকে আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— প্রত্যেক মানবশিশু জন্মগতভাবে সৌভাগ্যবান অথবা দুর্ভাগা হিসেবে নির্ধারিত। ওই নির্ধারণের অনুকূল স্বভাব নিয়েই তারা পৃথিবীতে আগমন করে এবং প্রত্যাগমনও করে ওই একই স্বভাব নিয়ে। পৃথিবীতে তাদের কর্মকাণ্ডও হয় স্বস্বভাবানুকূল। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে 'আল্লাহ্র সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই' কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— যে শুভ ও অশুভ স্বভাব নিয়ে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে, তা অপরিবর্তনীয়। সুতরাং ভাগ্যবান ও হতভাগ্যরা কখনোই তাদের স্বস্বভাব বদলাবে না।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের আদি রূপ মাতৃউদরে অবস্থান গ্রহণ করে শুক্রবিন্দু আকারে। এরপর ওই আকৃতি হয় রক্তপিণ্ড। তারপর গোশতপিণ্ড। এরপর এক ফেরেশতা তার ললাটে লিখে দেয় চারটি নির্ধারণ— আয়ুষ্কাল, উপজীবিকা, সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য। এরপর ওই গোশতপিণ্ডে ঘটানো হয় প্রাণের সম্পাত। যিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, সেই পবিত্র সত্তার শপথ! কোনো কোনো মানুষ জীবনভর

পুণ্যকর্ম করে, এমনকি সে চলে যায় জান্নাতের প্রায় একহাত ব্যবধানে। সহসা তার উপরে প্রবল হয়ে যায় তার জন্মকালীন ললাটলিপি। সে তখন শুরু করে জাহান্নামবাসীদের মতো আমল। পরিশেষে জাহান্নামই হয় তার গন্তব্য। আবার কোনো কোনো মানুষ জীবনব্যাপী আমল করে জাহান্নামবাসীদের মতো। এমনকি তার এবং জাহান্নামের মধ্যে ব্যবধান হয় প্রায় একহাত। সহসা তার উপরে প্রবল হয় তাঁর জন্মকালীন অদৃষ্টলিপি। তখন সে শুরু করে নিরবচ্ছিন্ন পুণ্যকর্ম। ফলে তার জান্নাতগমন হয় সুনিশ্চিত। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু দারদা বর্ণনা করেছেন, একবার আমরা রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে সমবেত হয়ে আমাদের পরিণামের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম। রসুল স. বললেন, যদি শোনো, কোনো পাহাড় স্থানচ্যুত হয়েছে, তবু সে তথ্যে তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করতে পারো। কিন্তু যদি শোনো, কোনো মানুষের স্বভাব বদল হয়েছে, তবে সে কথা বিশ্বাস কোরো না। কারণ মানুষের পরিণতি তার সুনির্ধারিত স্বভাবের অনুকূল। আহমদ। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্পাক প্রত্যেক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর জন্য নির্ধারিত স্বভাবের উপর। তারা সে স্বভাব পরিবর্তন করতে অক্ষম। অতএব হে আমার রসুল! একথা জেনে আনন্দিত হোন যে, আল্লাহ্ আপনাকে এবং সহচরবৃন্দকে করেছেন সৌভাগ্যবান। সুতরাং একনিষ্ঠভাবে আপনি ও আপনার অনুচরবর্গ স্বভাবকে পরিচ্ছন্ন ও শাণিত করবার নিমিত্তে ধর্মাধিষ্ঠিত হোন। সতত অনুসারী থাকুন আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত চিরন্তন প্রকৃতির। এমতাবস্থায় বলতে হয়, আলোচ্য আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের কারণ প্রকাশক। অর্থাৎ আলোচ্য বক্তব্যে নিহিত রয়েছে ধর্মীয় পরিশুদ্ধি অর্জনের আবেগঘন নির্দেশনা। ইকরামা ও মুজাহিদ আবার পুরো আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আল্লাহ্র সৃষ্টির রূপান্তর ঘটিয়ো না। যেমন জন্তু-জানোয়ারকে বানানো হয় খাশী ইত্যাদি।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটাই সরল দ্বীন'। একথার অর্থ— যে প্রকৃতি সম্মত ধর্মের কথা বলা হলো, সেই ধর্মই হচ্ছে বক্রতাবিমুক্ত প্রকৃত ধর্ম।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না'। একথার অর্থ— কিন্তু মক্কার অধিকাংশ মানুষ এই সরল তত্ত্বটি সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করে না।

এরপরের আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে— 'বিশুদ্ধচিত্তে তাঁর অভিমুখী হয়ে তাঁকে ভয় করো, সালাত কায়েম করো এবং অন্তর্ভুক্ত হয়ো না মুশরিকদের'। এখানকার 'মুনীবীন' শব্দটির বুৎপত্তি ঘটেছে 'আনাবা' থেকে। এর অর্থ— সবকিছু পরিত্যাগ করে একাগ্রচিত্তে আল্লাহ্ অভিমুখী হওয়া।

এরপরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'যারা নিজেদের দ্বীনে মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং দলে দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! ধর্মাদর্শের বিষয়ে যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী, তাদের অনুরাগী আপনি কস্মিনকালেও হবেন না। তারা তো নিজ নিজ মতবাদকে ধর্ম মনে করেই খুশী।

এখানকার 'যারা নিজেদের দ্বীনে মতভেদ সৃষ্টি করেছে' বাক্যটি পূর্ববর্তী আয়াতের। 'অন্তর্ভুক্ত হয়ো না মুশরিকদের' কথাটির অর্থান্তরন্যাস। অর্থাৎ অংশীবাদীরাই বিচ্ছিন্নতাবাদী। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— যারা প্রবৃত্তির প্ররোচনায় নির্বাচন করে নিয়েছে পৃথক পৃথক উপাস্য, রূপান্তরিত করেছে ধর্মের অবকাঠামো, তোমরা তাদের দলভুক্ত নও। তারা তো তাদের স্বকপোলকল্পিত মতবাদ নিয়েই তুষ্ট। তাদের প্রত্যেক দলের আচার্য আকর পৃথক পৃথক। তারাই ছিন্নভিন্ন করেছে প্রকৃত ধর্মাদর্শকে আর অধিকাংশ লোক হয়েছে তাদেরই অন্ধ অনুসারী।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'যারা নিজেদের দ্বীনে মতভেদ সৃষ্টি করেছে' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে এই উম্মতের বেদাতী দলগুলোকে। তারাও ধর্মের নামে হয়েছে আপনাপন মতবাদের অনুসারী। আর তারা 'মুশরিক' (অংশীবাদী) এই অর্থে যে— তারা আল্লাহ্র রসুল প্রবর্তিত ধর্মাদেশ ছেড়ে উপাসনা করতে শুরু করেছে স্বপ্রবৃত্তির। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মত বিভক্ত হবে তিয়াত্তরটি দলে, তন্মধ্যে একটি দল ব্যতীত অন্য সকল দল হবে জাহান্নামী। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! ওই দলটি কোন দল। তিনি স. বললেন, আমি ও আমার সহচরবৃন্দের দল। তিরমিজি।

এখানে 'মা লাদাইহিম' অর্থ নিজ নিজ মতবাদ। 'ফারিহূন' অর্থ উৎফুল্ল। বাতিলপন্থীরা নিজেদেরকে মনে করে সত্যপন্থী। তাই আপন মতবাদ নিয়েই তারা থাকে সতত উৎফুল্ল। ইবনে মোবারক ও আওজায়ীর সূত্রে ইব্রাহিম ইবনে ইসহাকের মাধ্যমে দারেমী বর্ণনা করেছেন, ইবলিস একবার তার সাঙ্গপাঙ্গদেরকে বললো, তোমরা আদম সন্তানদেরকে বিভ্রান্ত করবার জন্য কীভাবে প্রচেষ্টা চালাও? সাঙ্গপাঙ্গরা বললো যারা একত্ববাদী, তাদেরকে বিভ্রান্ত করা দুরূহ। কারণ একত্ববাদদের সঙ্গে জড়িত রয়েছে এক আল্লাহ্র মার্জনা। ইবলিস বললো, ঠিক আছে, আমি তাহলে তাদের মধ্যে এমন প্রথার প্রচলন ঘটাবো, যাতে করে তারা আর কখনো মার্জনাই কামনা করবে না। অর্থাৎ পাপকে পাপই মনে করবে না। মনে করবে, তারা যা করছে, সেটাই সঠিক। একথা বলে ইবলিস আদম সন্তানদের প্রবৃত্তিকে করে দিলো বিভিন্ন নতুনত্বের প্রতি অনুরাগী।

وَ اِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُّنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَآ اَذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾ لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ فَتَمَتَّعُوْا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٤﴾ اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوْا بِهٖ يُشْرِكُوْنَ ﴿٣٥﴾

r মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্যস্পর্শ করে তখন উহারা বিশুদ্ধ চিত্তে উহাদের প্রতিপালককে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন উহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহ আস্বাদন করান তখন উহাদের একদল উহাদের প্রতিপালকের শরীক করিয়া থাকে;

r ফলে উহাদিগকে আমি যাহা দিয়াছি, তাহা উহারা অস্বীকার করে। সুতরাং ভোগ করিয়া লও, শীঘ্রই তোমরা জানিতে পারিবে!

r আমি কি উহাদের নিকট এমন কোন দলীল অবতীর্ণ করিয়াছি যাহা উহাদিগকে শরীক করিতে বলে?

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— 'মক্কায় পৌত্তলিকেরা যখন বিপদাপদের সম্মুখীন হয়, তখন তারা তাদের পূজ্য প্রতিমাগুলোর পূজা অর্চনা ছেড়ে একমনে ডাকে কেবল আল্লাহ্‌কে। তারপর আল্লাহ্ যখন তাদের বিপদাপদ দূর করে দেন, তখন তারা আবার ফিরে যায় পৌত্তলিকতায়।

এখানে 'রহমত' (অনুগ্রহ) অর্থ বিপদমুক্তি। অথবা দীর্ঘ দুর্ভিক্ষের পর ফল-ফসলের সমারোহ। আর এখানে 'শরীক করে থাকে'। অর্থ করুণা দাতা হিসেবে বিপদের সময় আল্লাহ্‌কে মেনে নিলেও বিপদ অপসারিত হওয়ার নিষ্কৃতিদাতা হিসেবে মানতে শুরু করে প্রতিমাগুলোকে।

হজরত খালেদ ইবনে জায়েদ জুহুনী বর্ণনা করেছেন, তখন আমরা হুদায়বিয়ায়। রাতে বৃষ্টি হলো। প্রাতে রসুল স. আমাদেরকে নিয়ে পাঠ করলেন ফজরের নামাজ। নামাজ শেষে তিনি স. আমাদের দিকে মুখ করে বসে বললেন, জানো তোমাদের প্রভুপালনকর্তা কী বলেছেন? আমরা বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলই সমধিক পরিজ্ঞাত। রসুল স. বললেন, আল্লাহ্ বলেছেন— এই সকালেই আমার বান্দাগণের মধ্যে কেউ হলো মুমিন এবং কেউ কাফের। যারা বললো, সদাশয় আল্লাহ্ দয়া করে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। তারা ইমানদার। তারা নক্ষত্রপুঞ্জের প্রভাব অস্বীকারকারী। আর যারা বললো, বৃষ্টি হয়েছে অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে, তারা কাফের। তারা আমাকে প্রত্যাখ্যানকারী। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আকাশ থেকে যখন আল্লাহ্র বরকতের বর্ষণ হয়, তখন একদল মানুষ হয় আল্লাহ্র রহমত অস্বীকারকারী। বৃষ্টিপাত ঘটান আল্লাহ্ই, অথচ তারা বলে, বৃষ্টি হয়েছে অমুক অমুক নক্ষত্রের উদয় হওয়ার কারণে।

পরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'ফলে তাদেরকে আমি যা দিয়েছি তা তারা অস্বীকার করে'। এখানে 'লিইয়াকফুরূ' কথাটির 'লি' (যেনো, যা) অব্যয়টি পরিণতি প্রকাশক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— ফল এই দাঁড়ায় যে, তারা অকৃতজ্ঞ হয় আল্লাহ্ যা দিয়েছেন, তার প্রতি। অথবা বলা যেতে পারে 'লি' এর 'লাম' অক্ষরটি এখানে অনুজ্ঞাবোধক। আর অনুজ্ঞা অর্থ এখানে হুমকি প্রদান। যেনো বলা হয়েছে— ঠিক আছে, এখন তোমরা আমার দেওয়া অনুগ্রহসম্ভারের প্রতি অকৃতজ্ঞ হচ্ছো, হও। কিন্তু এর প্রতিফল তোমরা পরকালে পাবে শাস্তিরূপে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং ভোগ করে নাও, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে'। এ কথার অর্থ— এখন মজা লুটতে থাকো। কিন্তু সে দিনও বেশী দূরে নয়, যখন জানতে পারবে এমতো সম্ভোগের পরিণাম কতো অশুভ।

এর পরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— 'আমি কি তাদের নিকট এমন কোনো দলিল অবতীর্ণ করেছি যা তাদেরকে শরীক করতে বলে'? এখানকার 'আম' অব্যয়টি যোজক অথবা বিয়োজক। দু'ভাবেই এর ব্যবহার সুপ্রচল। আর অব্যয়টির সম্বন্ধ রয়েছে এখানে একটি উহ্য ক্রিয়ার সাথে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তারা কি কোনো প্রমাণ ব্যতিরেকেই আল্লাহ্র সঙ্গে শিরিক করে, না আল্লাহ্ তাদের শিরিক করার জন্য অবতীর্ণ করেছেন কোনো প্রমাণ? প্রশ্নটি এখানে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ— কখনোই আল্লাহ্ তাদের অংশীবাদিতার সমর্থনে কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'সুলতান' অর্থ প্রমাণ বা অজুহাত। কাতাদা বলেছেন, এর অর্থ আকাশজ গ্রন্থ। কেউ কেউ 'সুলতান' অর্থ করেছেন সুলতানধারী, অর্থাৎ ফেরেশতা, যাদের সাথে প্রমাণরূপে থাকে অলৌকিক নিদর্শন। অথবা সুলতান অর্থ এখানে নবী-রসুল, যাদেরকে সাহায্য করা হয় অলৌকিক প্রমাণ বা মোজেজা দ্বারা।

'ইয়াতাকাল্লামু' অর্থ বলে বা বলছে, ভাষায় অথবা অভিব্যক্তিতে। এমতো ব্যাখ্যার সমর্থন রয়েছে অন্য একটি আয়াতেও। যেমন— 'আমার গ্রন্থ সত্য কথা বলে'।

'বিমা কানু বিহী ইউশরিকূন' (যা তাদেরকে শরীক করতে বলে) কথাটির 'মা' অব্যয়টি এখানে ধাতুমূল। অর্থাৎ যা তাদেরকে শিরিক অথবা শিরিকের বৈধতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়। অথবা বলা যেতে পারে, এখানে 'মা' অব্যয়টির অর্থ কর্ম।

যদি তাই হয়, তবে 'বা' অব্যয়টি এখানে হবে কারণপ্রকাশক এবং বক্তব্যটি দাঁড়াবে— এমন উৎকৃষ্ট কর্ম যার কারণে তারা আল্লাহ্‌র অংশী স্থাপন করছে, মেনে নিচ্ছে মিথ্যা উপাস্যগুলোকে।

সূরা রূম ঃ আয়াত ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০

وَإِذَآ أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ ﴿٣٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٣٧﴾ فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ۖ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۠ فِيْٓ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ﴿٣٩﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ۗ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ ۗ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٤٠﴾

r আমি যখন মানুষকে অনুগ্রহের আস্বাদ দিই উহারা তাহাতে উৎফুল্ল হয় এবং উহাদের কৃতকর্মের ফলে দুর্দশাগ্রস্ত হইলেই উহারা হতাশ হইয়া পড়ে।

r উহারা কি লক্ষ্য করে না, আল্লাহ্ যাহার জন্য ইচ্ছা রিয্‌ক প্রশস্ত করেন এবং সীমিত করেন? ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।

r অতএব আত্মীয়কে দিবে তাহার হক এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। যাহারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে তাহাদের জন্য ইহা শ্রেয় এবং তাহারাই সফলকাম।

r মানুষের ধনে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া তোমরা যে সুদ দিয়া থাক, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তাহা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না। কিন্তু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়া থাক তাহাই বৃদ্ধি পায়; উহারাই সমৃদ্ধিশালী।

r আল্লাহ্‌ই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমাদিগকে রিয্‌ক দিয়াছেন, তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাইবেন ও পরে তোমাদিগকে জীবিত করিবেন। তোমাদের দেব-দেবীগুলির এমন কেহ আছে কি, যে এ সমস্তের কোন কিছু করিতে পারে? উহারা যাহাদিগকে শরীক করে, আল্লাহ্‌ উহা হইতে পবিত্র, মহান।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আমি যখন মানুষকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করি, তখন তারা অতিরিক্ত উৎফুল্ল হয়। শুরু করে দম্ভপ্রদর্শন। আর যখন তাদের কৃতকর্মের কারণে তারা দুঃখ-দুর্দশায় পতিত হয়, তখন ডুবে যায় সীমাহীন নৈরাশ্যে। উল্লেখ্য, বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীদের বিষয়টি ঠিক এর বিপরীত। তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভ করবে কৃতজ্ঞচিত্ত হয়ে এবং বিপদ-মুসিবতে ধারণ করে ধৈর্য। আর আশা রাখে ধৈর্যের যথাবিনিময়ের। নৈরাশ্য তাদেরকে কখনোই পীড়িত করে না।

পরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'তারা কি লক্ষ্য করে না, আল্লাহ্‌ যার জন্য ইচ্ছা রিজিক প্রশস্ত করেন এবং সীমিত করেন'। একথার অর্থ— জীবনোপকরণ প্রসরণ ও সংকোচন সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়নির্ভর। সুতরাং এই নিয়ে মানুষ চাঞ্চল্য প্রবণতাকে প্রশ্রয় দিবে কেনো? কেনো হবে প্রাপ্তিতে দম্ভোৎফুল্ল এবং অপ্রাপ্তিতে নৈরাশ্য পীড়িত? তোমরা তো সকলে আল্লাহ্‌র সকাশে প্রত্যানীত হবেই। তবে এই মুহূর্তে কেনো পরিত্যাগ করবে না অংশীবাদিতা ও পাপাসক্তি? কেনো বিপদে ধৈর্যধারণ করবে না প্রকৃত বিশ্বাসীদের মতো? আর এর জন্য কেনোই বা আশা করবেনা পুণ্যের?

এরপর বলা হয়েছে— 'এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য'। একথার অর্থ— রিজিকের প্রসরণ-সংকোচন ও বিপদ-মুসিবতে ধৈর্যধারণের মধ্যে যে আল্লাহ্‌র অতুলনীয় প্রজ্ঞা ও শক্তিমত্তার নিদর্শন রয়েছে, সে কথা সম্যক উপলব্ধি করতে পারে কেবল তারা, যারা বিশ্বাসবান। অন্যেরা এমতো উপলব্ধি থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত।

এরপরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'অতএব আত্মীয়কে দিবে তার হক এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও'। একথার অর্থ— হে মানুষ! এবার অবগত তো হলে যে, জীবনোপকরণ প্রসরণ-সংকোচনের ব্যাপারটি সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়াধীন। তাহলে আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার বিষয়ে আর শৈথিল্য প্রদর্শন করবে কেনো? কেনো পরিপূরণ করবে না তাদের অধিকার? আর কেনোই বা প্রয়োজন পূরণ করবে না অভাব গ্রস্তদের এবং প্রবাসী পথিকদের। তারা স্বগৃহে স্বচ্ছল হলেও প্রবাসে তো প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী। সুতরাং আত্মীয়-অভাবগ্রস্ত-পথিক এদেরকে নির্দ্বিধায় দান করো জাকাতের সম্পদ থেকে। আর

তোমরা জাকাত ছাড়াও তো ইচ্ছে করলে তাদের জন্য অর্থব্যয় করতে পারো। তোমাদের এমতো আবশ্যিক ও স্বেচ্ছাকৃত দানে যেমন মানুষ উপকৃত হয়, তেমনি প্রীত হন আল্লাহ্ স্বয়ং।

এরপর বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য এটাই শ্রেয় এবং তারাই সফলকাম'।

এখানে 'জালিকা খইর' (এটাই শ্রেয়) কথাটির মর্মার্থ— সম্পদ একা ভোগ করা অপেক্ষা স্বজন-অভাবী-পথিকদের অধিকার পরিপূরণসহ ভোগ করাই উত্তম। এতে করে মানবিক সৌহার্দ ও বন্ধন হয় অধিকতর দৃঢ়। আর তা সমাজে বয়ে আনে প্রভূত কল্যাণ।

'ওয়াজহাল্লহ্' অর্থ আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তা বা দিক। আর মর্মার্থ— বিশ্বাসবানেরা কামনা করে আল্লাহ্‌র পরিতুষ্টি। অভিলাষী হয় পুণ্যের। সুখ্যাতি অথবা দানের স্বীকৃতি পাওয়ার লোভে তারা দান-খয়রাত করে না।

'হুমুল মুফলিহুন' অর্থ তারাই সফলকাম। অর্থাৎ নশ্বর জগতের কিছু অর্থ-বিত্ত দিয়ে তারা যেহেতু ক্রয় করে নেয় অবিনশ্বর আখেরাতকে, সেহেতু তারাই সফল। আর সাফল্য বঞ্চিত তারা, যারা এর বিপরীত।

এরপরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'মানুষের ধনে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাকো, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না'। এখানে 'ওয়ামা আতাইতুম' অর্থ তোমরা সুদখোরকে যা দাও। 'মিররিবা' অর্থ শরিয়তবিরোধী ওই প্রাপ্তি অথবা দেয় যা দাতা-গ্রহীতা পরস্পরকে প্রদান করে। অথবা দাতা অতিরিক্ত বিনিময় লাভের আশায় গ্রহীতাকে কিছু দেয়। এরকম দানকেই এখানে বলা হয়েছে 'ফী আমওয়ালিন নাসি' (মানুষের সম্পদে)। দাতা অথবা গ্রহীতার সম্পদ বৃদ্ধিই থাকে এমতো দানের উদ্দেশ্য। আর 'ফালা ইয়ারবূ ইনদাল্লহ্' অর্থ আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তা ধনসম্পদ বৃদ্ধি করে না।

বাগবী লিখেছেন, আলেমগণ আলোচ্য বাক্যের ব্যাখ্যা করেছেন বিভিন্নভাবে। সাঈদ ইবনে যোবায়ের, মুজাহিদ, তাউস, কাতাদা প্রমুখ বলেছেন, অতিরিক্ত বিনিময় প্রাপ্তির প্রত্যাশায় দান যদিও শরিয়তসমর্থিত, তবুও আখেরাতে এর জন্য কোনো পুণ্য নেই। এটাই 'আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না' কথাটির উদ্দেশ্য। এরকম কর্ম রসুল স. এর জন্যও নিষিদ্ধ ছিলো। যেমন তাঁকে লক্ষ্য করে এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'অধিক প্রাপ্তির কামনা করবেন না'। জুহাক বলেছেন, আলোচ্য বক্তব্যটির মর্মার্থ এরকম— আল্লাহ্‌তায়ালার তুষ্টি সাধনের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে কেবল সম্পদ বৃদ্ধির লালসায় যে ব্যক্তি তার আত্মীয়-স্বজন অথবা বন্ধু-সুহৃদদেরকে দান করে। সেই দান আল্লাহ্‌র কাছে সম্পদবর্ধক বলে গণ্য নয়।

শা'বী বলেছেন, এখানকার বক্তব্যটির অর্থ হবে এরকম— যে ব্যক্তি সেবা-যত্ন, প্রবাস-সঙ্গ, বাণিজ্য আনুকূল্য ইত্যাকার প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অপরের সঙ্গে কিছু দান করার মাধ্যমে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলে, তার কথাই বলা হয়েছে এখানে। এরকম দান পরকালের পুণ্যশূন্য। কারণ আল্লাহ্তায়ালার সন্তোষ সাধনের উদ্দেশ্য এখানে অনুপস্থিত। রসুল স. বলেছেন, কর্ম উদ্দেশ্যনির্ভর। যার যেমন উদ্দেশ্য থাকবে, সে ফলাফল পাবে তেমনই। যার পার্থিব প্রাপ্তি অথবা বিবাহের উদ্দেশ্যে হিজরত করবে, সে পাবে সেগুলোই। বোখারী, মুসলিম।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে জাকাত তোমরা দিয়ে থাকো, তা-ই বৃদ্ধি পায়। তারাই সমৃদ্ধিশালী'। এখানে 'ওয়ামা আতাইতুম' অর্থ তোমরা জাকাত দাও অথবা দান খয়রাত করো। 'ওয়াজহাল্লহ' অর্থ পুণ্য লাভ অথবা আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের জন্য।

'আল মুদ্বইফূন' অর্থ তারাই সমৃদ্ধিশালী। অর্থাৎ এরকম লোকের পুণ্যলাভ হবে কয়েকগুণ। এক একটি পুণ্যকে বৃদ্ধি করা হবে দশ গুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত। অথবা এর চেয়ে বেশী, যেমন আল্লাহ্পাক ইচ্ছা করবেন। অথবা কথাটির অর্থ— তারা পাবে কয়েকগুণ সওয়াব।

এখানে সুদ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তা ধন সম্পদ বৃদ্ধি করে না'। সুতরাং জাকাতের ক্ষেত্রে এরকম বলাই সঙ্গত ছিলো, আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে। কিন্তু এখানে তা বলা হয়নি। বলা হয়েছে— তোমরা যে জাকাত দিয়ে থাকো তা-ই বৃদ্ধি পায়। নিন্দার্হ ও প্রশংসার্হ বিষয়ের পার্থক্যকে প্রকট করে তোলার জন্যই এখানকার বাকরীতিতে এসেছে এরকম ভিন্নতর উপস্থাপনা কৌশল। আবার জাকাতদাতাদের প্রসঙ্গে প্রথমে বলা হয়েছে 'তুরীদূনা' (তোমরা কামনা করো) অথচ শেষে বলা হয়েছে 'হুমুল মুদ্বইফূন' (তারাই সমৃদ্ধিশালী)। এভাবে মধ্যমপুরুষের সম্বোধন থেকে পুরুষান্তরে গমন করা হয়েছে জাকাত প্রদাতার মর্যাদাকে সমুন্নত করবার জন্য। জুজায বলেছেন, এখানে অনুক্ত রয়েছে 'আহলুহা' (তার ধারকবাহক) শব্দটি। ওই লুপ্ত শব্দসহযোগে এখানকার শেষ বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে— জাকাতদাতাগণ কয়েকগুণ পুণ্যের অধিকারী।

এরপরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তোমাদেরকে রিজিক দিয়েছেন; তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পরে তোমাদেরকে জীবিত করবেন। তোমাদের দেব-দেবীগুলীর এমন কেউ আছে কি, যে এসমস্তের কোনো কিছু করতে পারে?

এখানে 'হালমিন্ শুরাকায়িকুম' কথাটির মর্মার্থ— তোমরা যে সকল প্রতিমাকে কল্পিত দেব-দেবীরূপে পূজা করে থাকো সেগুলো কি সৃজন, জীবনোপকরণদান এরকম কর্মকাণ্ড সম্পাদনে সক্ষম?

আল্লাহ্পাক এখানে প্রথমে উল্লেখ করেছেন প্রকৃত উপাস্যের যোগ্যতা ও ক্ষমতার কথা। বলেছেন, যিনি উপাস্য হওয়ার যোগ্য, তার অবশ্যই থাকতে হবে সৃজন ক্ষমতা, জীবনোপকরণ প্রদানের যোগ্যতা, তদুপরি থাকতে হবে জীবন-মৃত্যু-পুনরুত্থান সংঘটনের শক্তিমত্তা। তারপর প্রকাশ করেছেন পৌত্তলিকদের মিথ্যা উপাস্যগুলোর শক্তিহীনতা ও অলীকতার কথা এবং বিষয়টিকে তিনি ছুঁড়ে দিয়েছেন অস্বীকৃতিজ্ঞাপক অপ্রতিরোধ্য প্রশ্নবানরূপে, সবেগে। বলেছেন এমন কেউ আছে কি যে এ সমস্তের কোনোকিছু করতে পারে? সুতরাং এটাই অবধারিত ও অত্যাবশ্যক যে, উপাস্য হিসেবে আল্লাহ্র অংশী, প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা সমকক্ষ কেউ নেই। কোনোকিছুই নেই।

শেষে বলা হয়েছে— 'তারা যাদেরকে শরীক করে। আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র, মহান'। একথার অর্থ— অক্ষম, অথর্ব ও উপাস্য হওয়ার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত প্রতিমাগুলোকে পৌত্তলিকেরা আল্লাহ্র এক উপাস্য হওয়ার ক্ষেত্রে অংশীদার বানাতে চায়। কিন্তু তাদের এমতো অপবিত্র বিশ্বাস থেকে আল্লাহ্তায়ালার সত্তা-গুণবত্তা কার্যকলাপ সম্পূর্ণ পবিত্র ও মহিমময়।

সূরা রূম ঃ আয়াত ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ ؕ كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ ﴿٤٢﴾ فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ يَّصَّدَّعُوْنَ ﴿٤٣﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ ﴿٤٤﴾ لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٥﴾

r মানুষের কৃতকর্মের দরুন সমুদ্রে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়াইয়া পড়ে; যাহার ফলে উহাদিগকে উহাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান, যাহাতে উহারা ফিরিয়া আসে।

r বল, 'তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হইয়াছে! উহাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক।

r তুমি সরল দীনে নিজকে প্রতিষ্ঠিত কর, আল্লাহ্র পক্ষ হইতে যে দিবস অনিবার্য তাহা উপস্থিত হইবার পূর্বে, সেই দিন মানুষ বিভক্ত হইয়া পড়িবে।

r যে কুফরী করে কুফরীর শাস্তি তাহারই প্রাপ্য; যাহারা সৎকর্ম করে তাহারা নিজেদেরই জন্য রচনা করে সুখ-শয্যা।

r কারণ যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন। তিনি কাফিরদিগকে পছন্দ করেন না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে'। একথার অর্থ— মানুষের অনানুগত্য ও পাপাচরণের ফলেই স্থলভাগে ও জলভাগে নেমে আসে মহা বিপর্যয়। এখানে স্থলভাগের বিপর্যয় অর্থ খরা, মহামারী, অকাল মৃত্যু, অধিক মৃত্যু, প্লাবন, অগ্নুৎপাত, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি। আর জলভাগের বিপর্যয় হচ্ছে তুফান, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি।

বাগবী লিখেছেন, 'স্থলে' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে মরুভূমি, মরুদ্যান ও বনভূমিকে। আর 'সমুদ্রে' বলে বুঝানো হয়েছে সমুদ্রতীরবর্তী বন্দর, নগরসমূহকে। আতীয়া বলেছেন, এখানে 'বার' অর্থ স্থলভাগ এবং 'বাহ্র' অর্থ সমুদ্র। উল্লেখ্য, অনাবৃষ্টির প্রভাব যেমন স্থলভাগে পড়ে, তেমনি পড়ে জলভাগেও। বৃষ্টি শুরু হলে সমুদ্রের ঝিনুকগুলো পানির উপরে ভেসে ওঠে। হা করে গলাধঃকরণ করে বৃষ্টির ফোটা তারপর ডুবে যায় সমুদ্রের অতলে। ওই বৃষ্টির ফোটাই তাদের উদরাভ্যন্তরে জন্ম দেয় মণিমুক্তার। বৃষ্টিপাত বন্ধ হলে মণিমুক্তা সৃষ্টির এই অনন্য প্রক্রিয়াও হয়ে যায় স্তব্ধ। সুতরাং এটাকেও বলা যেতে পারে জলভাগের বিপর্যয়।

হজরত ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ বলেছেন, এখানে স্থলভাগের বিপর্যয় বলে বুঝানো হয়েছে হজরত আদমতনয় কাবিলের ভ্রাতৃহত্যাকে। আর জলভাগের বিপর্যয় হচ্ছে হজরত মুসার যুগের অত্যাচারী রাজা জলনদি কর্তৃক জোরপূর্বক নৌকা ছিনিয়ে নেওয়াকে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'সে বলপূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছিলো প্রত্যেকটি তরণী'।

ফারইয়াবী, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, কাবিল কর্তৃক হাবিল হত্যা থেকেই পৃথিবীর স্থলভাগে শুরু হয়েছে অনাসৃষ্টি। আর অত্যাচারী নৃপতি আম্মান কর্তৃক নৌকা ছিনেয়ে নেওয়ার ঘটনা

থেকে শুরু হয়েছে জলভাগের বিপর্যয়। পৃথিবীর স্থলাংশ ছিলো আগে সবুজ শ্যামল। বৃক্ষপত্রে বিরাজ করতো বিরতিহীন বসন্ত। আর জলাংশের সকল পানি ছিলো সুপেয়। নেকড়ে বাঘও আক্রমণ করতো না গরুছাগলকে। তারপর যখন কাবিল হত্যা করলো তার আপন অগ্রজকে, তখন থেকেই শুরু হলো অনাসৃষ্টি। পৃথিবীর বিশাল ভূভাগ হয়ে গেলো মরুময়। মওসুমে মওসুমে পাতা ঝরতে শুরু করলো বৃক্ষকুলের। সমুদ্রের পানি হলো পানের অনুপযোগী, লবণাক্ত। আর নেকড়ে, বাঘ ইত্যাদি বন্যপ্রাণী হয়ে উঠলো হিংস্র। আক্রমণ করতে শুরু করলো নিরীহ প্রাণীকুলকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'যার ফলে তাদেরকে তাদের কোনো কোনো কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে'। একথার অর্থ— মানুষের পাপকর্মের তাৎক্ষণিক প্রতিফলরূপে আল্লাহ্তায়ালা পৃথিবীর মানুষকে কখনো কখনো দেন শাস্তি। ওই শাস্তিই তাদেরকে এনে দেয় সত্যের প্রতি সানুতপ্ত ও সলজ্জিত প্রত্যাবর্তনের সুযোগ। উল্লেখ্য, মক্কার মুশরিকদেরকেও আল্লাহ্তায়ালা এই উদ্দেশ্যেই দুর্ভিক্ষগ্রস্ত করেছিলেন। ওই দীর্ঘ দুর্ভিক্ষের সময় তারা বাধ্য হয়েছিলো মৃত জন্তুর অস্থি, চামড়া ও গোশত খেয়ে জীবন ধারণ করতে।

কাতাদা বলেছেন, রসুল স. এর মহাআবির্ভাবপূর্ব পৃথিবী ছিলো অন্যায়, অনাচার ও অনাসৃষ্টিতে পরিপূর্ণ। তারপর তিনি স. যখন এলেন তখন বহু মানুষ আপন কৃতকর্মের কারণে অনুতপ্ত হতে পারলো এবং ফিরে পেলো ইসলামের চিরশীতল আশ্রয়।

পরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো এবং দ্যাখো, তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছে। তাদের অধিকাংশই ছিলো মুশরিক'। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! মক্কার মুশরিকদেরকে বলুন, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে আল্লাহ্র আযাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীগুলো এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদসমূহ স্বচক্ষে দেখে এসো। জেনে রেখো, তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে প্রতিমার উপাসনা করতো বলেই তাদেরকে দেওয়া হয়েছিলো শাস্তি। তবুও কি তোমাদের বোধোদয় হবে না?

এখানে 'কানা আকছারুহুম মুশরিকীন' (তাদের অধিকাংশই ছিলো মুশরিক) কথাটির মর্মার্থ— তারা বিভিন্ন প্রকার পাপকর্মে লিপ্ত ছিলো বটে, কিন্তু অংশীবাদিতাই ছিলো তাদের প্রধানতম পাপ। আর সেকারণেই তাদের উপরে নেমে এসেছিলো সর্বগ্রাসী শাস্তি। অথবা অর্থ হবে— তাদের অধিকাংশই লিপ্ত হয়েছিলো অংশীবাদিতায়। আর অপরাপর অপরাধপ্রবণতা ছিলো তাদের স্বল্পসংখ্যকদের মধ্যে। কিন্তু বিনাশ করা হয়েছিলো তাদের সকলকেই। কারণ

স্বল্পসংখ্যকেরা ছিলো অংশীবাদীদের সতীর্থ। আবার কথাটির অর্থ হতে পারে এরকমও— ওই স্বল্পসংখ্যক অংশীবাদী না হলেও তারা পরিত্যাগ করেছিলো 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ' এর দায়িত্ব। তাদের চোখের সামনে অংশীবাদিতার মতো বৃহত্তম পাপ সংঘটিত হতে দেখেও তারা অংশীবাদীদেরকে সাবধান করেনি। জানায়নি সত্যের আমন্ত্রণ। তাই অংশীবাদীদের সঙ্গে তাদেরকেও হতে হয়েছিলো শাস্তিপ্রাপ্ত।

এরপরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'তুমি সরল দ্বীনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করো, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে দিবস অনিবার্য, তা উপস্থিত হবার পূর্বে, সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে'। একথার অর্থ— অতএব হে আমার রসুল! আপনি সহজ সরল ধর্ম ইসলামে আপনার অবস্থানকে করুন অধিকতর দৃঢ়। সতত ব্যাপৃত থাকুন সত্য ধর্মপ্রচারকর্মে, ওই অনিবার্য দিবস আগমন করবার পূর্বেই, যে দিবসে কর্মফল প্রাপ্তির জন্য সকলকে উপস্থিত হতে হবে আল্লাহ্ সকাশে। আর এটা সুনিশ্চিত যে, ওই দিন মানুষ চিরদিনের জন্য বিভক্ত হয়ে যাবে দু'টি দলে। একদল প্রবেশ করবে জান্নাতে। আর জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে অপর দল। অথবা তারা বিভক্ত হবে এজগতেই। একদল হবে নিহত ও বন্দী এবং অপর দল লাভ করবে নিরাপত্তা ও বিজয়। যেমন হয়েছিলো বদর যুদ্ধে।

এরপরের আয়াতে(৪৪) বলা হয়েছে— 'যে কুফরী করে, কুফরীর শাস্তি তারই প্রাপ্য, যারা সৎকর্ম করে, তারা নিজেদেরই জন্য রচনা করে সুখ-শয্যা'। একথার অর্থ— যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে, পৃথিবীতে ও পরবর্তী পৃথিবীতে, অথবা কেবল পরবর্তী পৃথিবীতে তাদের শাস্তিভোগ অবধারিত। আর যারা পুণ্যকর্মে ব্যাপৃত থাকে, তারাই সংগ্রহ করে চিরন্তন সুখের পাথেয়।

এরপরের আয়াতে (৪৫) বলা হয়েছে— 'কারণ যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন'। আলোচ্য বক্তব্য থেকে একথাই পরিস্ফুট হয় যে, বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করার ব্যাপারে আল্লাহ্ স্বয়ং আগ্রহান্বিত। কিন্তু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা একথা জানে না বলেই পুরস্কারের পথে ধাবিত না হয়ে স্বেচ্ছায় বরণ করে তিরস্কারের পথ। তাই বলতে হয়, তিরস্কার তাদের স্বনির্বাচিত বিষয়। আর আল্লাহ্‌ও তাই তাদেরকে শাস্তিদান করবেনই। যথাসময়ে দিবেন যথোপযুক্ত শাস্তি।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন' কথাটির অর্থ— আল্লাহ্ তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন তাদের প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক— দশগুণ, সাতশ' গুণ অথবা অনেক অনেকগুণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না'। একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তাঁর প্রিয়ভাজন নয়, বরং বিরাগ উদ্রেককারী। ব্যাখ্যাটিকে সুসঙ্গত বলা যেতে পারবে তখন, যখন ধরে নেয়া হবে এখানকার 'লি ইয়াজ্বযিয়া' (পুরস্কৃত করেন) কথাটি সম্পর্কযুক্ত হবে পূর্ববর্তী আয়াতের 'ইয়ামহাদূন' (তারা পাথেয় সংগ্রহ করে) এর সঙ্গে। কিন্তু শায়েখ জালালুদ্দিন মাহাল্লী লিখেছেন, এখানকার 'পুরস্কৃত করেন' কথাটির সম্পর্ক রয়েছে ৪৩ সংখ্যক আয়াতের 'বিভক্ত হয়ে পড়বে' এর সঙ্গে। এমতাবস্থায় বিভক্ত দু'টি দলই হবে প্রতিদান প্রাপ্তির আওতাভূত এবং 'তিনি কাফেরদেরকে ভালোবাসেন না'। কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— তিনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে শাস্তি দিবেন।

লক্ষণীয়, এখানে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন'। এতে করে বুঝা যায়, পুণ্যকর্মসমূহ পুরস্কার প্রাপ্তিকে অবধারিত করতে পারে না। বরং পুরস্কার হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার কৃপানির্ভর। তিনি কৃপাপরবশ হয়ে কিছু দিলে তবেই ঘটে প্রাপ্তিযোগ্য, সে প্রাপ্তি পুণ্যকর্মের বিনিময় হোক, পুণ্যাধিক্য হোক, অথবা হোক নিছক অনুগ্রহ। একথার সমর্থন রয়েছে আবুল হারেছ কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে, যা ইমাম আহমদ লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'জুহুদ' গ্রন্থে। লিখেছেন, একবার আল্লাহ্তায়ালা নবী দাউদের প্রতি প্রত্যাদেশ করলেন, হে আমার নবী! আমার বান্দাগণকে ভীতি প্রদর্শন করো, তারা যেনো গর্ব না করে, নিজেদের পুণ্যকর্মের উপরে যেনো নির্ভরশীল না হয়ে পড়ে। কারণ আমি তাদেরকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবোই। আর ন্যায়বিচার করলে দেখা যাবে, তারা সকলেই হয়েছে শাস্তির উপযোগী (অতএব পুণ্যকর্ম সম্পাদন করার সাথে সাথে তারা যেনো সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয় আমার অনুগ্রহের উপর)।

হজরত আলী থেকে আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ একবার বনী ইসরাইলের এক নবীর প্রতি এই মর্মে প্রত্যাদেশ করলেন, হে আমার নবী! তোমার উম্মতের পুণ্যবানদেরকে বলে দাও, তারা যেনো তাদের পুণ্যকর্মের উপর নির্ভরশীল না হয়। কারণ মহাবিচারের দিবসে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করবো আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবো। আর আমার এমতো সিদ্ধান্ত অবশ্যই জুলুম নয়। তোমার পাপিষ্ঠ উম্মতকেও বলে দাও, তারা যেনো নিরাশ না হয়। কারণ আমি সেদিন মার্জনা করবো বড় বড় পাপীকে। আমি তো কারো পরওয়া করি না।

তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওয়াসিলা ইবনে আমকাআ বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ বিচারের জন্য দাঁড় করাবেন একজন নিষ্পাপ ব্যক্তিকে। বলবেন, আমি তোমার নিকট উপস্থাপন করবো দু'টি বিষয়। তুমি তার যে কোনো একটি গ্রহণ করতে পারো। ১. তুমি কি তোমার পুণ্যের বিনিময়প্রার্থী

২. না আমার করুণা প্রত্যাশী? সে বলবে, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! তুমি তো জানোই, আমি কখনো তোমার অবাধ্য হইনি। আল্লাহ্ নির্দেশ দিবেন, এই ব্যক্তির পুণ্যসমূহের সমান্তরালে আমার একটি নেয়ামতকে দাঁড় করানো হোক। তাই করা হবে। তখন দেখা যাবে মাত্র একটি নেয়ামতের বিপরীতে তার সমুদয় পুণ্য নিঃশেষ। এ দৃশ্য দেখে সে মিনতি জানাবে, হে আমার পরম প্রভুপালক! আমি তোমার করুণা প্রত্যাশী।

হজরত আনাস থেকে বাযযার বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে মানুষের সামনে উপস্থাপন করা হবে তিনটি বৃহৎ পাণ্ডুলিপি। তন্মধ্যে একটি হবে পাপের, অপরটি পুণ্যের এবং আর একটি নেয়ামতের। তারপর আল্লাহ্ তাঁর নেয়ামতরাশির মধ্য থেকে একটি নগণ্য নেয়ামত দেখিয়ে বলবেন, আমার এই বান্দার পুণ্যসমূহকে এর বিপরীতে দাঁড় করানো হোক। তাই করা হবে। দেখা যাবে ওই নগণ্য নেয়ামতের সামনে তার সকল পুণ্যকর্ম নিঃশেষ। নেয়ামতের পাণ্ডুলিপি তখন নিবেদন করবে, হে মহানতম বিচারক! তোমার সমুচ্চ সম্মানের শপথ! আমার নগণ্য প্রকাশ তোমার এ বান্দার পুণ্যরাশিকে পরাভূত করেছে। এখন বাকি রয়েছে কেবল তার পাপরাশি। এরপর আল্লাহ্ যার প্রতি করণা করবেন, এরকম এক বান্দাকে ডেকে বলবেন, ওহে আমার দাস! আমি তোমার পুণ্যরাশিকে বৃদ্ধি করে দিচ্ছি কয়েকগুণ। বরং অনেক অনেক গুণ। এবার দ্যাখো, তোমার পরিত্রাণ কীরূপ সুনিশ্চিত।

হজরত ইবনে ওমর থেকে তিবরানী তাঁর 'আলআওসাত' গ্রন্থে লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, যারা দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে স্বীকার করেছে— আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্র সুদৃঢ় অঙ্গীকার। আর যারা সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়েছে, আল্লাহ্ সর্বোতভাবে ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত, যারা বলেছে 'সুবহানাল্লহ্' তাদেরকে দেয়া হবে এক লক্ষ পুণ্য। জনৈক সাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবো কীরূপে (শাস্তি তো তাহলে আমাদের হতেই পারে না)? তিনি স. বললেন, যার আনুরূপ্যহীন অধিকারে আমার জীবন, সেই পবিত্রাতিপবিত্র সত্তার শপথ! মহাবিচারের দিবসে বান্দা উপস্থিত হবে পর্বতশ্রেণী তুল্য পুণ্যকর্ম নিয়ে। কিন্তু দেখা যাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামতের তুলনায় ওই বিশাল পুণ্য সম্ভার কোনো কিছুই নয়। তবে হ্যাঁ, সেদিন মানুষের সাফল্য অর্জিত হবে কেবল তাঁর দয়ার কারণেই। সেদিন উদ্বেলিত হবে আল্লাহ্র করণাসিন্ধু।

উম্মত জননী হজরত আয়েশা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, সহজ সরল পথে সম্মিলিতভাবে জীবন যাপন করো এবং সাধুবাদ গ্রহণ করো। নিশ্চিত, পুণ্যকর্ম কাউকে বেহেশতে প্রবেশ করাতে পারবে না। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! আপনাকেও কি নয়? তিনি স.

বললেন, না। আমার ক্ষেত্রেও একই বিধান। তবে আমার কথা স্বতন্ত্র। আমি তো এখন তখন সর্বক্ষণ আসত্তা নিমজ্জিত তার ক্ষমায় ও দয়ায়। হজরত জাবের থেকে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন মুসলিম ও শরীক ইবনে তারেক, হজরত আবু মুসার পুত্র থেকে বাযযার এবং হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আহমদ। শরীক ইবনে তারেক, উমামা ইবনে শুরাইক ও আসাদ ইবনে কারাজী থেকে এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন তিবরানীও।

দু'টি সংশয়ঃ ১. অবস্থা যদি এরকমই হয়, তবে আর পুণ্যকর্মের প্রয়োজন কী? পাপবর্জনেই বা কী লাভ? আল্লাহ্ কৃপাপরবশ না হলে পুণ্যবানদের জন্যও তো নরক নিশ্চিত। আর যদি কৃপাপরবশ হন, তবে মহাপাতকের স্বর্গ প্রাপ্তিও তো অনিবার্য।

২. আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— 'তোমরা যে সৎকর্ম করেছিলে, তার বিনিময়ে আজ প্রবেশ করো জান্নাতে'। তাহলে উল্লেখিত হাদিসের তাৎপর্যই বা কী?

সংশয়ের অপনোদনঃ ১. যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রসুলের অনুসরণ করে, আল্লাহ্ তাকে ভালোবাসেন। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'হে আমার রসুল! আপনি মানুষকে জানিয়ে দিন, তারা যদি আমার ভালোবাসা চায়, তবে যেনো তারা হয় আপনার একনিষ্ঠ অনুসারী। তাহলে আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসবেন এবং ক্ষমা করবেন। হাদিসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ্ বলেন, নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার বান্দা আমার নৈকট্য ভাজন হয়। আমি তখন তাকে ভালোবাসতে থাকি। বোখারী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে।

২. পুণ্যকর্মের তারতম্যের কারণে জান্নাতের মর্যাদা ও তারতম্য ঘটবে যদিও প্রাথমিকভাবে জান্নাতের প্রবেশাধিকার লাভ করবে সকল পুণ্যবান। যেমন হান্নাদ তাঁর 'জুহুদ' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, তোমরা আল্লাহ্র দয়া-দাক্ষিণ্যের উপরে পার হয়ে যাবে পুলসিরাত। জান্নাতে প্রবেশ করবে তাঁর কৃপা ধন্য হয়ে। আর তোমাদের জান্নাতের মর্যাদাগত স্তর নির্ণীত হবে তোমাদের পুণ্যকর্মের ভিত্তিতে। আবু নাঈমও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন সউন ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرٰتٍ وَّ لِيُذِيْقَكُمْ مِّنْ
رَّحْمَتِهٖ وَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهٖ وَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى
قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ؕ
وَ كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ
فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَ يَجْعَلُهٗ
كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ
مِنْ عِبَادِهٖۤ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ
عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ ﴿٤٩﴾ فَانْظُرْ اِلٰۤى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ
كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۚ وَهُوَ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٥٠﴾ وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيْحًا فَرَاَوْهُ
مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ يَكْفُرُوْنَ ﴿٥١﴾ فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ
الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٢﴾
وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ؕ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ
يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٥٣﴾ ع

r তাঁহার নিদর্শনাবলীর একটি যে, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন সুসংবাদ দিবার জন্য ও তোমাদিগকে তাঁহার অনুগ্রহ আস্বাদন করাইবার জন্য; এবং যাহাতে তাঁহার বিধানে নৌযানগুলি বিচরণ করে, যাহাতে তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

r আমি তো তোমার পূর্বে রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট। তাহারা উহাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন লইয়া আসিয়াছিল; অতঃপর আমি অপরাধীদিগকে শাস্তি দিয়াছিলাম। মু'মিনদিগকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।

r আল্লাহ্ তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে ইহা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে; অতঃপর তিনি ইহাকে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়াইয়া দেন, পরে ইহাকে খণ্ড-বিখণ্ড করেন এবং তুমি দেখিতে পাও উহা হইতে নির্গত হয় বারিধারা; অতঃপর যখন তিনি তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহাদের নিকট ইচ্ছা ইহা পৌঁছাইয়া দেন, তখন উহারা হয় হর্ষোৎফুল্ল,

r যদিও উহারা উহাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে নিরাশ ছিল।

r আল্লাহ্র অনুগ্রহের ফল সম্বন্ধে চিন্তা কর, কিভাবে তিনি ভূমিকে জীবিত করেন উহার মৃত্যুর পর। এইভাবেই আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন, কারণ তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

r আর আমি যদি এমন বায়ু প্রেরণ করি যাহার ফলে উহারা দেখে শস্য পীতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, তখন তো উহারা অকৃতজ্ঞ হইয়া পড়ে।

r তুমি তো মৃতকে শুনাইতে পারিবে না, বধিরকেও পরিবে না আহ্বান শুনাইতে, যখন উহারা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়।

r আর তুমি অন্ধকেও পথে আনিতে পরিবে না উহাদের পথভ্রষ্টতা হইতে। যাহারা আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে শুধু তাহাদিগকেই তুমি শুনাইতে পারিবে, কারণ তাহারা আত্মসমর্পণকারী।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! দ্যাখো, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি কতোখানি করুণাপরবশ। দ্যাখো, তাঁর অপার শক্তিমত্তার একটি অনন্য নিদর্শন। তিনি তোমাদের জন্যই প্রবাহিত করেন সুমন্দ সমীরণ, বৃষ্টির আগাম শুভবারতারূপে। তারপর বৃষ্টি হয়। মৃত্তিকায় জেগে উঠে ফল-ফসলের সমারোহ। সেগুলো তোমরা ভক্ষণ করতে পারো আল্লাহ্র অনুগ্রহরূপে। আর ওই মানবহিল্লোলেই তো সুগম হয় তোমাদের বাণিজ্যবহরগুলোর জলধিযাত্রা। ফলে তোমাদের বসতি হয় সচল ও সফল। তোমরা লাভ করতে পারো বৈধ জীবনোপকরণ। অতএব তোমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

এখানে 'মিন আয়াতিহী' অর্থ তাঁর অসীম শক্তিমত্তার যৎকিঞ্চিত নিদর্শন। 'বায়ু প্রেরণ করেন সুসংবাদ দিবার জন্য' অর্থ বৃষ্টিবাহী মেঘের আগাম বারতা ঘোষণার্থে প্রেরণ করেন বায়ুপ্রবাহ— দক্ষিণ, উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম, এক এক সময় এক এক দিক থেকে। 'মুবাশ্শিরাত' অর্থ সুসংবাদ, শুভবারতা। 'তাঁর অনুগ্রহ আস্বাদন করানোর জন্য' অর্থ ভূমিজাত ফল-ফসল-সবজির আস্বাদ গ্রহণের জন্য। 'ওয়ালি তাজ্বিরিয়াল ফুলকা' অর্থ যাতে তাঁর বিধানে নৌযানগুলো পরিচালিত হয়।' 'যাতে তোমরা তাঁর অনুসন্ধান করতে পারো' অর্থ যাতে তোমাদের সমুদ্রযাত্রা হয় নির্বিঘ্ন, ফলে তোমাদের তেজারত হয় লাভজনক। আর 'তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও' অর্থ— তাঁর এমতো দয়ার প্রতি তোমরা যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তোমাদের ইহ-পরকালকে করো অর্থবহ ও সফল।

পরের আয়াতে (৪৭) বলা হয়েছে— 'আমি তো তোমার পূর্বে রসুলগণকে প্রেরণ করেছিলাম তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট। তারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলো'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম বার্তাবাহক। ইতোপূর্বে ও আমি আমার বার্তাবাহকগণকে প্রেরণ করে ছিলাম তাঁদের আপনাপন সম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শনার্থে। তাঁদেরকে আমি আমার পক্ষ থেকে দিয়েছিলাম সুস্পষ্ট নিদর্শনরাজি।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম। মুমিনদেরকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব'। একথার অর্থ— ওই সকল প্রেরিত পুরুষকে কেউ কেউ বিশ্বাস করেছে, আবার কেউ কেউ করেছে প্রত্যাখ্যান। প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে আমি দিয়েছি সমুচিত শাস্তি। আর উদ্ধার করেছি বিশ্বাসীদেরকে। আর বিশ্বাসীদেরকে উদ্ধার করা তো আমার দয়ার্দ্র দায়িত্ব। তারা সত্যের সৈনিক। তাই তাদেরকে বিজয়ী করবার জন্য আমি শাস্তি দিয়েছিলাম সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে।

একটি সন্দেহঃ 'মুমিনদেরকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব'— একথায় বুঝা যায় আল্লাহ্তায়ালা বিশ্বাসীদেরকে সাহায্য করার দায়িত্ব নিজের উপরে অবধারিত করে নিয়েছেন। যদি তাই হয়, তবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তো চিরপরাভূত। অথচ বাস্তবে রয়েছে এর অনেক বিপরীত দৃষ্টান্ত।

সন্দেহভঞ্জনঃ এখানকার 'আল মু'মিনীন' (বিশ্বাসীদেরকে) কথাটির 'আলিফ লাম' অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে বিশেষার্থে। সুতরাং বক্তব্যটি দাঁড়ায় বিশেষভাবে ওই সকল বিশ্বাসীকেই আল্লাহ্তায়ালা বিশেষভাবে সাহায্যমণ্ডিত করেন, যারা আল্লাহ্র মহিমা সমুন্নত করার নিমিত্তে কেবল তাঁর পরিতোষ লাভের আশায় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। কেবল তাদেরকে সহায়তা করাকেই আল্লাহ্তায়ালা দয়া করে তাঁর দায়িত্ব বলে গণ্য করেছেন।

হজরত আবু দারদা বর্ণনা করেছেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভ্রাতার সম্ভ্রম রক্ষায় ব্রতী হয়, তাকে নরকানল থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব আল্লাহ্র। এরপর তিনি স. আবৃত্তি করলেন আলোচ্য আয়াত। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি উত্তমসূত্রসম্বলিত। হজরত আসমা ইবনে ইয়াজিদ থেকেও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন তিবরানী ও ইসহাক ইবনে রহওয়াইহ্।

উল্লেখ্য, কোনো কোনো উচ্চারণরীতিতে এখানকার 'হাক্কান' শব্দটিতে যতিপাত পরিলক্ষিত হয়। এভাবে পাঠ করলে বুঝতে হবে এখানকার 'হাক্কান' (দায়িত্ব) কথাটি সম্পর্কযুক্ত পূর্ববর্তী বাক্যের 'ফানতাক্বম্না' (শাস্তি দিয়েছিলাম) কথাটির সঙ্গে এবং অর্থ দাঁড়াবে— অপরাধীদেরকে শাস্তি দেয়া ছিলো আমার দায়িত্ব।

এরপরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তিনি যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে তা মেঘমালাকে সঞ্চলিত করে; অতঃপর তিনি তাকে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন; পরে তাকে খণ্ড-বিখণ্ড করেন এবং তুমি দেখতে পাও তা থেকে নির্গত হয় বারিধারা; অতঃপর যখন তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের নিকট এটা পৌঁছে দেন, তখন তারা হয় হর্ষোৎফুল্ল'। এখানে মেঘসঞ্চালক বাতাস, মেঘের বিচিত্র বিন্যাস এবং বৃষ্টিপাতের কথা বলা হয়েছে মনোমুগ্ধকর ভাষায়। শেষে বলা হয়েছে, বৃষ্টির জন্য অপেক্ষিত কৃষককুলের কাছে যখন আল্লাহ্ পৌঁছে দেন ফল ও ফসলের সুসংবাদবাহী বৃষ্টিসম্ভার, তখন কৃষককুল হয় হর্ষোৎফুল্ল।

এখানে 'আসসামাউ' অর্থ ঊর্ধ্বদেশ, প্রকৃত অর্থে আকাশ নয়। অর্থাৎ মেঘপুঞ্জকে আল্লাহ্ ছড়িয়ে দেন ঊর্ধ্বদেশে, রূপকার্থে আকাশে, সে মেঘপুঞ্জ আবার বহুবর্ণের এবং বহুরকমের। পুঞ্জীভূত, বিক্ষিপ্ত, শাদা, কালো ইত্যাদি। 'ইয়াবসতু' অর্থ ছড়িয়ে দেয়া।

এরপরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'যদিও ইতোপূর্বে তাদের প্রতি বৃষ্টিবর্ষণের আগে তারা নিরাশ ছিলো'। এখানে 'মিন ক্বলিহী' দ্বারা পূর্বোক্ত 'মিন ক্বলি' কথাটিকে বেগবান করা হয়েছে'। এভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কৃষকদের দীর্ঘ অনাবৃষ্টিজনিত নৈরাশ্যের প্রগাঢ় অনুভবকে। এখানকার 'ইন' অব্যয়টির অর্থ 'যদি' ধরা হলে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা এরকমই দাঁড়ায়। আর যদি 'ইন' অর্থ ধরা হয় 'ইল্লা' (ব্যতীত) তাহলে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— ইতোপূর্বে ওই কৃষকদের নিরাশ হওয়া ব্যতীত অন্য কোনো উপায় ছিলো না। অর্থাৎ তারা হয়ে পড়েছিলো সম্পূর্ণরূপে নিরাশ।

এরপরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র অনুগ্রহের ফল সম্বন্ধে চিন্তা করো, কীভাবে তিনি ভূমিকে জীবিত করেন তার মৃত্যুর পর। এভাবেই আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন, কারণ, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান'।

এখানে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের ফল সম্বন্ধে চিন্তা করো অর্থ— বৃষ্টিপাতের ফলে বিশুষ্ক মৃত্তিকায় ফল ও ফসলের যে সমারোহ মূর্ত হয়ে ওঠে, সে সম্বন্ধে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করে দেখো যে, তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত কতো ব্যাপক ও বিস্তৃত। তোমাদের জীবন ধারণ ও যাপন নির্ভর করে তো তাঁর এমতো অনুগ্রহের উপরেই। 'ভূমির মৃত্যুর পর' অর্থ ভূমি বিশুষ্ক ও নিস্ফলা হয়ে যাওয়ার পর। 'ইন্না জালিকা' অর্থ অবশ্যই তিনি নিস্ফলা ভূমিকে প্রাণবন্ত করতে সমর্থ। আর 'লা মুহয়ীল মাওতা' অর্থ অবশ্যই তিনি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম। অর্থাৎ আল্লাহ্ যে মানুষের মৃত্যুর পর পুনরুত্থান দিবসে সকলকে পুনর্জীবিত করবেন, নিস্ফলা মৃত্তিকায় প্রাণের সঞ্চার হচ্ছে তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এর পরেও মহাপুনরুত্থানে অস্বীকৃতি বাতুলতা ছাড়া আর কী?

এরপরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে— 'আর যদি আমি এমন বায়ু প্রেরণ করি যার ফলে তারা দেখে শস্য পীতবর্ণ ধারণ করেছে, তখন তো তারা অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে'। এখানে 'রীহান' বলে বুঝানো হয়েছে ফসল সম্ভাবনাকে নস্যাৎকারী ভিন্ন ধরনের বায়ু প্রবাহকে। এধরনের বায়ু প্রবাহ মেঘসঞ্চালন করে না, বরং মেঘকে করে বিতাড়িত। ফলে মৃত্তিকাও হয়ে যায় অধিকতর বিশুষ্ক।

'ফার আওহু' অর্থ পীতবর্ণ, বিবর্ণ, অসবুজ। আর 'ইয়াকফুরূন' অর্থ অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে। উল্লেখ্য, তারা বিশুদ্ধবিশ্বাসী, ধৈর্যশীল ও চিন্তাশীল নয় বলেই এমতো বিরূপ পরিস্থিতিতে হয়ে যায় অকৃতজ্ঞ। কিন্তু যারা বিশ্বাসী, ধৈর্যশীল ও চিন্তাশীল, তারা নিশ্চয় এরকম করে না। করে ক্ষমাপ্রার্থনা। বলে আল্লাহ্ নিশ্চয় দয়া করবেন। সুতরাং তাঁর দয়ার আশায় ও অপেক্ষায় থাকাই আমাদের কর্তব্য।

এরপরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'তুমি তো মৃতকে শোনাতে পারবে না'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! যারা চিরভ্রষ্ট, তারা শারীরিকভাবে জীবিত হলেও আত্মিকভাবে মৃত। সুতরাং আপনি তাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে জাগ্রত করবেন কীভাবে? মৃতরা কি কখনো শোনে? তাদের বোধ, বুদ্ধি ও বিশ্বাসগ্রহণযোগ্যতা যে চিরঅন্তর্হিত।

ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস ইবনে মালেক বলেছেন, বদর যুদ্ধ শেষে রসুল স. নির্দেশ করলেন, মুশরিকদের মরদেহগুলোকে এভাবেই পড়ে থাকতে দাও। তিনদিন পর যখন তাদের লাশগুলো পচতে শুরু করলো তখন তিনি স. সেগুলোর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, হে উমাইয়া ইবনে খাল্‌ফ! হে আবু জেহেল ইবনে হিশাম। ওহে উতবা ইবনে রবীয়! তোমাদের প্রভুপালনকর্তা তোমাদের সম্পর্কে যে অঙ্গীকার করেছিলেন. সেই অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন এবার দেখলে তো? হজরত ওমর এগিয়ে এসে বললেন, হে মহানুভব রসুল। মৃত্যুর তিনদিন পর আপনি তাদেরকে এভাবে ডাকছেন কেনো? তারা কি শুনতে পাচ্ছে? আল্লাহ্ যে জানিয়েছেন 'তুমি তো মৃতকে শোনাতে পারবে না'।

রসুল স. জবাব দিলেন, যার অলৌকিক অধিকারে আমার জীবন, সেই আনুরূপ্যবিহীন সত্তার শপথ! আমার কথা তারা তোমার চেয়েও ভালোভাবে শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু জবাব দিবার অধিকার ও ক্ষমতা তাদের নেই। অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে ওমর থেকেও।

আমি বলি, বর্ণিত হাদিসকে যদি বিশুদ্ধ বলে মেনে নেওয়া হয়, তবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াবে— হে আমার রসুল! আপনি স্বইচ্ছায় ও স্বচেষ্টায় মৃতদেরকে যখন যা খুশী তা শোনাতে পারবেন না। তবে শোনাতে পারবেন তখন, যখন আল্লাহ্পাক এরকম ইচ্ছা করবেন। অথবা মর্মার্থ হবে— আপনি তাদেরকে শোনাতে পারবেন না কল্যাণজনক কোনো কথা।

এরপর বলা হয়েছে— 'বধিরকেও পারবেন না আহ্বান শোনাতে, যখন তারা মুখ ফিরিয়ে চলে যায়'। একথার অর্থ— আর আপনি বধিরকেও তো শোনাতে পারবেন না সত্যের আহ্বান। কারণ তারাও সম্পূর্ণরূপে শ্রবণযোগ্যতারহিত তবু যদি তারা আপনার সামনাসামনি হতো, তবে চোখের দেখা দেখেও হয়তো অনুমানে আপনার বক্তব্য বুঝবার চেষ্ট করতে পারতো। কিন্তু তারা যে অবজ্ঞাভরে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যায়। আপনার দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র করে না।

এরপরের আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— 'আর তুমি অন্ধকেও পথে আনতে পারবে না তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে'। একথার অর্থ— আর আপনি তো দৃষ্টিহীনকেও দেখাতে পারবেন না সত্যের পথ। নিরসন করতে পারবেন না তাদের পথভ্রান্তি। উল্লেখ্য, চিরভ্রষ্টরা দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও অন্ধ। তাই সত্য দর্শন তাদের অদৃষ্টে ঘটে না। অথবা বলা যেতে পারে, 'অন্ধ' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে তাদের হৃদয়ের অন্ধত্বকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'যারা আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে শুধু তাদেরকেই তুমি শোনাতে পারবে, কারণ তারা আত্মসমর্পণকারী।' একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম বাণীবাহক! আপনার কথা শুনতে বুঝতে ও মানতে পারবে কেবল তারা, যারা বিশ্বাস করেছে আমাকে এবং মান্য করেছে আমার নিদর্শনাবলীকে। তারা যে আপনার অনুগত। অথবা অর্থ— যারা বিশ্বাসাভিলাষী এবং আল্লাহ্পাক যাদের অদৃষ্টে রেখেছেন ইমান, কেবল তারাই সর্বান্তঃকরণে শুনতে পাবে আপনার আহ্বান। তারা যে আপনার বিশ্বস্ত অনুগামী।

সূরা রূম ঃ আয়াত ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّ شَيْبَةً ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ﴿۵۴﴾ وَ يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ

يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۙ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ ؕ كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ ۝٥٥ وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ ؗ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٥٦ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ۝٥٧ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؕ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ ۝٥٨ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٥٩ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ۝٦٠ ع

r আল্লাহ্ তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেন দুর্বল অবস্থায়, দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

r যেদিন কিয়ামত হইবে সেদিন অপরাধীরা শপথ করিয়া বলিবে যে, তাহারা মুহূর্তকালের বেশী অবস্থান করে নাই। এইভাবেই তাহারা সত্যভ্রষ্ট হইত।

r কিন্তু যাহাদিগকে জ্ঞান ও ঈমান দেওয়া হইয়াছে তাহারা বলিবে, 'তোমরা তো আল্লাহ্র বিধানে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করিয়াছ। ইহাই তো পুনরুত্থান দিবস, কিন্তু তোমরা জানিতে না।'

r সেইদিন সীমালংঘনকারীদের ওযর-আপত্তি উহাদের কাজে আসিবে না এবং উহাদিগকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টিলাভের সুযোগও দেওয়া হইবে না।

r আমি তো মানুষের জন্য এই কুরআনে সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত দিয়াছি। তুমি যদি উহাদের নিকট কোন নিদর্শন উপস্থিত কর, কাফিররা অবশ্যই বলিবে, 'তোমরা তো মিথ্যাশ্রয়ী।'

r যাহাদের জন্য নাই আল্লাহ্ এইভাবে তাহাদের হৃদয় মোহর করিয়া দেন।

r অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য। যাহারা দৃঢ়বিশ্বাসী নহে তাহারা যেন তোমাকে বিচলিত করিতে না পারে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের জন্মলগ্নকালে করে রাখেন নিরতিশয় দুর্বল, যৌবনে করেন শক্তিশালী, তারপর বার্ধক্যে করেন অসহায়। এভাবে তিনি যেমন ইচ্ছা করেন তেমনই করেন। তাঁর সৃজন-প্রক্রিয়া সম্পূর্ণতই তাঁর অভিপ্রায় ও ক্ষমতাভূত। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর। অথবা বলা যেতে পারে, তোমাদের সৃষ্টির ভিত্তিই দুর্বল। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'মানুষ ত্বরাপ্রবণ'। কিংবা বলা যেতে পারে, তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে শুক্রকণার মতো মৌল উপকরণ থেকে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'তোমাদেরকে কি আমি সৃষ্টি করিনি অনুল্লেখ্য সলিল বিন্দু থেকে?

এখানে 'তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন' অর্থ তিনিই নির্ধারণ করেন তোমাদের শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বাধক্য। 'তিনি সর্বজ্ঞ' অর্থ সৃষ্টির আদি অন্তের সকল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত। আর 'সর্বশক্তিমান' অর্থ তিনি তাঁর অভিপ্রায় কার্যকর করবার ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম।

পরের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— 'যেদিন কিয়ামত হবে সেদিন অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে, তারা মুহূর্তকালের বেশী অবস্থান করেনি'। একথার অর্থ যখন মহাপ্রলয় উপস্থিত হবে, তখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা শপথ উচ্চারণ করে আক্ষেপের স্বরে বলবে, হায়! আমাদের পৃথিবীবাস তো ছিলো মুহূর্তকাল মাত্র।

'সাআ'ত' অর্থ সময়, কাল। এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'কিয়ামত' অর্থে। এরকম অর্থে এখানে শব্দটি ব্যবহার করার হেতু হচ্ছে, মহাপ্রলয়মুহূর্তটি হবে পৃথিবীর বয়সের শেষ সময়ে। অথবা 'সাআ'ত' অর্থ এখানে ত্বরিৎ, একবারে। অর্থাৎ মহাপ্রলয় অনিবার্য এবং তা সংঘটিত হবে অতি সত্বর। উল্লেখ্য, 'সাআ'ত' শব্দটি 'কিয়ামত' বা মহাপ্রলয় অর্থেই অধিক প্রচলিত।

সেদিন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মনে হবে, পৃথিবীতে তারা বসবাস করেছিলো অল্প কিছু সময়ের জন্য। তাই একথা বলবে তারা শপথ করে। এক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে— 'আল্লাহর নির্ধারণে তোমরা মহাবিচারের দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছিলে কবরে'। অথবা সেদিন ভুলে যাবে অপসৃত অতীতের স্মৃতি। তাই তাদের আবছা আবছা মনে হবে, তাদের পৃথিবীবাস ছিলো হয়তো অল্প কিছু সময়ের জন্য। সে কারণেই ওই অল্প সময়কে এখানে 'মুহূর্তকাল' বা ক্ষণকাল বলা হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এভাবেই তারা সত্যভ্রষ্ট হতো'। একথার অর্থ— অযথার্থ অনুমান ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করাই তাদের স্বভাব। আর ওই অপস্বভাবের কারণেই তারা পৃথিবীতে যখন মহাপ্রলয়ের কথা শুনতো, তখন সে কথা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতো। শুরু করতো বাগাড়ম্বর। আর নির্দ্বিধায় চালিয়ে যেতো অংশীবাদিতা।

এরপরের আয়াতে(৫৬) বলা হয়েছে— 'কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান ও ইমান দেওয়া হয়েছে তারা বলবে, তোমরা তো আল্লাহ্র বিধানে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছো'। একথার অর্থ— যারা পৃথিবীতে পেয়েছিলো নবী-রসুলগণের মহান শিক্ষা, লাভ করেছিলো প্রজ্ঞা ও প্রত্যয়, তারা তখন বলবে, মুহূর্তকাল নয়, তোমরা আজকের এই পুনরুত্থান পর্যন্ত পৃথিবীতে ও কবরে অবস্থান করেছিলে সুদীর্ঘকাল। আর তা করেছিলে আল্লাহ্র বিধানানুসারেই।

এখানে 'লাবিছতুম ফী কিতাবিল্লাহ' অর্থ তোমাদের যতোদিনের অবস্থান আল্লাহ্পাক তোমাদের অদৃষ্টের বিধানে লিখে দিয়েছিলেন, তোমরা পৃথিবীতে ও কবরে ছিলে ততোদিন। অথবা 'কিতাবিল্লাহ্' অর্থ এখানে লওহে মাহ্ফুজ। অথবা ওই সময়কালকে এখানে আল্লাহ্র বিধান বলা হয়েছে, যে সময় মাতৃজঠরস্থিত মানবশিশুর জন্য ফেরেশতা কর্তৃক লিপিবদ্ধ করা হয় চারটি বিষয়। যেমন রসুল স. বলেছেন, মাতৃজঠরে মানবশিশু শুক্রবিন্দুরূপে অবস্থান করে চল্লিশ দিন। চল্লিশ দিন পর ওই বিন্দুটি পরিণত হয় রক্তপিণ্ডে। তার চল্লিশ দিন পর গোশতপিণ্ডে। তখন তার নিকট আল্লাহ্পাক প্রেরণ করেন একজন ফেরেশতা। সে লিপিবদ্ধ করে ওই শিশুর আয়ুষ্কাল, জীবনোপকরণ পরিমাণ, ভালো অথবা মন্দ ভাগ্য। কিংবা 'কিতাবিল্লাহ' অর্থ এখানে কোরআন মজীদ। যেমন কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে— 'আর তাদের পশ্চাতে রয়েছে অন্তহীন জগত, পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত'।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটাইতো পুনরুত্থান দিবস। কিন্তু তোমরা জানতে না'। এ কথার অর্থ— দ্যাখো, এটা সে-ই প্রতিশ্রুতি দিবস। আর তোমরা পৃথিবীতে এই দিবসকে করতে অস্বীকার। এখন তো বুঝলে, পৃথিবীতে তোমরা ছিলে পথভ্রষ্ট।

এরপরের আয়াতে (৫৭) বলা হয়েছে— 'সেদিন সীমালংঘনকারীদের ওজর-আপত্তি কাজে আসবে না এবং তাদেরকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টিলাভের সুযোগও দেওয়া হবে না'।

এখানে 'ওয়ালা হুম ইয়ুস্তা'তাবূন' অর্থ সেদিন তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না আল্লাহ্র সন্তোষসাধনমূলক কোনো কথা ও কাজ। যেমন— তওবা, ক্ষমাপ্রার্থনা, আনুগত্য। এগুলো তাদেরকে করতে বলা হয়েছিলো পৃথিবীতে। 'কামুস' অভিধানে লেখা রয়েছে 'উছবা' অর্থ সন্তুষ্টি। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও তাদেরকে কামনা করতে বলা হয়েছিলো পৃথিবীতে। পরকালে এর কোনো সুযোগই থাকবে না। এ সম্পর্কে কোনো প্রকার প্রশ্নই করা হবে না তাদেরকে। যেমন আরববাসীরা বলেন 'ইস্তা'তাব্না যায়দুন ফাআরদ্ব'তুহু' (জায়েদ আমার সন্তুষ্টি চেয়েছিলো, আমি তার আশা পূরণ করেছি)। অথবা কথাটির মর্মার্থ হবে— মহাবিচারের

দিবসে কাম্য হবে না সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পরিতুষ্টি। বরং পরিতুষ্টি কামনা করা হবে বিশ্বাসীদের। যেমন হজরত আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন আল্লাহ্ জান্নাতবাসীদেরকে বলবেন, তোমরা কি তুষ্ট? তারা বলবে, অবশ্যই। তুমি তো আমাদেরকে দান করেছো এমন নেয়ামত, যা অনেককেই দাওনি। আল্লাহ্ বলবেন, এর চেয়েও উৎকৃষ্ট নেয়ামত আছে। তারা বলবে, কী? আল্লাহ্ বলবেন, আমার প্রসন্নতা। সেই নেয়ামতও তোমাদেরকে দিলাম। আমি আর কখনো তোমাদের প্রতি হবো না অপ্রসন্ন। এরকম শুভসংবাদ ঘোষিত হয়েছে এক আয়াতে এভাবে— 'আর সুনিশ্চিত, অচিরেই তিনি প্রসন্ন হবেন'।

এরপরের আয়াতে (৫৮) বলা হয়েছে— 'আমি তো মানুষের জন্য এই কোরআনে সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত দিয়েছি'। একথার অর্থ— এই কোরআনে আমি দৃষ্টান্তরূপে বর্ণনা করেছি অনেক জনগোষ্ঠীর উত্থানপতনের কাহিনী। বিবৃত করেছি বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের শুভপরিণতি ও অপপরিণতির অনেক উপমাময় আলোচনা। এভাবে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল বৃত্তান্তই হয়েছে এই কোরআনের প্রসঙ্গভূত। সুতরাং মহাবিচারের দিবসে মহাসত্যকে গ্রহণ না করার কোনো প্রকার ওজর আপত্তিই চলবে না। অথবা বলা যেতে পারে, যেসকল ঘটনা, দৃষ্টান্ত ও বিবরণ দ্বারা সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় আল্লাহ্র এককত্ব, আল্লাহ্র রসুলের সততা ও সত্যতা এবং পারলৌকিক বিষয়সমূহ, তার সকল কিছুই আমি লিপিবদ্ধ করেছি এই কোরআনে, যেনো মানুষের পথপ্রাপ্তি হয় সহজ।

এরপর বলা হয়েছে— 'তুমি যদি তাদের নিকট কোনো নিদর্শন উপস্থিত করো, কাফেররা অবশ্যই বলবে, তোমরা তো মিথ্যাশ্রয়ী'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি যদি অংশীবাদীদের সম্মুখে উপস্থাপন করেন কোরআনের কোনো আয়াত অথবা নবী মুসার যষ্টির মতো অন্য কোনো অলৌকিকত্ব, তবুও তারা তা সত্য বলে মেনে নিবে না। উল্টো আপনি ও আপনার অনুগামীদেরকে বলবে, তোমরাই মিথ্যাশ্রয়ী। আমাদের পিতৃপুরুষদের ধর্মাদর্শই সত্য।

এরপরের আয়াতে (৫৯) বলা হয়েছে— 'যাদের জ্ঞান নেই, আল্লাহ্ এভাবে তাদের হৃদয় মোহর করে দেন'। একথার অর্থ— মক্কার মুশরিকদের অন্তরকে যেভাবে আমি চিরতরে অবরুদ্ধ করে দিয়েছি, সেভাবেই অবরুদ্ধ করে দেই অন্যান্য চিরভ্রষ্ট অংশীবাদীদের হৃদয়ও। এখানে 'লা ইয়ালামূন' অর্থ যারা আল্লাহ্র অখণ্ডনীয় এককত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। অথবা বলা যেতে পারে, আল্লাহ্র সত্তা-গুণবত্তা-কার্যকলাপ সম্পর্কে জানবার স্পৃহা যাদের একেবারেই নেই।

শেষোক্ত আয়াতে (৬০) বলা হয়েছে— 'অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! অংশীবাদীদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত বৈরী পরিবেশ দৃষ্টে আপনি চঞ্চল হবেন না। বরং এমতাবস্থায় ধৈর্য অবলম্বনই আপনার জন্য শ্রেয়। আর নিশ্চিত জানবেন যে, আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন অবশ্যম্ভাবী। তিনি তো আপনার সঙ্গে এই মর্মে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, অচিরেই তিনি আপনার আনীত ধর্মমতকে বিজয়ী করে দিবেন স্বদেশে বিদেশে সর্বত্র।

সবশেষে বলা হয়েছে— 'যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয় তারা যেনো তোমাকে বিচলিত না করতে পারে'। এখানে 'তারা যেনো তোমাকে বিচলিত করতে না পারে' কথাটির অর্থ— ওই সকল পথভ্রষ্টরা যেনো আপনাকে উৎসাহিত অথবা প্ররোচিত না করতে পারে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো গুরুত্বহীনতার দিকে।

সূরা লুক্মান

এই সুরার রুকুর সংখ্যা চার এবং আয়াতের সংখ্যা চৌত্রিশ। আর এর অবতরণস্থল মক্কা।

সূরা লুক্মান ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

الٓمّٓ ۚ ﴿١﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۙ ﴿٢﴾ هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ۙ ﴿٣﴾ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ؕ ﴿٤﴾ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥﴾

r আলিফ-লাম-মীম;

r এইগুলি জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত,

r পথ-নির্দেশ ও দয়াস্বরূপ সৎকর্মপরায়ণদের জন্য;

r যাহারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, আর তাহারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী;

r তাহারাই তাহাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে আছে এবং তাহারাই সফলকাম।

প্রথমে উল্লেখিত হয়েছে বিচ্ছিন্ন ও রহস্যাচ্ছন্ন বর্ণরাজি আলিফ লাম মীম। কোরআন মজীদের কোনো কোনো সুরার প্রথমে এধরনের বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি পরিদৃশ্যমান। এগুলোর মর্মার্থ জানেন কেবল আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুল। অবশ্য অতিনগণ্য সংখ্যক সৌভাগ্যবানও এ জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করেছেন। তাঁরাই 'ওলামায়ে রসিখীন'। বিষয়টি সাধারণবোধ নয়। তাই প্রকাশ্যে এর মর্মোন্মচনও নিষিদ্ধ।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'এগুলি জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত'। এখানে 'হাকীম' অর্থ প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানগর্ভ। কোরআন মজীদের সঙ্গে এভাবে এখানে প্রজ্ঞাময়তার সম্পর্ক করা হয়েছে পরোক্ষভাবে।

এর পরের আয়াতে (৩, ৪) বলা হয়েছে— 'পথনির্দেশ ও দয়াস্বরূপ সৎকর্মপরায়ণদের জন্য; যারা সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয়, আর তারাই আখেরাতে দৃঢ় বিশ্বাসী'। একথার অর্থ— জ্ঞানগর্ভ এই গ্রন্থ বিশ্বাসীদের জন্য পথপ্রদর্শক ও রহমত স্বরূপ। আর বিশ্বাসীগণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে— তারা সাধারণভাবে হবে সৎকর্মপরায়ণ। আর এই বিশেষ তিনটি সদগুণ তাদের থাকবেই— ১. নামাজ প্রতিষ্ঠা ২. জাকাত প্রদান এবং ৩. পরকালে বিশ্বাস। অথবা বলা যেতে পারে যে, এখানে নামাজ-জাকাত-পরকালবিশ্বাস এই ত্রয়ী পুণ্যকর্মের উল্লেখের কারণ হচ্ছে, এগুলোকে অন্যান্য পুণ্যকর্মাপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণরূপে প্রতিভাত করা। আর বিষয়টিকে অধিকতর মর্যাদায়িত করবার জন্য এখানে করা হয়েছে 'হুম' (তারা) সর্বনামটির পুনঃপুনঃ সন্নিবেশন।

এরপরের আয়াতে(৫) বলা হয়েছে— 'তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে আছে এবং তারাই সফলকাম'। একথার অর্থ— যারা আল্লাহ্‌র উপরে পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে কেবল তাঁর পরিতোষার্থে নামাজ পাঠ করে, জাকাত দেয় এবং অন্যান্য সৎকর্মের মাধ্যমে দৃঢ়ভাবে পরকালের জন্য যথাপ্রস্তুতি গ্রহণ করে তারাই নির্ভুল গন্তব্যাভিসারী এবং তারাই ইহপরকালে সফল।

জুয়াইবীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নজর ইবনে হারেছ একবার ক্রয় করলো এক গায়িকা ক্রীতদাসী। নৃত্যপটিয়সীও ছিলো সে। কেউ ইসলাম গ্রহণ করতে যাচ্ছে, এরকম সংবাদ শুনতে পেলেই নজর ইবনে হারেছ তাকে ডেকে আনতো। ক্রীতদাসীটিকে ডেকে বলতো, একে গান শোনাও এবং নগ্ননৃত্য দেখাও। তারপর তার ওই অতিথিকে বলতো, আরে মোহাম্মদের আমন্ত্রণ তো নিরস কর্মকাণ্ডের দিকে। নামাজ-জাকাত-স্বজনবৈরিতা এসবের

কথাই তো সে বলে। আর দ্যাখো, আমার আমন্ত্রণ কতো সরস ও উপভোগ্য। কী বলো, ঠিক বলিনি? তার এমতো অপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত।

সূরা লুক্‌মান ঃ আয়াত ৬

وَ مِنَ النَّاسِ مَنۡ یَّشۡتَرِیۡ لَهۡوَ الۡحَدِیۡثِ لِیُضِلَّ عَنۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ بِغَیۡرِ عِلۡمٍ ٭ۖ وَّ یَتَّخِذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِکَ لَهُمۡ عَذَابٌ مُّهِیۡنٌ ﴿۶﴾

r মানুষের মধ্যে কেহ কেহ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্‌র পথ হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করিয়া লয় এবং আল্লাহ্-প্রদর্শিত পথ লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। উহাদেরই জন্য রহিয়াছে অবমাননাকর শাস্তি।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— কোনো কোনো মানুষ এমন, যারা নিজে তো আল্লাহ্‌র পথে চলেই না, উপরন্তু তারা অন্যকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে সরিয়ে নেওয়ার অপ-উদ্দেশ্যে প্রবর্তন করে অর্থহীন ও পুণ্যহীন কথা ও কাজের। নিশ্চয় তাদের এমতো প্রবর্তনা অজ্ঞাতাপ্রসূত। আবার আল্লাহ্-প্রদর্শিত পথ সম্পর্কে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপও করে। তাদের জন্যই অপেক্ষা করছে চরম লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি, যা অবধারিত।

এখানে 'লাহ্ওয়াল হাদীছ' অর্থ ওই বাক্য, যা অসার, অর্থহীন, পুণ্যহীন, অসঙ্গত, অলীক, অসত্য, কৌতুকপ্রদ, অশুভ, অকল্যাণকর। 'হাদীছ' অর্থ বাক্য, বাণী, কথা, বক্তব্য।

আউফির বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে জনৈক কুরায়েশ ব্যক্তি সম্পর্কে। সে ক্রয় করেছিলো একটি সঙ্গীতপটিয়সী ক্রীতদাসীকে।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু সালমা কর্তৃক বিবৃত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ক্রীতদাসীকে গান শেখানো ঠিক নয়। গায়িকা ক্রীতদাসীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভক্ষণ নিষিদ্ধ। এদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে— মানুষের মধ্যে যারা ক্রয় করে আমার বাণী। গায়ক-গায়িকা গান শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্পাক দু'জন শয়তানকে তার উপরে চাপিয়ে দেন। তারা গিয়ে বসে তার দুই কাঁধে। গান শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা পদাঘাত করতে থাকে তাদেরকে। হজরত আবু উমামা বাহেলী থেকে তিরমিজি প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, গায়িকা দাসী কেনাবেচা কোরো না। তাদের ক্রয়-বিক্রয় কল্যাণহীন। তাদের বিক্রয়লব্ধ মূল্য ভক্ষণ হারাম। তাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে, 'মানুষের মধ্যে.....'।

মুকাতিল ও কালাবী সূত্রে বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে নজর ইবনে হারেছকে উদ্দেশ্য করে। সে ছিল বণিক। বাণিজ্য ব্যপদেশে সে হীরাত অঞ্চলে গমনাগমন করতো। সেখান থেকে সে শিখে আসতো অনারব জনগোষ্ঠীদের প্রচলিত কিস্‌সা-কাহিনী। সেগুলো আবার শোনাতো মক্কাবাসীদেরকে। বলতো, মোহাম্মদের চেয়ে আমি কম গল্প জানি না। সে তোমাদেরকে আদ-ছামুদের কাহিনী শোনায়। আর আমি শোনাই রোস্তম-সোহরাব ও পারস্য-রাজাদের কিংবদন্তী। তার কাহিনী বর্ণনার ভঙ্গি ছিলো আকর্ষণীয়। তাই অনেকেই তার দিকে ঝুঁকে পড়তো। আগ্রহ হারিয়ে ফেলতো কোরআনের সদুপদেশাবলীর প্রতি। এমতো পরিস্থিতিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বায়হাকীও এরকম বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তার 'শো'বুল ইমান' গ্রন্থে।

মুজাহিদ বলেছেন, গায়ক-গায়িকা উভয়েই এখানকার 'লাহ্‌ওয়াল হাদীছ' এর উদ্দেশ্যভূত। এখানে কিছু কথা রয়েছে অনুক্ত। ওই অনুক্ত অংশসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মানুষের মধ্যে এরকম মানুষও আছে, যারা ক্রয় করে গায়ক ও গায়িকা। অথবা— কিছু সংখ্যক লোক এমন, যারা কোরআনের চিরকল্যাণবহ বাণী নিচয়কে উপেক্ষা করে নিমগ্ন হয় সঙ্গীতচর্চায়। এমতো ক্ষেত্রে 'ক্রয় করে' মর্মার্থ হবে— প্রাধান্য দেয়। মাকহুল বলেছেন, যে ব্যক্তি গায়িকা ক্রীতদাসী ক্রয় করে সারাজীবন ধরে তার গান শুনতে থাকে, আমি তার জানাজা পড়বো না। কেননা আমার সামনে রয়েছে এই আয়াত।

হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত ইবনে আব্বাস, ইকরামা ও সাঈদ ইবনে যোবায়েরের মতে, এখানকার 'লাহ্‌ওয়াল হাদীছ' অর্থ সঙ্গীতশ্রবণ। আবুস্‌ সোহবা বর্ণনা করেছেন, আমি একবার হজরত ইবনে মাসউদের নিকটে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ জানতে চাইলাম। তিনি তিনবার শপথ উচ্চারণ করে বলবেন, যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, সেই পবিত্র সত্তার শপথ করে বলছি 'লাহ্‌ওয়াল হাদীছ' অর্থ সঙ্গীত।

ইবনে জুরাইজ বলেছেন, শব্দদুটোর অর্থ বাদ্যযন্ত্র। আমি বলি, সঙ্গীত নৃত্য-বাদ্য-কিস্‌সা-কাহিনী— যে কারণেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়ে থাকুক না কেনো, এর বিধান কিন্তু সার্বজনীন ও সর্বকালীন। একারণেই কাতাদা বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে নিন্দা করা হয়েছে সবধরনের চপল, চটুল ও অশ্লীল চিত্তবিনোদনের। জুহাক অবশ্য বলেছেন, 'লাহ্‌ওয়াল হাদীছ' অর্থ শিরিক।

মাসআলাঃ ফকীহ্‌গণের সর্বসম্মত মত এই যে, সর্ববিধ বাদ্য হারাম।

'আলমুত্তাকিক' গ্রন্থে রয়েছে, বাদ্যযন্ত্র বাজানো যেমন হারাম, তেমনি হারাম বাদ্যশ্রবণও। যেমন ঢোল তবলা। তবে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদেরকে সতর্ক করণার্থে

ঢাক পেটানো অসিদ্ধ নয়। বরং অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে এ রকম করা হলে তা হবে পুণ্যপদবাচ্য। 'মুলতাফাত' গ্রন্থে রয়েছে, কেউ কেউ মনে করেন, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করণার্থে এবং বিবাহ উৎসবে আনন্দ প্রকাশার্থে সঙ্গীত সিদ্ধ।

লক্ষণীয়, বিবাহ উৎসবে দফ বাজানো সিদ্ধ। অথচ দফও একটি বাদ্যযন্ত্র। কিন্তু দফ বাজানোর উদ্দেশ্য যেহেতু থাকে বিবাহের আনন্দ প্রচার, তাই তা অসিদ্ধ নয়। তাছাড়া বিবাহ অনুষ্ঠানে দফ বাজানো সুন্নতও বটে। রসুল স. স্বয়ং এর অনুমতি দিয়েছেন। বলেছেন, তোমরা বিবাহের সংবাদ প্রচার কোরো, দফ বাজিয়ে হলেও।

'জখীরা' পুস্তকে রয়েছে, কেউ কেউ বলেছেন, ঈদের সময় দফ বাজানোর মধ্যে পাপ নেই। এক বর্ণনায় এসেছে, একবার রসুল স. অবস্থান করছিলেন স্বগৃহে। দিনটি ছিলো ঈদের দিন। একটু পরে তাঁর গৃহের অঙ্গনে এসে হাজির হলো দুই কিশোরী। তারা দফ বাজিয়ে গান পরিবেশন করতে লাগলো। হঠাৎ হজরত আবু বকর সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, তোমরা করছো কী? আল্লাহ্‌র রসুলের ঘরের সামনে গান বাজনা শুরু করে দিয়েছো! রসুল স. তাঁকে কাছে ডেকে বললেন, গাইতে দাও। আজ যে ঈদের দিন।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. কুকুর বিক্রয়ের অর্থ এবং বংশীবাদকের উপার্জন ভক্ষণ করা নিষেধ করে দিয়েছেন। হজরত আবু মালেক আশয়ারী বর্ণনা করেছেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে কেউ কেউ হবে মদ্যপ। আর তারা মদকে দিবে ভিন্ন ভিন্ন নাম। তাদের সামনে পরিবেশিত হবে বাদ্য ও গায়িকাদের সঙ্গীত। আল্লাহ্ তাদের কাউকে কাউকে ভূমিধসের মাধ্যমে ভূপ্রোথিত করবেন। আর কারো কারো আকৃতি রূপান্তরিত করে দিবেন শূকর ও বানরের আদলে। বিবরণটিকে শুদ্ধসূত্রসম্বলিত আখ্যা দিয়েছেন ইবনে হাব্বান। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যখন আমার উম্মত পনেরোটি অপঅভ্যাসে লিপ্ত হবে, তখন তাদের উপরে আপতিত হবে বিভিন্ন প্রকারের বিপদাপদ। উপস্থিত সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র মহামান্য রসুল! ওই অপঅভ্যাসগুলো কী কী? তিনি স. বললেন— ১. যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে পার্থিব সম্পদরূপে গণ্য করা ২. গচ্ছিত সম্পদকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদরূপে ভাবা ৩. জাকাতকে মনে করা জরিমানা ৪. স্ত্রৈন্য হওয়া ৫. জননীর অনানুগত্য ৬. বন্ধুবান্ধবকে সবচেয়ে আপনজন ভাবা ৭. পিতৃদ্রোহীতা ৮. মসজিদে উচ্চস্বরে আওয়াজ করা ৯. সমাজপতিরূপে নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের অধিষ্ঠান ১০. অনিষ্টের আশংকায় দুরাচারকে সম্মান প্রদর্শন ১১. অবাধ মাদকাসক্তি ১২. পুরুষদের রেশমী বস্ত্র ব্যবহার ১৩. রক্ষিতারূপে গায়িকা সংরক্ষণ ১৪. বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপক প্রসার এবং ১৫. উত্তরপুরুষ কর্তৃক পূর্ব পুরুষদেরকে অভিসম্পাত প্রদান। এই পাপগুলো প্রকাশ পেলে মানুষ যেনো অপেক্ষা করতে থাকে ভয়ংকর তুফান, অগ্নুৎপাত ও ভূমিধসের।

মাসআলাঃ ফকীহ্গণ বলেন, আলোচ্য আয়াত এবং বর্ণিত হাদিসগুলোর মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সঙ্গীতশ্রবণ হারাম।

সূফী দার্শনিকগণ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র স্মরণে সততমগ্ন ও নির্জনাচারী, তার জন্য সঙ্গীত শ্রবণ দূষণীয় নয়। বরং নামাজ ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক ইবাদতের সময় ব্যতীত অন্য সময় সঙ্গীত শ্রবণ তাদের জন্য সিদ্ধ তো বটেই, উপরন্তু মোস্তাহাব (অভিপ্রেত)। কারণ তারা পুরোপুরি আল্লাহ্মনস্ক। সঙ্গীত তাদের আল্লাহ্প্রেমের আগুনকে করে অধিকতর প্রোজ্জ্বল। অন্য মানুষেরা এর বিপরীত। তাই সঙ্গীত তাদের অপপ্রবৃত্তিকে করে অধিকতর উদাসীন। বেশী করে উসকে দেয় তাদের পাপাগ্নিকে।

'শরহে কাফী' গ্রন্থে রয়েছে, যে ক্রীড়া-কৌতুক অনুষ্ঠিত হয় পাপবাসনা নিবারণার্থে, তাকেই বলে 'লাহ্ওয়াল হাদীছ'। এধরনের কামনা অন্তরে পোষণ করে তারা, যারা নামাজ সম্পাদন, কোরআন পাঠ ইত্যাদি পুণ্যকর্মের ধারে কাছেও যায় না। অথচ সহজে আকৃষ্ট হয় বাদ্য-সঙ্গীতের প্রতি। আমাদের বিদ্বজ্জনের অভিমত্যানুসারে এধরনের লোকদের জন্যই সঙ্গীত নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্প্রেমিক এবং শরিয়তের বিধানসমূহ পালনে যত্নবান, তাদের জন্য সঙ্গীত সিদ্ধ। কারণ সঙ্গীত তাদেরকে অধিকতর আল্লাহ্অভিমুখী করে। শাণিত করে তাদের পরকাল চেতনাকে।

'বজদবী' গ্রন্থের ভাষ্যকার আবুল কাসেম ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ দামেশকী তাঁর ভাষ্যগ্রন্থ নুরী কিতাবে উল্লেখ করেছেন, সঙ্গীতশ্রবণ সম্পর্কে আলেম সম্প্রদায়ের মধ্যে মতদ্বৈধতা পরিদৃষ্ট হয়। যারা নামাজবর্জনকারী ও মদ্যপ তারাই সাধারণতঃ যত্রতত্র গানের আসর বসায়। তাদের জন্য সঙ্গীত নিশ্চিত হারাম। কিন্তু যারা আল্লাহ্ভীরু, নামাজ, কোরআন পাঠ, দরূদপাঠ ও অন্যান্য ইবাদত বন্দেগীতে নিবিষ্টচিত্ত তাদের জন্য সঙ্গীত হারাম নয়। সঙ্গীত তাদের আল্লাহ্প্রেম ও পরকালবোধকে জাগ্রত করে। তাঁরা আল্লাহ্প্রেমে মত্ত হয়ে যদি নৃত্য শুরু করেন, তাও অসিদ্ধ নয়।

'আলইকনা' গ্রন্থে রয়েছে, কোনো কোনো গান হৃদয়কে করে বিনম্র। আল্লাহ্র সাক্ষাত লাভের বাসনায় অন্তরকে করে বিরহকাতর। আল্লাহ্র অসন্তোষের আশংকায় অন্তরে সৃষ্টি করে ভয় ও বিস্ময়। এধরনের গানে ইন্দ্রিয়জ অপরিচ্ছন্নতার লেশমাত্র থাকে না।

শায়েখ শিহাবুদ্দিন সোহরাওয়াদি তাঁর 'আল আওয়ায়েফ' গ্রন্থে লিখেছেন, যারা বিশুদ্ধচিত্ত, সঙ্গীত তাদেরকে আকৃষ্ট করে আল্লাহ্তায়ালার অপারসিন্ধুর তরঙ্গমুখরতার দিকে। 'ফতোয়ায়ে খোলাসা' গ্রন্থে রয়েছে, জ্ঞানপ্রবীণগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন, কেবল বিনোদনের উদ্দেশ্যে কাউকে গান শোনানো মাকরূহ (অশোভন)। কিন্তু তাঁদের মধ্যে আবার কেউ কেউ বলেছেন, বিবাহ-উৎসবে ও

অন্যান্য নির্দোষ প্রমোদায়োজনে সঙ্গীত পরিবেশন সিদ্ধ। দুঃখ-কষ্ট বা ভীতি প্রশমনার্থে সঙ্গীত পরিবেশনকে কেউই অশোভন বলেননি। ইমাম সুরুখসীও এ অভিমতের সমর্থক। আবার কোনো কোনো আলেম বলেছেন, সকল প্রকার সঙ্গীত মাকরূহ। ইমাম সাহেবগণও এ অভিমতের প্রবক্তা।

'জামেউল মুজমারাত' গ্রন্থে 'আন্নাফে' এবং 'জখীরা' গ্রন্থের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, কেউ যদি অপরের তুষ্টি-অতুষ্টির দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে কেবল নিজের চিত্তোদ্বেগ ও দুঃখ-যাতনা প্রশমনার্থে গান গায়, তবে তা দূষণীয় নয়। আমি ইমাম নজমুদ্দীনকেও এরকম বলতে শুনেছি, মনের খেদ দূর করবার জন্য যদি কেউ তার নিজের ক্রীতদাসীর গান শোনে, তবে তাতে দোষের কিছু নেই। অভিমতটি বর্ণিত হয়েছে হামীয়ার ঘটনাবলীতে। 'আওয়ায়েফ' গ্রন্থে ক্রীতদাসীর সঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে আপন সহধর্মিণীর কথাও। অর্থাৎ নিজের স্ত্রীর মুখে গান শোনা সিদ্ধ। এরকম উল্লেখ রয়েছে ইব্রাহীম শামীতেও। 'আল মুহীত' গ্রন্থে ইমাম সুরুখসী উল্লেখ করেছেন, ইমাম মোহাম্মদ তাঁর 'সীয়ারে কাবীর' গ্রন্থে লিখেছেন, একবার হজরত আনাস ইবনে মালেক তাঁর ভাইয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, তিনি গীতানুশীলনে মগ্ন।

উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে অনর্থক ক্রীড়াকৌতুককে নিষিদ্ধ বলা হয়েছে। কিন্তু সুফী সাধকগণের সঙ্গীত (ছামা) এই নিষিদ্ধতার পর্যায়ে পড়ে না। আর হাদিস শরীফসমূহে যে নিষিদ্ধতা বিঘোষিত হয়েছে, সে নিষিদ্ধতা সাধারণভাবে সকল প্রকার সঙ্গীতের উপরে প্রযোজ্য নয়। কারণ কোনো কোনো হাদিসে আবার সঙ্গীত সিদ্ধ হওয়ার কথাও এসেছে। এতে করে এমতো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কোনো কোনো সঙ্গীত নিষিদ্ধ এবং কোনো কোনো সঙ্গীত সিদ্ধ। এ কারণেই আমরা বলি, পাপপ্রবণতা উদ্রেকক সঙ্গীতই কেবল নিষিদ্ধ। অন্যগুলো নয়।

যে সকল হাদিস দ্বারা সঙ্গীত ও দফ বাজানো সিদ্ধ প্রমাণিত হয়েছে, তন্মধ্যে একটি হাদিস এরকম— হজরত রবী বিনতে মুয়াজ ইবনে আফরা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আমার বিবাহের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি স. উপবেশন করেছিলেন আমার পাশেই। কতিপয় কিশোরী তখন দফ বাজিয়ে সুরেলা কণ্ঠে শোকগাঁথা গাইছিলো। শোকগাঁথাটি ছিলো বদরযুদ্ধের শহীদগণ সম্পর্কে। তাঁর মধ্যে একটি শ্লোক ছিলো এরকম— আমাদের মধ্যে এমন একজন মহান নবী বিদ্যমান, যিনি ভবিতব্য সম্পর্কে জানেন। রসুল স. তখন বাধা দিয়ে বললেন, তোমরা এই চরণটি আর উচ্চারণ কোরো না। অন্যগুলো বলো। বোখারী। ইবনে মাজার বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— আর এরকম বোলো না। ভবিতব্য তো আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ জানে না।

জননী আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, জনৈক আনসার সাহাবীর সঙ্গে বিবাহ হলো এক রমণীর। বিবাহের পর যখন ওই রমণী পতিগৃহে উপস্থিত হলো, তখন রসুল স. নবদম্পতির দিকে লক্ষ্য করলেন। তারপর উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্যে গানবাজনা জানে, এমন কী কেউ নেই। ওরা যে সঙ্গীত প্রেমিক। বোখারী।

জননী আয়েশা কর্তৃক আরো বর্ণিত হয়েছে, অমুকের বিবাহের অনুষ্ঠান করো মসজিদে। আর দফ বাজিয়ে জোরে জোরে অনুষ্ঠানের প্রচার করো। তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদিসটি দুষ্প্রাপ্য। জননী আরো বর্ণনা করেছেন, এক আনসার আমার কাছেই থাকতো। আমার উদ্যোগেই তার বিবাহ হলো। বিয়ের আসরে রসুল স. উপস্থিত হয়ে বললেন, আয়েশা! গানবাজনার ব্যবস্থা কই? এই মেয়েটির গোত্র তো সঙ্গীতপ্রেমিক।

ইবনে হাব্বানের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার জননী আয়েশা তাঁর এক নিকটাত্মীয়ার বিবাহ দিলেন জনৈক আনসারী যুবকের সঙ্গে। বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর রসুল স. সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, তোমরা কি মেয়েটিকে বিদায় করে দিয়েছো? উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তিনি স. বললেন, আনসারীজনতা গজলপ্রেমিক। সুতরাং তোমরা যদি কোনো গায়ককে সেখানে পাঠিয়ে দিতে তবে উত্তম হতো। সে তাদেরকে শোনাতো এই গজলটি 'আতাইনাকুম আতাইনাকুম ফাহাইয়্যানা ওয়া হাইয়্যাকুম' (আমরা তোমাদের অতিথি; আল্লাহ্ আমাদেরকে কল্যাণ দান করুন; তোমাদেরকেও করুন কল্যাণধন্য)। ইবনে মাজা।

আমের ইবনে সাআদ বর্ণনা করেছেন, একবার আমি এক বিবাহ উৎসবে যোগদান করলাম। সেখানে উপস্থিত ছিলেন হজরত করজ ইবনে কাআব এবং হজরত আবু মাসউদ আনসারী। কয়েকজন বালিকা সুললিত কণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশন করতে শুরু করলো। আমি নিবেদন করলাম, হে রসুল স. এর মহামান্য সহচর! আপনাদের সামনে একি হচ্ছে? তাঁরা দু'জনেই সমস্বরে বলে উঠলেন, তোমার ইচ্ছা হলে থাকো, না হয় চলে যাও। আমরা বিবাহ অনুষ্ঠানে গান শোনার অনুমতিপ্রাপ্ত।

জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, তখন ছিলো হজের মওসুম। দু'জন বালিকা আমার সামনে দফ বাজাতে শুরু করলো। রসুল স. শুয়েছিলেন আচরণ শির চাদরাবৃত হয়ে। হঠাৎ আমার পিতা হজরত আবু বকর সেখানে উপস্থিত হয়ে বালিকাদেরকে ধমক দিলেন। রসুল স. চাদরের ভিতর থেকে মুখ বের করে বললেন, আবু বকর! ওদেরকে কিছু বোলো না। আজ তো ঈদের দিন। ওদেরকে

আনন্দ করতে দাও। বোখারী। ইবনে মাজার বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— রসুল স. আরো বললেন, প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রয়েছে উৎসব-পরব পালনের প্রথা। সে রকম উৎসব-পরব আমাদেরও রয়েছে। যেমন আজ।

হজরত আমর ইবনে শোয়াইবের পিতামহ বর্ণনা করেছেন, একবার এক রমণী রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্‌র প্রিয় বচনবাহক! আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করেছি যে, যদি আপনি দয়া করে আমার গৃহে পদধূলি দেন, তবে দফ বাজিয়ে আমি আনন্দ প্রকাশ করবো। তিনি স. বললেন, ঠিক আছে, তাই কোরো। আবু দাউদ। এখানে প্রণিধাননীয় যে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র অবাধ্যতাজনিত অঙ্গীকারপূরণ নিষিদ্ধ। সুতরাং বুঝতে হবে দফ বাজিয়ে আনন্দ প্রকাশ করা দূষণীয় নয়। যদি হতো তবে রসুল স. নিশ্চয় ওই রমণীকে এমতো অনুমতি দিতেন না। এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, রসুল স. যখন মদীনায় শুভাগমন করেন, তখন নাজ্জার গোত্রের বালিকারা গেয়ে উঠেছিলো—

নাহনু জ্বাওয়ারিম্ মিন বনী নাজ্জারিন
ইয়া হাব্‌বাজা মুহাম্মাদান মিন জ্বারিন।

অর্থ ঃ আমরা বনী নাজ্জার দুলালী। আর মোহাম্মদ হচ্ছেন আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অতিথি।

ওই বর্ণনায় একথাও এসেছে যে, রসুল স. ওই বালিকাদেরকে বলেছিলেন, আল্লাহ্ জানেন, আমি তোমাদেরকে ভালোবাসি।

বায়যাবীর বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. তখন ওই বালিকাদেরকে বলেছিলেন, আল্লাহ্ উত্তমরূপে অবগত যে, আমি তোমাদেরকে ভালোবাসি। জননী আরো বলেছেন, পুণ্যময় মদীনায় রসুল স. এর শুভাগমনকালে বালক-বালিকারা সমস্বরে গেয়ে ছিলো—

তালায়া'ল বদরু আ'লাইনা
মিন ছানিয়াতিল বিদায়ী
ওয়াজ্বাবাশ্ শুকরু আ'লাইনা
মাদায়া লিল্লাহি দায়ী'।

অর্থ ঃ বিদা শৈলশিখরে উদিত হয়েছে পূর্ণিমার শশী। এ অনন্য সৌভাগ্যের যথা-কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমাদের একান্ত কর্তব্য। আমাদের প্রতি প্রেরিত হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি তো এনেছেন এমন বিধান যা সকল মানুষের অবশ্য অনুসরণীয়।

হজরত আনাস থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, যখন মদীনায় রসুল স. এর শুভপদার্পণ ঘটলো, তখন আনন্দোৎফুল্লকারীরা ছোট ছোট বর্শা নিক্ষেপের খেলা খেলেছিলো।

মোহাম্মদ ইবনে হাতেব জুমুহী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সঙ্গীত ও বিবাহের সময় দফ বাজানোর মধ্যে সিদ্ধ ও নিষিদ্ধ দু'টোরই ইঙ্গিত রয়েছে। আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, নাসাঈ।

ইমাম গায্যালী তাঁর 'ইহ্ইয়াউল উলুম' গ্রন্থে লিখেছেন, শুভদিনের উৎসবে সঙ্গীত শ্রবণ করলে পরিবেশ হয়ে ওঠে আনন্দঘন। উৎসব যদি সিদ্ধ হয়, তবে সে উৎসবের সঙ্গীতও হবে সিদ্ধ। যেমন ঈদ, বিবাহ, ওলীমা, প্রবাসীজনের প্রত্যাবর্তন মুহূর্ত, শিশুর জন্মগ্রহণ, আকীকা, খৎনা, শিশুর কোরআন মজীদ হেফজ করার সূচনালগ্ন ইত্যাদি। আমি বলি, কোরআন মজীদ শিক্ষার উদ্দেশ্যে শিক্ষকের হাতে সন্তান সম্প্রদানকালে আনন্দোৎসবের সময়ের সঙ্গীতও এই বিধানের পর্যায়ভূত। এতক্ষণ ধরে যে আলোচনা করা হলো, তাতে একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, পাপপ্রবণতার সহায়ক সঙ্গীত নিষিদ্ধ এবং যে সঙ্গীত এরকম নয়, তা সিদ্ধ। নক্শবন্দিয়া তরিকার পীর-মোর্শেদগণ অবশ্য এ ব্যাপারে অত্যধিক সতর্ক। তাঁরা নিজেরা সঙ্গীত নৃত্য (ছামা রাক্কাসা) ইত্যাদির সঙ্গে মোটেও সংশ্লিষ্ট নন। আবার যারা এগুলো করে তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলেনও না।

এখানে 'অজ্ঞতাবশতঃ' অর্থ তারা জানেই না যে, অসার বাক্যক্রয় লাভজনক না ক্ষতিকর। অথবা বলা যেতে পারে, এমতো ক্রয়-বিক্রয়ের প্রকৃতি সম্পর্কেই তারা অনবগত। তাদের জন্য লাভজনক ছিলো কোরআনানুসরণ। অথচ তারা কোরআনকে বাদ দিয়ে গ্রহণ করেছে চটুল বিনোদনপন্থা। কাতাদা বলেছেন, আয়াতে কথিত লোকগুলি ছিলো চরম পর্যায়ের ভ্রান্ত। মহাসত্য পরিত্যাগ করে তারা গ্রহণ করেছিলো অলীক বাণী।

সূরা লোকমান ঃ আয়াত ৭, ৮, ৯, ১০, ১১

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِيْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٧﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ﴿٨﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٩﴾ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ؕ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ

كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ﴿١٠﴾ هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَأَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿١١﴾

r যখন উহার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরাইয়া লয় যেন সে ইহা শুনিতে পায় নাই, যেন উহার কর্ণ দুইটি বধির; অতএব উহাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।

r যাহারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য আছে সুখদ-কানন;

r সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়!

r তিনি আকাশমণ্ডলী নির্মাণ করিয়াছেন স্তম্ভ ব্যতীত-তোমরা ইহা দেখিতেছ; তিনিই পৃথিবীতে স্থাপন করিয়াছেন পর্বতমালা যাহাতে ইহা তোমাদিগকে লইয়া ঢলিয়া না পড়ে এবং ইহাতে ছড়াইয়া দিয়াছেন সর্বপ্রকার জীব-জন্তু। এবং আমিই আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করিয়া ইহাতে উদ্‌গত করি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদ।

r ইহা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি! তিনি ব্যতীত অন্যেরা কী সৃষ্টি করিয়াছে আমাকে দেখাও। সীমালংঘনকারীরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— নজর ইবনে হারেছ এবং তার মতো লোকেরা কোরআন পাঠ শুনলে দর্পভরে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে, অথবা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে স্থান ত্যাগ করে। তাদের ভাব দেখে মনে হয়, তারা যেনো কিছু শুনতেই পায়নি, যেনো তারা বধির। ঠিক আছে, আল্লাহ্‌র কালামের প্রতি এমতো তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের যথাপ্রতিফল তারা পাবেই। হে আমার রসুল! সেই অনিবার্য শাস্তির সুসংবাদ আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন। উল্লেখ্য, এখানে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদকে সুসংবাদ বলা হয়েছে উপহাসসলে। অথবা বলা যেতে পারে 'সুসংবাদ দাও' কথাটির অর্থ— একথা জানিয়ে দাও যে, তারা সকল প্রকার শুভসংবাদ থেকে চিরবঞ্চিত। আর এখানে 'ওয়াক্বরা' অর্থ শ্রবণক্ষমতা রহিতকারী ভারবস্তু। অর্থাৎ বধিরতা। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়, যেনো তাদের কান দু'টো বধিরতাক্রান্ত। যেনো তারা বধির।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে (৮, ৯)বলা হয়েছে— 'যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আছে সুখদ কানন; সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'।

এখানে 'ওয়া হুয়াল আ'যীয' অর্থ তিনি মহাপরাক্রমশালী, পুণ্যদানের প্রতিশ্রুতি পূরণে এবং মর্মন্তুদ শাস্তি কার্যকর করার ব্যাপারে তাঁকে বাধ্য করার ক্ষমতা কারো নেই। আর 'আল হাকীম' অর্থ প্রজ্ঞাময়। অর্থাৎ তিনি যা কিছু করেন, তার সকলকিছুই প্রজ্ঞামণ্ডিত।

এরপরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'তিনি আকাশমণ্ডলী নির্মাণ করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত, তোমরা তা দেখছো; তিনিই পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা যাতে তা তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে'। এখানে 'রওয়াসী' অর্থ ভূপ্রোথিত পাহাড়।

প্রশ্ন জাগতে পারে, আকাশ কি আদৌ স্তম্ভবিহীন। যদি স্তম্ভ থেকেই থাকে, তবে তা দৃষ্টিগোচরই বা হয় না কেনো? আর এখানে আকাশকে স্তম্ভবিহীন বলার অর্থই বা কী? এমতো প্রশ্নের প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে— ১. হয়তো আকাশ প্রতিষ্ঠিত কোনো অদৃশ্য অবলম্বনের উপর। ২. আদতেই এরকম অবলম্বনের কোনো অস্তিত্ব নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার জীবজন্তু। এবং আমিই আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করে এতে উদগত করি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদ'।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্র একক সৃজনী শক্তি ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরাক্রমের প্রমাণরূপে উল্লেখ করা হয়েছে স্তম্ভবিহীন আকাশ নির্মাণ এবং পর্বতশ্রেণীর নিম্নাংশকে ভূপ্রোথিত করে পৃথিবীকে অচঞ্চল ও বাসপোযোগী করার কথা। আরো উল্লেখ করা হয়েছে পৃথিবীতে বিচরণশীল অসংখ্য ও বহুধাবিচিত্র প্রাণী-পাখি-পশুদের বিচরণশীলতার কথা। আর আকাশ থেকে বারিবর্ষণ এবং তার মাধ্যমে ফল ও ফসলের উদ্ভিদরাজি উৎপন্ন করার প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে সকলের শেষে। এভাবে এখানে পরমপ্রভুপালক এবং উপাস্যরূপে এক আল্লাহ্কে গ্রহণ করার জন্য দেয়া হয়েছে প্রচ্ছন্ন সদুপদেশ। একই সঙ্গে পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে সকল প্রকার অংশীবাদিতাকে। সুতরাং একথা সহজে অনুমেয় যে, যে ব্যক্তি এরকম করবে না, সে চিরভ্রষ্ট। পরবর্তী আয়াতে (১১) এ বিষয়টিকেই করা হয়েছে অধিকতর স্পষ্ট।

বলা হয়েছে— 'এটা আল্লাহ্র সৃষ্টি। তিনি ব্যতীত অন্যেরা কী সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও। সীমালংঘনকারীরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে'।

সূরা লোকমান ঃ আয়াত ১২

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۝١٢

r আমি লুকমানকে জ্ঞান দান করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম যে, আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো তাহা করে নিজেরই জন্য এবং কেহ অকৃতজ্ঞ হইলে আল্লাহ্ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি লোকমানকে জ্ঞানদান করেছিলাম'। বাগবী লিখেছেন, লোকমান ছিলেন বাউরের পুত্র। বাউর পুত্র ছিলেন নাখুরের এবং নাখুর পুত্র ছিলেন তারেখের। এই তারেখই আজর বলে পরিচিত। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্‌বাহ বলেছেন, লোকমান ছিলেন নবী আইয়ুবের ভাগিনেয়। মুকাতিল বলেছেন, লোকমান ছিলেন আইয়ুব নবীর খালাতো ভাই। বায়যাবী লিখেছেন নবী দাউদের যুগ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন লোকমান। তিনি ছিলেন সুবিজ্ঞ বিধানবেত্তা (মুফতী)। নবী দাউদের মহাআবির্ভাবের পর তিনি ফতোয়া দেওয়া বন্ধ করে দেন। বলেন, এখন আর আমার সিদ্ধান্ত প্রদানের অধিকার নেই। কারণ নবীর বর্তমানে অনুসারীর কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হয়। ওয়াহেদী বলেছেন, লোকমান ছিলেন বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠীর বিজ্ঞ বিচারকর্তা। তাফসীরে দুর্‌রে মনসুরে বলা হয়েছে, ইবনে আবী শায়বার অভিমতও এরকম। 'জুহুদ' গ্রন্থে রয়েছে, ইমাম আহমদও এ মত সমর্থন করেন। 'আল মামলুকীন' গ্রন্থে বলা হয়েছে, ইবনে আবিদ্ দুন্‌ইয়াও এমতো অভিমতের প্রবক্তা। আর ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, লোকমান ছিলেন একজন কাফ্রী ক্রীতদাস। পেশাগতভাবে তিনি ছিলেন সূত্রধর। খালেদ বরঈর সূত্রে বাগবীও এরকম বলেছেন। মুজাহিদ বলেছেন, কাফ্রী ক্রীতদাস ছিলেন তিনি। আর তাঁর ওষ্ঠদ্বয় ছিলো পুরুষ্ট এবং পদদ্বয় প্রশস্ত। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, তিনি ছিলেন দরজি। কেউ কেউ আবার বলেছেন, তিনি ছিলেন মেষ ও ছাগলের রাখাল।

এখানে 'হিকমাত' অর্থ জ্ঞান, অভিজ্ঞান, প্রজ্ঞা, ন্যায়ানুগতা, নবুয়ত, আসমানী কিতাব সম্পর্কে প্রাজ্ঞ। 'কামুস' অভিধানগ্রন্থে এরকমই বলা হয়েছে। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে 'ইন্‌না মিনাশ শি'রি লাহিকমাহু'। এই 'হিকমত' অর্থ জ্ঞান। অপর এক হাদিসে এসেছে 'আ'লা ওয়াফী র'সিহী হিকমাহ'। এই 'হিকমত' অর্থ বিচক্ষণতা। আলোচ্য বাক্যে উল্লেখিত 'হিকমাত' এর অর্থ দু'টোই হয়। অর্থাৎ লোকমান ছিলেন জ্ঞানী ও বিচক্ষণ। বাগবী লিখেছেন, বিদ্বজ্জনের ঐকমত্য এই যে, লোকমান নবী ছিলেন না, ছিলেন একজন জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি।

ইকরামাই কেবল হজরত লোকমানের নবী হওয়ার প্রবক্তা। ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, ওয়াহাব ইবনে মুনাব্‌বাহ্‌র কাছে একবার জানতে চাওয়া হলো, হজরত লোকমান কি নবী ছিলেন? তিনি বললেন, না। তিনি কোনো প্রত্যাদেশ

পাননি। তবে তিনি ছিলেন অতীব বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ। ইবনে জারীর এবং মুজাহিদও এরকম মন্তব্য করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁকে নবুয়ত গ্রহণ করা না করার অধিকার দেওয়া হয়েছিলো। তিনি নবুয়ত না নিয়ে নিয়েছিলেন হিকমত।

বাগবী লিখেছেন, একবার হজরত লোকমান দ্বিপ্রহরিক নিদ্রা উপভোগ করছিলেন তাঁর আপন শয্যায়। স্বপ্নমধ্যে আদিষ্ট হলেন, লোকমান! তুমি কি চাও, আল্লাহ্ পৃথিবীতে তোমাকে তাঁর প্রতিনিধি মনোনীত করুন এবং তুমি রাজকার্য পরিচালনা করো ন্যায়নিষ্ঠতার সঙ্গে? তিনি স্বপ্নের ভিতরেই জবাব দিলেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আপনি যদি ভালো মনে করেন তবে আমাকে মার্জনা করুন। এটাই আমার জন্য উত্তম। আর যদি এটা আপনার অনড় আজ্ঞা হয়, তবে সে আজ্ঞা তো শিরোধার্য। কারণ আমি জানি আপনার অভিপ্রায়ের সঙ্গেই জড়িত থাকে দায়িত্বপালনের সামর্থ্য। পুনঃ ঘোষণা হলো, হে লোকমান! তুমি এমন করে বললে কেনো? তিনি জবাব দিলেন, সন্দিগ্ধ ও অস্পষ্ট সমস্যাগুলোর সমাধান অতি দুরূহ, গভীর কুয়াশাচ্ছন্ন। সুতরাং ওই সকল ক্ষেত্রে যদি আমি সঠিক সিদ্ধান্ত উদ্ধার করতে অক্ষম হই, তবে তো আমি হারিয়ে ফেলবো জান্নাতের পথ। এমতো আশংকাতেই আমি বলতে চাই, পৃথিবীতে নেতৃপদে অধিষ্ঠিত হওয়া অপেক্ষা অন্যের অধীন হয়ে থাকাই নিরাপদ। যারা ইহকালকে প্রাধান্য দেয় পরকালের উপর, তারা হারিয়ে ফেলে পরকালের কল্যাণ। আল্লাহ্ তাঁর এমতো জবাব পছন্দ করেছিলেন। এভাবে আর একদিনের স্বপ্নে আল্লাহ্পাক তাঁকে দান করেছিলেন হিকমত। তাই তো তিনি হতে পেরেছিলেন প্রকৃত অর্থে জ্ঞানী ও বিচক্ষণ।

নবী দাউদকেও এভাবে স্বপ্নযোগে হিকমত দান করা হয়েছিলো এবং তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন বিনা শর্তে। কিন্তু বাস্তবে তিনি কয়েকবার সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যাপারে ভুল করে বসেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ সে ভুলগুলো সংশোধন করে দিয়েছিলেন হজরত লোকমানের মাধ্যমে। সুতরাং নিছক ন্যায়নিষ্ঠ বিচারকে হিকমত বলা যাবে না। যদি তাই বলা যেতো, তবে হজরত লোকমান তা গ্রহণ করতে ইতস্তত করতেন না।

জাযারী তাঁর স্বরচিত গ্রন্থ 'নেহায়া'য় একটি চমকপ্রদ ঘটনার অবতারণা করেছেন। বলেছেন, হিকমত হচ্ছে সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। আমি বলি, সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে আল্লাহ্র পরম সত্তা। আর তিনি সকল প্রকার আনুরূপ্য থেকে চিরপবিত্র। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'লাইসা কামিছলিহী শাইয়ুন' (তিনি যাবতীয় আনুরূপ্য থেকে পবিত্র)। আর এক আয়াতে ঘোষিত হয়েছে— 'আইয়ু শাইইন আকবর শাহাদাতান কুলিল্লাহ্' (কোন সত্তা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রত্যক্ষ গোচর? বলো, আল্লাহ্)। আর সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান হচ্ছে ওই জ্ঞান, যেখানে ঔদাসীন্যের ছায়াপাত মাত্র নেই। এই জ্ঞানকেই বলে আত্মজ্ঞান (এলমে হুজুরী)। পক্ষান্তরে অর্জিত জ্ঞান

(এলমে হুসুলী) নির্ভুল নয়। কারণ তাতে প্রায়শঃ পতিত হয় উদাসীনতার ছায়া। তাই অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পরিচয়প্রাপ্তি অসম্ভব। কোনোকিছুর প্রতিচ্ছবি অনুভবের আয়নায় প্রতিফলিত হওয়ার নাম অর্জিত জ্ঞান। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা যে অনুভবের অতীত, আকার প্রকার ও আনুরূপ্যহীন। আল্লাহ্‌পাকের সত্তা তাঁর সত্তাসঞ্জাত জ্ঞান অপেক্ষাও অনেক উচ্চ ও মহিমান্বিত। জ্ঞানীদের আত্মজ্ঞান আবার আল্লাহ্‌র সত্তাসঞ্জাত জ্ঞানের বিচারে অর্জিত জ্ঞানতুল্য। সুতরাং বুঝতে হবে আত্মজ্ঞান ও অর্জিত জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে বিস্তর প্রভেদ। অর্জিত জ্ঞান বিবেকনির্ভর, আর আত্মজ্ঞান সত্তানির্ভর। অর্থাৎ আত্মজ্ঞানই মূল জ্ঞান এবং অর্জিত জ্ঞান তার অতি দূরবর্তী ছায়া। আর এই দূরবর্তিতার কারণেই অর্জিত জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও অনির্ভরযোগ্য। যেমন প্রত্যেকে তার সত্তাকে এভাবে অনুভব করে যে, আমি আমিই। এমতো জ্ঞান পূর্ণ। কিন্তু আল্লাহ্ বলেছেন 'আমি তোমার প্রাণরগ অপেক্ষাও নিকটে)। অর্থাৎ তুমি তোমার যতো নিকটে, তার চেয়ে আমি তোমার অধিক নিকটে। সুতরাং এই জ্ঞান অধিকতর পূর্ণ; বরং পূর্ণতম। কারণ সমীপবর্তী ও দূরবর্তীরূপে আত্মজ্ঞান ও অর্জিত জ্ঞান সত্তাসন্নিহিত। কিন্তু আল্লাহ্‌র নৈকট্যের জ্ঞান যে সত্তারও অতীত। আর এমতো দুর্বোধ্য ও অনির্বচনীয় নৈকট্যের মাধ্যমেই লাভ হয় আল্লাহ্‌র পরিচিতি (মারেফত)। আর এই মারেফতের সম্পর্ক সত্তা ও আত্মার সঙ্গে। তাই হাদিসে কুদসীতে এসেছে, 'নভোমণ্ডলে ও ভূবনে আমার সংকুলান হয় না, সংকুলান হয় কেবল মানবাত্মায়'।

উল্লেখ্য, আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ প্রিয়ভাজন যারা, তাঁদের অনেকেই সত্তাসঞ্জাত জ্ঞান লাভ করে ধন্য হয়েছেন। হজরত আনাস থেকে বায়হাকী ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, হজরত লোকমান ছিলেন নবী দাউদের বিশেষ অনুচর। নবী দাউদ স্বহস্তে নির্মাণ করতেন লৌহবর্ম। কিন্তু হজরত লোকমান কোনোদিনই তাঁর নিকটে এ সম্পর্কে কিছু জানতে চাননি। একদিন নবী দাউদ একটি লৌহবর্ম প্রস্তুত করে পরিধান করলেন। তারপর বললেন, কী চমৎকার একটি যুদ্ধ-পরিচ্ছদ। হজরত লোকমান বললেন, নিশ্চুপ থাকাই বীরত্ব। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, বলুন, সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, যে অপকর্ম করে প্রকাশ্যে।

ইবনে আবী শায়বা, ইমাম আহমদ ও ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, খালেদ রবয়ী বলেছেন, হজরত লোকমান ছিলেন একজন কাফ্রী ক্রীতদাস এবং তিনি ছিলেন সূত্রধর। একবার তাঁর মালিক তাকে নির্দেশ দিলেন, একটি ছাগল জবাই করে তার মধ্য থেকে সবচেয়ে ভালো দু'টো টুকরা নিয়ে এসো। তিনি একটি ছাগল জবাই করে তার মধ্য থেকে নিয়ে এলেন জিহ্বা ও যকৃত। কিছুদিন পর তাঁর মালিক আদেশ করলেন, এবার একটি ছাগল জবাই করো এবং নিয়ে এসো

তার সর্বনিকৃষ্ট দু'টো অংশ। এবারও তিনি উপস্থিত করলেন জিহ্বা ও যকৃত। এরকম করার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দিলেন, এই অংশদুটো ভালো থাকলে সমস্ত শরীর ভালো থাকে এবং খারাপ হলে সমস্ত দেহ হয়ে যায় খারাপ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং বলেছিলাম, আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো'। এ কথার অর্থ— এবং আমি তাকে বলেছিলাম, হে লোকমান! তোমার প্রতি আমার এই যে অযাচিত দান, এই যে, হিকমাত, এর জন্য তুমি কায়মনোবাক্যে প্রকাশ করো আমার কৃতজ্ঞতা। অধিকাংশ তাফসীরবেত্তা বলেছেন, এখানকার 'আন' অব্যয়টি সন্নিবেশিত হয়েছে ব্যাখ্যামূলক হিসেবে। আমি বলি, এখানে হিকমত প্রদান করার অর্থ হিকমত শিক্ষা দেওয়া। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের। সুতরাং এখানে ব্যাখ্যামূলক অব্যয় ব্যবহারই যুক্তিযুক্ত। আর হিকমত প্রদানের অর্থই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ প্রদান।

'আনিশকুর্‌' (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো) কথাটি অনুজ্ঞাসূচক। আর এ অনুজ্ঞা হচ্ছে সৃষ্টিগত বা স্বভাবজাত। কারণ শরিয়তগত নির্দেশ তো রয়েছে সাধারণভাবে সকলের উপরেই। কেবল হজরত লোকমান তো এমতো নির্দেশের অন্তর্গত নন। যদি একে শরিয়তের সাধারণ অনুজ্ঞাই ধরে নেয়া হয়, তবুও তাঁর উপর সাধারণভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অপরিহার্য হয় না। কিন্তু যদি তা সৃষ্টিগত বা স্বভাবজ হয়, তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দায়িত্ব হয়ে যায় অনিবার্য। হিকমত দান করার পর যেমন তা গ্রহণ করা অনিবার্য, তেমনি এর জন্য কৃতজ্ঞতা জানানোও অবধারিত।

ভাবার্থে 'হিকমত'কে কৃতজ্ঞতা বলা সিদ্ধ। আর দানের জন্য যথাকৃতজ্ঞ হওয়া অবশ্য কর্তব্য। কারণ অবধারণ এর স্থলে অবধারিত এবং অবধারিত এর স্থলে অবধারণ মর্মগ্রহণ ব্যকরণসিদ্ধ।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থঃ 'শোকর' অর্থ দাতার দানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আর 'কুফর' অর্থ অকৃতজ্ঞ হওয়া, দাতার দান গোপন করা। 'কামুস' রচয়িতা লিখেছেন, 'শোকর' অর্থ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। কারো কারো ধারণা শব্দটির মূলরূপ ছিলো 'কোশর'। অক্ষরের অগ্রপশ্চাত করে ওই শব্দটিই হয়েছে 'শোকর'। 'কোশর' অর্থ উন্মোচন করা, উদঘাটন করা। তদ্রূপ 'শোকর' অর্থও নেয়ামতের প্রকাশন। শোকর ত্রিবিধ— ১. চিত্তে ধারণ করা ২. নেয়ামত দাতার স্তুতি বর্ণনা করা এবং ৩. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আনুগত্য প্রকাশ করা।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'শোকর' শব্দটির উৎসারণ ঘটেছে 'আইনুন শাকিরুন' প্রবাদ বাক্যটি থেকে। প্রবাদ বাক্যটির অর্থ সলিলধারিণী নির্ঝরিণী। এমতাবস্থায় 'শোকর' শব্দটির অর্থ দাঁড়ায়— দাতার দানকে স্মরণমুখর করা। একারণেই এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ওয়াক্বলিলুম মিন ইবাদিয়াশ্‌ শাকুর' (আমার

দাসগণের অতি অল্পসংখ্যকই কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী)। তাছাড়া আল্লাহ্পাক মহাগ্রন্থ কোরআনে তাঁর দু'জন বিশেষ বান্দাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বলেছেন। তাঁরা হচ্ছেন নবী ইব্রাহিম এবং নবী নূহ। প্রথম জন সম্পর্কে বলেছেন— 'শাকিরাল লি আনউমিহী' (তাঁর দানসমূহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী) এবং দ্বিতীয়জন সম্পর্কে বলেছেন 'ইননাহু কানা আবদান শাকুরা' (অবশ্যই তিনি ছিলেন কৃতজ্ঞ সেবক)।

আল্লামা জাযারী বলেছেন, দানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হতে পারে বাচনিকভাবে, আবার আনুষ্ঠানিকভাবেও। কখনো তা হয় আন্তরিক, কখনো আক্ষরিক। মুখের কথায় দাতার গুণগান করা প্রয়োজন। আবার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা ফুটিয়ে তোলা উচিত কৃতজ্ঞতা বোধকে। তদুপরি হৃদয়ে এই বিশ্বাসটিও দৃঢ়বদ্ধ করা আবশ্যিক যে, নেয়ামতদাতাই আমার একমাত্র অভিভাবক।

এরপর বলা হয়েছে— 'যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তো তা করে নিজেরই জন্য'। একথার অর্থ— যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে অনুদানসম্ভার থাকে সুরক্ষিত। খুলে যায় অতিরিক্ত উপহারের দুয়ার। অবধারিত হয়ে পড়ে আল্লাহ্র সামীপ্য ও জান্নাত। এ বিষয়টি স্পষ্ট করে বলা হয়েছে অন্য এক আয়াতে এভাবে— 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি দান করবো আরো অতিরিক্ত'।

শেষে বলা হয়েছে—'এবং কেউ অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ্ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ'। এ কথার অর্থ— কেউ যদি আল্লাহ্র দানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে, তবে যথাকর্তব্যে অবহেলার দায়িত্ব আপতিত হয় তার উপরেই। আল্লাহ্ কারো কৃতজ্ঞতার মুখাপেক্ষী নন। এমনিতেই তিনি চিরপ্রশংসিত। এই বিশাল সৃষ্টির সকলেই এবং সকলকিছুই তাঁর প্রশংসায় সততমুখর।

সূরা লোকমান ঃ আয়াত ১৩, ১৪, ১৫

وَ اِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّ فِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ؕ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ ﴿١٤﴾ وَ اِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۙ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۫ وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ۚ ثُمَّ اِلَيَّ

مَرۡجِعُكُمۡ فَاُنَبِّئُكُمۡ بِمَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۵﴾

r স্মরণ কর, যখন লুকমান উপদেশাচ্ছলে তাহার পুত্রকে বলিয়াছিল, 'হে বৎস! আল্লাহ্‌র কোন শরীক করিও না। নিশ্চয় শির্‌ক চরম জুলুম।'

r আমি তো মানুষকে তাহার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়াছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করিয়া গর্ভে ধারণ করে এবং তাহার দুধ ছাড়ান হয় দুই বৎসরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।

r তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাইতে যে-বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নাই, তুমি তাহাদের কথা মানিও না, তবে পৃথিবীতে তাহাদের সহিত বসবাস করিবে সদ্‌ভাবে এবং যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখী হইয়াছে তাহার পথ অবলম্বন কর, অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট এবং তোমরা যাহা করিতে সে বিষয়ে আমি তোমাদিগকে অবহিত করিব।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! স্মরণ করুন ওই সময়ের কথা, যখন লোকমান তাঁর আত্মজকে এই মর্মে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, প্রিয় পুত্র! আল্লাহ্‌র কোনো অংশীদার সাব্যস্ত কোরো না। নিশ্চয় অংশীবাদিতা হচ্ছে চরমতম অপরাধ।

হজরত লোকমানের পুত্রের নাম ছিলো আজআম, অথবা আশকাম, কিংবা মাছাম। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, লোকমানতনয় ছিলো অংশীবাদী। পরে পিতার সদুপদেশ শুনে সে ইমানদার হয়ে যায়।

'জুলুম' অর্থ অপাত্রে স্থাপন, এমতো অন্যায় অল্প-বিস্তর যেরকমই হোক না কেনো। আধার বা সময়ের হেরফের করাও জুলুম। আবার কিঞ্চিদধিক সত্যের সীমাতিক্রমও জুলুম পদবাচ্য। একারণেই ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল পাপকেই 'জুলুম' বলা হয়। আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্য কাউকে অথবা কোনোকিছুকে উপাস্য স্থির করার অর্থ অযথার্থ উপাসনা করা, যা নিঃসন্দেহে জুলুম। এখানেও আল্লাহর ইবাদতের সঙ্গে অন্যের ইবাদত শরীক করাকে তাই বলা হয়েছে 'ইন্‌নাশ শিরকা লাজুলমুন আ'জীম' (নিশ্চয় শিরিক চরমতম জুলুম)।

পরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'আমি তো মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি'। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতের প্রসঙ্গ ভিন্ন। হজরত লোকমানের প্রসঙ্গ এখানে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়।

যা হোক, এরপর বলা হয়েছে— 'জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে'। এখানে বিশেষভাবে বলা হয়েছে মায়ের বিশেষ অধিকারের

কথা। গর্ভধারণের কষ্টই মায়েদের প্রধানতম কষ্ট। তাই এখানে সেদিকে বিশেষভাবে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, একদিন আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! পৃথিবীতে আমার উপরে সবচেয়ে বেশী অধিকার কার? তিনি স. বললেন, মায়ের। এরকম বললেন তিনি তিনবার। চতুর্থবার বললেন, পিতার। এরপর বললেন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার যথাক্রম অনুসারে। বোখারী, মুসলিম। হজরত মুগীরা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের জন্য জননীর অনানুগত্যকে করা হয়েছে নিষিদ্ধ। বোখারী, মুসলিম।

এখানে 'ওয়াহ্নান আ'লা ওয়াহ্নিন' অর্থ কাঠিন্যের উপরে কাঠিন্য। হজরত ইবনে আব্বাস এরকম বলেছেন। আর মুজাহিদ বলেছেন, এর অর্থ কষ্টের পর কষ্ট। গর্ভধারণ রমণীদেহে আনে দ্রৌর্বল্য, তদুপরি গর্ভ তার জন্য হয়ে ওঠে দুর্ভার। সন্তান প্রসবকালেও ভোগ করতে হয় অতিরিক্ত রজঃস্রাবজনিত ক্লেশ ও দুগ্ধপান করানোর মতো বলক্ষয়তা।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বৎসরে'। আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ প্রমাণ করেন যে, শিশুর দুগ্ধপানের সময়সীমা দুই বৎসর। আমি এ প্রসঙ্গে সবিস্তার আলোচনা উপস্থাপন করেছি সুরা বাকারার তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও'। আলোচ্য বাক্যের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেছেন, যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করলো, সে আদায় করলো আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা এবং যে নামাজ শেষে পিতা-মাতার জন্য দোয়া করলো, সে আদায় করলো পিতামাতার কৃতজ্ঞতা।

শেষে বলা হয়েছে— 'প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট'। একথার অর্থ— একসময় আপনাপন কর্মের জবাবদিহিতার জন্য সকলকে আমার সকাশে উপস্থিত হতেই হবে। তখনই আমি তাদেরকে দিবো যথাপ্রতিফল। কৃতজ্ঞদেরকে জান্নাত এবং অকৃতজ্ঞদেরকে জাহান্নাম।

এরপরের আয়াতে (১৫) বল হয়েছে— 'তোমার পিতামাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা মেনো না'।

এখানে 'লাইসা লাকা বিহী ই'লম' অর্থ যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই। অর্থাৎ হে আমার রসুল! আল্লাহ্র সঙ্গে শিরিক করার বিষয়টি যেহেতু প্রামাণ্য নয়, আপনার কাছেও যখন শিরিকের স্বপক্ষে কোনো জ্ঞান ও প্রমাণ অনুপস্থিত, তখন পিতামাতাও যদি আপনাকে শিরিক করতে বলে, তবে আপনি তাদেরকে অমান্য করবেন। কারণ একথা সুপ্রমাণিত ও সুস্পষ্ট যে, শিরিক অগ্রাহ্য, পরিত্যক্ত ও মিথ্যা। মনে রাখবেন আল্লাহ্র অধিকারই সর্বাগ্রগণ্য।

রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, সৃষ্টির আদেশ পালন করতে গিয়ে স্রষ্টার অবাধ্য হয়ো না। ইমরান ও হাকেম ইবনে আমর গিফারী সূত্রে এরকম বর্ণনা করেছেন আহমদ ও হাকেম। হাকেম বলেছেন, বর্ণনাটি শুদ্ধসূত্রসম্বলিত। হজরত আলী থেকেও এরকম বর্ণনা করেছেন বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসাঈ।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবে পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে বসবাস করবে সদ্ভাবে'। একথার অর্থ— তাদের সঙ্গে পৃথিবীতে প্রদর্শন করতে হবে সদাচরণ, যেমন সদাচরণ শরিয়তসমর্থিত।

মাসআলা ঃ আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, পিতা-মাতা যদি কাফের ও দরিদ্র হয়, তবে তাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ না করা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা সন্তানের জন্য ওয়াজিব।

হজরত আবু বকর তনয়া আসমা বর্ণনা করেছেন, একদিন আমার কাছে এলেন আমার পিতামহী। তখন তিনি ছিলেন পৌত্তলিক। আমি তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য টের পেয়ে রসুল স. সকাশে উপস্থিত হলাম। বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার পিতামহী আর্থিক সাহায্যলাভের উদ্দেশ্যে আমার কাছে এসেছেন। তিনি তো মুসলমান নন। আমি কি তাঁকে অর্থ সাহায্য করতে পারবো? তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে পারবো? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখো। বোখারী, মুসলিম। সুরা আনকাবুতের তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে, এখানকার ১৪ এবং ১৫ সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ এবং তাঁর জননী সম্পর্কে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে, তার পথ অবলম্বন করো'। এখানে 'সাবীল' অর্থ পথ, দ্বীন, ধর্ম, বিধান। আর 'মান আনাবা ইলাইয়া' (যে বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহ্ অভিমুখী হয়েছে) বলে বুঝানো হয়েছে রসুল স. এবং তাঁর প্রিয়ভাজন সহচরবৃন্দকে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'যে আল্লাহ্ অভিমুখী হয়েছে' বলে বুঝানো হয়েছে হজরত আবু বকর সিদ্দীককে। ঘটনাটি ছিলো এরকম— হজরত আবু বকরের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ পেয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন হজরত ওসমান, তালহা, যোবায়ের, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ ও আবদুর রহমান ইবনে আউফ। বললেন, আপনি কি ওই ব্যক্তির উপরে ইমান এনেছেন, যিনি নিজেকে রসুল বলে দাবি করছেন? আপনি কি মনে করেন তিনি সত্য রসুল? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি সত্য রসুল। তোমরাও তাঁর উপর ইমান আনো। এরপর তিনি তাঁদের সকলকে নিয়ে উপস্থিত হলেন রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে। সকলে অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করলেন ইসলাম। তাঁরাই ছিলেন ইসলাম গ্রহণের পুরোধা। আর তাঁরা এরকম হতে পেরেছিলেন

হজরত আবু বকরের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে। তাঁর এমতো অবদানকে লক্ষ্য করেই এখানে তাঁর দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে...।

মাসআলা ঃ পিতা-মাতা যদি কোনো ফরজ দায়িত্ব পালন করতে নিষেধ করেন, অথবা কোনো হারাম কাজ করতে বলেন, তবে তা মানা যাবে না। আল্লাহ্পাকের নির্দেশের বিরুদ্ধে অন্য কারো নির্দেশ কার্যকর করার নামই শিরিক। ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদিসেও একথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। তবে পিতামাতা যদি কোনো শরিয়তসিদ্ধ কর্মের নির্দেশ দেন, তবে তা পালন করা দূষণীয় নয়। বরং ক্ষেত্রবিশেষে পিতামাতার এমতো হুকুম পালন করা অত্যাবশ্যক।

পিতা-মাতা যদি অধিক জিকির আজকার ও নফল ইবাদতে বাধা দেন, অথবা দেন সাধ্যাতীত উপার্জনের আদেশ, তবে সে আদেশ কি অবশ্যপালনীয়? আমি বলি, এ ধরনের আদেশ পালন ওয়াজিব নয়। কারণ আলোচ্য আয়াতেই দেওয়া হয়েছে যারা বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহ্ অভিমুখী হয়, তাদের পথে চলার নির্দেশ। আর আল্লাহ্ অভিমুখী যাঁরা, তাঁরা হন ইবাদতপ্রিয় ও পৃথিবীপ্রসক্তিহীন। সাহাবীগণ এরকমই ছিলেন। আল্লাহ্র নৈকট্য ও ভালোবাসাই ছিলো তাঁদের একমাত্র কাম্য। আর একারণেই তাঁরা পরিত্যাগ করেছিলেন স্বদেশ, স্বজন ও সম্পদ। অকাতরে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন আল্লাহ্র পথে। এরকমই দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে অন্য এক আয়াতে এভাবে— 'হে আমার নবী! আপনি বিশ্বাসীদেরকে জানিয়ে দিন, তোমাদের পিতামাতা, সন্তান-সন্তুতি, সহধর্মিণী ও আত্মীয়স্বজন, তোমাদের উপার্জিত সম্পদ, বাণিজ্যসম্ভার, যা বিনষ্ট হওয়ার আশংকায় তোমরা সশংকিত থাকো, তোমাদের বসতবাটি, যেগুলোর প্রতি তোমরা সতত প্রসক্ত, এসকলকিছু যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পথে সংগ্রামের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, তবে অপেক্ষা করো, আল্লাহ্ অতিসত্বর তাঁর বিধান নিয়ে আগমন করছেন'। এই আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করার লক্ষ্যে সকলকিছু পরিত্যাগ করা কেবল সিদ্ধই নয়, বরং অত্যাবশ্যক। সুতরাং পিতামাতার নির্দেশে ইবাদত বন্দেগী পরিত্যাগ করা সিদ্ধ হবে কীভাবে?

আমের ইবনে আবদুল্লাহ্র মাধ্যমে হাকেম বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, একবার হজরত আবু বকরের পিতা আবু কোহাফা তাঁকে বললেন, শুনলাম তুমি নাকি দুর্বল ক্রীতদাসদেরকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিচ্ছো। দাসমুক্ত যদি করতেই হয়, তবে সবল ক্রীতদাস মুক্ত করছো না কেনো? তারা তোমার সহায়তা করতে পারতো, যুদ্ধ বিগ্রহের সময় দাঁড়াতো তোমার সপক্ষে। হজরত আবু বকর বললেন, পিতা! আমি তো ওই পুণ্যরাজির আশা করি, যা সংরক্ষিত রয়েছে আমার আল্লাহ্র নিকট। তাঁর এমতো কথার প্রেক্ষিতে

অবতীর্ণ হলো 'আর অচিরেই এ থেকে দূরে রাখা হবে আল্লাহ্‌ভীরু ব্যক্তিকে, যে তার ধনসম্পদ ব্যয় করে আল্লাহ্‌র সন্তোষ কামনায়'। ঘটনাটি ঘটেছিলো তখন, যখন হজরত বেলাল, হজরত আমের ইবনে ফুহাইরা, হজরত উম্মে উমাইস, হজরত যোবায়ের প্রমুখকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন হজরত আবু বকর। আবার হিজরতকালে তিনি রসুল স. এর সহযাত্রী হয়েছিলেন চার হাজার স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে নিয়ে। পরিবার পরিজনের জন্য কোনো অর্থ সম্পদ রেখে যাননি। তাঁর এমতো কর্ম ছিলো তাঁর পিতার ইচ্ছাবিরুদ্ধ। সুরা তওবার তাফসীরে আমি এব্যাপারে সবিস্তার আলোচনা করেছি। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট এবং তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করবো'। একথার অর্থ— তোমরা যা কিছুই করো না কেনো, নিশ্চিত জেনো, মহাবিচারের দিবসে তোমাদেরকে আমার কাছে জবাবদিহি করতেই হবে। তখন তোমরা পৃথিবীতে যা করতে, তার যথাপ্রতিফল আমি দিবো। ইসলাম গ্রহণের পুরস্কার যেমন দিবো, তেমনি দিবো পিতামাতার অবাধ্যতার শাস্তি ।

সূরা লোকমান ঃ আয়াত ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

يٰبُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿۱۶﴾ يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿۱۷﴾ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ﴿۱۸﴾ وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ؕ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ﴿۱۹﴾

r 'হে বৎস! ক্ষুদ্র বস্তুটি যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং উহা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নীচে, আল্লাহ্‌ তাহাও উপস্থিত করিবেন। আল্লাহ্‌ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।

r ‘হে বৎস! সালাত কায়েম করিও, সৎকর্মের নির্দেশ দিও আর অসৎ কর্মে নিষেধ করিও এবং আপদে বিপদে ধৈর্য ধারণ করিও। ইহাইতো দৃঢ়সংকল্পের কাজ।

r অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করিও না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করিও না; নিশ্চয় আল্লাহ্ কোনো উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

r ‘তুমি পদক্ষেপ করিও সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু করিও; নিশ্চয় সুরের মধ্যে গর্দভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।’

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত লোকমানের পুত্র তাঁর পিতার সদুপদেশ শুনে বললো, হে পিতা! আমি অতি সঙ্গোপনে যদি কোনো পাপকর্ম করি, তাহলে আল্লাহ্তায়ালা তা জানবেন কীভাবে? তখন হজরত লোকমান বললেন, হে বৎস! আল্লাহ্র কাছে কোনো কিছুই গোপন নয়। অতি ক্ষুদ্র পাপ অথবা পুণ্য সকল কিছুই তাঁর জানা, যদিও সে পাপ অথবা পুণ্য থাকে প্রস্তরাভ্যন্তরে, অথবা অতি দূরবর্তী আকাশে, কিংবা ভূগর্ভে। মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্তায়ালা ওই সরিষাদানাবৎ পাপও উপস্থিত করবেন। নিঃসন্দেহে তিনি সুক্ষ্মদর্শী এবং সকলকিছুই তাঁর জ্ঞানায়ত্ত।

এখানে ‘ইন্নাহা’ বলে বুঝানো হয়েছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পাপ-পুণ্য উভয়কে। কাতাদা বলেছেন, এখানে ‘ইন্নাহা’ এর ‘হা’ সর্বনামটি সম্পর্কযুক্ত হবে একটি উহ্য শব্দ ‘খাত্বা’ (পাপ) এর সঙ্গে। কারণ হজরত লোকমানের পুত্র বলেছিলো, আমি যদি অতি গোপনে পাপ করি, তবে আল্লাহ্ জানবেন কীভাবে? আলোচ্য আয়াত তার ওই কথারই প্রত্যুত্তর।

‘হাব্বাতিম মিন খরদালিন’ অর্থ ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ বস্তু। আর ‘তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নিচে’। কথাটির অর্থ— ওই তুচ্ছাতিতুচ্ছ পাপ যদি থাকে সুসংরক্ষিত কোনো অদৃশ্য স্থানে, যেমন প্রস্তরগর্ভে, অথবা আকাশের দুর্নিরিক্ষ্য ঠিকানায় কিংবা মৃত্তিকাভ্যন্তরে।

কাতাদা বলেছেন, এখানে ‘সাখরাহ’ অর্থ পাহাড়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে ‘সাখরাহ’ বলে বুঝানো হয়েছে ওই পাথরকে যা সন্নিবেশিত রয়েছে মৃত্তিকার সপ্তস্তরের নিচে। ওই প্রস্তরবক্ষেই জমা হয় অবিশ্বাসী ও দুর্বৃত্তদের কৃতকর্মের প্রতিক্রিয়া। আকাশের নীল আভা ওই অপপ্রতিক্রিয়ারই প্রতিবিম্ব। সুদ্দী বলেছেন, আল্লাহ্ ভূমণ্ডলকে স্থাপন করেছেন একটি প্রকাণ্ড মৎস্যের পৃষ্ঠদেশে। কোরআন মজীদে ওই মৎস্যকেই বলা হয়েছে ‘নূন’। যেমন— ‘নূন’ ওয়াল ক্বলামি ওয়া মা ইয়াসতুরূন’ (নুন এবং শপথ ওই কলমের এবং সেই বিষয়ের যা তারা লিপিবদ্ধ করে)। মৎস্যটির অবস্থিতি পানির অভ্যন্তরে সুবৃহৎ এক পাথরের উপর। আর ওই পাথরটি রয়েছে এক বৃহদাকার ফেরেশতার পৃষ্ঠদেশে। ওই ফেরেশতা দণ্ডায়মান রয়েছে আর একটি পাথরের উপর। এই পাথরের কথাই হজরত

লোকমান উল্লেখ করেছেন তাঁর আলোচ্য উপদেশ বাক্যে। বলেছেন— তা যদি থাকে শিলাগর্ভে। এই পাথরটি পৃথিবীসম্পৃক্ত যেমন নয়, তেমনি নয় আকাশসংযুক্ত। বরং তা অবস্থিত বায়বীয় ভিত্তির উপর।

আর এখানকার 'ইয়া'তি বিহাল্লহ্' অর্থ আল্লাহ্ তা-ও সর্বসমক্ষে উপস্থিত করবেন মহাবিচারের সময়। অর্থাৎ ওই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ও সংগুপ্ত পাপ-পুণ্যও আনা হবে বিচারের আওতায়।

'আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত' অর্থ সূক্ষ্মাতিতসূক্ষ্ম বিষয়ও আল্লাহ্র জ্ঞান ও দর্শনের আওতাভূত। তাঁর অবলোকন ও অবহিতির অতীত কোনো কিছুই নেই। হাসান বলেছেন, কথাটির অর্থ— তাঁর অবগতি ও দর্শনক্ষমতা প্রতিটি বস্তুকে করে রেখেছে সতত বেষ্টিত। বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য বাক্যটিই ছিলো হজরত লোকমানের শেষ বাক্য। অর্থাৎ কথাটির উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বিদীর্ণ হয়েছিলো তাঁর হৃৎপিণ্ড এবং সেই মুহূর্তেই তিনি যাত্রা করেছিলেন পরপারে।

পরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'হে বৎস! সালাত কায়েম কোরো, সৎকর্মের নির্দেশ দিয়ো আর অসৎকর্মে নিষেধ কোরো'। একথার অর্থ— হজরত লোকমান পুনঃউপদেশ দিলেন, হে প্রিয়পুত্র! আত্মসংশোধনার্থে নামাজ প্রতিষ্ঠা কোরো এবং অপরের সংশোধনার্থে দিয়ো উপদেশ— সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আপদে বিপদে ধৈর্য ধারণ কোরো'। একথার অর্থ অন্যের সংশোধনদায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তুমি যদি বৈরীতার সম্মুখীন হও, অথবা পতিত হও দুঃখক্লেশে, তবে ধৈর্য অবলম্বন কোরো, আপন সংকল্পে থেকো অটল।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটাই তো দৃঢ়সংকল্পের কাজ'। একথার অর্থ— আল্লাহ্র আদেশ নিষেধ প্রচারে সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ একটি অতি আবশ্যকীয় কর্ম, যেমন অত্যাবশ্যক করা হয়েছে অন্যান্য ফরজ ও ওয়াজিব দায়িত্বকে। রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ যে কাজ অপরিহার্য করে দিয়েছেন, সে কাজই সর্বোত্তম। অভিধানবেত্তাগণ লিখেছেন, কোনো কর্মের সুদৃঢ় অভিপ্রায়কে বলে 'আ'যম'। এ ব্যাখ্যার আলোকে ধাতুমূল 'আ'যম' এর অর্থ হবে কর্মপদরূপ 'মা'যুম'। অর্থাৎ দৃঢ় সংকল্প বা দৃঢ় পদক্ষেপ।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা কোরো না'। একথার অর্থ— মানুষের নিকট আল্লাহ্র আদেশ নিষেধ বর্ণনা করতে গিয়ে যদি তাদের অশোভন ও ক্লেশকর আচরণের সম্মুখীন হও, তবুও তাদের প্রতি বিমুখ হয়ো না। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন— মানুষ তোমার উদ্দেশ্য ও কর্মকাণ্ডকে ভুল বুঝবে, বিতণ্ডা করবে, তবুও তাদেরকে পাপী বলে তুচ্ছ ভেবো না এবং নিজেকে পুণ্যবান মনে করে হয়ো না গর্বিত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ কোরো না, নিশ্চয় আল্লাহ্ কোনো উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না'। এখানে 'মুখতাল' অর্থ ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারী এবং 'ফাখুর' অর্থ অহংকারী।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'তুমি পদক্ষেপ কোরো সংযতভাবে'। একথার অর্থ— এমন দাপটের সঙ্গে পথ চোলো না, যাতে মনে হয় তুমি অহংকারী, আবার পদবিক্ষেপকে কোরো না এমন চঞ্চল, যাতে মনে হতে পারে তুমি ব্যক্তিত্বহীন। অর্থাৎ অবলম্বন কোরো এমন সংযম, যাতে মনে হয়, তুমি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, অথচ নির্দাম্ভিক। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, চঞ্চল পদচারণা বিশ্বাসীদের জন্য মর্যাদা হানিকর। হাদিসটি উল্লেখ করেছেন ইবনে আদী এবং 'হুলিয়া' গ্রন্থে আবু নাঈম। উল্লেখ্য, এখানে নিন্দা করা হয়েছে অস্বাভাবিক দ্রুত পদচারণার। স্বাভাবিক দ্রুত পদচারণা কিন্তু নিন্দনীয় নয়। বরং তা মোস্তাহাব।

ইবনে সা'দের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইয়াজিদ ইবনে মারছাদ বলেছেন, রসুল স. এর স্বাভাবিক চলাও আমাদের কাছে মনে হতো দ্রুত। তাঁর সঙ্গ বজায় রাখতে আমাদেরকে চলতে হতো দ্রুতই। হজরত আবু মুসা আশয়ারী থেকে তিবরানী ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পদবিক্ষেপকে সংযত কোরো। জানাযাযাত্রায় বজায় রেখো মধ্যম গতি। বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থষষ্ঠকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, জানাযা বহন কোরো ত্বরিত গতিতে। মৃত ব্যক্তি যদি পুণ্যবান হয়, তবে তাকে দ্রুত আস্বাদন করতে দাও সাফল্যের স্বাদ। আর পাপী হলে দ্রুত মুক্ত হও তার বহন কর্ম থেকে। এই সকল হাদিসের প্রেক্ষিতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, অভ্যস্ত দ্রুত পদবিক্ষেপ দূষণীয় নয়। এখানে উল্লেখিত হয়েছে 'ক্বসদ' শব্দটি। এর অর্থ দৌড় নয়, আবার মন্থর গতিও নয়। অর্থাৎ ত্বরা ও মন্থরতার মাঝামাঝি।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমার কণ্ঠস্বরকে নিচু কোরো; নিশ্চয় স্বরের মধ্যে গর্দভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর'। মুকাতিল বলেছেন, 'ওয়াগদুদ্ব' অর্থ নিম্নগ্রাসের স্বর। গাধার আওয়াজ ঠিক এর উল্টো— উগ্র, উৎকট ও অশোভন। উল্লেখ্য দোজখীদের গলার আওয়াজ হবে গাধার আওয়াজের মতো শ্রুতিকটু। প্রথমাবস্থায় হবে 'যফীর' এবং পরিশেষে হবে 'শহীক্ব'। অর্থাৎ প্রথমে তারা চিৎকার করবে গাধার মতো। তারপর তাদের কণ্ঠ থেকে উত্থিত হবে গোঁঙানি। সুফিয়ান সওরী বলেছেন, শব্দটির অর্থ হবে— শ্রুতিপীড়াদায়ক কুৎসিত কণ্ঠস্বর। ওয়াহাব বলেছেন, হজরত লোকমান তাঁর আপনভাষায় উন্মোচন করেছেন প্রজ্ঞার বারো হাজার তোরণ। অর্থাৎ তিনি রেখে গিয়েছেন বারো হাজার প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী। পরবর্তী যুগের মানুষ সেগুলোকেই তাদের প্রবাদের ও প্রবচনের অঙ্গীভূত করে নিয়েছে।

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَ
اَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّ بَاطِنَةً ؕ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ
يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ لَا هُدًى وَّ لَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ﴿۲۰﴾ وَ اِذَا
قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ
اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿۲۱﴾
وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗۤ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ؕ وَ اِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿۲۲﴾ وَ مَنْ كَفَرَ فَلَا
يَحْزُنْكَ كُفْرُهٗ ؕ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ
عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۲۳﴾ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى
عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿۲۴﴾

r তোমরা কি দেখ না, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁহার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিয়াছেন? মানুষের মধ্যে কেহ কেহ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, তাহাদের না আছে পথ-নির্দেশক আর না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব।

r উহাদিগকে যখন বলা হয়, 'আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহা অনুসরণ কর।' উহারা বলে 'বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যাহাতে পাইয়াছি তাহারই অনুসরণ করিব।' শয়তান যদি উহাদিগকে জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তির দিকে আহ্বান করে, তবুও কি?

r যে কেহ আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয় সে তো দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এক মযবুত হাতল, যাবতীয় কার্যের পরিণাম আল্লাহ্র ইখ্তিয়ারে।

r আর কেহ কুফরী করিলে তাহার কুফরী যেন তোমাকে ক্লিষ্ট না করে। আমারই নিকট উহাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি উহাদিগকে অবহিত করিব উহারা যাহা করিত। অন্তরে যাহা রহিয়াছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

r আমি উহাদিগকে জীবনোপকরণ ভোগ করিতে দিব স্বল্পকালের জন্য। অতঃপর উহাদিগকে কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য করিব।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমরা কি দ্যাখো না, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন'। এখানে আকাশস্থিত কল্যাণপ্রদায়ক বস্তুগুলো হচ্ছে— চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা ও মেঘপুঞ্জ। আর পৃথিবীর কল্যাণকর বস্তুগুলো হচ্ছে উদ্ভিদকুল, প্রাণীকুল, সমুদ্র, নদী, পাহাড়-পর্বত ও খনিজ সম্পদ। মানুষ এসমস্তকিছু থেকে সুফল লাভ করে সরাসরি অথবা কোনো মাধ্যম সহযোগে, আবিষ্কার, উদ্ভাবনা ইত্যাদির দ্বারা।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন।' এখানে প্রকাশ্য অনুগ্রহ হচ্ছে— ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুগ্রহসম্ভার। যেমন সুঠাম শরীর, সৌন্দর্য, রিজিক, দৈহিক সুস্থতা ইত্যাদি। শত্রুর উপর বিজয়দানও প্রকাশ্য অনুগ্রহ। তেমনি রসুল, কোরআন ও ইসলাম প্রাপ্তিও প্রকাশ্য নেয়ামত। শরিয়তের নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাসমূহ দুর্বহ অথবা অবহ না হওয়াও প্রকাশ্য অনুগ্রহ পদবাচ্য। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মের উপরে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাও প্রকাশ্য অনুগ্রহের অন্তর্গত।

আর অপ্রকাশ্য অনুগ্রহসম্ভারের মধ্যে রয়েছে— আত্ম-বিবেক, ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান, উদার অন্তঃকরণ, সত্যান্বেষণ, সদ্বিশ্বাস, তওবার সুযোগ, ফেরেশতাদের সহায়তা, আল্লাহ্প্রেম, রসুলপ্রেম, শাফায়াতের শুভসংবাদ, মারেফত ইত্যাদি।

এরপর বলা হয়েছে— 'মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, তাদের না আছে পথনির্দেশক, না আছে কোনো দীপ্তিমান কিতাব'। এখানে 'বিতণ্ডা করে' অর্থ তারা বিতণ্ডা করে আল্লাহ্র রসুলের সঙ্গে। 'আল্লাহ্ সম্বন্ধে' অর্থ আল্লাহ্র সত্তা ও গুণবত্তা সম্পর্কে। 'অজ্ঞতাবশত' অর্থ নির্ভরযোগ্য জ্ঞান ও প্রমাণ ব্যতিরেকে। 'না আছে পথনির্দেশক' অর্থ তাদের না আছে কোনো পথপ্রদর্শক রসুল এবং 'না আছে কোনো দীপ্তিমান কিতাব' অর্থ তাদের নেই কোনো নভজ মহাগ্রন্থও। অর্থাৎ তারা বিতণ্ডা করে স্বকপোলকল্পিত ধারণার উপরে ভিত্তি করে, পথনির্দেশক নবী এবং প্রত্যাদেশিত গ্রন্থের সমর্থন ব্যতিরেকেই।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে নজর ইবনে হারেছ ও উবাই ইবনে খাল্‌ফকে উদ্দেশ্য করে।

পরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তা অনুসরণ করো। তারা বলে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে যাতে পেয়েছি তারই অনুসরণ করবো'। একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে যখন বলা হয়, আনুগত্য করো আল্লাহ্‌র বিধানের, তখন তারা জবাব দেয়, না, আমরা তো আনুগত্য করবো আমাদের পিতৃপুরুষদের আচরিত ধর্মের। আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহে অন্য কারো আনুগত্য নিষিদ্ধ। তবে ধর্মের শাখা প্রশাখাগত বিষয়ে অন্যেরগবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা যায়।

এরপর বলা হয়েছে— 'শয়তান যদি তাদেরকে জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তির দিকে আহ্বান করে, তবুও কী'? একথার অর্থ— তারা বলে, কী? শয়তান যদি তাদের পূর্বপুরুষদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে গিয়ে থাকে, তবুও কি তারা তাদের অনুসারী হবে? এখানে 'জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তির দিকে আহ্বান করে' অর্থ, শয়তান তাদেরকে প্ররোচিত করে শিরিক ও সীমালংঘনের দিকে। উল্লেখ্য, আলোচ্য প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক।

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'যে কেউ আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয়, সে তো দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এক মজবুত হাতল, যাবতীয় কার্যের পরিণাম আল্লাহ্‌র এখতিয়ারে'।

এখানে 'মাই ইয়ুসলিম ওয়াজ্‌হাহু' অর্থ যে আল্লাহ্‌র প্রতি সতত একাগ্র, একনিষ্ঠ ও আন্তরিক, সমর্পিত, যার সকল চিন্তা ও কার্যক্রম আবর্তিত হয় কেবল আল্লাহ্‌র পরিতোষকামনাকে কেন্দ্র করে। 'ওয়াহুয়া মুহসিন' অর্থ সে সৎকর্ম পরায়ণ। রসুল স. বলেছেন, 'ইহসান' হচ্ছে— এমনভাবে ইবাদত করো, যেনো তুমি আল্লাহ্‌কে দেখছো, অথবা মনে করো, তিনি তো তোমাকে দেখছেন। অর্থাৎ সৎকর্মপরায়ণ হওয়ার অর্থ নিবিষ্টচিত্তে ইবাদতমগ্ন হওয়া। 'ফাক্বাদিস্‌তামসাকা' অর্থ দৃঢ়ভাবে ধারণ করা। 'উরওয়াতুল উছক্বা' অর্থ মজবুত হাতল বা সুদৃঢ় রজ্জু। অর্থাৎ সে শক্তহাতে ধরেছে সত্যের রজ্জু, এভাবে সত্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়েছে চির অটুট। আর 'যাবতীয় কার্যের পরিণাম আল্লাহ্‌র এখতিয়ারে' অর্থ, সকল কিছুই তাঁর অভিপ্রায়ভূত, সুতরাং মনে রেখো আপনাপন কর্মকাণ্ডের হিসাব দেওয়ার জন্য তোমাদেরকে একদিন তাঁর কাছে ফিরে যেতেই হবে।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'আর যে কেউ কুফরী করলে তার কুফরী যেনো তোমাকে ক্লিষ্ট না করে। আমারই নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তাদেরকে অবহিত করবো তারা যা করতো। অন্তরে যা রয়েছে সে

সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনাকে যে প্রত্যাখ্যান করবে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং আপনি মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না। ভাববেন না যে, তারা আপনার কোনো অনিষ্ট করতে সক্ষম। অপেক্ষা করুন, তাদেরকে তো আমার কাছে ফিরে আসতেই হবে। তখন আমি তাদেরকে ভালো করে বুঝিয়ে দিবো, তাদের অপরাধ কতো ভয়াবহ ও অমার্জনীয়। সকলের ও সকলকিছুর প্রকাশ্য গোপন সবকিছুই আমি জানি। সুতরাং তাদের অপকর্মের প্রতিফল তারা পাবেই।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিবো স্বল্পকালের জন্য। অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তিভোগ করতে বাধ্য করবো'। এখানে 'আ'জাবিন গলীজ' অর্থ গুরু শাস্তি বা কঠিন শাস্তি। ভারী বস্তু যেমন দুর্বহ, তেমনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের উপরে আপতিত শাস্তিও হবে অত্যন্ত গুরুভার, কঠিন।

সূরা লোকমান ঃ আয়াত ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۲۵﴾ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿۲۶﴾ وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّ الْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۷﴾ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿۲۸﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ يُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ۫ كُلٌّ يَّجْرِيْۤ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّ اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۲۹﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَ اَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿۳۰﴾

r তুমি যদি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করিয়াছেন?' উহারা নিশ্চয়ই বলিবে, 'আল্লাহ্।' বল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই', কিন্তু উহাদের অধিকাংশই জানে না।

r আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা আল্লাহ্‌রই; আল্লাহ্, তিনি তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

r পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় আর সমুদ্র হয় কালি এবং ইহার সহিত আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়, তবুও আল্লাহ্‌র বাণী নিঃশেষ হইবে না। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

r তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই অনুরূপ। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা।

r তুমি কি দেখ না আল্লাহ্ রাত্রিকে দিবসে এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত করেন? তিনি চন্দ্র সূর্যকে করিয়াছেন নিয়মাধীন, প্রত্যেকটি বিচরণ করে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত; তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবহিত।

r এইগুলি প্রমাণ যে, আল্লাহ্ই সত্য এবং উহারা তাঁহার পরিবর্তে যাহাকে ডাকে, তাহা মিথ্যা। আল্লাহ্, তিনি তো সমুচ্চ মহান।

প্রথমে বলা হয়েছে— হে আমার রসুল! মহাবিশ্বের সৃজয়িতা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য যে কেউই নয়, তার প্রকাশ্য প্রমাণ রয়েছে ভুরিভুরি, অজস্র, অসংখ্য। তাই অবিশ্বাসীরাও একথা মেনে নিতে বাধ্য হয়। বিষয়টি আপনি না হয় এখনই পরীক্ষা করে দেখুন। তাদেরকে প্রশ্ন করুন, বলো, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন কে? জবাবে তারা নিশ্চয় বলবে, আল্লাহ্। সুতরাং হে আমার প্রিয় রসুল! কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে উচ্চারণ করুন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র । কারণ তিনি আপনার অন্তর ও বাহিরকে করেছেন সত্যের দীপ্তিতে সতত প্রোজ্জ্বল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষকে তিনি করেছেন সত্যবোধবিচ্যুত। তাইতো তারা মুখে আল্লাহ্‌কে সৃষ্টিকর্তা বলে মেনে নিতে বাধ্য হলেও অন্তরে লালন করে অবিশ্বাস।

পরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌রই, আল্লাহ্, তিনি তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ'। একথার অর্থ গগনমণ্ডলে ও ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে, তার সকল কিছুই তাঁর একক মালিকানাধীন। সুতরাং তিনি ব্যতীত উপাস্য হওয়ার অধিকার ও যোগ্যতা অন্য কারো বা কোনোকিছুর নেই। আর তিনি কারো বা কোনোকিছুর মুখাপেক্ষীও নন। তিনি যে চিরঅভাবমুক্ত ও চিরপ্রশংসিত— কেউ তার প্রশংসা করুক অথবা না করুক।

আতা ইবনে ইয়াসারের উক্তিরূপে ইবনে ইসহাক এবং বাগবী বর্ণনা করেছেন, 'ওয়ামা উতিতুম মিনাল ইলমি ইল্লা ক্বলীলা'(তোমাদেরকে অত্যল্প জ্ঞানই দেওয়া

হয়েছে)। এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো রসুল স. এর হিজরতপূর্ব সময়ে মক্কায়। এরপর তিনি স. যখন মদীনায় শুভাগমন করলেন, তখন একদিন একদল ইহুদী পণ্ডিত তাঁর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, আপনি নাকি বলেন 'তোমাদেরকে অত্যল্প জ্ঞান দেওয়া হয়েছে'? একথার লক্ষ্যস্থল কারা? আপনারা না আমরা? তিনি স. বললেন, সমগ্র মানবজাতি। পণ্ডিতেরা বললো, আপনার উপরে যে গ্রন্থ অবতারিত হয়েছে, তাতে কি একথার উল্লেখ নেই যে, আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে তওরাত, যা জ্ঞানের মহাভাণ্ডার? তিনি স. বললেন, আল্লাহ্‌র অসীম জ্ঞানের তুলনায় তওরাতের জ্ঞানও অত্যল্পই। তাঁর একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত (২৭)।

বলা হলো— 'পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় আর সমুদ্র হয় কালি এবং এর সঙ্গে আরো সাত সমুদ্র যুক্ত হয়, তবুও আল্লাহ্‌র বাণী নিঃশেষ হবে না'। একথার অর্থ পৃথিবীর সকল বৃক্ষকে কলম এবং সমুদ্রসমূহের সকল পানিকে কালি বানিয়ে যদি আল্লাহ্‌র জ্ঞানভাণ্ডারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে শুরু করা হয়, তবে দেখা যাবে একসময় কলম-কালি সবকিছু নিঃশেষ হয়েছে, কিন্তু তাঁর জ্ঞান রয়েছে আগের মতোই অনিঃশেষ, অন্তহীন।

এখানে 'ইয়ামুদ্‌দুহু' অর্থ বিদ্যমান সাতসাগরের পানির সঙ্গে যদি যুক্ত করা হয় আরো সাতটি সাগরের পানি এবং সে গুলোকে যদি পরিণত করা হয় কালিতে। দোয়াতে কালি ঢেলে দেয়াকে বলে 'মাদদাদ্‌ দাওয়াত'। একথা থেকেই পরিগঠিত হয়েছে এখানকার 'ইয়ামুদদুহু'। আর এখানকার 'কালিমাতুল্লহ্‌' (আল্লাহ্‌র বাণী) কথাটির মর্মার্থ— আল্লাহ্‌তায়ালার আনুরূপ্যবিহীন অবহিতি, তাঁর জ্ঞানভাণ্ডারের অতুলনীয় পরিসর।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'। একথার অর্থ— আল্লাহ্‌ চিরদুর্জয়, চিরঅজেয়। তাঁর প্রজ্ঞাও অবধিবিহীন, অতুলনীয়রূপে অসীম। কোনোকিছুই তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞাবহির্ভূত নয়।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, ইকরামা বলেছেন, একবার ইহুদীরা রসুল স. সকাশে প্রশ্ন করে বসলো, বলুন, আত্মা কী? তখন অবতীর্ণ হলো 'তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি বলে দিন, রূহ হচ্ছে আমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত একটি আদেশ। আর তোমাদেরকে যে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তা অতি অল্প'। রসুল স. সদ্য অবতীর্ণ এই আয়াত পাঠ করে শোনালেন। তারা বললো, আপনি কি মনে করেন আমরা অত্যল্প জ্ঞানের অধিকারী? কিন্তু আপনি তো জানেনই আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে তওরাত, যা জ্ঞানের মহাআঘার। তাদের এমতো কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। এমতো ব্যাখ্যার আলোকে বলতে হয়, আলোচ্য আয়াতের অবতরণস্থল মদীনা। কিন্তু কেউ কেউ

মনে করেন, এই আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ। আর 'আত্মা কী' এরকম প্রশ্ন রসুল স. এর সম্মুখে উপস্থিত করেছিলো মক্কার মুশরিকেরা। অবশ্য মদীনায় প্রেরিত তাদের দূতকে এরকম প্রশ্ন করার পরামর্শ দিয়েছিলো সেখানকার ইহুদীরাই। মক্কায় কোনো ইহুদীর বসবাস ছিলো না।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, আবু শায়েখ তাঁর কিতাবুল উজমা গ্রন্থে লিখেছেন, মক্কার মুশরিকেরা বলতো, কোরআন অবলুপ্ত হয়ে যাবে অল্পদিনের মধ্যেই। তাদের এমতো অপবচনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

এরপরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই অনুরূপ। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা'। একথার অর্থ— হে মানুষ! ভালো করে জেনে নাও, আল্লাহ্র কর্মপদ্ধতি তোমাদের কর্মপদ্ধতির মতো নয়। তোমরা এক কাজ করার সময় আর এক কাজ স্থগিত রাখতে বাধ্য হও। কিন্তু আল্লাহ্পাক ইচ্ছা করলে এক লহমায় একজন অথবা এক নির্দেশে অসংখ্যজনকে সৃষ্টি করতে সক্ষম। তাঁর অভিপ্রায়, প্রজ্ঞা ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে অগ্রপশ্চাত অথবা পূর্বাপর বলে কিছুই নেই। অসম্ভব বলেও কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। সুতরাং জেনে নাও, তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান তোমাদের যে কোনো একজনের সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের মতো তাঁর আনুরূপ্যবিহীন একই নির্দেশের অধীন। আর তিনি সর্বশ্রোতা এবং সম্যক দ্রষ্টাও। শ্রুতিযোগ্য ও দর্শনযোগ্য সকলকিছুই তাঁর আকারপ্রকারবিহীন শ্রুতি ও দর্শনের অন্তর্ভূত। এ ক্ষেত্রেও পূর্বাপরতা অনুপস্থিত। অর্থাৎ এমতোক্ষেত্রেও তাঁর কোনো এক বিষয়ের জানা শোনা অন্য বিষয়ের জানা শোনার অন্তরায় নয়। উল্লেখ্য, এখানে 'নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা' কথাটির মর্মার্থ হবে— নিশ্চয় আল্লাহ্ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পরকাল অস্বীকৃতিমূলক অপবচনের শ্রোতা এবং তাদের বিশ্বাসবিরোধী কর্মকাণ্ডের দর্শক।

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'তুমি কি দ্যাখো না আল্লাহ্ রাত্রিকে দিবসে এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত করেন? তিনি চন্দ্র-সূর্যকে করেছেন নিয়মাধীন, প্রত্যেকটি বিচরণ করে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত; তোমরা যা করো আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত'। এখানে 'প্রত্যেকটি বিচরণ করে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত' অর্থ চন্দ্র-সূর্যের এই নিয়মিত নভঃপরিক্রমণ চলতে থাকবে মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত।

এরপরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'এইগুলি প্রমাণ যে, আল্লাহ্ই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে, তা মিথ্যা'। একথার অর্থ— এতক্ষণ ধরে আল্লাহ্র আনুরূপ্যবিহীন ও চিরঅপ্রতিদ্বন্দ্বী সত্তা-গুণবত্তা-কর্মকুশলতার যে সকল পরিচয় তুলে ধরা হলো, তার প্রেক্ষিতে একথা মেনে না নিয়ে গত্যন্তর নেই যে,

আল্লাহ্ই সন্দেহাতীতরূপে সত্য, আর অংশীবাদীরা যাদের উপাসনা-অর্চনা করে সেগুলো সর্বৈবরূপে মিথ্যা। সুতরং হে মানুষ! সত্যকে গ্রহণ করো এবং বর্জন করো অসত্যকে।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্, তিনি তো সমুচ্চ, মহান'। একথার অর্থ আল্লাহ্ই উচ্চতম ও মহানতম। সুতরাং তাঁর মহাপ্রতাপের উদ্দেশ্যে পূর্ণ সমর্পিত হওয়া ছাড়া সৃষ্টির অন্য কোনো উপায়ই নেই।

সূরা লোকমান ঃ আয়াত ৩১, ৩২, ৩৩

اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ؕ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿۳۱﴾ وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ
كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۬ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ
فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ؕ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَاۤ اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ ﴿۳۲﴾
يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِيْ وَالِدٌ عَنْ
وَّلَدِهٖ ۫ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ
فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ٚ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ﴿۳۳﴾

r তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহে নৌযানগুলি সমুদ্রে বিচরণ করে, যদ্দ্বারা তিনি তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শনাবলীর কিছু প্রদর্শন করেন? ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

r যখন তরংগ উহাদিগকে আচ্ছন্ন করে মেঘচ্ছায়ার মত তখন উহারা আল্লাহ্কে ডাকে তাঁহার আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া। কিন্তু যখন তিনি উহাদিগকে উদ্ধার করিয়া স্থলে পৌঁছান তখন উহাদের কেহ কেহ সরল পথে থাকে; কেবল বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।

r হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর এবং ভয় কর সেই দিনের যখন পিতা সন্তানের কোন উপকারে আসিবে না, সন্তানও কোন উপকারে আসিবে না তাহার পিতার। আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য, সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদিগকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন তোমাদিগকে কিছুতেই আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তুমি কি লক্ষ্য করো না যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে নৌযানগুলি সমুদ্রে বিচরণ করে, যদ্দ্বারা তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলীর কিছু প্রদর্শন করেন'? একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন আল্লাহ্‌র শক্তিমত্তা ও অনুগ্রহের আর একটি দৃষ্টান্ত। তা হচ্ছে সমুদ্রগামী জলযানগুলোর নিরাপদ বিচরণ। ওগুলোও তো মানুষের বাণিজ্যবেসাতির অন্যতম উপকরণ। আয়-উপার্জনের বিশিষ্ট মাধ্যম।

এখানে 'নি'মাতি' অর্থ আমার অনুগ্রহ, অনুকম্পা, দয়াদাক্ষিণ্য, করুণা, বদান্যতা। 'মিন আয়াতিহি' অর্থ তাঁর নিদর্শনাবলীর কিছু, নিদর্শনাবলীর মধ্য থেকে। এখানকার 'মিন' (থেকে, হতে) অব্যয়টি আংশিক অর্থ প্রকাশক। অর্থাৎ বিশাল নীলাম্বুরাশির উপরে ভাসমান রয়েছে তাঁর কিছু বিস্ময়কর নিদর্শনাবলী ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য'। এখানে 'সব্‌বার' বলে বুঝানো হয়েছে ওই ব্যক্তিকে, যে অন্তর্জগত ও বহির্জগত, আত্মা ও সত্তাসন্নিহিত জ্ঞানের রহস্য উন্মোচনে সতত নিয়োজিত। আর এমতো জ্ঞানান্বেষণের পথে যে সহ্য করে অনেক ক্লেশ ও দুঃখ-যাতনা। আর 'শাকুর' বলে ওই ব্যক্তিকে, যে আল্লাহ্‌তায়ালার অনুকম্পা সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত এবং অনুকম্পাদাতার প্রতি কৃতজ্ঞচিত্ত। অথবা বলা যায় পূর্ণ ইমানদার ব্যক্তিকেই এখানে অভিহিত করা হয়েছে 'সব্‌বারিন্ শাকুর' (ধৈর্যশীল-কৃতজ্ঞ)। কারণ হজরত আনাস থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ইমানের অর্ধাংশ হচ্ছে ধৈর্য এবং অপর অর্ধাংশ কৃতজ্ঞতা।

পরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'যখন তরঙ্গ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে মেঘচ্ছায়ার মতো, তখন তারা আল্লাহ্‌কে ডাকে তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে স্থলে পৌঁছান, তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে থাকে; কেবল বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে'।

এখানে 'গাশিয়াহুম' অর্থ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে, ঢেকে নেয়। 'কাজ্‌জুলালি' অর্থ মেঘচ্ছায়ার মতো। এরকম অর্থ করেছেন কালাবী। আর মুকাতিল অর্থ করেছেন—পাহাড়ের মতো। 'জুললাতুন' এর বহুবচন 'জুলাল'। 'মুখলিসীনা লাহুদদীন' অর্থ তার আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে। অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো অথবা অন্য কোনোকিছুর দিকে না তাকিয়ে। উল্লেখ্য, মৃত্যুর সমূহ সম্ভাবনার সম্মুখে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকল মানুষের লালিত অপবিশ্বাস ও কুসংস্কার কর্পূরের মতো উবে যায়। বাঁচবার জন্য তখন তারা সকলে কেবল আল্লাহ্‌কেই ডাকতে থাকে। আলোচ্য বাক্যাংশে তাদের ওই অবস্থার কথাই তুলে ধরা হয়েছে।

'ফা মিনহুম মুক্বতাসীদ' অর্থ, তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে থাকে। তাফসীরবেত্তাগণের অনেকেই বক্তব্যটিকে পূর্বোল্লিখিত বাক্যের ফলাফল বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু তাঁদের অভিমতটি অযথার্থ। বরং বলা যেতে পারে, ফলাফল এখানে রয়েছে উহ্য। সুতরাং প্রকৃত বক্তব্যটি হবে এরকম— আল্লাহ্পাক যখন তাদেরকে সমুদ্রঝড়ের কবল থেকে উদ্ধার করে তটভূমিতে পৌঁছে দেন, তখন কেউ কেউ প্রকাশ করে কৃতজ্ঞতা, কেউ কেউ হয় অকৃতজ্ঞ এবং কেউ কেউ অবলম্বন করে মধ্যম পন্থা। আবার প্রকৃত অবিশ্বাসীদের অস্বীকৃতির প্রকৃতি আবার ভিন্ন। তারা তো অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে হতে চায় একে অপর অপেক্ষা অগ্রগামী। কালাবী 'মুক্বতাসীদ' এর অর্থ করেছেন মধ্যম পন্থার অকৃতজ্ঞ। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরবেত্তাগণের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, শব্দটির অর্থ মধ্যবর্তী পথের উপরে অবস্থানকারী। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত আল্লাহ্র এককত্বের বিশ্বাসের উপরে। আয়াতখানি হজরত ইকরামা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিলো বলেই এরকম ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করা হয়েছে। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের দলভূত ছিলেন তিনি। তাই মক্কাবিজয়ের প্রাক্কালে তিনি ভীত হয়ে পালিয়ে যান লোহিত সাগরের পাড়ে। অন্য দেশে গমন করার উদ্দেশ্যে আরোহণ করেন এক জাহাজে। কিন্তু সমুদ্রবক্ষে ওঠে প্রচণ্ড ঝড়। তিনি তখন প্রতিজ্ঞা করেন, আল্লাহ্ যদি এযাত্রায় আমাকে বাঁচিয়ে দেন, তবে আমি রসুল স. এর পবিত্র হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করবো। অকস্মাৎ ঝড় স্তিমিত হলো। জাহাজ নিরাপদে ভিড়লো ডাঙ্গায়। তিনি আর কালক্ষেপণ না করে উপস্থিত হলেন মক্কায়। যথারীতি পালন করলেন তাঁর প্রতিজ্ঞা। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, পলাতকদের কেউ কেউ অবলম্বন করেছিলেন মধ্যবর্তী সরল পথ এবং অবশিষ্টরা রয়ে গিয়েছিলো আগের মতোই চরমপন্থী, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী।

'খত্তার' অর্থ বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক, অঙ্গীকার ভঙ্গকারী। 'কাফুর' অর্থ অকৃতজ্ঞ। আর এখানে 'আয়াত' অর্থ আল্লাহ্তায়ালার শক্তিমত্তার নিদর্শনাবলী। এভাবে এখানকার শেষোক্ত বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— বিপদকবলিত অবস্থায় জীবনরক্ষার্থে ইসলাম গ্রহণের অঙ্গীকার যারা করে, তাদের মধ্যে যারা পরিত্রাণ প্রাপ্তির পর তাদের কৃত অঙ্গীকারের কথা ভুলে যায়, তাদের মতো বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিরাই মহাবিপদ থেকে ত্রাণকর্তা আল্লাহ্র শক্তিমত্তার এই বিরল নিদর্শনসমূহের প্রতি জানায় অস্বীকৃতি।

এরপরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো এবং ভয় করো সেই দিনের, যখন পিতা সন্তানের কোনো উপকারে আসবে না, সন্তানও উপকারে আসবে না তার পিতার'। একথার অর্থ— হে আমার রসুলের সহচরবৃন্দ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করার সাথে সেই দিনের

কথা স্মরণ কর ও ভীত হও, যেদিন বিশ্বাসী পিতা তার অবিশ্বাসী পুত্রের এবং বিশ্বাসী পুত্র তার অবিশ্বাসী পিতার পক্ষে কোনো সুপারিশ করতে পারবে না। মিলিতও হতে পারবে না একে অপরের সঙ্গে। উল্লেখ্য, সেদিন বিশ্বাসী পিতা-পুত্র একে অপরের উপকারে আসবে। চিরবিচ্ছেদ তদের ঘটবে না। যেমন এক আয়াতে ঘোষিত হয়েছে— 'যারা ইমান এনেছে, আর তাদের সন্তানগণ ইমান সহ তাদের অনুসরণ করেছে, তাদের সাথে আমি মিলিত করবো তাদের সন্তানদেরকে'। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'আদন জান্নাত; তারা তাতে প্রবেশ করবে। আর যারা শুদ্ধাচারী তাদের পিতৃগণ থেকে, সহধর্মিণীগণ ও সন্তানগণ থেকে'।

'ওয়ালাদ' অর্থ সন্তান এবং 'মাওলুদ' অর্থ ভূমিষ্ঠ। সেদিন কেউ কারো কোনো উপকারে আসবে না। এই কথাটিকে বলিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যেই এখানে 'ওয়ালাদ' এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে 'মাওলুদ'। 'মাওলুদ' বলে সন্তানকে। আর সন্তানের সন্তানকে বলে 'ওয়ালাদ'। এভাবে এখানে এই বক্তব্যটিকেই পরিপুষ্ট ও বলিষ্ঠ করা হয়েছে যে, সন্তান হচ্ছে প্রত্যক্ষ উত্তরপুরুষ। সেই সন্তানই যদি সেদিন কোনো কাজে না আসে, তবে পরোক্ষ উত্তরপুরুষ সন্তানের সন্তান আর কী কাজে আসবে? অধিকন্তু 'ওয়ালাদ' শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় পৌত্র, প্রপৌত্র এধরণের দূরবর্তী উত্তরপুরুষদের ক্ষেত্রে।

উল্লেখ্য, আলোচ্য বাক্যে 'হে মানুষ' বলে সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স. এর সাহাবীগণকে। কারণ তাঁদের অনেকের পিতা-পিতামহ পৃথিবী পরিত্যাগ করেছিলো কাফের অবস্থায়। সেকারণেই তাঁদেরকে এখানে দৃঢ়ভাবে একথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের ওই সকল পিতৃপরুষ মহাবিচারের দিবসে তোমাদের কোনো কাজেই আসবে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেনো কিছুতেই তোমাদেরকে প্রতারিত না করে'। একথার অর্থ—মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান, মহাবিচারপর্ব, চিরস্বস্তি অথবা চিরশাস্তি— এসকল কিছু অমোঘ। কারণ এ সকল ঘটনা ঘটবে বলে আল্লাহ্ স্বয়ং ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁর ঘোষণার বিপরীত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং তোমরা পার্থিব জীবনের সাময়িক সুখ-সম্ভোগের ফাঁদে আটকে যেয়ো না। নিশ্চিত জেনো, অতিরিক্ত ইহকালপ্রীতি পারত্রিক সাফল্যের অন্তরায়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং সেই প্রবঞ্চক যেনো তোমাদেরকে কিছুতেই আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে'। একথার অর্থ— আল্লাহ্‌র অপার দয়া ও প্রতিশ্রুত শাস্তির বিলম্বিতি তোমাদেরকে যেনো এই মর্মে প্রবঞ্চনায় পতিত না করে যে, শাস্তি টাস্তি বলে আসলে কোনো কিছু নেই।

এখানে 'গরূর' অর্থ শয়তান। এই শয়তানই মানুষকে করে প্রবঞ্চিত। মন্ত্রণা দেয়, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল। সুতরাং পাপাচার করলেও ক্ষতি নেই। তিনি মার্জনা করবেন।

মুজাহিদ থেকে প্রায়োন্নত সূত্রপরম্পরায় ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, একবার এক মরুচারী উপস্থিত হলো রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে। বাগবীর বর্ণনানুসারে লোকটির নাম ছিলো আমর ইবনে হারেছ। সে বললো, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! কখন অনুষ্ঠিত হবে কিয়ামত ও হাশর-নশর? আমার স্ত্রী অন্তঃসত্তা। কবে জন্মগ্রহণ করবে তার সন্তান? আমাদের অঞ্চলে চলছে প্রচণ্ড খরা। বলুন, সেখানে বৃষ্টি হবে কখন? আরো বলুন, আমার মৃত্যু হবে কোথায়? তার এতো প্রশ্নাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত। ঘোষিত হলো —

সূরা লোকমান ঃ আয়াত ৩৪

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌۢ ﴿٣٤﴾

r কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র নিকট রহিয়াছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যাহা জরায়ূতে আছে। কেহ জানে না আগামীকল্য সে কি অর্জন করিবে এবং কেহ জানে না কোন্ স্থানে তাহার মৃত্যু ঘটিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— পাঁচটি বিষয় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। ওই পাঁচটি বিষয় হচ্ছে— ১. কখন সংঘটিত হবে মহাপ্রলয় ২. কোথায় কখন বৃষ্টিপাত হবে কী পরিমাণে ৩. কোন রমণীর গর্ভাশয়ে রয়েছে কোন্ আকৃতি ও কোন প্রকৃতির সন্তান ৪. আগামী দিবস কে কোথায় হবে কোন পরিস্থিতির শিকার এবং ৫. কোন স্থানে কে কখন পরিত্যাগ করবে শেষ নিঃশ্বাস। নিশ্চয় এগুলো জানেন কেবল আল্লাহ্। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নেই — ১. আগামীকাল কী ঘটবে? ২. মাতৃউদরে কী রয়েছে ৩. কিয়ামত সংঘটিত হবে কখন ৪. মৃত্যু সংঘটিত হবে কোন স্থানে এবং ৫. কখন শুরু হবে বৃষ্টিপাত। আহমদ, বোখারী।

উদ্ধৃত আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে হজরত ইবনে ওমরের বর্ণিত হাদিসটি বর্ণনা করার পর বাগবী লিখেছেন, রসুল স. আরো বর্ণনা করেছেন, অদৃশ্যের ভাণ্ডারস্থিত বিষয় এই পাঁচটি। তারপর তিনি পাঠ করলেন আলোচ্য আয়াত।

ইবনে আবী শায়বা তাঁর 'আলমুসান্নিফ' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত খাইছুমা বর্ণনা করেছেন, একবার নবী সুলায়মানের নিকট আগমন করলেন মৃত্যুর ফেরেশতা হজরত আজরাইল। নবী সুলায়মানের এক পার্শ্বচরের প্রতি তিনি হানলেন তির্যক দৃষ্টি। লোকটি ভয় পেয়ে গেলো। নবী সুলায়মানকে বললো, আগন্তুকটি কে? নবী সুলায়মান বললেন, মৃত্যুর ফেরেশতা। লোকটি বললো, মনে হচ্ছে সে আমার প্রাণসংহার করতে চায়। হে মহামান্য নবী! আপনি বায়ুকে আদেশ করুন, সে যেনো এই মুহূর্তে আমাকে হিন্দুস্তানে পৌঁছে দেয়। নবী সুলায়মান বায়ুকে আদেশ করলেন। নবীর আদেশে বায়ু তাকে অতিদ্রুত পৌঁছে দিলো হিন্দুস্তানে। হজরত আজরাইল বললেন, হে নবীপ্রবর! আমি বিস্ময়ের সঙ্গে লোকটিকে দেখলাম, আর ভাবলাম, মাত্র কয়েক মুহূর্ত পর তার মৃত্যু হবে হিন্দুস্তানে। অথচ সে রয়েছে তার মৃত্যুস্থান থেকে এতো দূরে। আল্লাহ্‌তায়ালাই সমধিক জ্ঞাত।

উল্লেখ্য, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর জ্ঞানের পরিসর প্রকাশ করবার জন্যই এখানে বলেছেন 'ই'লমুস্‌সাআ'ত' (কিয়ামতের জ্ঞান), 'ইয়া'লামু মাফীল আরহাম'(তিনি জানেন যা জরায়ূতে আছে)। আর সৃষ্টির জ্ঞানকে তিনি এখানে নাকচ করে দিয়েছেন একথা বলে— 'মা তাদরী' (কেউ জানে না)।

এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে 'ইলম' (জ্ঞান) এবং 'দেরায়েত' (বুদ্ধি) এর মধ্যে পার্থক্য কী? এর উত্তরে বলা যেতে পারে, যদিও শব্দ দু'টো প্রায় সমার্থক, তবুও এ দু'টোর মধ্যে রয়েছে সূক্ষ্ম পার্থক্যও। যেমন 'ইলম' হচ্ছে সাধারণ জ্ঞান এবং 'দেরায়েত' হচ্ছে গবেষণালব্ধ জ্ঞান। 'কামুস' গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'দারাইতুহু' অর্থ 'আ'লীমতুহু' 'বিদ্বরবিম্ মিনাল হীলাতি' অর্থ 'দেরায়েত' ওই জ্ঞানের নাম, যা আমি শিক্ষা করেছি গবেষণার মাধ্যমে। অর্থাৎ 'দেরায়েত' হচ্ছে ভূয়োদর্শন।

আলোচ্য আয়াতে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, সৃষ্টি যতোই গবেষণায় লিপ্ত হোক না কেনো, এ বিষয়ে সে কিছুতেই নিশ্চিত হতে পারবে না যে, আগামী দিবস তার পরিণতি হবে কী? এভাবে যদি সে নিজের অসহায়ত্ব প্রকটভাবে অনুভব করে, তবে সে একথাও বুঝতে পারবে অন্যের সুনির্ধারিত অদৃষ্টের ব্যাপারেও তার করণীয় কিছু নেই। তবে আল্লাহ্‌তায়ালা যদি তাঁর নবী-রসুলগণের মাধ্যমে অথবা অলৌকিক নিদর্শনের মাধ্যমে আগাম কোনোকিছু জানিয়ে দেন, তবে সে কথা স্বতন্ত্র।

'ইন্নাল্লহা আ'লীমুন খবীর' অর্থ, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত। এই সর্ব বিষয়ে অবহিতির অর্থ হচ্ছে সকল কিছুর আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় দিকের, বরং সকল দিকের অবগতি।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে আব্বাসীয় খলিফা মনসুরের একটি স্বপ্নের বিবরণ। একবার তিনি স্বপ্নযোগে সাক্ষাত পেলেন হজরত আজরাইলের। স্বপ্নেই জিজ্ঞেস করলেন, আমি আর কতোদিন বাঁচবো? হজরত আজরাইল কোনো কথা বললেন না। কেবল দেখালেন হাতের পাঁচটি আঙুল। স্বপ্নভঙ্গের পর তিনি স্বপ্নবিশারদগণকে ডেকে তাঁদের নিকট থেকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। তাঁদের কেউ কেউ অর্থ করলেন, ওই পাঁচ আঙুলের অর্থ— আপনার আয়ু আছে আর মাত্র পাঁচ দিন। কেউ কেউ বললেন, পাঁচ বছর। ইমাম আবু হানিফা বললেন, এর অর্থ পাঁচটি বিষয় আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। ওই পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে সুরা লোকমানের শেষ আয়াতে।

সূরা সাজদা

এই সুরার রুকুর সংখ্যা তিন এবং আয়াতের সংখ্যা ৩০। সুরাটি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়।

সূরা সাজদা ঃ আয়াত ১, ২, ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ﴿١﴾ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٣﴾

r আলিফ-লাম-মীম,

r এই কিতাব জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

r তবে কি উহারা বলে, 'ইহা সে নিজে রচনা করিয়াছে?' না, ইহা তোমার প্রতিপালক হইতে আগত সত্য, যাহাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করিতে পার, যাহাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসে নাই। হয়তো উহারা সৎ পথে চলিবে।

প্রথমে উল্লেখিত হয়েছে বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি আলিফ-লাম-মীম। এই বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি চিরদুর্বোধ্য। কেবল আল্লাহ্, আল্লাহ্র রসুল এবং অতি নগণ্যসংখ্যক তত্ত্বজ্ঞ এগুলোর রহস্যভেদ করতে সক্ষম। এগুলোকে সর্বসাধারণবোধ্য করে তোলার চেষ্টা পরিহরণীয়। কেবল বিশ্বাস রাখতে হবে কোরআন মজীদের বিভিন্ন সুরার শিরোনামরূপে লিপিবদ্ধ এই রহস্যাচ্ছন্ন অক্ষরগুলো অন্যান্য সুস্পষ্ট আয়াতসমূহের মতোই প্রত্যাদেশপ্রদাতা এক ও আনুরূপ্যবিহীন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সমাগত।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'এই কিতাব জগত সমূহের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ। এতে কোনো সন্দেহ নেই'। একথার অর্থ— এই কোরআন যে বিশ্বসমূহের পালনকর্তা আল্লাহ্র বাণী, সেকথা সুনিশ্চিত। এমতো বিষয় ও বিশ্বাসে দ্বিধা-সংশয় আরোপনের অবকাশ মাত্র নেই।

এর পরের (৩) আয়াতে বলা হয়েছে— 'তবে কি তারা বলে, এটা সে নিজে রচনা করেছে? না, এটা তোমার প্রতিপালক থেকে আগত সত্য'। এখানে 'তোমার প্রতিপালক থেকে আগত সত্য' কথাটি পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্যকে (এতে কোনো সন্দেহ নেই) করেছে অধিকতর সংহত ও সবল। এভাবে পুরো বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে মক্কার মুশরিকেরা! এই যে আলিফ-লাম-মীম অবতীর্ণ হলো। তোমরা তো এই দৃশ্যতঃ অবিন্যস্ত অক্ষরগুলোর মর্মোদ্ধার করতে পারলে না। তোমাদের এমতো অক্ষমতা কি একথাই প্রমাণ করে না যে, এই বাণী মানব রচিত কোনো বাণী নয়। নিঃসন্দেহে এই মহান বাণীবৈভব আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সমাগত। তবে তোমরা কেনো একথা বলো যে, মোহাম্মদ এর রচয়িতা! তোমাদের এমতো অপমন্তব্য অবশ্যই পরিত্যাজ্য। পুনরায় ভালো করে শুনে নাও, অবতরণরত এই অপার্থিব বচনসম্ভার বিশ্বসমূহের মহাসৃজয়িতা ও মহাপ্রতিপালয়িতার পক্ষ থেকে আগত মহাসত্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারো, যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসেনি, হয়তো তারা সৎপথে চলবে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অপমন্তব্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না। আপনি কোরআনের প্রচারকর্মে দৃঢ়ভাবে আত্মনিয়োগ করুন। আপনাকে তো এমন এক সম্প্রদায়ের সংশোধনার্থে প্রেরণ করা হয়েছে যারা ইতোপূর্বে কোনো নবী-রসুলের প্রত্যক্ষ সাহচর্য লাভের সুযোগ পায়নি। সুতরাং তাদের এখনকার বিরুদ্ধবাদিতা অনড় মনে হলেও ভবিষ্যতে তাদের সত্যোপলব্ধি ঘটা অসম্ভব কিছু নয়। হয়তো তারা একসময় মিথ্যাচার পরিত্যাগ করবে। অবলম্বন করবে সত্যের পথ।

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَیْنَهُمَا فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ ؕ مَا لَکُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِیٍّ وَّ لَا شَفِیْعٍ ؕ
اَفَلَا تَتَذَکَّرُوْنَ ﴿۴﴾ یُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَی الْاَرْضِ ثُمَّ
یَعْرُجُ اِلَیْهِ فِیْ یَوْمٍ کَانَ مِقْدَارُهٗۤ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ﴿۵﴾ ذٰلِكَ
عٰلِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ ﴿۶﴾ الَّذِیْۤ اَحْسَنَ کُلَّ
شَیْءٍ خَلَقَهٗ وَ بَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِیْنٍ ﴿۷﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ
سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِیْنٍ ﴿۸﴾ ثُمَّ سَوّٰىهُ وَ نَفَخَ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَ جَعَلَ
لَکُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِیْلًا مَّا تَشْکُرُوْنَ ﴿۹﴾

r আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদিগের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন ছয় দিনে। অতঃপর তিনি আর্‌শে সমাসীন হন। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবক নাই এবং সুপারিশকারীও নাই; তবু কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না?

r তিনি আকাশ হইতে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, অতঃপর একদিন সমস্ত কিছুই তাঁহার সমীপে সমুত্থিত হইবে— যে দিনের পরিমাপ হইবে তোমাদের হিসাবে সহস্র বৎসর।

r তিনিই অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু,

r যিনি তাঁহার প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করিয়াছেন উত্তমরূপে এবং কর্দম হইতে মানব-সৃষ্টির সূচনা করিয়াছেন।

r অতঃপর তিনি তাহার বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হইতে।

r পরে তিনি উহাকে করিয়াছেন সুঠাম এবং উহাতে ফুঁকিয়া দিয়াছেন রূহ হইতে এবং তোমাদিগকে দিয়াছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ, তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে'। একথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা অবশ্যই সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর। এই বিশাল সৃষ্টিকে অস্তিত্বদান করা তাঁর জন্য ছিলো মুহূর্তের ব্যাপার। তৎসত্ত্বেও তিনি ধীরতা ও স্থিরতার দৃষ্টান্ত স্থাপনের নিমিত্তে আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সকল কিছুর সৃজন সমাপন করেছেন ছয় দিনে। সূচনা রবিবারে এবং সমাপ্তি শুক্রবারে।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন'। আল্লাহ্র আরশে সমাসীন হওয়ার এই বিষয়টি অবোধ্য। কারণ আল্লাহ্তায়ালা যেমন আনুরূপ্যবিহীন, তেমনি তাঁর সমাসীন হওয়ার প্রকৃতিটিও। এ সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে সুরা ইউনুস এবং সুরা আ'রাফের তাফসীরে, যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যায়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই এবং সুপারিশকারীও নেই'। একথার অর্থ— হে মানুষ! আল্লাহ্পাকই তোমাদের আপনতম আশ্রয়। সুতরাং তাঁকেই তোমরা মেনে নাও তোমাদের প্রকৃত অভিভাবক ও দয়ার্দ্র সপক্ষরূপে, পরিত্রাণই যদি তোমাদের কাম্য হয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবু কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না'? এখানকার 'ফা' অব্যয়টি একটি যোজক অব্যয়। এর যোজনা রয়েছে একটি উহ্য বাক্যের সঙ্গে। ওই উহ্য বাক্যটিসহ বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হে মানুষ! তবু কি তোমরা এবিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করবে না, চিন্তা করে দেখবে না?

পরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ই তাঁর অদৃশ্য সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালনা করেন আকাশ ও পৃথিবীর সকল কার্যক্রম।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর একদিন সমস্তকিছুই তাঁর সমীপে সমুত্থিত হবে— যে দিনের পরিমাপ হবে তোমাদের হিসাবে সহস্র বৎসর'।

এখানে 'ছুম্মা ইয়া'রুজু ইলাইহি' কথাটির অর্থ প্রতিটি কর্মই তাঁর সমীপে উপনীত হয়। সতত বিদ্যমান থাকে তাঁর জ্ঞানের আওতায়। 'ইয়ুদাব্বিরুল আম্রা' অর্থ তিনিই বিধান পরিচালনা করেন, প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করেন হজরত জিবরাইলের মাধ্যমে। অথবা অর্থ হবে,— তাঁর আদেশে সেসব ফেরেশতাগণের মাধ্যমে ধরাপৃষ্ঠে নেমে আসে আকাশজ সমাধান। অতঃপর হজরত জিবরাইল অথবা সেবক ফেরেশতাগণ তার প্রতিফল নিয়ে উত্থিত হয় আল্লাহ্পাকের সন্নিধানে। অর্থাৎ ওই স্থানে, যে স্থান আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত। আর 'ফী ইয়াওমিন' এর শাব্দিক অর্থ 'এক দিন' হলেও এর মর্মার্থ— এক সময়ে। কেননা ফেরেশতাগণের ঊর্ধ্বমার্গে ওঠানামা চলে দিনে ও রাতের যে কোনো সময়ে।

‘কানা মিক্বদারুহু’ অর্থ ফেরেশতাদের অবতরণ ও ঊর্ধ্বারোহণ। আর ‘যে দিনের পরিমাপ হবে তোমাদের হিসাবে সহস্র বৎসর’ কথাটির অর্থ— হে মানুষ! ফেরেশতারা যে দূরত্ব এক লহমায় অতিক্রম করে, তা যদি তোমরা অতিক্রম করতে চাও, তবে সময় লাগবে এক হাজার বৎসর। সুতরাং বুঝে নাও, আল্লাহ্তায়ালা ফেরেশতাদেরকে কীরূপ দ্রুতগতিসম্পন্ন করেছেন। আর একথাও বুঝে নাও যে, তাঁর প্রতাপ ও শক্তিমত্তা কতো প্রবল।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে ফেরেশতাদের ভূবনাবরোহণ এবং আকাশারোহণের কথা। আর বলা হয়েছে মানুষের হিসাবে এই দূরত্ব এক হাজার বৎসরের পথের দূরত্বের সমান। কিন্তু অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘ফেরেশতামণ্ডলী ও জিবরাইল একদিনে ঊর্ধ্বগমন করে তাঁর সান্নিধ্যে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বৎসর’। এখানে বলা হয়েছে ভূপৃষ্ঠ থেকে সপ্তম আকাশের সিদরতুল মুনতাহা পর্যন্ত দূরত্বের কথা। অবশ্য হজরত জিবরাইলের সর্বোচ্চ গন্তব্য ওই পর্যন্তই। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হজরত জিবরাইল ও তাঁর সহচর ফেরেশতারা সিদরাতুল মুনতাহা ও পৃথিবীর মধ্যে যাতায়াত করেন অত্যল্প সময়ে। মানুষের হিসাবে ওই দূরত্ব পঞ্চাশ হাজার বৎসরে অতিক্রমযোগ্য দূরত্বের সমান। এরকম বলেছেন মুজাহিদ ও জুহাক। তবে আমার মতে দু’টো আয়াতের লক্ষ্য একটিই। অর্থাৎ দু’টো আয়াতেই বলা হয়েছে পৃথিবী ও সিদরাতুল মুনতাহার মধ্যবর্তী ব্যবধানের কথা। একটিতে এক হাজার বৎসর এবং অপরটিতে পঞ্চাশ হাজার বৎসর। এমতো পার্থক্যের কারণ নির্ণয় করা যেতে পারে এভাবে— গতি দ্রুততর হলে সময় লাগবে এক হাজার বৎসর। এবং শ্লথগতিসম্পন্ন হলে সময় লাগবে পঞ্চাশ হাজার বৎসর। কেননা হজরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পৃথিবী থেকে প্রথম আকাশের দূরত্ব একাত্তর, বায়াত্তর অথবা তিয়াত্তর বৎসর। আবার হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি ও আহমদ কর্তৃক বর্ণিত অপর এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, পৃথিবী থেকে প্রথম আকাশ এবং এক আকাশ থেকে অন্য আকাশ পর্যন্ত দূরত্ব পাঁচশত বৎসরের পথের দূরত্বের সমান। এতে করে সহজেই একথা প্রতীয়মান হয় যে, এমতো ক্ষেত্রে দূরত্বের তারতম্য নির্ণীত হয়েছে গতির তারতম্যের উপর। আল্লাহ্ই সমধিক জ্ঞাত।

কোনো কোনো বিদ্বজ্জন অভিমত প্রকাশ করেছেন, আল্লাহ্তায়ালা জাগতিক কার্যক্রম নিষ্পন্ন করেন আকাশী আয়োজনের মাধ্যমে। অর্থাৎ ফেরেশতাদের মাধ্যমে। এমতো ব্যবস্থাপনা চলতে থাকবে মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত। মহাপ্রলয়কালের ব্যবস্থাপনায় মাধ্যম বলে আর কিছু থাকবে না। তখন কেবল আল্লাহ্ই হবেন

মহাপ্রলয়ের সরাসরি পরিচালক। আর ওই প্রলয়কালপরিসর হবে এক হাজার বৎসরের সমান। ওই সুদীর্ঘ দিবসই কিয়ামতের দিবস (ইয়াওমাল কিয়ামাহ্)। একথার সমর্থন রয়েছে তিরমিজী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে, যেখানে বলা হয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বিত্তহীন বিশ্বাসীরা বেহেশতে প্রবেশ করবে বিত্তশালী বিশ্বাসীদের অর্ধদিবস পূর্বে। ওই অর্ধদিবসের পরিমাণ পৃথিবীর হিসাবে পাঁচশত বৎসর। আর যে আয়াতে পঞ্চাশ হাজার বৎসরের কথা বলা হয়েছে, সে আয়াতের বক্তব্য প্রযোজ্য হবে মহাবিচার দিবসের ক্ষেত্রে। কিন্তু হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পৃথিবীতে যে সকল পুঁজিপতি জাকাত আদায় করেনি, সেদিন তাদের জমানো সম্পদগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে দোজখের আগুনে। সেগুলো দিয়ে বানানো হবে বড় বড় পাথরের চাঁই। আর ওই সকল উত্তপ্ত পাথরের চাঁই দিয়ে দাগ দেওয়া হবে পুঁজিপতিদের পাঁজরে ও ললাটে। বিচারপর্ব সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত চলতেই থাকবে তাদের এরকম শাস্তি। আর ওই বিচারপর্বের সময়ের পরিধি হবে পঞ্চাশ হাজার বৎসর। তবে বলা যেতে পারে, এ ব্যাপারে তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত হাদিসটিই অধিক অগ্রগণ্য। কিন্তু এতদসত্ত্বেও উদ্ভূত সময়সম্পর্কিত সমস্যাটি অসমাধ্য বলেই অনুমিত হয়। তবে এর সমাধান দেওয়া যেতে পারে আর একভাবে। যেমন— সেদিন আপনাপন কর্মের প্রভাবে মহাবিচারের দিবসের পরিসর এক এক জনের কাছে অনুমিত হবে এক এক রকম। কারো কারো মনে হবে পঞ্চাশ হাজার বৎসর। কারো মনে হবে এক হাজার বৎসর। আবার কারো কারো কাছে অনুমিত হবে পৃথিবীর একটি দিনের চেয়েও কম সময়। যেমন হজরত আবু হোরায়রা থেকে উন্নত ও প্রায়োন্নত উভয় সূত্রে হাকেম ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, বিশ্বাসবানগণের নিকট মহাবিচারপর্বের সময়পরিসরকে মনে হবে জোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়টুকুর সমান। বাগবী লিখেছেন, ইব্রাহিম তাইমি এরকমই ব্যাখ্যা করেছেন।

উত্তম সূত্রপরম্পরায় আবু ইয়ালী, ইবনে হাব্বান ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু সাঈদ বলেছেন, একবার রসুল স.কে মহাবিচারপর্বের পঞ্চাশ হাজার বৎসর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি স. বললেন, যাঁর অধিকারে আমার জীবন, সেই পবিত্রতম সত্তার শপথ! ইমানদারদের কাছে ওই দিনকে মনে হবে তার পৃথিবীর ফরজ নামাজ পাঠের সময়ের চেয়েও কম সময়।

বাগবী লিখেছেন, ইবনে আবী মালিকা বলেছেন, একবার আমি ও হজরত ওসমানের মুক্ত করা ক্রীতদাস আবদুল্লাহ্ ইবনে ফিরোজ উপস্থিত হলাম হজরত ইবনে আব্বাস সকাশে। জানতে চাইলাম পঞ্চাশ হাজার বৎসরের দীর্ঘ দিবস সম্পর্কে। তিনি জবাব দিলেন, এ বিষয়ের জ্ঞান আমার নেই। সুতরাং আমার

পক্ষে এ সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকাই শ্রেয়। জালালউদ্দিন মাহাল্লী তাঁর তাফসীরে এই বর্ণনাটিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে এরকম— ফেরেশতারা একবারে নিয়ে আসেন এক হাজার বৎসরের কার্যক্রমের ফিরিস্তি। এক হাজার বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর পুনরায় নিয়ে আসেন এক হাজার বৎসরের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নির্দেশনা। এই নিয়মেই তারা দায়িত্ব পালন করে চলবে কিয়ামত পর্যন্ত।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'তিনিই অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— তিনি সকলের ও সকল কিছুর গোপন ও প্রকাশ্য সকলকিছু উত্তমরূপে অবগত বলেই তাঁর ব্যবস্থাপনা এতো নির্ভুল, নিখুঁত ও যথাযথ। তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি একাধারে পরাক্রমশালী ও পরম দয়াবান। অর্থাৎ বান্দাগণের কল্যাণের দিকেই তাঁর দয়া ও দান সতত তৎপর।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন উত্তমরূপে'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ প্রত্যেক সৃষ্টিকে তাদের আপনাপন ধারণক্ষমতা ও যোগ্যতানুসারে সুঠাম ও সুন্দর করেছেন। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন কাতাদা। আর হজরত ইবনে আব্বাস ব্যাখ্যা করেছেন— আল্লাহ্ তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকে করেছেন শক্ত-সমর্থ, বলিষ্ঠ। তিনি আরো বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাগণের কটিদেশ খুব সুন্দর করে সৃষ্টি করেননি, করেছেন মজবুত। মুকাতিল 'খুব সুন্দর' বা 'অত্যুত্তম' কথাটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আল্লাহ্পাক তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির সৃজনশৈলী সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত। আরবী প্রবাদে বলা হয় 'ফলানুন ইউহ্সিনু কাজা' (কীভাবে একাজ করতে হবে, তা অমুক লোক জানে)।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং কর্দম থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন'। একথার অর্থ— এবং তিনি মানুষের আদি পিতা আদমকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।

এরপরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তিনি তাঁর বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস থেকে'। এখানে 'নসল' অর্থ পৃথক হওয়া। যেহেতু অনাগত সন্তান তার পিতার পৃথক অংশ, তাই এখানে ঘটেছে এমতো শব্দ ব্যবহার। আর এখানে 'তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস' (সুলালাতিন) অর্থ শুক্রকণা। 'সুলালাতিন' এসেছে 'আসাললুন' থেকে। 'আসাললুন' অর্থ আক্ষেপণ। যেহেতু মানুষের শরীর থেকে বীর্য নির্গত হয় আক্ষেপের সঙ্গে, তাই এখানে শুক্রকণা বা তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাসকে বলা হয়েছে 'সুলালাতিন'।

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— ‘পরে তিনি তাকে করেছেন সুঠাম’। একথার অর্থ—তারপর তিনি ওই শুক্রকণাকে দিয়েছেন দৃষ্টিগ্রাহ্য অবয়ব।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং তাতে ফুঁকে দিয়েছেন তাঁর রূহ থেকে’। এখানে ‘মিররুহিহী’ এর ‘হী’ (তার) সম্বন্ধ পদটির দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয় যে, মানব সৃষ্টি একটি মহৎকর্ম। আর এমতো কর্ম অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্নও। কারণ এমতো সৃজনকর্ম অভাবনীয় ও অভূতপূর্ব।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ’। একথার অর্থ— মাতৃউদরস্থিত মানবাবয়বে আত্মার সম্পাত ঘটানোর পর তিনি তোমাদেরকে শুনবার জন্য কান, দেখবার জন্য চোখ এবং বুঝবার জন্য হৃদয় দিয়েছেন, যেনো তোমরা সমর্থ হও শুনতে, দেখতে ও হৃদয়ঙ্গম করতে।

শেষে বলা হয়েছে— ‘তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো’। এ কথার অর্থ— তোমরা আল্লাহ্‌র এমতো দয়া ও দানের পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না। অথবা— তোমাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোক এব্যাপারে যথাযথ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। এখানে ‘মা’ অব্যয়টি অতিরিক্তরূপে স্বল্পতা জ্ঞাপক অর্থে সন্নিবেশিত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমরা এমতো অনুগ্রহদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো খুব কমই। আর খুব কম সংখ্যকই তাঁর প্রতি ইমান আনো এবং তাঁর ইবাদত করো।

সূরা সাজদা ঃ আয়াত ১০, ১১

وَقَالُوٓا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِى الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۬ؕ بَلْ هُمْ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ﴿١٠﴾ قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ﴿١١﴾

r উহারা বলে, ‘আমরা মৃত্তিকায় পর্যবসিত হইলেও কি আমাদিগকে আবার নূতন করিয়া সৃষ্টি করা হইবে? বরং উহারা উহাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ অস্বীকার করে।

r বল, ‘তোমাদের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর ফিরিশ্‌তা তোমাদের প্রাণ হরণ করিবে। অবশেষে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যানীত হইবে।’

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘তারা বলে, আমরা মৃত্তিকায় পর্যবসিত হলেও কি আমাদেরকে আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে’? একথার অর্থ— মক্কার মুশরিকেরা বলে, আমরা মরে গেলে তো মাটির সঙ্গে মিশে যাবো, তারপরেও কি

আমাদেরকে আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে? এরকম কথা কি বিশ্বাস করা যায়? এখানে 'দ্বলালনা ফীল আরদ্বি' অর্থ মৃত্তিকায় পর্যবসিত হলেও, মাটিতে মিশে গেলেও। যেমন বলা হয় 'দ্বললাল মাউ ফীল লাবান' (পানি মিশেছে দুধের সঙ্গে)। উল্লেখ্য, আলোচ্য উক্তিটি ছিলো উবাই ইবনে খালফের। অন্যান্য অংশীবাদীরাও ছিলো তার একথার সঙ্গে একাত্ম। তাই এখানে 'সে বলে' না বলে বলা হয়েছে 'তারা বলে'।

এরপর বলা হয়েছে— 'বরং তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত অস্বীকার করে'। একথার অর্থ— তাদের এমতো অপবচনের কারণ এই যে, পরকালের প্রতি তাদের আদৌ বিশ্বাস নেই।

এরপরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'বলো, তোমাদের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের প্রাণহরণ করবে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! তাদেরকে বলে দিন, সকলের প্রাণহরণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মৃত্যুর ফেরেশতা আজরাইলকে। তিনি যথাসময়ে তোমাদের প্রাণহরণ করবেনই।

এখানে 'ইয়াতাওফ্ফা' অর্থ 'ইয়াসতাওফিয়া'। এরকম এক সূত্রভূত শব্দের অন্য অর্থ প্রদান ব্যাকরণসম্মত। সুতরাং বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের প্রাণসংহার করবে সম্পূর্ণরূপে। প্রাণের কোনো অংশই সে ছেড়ে দিবে না। অথবা ছেড়ে দিবে না তোমাদের কাউকেও। বলাবাহুল্য, এখানে 'মৃত্যুর ফেরেশতা' বলে বুঝানো হয়েছে হজরত আজরাইলকে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইকরামা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মৃত্যু পৃথিবীর সকল দুঃখ-যাতনা হরণকারী। কারো অন্তিমকাল উপস্থিত হলে মৃত্যুর ফেরেশতা তার কাছে এসে বলে, হে আল্লাহ্র দাস! তোমার কাছে তো এ পর্যন্ত অনেক সংবাদই পৌঁছেছে। আমি এসেছি শেষ বার্তা নিয়ে। এবার তোমাকে বলতেই হবে, আমি প্রস্তুত। একথা বলেই সে ওই ব্যক্তির জান কবজ করে। সুহৃদ -স্বজনেরা শোকাচ্ছন্ন হয়, বিলাপ করে। মৃত্যুদূত তখন বলে, কার জন্য তোমাদের এ আর্তনাদ? রোদনই বা কার জন্য? আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, আমি কারো আয়ুষ্কাল এক মুহূর্তও হ্রাস করিনি। ভক্ষণ করিনি কারো এক কণা উপজীবিকা। তাকে তো ডাক দিয়েছেন তার প্রভুপালনকর্তা স্বয়ং। ওহে বিচ্ছেদাহত ব্যক্তিবর্গ। তোমরা রোদন করো তোমাদের নিজেদের জন্য। আল্লাহ্র শপথ! আমি বার বার আসবো। আমার হাত থেকে কারোরই নিস্তার নেই।

এখানে 'আল্লাজীনা বুককিলা বিকুম' অর্থ মৃত্যু সংঘটনকারী ফেরেশতামণ্ডলী। তারা সকলে হজরত আজরাইলের সহযোগী। সুরা আনয়া'মের যথাস্থানে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

মাসআলা ঃ হজরত আজরাইল ও তাঁর সহযোগীরা আগে থেকে কখন কার কোথায় মৃত্যু হবে তা জানে না। জানে মৃত্যু কার্যকর করার পূর্ব মুহূর্তে। ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়ার বর্ণনায় এসেছে ইবনে জুরাইজ বলেছেন, কারো মৃত্যুর সময় অত্যাসন্ন হলে হজরত আজরাইলকে জানানো হয়, যাও, অমুক সময়ে অমুক ব্যক্তির প্রাণ সংহার করো।

মাসআলা ঃ মৃত্যুদূত বিশ্বাসবান ব্যক্তিদের সামনে উপস্থিত হয় মনোমুগ্ধকর-রূপে। আর অবিশ্বাসীদের কাছে যায় ভয়ংকরদর্শন হয়ে। ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ এবং হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্ যখন নবী ইব্রাহিমকে তাঁর বন্ধু (খলিল) নির্বাচন করলেন, তখন হজরত আজরাইল নিবেদন করলেন, হে আমার প্রভুপালক! দয়া করে অনুমতি দিন, আমি এই শুভসমাচারটি নবী ইব্রাহিমকে দিয়ে আসি। আল্লাহ্পাক অনুমতি দিলেন। হজরত আজরাইল নবী ইব্রাহিমের নিকটে উপস্থিত হয়ে শুভসমাচার জানালেন। নবী ইব্রাহিম তৎক্ষণাৎ উচ্চারণ করলেন, 'আলহামদু লিল্লাহ'। তারপর বললেন, হে মৃত্যুদূত! আমাকে দেখাও, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জীবন তুমি হরণ করো কীভাবে? হজরত আজরাইল বললেন, আপনি সহ্য করতে পারবেন না। নবী ইব্রাহিম বললেন, পারবো। হজরত আজরাইল পিছন ফিরে দাঁড়ালেন। পরক্ষণেই ঘুরে দাঁড়ালেন নবী ইব্রাহিমের মুখোমুখি হয়ে। নবী ইব্রাহিম দেখলেন, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে বিকট, বীভৎস ও বিশাল এক দানব। তার মুখ দিয়ে ঠিকরে বেরুচ্ছে আগুন। তার প্রতিটি লোমকূপে রয়েছে এক একটি মানবাকৃতির প্রাণী। তাদের মুখ থেকেও নির্গত হচ্ছে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। মুহূর্ত মধ্যে চেতনা হারিয়ে ফেললেন আল্লাহ্র নবী। কিছুক্ষণ পর চেতনা ফিরে পেয়ে দেখলেন, হজরত আজরাইল দাঁড়িয়ে রয়েছেন আগের মতো মনোহর বেশ নিয়ে। বললেন, হে মৃত্যুদূত! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আর কোনো শাস্তি না পেলেও তোমার বীভৎস দর্শনই তো তাদের জন্য শাস্তি হিসেবে যথেষ্ট। যা হোক, এবার দেখাও তুমি বিশ্বাসবানদের কাছে উপস্থিত হও কোনরূপ ধরে। মৃতুদূত পুনরায় পিছন ফিরে দাঁড়ালেন। পরক্ষণেই যখন নবী ইব্রাহিমের মুখোমুখি হলেন, তখন ইব্রাহিম সবিস্ময়ে দেখলেন তাঁর চিত্তহারী রূপ। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে অপার্থিব সুবাস। আর তার পরনে রয়েছে শুভ্রঅভ্রমুক্তাখচিত নয়নাভিরাম পরিচ্ছদ। বললেন, হে মৃতুদূত! বিশ্বাসবানেরা আর কোনো পুরস্কার না পেলেও তোমার এই হৃদয় পাগল করা রূপই পুরস্কার হিসেবে তাদের জন্য হবে যথেষ্ট।

হজরত কা'ব বলেছেন, হজরত আজরাইল নবী ইব্রাহিমের নিকট প্রথমে নিজেকে প্রদর্শন করেছিলেন অনিন্দ্য সুন্দররূপে, যে রূপে তিনি আবির্ভূত হন বিশ্বাসীগণের রূহ্ কবজ করার সময়। তাঁর ওই ভূবনমোহিনী রূপের প্রকৃত তত্ত্ব

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ অবগত নয়। পুনর্বার তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন ভীষণ নিষ্ঠুর আকৃতিতে, যার ফলে নবী ইব্রাহিম হয়ে পড়েছিলেন ভীত-সন্ত্রস্ত ও সংজ্ঞাহীন।

মাসআলা ঃ পশু-পাখির মৃত্যু কীভাবে হয়, সে সম্পর্কে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু শায়েখ ও দায়লামী এবং সেটি উকাইলি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'সানআ' গ্রন্থে। হাদিসটি এই— রসুল স. বলেছেন, পশু-পাখি ও কীট-পতঙ্গ যতদিন আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনায় লিপ্ত থাকে, ততদিন প্রলম্বিত থাকে তাদের আয়ু। একাজ যখন বন্ধ হয়, তখন আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং ঘটান তাদের মৃত্যু। তাদের ক্ষেত্রে আজরাইলের কোনো ভূমিকা নেই। অপর এক সূত্রে এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে ওমর থেকে খতিব বাগদাদী। হাদিসটিকে আতীয়া ও কুরতুবী ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— মৃত্যুদূতের অংশগ্রহণ ছাড়াই আল্লাহ্ স্বয়ং নিভিয়ে দেন তাদের প্রাণপ্রদীপ।

আমি বলি, মৃত্যুকালে বিশ্বাসীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং অবিশ্বাসীদেরকে হুমকি প্রদানের জন্যই মৃত্যুদুতের সঙ্গে নিযুক্তি দেয়া হয়েছে তার সহযোগী ফেরেশতাদেরকে।

খতিব বাগদাদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেন, জুহাক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত আজরাইল প্রাণহরণ করেন কেবল মানুষের। জ্বিন, শয়তান এবং ভূচর, খেচর ও জলচর প্রাণীদের মৃত্যুর ফেরেশতা ভিন্ন ভিন্ন। ফেরেশতামণ্ডলী মৃত্যুমুখে পতিত হবে কিয়ামতের সময় হজরত ইসরাফিলের প্রথম ফুৎকারধ্বনি উত্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। তাদের প্রাণও হরণ করবেন হজরত আজরাইল। সবশেষে হজরত আজরাইলকেও মৃত্যুবরণ করতে হবে। আর যারা জেহাদের ময়দানে শহীদ হন এবং জলে ডুবে মরেন, তাদের প্রাণহরণ করেন আল্লাহ্ নিজে। তারা আল্লাহ্র বিবেচনায় সম্মানার্হ বলে হজরত আজরাইলকে তাদের কাছে পাঠান না। সমুদ্রবক্ষে নিমজ্জিতরা তো আল্লাহ্র পথের পথিক বলেই গণ্য। হাদিসটির সূত্রপ্রবাহভূত জুয়াইবীর আবার বর্ণনাকারীরূপে অকিঞ্চন বলে পরিচিত। এদিকে আবার হজরত ইবনে আব্বাসের সঙ্গে জুহাকের যোগসূত্রও বিচ্ছিন্ন। অবশ্য বর্ণিত সাহাবীবচনের শেষ দিকের অনুরূপ একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে সর্বোন্নত সূত্রে।

হজরত আবু উমামা বাহিলী থেকে ইবনে মাজা কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা শহীদগণ ছাড়া অন্য সকলের প্রাণহরণ করার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন হজরত আজরাইলের উপর। আর সমুদ্রসমাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রাণহরণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন নিজে। আমি বলি, আল্লাহ্র প্রেমসমুদ্রে সমাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিই এমতো সৌভাগ্যলাভের অধিকতর যোগ্য। আল্লাহ্ই সমধিক অবহিত।

এরপর বলা হয়েছে— 'অবশেষে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যানীত হবে'। একথার অর্থ— মৃত্যুর পর বিশ্বাসীগণের পুণ্য আত্মা নিয়ে রহমতের ফেরেশতারা উঠে যাবে সপ্তম আকাশে 'ইল্লিয়্যীন' নামক স্থানে। আর অবিশ্বাসীদের আত্মা নিয়ে আযাবের ফেরেশতারা প্রথম আকাশে উঠে যাবে। কিন্তু তাদের জন্য প্রথম আকাশের দরোজা উন্মুক্ত করা হবে না। বরং দুরাত্মাগুলোকে নিক্ষেপ করা হবে দূরে, সিজ্জীন নামক স্থানে। হাদিসটির পূর্ণ উল্লেখ সন্নিবেশিত হয়েছে সুরা আনয়া'মের যথাস্থানে। ইচ্ছে করলে সেখানে পুরো হাদিসটি দেখে নেওয়া যেতে পারে। অথবা আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ হবে এরকম— অবশেষে তোমাদের আপনাপন সমাধি থেকে তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করে নিয়ে যাওয়া হবে হাশর প্রান্তরে। সেখানেই দেওয়া হবে চূড়ান্ত ফলাফল।

সূরা সাজ্‌দা ঃ আয়াত **১২, ১৩, ১৪**

وَلَوْ تَرٰۤى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ رَبَّنَاۤ اَبْصَرْنَا وَ سَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ﴿۱۲﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَ لٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّىْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿۱۳﴾ فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ وَ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴﴾

r হায়, তুমি যদি দেখিতে! যখন অপরাধীরা তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে অধোবদন হইয়া বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম ও শ্রবণ করিলাম, এখন তুমি আমাদিগকে পুনরায় প্রেরণ কর, আমরা সৎকর্ম করিব, আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী।'

r আমি ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করিতাম; কিন্তু আমার এই কথা অবশ্যই সত্য ঃ আমি নিশ্চয়ই জ্বিন্ ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করিব।

r তবে, 'শাস্তি আস্বাদন কর, কারণ আজিকার এই সাক্ষাৎকারের কথা তোমরা বিস্মৃত হইয়াছিলে। আমিও তোমাদিগকে বিস্মৃত হইয়াছি, তোমরা যাহা করিতে তজ্জন্য তোমরা স্থায়ী শাস্তি ভোগ করিতে থাক।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! পরকালে অবিশ্বাসী পৌত্তলিকদের অপপরিণতির দৃশ্য যদি আপনাকে প্রত্যক্ষ করানো হতো, তবে আপনি দেখতে পেতেন, তারা লজ্জায়,আক্ষেপে ও ভয়ে জড়সড়ো হয়ে মাথা হেঁট করে বলছে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! ইতোপূর্বে আমরা পুনরুত্থান, বিচার এসব কথা শুনেছিলাম, এখন তা স্বচক্ষে দেখলাম। বুঝলাম, আমরা নিমজ্জিত ছিলাম চরম ভুলের ভিতরে। আমরা সে ভুল এবার শুধরে নিতে চাই। সুতরাং তুমি আমাদেরকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করো। আমরা এবার হবো দৃঢ় বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ।

এখানে 'আবসরনা' (প্রত্যক্ষ করলাম) অর্থ আমাদের পৃথিবীবাসের সময় পরকাল সম্পর্কিত যে সকল সংবাদ আমাদের কাছে পৌঁছেছিলো, আজ তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম। 'সামি'না' (শ্রবণ করলাম) অর্থ পৃথিবীতে তোমার প্রেরিত পুরুষগণ যে সকল কথা আমাদেরকে শুনিয়েছিলেন, আজ সে সকল বিষয় আমরা সরাসরি শুনলাম তোমার পক্ষ থেকে। কেউ কেউ কথাদুটোকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমরা এবার স্বচক্ষে অবলোকন করলাম আমাদের পাপরাশিকে এবং স্বকর্ণে শুনতে পেলাম আমাদের নিদারুণ পরিণতির কথা। আর 'ইন্না মূক্বিনূন' (আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী) অর্থ— আমরা পৃথিবীতে ছিলাম সন্দিগ্ধচিত্ত, কিন্তু স্বচক্ষে সবকিছু দেখে এবং স্বকর্ণে সবকিছু শুনে এবার আমরা হয়েছি দৃঢ় প্রত্যয়ী।

পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতাম, কিন্তু আমার কথা অবশ্যই সত্যঃ আমি নিশ্চয় জ্বিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবো'। একথার অর্থ— আমি যদি ইচ্ছা করতাম, তবে অবশ্যই প্রত্যেক মানুষ ও জ্বিনকে করতে পারতাম সত্যপথানুসারী। কিন্তু আমার স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত এই যে, আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবোই। আর পূর্ণ করবো অবিশ্বাসী মানুষ ও জ্বিনদের দ্বারা'।

এখানে 'মিনাল জ্বিন্নাতি ওয়ান্নাস' (জ্বিন ও মানুষ উভয় দ্বারা) বাক্যটির 'আলিফ-লাম' সীমিত অর্থবোধক। এর দ্বারা সীমায়িত করা হয়েছে মানুষ ও জ্বিন সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবল পাপিষ্ঠদেরকে। জননী আয়েশার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, কোনো কোনো মানুষ জন্মপূর্ব থেকে পিতার পৃষ্ঠদেশে থাকার সময়েই দোজখীরূপে নির্ধারিত এবং কোনো কোনো মানুষ বেহেশতী বলে স্থিরীকৃত জন্মপূর্ব সময় থেকেই, যখন তারা অবস্থান করে তাদের পিতার পৃষ্ঠদেশে।

হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, প্রত্যেকের জন্যই স্থিরীকৃত রয়েছে সুনির্দিষ্ট আবাসস্থল— জান্নাত অথবা জাহান্নাম। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশবাহক! তাহলে আমরা আমল পরিত্যাগ করে

নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবো না কেনো? তিনি স. আজ্ঞা করলেন, না, কর্মরত থাকো। প্রত্যেকেই ওই কর্ম সম্পন্ন করবার সামর্থ্যপ্রাপ্ত, যে কর্মের জন্য সে সৃষ্ট। সৌভাগ্যবানদের জন্য সহজ পুণ্যকর্ম এবং দুর্ভাগাদের জন্য মনোপুত পাপ। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন— 'ফাআম্‌মা মান আ'তা ওয়াত্তাক্বা ওয়া সদ্দাক্বা বিল হুসনা' (কাজেই যে দান করে ও সংযমী হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য বলে মনে করে, আমি তাকে সহজ পথ দান করবো সুখের বিষয়ের জন্য)। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. তাঁর পবিত্র হাতে দুটি লিখিত কাগজ নিয়ে বহির্বাটিতে উপস্থিত হলেন। বললেন, তোমরা কি জানো, এই কাগজ-দুটোতে কি লেখা রয়েছে? আমরা বললাম, জানিনা। তিনি স. তাঁর ডান হাতের কাগজটি দেখিয়ে বললেন, এতে রয়েছে স্বর্গবাসীদের নাম ও পিতৃপরিচয়। এটাই অদৃষ্ট লিপি। এ অদৃষ্টলিপি চূড়ান্ত, অপরিবর্তনীয়। এরপর তিনি স. তাঁর বাঁ হাতের কাগজটি দেখিয়ে বললেন, আর এতে রয়েছে নরকবাসীদের নাম ও পিতৃপরিচয়। এটাও অদৃষ্ট লিপি, আর এটাও চূড়ান্ত ও পরিবর্তনরহিত। আমরা বললাম, হে প্রত্যাদেশিত পুরুষ! বিষয়টি যখন চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তিকৃত, তখন কর্মের আর কী প্রয়োজন? তিনি স. বললেন, কর্মসচল থাকো মধ্যম গতিতে, সম্মিলিতভাবে। স্বর্গবাসীরা অন্তিমযাত্রা করবে পুণ্যশোভিত হয়ে, ইতোপূর্বে সে যা কিছু করে থাকুক না কেনো। আর নারকীরা জীবন সাঙ্গ করবে পাপিষ্ঠরূপে, ইতোপূর্বে তারা যা কিছুই করুক না কেনো। অতঃপর রসুল স. শূন্যে নিক্ষেপ করলেন তাঁর হাতের কাগজদুটো। মুহূর্ত মধ্যে উধাও হয়ে গেলো সেদুটো। তারপর বললেন, তোমাদের প্রভুপালক তাঁর অনুচরবর্গের নিকট থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন— একদল স্বর্গবাসী, আরেকদল নারকী।

এখানকার 'জাহান্নাম পূর্ণ করবো' কথাটি 'এই কথা' পদের বিশেষণ। মুকাতিল বলেছেন, এখানে 'এই কথা' বলে বুঝানো হয়েছে আল্লাহ্‌র ওই অঙ্গীকারকে, যা তিনি ঘোষণা করেছিলেন ইবলিসকে লক্ষ্য করে। বলেছিলেন— অবশ্যই আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবো তুমি ও তোমার অনুসারীদের দ্বারা।

আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়টিও সুপ্রকট যে, মানুষের ইমানপ্রাপ্তি সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়নির্ভর। তাই এখানে 'এই কথা অবশ্যই সত্য' বলে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, দোজখবাসীরা অভিপ্রায়শূন্য। আর তাদের অবিশ্বাসী হওয়া এবং দোজখগমনের বিষয়টি সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রায়পুষ্ট। অথবা বলা যেতে পারে, এখানকার 'জাহান্নাম পূর্ণ করবো' অর্থ তাদের জাহান্নামগমনের সিদ্ধান্তটি পূর্বনির্ধারিত। তাই ইমান প্রাপ্তির বিষয়টি তাদের অভিপ্রায়গত নয়।

অবশ্য পূর্ববর্তী আয়াতে পরকালবিস্মৃতিকে তাদের জাহান্নামগমনের কারণরূপে নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু কারণ পূর্বনির্ধারিত নয়। পূর্বনির্ধারিত হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায়। সেকথাই বলা হয়েছে এই আয়াতে।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'সুতরাং শাস্তি আস্বাদন করো, কারণ আজকের এই সাক্ষাতকারের কথা তোমরা বিস্মৃত হয়েছিলে। আমিও তোমাদেরকে বিস্মৃত হয়েছি। তোমরা যা করতে তার জন্য তোমরা স্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাকো'।

উল্লেখ্য, ভুলে যাওয়া একটি ত্রুটি, আর আল্লাহ্ যাবতীয় ত্রুটি থেকে পবিত্র। সুতরাং এখানকার 'আমিও তোমাদেরকে বিস্মৃত হয়েছি' কথাটির মর্মার্থ হবে— আমিও আজ তোমাদেরকে বঞ্চিত করলাম আমার কৃপা থেকে। অথবা মর্মার্থ হবে— মানুষ যে ভাবে ভুল করে কোনো জিনিসকে ফেলে রেখে দেয়, তেমনি আমি ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে হলেও তোমাদেরকে এখন ফেলে রাখলাম অনন্ত শাস্তিতে। আমার অনুকম্পা থেকে তোমাদেরকে করলাম চিরবঞ্চিত।

এখানে 'আজকের এই সাক্ষাতের কথা' অর্থ আপনাপন সমাধি থেকে গাত্রোত্থানের পর মহাবিচারপর্বের এই লগ্নের কথা। আর ' তোমরা যা করতে তার জন্য' অর্থ পৃথিবীতে তোমরা যে কুফরী ও অনানুগত্য করতে তার জন্য। ইতোপূর্বেও পরকালের প্রতি অস্বীকৃতি বা কুফরীকে নির্ধারণ করা হয়েছে দোজখের শাস্তির কারণরূপে। এখানেও সেরকমই করা হলো। পুনঃপুনঃ একথা উল্লেখ করার মধ্যে এই ইঙ্গিতটি নিহিত রয়েছে যে, পরলোকবিস্মৃতি ও পাপাচারের সীমালংঘনই দোজখের শাস্তিকে করে অবধারিত।

আলোচ্য আয়াত বিভ্রান্ত জাবা্রিয়া ও কাদ্রিয়া সম্প্রদায়ের অপবিশ্বাসের একটি বিরুদ্ধ প্রমাণ। জাবা্রিয়া সম্প্রদায় মানুষকে মনে করে জড়পদার্থতুল্য অসহায়। আর কাদ্রিয়ারা বিশ্বাস করে, মানুষ নিজেই তার কর্মের স্রষ্টা। এখানে 'এই সাক্ষাতের কথা তোমরা বিস্মৃত হয়েছিলে'কথাটি জাবা্রিয়াদের মতাদর্শের বিরুদ্ধে একটি অনড় প্রতিবাদ। পরকালবিস্মৃতিই এখানে তাদের শাস্তিভোগের কারণ। সুতরাং পরকালবিস্মৃতির জন্য তারা অবশ্যই দায়ী। কেননা চিন্তা-গবেষণা, ইমান, পাপ ইত্যাদি মানুষের ইচ্ছাধীন। আর কাদ্রিয়ারা বলে, আল্লাহ্পাক চান কেবল ইমান ও পুণ্যকর্ম। কিন্তু মানুষ নিজ ইচ্ছায় তা পরিত্যাগ করে। সুতরাং তার নিজের দুষ্কর্মের স্রষ্টা সে নিজে। একথার প্রতিবাদ ঘোষিত হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতে এভাবে— 'আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতাম'। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের কোনো ইচ্ছাই আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে কার্যকর হয় না। কিন্তু আল্লাহ্র অভিপ্রায় অবিকল বলপ্রয়োগ যেমন নয়, তেমনি কেউই তাঁর অভিপ্রায়ের

আওতাবহির্ভূতও নয়। সুতরাং এমতোক্ষেত্রে মধ্যবর্তী বিশ্বাসই হচ্ছে সরল ও নির্ভুল বিশ্বাস। অর্থাৎ সৃজন আল্লাহ্‌র এবং অর্জন বান্দার। তাই তিনি সৃজয়িতা এবং তাঁর দাসেরা নির্মাতা। অতএব একথা মেনে নিতেই হবে যে, মানুষ আল্লাহ্‌র বিধানকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে, কিন্তু তাঁর অভিপ্রায়কে অমান্য করতে পারে না কিছুতেই।

সূরা সাজ্‌দা ঃ আয়াত ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২

اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا
وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ هُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۩ ﴿١٥﴾ تَتَجَافٰى
جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا ۡ وَّ مِمَّا
رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ
اَعْيُنٍ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٧﴾ اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ
كَانَ فَاسِقًا ؕ لَا يَسْتَوٗنَ ﴿١٨﴾ اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى ۡ نُزُلًۢا بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٩﴾
وَ اَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ
يَّخْرُجُوْا مِنْهَآ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَ قِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ
الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ
الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٢١﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ
بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ؕ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ ﴿٢٢﴾

r কেবল তাহারাই আমার নিদর্শনাবলী বিশ্বাস করে যাহারা উহার দ্বারা উপদিষ্ট হইলে সিজ্‌দায় লুটাইয়া পড়ে এবং তাহাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আর তাহারা অহংকার করে না।

r তাহারা শয্যাত্যাগ করিয়া তাহাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশংকায়, এবং আমি তাহাদিগকে যে রিয্‌ক দান করিয়াছি উহা হইতে তাহারা ব্যয় করে।

r কেহই জানে না তাহাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কী লুকায়িত রাখা হইয়াছে তাহাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ!

r তবে যে ব্যক্তি মু'মিন, সে কি পাপাচারীর ন্যায়? উহারা সমান নহে।

r যাহারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে তাহাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাহাদের আপ্যায়নের তাহাদের স্থায়ী বাসস্থান হইবে জান্নাত।

r এবং যাহারা পাপাচার করিয়াছে তাহাদের বাসস্থান হইবে জাহান্নাম; যখনই উহারা জাহান্নাম হইতে বাহির হইতে চাহিবে তখনই উহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে উহাতে এবং উহাদিগকে বলা হইবে, 'যে অগ্নিশাস্তিকে তোমরা মিথ্যা বলিতে উহা আস্বাদন কর।'

r গুরুশাস্তির পূর্বে উহাদিগকে আমি অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাইব, যাহাতে উহারা ফিরিয়া আসে।

r যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া তাহা হইতে মুখ ফিরায় তাহার অপেক্ষা অধিক জালিম আর কে? আমি অবশ্যই অপরাধীদিগকে শাস্তি দিয়া থাকি।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— বিশ্বাসবানদের স্বভাব এরকম, তারা আমার প্রত্যাদেশিত সদুপদেশ শোনার সঙ্গে সঙ্গে সেজদাবনত হয়ে প্রকাশ করে তাদের কৃতজ্ঞতা এবং ঘোষণা করে আমার প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা। আর তারা এমতো পুণ্যবান হওয়া সত্ত্বেও হয় বিনয়ী, অহংকার প্রকাশ কদাচ করে না।

এখানে 'জুক্‌কিরু' অর্থ যখন তাদেরকে প্রদান করা হয় উপদেশ। 'খর্‌রু' অর্থ লুটিয়ে পড়ে। 'সাববাহু' অর্থ ঘোষণা করে পবিত্রতা, যেহেতু তারা জানে তাদের প্রভুপালক সকল প্রকার ক্ষয়ক্ষতি, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অজ্ঞতা-অক্ষমতা থেকে চিরমুক্ত, চিরপবিত্র। 'বি হামদি রববিহিম' অর্থ বর্ণনা করে তাদের প্রভুপালকের সকৃতজ্ঞ প্রশংসা। যেহেতু তিনি তাদেরকে দিয়েছেন ইমান গ্রহণের সুযোগ ও সামর্থ্য। অর্থাৎ তারা তাদের হৃদয়ের প্রতীতি সহ বাচনিকভাবে বলে 'সুবহানাল্লহি ওয়া বি হামদিহী'।

নির্দেশনাঃ এই আয়াত যাঁরা আরবীতে পাঠ করলেন, তাঁরা তেলাওয়াতের সিজদা করে নিন।

পরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশংকায়'। একথার অর্থ— ওই সকল কৃতজ্ঞচিত্ত ও বিনয়াবনত বিশ্বাসবানেরা রাতের শয্যাসুখ পরিত্যাগ করে নামাজে দণ্ডায়মান হয় আল্লাহ্‌র অসন্তোষ ও শাস্তির ভয়ে এবং তাঁর পরিতোষ ও পুণ্যপ্রাপ্তির আশায়।

এখানে 'শয্যাত্যাগ করে' অর্থ রাতের নিদ্রাসুখ পরিহার করে। হজরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ বলেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ মহাবিচারের দিবসে এক সুবিশাল উন্মুক্ত প্রান্তরে সকলকে সমবেত করবেন। সেখানকার ঘোষণা সকলে শুনতে পাবে একইভাবে এবং একইভাবে দেখতে পাবে পরস্পরকে। জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবেন, যারা পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত আল্লাহ্র স্তব-স্তুতি করতো, তারা কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডায়মান হবে একদল লোক। তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে বিনা হিসাবে। এরপর ঘোষণাকারী পুনঃঘোষণা করবে, কোথায় ওই সমস্ত মানুষ যারা শয্যা ত্যাগ করে আল্লাহ্র ইবাদতে মগ্ন হতো? সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াবে কিছুসংখ্যক মানুষ। তারাও বিনা বিচারে প্রবেশ করবে বেহেশতে। এরপর শুরু হবে বিচারপর্ব। এই হাদিসটি হান্নাদ ইবনে রহওয়াইহ্ এবং আবু ইয়ালীও লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁদের আপনাপন গ্রন্থে। তবে তাঁদের উদ্ধৃতিতে অতিরিক্ত রয়েছে এই কথাটুকু— ওই ঘোষকের ঘোষণা সকলেরই শ্রুতিগোচর হবে সমভাবে। ফলে তারা বুঝতে পারবে, আজ সর্বাধিক কল্যাণপ্রাপ্ত কারা।

হাসান বসরী, মুজাহিদ, ইমাম মালেক, ইমাম আওযায়ী ও আলেমগণের এক বিরাট দল বলেছেন, এখানে শয্যাত্যাগ করে আশা-আশংকার দোলায় দুলে আল্লাহ্কে ডাকার অর্থ তাহাজ্জুদ নামাজ পাঠ করা।

ইমাম আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, ইবনে আবী শায়বা, ইসহাক ইবনে রহ্ওয়াইহ্ ও হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত মুয়াজ বলেছেন, আমি একবার আমার প্রাণপ্রিয় রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলাম, হে প্রত্যাদেশিত পুরুষ! আমাকে এমন একটি আমলের কথা জানিয়ে দিন, যা আমাকে দোজখ থেকে মুক্ত রাখবে এবং নিয়ে যাবে জান্নাতে। তিনি স. বললেন, তুমি জানতে চেয়েছো এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে আল্লাহ্ যাকে সামর্থ্য দেন, তার জন্য একাজ কঠিন নয়। তবে শোনো, তুমি যা চাও, তা পেতে হলে ইবাদত কোরো কেবল আল্লাহ্র, অন্য কাউকে বা কোনোকিছু স্থির কোরো না তাঁর সমকক্ষ। আর পালন কোরো নামাজ, আদায় কোরো জাকাত, রোজা রেখো রমজান মাসে এবং হজ কোরো কাবা শরীফের। তিনি স. আরো বললেন, কল্যাণতোরণের সন্ধানও জেনে নাও এই সাথে। শোনো, রোজা প্রতিরক্ষার উপকরণ। পানি যেমন অগ্নিশিখাকে নির্বাপিত করে, তেমনি দান-খয়রাত নির্বাপিত করে পাপাগ্নিকে। আর প্রকৃত কল্যাণতোরণ হচ্ছে মধ্য রাতের নামাজ। এরপর তিনি স. তেলাওয়াত করলেন আলোচ্য আয়াত। পুনর্বার তিনি স. বললেন, ধর্মের স্তম্ভ ও শৈলশৃঙ্গ কী তা-ও শুনে নাও এবার। ধর্মের স্তম্ভ হচ্ছে নামাজ এবং শৈলশৃঙ্গ হচ্ছে জেহাদ। তিনি স. আবারো বললেন, আমি কি তোমাকে জানাবো না, এসকল পুণ্যের পটভূমিকাটি কী? আমি বললাম, নিশ্চয়। তিনি স. তাঁর পবিত্র রসনা স্পর্শ করে বললেন, একে সংযত রেখো। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! কথা বলার জন্যও কি

আমাদেরকে অভিযুক্ত হতে হবে? তিনি স. বললেন, মুয়াজ! তোমার জন্য তোমার মাতা বিলাপ করুক। জেনে রেখো, কেবল রসনার অসংযতিই মানুষের দোজখ প্রবেশের জন্য যথেষ্ট।

হজরত আবু মালেক আশয়ারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে রয়েছে এমন এমন স্বচ্ছ প্রাসাদ যেগুলোর ভেতর থেকে বাইরে এবং বাইরে থেকে ভিতরে দৃষ্টিগোচর হবে অনায়াসে। ওই প্রাসাদগুলোর অধিকারী হবে তারা, যারা মিষ্টভাষী, নিরন্নকে অন্নপ্রদাতা, নিরবচ্ছিন্ন রোজা প্রতিপালনকারী এবং গভীর রাতে নামাজ পাঠকারী, যখন মানুষ থাকে সুপ্তিমগ্ন। বায়হাকী হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তাঁর শো'বুল ইমানে। অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত আলী থেকে তিরমিজিও।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, রমজানের রোজার পরে সর্বোত্তম রোজা হচ্ছে আল্লাহ্‌র মাসের রোজা। অথার্ৎ মহররম মাসের রোজা। আর ফরজ নামাজের পর সবচেয়ে উত্তম নামাজ হচ্ছে নিশিথের নামাজ। ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত অনুরূপ হাদিসের শেষ কথাটি এরকম— ফরজ নামাজের পরে সর্বোত্তম নামাজ হচ্ছে নিশুতি রাতের নামাজ।

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, দু'ধরনের লোককে আল্লাহ্ ভালোবাসেন। এক ধরনের লোক তারা, যারা গভীর রাতের নিদ্রাসুখ পরিত্যাগ করে নামাজে দণ্ডায়মান হয়। আর এক ধরনের লোক তারা, যারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্‌র পথে। পরাজিত হয়ে তাৎক্ষণিক পশ্চাদপসরণ করলেও পুনরায় ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুসেনার উপর। এভাবে প্রাণপন লড়াই করে হয় শহীদ।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বাগবী কর্তৃক বর্ণিত হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রহওয়াইহ্ খাজরাজী আনসারীর এক কবিতায় বলা হয়েছে— আমাদের মধ্যে রয়েছেন একজন প্রত্যাদেশিত পুরুষ। প্রভাতে তিনি নিমগ্ন হন কোরআন পাঠে। আমরা পথ হারাবার পর তিনিই আমাদেরকে দিয়েছেন পথের দিশা। আমরা তাঁকে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি। তিনি নিশুতি রাতে শয্যাসুখ ত্যাগ করেন, যখন অবিশ্বাসীরা পড়ে থাকে তাদের আপনাপন শয্যায় মৃতবৎ।

আমি তাহাজ্জুদ নামাজের মাহাত্ম্যসম্বলিত হাদিসগুলি সন্নিবেশিত করেছি সুরা মুয্যামমিলের তাফসীরে। যথাস্থানে সেগুলো পাঠ করে নেয়া যেতে পারে।

তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত এবং বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে তাদের কথা, যারা মাগরিবের নামাজ সমাধা করার পর অপেক্ষমান থাকে ইশার নামাজের জন্য।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আমাদেরকে অর্থাৎ আনসারদেরকে লক্ষ্য করে। আমরা মাগরিবের নামাজ পাঠ করে বসে থাকতাম ইশার প্রতীক্ষায়। তারপর যথাসময়ে রসুল স. এর সঙ্গে ইশার নামাজ সমাধা করে ফিরে যেতাম আপনাপন গৃহে।

হজরত আনাস কর্তৃক আরো বর্ণিত হয়েছে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কিছুসংখ্যক সাহাবী সম্পর্কে। তাঁরা মাগরিবের নামাজ সমাপনের পর মসজিদে বসেই অপেক্ষা করতেন ইশার নামাজের । বর্ণনাটি সংকলন করেছেন ইবনে মারদুবিয়া। মূল বিবরণটি উল্লেখিত হয়েছে সুনানে আবু দাউদে। ইবনে আবী হাতেম এবং মোহাম্মদ ইবনে মুনকাদির বলেছেন, এখানে বলা হয়েছে আউয়াবিন নামাজের কথা। শিথিল সূত্র সহযোগে বায্যার বর্ণনা করেছেন, হজরত বেলাল বলেছেন, আমরা কয়েক জন মাগরিবের পর ইশার নামাজের অপেক্ষায় মসজিদেই বসে থাকতাম। আমাদের এমতোকর্মকে লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আবু দারদা, হজরত আবু জর এবং হজরত উবাদা ইবনে সামেত রসুল স. এর সঙ্গে জামাতবদ্ধ হয়ে আদায় করতেন ইশা ও ফজর। হজরত ওসমান থেকে আহমদ ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি ইশার নামাজ জামাতবদ্ধ হয়ে আদায় করলো, সে যেনো ইবাদত করলো অর্ধরাত্রি ব্যাপী। এর সঙ্গে সে যদি ফজরের নামাজও জামাতবদ্ধ হয়ে আদায় করে তাহলে সে যেনো ইবাদতে অতিবাহিত করলো সারা রাত।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী, মুসলিম, আহমদ ও নাসাঈ কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আজান দেওয়া এবং প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে নামাজ পাঠ করার মর্যাদা যদি মানুষ জানতো তবে লটারী ছাড়া কেউ আজান দিতে এবং সামনের কাতারে দাঁড়াবার সুযোগ পেতো না। তেমনি জোহরের নামাজের ফযীলত সম্পর্কে জানলে মানুষ জোহরের জামাতে উপস্থিত হতো দৌড়ে। আর ফজর ও ইশার নামাজের উপকার কী তা বুঝতে পারলে চলচ্ছক্তিহীনেরাও জামাতে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করতো হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দান করেছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে'। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে বলা হয়েছে জাকাতের অর্থ ব্যয় করার কথা। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'ব্যয় করে' অর্থ নফল দান-খয়রাত করে।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'কেউই জানে না তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ'। এখানে 'নাফসুন' (কেউই) বলে বুঝানো হয়েছে নবী-রসুলগণ ও নৈকট্যভাজন ফেরেশতাবৃন্দকে। অর্থাৎ তারাও জানেন না, বিশ্বাসবানগণের জন্য আল্লাহ্ কীরকম নয়নাভিরাম পুরস্কার রেখে দিয়েছেন।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, আমি আমার পুণ্যবান বান্দাগণের জন্য এমনই পুরস্কার রেখে দিয়েছি, যার বিবরণ কখনো শোনেনি কোনো কান এবং সে পুরস্কার কখনো দেখেনি কোনো চোখ। আর যার কথা কখনো ধারণাও করতে পারে না কোনো মানবহৃদয়। একথার প্রমাণরূপে যদি তোমরা চাও তবে আবৃত্তি করো— কেউই জানে না তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর...।

সাঈদ ইবনে যোবায়েরের মাধ্যমে ওয়াহেদী ও ইবনে আসাকের বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার বিতণ্ডা উপস্থিত হলো হজরত আলী ও ওলীদ ইবনে উকবার মধ্যে। এক পর্যায়ে ওলীদ ভয়ানক রেগে গিয়ে বললো, চুপ থাকো। আমি তোমার চেয়ে অধিক বাকপটু, মল্লযোদ্ধা ও বীর। হজরত আলী বললেন, তুমি চুপ থাকো। তুমিতো আল্লাহ্‌র অবাধ্য। এঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত(১৮)।

বলা হলো— 'তবে যে ব্যক্তি মুমিন, সে কি পাপাচারীর ন্যায়? তারা সমান নয়'। এখানে 'ফাসেক্ব' অর্থ বিশ্বাসবিবর্জিত, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, কাফের।

উল্লেখ্য, হজরত আলী এবং ওলীদ ইবনে উকবার বচসার প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। একথা হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বিভিন্ন সূত্রপরম্পরায় ব্যাপকভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে আতা ইবনে ইয়াসারের বিবৃতির অনুরূপ ওয়াহেদী ও ইবনে আসাকেরের বিবৃতি সংকলন করেছেন ইবনে জারীর। খতিব বাগদাদী তাঁর 'ইতিহাস' গ্রন্থে উপরন্তু কালাবীর মাধ্যমে আবু সালেহ সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন ইবনে আদী। আবার আমর ইবনে দীনারের উদ্ধৃতিতে ইবনে লেহিয়ার মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃত উক্তিটি সংকলন করেছেন ইবনে আসাকের। সবগুলো বিবরণের তথ্য একই। অর্থাৎ হজরত আলী ও ওলীদ ইবনে উকবার বচসাই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিত। 'তারা সমান নয়' অর্থ বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী কখনোই সমান্তরাল নয়। তাদের উভয়ের কর্মকাণ্ড, গতিবিধি ও গন্তব্য বিপরীতমুখী। এই বিপরীতমুখিতা সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া হয়েছে পরবর্তী আয়াত চতুষ্টয়ে।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'যারা ইমান আনে, সৎকর্ম করে তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাদের আপ্যায়নের জন্য তাদের স্থায়ী বাসস্থান হবে জান্নাত'। একথার অর্থ— বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলেরা যাবে জান্নাতে। সেখানে তাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে সাদর আপ্যায়নের বিপুল আয়োজন।

এরপরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'এবং যারা পাপাচার করেছে তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম; যখনই তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে তাতে এবং তাদেরকে বলা হবে, যে অগ্নিশাস্তিকে তোমরা মিথ্যা বলতে, তা আস্বাদন করো।

উল্লেখ্য, মানুষের প্রকৃত স্বদেশ হচ্ছে জান্নাত আর বিদেশ জাহান্নাম। সে যদি স্বদেশে ফিরে যেতে না চায়, তবে তাদেরকে ঠেলে দেয়া হবে বিদেশ বা জাহান্নামের দিকেই। আর বিদেশবাস তাদের জন্য হবে চিরস্থায়ী। এখানকার 'উয়ীদূ ফীহা' (ফিরিয়ে দেওয়া হবে তাতে), কথাটির মধ্যে রয়েছে সে বক্তব্যেরই ইঙ্গিত। আর 'ওয়া ক্বীলা লাহুম' (তাদেরকে বলা হবে) অর্থ তাদেরকে লাঞ্ছনা ও অপমান করার উদ্দেশ্যেই তখন বলা হবে— যে অগ্নিশাস্তিকে তোমরা অস্বীকার করতে, এখন ভোগ করো সেই আগুনেরই শাস্তি।

এরপরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'গুরু শাস্তির পূর্বে আমি অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাবো, যাতে তারা ফিরে আসে'। একথার অর্থ— পরকালের কঠিন শাস্তির পূর্বে আমি তাদেরকে এই দুনিয়ায় আস্বাদন করাবো লঘু শাস্তি, যাতে তাদের চৈতন্যোদয় হয়, ফিরে আসার সুযোগ পায় সত্যের পথে।

হজরত উবাই ইবনে কা'ব, জুহাক, হাসান বসরী ও ইব্রাহিম নাখয়ী বলেছেন, এখানে 'লঘু শাস্তি' বলে বুঝানো হয়েছে অবিশ্বাসীরা পৃথিবীতে যে সকল রোগ-শোক ও দুঃখ বিপদে ভোগে, সেই সকল সমস্যাকে। দায়লামীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাসও এরকম ব্যাখ্যা করেছেন। ইকরামা বলেছেন, এখানে 'লঘু শাস্তি' অর্থ শরিয়তের ইহজাগতিক দণ্ডবিধান। মুকাতিল বলেছেন, এখানে 'লঘু শাস্তি' দ্বারা বুঝানো হয়েছে মক্কার পৌত্তলিকদের উপরে আপতিত সুদীর্ঘ ছয় বৎসরের একটানা দুর্ভিক্ষের কথা। ওই সময় তারা ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয়েছিলো মৃত জন্তুর হাড় মাংস খেতে। কুকুরের গোশত পর্যন্ত ভক্ষণ করতে হয়েছিলো তাদেরকে।

'যাতে তারা ফিরে আসে' অর্থ বদর যুদ্ধের পরে যে সকল পৌত্তলিক বেঁচে ছিলো, যারা রক্ষা পেয়েছিলো দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস থেকে তারা যেনো লাভ করে ইসলামে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ।

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে তা থেকে মুখ ফিরায় তার অপেক্ষা অধিক জালেম আর কে? আমি অবশ্যই অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি'।

এখানে 'মুখ ফিরায়' অর্থ আল্লাহর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে তারা চিন্তা-ভাবনা মাত্রই করে না, অবলীলায় প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্, আল্লাহ্র রসুল ও কোরআনকে। আর এখানকার 'ছুম্মা' পরম্পরা-প্রকাশক অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে বিস্ময় প্রকাশার্থে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী তো প্রকাশ্যেই পরিদৃশ্যমান, অথচ অংশীবাদীরা কতোইনা জালেম! তারা এ সম্পর্কে একটু ভেবেও দেখলো না।

‘আমি অবশ্যই অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি’ অর্থ, এটাই আমার চিরাচরিত নিয়ম যে, যারা অপরাধী তারা আমার দ্বারা অবশ্যই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। আর মক্কার পৌত্তলিকেরা তো সবচেয়ে বড় অপরাধী। কেননা তারা অস্বীকার করে চলেছে সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বশেষ রসুল ও সর্বশেষ মহাগ্রন্থকে। সুতরাং তাদেরকে শাস্তি তো আমি দিবোই।

সূরা সাজ্‌দা ঃ আয়াত ২৩, ২৪

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُنْ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآئِهٖ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۝٢٣ وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ؕ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ ۝٢٤

r আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম; অতএব তুমি তাহার সাক্ষাত সম্বন্ধে সন্দেহ করিও না, আমি ইহাকে বনী ইসরাইলের জন্য পথ-নির্দেশক করিয়াছিলাম।

r আর আমি উহাদের মধ্য হইতে নেতা মনোনীত করিয়াছিলাম যাহারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ-প্রদর্শন করিত। যেহেতু উহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল আর উহারা ছিল আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘আমিতো মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতএব তুমি তার সাক্ষাত সম্বন্ধে সন্দেহ কোরো না’। একথার অর্থ— হে আমার সর্বশেষ রসুল! আপনাকে যেমন কোরআন দিয়েছি, মুসা নবীকেও তেমনি দিয়েছিলাম একটি কিতাব। সুতরাং মুসা নবী যেমন আমা কর্তৃক প্রদত্ত ওই গ্রন্থ সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি আপনিও হৃদয়ের সকল অনুরাগ দিয়ে গ্রহণ করুন এই কোরআনকে, এ সম্পর্কে দ্বিধা আড়ষ্টতাকে প্রশ্রয় দিবেন না মোটেও। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন সুদ্দী। আর হজরত ইবনে আব্বাসের ব্যাখ্যাটি, যা রসুল স. কর্তৃক অনুমোদিত, তা বর্ণনা করেছেন তিবরানী। ব্যাখ্যাটি এরকম— নবী মুসা আল্লাহ্‌র সাক্ষাত পেয়েছিলেন তুরপর্বতে, সুতরাং হে আমার সর্বশেষ নবী! আপনি বিষয়টিকে অস্পষ্ট কোনো বিষয় বলে মনে করবেন না। কেউ কেউ বক্তব্যটির মর্মার্থ করেছেন এভাবে— এ বিষয়টি সন্দেহাতীত যে, মেরাজ রজনীতে রসুল স. এর সঙ্গে সাক্ষাত ঘটেছিলো হজরত মুসার। যেমন বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মেরাজ রজনীতে নবী মুসার সঙ্গে সাক্ষাত ঘটেছিলো আমার। তিনি ছিলেন ঝাঁকড়া চুল

বিশিষ্ট কৃশকায় ও সুন্দর। দেখে মনে হচ্ছিলো, তিনি হয়তো শিনওয়া গোত্রের কেউ। ঈসা নবীর সাক্ষাতও পেয়েছিলাম আমি। তিনি ছিলেন মধ্যমাকৃতির। তাঁর গায়ের রঙ যেনো দুধে আলতায় মেশানো। আর তাঁর মাথায় ছিলো বাবরী চুল। আরো অনেকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো ওই রাতে। যেমন দোজখের প্রহরীপতি মালেক, অভিশপ্ত দাজ্জাল। এরপর তিনি স. আবৃত্তি করলেন 'অতএব তুমি তার সাক্ষাত সম্বন্ধে সন্দেহ কোরো না'।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, একবার আমি এক প্রবাসযাত্রায় সহযাত্রী হলাম রসুল স. এর। কাফেলা চলছিলো এক গিরি উপত্যকার পাশ দিয়ে। তিনি স. প্রশ্ন করলেন, এটা কোন উপত্যকা? আমাদের মধ্যে একজন বললেন, আম্রক। তিনি স. বললেন, মেরাজরজনীতে আমি উড়ে গিয়েছিলাম এই উপত্যকার উপর দিয়ে। হঠাৎ দেখলাম, মুসা নবী তাঁর দুই কর্ণে আঙুল প্রবেশ করিয়ে উচ্চস্বরে 'লাব্বাইক' 'লাব্বাইক' বলে আল্লাহ্‌কে ডাকছেন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এরপর আমরা আরো অগ্রসর হলাম। এবার পৌঁছলাম আর এক গিরিপথের সন্নিকটে। রসুল স. বললেন, এটা কোন গিরিপথ? আমরা বললাম, মারশা। তিনি স. বললেন মেরাজের রাতে এখানেই আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো নবী ইউনুসের। তিনি ছিলেন একটি লোহিতবর্ণ উষ্ট্রীপৃষ্ঠে আরুঢ়। সর্বাঙ্গ আবৃত ছিলো তাঁর দীর্ঘ পরিচ্ছদে। হাতে ছিলো উষ্ট্রীর লাগাম। তিনিও পথ চলছিলেন 'লাব্বাইক' 'লাব্বাইক' (এই যে আমি, এই যে আমি) বলতে বলতে।

সুরা বনী ইসরাইলের তাফসীর ব্যাপদেশে মেরাজ সম্পর্কিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. এর সঙ্গে নবী মুসার দেখা হয়েছিলো ষষ্ঠ আসমানে। সেখানে তাঁদের মধ্যে নামাজের ওয়াক্তের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচনাও হয়েছিলো। আবার হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, মেরাজ রজনীতে আমি রসুল মুসাকে তাঁর সমাধিতে নামাজ পাঠরত অবস্থায় দেখেছি।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি একে বনী ইসরাইলের জন্য পথপ্রদর্শক করেছিলাম'। একথার অর্থ— আমি রসুল মুসার উপরে যে মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছিলাম, সেই মহাগ্রন্থকেই উপলক্ষ করেছিলাম বনী ইসরাইলদের সুপথপ্রাপ্তির। কাতাদা অর্থ করেছেন— আমি মুসাকে পথপ্রদর্শক করেছিলাম বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠীর। হজরত ইবনে আব্বাসের ব্যাখ্যাও এরকম। আর তাঁর এরকম ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন তিবরানী।

পরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'আর আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথপ্রদর্শন করতো'। একথার

অর্থ— আমি বনী ইসরাইলদের বংশে মনোনীত করেছিলাম অনেক নবী। তাঁরা আল্লাহ্‌র নির্দেশানুসারেই জনগণকে পথপ্রদর্শন করতেন। অথবা আমা কর্তৃক প্রদত্ত সামর্থ্য আনুসারেই তাঁরা মানুষকে সৎপথ প্রদর্শন করতেন। কাতাদা বলেছেন, এখানে পথপ্রদর্শনকারীরূপে নবীগণের কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে বনী ইসরাইলদের বিভিন্ন শাখাগোত্রের নেতৃবৃন্দকে। বিভিন্ন কল্যাণকর বিষয়ে জনতা তাদের অনুসরণ করতো।

এরপর বলা হয়েছে— 'যেহেতু তারা ধৈর্যধারণ করেছিলো' একথার অর্থ— মিসরে অবস্থানকালে ওই সকল নেতৃবর্গকে সহ্য করতে হয়েছিলো অনেক রকম নিগ্রহ। আলোচ্য বাক্যাংশের দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, বিপদাপদে ধৈর্যধারণ নেতাদের জন্য একটি অত্যাবশ্যক গুণ। এরকমও বলা যায় যে, যারা চরম বিপদে ধৈর্যধারণ করে, তারাই হতে পারে জননেতা।

শেষে বলা হয়েছে— 'আর তারা ছিলো আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী'। একথার অর্থ— পথপ্রদর্শন, ধৈর্যধারণ এ সকল গুণ তারা অর্জন করতে পেরেছিলো একারণেই যে, তারা আমা কর্তৃক অবতারিত মহাগ্রন্থ তওরাতের আয়াতসমূহ দৃঢ়বিশ্বাসের সঙ্গে অধ্যয়ন করতো।

সূরা সাজ্‌দা ঃ আয়াত ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٢٥﴾ اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ ۗ اَفَلَا يَسْمَعُوْنَ ﴿٢٦﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَآءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا تَاْكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ ۗ اَفَلَا يُبْصِرُوْنَ ﴿٢٧﴾ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٨﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٢٩﴾

r উহারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করিতেছে তোমার প্রতিপালকই কিয়ামতের দিন তাহাদের মধ্যে উহার ফয়সালা করিয়া দিবেন।

r ইহাও কি তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিল না যে, আমি তো ইহাদের পূর্বে ধ্বংস করিয়াছি কত মানবগোষ্ঠী-যাহাদের বাস ভূমিতে ইহারা বিচরণ করিয়া থাকে? ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে; তবুও কি ইহারা শুনিবে না?

r উহারা কি লক্ষ্য করে না, আমি ঊষর ভূমির উপর পানি প্রবাহিত করিয়া উহার সাহায্যে উদ্‌গত করি শস্য, যাহা হইতে আহার্য গ্রহণ করে উহাদের আন্'আম এবং উহারাও? উহারা কি তবুও লক্ষ্য করিবে না?

r উহারা জিজ্ঞাসা করে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বল, কখন হইবে এই ফয়সালা?'

r বল, 'ফয়সালার দিনে কাফিরদের ঈমান আনয়ন উহাদের কোন কাজে আসিবে না এবং উহাদিগকে অবকাশও দেওয়া হইবে না।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! অংশীবাদীরা না জেনে, না বুঝে কেবল বিদ্বেষবশত আপনার সঙ্গে মতবিরোধ করছে। তাদের এ মতোবিরোধের চূড়ান্ত সমাধান এ পৃথিবীতে হবে না, হবে পরকালে হাশরের মাঠে। তখন আল্লাহ্ চিরদিনের জন্য সত্য ও মিথ্যাকে পৃথক করে দিবেন। ফলে মতোবিরোধের কোনো সুযোগ তখন কেউই পাবে না।

পরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'এটাও কি তাদেরকে পথপ্রদর্শন করলো না যে, আমি তো তাদের পূর্বে ধ্বংস করেছি কতো মানবগোষ্ঠী— যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করে থাকে? এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, তবুও কি এরা শুনবে না'? একথার অর্থ— মক্কার পৌত্তলিকেরা তো ওই সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর বিরাণ লোকালয় স্বচক্ষে দ্যাখে। ওগুলো তো তাদের বাণিজ্যপথের পাশেই। আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার এমতো মর্মবিদারক পরিণাম দেখা সত্ত্বেও কোরআনের সতর্কবাণীর দ্বারা তাদের জ্ঞানকর্ণ সচকিত হয় না কেনো? অবাধ্যতাকে পরিত্যাগ করে কেনো হয় না সত্যপথের অনুসারী? ওই ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদগুলো তো অবশ্যই আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতিশোধ গ্রহণের নিদর্শন। নিদর্শন তাঁর সর্বশক্তিধরতার।

এরপরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'তারা কি লক্ষ্য করে না, আমি উষরভূমির উপর পানি প্রবাহিত করে তার সাহায্যে উদগত করি শস্য, যা থেকে আহার্য গ্রহণ করে তাদের আনয়া'ম এবং তারাও। এরা কি তবুও লক্ষ্য করবে না'?

এখানে 'আলজুরুয্' অর্থ উষর ভূমি, নিষ্ফলা মৃত্তিকা, শ্যামলিমাবিহীন মাটি। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমিই বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে নিষ্ফলা মৃত্তিকাকে করি সঞ্জীবিত। ফলে সেখানে উৎপন্ন হয় বিভিন্ন প্রকার তৃণগুল্ম, ফল ও ফসল। আর সেগুলো দ্বারা উদরপূর্তি করে মানুষ ও প্রাণীকুল। ফলে তাদের অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও প্রজন্মপরম্পরা হতে পারে নির্বিঘ্ন। সতত পরিদৃশ্যমান এই

নিদর্শনটির প্রতি তবুও তারা দৃষ্টি নিবদ্ধ করে না কেনো? কেনো মেনে নেয় না আল্লাহ্‌কে একমাত্র সৃজয়িতা ও পালয়িতা বলে? আর একথাটাও কেনো বুঝতে চেষ্টা করে না যে, আল্লাহ্‌তায়ালা কতো করুণাপরবশ ও শক্তিমান। তিনি যেমন এ বিশাল সৃষ্টিকে সৃজন ও প্রতিপালন করে চলেছেন, তেমনি তিনি এসকল কিছু ধ্বংস করে পুনরায় পূর্বের মতো সৃষ্টি করতেও সক্ষম। সুতরাং কেনো তারা একথা বিশ্বাস করতে চায় না যে, পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী। মহাবিচারপর্বও সুনিশ্চিত।

কাতাদা সূত্রে ইবনে জারীরের একটি বিবরণ বাগবী উল্লেখ করেছেন এভাবে— সাহাবীগণ মক্কার মুশরিকদেরকে বলেছিলেন, সামনে রয়েছে আমাদের শুভদিন। আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে আমাদের চিরবিচ্ছেদ ঘটাবেন। আমি বলি, সাহাবীগণের এমতো কথার উদ্দেশ্য ছিলো একথা বলা যে— আল্লাহ্ আখেরাতে তোমাদের সঙ্গে আমাদের চিরবিচ্ছেদ ঘটাবেন। কালাবী বলেছেন, সাহাবীগণ একথার মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছিলেন মক্কাবিজয়ের। সুদ্দী বলেছেন, তারা বলতে চেয়েছিলেন বদরযুদ্ধের কথা। তাঁরা আরো বলতেন, আল্লাহ্‌ই আমাদের সাহায্যকারী। তিনি আমাদেরকে তোমাদের উপরে বিজয়ী করবেন। একথা শুনে তারা উপহাস করতো। তাদের সেই উপহাসের কথাই বিবৃত হয়েছে পরবর্তী আয়াতে (২৮)।

বলা হয়েছে— 'তারা জিজ্ঞেস করে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বলো কখন হবে এই ফয়সালা'?

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'বলো, ফয়সালার দিনে কাফেরদের ইমান আনয়ন তাদের কোনো কাজে আসবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি ওই সকল বিদ্রূপপ্রবণ ও উন্নাসিক সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে জানিয়ে দিন যে, চূড়ান্ত মীমাংসা তো হবে শেষ বিচারের দিন। আর ওই দিন হচ্ছে প্রতিফল প্রদানের দিন। সুতরাং তোমাদের ওই সময়ের বিশ্বাস তোমাদের কোনো কাজেই তো আসবে না। কারণ তখন মহাসত্য হবে সুস্পষ্ট। ফলে সত্যপ্রত্যাখ্যানের সুযোগ আর কারো থাকবেই না। থাকবে না নতুন করে বিশ্বাসানুকূল আমলের অবকাশ। অবশ্য যারা এখানকার 'ফয়সালা' এর অর্থ করেন বদর দিবস, তারা বক্তব্যটির মর্মার্থ করেন এভাবে— বদরের যুদ্ধে যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, তারা সম্মুখীন হবে ভয়াবহ শাস্তির। তখন তারা বিশ্বাস গ্রহণ করলেও তা তাদের কোনো উপকারে আসবে না। আর সে সুযোগও তাদেরকে দেওয়া হবে না।

লক্ষণীয়, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রশ্নটি ছিলো 'কখন হবে এই ফয়সালা'? তার উত্তরে এখানে বলা হয়েছে 'ফয়সালার দিনে তাদের ইমান আনয়ন তাদের কোনো কাজে আসবে না, আর সে অবকাশও তাদেরকে দেওয়া হবে না'।

বাহ্যতঃ মনে হয় জবাবটি যথাযথ নয়। কিন্তু একটু গভীরে ভাবলেই বোঝা যায়, এটাই ছিলো তাদের প্রশ্নের উপযুক্ত জবাব। কারণ বিজয়ের দিন তারিখ জানার উদ্দেশ্য তাদের মোটেও ছিলো না। তারা মুসলমানদের বিজয়ের কথা একেবারেই বিশ্বাস করতো না। সুতরাং ফয়সালার দিনক্ষণ জানিয়ে আর লাভ কী? বরং তাদের ব্যাঙ্গাত্মক প্রশ্নের প্রেক্ষিতে একথা বলাই তো উচিত যে, ফয়সালার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে আর কী লাভ? তোমরা তো একথা বিশ্বাসই করো না। তবে এতটুকু শুনে নাও যে, ফয়সালার দিবস যখন সমাগত হবে, তখন বাস্তব অবস্থা দেখে শাস্তি থেকে অব্যাহতির নিমিত্তে যদি তোমরা তখন ইমানও আনো, তবুও তো তা গৃহীত হবে না। আর সে অবকাশই বা তোমাদেরকে দেওয়া হবে কেনো? তোমরা যে চিরভ্রষ্ট। উল্লেখ্য, এই যুক্তিসঙ্গত জবাবটিকেই উপস্থাপন করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

সূরা সাজদা ঃ আয়াত ৩০

فَاَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ وَانۡتَظِرۡ اِنَّهُمۡ مُّنۡتَظِرُوۡنَ ﴿۳۰﴾

r অতএব তুমি উহাদিগকে উপেক্ষা কর এবং অগ্রাহ্য কর, উহারাও অপেক্ষা করিতেছে।

এখানে 'অতএব তুমি তাদেরকে অগ্রাহ্য করো' অর্থ হে আমার রসুল! আপনি তাদের অপবচনসমূহের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র করবেন না। তারা যা বলে ও করে, তা-ই বলতে ও করতে দিন তাদেরকে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, জেহাদের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রহিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতের বিধান।

'এবং অপেক্ষা করো' অর্থ, আপনি অপেক্ষা করুন ওই বিজয়ের, যে বিজয়ের অঙ্গীকার আমি করেছি। আর 'তারাও অপেক্ষা করছে' অর্থ অবধারিত অশুভ পরিণামের জন্য তারাও অতিবাহিত করছে বহমান সময়। কেউ কেউ কথা দু'টোর মর্মার্থ করেছেন এভাবে— হে আমার রসুল! আপনি অপেক্ষা করুন শাস্তি আগমনের আর তারা অপেক্ষা করুক শাস্তিভোগের।

হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. ফজরের নামাজে পাঠ করতেন সুরা সাজদা ও হাল আতা আ'লাল ইনসান। হজরত জাবের বলেছেন, রসুল স. সুরা সাজদা ও সুরা মুলক তেলাওয়াত না করে শয্যাগ্রহণ করতেন না। আহমদ, তিরমিজি, দারেমী। তিরমিজি বলেছেন, বর্ণনাটি বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত।

হজরত খালেদ ইবনে মা'দান বলেছেন, আমি সুরা সাজ্‌দা ও সুরা মুলক সম্পর্কে একটি ঘটনা জানি। ঘটনাটি এই— এক লোক প্রতিদিন সুরা দু'টো পাঠ করতো। তার মৃত্যুর পরে সুরা দু'টো তাকে ঘিরে ফেলে আল্লাহ্ সকাশে সুপারিশ

করলো, হে মহাদয়াপরবশ আল্লাহ্। তুমি এ লোকের উপরে সদয় হও। নিশ্চিহ্ন করে দাও তার পাপরাশিকে। সে প্রতিদিন আমাদেরকে আবৃত্তি করতো। আল্লাহ্তায়ালা তাদের সুপারিশ গ্রহণ করলেন। ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন, লোকটির পাপরাশি মুছে ফেলো। তৎপরিবর্তে লিখে দাও পুণ্য। আর তার মর্যাদাও করে দাও অধিকতর উন্নত।

এক বর্ণনায় এসেছে, এই সুরা দু'টো কবরে হবে তাদের পাঠকের প্রতিনিধি। নিবেদন জানাবে, হে মহাপ্রভুপালক! আমরা যদি তোমা কর্তৃক অবতারিত গ্রন্থের সুরা হয়ে থাকি, তবে এই লোকের জন্য আমাদের সুপারিশ গ্রহণ করো। আর যদি তা না হই, তবে তোমার মহাগ্রন্থ থেকে আমাদেরকে অপসারিত করে দাও। এই বলে সুরা দু'টো তাদের ডানা বিস্তার করে দিবে তার পাঠকের উপর। এভাবে আল্লাহ্র আযাব থেকে মুক্ত করবে তাদের পাঠককে। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, অন্যান্য সুরার তুলনায় এই সুরার মর্যাদা ষাট গুণ বেশী। দারেমী।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে দায়লামী ও ইবনে মারদুবিয়া কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি সুরা সাজদা ও সুরা মুলক পাঠ করলো, সে যেনো সওয়াব লাভ করলো কদর রাতের ইবাদতের। হজরত ইবনে ওমর থেকেও ইবনে মারদুবিয়া অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আল্লামা সুয়ূতি বলেছেন, বর্ণনাটি তাঁর নিজস্ব।

সূরা আহযাব

সুরা আহযাব অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। এই সুরার রুকুর সংখ্যা ৯ এবং আয়াতের সংখ্যা ৭৩। হজরত উবাই ইবনে কা'ব হজরত আবু জরকে একবার বলেছিলেন, বলুন, কয়টি আয়াত রয়েছে সুরা আহযাবে? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, তিয়াত্তরটি। হজরত উবাই ইবনে কা'ব তখন বলেছিলেন, আল্লাহ্র শপথ। এই সুরাটি তো ছিলো সুরা বাকারার মতো দীর্ঘ, অথবা তদপেক্ষাও বড়। এই সুরাতেই তো আমি পাঠ করেছি এই আয়াতটি— 'আশ্শায়খু ওয়াশশাইখাতু ইজা যানায়া ফারজুমুহুমা নাকালাম মিনাল্লাহি ওয়াল্লহু আযীযুন হাকীম'।

সূরা আহযাব ঃ আয়াত ১, ২, ৩

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○

يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَ لَا تُطِعِ الۡكٰفِرِيۡنَ وَ الۡمُنٰفِقِيۡنَ ؕ اِنَّ

اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۙ﴿۱﴾ وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۙ﴿۲﴾ وَّ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿۳﴾

r হে নবী! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং কাফিরদের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করিও না। আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

r তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা ওহী হয়, তাহার অনুসরণ কর; তোমরা যাহা কর, আল্লাহ্তো সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।

r আর তুমি নির্ভর কর আল্লাহ্র উপর, এবং কর্মবিধানে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

জুহাক সূত্রে জুয়াইবীর বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওলীদ ইবনে মুগীরা, শায়বা ইবনে রবীয়া প্রমুখ কুরায়েশ গোত্রপতি একবার রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে প্রস্তাব দিলো, আপনি আপনার মতাদর্শ পরিত্যাগ করুন, আমরা আমাদের সম্পদের একাংশ আপনাকে দান করবো। এদিকে মদীনার মুনাফিক ও ইহুদীরা হুমকি দিলো, হে মোহাম্মদ! আপনি যদি আপনার ধর্মাদর্শ প্রচার স্থগিত না করেন, তবে আমরা আপনাকে হত্যা করবো। তাদের এমতো প্রস্তাব ও হুমকির প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথমোক্তটি।

বলা হলো— 'হে নবী! আল্লাহ্কে ভয় করো'। লক্ষণীয় এখানে রসুল স.কে নাম ধরে ডাকা হয়নি। সম্বোধন করা হয়েছে 'হে নবী' বলে। এভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে রসুল স. এর অনন্যসাধারণ মর্যাদাকে। একথাটিও প্রমাণ করা হয়েছে যে, তিনি সাধারণ কোনো ব্যক্তি নন, তিনি একজন মহামর্যাদাসম্পন্ন নবী। আবার 'ভয় করো' বলেও একথা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ভয় বা 'তাক্বওয়া'র গুরুত্ব কতো বেশী এবং সেই ভয় আল্লাহ্র নবীগণের জন্য কতো প্রয়োজনীয়।

বাগবী লিখেছেন, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে আবু সুফিয়ান ইবনে হরব, ইকরামা ইবনে আবু জেহেল ও আবুল আয়ওয়ার আমর ইবনে সুফিয়ান সালামীকে উদ্দেশ্য করে। উহুদ যুদ্ধের পর এই নেতৃত্রয় উপস্থিত হলো মদীনার মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের বাড়ীতে। সেখান থেকে তারা রসুল স. এর কাছে আলোচনার প্রস্তাব পাঠালো। রসুল স. সম্মতি দিলেন। তারা সকলে রসুল স. এর সঙ্গে দেখা করলো। তাদের পক্ষ থেকে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী সা'দ ও তু'মা ইবনে উবাইরিক প্রস্তাব রাখলো, আপনি আমাদের দেবতা লাত, উজ্জা ও মানাতের সমালোচনা পরিত্যাগ করুন। আর একথাও সকলকে বলুন যে, এই দেবতাগুলো তাদের উপাসকদের জন্য সুপারিশ করবে। এরকম যদি আপনি

বলেন, তবে আমরা আপনার কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াবো না। রসুল স. তাদের কথা শুনে মর্মাহত হলেন। সেখানে উপস্থিত হজরত ওমর বলে উঠলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! অনুমতি দিন, আমি এদের শিরোশ্ছেদ করি। রসুল স. বললেন, না, তা হয় না। আমি এদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছি যে। তারপর তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা এবার যেতে পারো। তোমাদের উপর বর্ষিত হোক আল্লাহ্‌র ক্রোধ ও অভিসম্পাত। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

কোনো কোনো ভাষ্যকার লিখেছেন, এখানে রসুল স. কে সরাসরি সম্বোধন করা হলেও, এর বিধান (ভয় করো) প্রযোজ্য হবে সমগ্র উম্মতের উপর। জুহাক বলেছেন আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে— হে আমার প্রিয়তম নবী! আপনি ভয় করুন কেবল আল্লাহ্‌কে এবং বজায় রাখুন বিধর্মীদের সঙ্গে সম্পাদিত সন্ধিচুক্তি। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'ভয় করো' কথাটির মর্মার্থ হবে— আত্মরক্ষা করুন আল্লাহ্ কর্তৃক প্রবর্তিত সকল নিষেধাজ্ঞা থেকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং কাফেরদের ও মুনাফিকদের আনুগত্য কোরো না'। একথার অর্থ— আর আপনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী আবু সুফিয়ান, আবুল আয়্ওয়ার এবং কপটবিশ্বাসী আবুদল্লাহ্ ইবনে উবাই, আবদুল্লাহ্ ইবনে সা'দ তু'মা ইবনে উবাইরিক প্রমুখের প্রস্তাব মানবেন না।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ তো তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে জানেনই যে, কে দুর্বৃত্ত এবং কে সুশীল। তাঁর সকল ব্যবস্থাপনায় রয়েছে তাঁর অপার প্রজ্ঞার প্রভাব।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা ওহী হয়, তার অনুসরণ করো'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনার পরম প্রভুপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়, আপনি অনুসরণ করুন কেবল সেই প্রত্যাদেশের। এ কথার মাধ্যমে প্রবলতর করা হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত নির্দেশটিকে। এভাবে পুরো বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! আপনি কেবল আল্লাহ্‌কে ভয় করুন, কাফের মুনাফিকদের অমান্য করুন এবং অনুসরণ করুন কেবল প্রত্যাদেশিত বিষয়ের।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা যা করো, আল্লাহ্ তো সে বিষয়ে সম্যক অবহিত'। এখানে রসুল স. সহ সম্বোধন করা হয়েছে সাহাবীগণকেও। পূর্বের আয়াতে একবচনবোধক সম্বোধন ব্যবহৃত হলেও, সেই সম্বোধনের মধ্যেও সাহাবীগণ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তবে এখানে খোলাখুলিভাবে' তোমরা' সম্বোধন করা হয়েছে এজন্যে যে, এতে করে যেনো প্রস্তুত হয় অধিকতর মান্যতার মনোভাব। যেনো অধিকভাবে সাহাবীগণের মনে সৃষ্টি হয়শাস্তির ভীতি ও পুরস্কারের প্রতীতি।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'আর তুমি নির্ভর করো আল্লাহ্‌র উপর এবং কর্মবিধানে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট'। জুজায বলেছেন, বাক্যটি বিবৃতিমূলক হওয়া সত্ত্বেও অনুজ্ঞা অর্থ প্রকাশক। এর মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করাই যথেষ্ট। সুতরাং হে আমার রসুল! আপনি পুরোপুরি কেবল তাঁর প্রতিই নির্ভরশীল হোন। কারণ তিনিই কেবল সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর, মহাদয়াপরবশ। সকল কর্মের সমাধান কেবল তাঁর অধিকারায়ত্ত। সুতরাং অপর কারো প্রতি নির্ভর করার অবকাশ মাত্র নেই।

সূরা আহ্‌যাব ঃ আয়াত ৪

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ ۝٤

r আল্লাহ্ কোন মানুষের অভ্যন্তরে দুইটি হৃদয় সৃষ্টি করেন নাই; তোমাদের স্ত্রীগণ, যাহাদের সহিত তোমরা জিহার করিয়া থাক, তিনি তাহাদিগকে তোমাদের জননী করেন নাই এবং তোমাদের পোষ্য পুত্রদিগকে, তিনি তোমাদের পুত্র করেন নাই; এইগুলি তোমাদের মুখের কথা। আল্লাহ্ সত্য কথাই বলেন এবং তিনিই সরল পথ নির্দেশ করেন।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ কোনো মানুষের অভ্যন্তরে দু'টি হৃদয় সৃষ্টি করেননি'। একথা অনস্বীকার্য যে, হৃৎপিণ্ড হচ্ছে সকল কর্ম-পরিকল্পনার কেন্দ্র। আর কেন্দ্র যেহেতু একাধিক হয় না। তাই কারও হৃৎপিণ্ডও একাধিক হতে পারে না। যদি কারো দু'টি হৃদয়ের অস্তিত্ব ধরেও নেওয়া যায়, তবে দেখা যাবে একটি দ্বারাই সমাধা হচ্ছে সকল পরিকল্পনা এবং অপরটি রয়েছে বেকার। অথবা দুই হৃদয় দ্বারা সাধিত হচ্ছে একটিই পরিকল্পনা। তাহলে দু'টি হৃদয়ের প্রয়োজনই বা কী? সুতরাং একটিই তো যথেষ্ট। কিংবা যদি ধরা যায় একটি হৃদয় দ্বারা সে একটি কাজের পরিকল্পনা করবার পর তা বাস্তবায়িতও করলো। পরে কাজে লাগালো অপরটিকে। তখন অপর হৃদয়টি বাতিল করে দিলো প্রথমোক্ত কর্মটিকে। এমনি করে হৃদয়ে হৃদয়ে শুরু হলো দ্বন্দ্ব। এমতো অবস্থা কি সুখকর, না অভিপ্রেত। এরকম হলে তো জগতের সকল কর্মকাণ্ডই হয়ে পড়বে বিপর্যস্ত, ভণ্ডুল।

সুদ্দী ও ইবনে নাজীহের সূত্রে বাগবী ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, মুজাহিদ বলেছেন, আবু মুয়াম্মার জামীল ইবনে মুয়াম্মার ফিহরী নামক এক লোক ছিলো প্রখর মেধাসম্পন্ন। কোনো কিছু একবার শুনলেই সে তা স্মরণবদ্ধ করে রাখতে পারতো। লোকে তাই বলতো আবু মুয়াম্মারের রয়েছে দু'টি হৃদয়। সে নিজেও ফলাও করে বলতো, আমার হৃৎপিণ্ড দুইটি। মোহাম্মদ যা বোঝে, আমি আমার একটি হৃদয় দিয়েই তা বুঝি আরো ভালোভাবে। তার এমতো গর্হিত বচনের পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য প্রতিবাদটি।

বদরের রণক্ষেত্রে যখন মুশরিকবাহিনী পরাস্ত হলো, তখন আবু মুয়াম্মার পালাতে শুরু করলো ঊর্ধ্বশ্বাসে। তার পায়ে ছিলো তখন একটি জুতো, আর একটি ছিলো তার হাতে। আবু সুফিয়ান তার এ অবস্থা দেখে বললো, কী আবু মুয়াম্মার, এভাবে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছো কেনো? আবু মুয়াম্মার বললো, কুরায়েশরা পরাজয় বরণ করেছে। আবু সুফিয়ান বললো, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু তোমার জুতো কেনো একটি পায়ে, আরেকটি হাতে? আবু মুয়াম্মার চমকে উঠে বললো, তাইতো! আমিতো মনে করেছিলাম জুতো দু'টো আমার দু'পায়েই রয়েছে। তার সাথীরাও দেখলো তার এরকম উদভ্রান্ত অবস্থা। সেই থেকে তাদের ধারণা গেলো পাল্টে। সকলেই বুঝলো, তার দু'টো হৃদয়ের ব্যাপারটি একটি প্রচারণা মাত্র।

খসীফ সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, সাঈদ ইবনে যোবায়ের, ইকরামা এবং মুজাহিদ বলেছেন, আরব দেশে ছিলো একজন দুই হৃদয়বিশিষ্ট লোক। তাকে লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য বাক্যটি।

আউফির মাধ্যমে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসও এরকম বলেছেন। আউফি আবার কাতাদার মাধ্যমেও বর্ণনা করেছেন হাসান বসরীর অনুরূপ মন্তব্য। শেষোক্ত বর্ণনায় অতিরিক্তরূপে এসেছে এই কথাটুকু— সে বলতো, আমার একটি হৃদয়ে কোনো অনুপ্রেরণার উদয় হলে অপরটি তা নাকচ করে দেয়।

তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার রসুল স. সহসা দণ্ডায়মান হলেন। তাঁর অন্তরে সৃষ্টি হলো কী রকম যেনো এক দ্বিধা-সংকোচ। তাই তিনি স্থির করতে পারলেন না কী করবেন এখন। তাঁর এরকম অবস্থা দেখে এক কপটবিশ্বাসী বলে বেড়াতে লাগলো, মোহাম্মদের রয়েছে দুটি হৃদয়। একটি সংলিপ্ত তোমাদের সঙ্গে। আর একটি সংযুক্ত অপর কারো দিকে। এমতো ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হলো আলোচ্য বাক্যটি। তিরমিজি বলেছেন, বর্ণনাটি উত্তম সূত্রবিশিষ্ট।

জুহুরী ও মুকাতিল বলেছেন, দোদুল্যচিত্তদেরকে লক্ষ্য করে আলোচ্য বাক্যটি অবতীর্ণ হয়নি। আবার এর প্রকাশ্য অর্থও গ্রহণীয় নয়। বরং আল্লাহ্পাক এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থাপন করেছেন ওই ব্যক্তির কথা, যে তার স্ত্রীর সঙ্গে জেহার করে থাকে (জেহার বলে বিবাহনিষিদ্ধ রমণী যেমন মা, খালা বা ভগ্নির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে আপন স্ত্রীর কোনো অঙ্গের তুলনা করাকে)। উপমা স্বরূপ উপস্থাপন করা হয়েছে ওই ব্যক্তির প্রসঙ্গও যে অপরের পুত্রকে বলে নিজের পুত্র। যেমন সে এক মনে বলে, সে আমার স্ত্রী, আবার অপর মনে বলে, সে আমার মা। অনুরূপ অপরের সন্তানকে বলে নিজের সন্তান। আর এরূপ দৃষ্টান্ত উল্লেখের উদ্দেশ্যে একথা প্রমাণ করা যে, এক লোকের যেমন দু'টি হৃদয় থাকা সম্ভব নয়, তেমনি জেহারকারীর স্ত্রী কখনোই হতে পারে না তার মাতা। হতে পারে না একারণে যে, দু'টি বংশধারার একত্রায়ন অসম্ভব। এমতো একত্রায়ন অবাস্তব বলেই অপরের পুত্রও হতে পারে না নিজের পুত্র।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদের স্ত্রীগণ যাদের সঙ্গে তোমরা জেহার করে থাকো, তিনি তাদেরকে তোমাদের জননী করেননি'। উল্লেখ্য, মূর্খতার যুগে জেহারকে মনে করা হতো তালাক। ইসলাম জেহারকে তালাক সাব্যস্ত করেনি। তবে এই বিধান দিয়েছে যে, প্রায়শ্চিত্ত না করা পর্যন্ত জেহারকারী তার স্ত্রীর সঙ্গে শারীরিক মিলন সম্পাদন করতে পারবে না।

জেহারের দৃষ্টান্ত এরকম— যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বললো, তুমি আমার মায়ের পিঠ। জেহার সম্পর্কে আমি বিশদ আলোচনা করেছি সুরা মুজাদিলার তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যায়।

বায়যাবী লিখেছেন, 'জেহার' শব্দটি এসেছে 'জাহর' থেকে। 'জাহর' অর্থ পৃষ্ঠদেশ। রূপক অর্থে পেট। উল্লেখ্য, পিঠ পেটেরই প্রকাশ্য অংশ। আগের যুগে পিঠ বলে পেটকেই বোঝানো হতো। অথবা 'জেহার' এর মর্মার্থ— কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। কারণ পিঠের দিক দিয়ে, অর্থাৎ উপুড় করে স্ত্রী সম্ভোগ করাকে সে যুগে মনে করা হতো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রদেরকে তিনি তোমাদের পুত্র করেননি'।

এখানকার 'আদ্য়ি'ইয়া' শব্দটি 'দাউন' এর বহুবচন। শব্দটি নিপাতনে সিদ্ধ। অর্থাৎ কাউকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করলেই সে ঔরষজাত পুত্র হয় না। তাই সে হতে পারে না উত্তরাধিকারের বিধানভূতও। সুতরাং বংশগত বৈবাহিক নিষিদ্ধতাও তার উপরে কার্যকর নয়। আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে মুর্খতার যুগের পোষ্যপুত্রকে আপন পুত্র ভাবার কুসংস্কারটিকে প্রতিহত করা হয়েছে সেভাবে, যেভাবে

প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে একই ব্যক্তির দুই হৃদয়ের বিদ্যমানতাকে। তেমনি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এ কুসংস্কারটিকে যে, জেহার তালাকে বায়েন। জেহারকৃত স্ত্রী মায়ের মতো চিরতরে হারাম।

এরপর বলা হয়েছে— 'এগুলো তোমাদের মুখের কথা। আল্লাহ্ সত্য কথাই বলেন এবং তিনিই সরল পথনির্দেশ করেন'।

হজরত যায়েদ ইবনে হারেছা ছিলেন রসুল স. এর ক্রীতদাস। তিনি স. তাঁকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। তাই তাঁকে মুক্ত করে দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন পোষ্যপুত্ররূপে এবং তাঁর ভ্রাতৃসম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন হজরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সঙ্গে। হজরত জয়নাব বিনতে জাহাশের সঙ্গে তিনি স. তাঁকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধও করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের দাম্পত্য জীবনে তুমুল অশান্তি দেখা দিলে রসুল স. তাদের মধ্যে ঘটিয়ে দিলেন বিবাহ বিচ্ছেদ। তারপর হজরত জয়নাবকে নিজেই বিবাহ করলেন। তখন কপটাচারীরা বলে বেড়াতে লাগলো, দ্যাখো, মোহাম্মদ শেষ পর্যন্ত তার পুত্রবধুকে বিয়ে করলো। অথচ অপরের এমতো কর্মের প্রতি রয়েছে তার নিষেধাজ্ঞা। তাদের এমতো কথার প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হলো আলোচ্য বাক্য। এর মর্মার্থ হচ্ছে— পোষ্যপুত্র যেহেতু আপনপুত্র নয়, তাই তার তালাক দেয়া স্ত্রীকে বিবাহ করাও তার পোষক পিতার জন্য অসিদ্ধ নয়। সুতরাং যারা এরকম বিবাহের বিরুদ্ধে বলে, তাদের কথা কথার কথামাত্র। এরকম নিরর্থক কথা গণ্যই করা যায় না। কারণ, আল্লাহ্ এমতো বিধানকে সিদ্ধ বলেছেন। সুতরাং তাঁর বিধান সত্য। আর তাঁর পথ নির্দেশনাই সরল।

উম্মতজননী হজরত আয়েশা বর্ণনা করেছেন, একবার আবু হুজায়ফা ইবনে উতবা ইবনে রবীয়ার পত্নী সহলা বিনতে সহল ইবনে আমর রসুল স. এর মহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আবু হুজায়ফা তাঁর এক ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দিয়ে পোষ্যপুত্র বানিয়ে নিয়েছে। তাকে আমরা আপন পুত্রই মনে করি। সেও নিজের ছেলের মতো আমার কাছে যখন তখন আসে। আমার বেশবাশও তখন থাকে শিথিল। এ ব্যাপারে শরিয়তের বিধান কী? তার এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত। বলা হয়—

সূরা আহযাব ঃ আয়াত ৫

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ

جُنَاحٌ فِيۡمَاۤ اَخۡطَاۡتُمۡ بِهٖ ۙ وَلٰكِنۡ مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوۡبُكُمۡ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوۡرًا رَّحِيۡمًا ﴿۵﴾

r তোমরা তাহাদিগকে ডাক তাহাদের পিতৃ-পরিচয়ে; আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ইহা অধিক ন্যায়সংগত, যদি তোমরা তাহাদের পিতৃ-পরিচয় না জান তবে তাহারা তোমাদের দীনি ভাই এবং বন্ধু; এই ব্যাপারে তোমরা কোন ভুল করিলে তোমাদের কোন অপরাধ নাই, কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকিলে অপরাধ হইবে, আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমরা তাদেরকে ডাকো তাদের পিতৃপরিচয়ে'। একথার অর্থ তোমাদের পোষ্যপুত্র যদি থাকে, তবে তার প্রকৃত পিতার সঙ্গে জড়িয়ে দাও তার বংশলতিকা।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এটা অধিক ন্যায়সঙ্গত। এখানকার 'আক্বসাতু' শব্দটি হচ্ছে তুলনামূলক বিশেষণ। আর তুলনামূলক আধিক্য বুঝিয়ে এখানে বংশগত আধিক্য বোঝানো হয়নি, বোঝানো হয়েছে ন্যায়ানুগতার আধিক্যের কথা। অর্থাৎ এটা একটি বিশুদ্ধ সত্যবচন। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, আগে আমরা জায়েদ ইবনে হারেছাকে বলতাম জায়েদ ইবনে মোহাম্মদ। তারপর একদিন অবতীর্ণ হলো 'তোমরা তাদেরকে ডাকো তাদের পিতৃপরিচয়ে.....'।

এরপর বলা হয়েছে— 'যদি তোমরা তাদের পিতৃপরিচয় না জানো, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই ও বন্ধু। এ ব্যাপারে তোমরা কোনো ভুল করলে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই; কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে অপরাধ হবে, আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— যদি তোমরা তাদের পিতৃপরিচয় জানতে না পারো, তবে তাদেরকে গ্রহণ কোরো তোমাদের ধর্মীয় ভ্রাতা ও বন্ধুরূপে। এই বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে অথবা এই নিষেধাজ্ঞাটি ভুলে যদি তোমরা এ ব্যাপারে অপরাধ করে থাকো, তবে তোমাদেরকে অভিযুক্ত করা হবে না। কিন্তু তোমাদের ইচ্ছাকৃত ও সচেতন অপরাধ ক্ষমার্হ নয়। আর আল্লাহ্ মার্জনা করেন তাকে, যে ভুল করে গেলেও অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে আল্লাহ্ সকাশে ক্ষমাপ্রার্থী হয়। কারণ তিনি ক্ষমাপরবশ ও পরম দয়ার্দ্র।

হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ এবং হজরত আবু বকর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি জেনে শুনে আপন পিতাকে পরিত্যাগ করে অন্যকে পিতা হিসাবে গ্রহণ করে, তার জন্য জান্নাত হারাম। বোখারী, মুসলিম, আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে নিজের পিতাকে ছেড়ে অন্যের পিতৃপরিচয়ে পরিচিত হয় এবং যে ক্রীতদাস তার প্রভুর বদলে স্বীকার করে অন্যের প্রভুত্ব, তার উপর মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নরূপে বর্ষিত হতে থাকবে অভিসম্পাত। আবু দাউদ। সুয়ূ্তী বলেছেন, বর্ণনাটি যথাসূত্রসম্বলিত।

বায়যাবী লিখেছেন, ইমাম শাফেয়ীর মতে মৌখিক স্বীকৃতি দানকারী পুত্ররূপে গণ্য নয়। অর্থাৎ মুখের কথায় কেউ কারো পুত্র হয় না। ইমাম আবু হানিফা বলেন, যদি কেউ তার ক্রীতদাসকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে, তবে ওই ক্রীতদাস মুক্ত হয়ে যাবে। আবার কেউ যদি কোনো অপরিচিত বালককে পুত্র সম্বোধন করে, তবে লাভ করবে পুত্রের অধিকার। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা সম্পর্কে বায়যাবীর এই মন্তব্য সঠিক নয়। কেননা ইমাম আবু হানিফার সমাধানটি এরকম— কেউ তার ক্রীতদাসকে 'তোমাকে আমি পুত্র করলাম' বললেই সে তার পুত্র হয়ে যাবে না। আবার অজ্ঞাত কাউকে 'আমি তোমাকে আমার পুত্র করলাম' বললেও সে তার পুত্র হয়ে যাবে, এমন কথাও তিনি বলেননি। বরং তিনি বলেছেন, যদি কেউ তার চেয়ে বয়সে বড় অথবা ছোট ক্রীতদাসকে বলে 'তুমি আমার পুত্র', তবে তার উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করতে হবে। সে যদি তার এরকম কথাকে রূপক অর্থে গ্রহণ করে থাকে, তবে তার ক্রীতদাস অবশ্যই মুক্ত হয়ে যাবে। কারণ রক্ত সম্পর্কীয় কেউ ক্রীতদাস থাকতে পারে না। যেমন রসুল স. বলেছেন, কেউ যদি উত্তরাধিকার সূত্রে, ক্রয়সূত্রে এবং দান সূত্রে কারো মালিক হয়ে যায়, তবে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ব্যক্তি আপনা-আপনি মুক্ত হয়ে যাবে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ ও সুনান প্রণেতাগণ।

তবে এমতোক্ষেত্রে ভিন্ন সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ। বলেছেন কেউ যদি তার চেয়ে বয়সে বড় ক্রীতদাসকে 'আমার পুত্র' বলে, তবে ওই ক্রীতদাস মুক্ত হবে না। উদ্ধৃত মতবিরোধটি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে অন্য আর একটি মতবৈষম্যমূলক সূত্রের উপর। ফেকাহ শাস্ত্রীয় সূত্র গ্রন্থে রয়েছে যার আলোচনা। মতবৈষম্যের বিষয়ে শব্দের রূপকার্থ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রকৃত অর্থ বিচার্য নয়। এটাই হচ্ছে পার্থক্য নিরসনের মূল সূত্র। তাই কেবল বাক্যালাপের ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থ নির্ণয়ের জন্য রূপকার্থ গ্রহণ করাকেই যথেষ্ট বলে গণ্য করা হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, কেউ তার চেয়ে বয়সে বড় ক্রীতদাসকে 'আমার পুত্র' বললেও সে মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদের নিকট রূপকার্থ প্রকৃত অর্থের স্থলাভিষিক্ত নয়। অর্থাৎ যেখানে প্রকৃত অর্থ প্রয়োগের অবকাশ নেই, সেখানে রূপকার্থ গ্রহণীয় নয়। তাই তাঁদের মতে এমতাবস্থায় ওই ক্রীতদাস মুক্ত হবে না।

বাগবী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. যখন জেহাদের আমন্ত্রণ জানাতেন, তখন কেউ কেউ বলতো, আমরা তো প্রস্তুত। তবে পিতামাতার অনুমতি সাপেক্ষে। এমতো পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত। বলা হয়—

সূরা আহ্যাব ঃ আয়াত ৬

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ اَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ ؕ وَ اُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّاۤ اَنْ تَفْعَلُوْۤا اِلٰۤى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ﴿٦﴾

r নবী মু'মিনদের নিকট তাহাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর এবং তাহার পত্নীগণ তাহাদের মাতা। আল্লাহ্র বিধান অনুসারে মু'মিন ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা যাহারা আত্মীয়, তাহারা পরস্পরের নিকটতর। তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধুবান্ধবের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করিতে চাহ- তাহা করিতে পার। ইহা কিতাবে লিপিবদ্ধ।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'নবী মুমিনগণের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর'। একথার অর্থ— বিশ্বাসবানগণের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা ও অন্তরঙ্গতার চেয়ে নবীগণের সঙ্গে তাঁদের উম্মতের ঘনিষ্ঠতা অধিকতর সুদৃঢ়। এ কারণেই তাঁদের আদেশ তাঁদের বিশ্বাসবান অনুচরদের জন্য অবশ্যপালনীয়। পিতামাতার আদেশ নবীর নির্দেশের পরিপন্থী হলে তা প্রত্যাখ্যান করাও অনিবার্য। আর নবীগণ জেহাদের আহ্বান জানান আল্লাহ্র আদেশে। তাই তাঁদের সে আদেশ প্রতিপালন করতে হয় বিনাবাক্যব্যয়ে। এমতোক্ষেত্রে অজুহাত অচল।

উদ্ধৃত আয়াতাংশের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে হজরত ইবনে আব্বাস ও আতা বলেছেন, রসুল স. এর আদেশের বিপরীত প্রবৃত্তি অবশ্যপরিহরণীয়। মনে রাখতে হবে, তাঁর আনুগত্যের মধ্যেই রয়েছে ইহ-পারত্রিক কল্যাণ। প্রত্যাদিষ্ট না হয়ে তিনি কোনো নির্দেশ প্রদান করেন না। এক আয়াতে একথা বলাও হয়েছে স্পষ্ট করে। যেমন— 'তিনি বিশ্বাসবানগণের হিতাকাংখী, তাদের প্রতি স্নেহ-পরবশ ও দয়ার্দ্র'।

মানুষের প্রবৃত্তি অশুভ কর্মের প্রতি সতত ধাবমান। তাই তাদের জন্য প্রবৃত্তির অনুগমন নিষিদ্ধ। রসুল স. এর নির্বিবাদ অনুগমনই হচ্ছে তাদের পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায়। সুতরাং রসুল-প্রেমে হৃদয়ে পরিপূর্ণ রাখা এবং রসুলানুগত্যকে আদর্শ বলে স্থির করা ছাড়া মুক্তির আশা করা বৃথা। যারা রসুলপ্রেমিক নয়, তারা ইমানদারও নয়। যেমন এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, কোনো ব্যক্তিই পুরাপুরি ইমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ আমি তার নিকট না হবো তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্তুতি এবং পৃথিবীর সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয়।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ইহ-পরকালে মুমিনদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রগাঢ় ও অবিচ্ছেদ্য। যদি এর প্রমাণ চাও, তবে পাঠ করো 'নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর'। পৃথিবী পরিত্যাগকারী মুমিনের সম্পদের অধিকারী হবে তার উত্তরাধিকারীরা। আর যে মুমিন অসহায়ভাবে পরিত্যাগ করে থাকে তার পরিবারবর্গকে, তারা আসবে আমার কাছে। আমিই হবো তাদের উত্তমতর অভিভাবক। বোখারী।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তার পত্নীগণ তাদের মাতা'। একথার অর্থ— রসুলের সহধর্মিণীগণ বিশ্বাসীগণের জননীতুল্য। সুতরাং তাঁদেরকে দিতে হবে জননীর মর্যাদা। আপন জননীর সঙ্গে বিবাহবদ্ধ হওয়া যেমন হারাম, তেমনি হারাম তাঁদের সঙ্গেও। আবার অপরিচিত রমণীর সঙ্গে যেভাবে পর্দা করতে হয় সেভাবে তাঁদের সঙ্গেও পালন করতে হবে পর্দার বিধান। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'যদি তোমরা নবী-পত্নীগণের নিকট থেকে কিছু চাও, তবে তা চেয়ে নাও পর্দার অন্তরাল থেকে'।

উল্লেখ্য, রসুলেপাক স. এর পবিত্র সহধর্মিণীগণ মুমিনদের মাতা হলেও তাঁদের সন্তান-সন্তুতিরা কিন্তু মুমিনগণের ভ্রাতা ও ভগ্নি নন। আবার উম্মত জননীগণের বোন ও ভাইও নন এই উম্মতের খালা ও মামা। অর্থাৎ উম্মত জননীগণের সন্তান-সন্তুতি ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন মুমিনগণের বংশসম্পর্কিত কোনো আত্মীয় নন। যেমন হজরত যোবায়ের বিবাহ করেছিলেন জননী আয়েশার বোন হজরত আসমাকে। তাই বলে একথা বলা যাবে না যে, হজরত আসমা ছিলেন তাঁর খালা। রসুল স. তাঁর আদরের দুলালী হজরত ফাতেমাকে বিবাহ দিয়েছিলেন হজরত আলীর সঙ্গে। অন্য দু'জন আদরের কন্যাকে বিবাহ দিয়েছিলেন হজরত ওসমানের সঙ্গে।

বাগবী লিখেছেন, মাসরুক সূত্রে শা'বী বর্ণনা করেছেন, একবার এক রমণী জননী আয়েশাকে সম্বোধন করলেন 'আম্মাজান' বলে। তিনি প্রতুত্তরে বললেন, আমি তোমার মা নই। আমি পুরুষ জাতির মা। বায়হাকীও বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর সুনান গ্রন্থে। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. এর সম্মানিতা

সহধর্মিণীগণকে জননীরূপে স্থির করার উদ্দেশ্য একথা বুঝিয়ে দেওয়া যে, রসুল স. এর মহাতিরোধানের পর তাঁদেরকে বিবাহ করা মুমিনগণের জন্য হারাম। হজরত উবাই ইবনে কা'বের ক্বেরাতে এ বিষয়টি ফুটে ওঠে অধিকতর সুস্পষ্টরূপে। তিনি উচ্চারণ করতেন—'ওয়া আযওয়াজুহুম উম্মাহাতুহুম ওয়াহুয়া আবুল লাহুম' (এবং তাঁর পত্নীগণ তাদের মাতা ও তিনি তোমাদের পিতা)। সুতরাং চিরাচরিত নিয়ম এই যে, সকল নবী-রসুল তাঁদের আপনাপন উম্মতের পিতা এবং তাঁদের সহধর্মিণীগণ তাদের মাতা। কেননা মানব জাতির অবিনশ্বর জীবনের মূল ভিত্তিই হচ্ছেন নবী-রসুলগণ। এভাবে নবী-রসুলগণ যেহেতু নিজ নিজ উম্মতের পিতা, তাই বিশ্বাসীগণও পরস্পরের ধর্মীয় ভাই।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌র বিধান অনুসারে মুমিন ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা যারা আত্মীয় তারা পরস্পরের নিকটতর'।

'কিতাবুল্লাহ্‌' অর্থ আল্লাহ্‌র গ্রন্থ। কিন্তু এখানে কথাটির মর্মার্থ হবে আল্লাহ্‌র বিধানে, অথবা লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ অদৃষ্টলিপি অনুসারে। অথবা এই আয়াত অনুসারে, কিংবা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াত অনুসারে।

'যারা আত্মীয় তারা পরস্পরের নিকটতর' অর্থ উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধানে যারা যোগ্য অংশীদার। সেকারণেই রসুল স. বলেছেন, পরিত্যক্ত সম্পদের অংশীদার হবে পরলোকগত ব্যক্তির রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজন।

'মিনাল মু'মিনীন' অর্থ বিশ্বাসীগণের মধ্যে। উল্লেখ্য, রসুল স. মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্বসম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন। তাই আনসারগণের পরিত্যক্ত সম্পদের অংশ পেতেন মুহাজিরগণও। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে এই প্রথাটি রহিত করে দেওয়া হয়। স্পষ্ট করে বলা হয় উত্তরাধিকারিত্বের ক্ষেত্রে মুহাজির-আনসার ভ্রাতৃসম্পর্ক অপেক্ষা রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজনেরাই অধিকতর ঘনিষ্ঠ। অর্থাৎ এখন থেকে আত্মীয়-স্বজনেরাই পাবে পরিত্যক্ত সম্পদের অংশ। কাতাদা বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে উত্তরাধিকার বণ্টন করা হতো মুহাজির-আনসার সম্পর্কের ভিত্তিতে। বাগবী লিখেছেন, কালাবী বলেছেন, রসুল স. একজন মুহাজির-একজন আনসার এভাবে জোড়ায় জোড়ায় ভাই বানিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে তাঁরা হতেন একে অপরের ওয়ারিশ। পরিশেষে এই বিধানটি রহিত হয়ে যায় আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে।

'উলূল আরহাম' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে যারা কোরআনে কথিত অংশীদার নয়, আবার রক্ত সম্পর্কীয়ও নয়, সেই সকল আত্মীয়কে। ইমাম শাফেয়ীর মতে 'জাবীল আরহাম' বা কেবল নিকটজন যারা, তারা উত্তরাধিকার বঞ্চিত। আর ইমাম আবু হানিফার মতে জাবীল ফুরূজ ও আসবাতগণের

অবর্তমানে তারাও অংশীদারিত্ব লাভের যোগ্য। 'জাবীল ফুরূজ' তারা, যারা প্রধান উত্তরাধিকারী। এদের কথা কোরআন মজীদে উল্লেখ করা হয়েছে সুস্পষ্টরূপে। আর 'আসবাত' তারা, যারা সমুদয় ত্যাজ্য সম্পত্তির অধিকারী হয় 'জাবীল ফুরূজের' অবর্তমানে। জাবীল ফুরূজগণের মধ্যে অংশ বণ্টনের পর যা উদ্বৃত্ত থাকে, তা পায় আসবাতেরা। আর 'উলূল আরহাম' তারা, যারা অংশ পায় জাবীল আরহাম ও আসবাতের অবর্তমানে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী কোনো অবস্থাতেই 'উলূল আরহাম'গণের অংশ পাওয়ার কথাকে স্বীকার করেন না। বলেন, আসবাতের অবর্তমানে পরিত্যক্ত সম্পদ জমা করে দিতে হবে বায়তুল মালে। আমরা বলি, 'উলূল আরহাম'গণকে যেহেতু সাধারণ মুসলমান অপেক্ষা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় সাব্যস্ত করা হয়েছে সেহেতু তারা আসবাতের অবর্তমানে হবে অংশীদার।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করতে চাও, তবে তা করতে পারো'। একথার অর্থ— প্রকৃত উত্তরাধিকারী এবং নিকটাত্মীয় ব্যতীত তোমরা যদি তোমাদের মুহাজির ভ্রাতা অথবা যে কোনো মুসলমানকে বন্ধুত্বের খাতিরে যদি কিছু দিতে চাও, তবে সেটা হবে তোমাদের জন্য অতিরিক্তরূপে সিদ্ধ।

এখানে 'মা'রূফ' (আনুকূল্য) অর্থ অসিয়ত। অন্তিমকালে কেউ যদি তার সম্পদের কিছু অংশ অথবা সমুদয় সম্পদ তার কোনো প্রিয়জনকে সম্প্রদানের অভিলাষ প্রকাশ করে, তবে তাকে বলে অসিয়ত বা অন্তিম অভিপ্রায়। এরকম অন্তিম অভিপ্রায়ের আনুকূল্য যে পায়, তার দাবি হয় অংশীদারগণের দাবি অপেক্ষা অগ্রগণ্য। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে অসিয়তের কথা বলা হয়েছে সাধারণভাবে। কিন্তু রসুল স. এর বিধান ও ঐকমত্য এই বিধানটিকে করেছে সীমায়িত। এভাবে বিধানটি দাঁড়িয়েছে— অসিয়ত কার্যকর হবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের উপর। অর্থাৎ পরলোকগত ব্যক্তি যদি তার কোনো প্রিয়জনকে সমস্ত সম্পত্তি সম্প্রদান করার অসিয়ত করে থাকে, তবুও তার ওই প্রিয়জন এক তৃতীয়াংশের অধিক পাবে না।

প্রকাশ থাকে যে, কোরআনের বিধানানুসারে নিকটাত্মীয়দের অধিকারই সর্বাগ্রগণ্য। কিন্তু সেই অসিয়তকৃত স্বজন বা প্রিয়জনেরা এর ব্যতিক্রম। অর্থাৎ যার জন্য অসিয়ত করা হয়, সে নিকটাত্মীয় অপেক্ষা অধিক প্রাধান্যপ্রাপ্ত। অথবা বলা যেতে পারে ব্যতিক্রমটি এখানে বিকর্তিত। অর্থাৎ নিকটাত্মীয় ও অসিয়তকৃত স্বজনদের মধ্যে দ্বন্দ্বগত সম্পর্কটি এখানে বিকর্তিত। বরং এমতোক্ষেত্রে সংযোজিত হয়েছে একটি নতুন বিধান, যা রহিত করে দিয়েছে পূর্বের মুহাজির ও বন্ধু-বান্ধবদের অংশীদারিত্বের বিধানকে। আর এই নতুন বিধানে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে অসিয়তকে। অর্থাৎ ইচ্ছে করলে এবার যে কেউ তার সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ সম্পদ দ্বারা অন্তিম মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারে।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুহাজিরীনা' কথাটির 'মিন' অব্যয়টি বিবৃতিমূলক। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে, বিশ্বাসী ও মুহাজির মৃতের স্বজন সেই অংশীদারিত্বের প্রধান হকদার। এতে করে আরো প্রতীয়মান হয় যে, অবিশ্বাসী-বিশ্বাসী, মুহাজির-অমুহাজির উত্তরাধিকারিত্বের মাপকাঠি নয়। তবে অবিশ্বাসী ও অমুহাজিরদের ক্ষেত্রে অসিয়ত করা যেতে পারে। বাগবী লিখেছেন, কাতাদা, আতা ও ইকরামা এমতো অভিমতের প্রবক্তা।

আমি বলি, এখানকার 'মিন' কে বিবৃতিমূলক ধরে নিলে তুলনামূলক শব্দরূপ 'আওলা' (নিকটতর) এর ব্যবহার এখানে ব্যাকরণসম্মত হবে না। কারণ তুলনামূলক শব্দরূপ ব্যবহারের রীতি তিনটি— হয় তার সঙ্গে যুক্ত হবে 'আলিফ লাম' অথবা পদটি হবে সম্বন্ধপদ, নতুবা তার যোজকের সঙ্গে উল্লেখিত হবে 'মিন' অব্যয়টি। অথচ এই তিনটি রীতির কোনো একটিরও প্রয়োগ এখানে নেই। পক্ষান্তরে 'মিন' অব্যয়টি এখানে বিবৃতিমূলক ধরে না নিলে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীদের মধ্যে উত্তরাধিকারিত্বের বিলোপসাধনের উপর শব্দগত অথবা অর্থগত নির্দেশ হবে অসম্পূর্ণ। এভাবে দেখা দিবে একটি অমোচনীয় অসঙ্গতি। আর যদি মুমিনগণই উত্তরাধিকারীরূপে অধিক ঘনিষ্ঠ হয়, তবে এই বিষয়টিই প্রমাণিত হবে যে, মুমিন উত্তরাধিকারী বর্তমান না থাকলেও কাফের উত্তরাধিকারীকে পরিত্যক্ত সম্পদের অংশ দেওয়া যাবে না।

শেষে বলা হয়েছে— 'এটা কিতাবে লিপিবদ্ধ'। একথার অর্থ— উত্তরাধিকারীত্বের এই বিধানটি লিপিবদ্ধ রয়েছে লওহে মাহফুজের সুরক্ষিত ফলকে, অথবা কোরআনে। আবার কেউ কেউ অর্থ করেছেন— এ বিধান লিপিবদ্ধ রয়েছে তওরাতে।

সূরা আহ্‌যাব ঃ আয়াত ৭, ৮

وَ اِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُّوْحٍ وَّ اِبْرٰهِيْمَ وَ مُوْسٰى وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَ اَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۙ﴿۷﴾ لِّيَسْـَٔلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿۸﴾

r স্মরণ কর, যখন আমি নবীদের নিকট হইতে অংগীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং তোমার নিকট হইতেও এবং নূহ, ইব্‌রাহীম, মূসা ও মার্‌য়াম-তনয় ঈসার নিকট হইতে, তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম দৃঢ় অংগীকার—

r সত্যবাদীদিগকে তাহাদের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য। তিনি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! ওই অবিস্মরণীয় অঙ্গীকার দিবসের কথা স্মরণ করুণ, যখন আমি আপনার নিকট থেকে এবং নুহ-ইব্রাহিম-মুসা-ঈসাসহ সকল নবীগণের নিকট থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম।

বলা বাহুল্য, কথিত অঙ্গীকার গ্রহণপর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছিলো রসুলেপাক স. এর পৃথিবীর মহাআবির্ভাবের বহুপূর্বে। তখন সৃজিত হয়েছিলেন কেবল হজরত আদম। আল্লাহ্পাক তাঁর পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর অনাগত বংশধরদের রূহ বের করে এক স্থানে সমবেত করেছিলেন এবং এই মর্মে সকলের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, তারা পৃথিবীতে গিয়ে কেবল আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং নবী-রসুলগণ অন্যকেও আহ্বান জানাবেন এক আল্লাহ্র দিকে। আর তাঁরা আপনাপন উম্মতের প্রতি হবেন সদয় ও কল্যাণকামী। আর নিজেদের মধ্যে প্রবহমান রাখবেন পারস্পরিক সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষণ।

এখানকার 'আন্নাবীয়্যিন' কথাটির অন্তর্ভূত হয়েছেন পূর্বাপর সকল নবী-রসুল। তাঁদের মধ্যে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র কয়েকজনের নাম। এতে করে প্রতীয়মান হয় যে, যাঁদের নাম এখানে বলা হলো তাঁরা তাঁদের অন্যান্য সঙ্গী অপেক্ষা অধিকতর সম্মানিত। কেননা তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে মহাগ্রন্থ ও আকাশী পুস্তিকা। দেওয়া হয়েছে তাঁদেরকে তাঁদের সমকালের উপযোগী পৃথক পৃথক বিধান ও প্রবিধান। আরো একটি বিষয়ও এখানে প্রণিধাননীয় যে, তাঁদের সকলের আগে উল্লেখ এসেছে মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর। এতে করে এ বিষয়টি আর অস্পষ্ট থাকে না যে, তিনিই রসুলশ্রেষ্ঠ, নবীকুলশিরোমনি। তিনি স. নিজেও বলেছেন, মানবজাতির শুরুতে যেমন আমি, তেমনি শেষেও। আমার মহাআবির্ভাব নবুয়তপ্রবাহের শেষ প্রান্তে। প্রায়োন্নত সূত্রপরম্পরায় কাতাদা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে সা'দ। এই হাদিসটিই আবার বাগবী বর্ণনা করেছেন কাতাদা, হাসান ও হজরত আবু হোরায়রা থেকে যথা সূত্রসহযোগে। বাগবী আরো লিখেছেন, এটাই হলো আলোচ্য আয়াতের সারকথা। কেননা এখানে রসুল স. এর উল্লেখ এসেছে সকলের পুরোধারূপে সর্বাগ্রে।

ইবনে সা'দ এবং আবু নাঈম তাঁর 'হুলিয়া' গ্রন্থে মাইসারা ইবনে ফখর ইবনে সা'দের মাধ্যমে আবুল জাদআর সূত্রে এবং তিবরানী তাঁর 'আওসাত' গ্রন্থে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এভাবে— রসুল স. বলেছেন, আমি তখনও নবী ছিলাম যখন আদি পিতা আদম ছিলেন দেহ ও আত্মার মধ্যবর্তী টানাপোড়েনে।

'মীছাক্বান গলীজা' অর্থ সূদৃঢ় অঙ্গীকার, মহামর্যাদায়িত প্রতিশ্রুতি। অথবা ওই প্রতিজ্ঞা, যা সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে সূদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে।

পরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবার জন্য'। একথার অর্থ— আমার ওই অঙ্গীকার গ্রহণের উদ্দেশ্য ছিলো এই, মহাবিচারের দিবসে আমি তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করবো, তাঁরা তাঁদের উম্মতকে কী বলেছিলেন? অথবা অর্থ হবে— সেদিন সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের লাঞ্ছিত করবার উদ্দেশ্যেই আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবো, তোমরা কি তোমাদের প্রতি প্রেরীত আমার নবী-রসুলগণকে মান্য করেছিলে? কিংবা অর্থ হবে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে তখন আমি জিজ্ঞেস করবো, কেনো তোমরা আমার বচনবাহকগণকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে? তাঁরা কি সত্যবাদী ছিলেন না? আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ আবার এরকমও হতে পারে যে— যারা তাদের পৃথিবীবাসের সময় অন্তরে বাহিরে ছিলো সত্যাশ্রয়ী, সেদিন তাদের সেই সত্যপ্রীতিকে আমি চূড়ান্ত স্বীকৃতি দান করবো।

শেষে বলা হয়েছে— 'তিনি কাফেরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি'। একথার অর্থ— আর আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য যে মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি, সেদিন সে শাস্তি তাদেরকে আস্বাদন করতেই হবে।

সূরা আহ্যাব ঃ আয়াত ৯

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ۗ وَ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ۚ﴿٩﴾

r হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হইয়াছিল এবং আমি উহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এক বাহিনী যাহা তোমরা দেখ নাই। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার সম্যক দ্রষ্টা।

খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়েছে এখান থেকে। ওই যুদ্ধকে আহযাবের যুদ্ধও বলা হয়। কুরায়েশ, ইহুদী এবং আরো কতিপয় আরব গোত্রের সম্মিলিত বাহিনী তখন চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেছিলো মদীনাবাসী মুসলমানদেরকে। ঝঞ্ঝাবায়ু ও ফেরেশতাবাহিনী প্রেরণ করে আল্লাহ্পাক তখন বিতাড়িত করেছিলেন শত্রুবাহিনীকে। আল্লাহ্তায়ালার ওই বিশেষ অনুগ্রহের কথা

স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আহ্বান জানানো হয়েছে এখানে। বলা হয়েছে— হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্র ওই বিশেষ অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদেরকে অবরুদ্ধ করেছিলো, আর তিনি ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করেছিলেন। ফলে তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলো। ফেরেশতাবাহিনীও অলক্ষ্যে প্রেরিত হয়েছিলো তোমাদের সাহায্যার্থে। আর তোমরা আত্মরক্ষার উপলক্ষ হিসেবে মদীনার চতুর্দিকে যে পরিখা খনন করেছিলে, তোমাদের সেই শুভপ্রচেষ্টাও অতি অবশ্যই ছিলো আল্লাহ্র গোচরীভূত।

এখানে 'জুনুদুন' শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে দু'বার। প্রথমটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে শত্রুবাহিনীকে এবং ফেরেশতাবাহিনীকে বুঝানো হয়েছে পরেরটি দ্বারা। শত্রুবাহিনীতে ছিলো মক্কার কুরায়েশ, মদীনার উপকণ্ঠে বসবাসকারী বনী কুরায়জার ইহুদী ও গাতফান গোত্র। তাদের সম্মিলিত সংখ্যা ছিলো বারো হাজার।

'রীহান' অর্থ ঝঞ্ঝাবায়ু। তখন ছিলো শীতকাল। শত্রুবাহিনী গড়ে তুলেছিলো শক্তিশালী অবরোধ। কিন্তু পরিখা ভেদ করে তারা মদীনাভ্যন্তরে প্রবেশও করতে পারছিলো না। এভাবেই বয়ে যাচ্ছিলো জয়-পরাজয়হীন অনিশ্চিত সময়। সহসা এক রাতে আল্লাহ্পাক প্রেরণ করলেন প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু। শুরু হলো প্রবল শৈত্যঝড়। শত্রুকুলের তাঁবুর খুঁটিগুলো পড়লো উপড়ে। তাঁবুগুলো হয়ে গেলো ছিন্নভিন্ন। তাঁবুর প্রদীপ, রান্নাবান্নার সরঞ্জাম সবকিছু হয়ে গেলো লণ্ডভণ্ড। যুদ্ধাশ্বগুলোও ছুটে পালাতে শুরু করলো দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। ফলে পলায়ন ছাড়া তাদের আর গত্যন্তর রইলো না। প্রেরিত ফেরেশতাবাহিনীকে যুদ্ধই করতে হলো না। তারা কেবল শত্রুদেরকে করে তুললো অধিকতর ভীত-সন্ত্রস্ত। গুরুগম্ভীর ধ্বনিতে মুসলিমবাহিনীর সঙ্গে তারাও মুহুর্মুহু উচ্চারণ করতে লাগলো আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। কেঁপে উঠলো শত্রুদলের সেনাপতিদের বুক। তারা তাদের ছত্রভঙ্গ সৈন্যদেরকে লক্ষ্য করে বার বার বলতে লাগলো, বিপদ! বিপদ! পালাও! পালাও! আত্মরক্ষা করো।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আ'দ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছিলো পশ্চিমী লু হাওয়া দ্বারা। আর আমাকে সাহায্য করা হয়েছিলো পূবাল বাতাস প্রেরণ করে।

পরিখার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো চতুর্থ হিজরীর শাওয়াল মাসে। একথা লেখা রয়েছে 'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে। সেখানে বর্ণনাকারী হিসেবে রয়েছেন মুসা ইবনে উকবার নাম। বর্ণনাটি এরকম— চরম অপরাধের শাস্তিস্বরূপ রসুল স. মদীনা থেকে বিতাড়িত করেছিলেন ইহুদীদের বনী নাজির গোত্রকে। তাদের

বিতাড়নের আট মাস পর সংঘটিত হয়েছিলো খন্দক যুদ্ধ। বহিষ্কৃত বনী নাজির গোত্র বিভিন্ন অঞ্চলে অস্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। এভাবে শেষে উপস্থিত হয় খায়বরে। সেখানে তাদের সঙ্গে মিলিত হয় ইহুদীনেতা সালাম ইবনে আবীল হাকীক, কেনানা ইবনে রবী ও হুয়াই ইবনে আখতাব।

বাগবী লিখেছেন, মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেছেন, আমাকে পরিখা যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করেছেন ওরওয়া ইবনে যোবায়ের থেকে ইয়াজিদ ইবনে রূমান। এরকম আরো বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ্ ইবনে কা'আব ইবনে মালেক, জুহুরী এবং আসেম ইবনে আমর ইবনে কাতাদা, অধিকন্তু আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী বকর ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হযম এবং মোহাম্মদ বিন কা'ব কারাজী। সবগুলো বর্ণনার তথ্যাবলী প্রায় একই রকম। যেমন— রসুলেপাক স. এর বিরুদ্ধে সকল অমুসলিমকে একত্র করবার কাজে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলো ইহুদী গোত্রপতি সালাম ইবনে আবীল হাকীক, হুয়াই ইবনে আখতাব, কেনানা ইবনে রবী, হাওদা ইবনে কায়েস ও আবু আমের লেওয়ায়ী। বনী নাজির ও বনী ওয়ায়েলের কিছু লোক ছিলো এদের একান্ত সহযোগী। তারা সকলে মিলে একদিন উপস্থিত হলো মক্কায়। কুরায়েশ নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাত করে বললো, মোহাম্মদকে মূলোৎপাটিত করবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করো। আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি। কুরায়েশ নেতারা বললো, তোমরা জ্ঞানী গুণী সজ্জন। তোমাদের রয়েছে একটি আকাশী গ্রন্থও। মোহাম্মদের সঙ্গে তো আমাদের বিরোধ উপস্থিত হয়েছে ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে। আচ্ছা, তোমরা ঠিক করে বলোতো, তোমাদের ধর্ম উৎকৃষ্ট, না আমাদের? ইহুদীরা জবাব দিলো, তোমাদের ধর্ম সনাতন, তাই তোমরাই অধিক সত্যানুসারী। তাদের এমতো অপবচনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় 'আলামতারা আ'লাল্লাজীনা ......'(আপনি কি দেখেননি তাদেরকে, যাদেরকে দেওয়া হয়েছে কিতাবের কিছু অংশ, তারা আবার বিশ্বাস করে প্রতিমা ও শয়তানকে)। ইহুদীদের জবাব শুনে কুরায়েশরা খুবই আনন্দিত হলো। প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে শুরু করে দিলো যুদ্ধ প্রস্তুতি। ইহুদীরা এবার গেলো গাতফানদের কাছে। ওই গোত্রটি ছিলো কায়েস ইবনে গাইলানের একটি শাখা। তাদেরকে বিভিন্ন মনোমুগ্ধকর কথা শুনিয়ে উত্তেজিত করে তুললো ইহুদীরা। বললো, কুরায়েশরাও আমাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে একমত। সুতরাং ভয়ের কিছুই নেই।

আমি বলি, কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, কুরায়েশদের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলো বনী নাজির ও বনী ওয়াইলের অন্ততঃ কুড়িজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। আবু সুফিয়ান তাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানালো। বললো, তোমরা আমাদের দৃষ্টিতে মহান। কারণ, তোমরা মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে চাও। আমরা তো এরকম চুক্তিকে মনে করি পরম সৌভাগ্য।

ইহুদীরা বললো, হে মান্যবর গোত্রপতি! আপনিসহ আপনার গোত্রের পঞ্চাশজনকে ঠিক করুন। আমরাও পঞ্চাশজন যোগ দিবো আপনাদের সাথে। তারপর সকলে মিলে প্রবেশ করবো কাবা শরীফের গেলাফের অন্তরালে। তারপর কাবার দেয়ালে বুক স্থাপন করে শপথ করে বলবো, মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে আমরা একমত। আমাদের মধ্যে একজন জীবিত থাকা পর্যন্ত আমরা তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতেই থাকবো। এ প্রস্তাবে একমত হলো সকলেই। ইহুদীরা এভাবে কুরায়েশদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবার পর উপস্থিত হলো গাতফান গোত্রের নিকটে। তাদেরকে বললো, যদি তোমরা আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, তবে আমরা তোমাদেরকে আমাদের খায়বরের ফলের বাগানগুলোর ফল ভক্ষণ করতে দিবো ছয় মাস অথবা এক বৎসর ধরে। তাদের এমতো প্রস্তাবে একাত্মতা ঘোষণা করলো গাতফানদের গোত্রাধিপতি উয়াইনা ইবনে হুসাইন ফাজারী। তারা নিজ উদ্যোগে বনী আসাদ গোত্রকেও করে নিলো তাদের মিত্রশক্তিভূত। এভাবে আবু সুফিয়ানের সৈন্যাপত্যে গঠিত হলো এক বিশাল বাহিনী। একত্রিত হলো ইহুদী, গাতফান, বনী ফাজারা, বনী আশজাআ ইত্যাদি। নির্ধারিত দিনে তারা রওয়ানা হলো মদীনা অভিমুখে।

আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ছিলো চার হাজার সৈনিক। তদের মধ্যে অশ্বারোহী তিন হাজার ও এক হাজার উষ্ট্রারোহী। অন্যান্যরা পদাতিক। নিশান বরদারের দায়িত্ব দেয়া হলো ওসমান ইবনে আবী তালহাকে। তাঁর বাহিনী যাত্রাবিরতি করলো মাররুজ জাহরান নামক স্থানে। সেখানে একে একে সমবেত হলো বনী আসলাম, বনী আশজাআ, বনী মুররা, বনী কেনানা, বনী ফাজারা ও বনী গাতফান। সেখান থেকে সকলে একজোটে যাত্রা করলো মদীনার দিকে। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর শত্রুবাহিনী উপনীত হলো মদীনার উপকণ্ঠে। বিভিন্ন গোত্রের বিচিত্র মনোবৃত্তি ও আচার আচরণের লোক মিলে শত্রুবাহিনী গঠিত হয়েছিলো বলেই এই যুদ্ধের নাম ছিলো আহযাব্ বা অসমবাহিনীর যুদ্ধ।

বাগবী লিখেছেন, রসুল স. যখন শত্রুদের সম্মিলিত বাহিনীর মদীনা আক্রমণের সংবাদ জানতে পারলেন, তখন ডেকে পাঠালেন হজরত সালমানকে এবং তাঁর পরামর্শক্রমেই তিনি মদীনার চতুষ্পার্শ্বে খনন করালেন পরিখা।

হজরত সালমান ছিলেন পারস্যের অধিবাসী। জীবনের বহু ঘাতপ্রতিঘাত উত্থানপতন পেরিয়ে দাস পরিচয়ে তাঁকে উপনীত হতে হয়েছিলো মদীনায়। রসুল স. এর সরাসরি হস্তক্ষেপের ফলেই তিনি মুক্ত হতে পেরেছিলেন। তিনি ছিলেন রসুল স. এর একান্ত প্রিয়ভাজনগণের অন্যতম। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি প্রথম যে যুদ্ধ পেয়েছিলেন, সেই যুদ্ধেই লাভ করেছিলেন বিশেষ পরামর্শদাতার ভূমিকা। তিনি বলেছিলেন, হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ! আমি পারস্যবাসী বলে সে দেশের যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কে জানি। সেখানকার সেনাবাহিনী শত্রুবাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে

পড়বার আশংকা করলে আত্মরক্ষার জন্য তাদের চতুষ্পার্শ্বে নির্মাণ করে পরিখা। এটি একটি মোক্ষম আত্মরক্ষামূলক কৌশল। তাঁর এমতো পরামর্শ রসুল স. এর মনোপূত হলো খুব। পরিকল্পনাটি শ্রমসাধ্য হলেও রসুল স. এর নির্দেশের বরকতে কিছুদিনের মধ্যেই সমাপ্ত হলো পরিখা খননের কাজ।

আমি বলি, এক হাদিসে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে— শত্রুদলের সমন্বিত বাহিনীর আক্রমণের সংবাদ রসুল স. এর শ্রুতিগোচর হলো। তৎক্ষণাৎ তিনি পাঠ করলেন 'হাসবুনাল্লহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল' (আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তিনিই আমাদের উত্তম অভিভাবক)। এরপর মুহাজির ও আনসারগণকে ডেকে বসালেন পরামর্শসভা। সেখানে হজরত সালমান ফারসী পরামর্শ দিলেন পরিখা খননের। রসুল স. সে পরামর্শ গ্রহণও করলেন। মদীনার অভ্যন্তরভাগের দেখাশোনার দায়িত্বভার অর্পণ করলেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুমের উপর। তারপর সকলকে নিয়ে অবস্থান গ্রহণ করলেন পরিখার পাড়ে সশস্ত্রপ্রহরীর ভূমিকায়। সাহাবীগণ অবস্থান গ্রহণ করলেন পরিখার বিভিন্ন পাড়ে। মুহাজির-আনসার মিলিয়ে তাঁর সেনাসংখ্যা ছিলো তিন হাজার। মুহাজিরগণের নিশানবহনের দায়িত্ব পেলেন হজরত জায়েদ ইবনে হারেছা। আর আনসারগণের পতাকা তুলে ধরলেন হজরত সা'দ ইবনে উবাদা।

আমি বলি, অপর এক বর্ণনায় এসেছে, ওই যুদ্ধে মুসলিমবাহিনীর ছিলো মাত্র ছত্রিশটি যুদ্ধাশ্ব। কিছুসংখ্যক অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য হয়ে উঠলো উদগ্রীব। রসুল স. তাদের মধ্যে গ্রহণ করলেন পনেরো বৎসর বয়সের উপরে যাদের বয়স, তাদেরকে। অবশিষ্টদেরকে অনুমতি দিলেন না। প্রায় যুবক যে সকল সাহাবী তখন যুদ্ধ করবার অনুমতি পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর, হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত, হজরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হজরত বারা ইবনে আজীব। এরপর রসুল স. পরিদর্শন করলেন পরিখার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানগুলো। তিনিই স. অবশ্য স্বহস্তে এঁকে দিয়েছিলেন পরিখার রেখাচিহ্ন। পেছনে রেখেছিলেন পাহাড় এবং সামনে সমতলভূমি।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আউফ বলেছেন, পরিখার যুদ্ধের সময় রসুল স. স্বহস্তে যে দাগ এঁকে দিয়েছিলেন, সে দাগের উপরেই পরিখা খনন করা হয়েছিলো। প্রতি দশজন সাহাবীর ভাগে পড়েছিলো চল্লিশ হাত পরিখা খনন করার দায়িত্ব। বর্ণনাকারী বলেন, তখন সালমান ফারসীকে নিয়ে আমাদের মধ্যে শুরু হলো টানাটানি। মুহাজিরগণ বলতে শুরু করলেন, সালমান আমাদের দলভূত। আনসারগণ বললেন, না, আমাদের। রসুল স. তখন বিষয়টির সমাধান করে দিলেন একথা বলে যে, সালমান আমার পরিবারপরিজনের অন্তর্ভূত। হজরত আমর ইবনে আউফ বলেছেন, আমি,

সালমান, হুজায়ফা, নোমান এবং আরো ছয়জন আনসারের উপরে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো চল্লিশ হাত পরিখা খননের । আমরা যথারীতি খননকার্য শুরু করলাম। আটকে গেলাম একস্থানে এসে। সেখানে দেখা গেলো একটি প্রকাণ্ড পাথর। আমরা অনেক চেষ্টা করেও পাথরটিকে না ভাঙতে পারলাম, না পারলাম সরাতে। আমি বললাম, সালমান! রসুল স.কে সমস্যাটির কথা জানাও। দ্যাখো, তিনি কী নির্দেশ দেন। সালমান রসুল স. এর নিকটে গিয়ে সব খুলে বললেন। একটু পরেই তিনি স. উপস্থিত হলেন অকুস্থলে। পরিখার মধ্যে নামলেন তিনি। তারপর একটি শাবল দিয়ে পাথরটিতে বাড়ি দিলেন সজোরে। সঙ্গে সঙ্গে পাথরে সৃষ্টি হলো একটি ফাটল। আর সেখান থেকে বিচ্ছুরিত হলো অপার্থিব আলো। সে আলোয় আলোকিত হলো মদীনার দুই প্রান্ত। মনে হলো, কেউ যেনো প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলো অন্ধকার ঘরে। রসুল স. এর কণ্ঠে উচ্চারিত হলো জয়ধ্বনি। তার প্রতিধ্বনি উচ্চারিত হলো সাহাবীগণের কণ্ঠে। এবার তিনি স. হানলেন দ্বিতীয় আঘাত। এবার দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলো পাথরটি। সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো মদীনার অপর দুই প্রান্ত। এবারও মনে হলো আঁধার ঘরে যেনো সহসা প্রজ্জ্বলিত হলো প্রদীপ। এবারও জয়ধ্বনি উচ্চারিত হলো রসুল স. এর কণ্ঠে। সাহাবীগণের কণ্ঠেও উচ্চারিত হলো তার অনুরণন। এরপর তিনি স. তৃতীয়বার আঘাত হেনে চুরমার করে দিলেন পাথরটিকে। শেষে হজরত সালমানের হাত ধরে উঠে এলেন পরিখাভ্যন্তর থেকে। সালমান বললেন, হে রহমতের নবী। একী দৃশ্য দেখলাম আজ! তিনি স. সাহাবীগণের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। বললেন, তোমরা কী সালমানের কথা শুনলে? সকলে সমস্বরে বললেন, হ্যাঁ। তিনি স. বললেন, প্রথম আঘাতে যে আলোকস্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠলো, তাতে আমার সামনে পরিদৃশ্যমান হলো ইরাকশাহের রাজধানী ও হেরাপ্রদেশের মাদায়েন নগরী। আমি দেখতে পেলাম তাদের রাজপ্রাসাদ। দেখে মনে হলো যেনো পুরতঃ পতিত কুকুরের সম্মুখস্থিত মাংসাশী দাঁত। ভ্রাতা জিবরাইল বললেন, ওই হেরা ও মাদায়েন অচিরেই করতলগত হবে আপনার উম্মতের। তোমরা দেখেছো দ্বিতীয় আঘাতেও বিচ্ছুরিত হলো অপার্থিব আলোকচ্ছটা। ওই আলোতে আমার দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হলো রোমীয়দের রাজপ্রাসাদ। যেভাবে তোমরা প্রত্যক্ষ করো হিংস্র কুকুরের স্বচ্ছধবল দন্তপাটি। ভ্রাতা জিবরাইল বললেন, সেদিন বেশী দূরে নয়, যখন রোমসাম্রাজ্যও পদানত হবে আপনার উম্মতের। অতএব, তোমাদের জন্য সাধুবাদ ও শুভসংবাদ। রসুল স. এর এমতো বচন শুনে সাহাবীগণের অন্তরে শুরু হলো আনন্দের ঝড়। সকলে সমস্বরে বলে উঠলেন, সকল স্তব-স্তুতি আল্লাহ্‌র। তাঁর অঙ্গীকার অবশ্যই সত্য। তিনিই তো আমাদেরকে শুভসংবাদ দিলেন, অবরুদ্ধ হওয়ার পর আসবে বিজয়, মহাবিজয়।

কিন্তু কপটবিশ্বাসীরা একথা শুনে অন্তরে অন্তরে দগ্ধীভূত হতে শুরু করলো। সাহাবীগণের কারো কারো কাছে ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে লাগলো, আশা আকাংখারও তো একটা সীমা আছে। মোহাম্মদ তো দেখছি কল্পনাবিহারী। তোমাদেরকেও তার কল্পনাবিহারে অংশগ্রহণ করতে বলছে। পারস্য ও রোম দু'টোই মহাপরাক্রান্ত সাম্রাজ্য। তোমাদের মতো দুর্বল ও আত্মরক্ষাচিন্তায় বিষণ্ন দলের কাছে তাদের পরাজিত হওয়া কি চাট্টিখানি কথা। সে রকম কিছু করার সামর্থ্য যদি তোমাদের থাকতো, তবে তোমরা এভাবে পরিখা খনন করে এদেশের শত্রুদের হাত থেকে বাঁচার চেষ্টায় কালাতিপাত করতে না। তাদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হলো— 'আর স্মরণ করো, মুনাফিকেরা ও যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিলো, তারা বলছিলো, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নয়' (আয়াত ১২)। তাদের এমতো অপবচনের প্রেক্ষিতে আবার অবতীর্ণ হলো— 'হে নবী! আপনি বলুন, হে আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌমত্বের অধিকারী'।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, শীতের সকাল। রসুল স. উপনীত হলেন পরিখার পাড়ে। দেখলেন, মুহাজির আনসার সকলেই পরিখা খননে মগ্ন। তাঁদের পানাহার হয়েছে কিনা তার খোঁজখবর নিলেন তিনি স.। তারপর আবৃত্তি করলেন—

ইন্নাল আইশা আইশুল আখিরাহ্
ফাগফিরিল আনসারা ওয়াল মুহাজিরাহ্

পারলৌকিক কল্যাণই তো প্রকৃত কল্যাণ হে আল্লাহ্! ক্ষমা করো আনসার ও মুহাজিরকে।

সাহাবীগণ আবৃত্তি করলেন—
নাহনুল লাজীনা বায়াউ' মুহাম্মাদান
আ'লাল জিহাদি মা বাক্বাইনা আবাদান।

আমরা প্রতিশ্রুত এই মর্মে যে, মোহাম্মদের সঙ্গী হয়েই আমরা যুদ্ধ করবো আজীবন।

বোখারীর বর্ণনায় আরো এসেছে, হজরত বারা ইবনে আজীব বর্ণনা করেছেন, রসুল স.ও তখন পরিখা খননের কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মাটি ও পাথর অপসারণে তাঁর পবিত্র শরীরও তখন হয়েছিলো ধূলিধূসরিত। তিনি স. তখন কাজ করতেন ছন্দোবদ্ধ কবিতার তালে তালে। ইবনে রওয়াহা রচিত ওই কবিতাটি ছিলো এরকম—

আল্লাহুম্মা লাওলা আন্তা মাহতাদাই না
ওয়ালা তাসাদ্দাক্বনা ওয়ালা সল্লাইনা

ফাআন্‌যিলান্‌ সাকিনাতান আ'লাইনা
ওয়া ছাববিতিল আক্বদামা ইন লাক্বিনা
ইন্‌নাল উলা ক্বদ বাগাও আ'লাইনা
ইজা আরাদু ফিত্‌নাতান্‌ আবাইনা।
ওয়াল্লহি লাওলাহু মাহতাদাই না।

অর্থঃ হে আমাদের আল্লাহ্‌! তুমি সামর্থ্য না দিলে আমরা কীভাবে পেতাম হেদায়েত? পাঠ করতাম নামাজ? জাকাতই বা প্রদান করতাম কীভাবে? অতএব হে আমাদের প্রভুপালক! তুমি আমাদের উপরে অবতীর্ণ করো প্রশান্তি। আর সুদৃঢ় রাখো আমাদের অবস্থান তখন, যখন আমরা হই শক্রর সম্মুখীন। তারাই তো সীমাতিক্রমকারী। তাদের অনাসৃষ্টির কারণেই তো আমরা বার বার বাধ্য হই তাদের সশস্ত্র প্রতিপক্ষ হতে। শপথ তোমার! তুমি সুযোগ না দিলে আমরা কখনোই পেতাম না হেদায়েত।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত সালমান ছিলেন বলিষ্ঠ দেহসৌষ্ঠবের অধিকারী। তিনি একাই প্রায় দশ জনের সমান কাজ করতে পারতেন। পরিখার যুদ্ধের সময় তিনি প্রতিদিন খনন করতেন পাঁচ হাত গভীর ও পাঁচবর্গহাত আয়তনের মাটি। তাঁর এমতো শক্তিমত্তা দেখে একবার তাঁর প্রতি বদনজর পড়লো কায়েস ইবনে সানা'আর। ফলে তিনি হয়ে পড়লেন সংজ্ঞাহীন। রসুল স. কায়েসকে বললেন, কোনো পাত্রের ভিতরে ওজু করো। তারপর ওই পাত্রের পানি দিয়ে সালমানকে গোসল করাও। তারপর খালি পাত্রটি উপুড় করে নিক্ষেপ করো দূরে। কায়েস তাই করলেন। হজরত সালমানও সুস্থ্য হয়ে উঠলেন।

বোখারী ও ইমাম আহমদ উল্লেখ করেছেন, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌ বলেছেন, পরিখা খননের সময় আমি ছিলাম রসুল স. এর পাশে। পুরোদমে খননকার্য চলাকালে একদিন সামনে পড়ল একটি বিশাল পাথর। সেটিকে ভাঙ্গা বা অপসারণ কোনটিই করা যাচ্ছিলো না। সকলে রসুল স. সকাশে নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এখন আমরা কী করবো? রসুল স. বললেন, দেখি কী করা যায়। একথা বলেই তিনি স. উপস্থিত হলেন ওই পাথরটির কাছে? তখন তিনি স. ছিলেন তিন দিনের অনাহারী। তৎসত্ত্বেও তিনি স. সজোরে আঘাত হানলেন পাথরটির উপর। সঙ্গে সঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে গেলো পাথরটি। এর পর অনুমতি নিয়ে আমি ফিরে এলাম স্বগৃহে। আমার স্ত্রীকে বললাম, রসুল স. আজ নিয়ে তিন দিনের অভুক্ত। ঘরে কি কিছু আছে। সে সঙ্গে সঙ্গে বের করে আনলো একটি থলি। দেখা গেলো থলিতে রয়েছে চার সের যব। আমি উৎফুল্ল হলাম। বললাম এই যবের আটা তৈরী করো। তার পর বানাও রুটি। আর আমাদের ছাগলটাও আমি জবাই করে দেই। শুরু হলো পানাহারের আয়োজন। রান্না বান্না শেষ

হওয়ার আগেই আমি রওয়ানা হলাম। স্ত্রী বললো যাচ্ছো, যাও। কিন্তু বেশী লোককে দাওয়াত দিয়ে আবার আমাকে লজ্জায় ফেলে দিয়ো না। কারণ, অধিক লোকের আয়োজন তো নেই। আমি রসুল স. সমীপে উপস্থিত হলাম। বললাম, হে আল্লাহর প্রিয়তম রসুল! আমার গৃহে পানাহারের আয়োজন প্রায় প্রস্তুত। দয়া করে কয়েকজন সঙ্গী সাথী নিয়ে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। তিনি স. বললেন, কতজনের জন্য আয়োজন করেছো? আমি খুলে বললাম সব। তিনি স. বললেন যথেষ্ট। বরকতময়। তুমি আগেই যাও। গিয়ে তোমার গৃহিনীকে বলো আমি না আসা পর্যন্ত সে তার গোশতের হাঁড়িঁ উনুন থেকে যেনো না নামায়। আর রুটি যেনো না সেঁকে। একথা বলার পর তিনি উচ্চস্বরে সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, হে পরিখাবাসী! জাবের তোমাদেরকে নিমন্ত্রণ করেছে। সকলে মিলে চলো যাই। আমি প্রায় দৌড়ে আগে ভাগে উপস্থিত হলাম বাড়ীতে। গিন্নিকে গিয়ে বললাম, রসুল স. তো আনসার মুহাজির সকলকে দাওয়াত করে বসেছেন। বলো এখন কী করা যায়? গিন্নি বললেন, চিন্তিত হবার কী আছে। মনে করতে হবে এটাই আল্লাহ্‌র নির্ধারণ। আর আল্লাহ্‌র রসুল তো জেনে শুনেই সবাইকে আসতে বলেছেন। আমি বললাম হ্যাঁ, আমি তো তাকে সব খুলেই বলেছি। গিন্নি বললেন, তাহলে তো সব ঠিকই আছে। কিছুক্ষণের মধ্যে রসুল স. তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে প্রথমে গৃহাঙ্গনে উপস্থিত হলেন তিনি। তারপর সাহাবীগণকে ডেকে বললেন, তোমরাও ভিতরে এসো। এক জায়গায় ভিড় করে দাঁড়িয়ো না। আমি আটার খামির রসুল স. এর সম্মুখে পেশ করলাম। তিনি স. ওই খামিরের সাথে মিশ্রিত করলেন তাঁর পবিত্র মুখের কিছু লালা। দোয়া করলেন বরকতের জন্য। উনুনে চাপানো গোশতের হাঁড়ির মুখ ঢেকে দিলেন স্বীয় রুমাল দিয়ে। এরপরেও দোয়া করলেন বরকতের জন্য। তারপর আমাকে বললেন, তোমার স্ত্রীকে এবার রুটি সেঁকতে বলো। আর তুমি বণ্টন করো গোশত। তাই করলাম আমরা। রসুল স. এর কাছে একে একে হাজির করলাম রুটি ও গোশতের টুকরা। তিনি স. রুটি ও গোশতের টুকরো বেঁটে দিতে লাগলেন সকলের হাতে হাতে। প্রায় এক হাজার সাহাবী সকলেই এভাবে আহার করলেন পরিতৃপ্তির সঙ্গে। অনেকেই পরিবেশিত খাদ্য পুরোপুরি খেতেও পারলেন না। অথচ তখন পর্যন্ত মনে হচ্ছিলো হাঁড়ি থেকে বের হয়ে আসছে গোশতের স্রোত। মনে হচ্ছিলো রুটিও যেনো ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এর পর তিনি স. আমার স্ত্রীকে বললেন, এবার তুমি খাও। তারপর উদ্বৃত্ত রুটি গোশত পাঠিয়ে দাও প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে। আজ সকলেই অনাহারক্লিষ্ট।

আমি বলি, সাহাবীগণ পরিখা খনন শেষ করেছিলেন ছয় দিনে। যথাসূত্র-সম্বলিত বিবৃতিগুলোতে এরকমই বলা হয়েছে।

বাগবী লিখেছেন ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. পরিখা খনন শেষ হওয়া মাত্র মদীনার উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হলো শত্রুবাহিনী। প্রায় দশ হাজার সৈন্য ছাউনি ফেললো মুজতামাউল আসবালে। বনি গাতফান তাদের মিত্রশক্তি নজদী সেনাবাহিনীসহ অবস্থান গ্রহণ করলো উহুদ পর্বতের এক পাশে নকমীর পিছনের দিকে। ইত্যবসরে রসুল স. তাঁর প্রাণ উৎসর্গকারী তিন হাজার সাহাবী নিয়ে পরিখার পাড়ে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নিলেন। ঢাল হিসেবে পিছনে রাখলেন সলআ পাহাড়কে। ফলে মুসলিম বাহিনী ও অমুসলিম বাহিনীর মাঝে অন্তরায় হলো কেবল পরিখা। আর নারী ও শিশুদেরকে রসুল স. অবস্থান গ্রহণ করতে বললেন পেছনের পর্বত শিখরে।

বনী নাজিরের গোত্রীয় নেতা হুয়াই ইবনে আখতাব স্বস্থান থেকে গাত্রোত্থান করলো। প্রথমে গেলো কাআ'ব ইবনে কারাজির বাড়িতে। বনী কুরাইজার নেতা কাআ'ব তার স্বগোত্রীয়দের নিরাপত্তার স্বার্থে শান্তিচুক্তি করেছিলো রসুল স. এর সঙ্গে। সে কারণেই সে হুয়াইয়ের আগমন টের পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকে খিল এটেঁ দিলো। হুয়াই বার বার দরজা খোলার অনুরোধ জানালো। কিন্তু কা'ব তার কথায় ভ্রূক্ষেপই করলো না। বরং বললো, দ্যাখো হুয়াই! আমি মোহাম্মদের সঙ্গে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আমি তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবো না। তিনি অত্যন্ত সজ্জন ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার ব্যাপারে একনিষ্ঠ। তিনি কখনোই কারো সঙ্গে প্রতিশ্রুতিভঙ্গ করেননি। এরকম লোকের সঙ্গে আমি প্রতারণা করতে পারবো না। হুয়াই তবুও নাছোড়বান্দা। সে এবার ধরলো ভিন্ন কৌশল। বললো, আমি তোমার অন্নে ভাগ বসাবো বলেই তো তুমি দরোজা খুলছো না। কা'ব এবার রেগে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে দরোজা খুলে দিয়ে বললো, আমাকে এমন অপবাদ তুমি দিতে পারলে? হুয়াই বললো, শোনো কাআ'ব! মোহাম্মদের বিরুদ্ধে এক বিশাল অভিযানের ব্যবস্থা করেছি আমি। কুরায়েশ, গাতফান ও আরো অনেক আরব গোত্র একত্রিত হয়ে এসেছে এবার। তাদের সঙ্গে আমরা তো আছিই। তারা সকলে আমার সঙ্গে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে যে, মোহাম্মদের মূলোৎপাটন না করা পর্যন্ত তারা ঘরে ফিরে যাবে না। সুতরাং তোমার জন্যও এসেছে এবার বিরাট সুযোগ। ইচ্ছা করলেই তুমি এখন হতে পারো এক সফল অধিনায়ক। কাআ'ব বললো, তুমি আমার জন্য নিয়ে এসেছো একটা স্থায়ী গঞ্জনা। নিয়ে এসেছো এমন বারিশূন্য মেঘ, যাতে রয়েছে কেবল বজ্রধ্বনি ও অশনিসংকেত। মোহাম্মদ প্রসঙ্গে আমাকে আর কিছু বোলো না। তিনি অঙ্গীকার রক্ষার বিষয়ে অতি বিশ্বস্ত। এরকম লোকের সঙ্গে আমি অঙ্গীকার ভঙ্গ করি কীরূপে? হুয়াই এতে করেও দমলো না। জিদ করতে লাগলো বার বার। বললো, কা'ব! তুমি অযথা ভীত হচ্ছো। তুমি কি মনে করেছো কুরায়েশেরা

পরাভূত হবে? কখনোই নয়। আর যদি সে রকম কিছু হয়েও যায়, তবে তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি জীবন থাকতে আমি তোমার সঙ্গ ত্যাগ করবো না। মোহাম্মদের দিক থেকে আক্রমণের আশংকা দেখা দিলে আমি আমার লোকজনকে নিয়ে অবশ্যই তা প্রতিহত করবো। কাআ'ব এবার নরম হলো। কথা দিলো, সে-ও তার লোকজনকে নিয়ে কুরায়েশ বাহিনীকে সাহায্য করবে।

সংবাদ খুব শীঘ্রই পৌঁছে গেলো রসুল স. এর কানে। তিনি স. বিষয়টির সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য বনী কুরায়জার কাছে পাঠালেন সর্ব হজরত আউস গোত্রের নেতা সা'দ ইবনে মুয়াজ আশহালী, খাজরাজ গোত্রের নেতা সা'দ ইবনে উবাদা সায়েদী, আবদুল্লাহ্ ইবনে রওয়াহা খাজরাজী এবং খাওয়াত ইবনে যোবায়ের আমেরীকে। তাঁদেরকে বলে দিলেন, তোমরা যদি বুঝতে পারো ঘটনা সত্য, তাহলে সেকথা আমাকে জানিয়ো ইশারা-ইঙ্গিতে। না হলে আমাদের অনেকের মনোবল যাবে ভেঙে। আর যদি দ্যাখ্যো, ঘটনা সত্য নয়, তবে বিষয়টি প্রকাশ্যেই আমাকে জানাতে পারবে। তারা সকলে পৌঁছে গেলো বনী কুরায়জাদের বসতিতে। তাদের সঙ্গে আলাপ করে সহজেই বুঝতে পারলো অবস্থা বেগতিক। তারা স্পষ্ট করেই জানালো, মোহাম্মদের সঙ্গে আমাদের কোনো অঙ্গীকার নেই। হজরত সা'দ ইবনে উবাদা ছিলেন তেজস্বী। তিনি তাদেরকে শুনিয়ে দিলেন কঠোর প্রকৃতির কিছু কথা। হজরত সা'দ ইবনে মুয়া'জ বাধা দিয়ে বললেন, যেতে দাও। বড় বাড় বেড়েছে ওদের। একথা বলে সকলে প্রত্যাবর্তন করলেন। রসুল স. এর দয়ার্দ্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনার সহচরবৃন্দের সঙ্গে প্রতারণা তো সাংঘাতিক ব্যাপার। আল্লাহু আকবর! হে মুসলিম ভ্রাতৃবর্গ! শুভ সংবাদ শ্রবণ করো। সাহাবীগণ আঁচ করতে পারলেন, পরিস্থিতি খুব একটা সুবিধের নয়। ভিতরে বাইরে শত্রু। সংশয়ের কালো মেঘ ছায়াপাত করতে শুরু করলো তাঁদের উপর। মুনাফিকেরা সবই বুঝলো। তাদের দলের মা'তাব ইবনে কুশাইর আমেরী প্রকাশ্যে বলেই বসলো, মোহাম্মদ! আপনি তো অঙ্গীকার করেছেন, আমাদের দখলে আসবে রোম ও পারস্যের ধনভাণ্ডার। কিন্তু এখন তো আমাদের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। আমরা তো জঙ্গলে গিয়েও আর প্রাণরক্ষা করতে পারবো না। তাহলে কী আপনার ও আপনার আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি প্রতারণাপূর্ণ নয়? আর এক মুনাফিক আউস ইবনে কিবতী বললো, হে আল্লাহ্র প্রতিনিধি! আমার গৃহ অরক্ষিত। বাড়িও বেশ দূরে। আমাকে এবার বাড়ি ফিরে যাবার অনুমতি দেওয়া হোক। এভাবে বিভিন্ন বাহানায় অন্য মুনাফিকেরাও সরে পড়তে লাগলো।

আমি বলি, কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গের ঘটনাটি কাআ'ব তার গোত্রনেতাদেরকে ডেকে জানালো। ওই গোত্রনেতাদের মধ্যে ছিলো, যোবায়ের ইবনে বালতা, নাব্বাশ ইবনে কায়েস, উকবা ইবনে জায়েদ ও আরো অনেকে। তারা সকলেই

কাআ'বের কথা শুনে মনোক্ষুণ্ন হলো। কেউ কেউ ভর্ৎসনা করলো কাআ'বকে। সঙ্গীসাথীদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখে কাআ'বও হয়ে গেলো কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কিন্তু তখন সে আর প্রত্যাবর্তনের কোনো পথই খুঁজে পেলো না।

বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত যোবায়ের ইবনে আ'ওয়াম বলেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে, যে আমাকে এই মুহূর্তে এনে দিতে পারবে বনী কুরায়জার সংবাদ? একথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে দাঁড়ালাম। তৎক্ষণাৎ রওয়ানা দিলাম বনী কুরায়জার বসতির দিকে। অল্পক্ষণের মধ্যে ফিরে এসে জানালাম তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের তথ্য। তিনি স. বললেন, তোমার জন্য উৎসর্গীকৃত হোক আমার পিতা-মাতা।

আমি বলি, হজরত যোবায়ের বনী কুরায়জার বসতিতে সংবাদ সংগ্রহের জন্য গিয়েছিলেন হজরত সা'দ ও হজরত মুয়াজের প্রত্যাবর্তনের পর। প্রথম যাত্রাটি ছিলো অঙ্গীকার ভঙ্গের সংবাদ যাচাইকল্পে এবং পরের যাত্রা ছিলো তাদের যুদ্ধপ্রস্তুতির খবরাখবর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। হজরত যোবায়ের এসে জানালেন, বনী কুরায়জারা তাদের দুর্গ সংস্কার করছে। আশে পাশের রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছে। গৃহপালিত পশুগুলোকেও আবদ্ধ করছে দুর্গমধ্যে। রসুল স. তাঁর সঠিক সংগ্রহের ফিরিস্তি শুনে প্রীত হলেন খুব। বললেন, প্রত্যেক নবীর একজন বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলো। আর আমার বিশ্বস্ত বন্ধু যোবায়ের।

বাগবী লিখেছেন, রসুল স. ও সাহাবীগণকে তাঁদের পরিখার পাড়ের অবস্থান থেকে একটু অগ্রবর্তী অথবা পশ্চাদবর্তী হতে হয়নি। কুরায়েশ বাহিনীও তাদের অবস্থান থেকে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পায়নি। এভাবেই উভয়বাহিনী মুখোমুখি অবস্থান নিয়ে অতিবাহিত করেছিলো কুড়িটি দিন। উভয় বাহিনীর মধ্যে পাথর ও তীর ছোঁড়াছুড়ি হয়েছিলো কিছুটা। কিন্তু যুদ্ধ হয়নি। তাই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিও হয়নি কোনো পক্ষের। ফলাফল অনিশ্চিত ছিলো, তাই রসুল স. সাহাবীগণের সদাসতর্ক অবস্থার কষ্ট বিবেচনা করে ভাবলেন, সন্ধি করাই উত্তম। অস্বাভাবিকতার অবসান ঘটানোই শ্রেয়। এমতো ভাবনার কারণেই তিনি স. সর্বপ্রথম ডেকে পাঠালেন গাতফান গোত্রের উমাইয়া ইবনে হোসাইন ও আবুল হারেছ ইবনে আমরকে। বললেন, তোমরা তোমাদের গোত্রের লোকজন নিয়ে ফিরে যাও। বিনিময়ে আমি তোমাদেরকে দিবো এখানকার খেজুরবাগানগুলোর উৎপাদিত খেজুরের এক তৃতীয়াংশ। এ প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলো তারা। সন্ধির চুক্তিপত্র প্রস্তুত করা হলো। কিন্তু তাতে স্বাক্ষর করার আগে রসুল স. পরামর্শ চাইলেন হজরত সা'দ ইবনে মুয়াজ এবং হজরত সা'দ ইবনে উবাদার কাছে। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি যদি আল্লাহ্র হুকুমে এ কাজ করেন,

তবে তো তা পালন করা আমাদের জন্য হবে অত্যাবশ্যক। আর বিষয়টি যদি হয় আপনার নিজস্ব চিন্তাভাবনার ফসল, তবুও তা আমরা মেনে নিতে বাধ্য। আর যদি আপনি আমাদের সুবিধা হবে বলে এরকম উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তবেই কেবল আমরা আমাদের মতামত প্রকাশ করতে পারবো। রসুল স. বললেন, আমি কেবল তোমাদের অসুবিধার কথা বিবেচনা করেই এমতো উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আমি দেখতে পাচ্ছি, সমগ্র আরব উপদ্বীপ তোমাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ। তারা তাদের সমুদয় তীর নিক্ষেপ করতে চাইছে একটি মাত্র ধনুক থেকে। আমি চাচ্ছি তাদের এ সংঘবদ্ধ শক্তির বিভেদ। হজরত সা'দ ইবনে মুআ'জ নিবেদন করলেন, হে প্রত্যাদেশিত পুরুষপ্রবর! ইতোপূর্বে আমরাও ছিলাম ওদের মতো পৌত্তলিক। আল্লাহ্‌কে আমরা চিনতাম না। তাঁর ইবাদত কীভাবে করতে হয় তা-ও জানতাম না। সেই সময়ও তো কেউ সাহস করে দাবি করতে পারেনি মদীনার একটি খেজুর। নিমন্ত্রণ ছাড়া এখানকার খেজুর ভক্ষণের কোনো সুযোগও তাদের ছিলো না। আর এখন আমাদেরকে ধন্য করা হয়েছে ইসলামের মতো সর্বশ্রেষ্ঠ বৈভবে। আপনার মহান ব্যক্তিত্বের সাহচর্যে আমরা পেয়েছি অমূল্য আভিজাত্য। তাহলে কী কারণে আমরা আমাদের শত্রুদলকে খেজুর প্রদান করতে বাধ্য হবো? সুতরাং আমাদের বক্তব্য এই যে, এরকম অবমাননাকর চুক্তির প্রয়োজন আমাদের নেই। আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা বিনা কারণে কিছুই দিবো না। রসুল স. প্রীত হয়ে বললেন, ঠিক আছে, তোমরা যা পছন্দ করো, তাই হবে। হজরত সা'দ ইবনে মুআ'জ তখন ছিঁড়ে ফেললেন লিখিত সন্ধিপত্রটি। দূতদ্বয়কে বললেন, তোমরা এবার যাও যা করতে পারো করো।

আমি বলি, কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, সর্বপ্রথম এরকম কথা বলেছিলেন হজরত উসাইয়েদ ইবনে হুদাইর। এরপর একই অস্বীকৃতি উচ্চারণ করেছিলেন হজরত সা'দ ইবনে উবাদা। ওই বৈঠকে গাতফানদের দূত উমাইয়া ইবনে হোসাইন বসে ছিলো দু'পা ছড়িয়ে। হজরত সা'দ ইবনে মুআ'জ তাকে ধমক দিয়ে বললেন, এই বেয়াদব! পা সোজা করে বসো না। আল্লাহ্‌র রসুলের উপস্থিতি না থাকলে আমি এক্ষুণি বল্লমের ফলা দিয়ে তোমার কুঁজো পিঠ সোজা করে দিতাম। অগত্যা বাধ্য হয়ে ফিরে গেলো উয়াইনা ও হারেছ। বুঝতে পারলো, মুসলমানদের উপরে প্রভাব বিস্তার করার আশা সুদূরপরাহত।

বাগবী লিখেছেন, শত্রুদের অবরোধ চললো দিনের পর দিন। কিন্তু যুদ্ধ হলো না মোটেও। শুধুমাত্র একদিন কয়েকজন অশ্বারোহী বনী কেনানার বসতির উপর দিয়ে অশ্ব ছুটিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় চিৎকার করে বললো, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। আজ টের পাবে কোন্ অশ্বারোহীর পাল্লায় তোমরা পড়েছো। ওই অশ্বারোহীরা ছিলো আমর ইবনে আবদুদ আমেরী, ইকরামা ইবনে আবু জেহেল মাখজুমী, হুবাইরা ইবনে ওয়াহাব মাখজুমী, নওফেল ইবনে আবদুল্লাহ্, দ্বারার

ইবনে খাত্তাব এবং মিরদাস ইবনে লুওয়াই মুহারেবী। তারা ধাবিত হলো পরিখার দিকে। কাছাকাছি গিয়ে পরিখা দেখে বলে উঠলো, আরে এযে দেখছি অভিনব কৌশল। এরপর তারা অনুসন্ধান করে দেখতে লাগলো, দুর্বলতম অবস্থান কোনটি। এভাবে তারা উপস্থিত হলো অপেক্ষাকৃত কম সুরক্ষিত একটি স্থানে। ঘোড়াগুলো নিয়ে চক্কর দিতে লাগলো পরিখা ও সালআ পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে। হজরত আলী কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে গেলেন তাদের সামনে। পরিখার ওই অংশের সুরক্ষা করলেন অধিকতর সুদৃঢ়। দেখলেন, অদূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে শত্রুপক্ষের আমর ইবনে আবদুদ। বদরযুদ্ধে আহত হয়েছিলো। তাই উহুদযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। এখন পরিখার যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছে মহাউৎসাহে অশ্বারোহী সৈনিকদের প্রশিক্ষকরূপে। হজরত আলী তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, আমর! তুমি কিন্তু একবার আল্লাহ্‌র শপথ করে বলেছিলে, কোনো কুরায়েশ যদি তোমার সামনে হাঁ বা না সূচক কোনো কথা উপস্থাপন করে, তবে তুমি গ্রহণ করবে তার যে কোনো একটি। আমর বললো, অবশ্যই। আমি এক কথার মানুষ। হজরত আলী বললেন, আমি তোকে আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রসুল ও ইসলামের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। আমর বললো, আমার এগুলোর কোনোই আবশ্যক নেই। হজরত আলী বললেন, তবে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হও। সে বললো, ভাতিজা! এরকম বলছো কেনো? আমার হাতে কি তুমি বেঘোরে প্রাণটা হারাতে চাও? আমি তো তা চাই না। হজরত আলী বললেন, আমি চাই তোমার রক্ত। একথা শুনে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠলো আমর। লাফিয়ে নামলো ঘোড়া থেকে। তারপর তার ঘোড়ার পায়ে হানলো তলোয়ারের আঘাত। অথবা ঘোড়াটিকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তার মুখে মারলো অঙ্কুশ। তারপর অগ্রসর হয়ে দাঁড়ালো হজরত আলীর মুখোমুখি। হজরত আলীও অগ্রসর হলেন। শুরু হলো দ্বৈরথ যুদ্ধ। অল্পক্ষণের মধ্যে হজরত আলী তাকে পাঠিয়ে দিলেন মৃত্যুর দুয়ারে। হত্যা করলেন তার আরো দু'জন সাথীকে। একজন প্রাণ বাঁচালো পালিয়ে। তাদের একজন হলো শরাহত। সে মৃত্যুবরণ করেছিলো মক্কায় ফিরে গিয়ে। তার নাম মুনাব্বেহ্ ইবনে ওসমান ইবনে আবদুস সিয়াক। নওফেল ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগীরা সাহস করে নেমে পড়লো পরিখায়। সাহাবাগণ প্রস্তর বর্ষণ করতে শুরু করলেন তার উপর। অবস্থা বেগতিক দেখে সে চিৎকার করে বলতে লাগলো, ওহে আরবী যোদ্ধৃবৃন্দ! প্রস্তরবর্ষণ অপেক্ষা উত্তম রণকৌশল কি তোমাদের জানা নেই? বীর যদি হও, তবে সামনে এগিয়ে আসো না কেনো? একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে পরিখায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন হজরত আলী। মুহূর্তমধ্যে তলোয়ারের আঘাতে উড়িয়ে দিলেন তার গর্দান। কুরায়েশবাহিনী থেকে প্রস্তাব এলো, নগদ মূল্যের বিনিময়ে আমাদের যোদ্ধাদের লাশ ফেরত দেওয়া হোক। রসুল স. বলে পাঠালেন, নগদ মূল্যের প্রয়োজন আমাদের নেই। তোমরা লাশ নিয়ে যেতে পারো।

জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, মদীনার দুর্গগুলোর মধ্যে বনী হারেছার দুর্গটি ছিলো সর্বাপেক্ষা অধিক সুদৃঢ়। আমরা পরিখার যুদ্ধের সময় ওই দুর্গেই আশ্রয় নিয়েছিলাম। তখনো পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়নি। তাই সেখানে অবস্থান নিয়েছিলেন হজরত সা'দ ইবনে মুয়াজও। তিনি ছিলেন লৌহবর্ম পরিহিত। কিন্তু বর্মবহির্ভূত ছিলো তাঁর দুই বাহু। কাফের বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে শুনে এক হাতে একটি বর্শা নিয়ে তিনি ছুটে চললেন রণক্ষেত্রের দিকে। তাঁর মুখে তখন উচ্চারিত হচ্ছিলো একটি টগবগে কবিতা— হায়! আমার উষ্ট্রীটিও যদি অবতীর্ণ হতো এই লড়াইয়ে। যখন উপস্থিত হয় মৃত্যুর মহালগ্ন তখন মৃত্যুভয় আর থাকেই বা কেমন করে?

সা'দের মা তাঁকে বললেন, বৎস! এক্ষুণি পৌঁছে যাও রসুল স. সকাশে। আল্লাহ্র শপথ! জলদি যাও। পেছনে পড়ে থেকো না। আমি বললাম, হে সা'দের মাতা! সা'দ যে বর্মটি পরিধান করেছে তা আকারে ছোট। বড় একটি বর্ম পরলে ভালো হতো। তার অনাবৃত বাহু তো সহজেই তীরবিদ্ধ হতে পারে। তাই হয়েছিলো। শত্রুপক্ষের হাইয়্যানের তীর বিদ্ধ হলো তাঁর বাহুতে। রক্তরঞ্জিত হলেন তিনি। হাইয়্যানকে অভিশাপ দিলেন, আল্লাহ্ তোকে শাস্তি দিবেন জাহান্নামে। তারপর আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বললেন, হে আল্লাহ্! কুরায়েশদের সঙ্গে যুদ্ধ যদি এখনো শেষ না হয়ে থাকে, তবে তুমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্যই আমাকে বাঁচিয়ে রাখো। কারণ তারা তোমার রসুলকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং বিতাড়িত করেছে তাঁর প্রিয় জন্মভূমি থেকে। আর যদি তুমি মনে করো তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রয়োজন আর নেই, তাহলে এই আঘাতেই ইতি টেনে দাও আমার পৃথিবীর জীবনের। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক বনী কুরায়জার শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত তো আমার নয়ন শীতল হবে না। সুতরাং হে আমার আল্লাহ্! তাদের ধ্বংস প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ আমাকে দাও। অথচ মূর্খতার যুগে সা'দ ইবনে মুয়াজের গোত্র ও বনী কুরায়জা ছিলো পরস্পরের মিত্র।

ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইবাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ সূত্রে ইবাদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মুজাহিদ ও মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেছেন, আবদুল মুত্তালিব তনয়া হজরত সাফিয়া বর্ণনা করেছেন, আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম হাস্সান ইবনে সাবেতের দুর্গে। হাস্সান নিজেও তাঁর পরিবারবর্গসহ ঠাঁই নিয়েছিলো সেখানে। একদিন আমরা লক্ষ্য করলাম এক ইহুদী আমাদের দুর্গের আশে পাশে ঘুর ঘুর করছে। সে ছিলো সন্ধিচুক্তি ভঙ্গকারী বনী কুরায়জার দলভূত। ওদিকে রসুল স. কুরায়েশ বাহিনীর আক্রমণ ঠেকাতে ব্যস্ত। বনী কুরায়জার পক্ষ থেকে হামলার আশংকা করছিলাম আমরা। তাদেরকে প্রতিহত করবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও আমাদের ছিলো না। আমি হাস্সানকে ডাক দিয়ে বললাম, দ্যাখো, ওই ইহুদীটির ঘোরাফেরা সন্দেহজনক। আমাদের দুর্গও অরক্ষিত। ইহুদীরা অতর্কিতে আমাদের

উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তার আগেই তুমি লোকটিকে হত্যা করে ফেলো। হাস্সান বললো, হে আবদুল মুত্তালিব নন্দিনী! আল্লাহ্ আপনাকে মার্জনা করুন। আপনি তো জানেনই, একাজে আমি সিদ্ধহস্ত নই। তার কথা শুনে আমি বিস্মিত হলাম না। বরং নিজেই তাঁবুর একটি খুঁটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম দুর্গ থেকে। একটু এগিয়ে যেতেই সাক্ষাত পেলাম লোকটির। সে কিছু বুঝে উঠবার আগেই আমি খুঁটিটি সজোরে বসিয়ে দিলাম তার মাথায়। ওই এক আঘাতেই লোকটি মরে পড়ে রইলো। ফিরে এসে আমি হাস্সানকে বললাম, খতম করেছি দুশমনকে। এবার তুমি যাও, তার শরীর থেকে খুলো নিয়ে এসো অস্ত্র ও পোশাক। হাস্সান বললো, হে অকুতোভয়া! আমার অতো সাহস নেই। অস্ত্র ও পোশাকের প্রয়োজনও আমার নেই।

আমি বলি, কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, বনী কুরায়জার পরিকল্পনা ছিলো, তারা রাতের অন্ধকারে হামলা চালাবে দুর্গের উপর। রসুল স. তাদের অশুভ পরিকল্পনা সম্পর্কে আগেভাগেই আঁচ করতে পারলেন। তাই হজরত সালমা ইবনে আসলামের নেতৃত্বে দুইশত সৈন্য পাঠালেন অরক্ষিত দুর্গগুলোর নিরাপত্তার্থে। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এর তাঁবু রক্ষার জন্য প্রহরায় নিয়োজিত ছিলেন হজরত উব্বাদ ইবনে বশীর ও তাঁর সঙ্গী সাথীরা। কুরায়েশ বাহিনী পরিখা ভেদ করে ভেতরে ঢুকে পড়বার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিলো। আর বার বার প্রস্তর ও তীর বর্ষণের দ্বারা সাহাবীগণ তাদেরকে ঠেকিয়ে রাখছিলেন। রসুল স. নিজেও ছিলেন সদাসতর্ক।

বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, জননী আয়েশা বলেছেন, মদীনায় আগমনের পর প্রথমদিকে রসুল স. কে শত্রুর আক্রমণাশংকায় সদাসতর্ক থাকতে হতো। এক রাতে শয্যাগ্রহণের পূর্বে রসুল স. বললেন, কেউ যদি পাহারায় থাকতো। হঠাৎ আমরা শুনতে পেলাম অস্ত্রের আওয়াজ। মনে হয় অস্ত্রধারী কে যেনো এগিয়ে আসছে। রসুল স. বললেন, কে? আওয়াজ এলো, আমি স'াদ। অকস্মাৎ রসুল স. এর নিরাপত্তাচিন্তা আমাকে ব্যাকুল করে তুললো। আমার সশস্ত্র আগমন সেকারণেই। এরপর রসুল স. তাঁর জন্য দোয়া করলেন এবং নিশ্চিন্তচিত্ত হয়ে করলেন শয্যাগ্রহণ। জননী আয়েশা আরো বলেছেন, পরিখার যুদ্ধের সময় রসুল স. এর প্রধান দেহরক্ষী ছিলো সা'দ। তখন থেকেই তাঁর প্রতি আমার মায়া পড়ে গিয়েছিলো খুব।

পরিখার আবেষ্টনীর একটি স্থানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিলো দুর্বল। আশংকা ছিলো, ওই জায়গা দিয়েই শত্রুরা ব্যুহ ভেদ করার চেষ্টা করবে। আর রসুল স. অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন ওই জায়গাতেই। কোনো কোনো সময় প্রচণ্ড শীতে কাবু হয়ে পড়তেন তিনি। সঙ্গীদেরকে সতর্ক থাকতে বলে চলে আসতেন আমার

সান্নিধ্যে। শরীরের উষ্ণতা ফিরে পাবার পর পুনরায় চলে যেতেন তাঁর রণ অবস্থানে। একবার আমাকে বললেন, শত্রুর আক্রমণ থেকে আমরা আশংকামুক্ত নই। কেউ যদি পাহারা দিতো, তবে আজ রাতে আমি একটু নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিতে পারতাম। এমন সময় আমরা শুনতে পেলাম সশস্ত্র কারো এগিয়ে আসার আওয়াজ। উৎকর্ণ হলাম আমরা। রসুল স. ধমকের সুরে বললেন, কে আসে? জবাব এলো, আমি সা'দ। আজ রাতে আমি এখানেই প্রহরায় থাকবো। তিনি স. আর দ্বিরুক্তি করলেন না। নিশ্চিন্তে শয্যাগ্রহণ করলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই হলেন নিদ্রাভিভূত। আমি শুনতে পেলাম তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের ভারী শব্দ।

উম্মত জননী হজরত উম্মে সালমা বর্ণনা করেছেন, প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করেও প্রতি রাতে রসুল স. পাহারা দিতেন পরিখার বেষ্টনীতে। এক রাতের ঘটনা। তিনি স. ঘরে এসে নামাজ পাঠ করলেন। তারপর বেরিয়ে গেলেন তাঁর প্রহরার নির্দিষ্ট স্থানে। বললেন, শত্রুরা ইতস্ততঃ ঘোরাফিরা করছে। এরপর ডাক দিলেন, উব্‌বাদ ইবনে বশীর কোথায়? উব্‌বাদ আওয়াজ দিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এই যে আমি। তিনি স. বললেন, তোমার সঙ্গী-সাথীরা কি প্রস্তুত? উব্‌বাদ বললেন, হ্যাঁ। রসুল স. বললেন, ভালো করে নজর রাখো। দেখতে পাচ্ছো, শত্রুসেনারা কাছাকাছি ঘোরাফিরা করছে। তুমি তোমার সঙ্গী-সাথীদেরকে নিয়ে তাদের গতিবিধির উপরে কড়া নজর রাখো। নস্যাৎ করে দাও তাদের অশুভ উদ্যোগ। উব্‌বাদ তাঁর সঙ্গীসাথীদেরকে নিয়ে টহল দিতে দিতে একস্থানে দেখলো, পরিখাবেষ্টনীর একস্থানে অপরিসর ঢাল বেয়ে পরিখাভ্যন্তরে অবতরণ করছে আবু সুফিয়ান ও কিছুসংখ্যক পৌত্তলিক সৈন্য। মুসলিম সেনারা একটু পরেই টের পেয়ে গেলো তাদের গতিবিধি। সঙ্গে সঙ্গে তাদের দিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে লাগলো পাথর ও তীর। উব্‌বাদও সেখানে পৌঁছে গেলো সদলবলে। তারাও ছুঁড়ে মারতে শুরু করলো পাথর ও তীর। শত্রুরা উপায়ন্তর না দেখে পিছু হঠতে শুরু করলো। অতি দ্রুত ফিরে গেলো তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে। আমি ফিরে এসে দেখলাম, রসুল স. গভীর মগ্নতার সঙ্গে নামাজ পাঠ করছেন। নামাজ শেষ হলে আমি তাঁকে খুলে বললাম সব।

জননী উম্মে সালমা আরো বর্ণনা করেছেন, নামাজ সমাপনের পর তিনি স. নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন। আমি শুনতে পেলাম তাঁর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ভারী আওয়াজ। ভোরে বেলালের আজান ধ্বনিত হলো। জেগে উঠলেন আল্লাহ্‌র নবী। যথাপ্রস্তুতি গ্রহণ করে মসজিদে গিয়ে ইমামতি করলেন ফজরের জামাতের। নামাজ শেষে দোয়া করলেন, হে আমার পরমপ্রভুপালক। তুমি উব্‌বাদের উপরে সদয় হও। তার উপরে বর্ষণ করো তোমার অপার করুণাবারি।

তিনি আরো বর্ণনা করেছেন, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। রসুল স. ছিলেন নিদ্রাভিভূত। সহসা বাইরে শোনা গেলো জনগুঞ্জন। কে যেনো বলে উঠলো, হে আল্লাহ্‌র বিশেষ বাহিনী! আরোহণ করো। মুহাজিরগণ সাধারণতঃ যুদ্ধকালে এরকমই বলতেন। আর এক বর্ণনায় এসেছে রাতে শত্রুরা তোমাদের প্রতি আক্রমণোদ্যত হলে তোমাদের পরিচিত ধ্বনি হবে— হা মীম লা ইউনসরূন। বর্ণনা দু'টোর সামঞ্জস্য সাধনার্থে বলা যেতে পারে মুহাজিরদের পরিচিত ধ্বনি ছিলো 'হে আল্লাহ্‌র বিশেষবাহিনী! আরোহণ করো' এবং আনসারগণের পরিচিতি ধ্বনি হবে 'হা মীম লা ইউনসরূন'। জননী সালমার বর্ণনায় বাকী অংশটুকু এরকম— বাইরের আওয়াজ শুনে জাগ্রত হলেন রসুল স.। বাইরে বেরিয়ে গেলেন। প্রহরী উব্‌বাদকে জিজ্ঞেস করলেন, খোঁজ নাও তো, কীসের শোরগোল হচ্ছে? উব্বাদ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! পৌত্তলিকদের আমর ইবনে আবদুদের কিছুসংখ্যক সৈন্যের সঙ্গে মুসলমানদের সংঘর্ষ চলছে। চলছে তীর নিক্ষেপণ ও প্রস্তর বর্ষণ। রসুল স. পুনরায় তাঁবুতে ফিরে এলেন। বেরিয়ে গেলেন অস্ত্রসজ্জিত হয়ে। এরপর অশ্বারোহী হয়ে কিছু সংখ্যক সৈন্যসহ যাত্রা করলেন সংঘর্ষস্থলের দিকে। উৎফুল্লচিত্তে ফিরে এলেন কিছুক্ষণ পর। বললেন, আল্লাহ্ তাদের দুষ্প্রচেষ্টা প্রতিহত করেছেন। আহত হয়েছে তাদের অনেকে। তারপর পলায়ন করেছে। তিনি স. পুনরায় শয্যাগ্রহণ করলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি শুনতে পেলাম তাঁর ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ। কিছুক্ষণ পর পুনরায় বাইরে থেকে ভেসে এলো জনগুঞ্জন। তিনি স. জাগ্রত হয়ে বাইরে গেলেন। কী হচ্ছে তা জানার জন্য। ঘটনাস্থলের দিকে প্রেরণ করলেন উব্বাদকে। তিনি ফিরে এসে জানালেন, এবার সংঘর্ষ শুরু হয়েছে দ্বেরার ইবনে খাত্তাবের বাহিনীর সঙ্গে। উভয়পক্ষ থেকে চলছে শরবর্ষণ ও প্রস্তর নিক্ষেপণ। তিনি স. পুনরায় অস্ত্রসজ্জিত হয়ে যাত্রা করলেন। যুদ্ধ শুরু করলেন শত্রুদের সঙ্গে। লড়াই চললো সকাল পর্যন্ত। তারপর রসুল খুশী মনে ফিরে এসে বললেন, ওরা অনেকেই আহত হয়েছে। শেষে তিষ্ঠাতে না পেরে পালিয়েছে।

জননী উম্মে সালমা আরো বর্ণনা করেছেন, আমি আমার প্রিয়তম রসুলের বিশেষ সঙ্গিনী ছিলাম। মুরাইসি, খায়বর, হুনায়েন যুদ্ধ ও মক্কাবিজয়ের সময়। কিন্তু ওগুলোর কোনোটাই পরিখার যুদ্ধের মতো অধিক সংকটময় ছিলো না। পরিখার যুদ্ধেই তাঁর লোকেরা আহত হয়েছিলো অধিকসংখ্যক। আর তখন ছিলো অত্যন্ত শীত। মানুষও ছিলো অনটন কবলিত।

এক বর্ণনায় এসেছে, শত্রুরা পুরো পরিখা বেষ্টন করে ফেললো। মুসলিম বাহিনী গড়ে তুললো দুচ্ছেদ্য প্রতিরোধ। জ্বলে উঠলো তীব্র রণানল। দিবাবসান

হলো। যুদ্ধ চললো বিরতিহীনভাবে। রসুল স. এবং সাহাবীগণ আসর ও মাগরিব সঠিক সময়ে আদায় করার সুযোগই পেলেন না। কাজা আদায় করলেন ইশার সময়ে।

তিরমিজি ও নাসাঈর বর্ণনায় এসেছে, আবু উবায়দা বর্ণনা করেছেন, আমার পিতা আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, পরিখার যুদ্ধে অংশীবাদীরা রসুল স.কে চার ওয়াক্ত নামাজ পড়তে দেয়নি। রাতে যখন যুদ্ধ বন্ধ হলো, তখন তিনি স. একে একে আদায় করলেন জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা। প্রতি ওয়াক্তের নামাজের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে আজান ও একামত বললেন বেলাল। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটির সূত্রপরম্পরা ত্রুটিবিহীন। তবে এ সম্পর্কে কেবল এতোটুকু বলা যেতে পারে যে, আবু উবায়দা তাঁর পিতার নিকট থেকে হাদিসটি শোনেননি। সুতরাং বলা যেতে পারে, এর সূত্রপরম্পরা বিকর্তিত। ইমাম নাসাঈ তাঁর সুনান গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, পরিখার যুদ্ধের সময় একদিন আমরা জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা কাজা করতে বাধ্য হয়েছিলাম। শেষে বিজয় এলো আমাদেরই পক্ষে। আল্লাহ্ এ সম্পর্কে অবতীর্ণ করলেন 'ওয়া কাফাল্লহুল মু'মিনীনাল্ ক্বীতাল' (বিশ্বাসীগণের সংগ্রামে আল্লাহ্ই যথেষ্ট)। রসুল স. তখন নামাজে দণ্ডায়মান হলেন। বেলাল বললেন ইকামত। এভাবে কাজা নামাজগুলো আদায় করা হলো পৃথক পৃথক ইকামতের মাধ্যমে। উল্লেখ্য, এ ঘটনা ঘটেছিলো ভীতিপ্রদ অবস্থার নামাজের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে। ইবনে হাব্বানও তাঁর 'সসীহ্' পুস্তকে এরকম বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর বর্ণনায় ইশার নামাজের কথা নেই। ইশার নামাজ কাজা হয়নি বলেই হয়তো ইশার নামাজের কথা সেখানে অনুল্লেখিত রাখা হয়েছে। তবে ইশা কাজা না হলেও হয়েছিলে বিলম্বিত। তাই কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে চারওয়াক্ত নামাজের কথা।

হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন, পরিখার যুদ্ধের সময় একদিন রসুল স. সময় মতো চার ওয়াক্তের নামাজ পাঠ করতে পারেননি— জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা। রাতের প্রথম প্রহর অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি স. নামাজ পাঠের অবকাশ পেলেন। তখন বেলালকে নির্দেশ দিলেন, আজান দাও ও ইকামত বলো। বেলাল নির্দেশ পালন করলেন। রসুল স. আদায় করলেন জোহর। তিনি স. পুনঃনির্দেশ দিলেন, আজান দাও ও ইকামত বলো। যথারীতি নির্দেশ প্রতিপালিত হলো। তিনি স. এবার পাঠ করলেন আসর। পুনরায় নির্দেশ দিলেন আজান ও ইকামতের। নির্দেশ প্রতিপালিত হলো। এভাবে আজান ও ইকামতসহ আদায় করলেন মাগরিব। ইশার নামাজও আদায় করলেন এভাবেই। তারপর বললেন, এখন পৃথিবীতে এমন কোনো জাতি নেই, যারা এখন

তোমাদের মতো আল্লাহ্র স্মরণে মগ্ন। হাদিসটির সূত্রপরম্পরাভূত এক বর্ণনাকারীর নাম আবদুল করিম ইবনে আবীল মুখারিক। তিনি আবার বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল।

সুপ্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখিত হয়েছে, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো। কুরায়েশ বাহিনীর আক্রমণ তবু থামতেই চায় না। থামলো সন্ধ্যার অনেক পর। ওমর তাদেরকে কঠোর ভাষায় গালি দিতে দিতে রসুল স. সকাশে হাজির হলেন। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! দুশমনদের কারণে আমিতো আসর নামাজ পড়তেই পারলাম না। তিনি স. বললেন, আমিও পারিনি। এরপর তিনি স. আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে গমন করলেন বুতহান নামক স্থানে। সেখানে ওজু সমাপনের পর আমাদেরকে নিয়ে আদায় করলেন আসর, তারপর মাগরিব।

সুপ্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থদ্বয়ে আরো বর্ণিত হয়েছে, হজরত আলী বলেছেন, পরিখার যুদ্ধের সময় একদিন সময়মতো নামাজ পাঠ করতে না পারায় রসুল স. উত্তেজিত হলেন। বললেন, ওরা আমাদেরকে সময়মতো নামাজ পড়তে দিলো না। আল্লাহ্ ওদের ঘরদোর ও কবর অগ্নি দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিন। মুসলিমের বর্ণনায় অতিরিক্তরূপে এসেছে এই কথাটুকু— এরপর রসুল স. মাগরিব ও ইশার মাঝামাঝি সময়ে আদায় করলেন আসরের কাযা। উল্লেখ্য, পরিখার যুদ্ধ চলেছিলো বেশ কিছুদিন ধরে। সুতরাং ওই সময়ের কাযা নামাজ আদায়ের মধ্যে যে বর্ণনাবৈষম্য দেখা যায়, তার সমাধানার্থে বলা যেতে পারে, সম্ভবতঃ বিবরণগুলো সম্পৃক্ত বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে। অথবা সম্পৃক্ত একই ঘটনার সঙ্গে। হাদিস বেত্তাগণ বলেন, বর্ণনাকারী ভিন্ন ভিন্ন হলেও এরকম বর্ণনাবৈষম্য সৃষ্টি হওয়া দূষণীয়ও নয়।

মাসআলা ঃ একবারে কয়েক ওয়াক্তের নামাজ কাযা হলে প্রতি ওয়াক্তের কাযা আজান ও ইকামতসহ আদায় করতে হবে কিনা সে সম্পর্কে মত-প্রভেদ রয়েছে। তবে সর্বোত্তম পদ্ধতি হচ্ছে— প্রতি ওয়াক্তের কাযা পৃথক পৃথক আজান-ইকামতসহ সম্পাদিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইতোপূর্বে বর্ণিত বায্যারের বিবরণের মাধ্যমে সেকথাই প্রমাণিত হয়। আল্লাহ্ই সমধিক জ্ঞাত।

প্রলম্বিত পরিখার যুদ্ধে মুসলমানদের দুর্ভোগ বাড়িয়েই চললো। তখন একদিন রসুল স. শত্রুবাহিনীর জন্য অপপ্রার্থনা করলেন। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয়তম রসুলের সে প্রার্থনা অনুমোদনও করলেন। যেমন ইমাম বোখারী তাঁর 'সহীহ্' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী আওফা বলেছেন, অবিশ্বাসীদের যৌথবাহিনী যখন মদীনা অবরোধ করে বসলো তখন রসুল স. নিবেদন করলেন, হে মহাগ্রন্থের অবতারক! হে মহাবিচার দিবসের পরিচালক! তুমি সংঘবদ্ধ শত্রু সেনাকে বিভেদিত করো, করো পর্যুদস্ত।

আমি বলি, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌র বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. পরিখার যুদ্ধের সময় তাঁর অবস্থান স্থল মসজিদে ফাতাহ থেকে পরপর তিন দিন শত্রুবাহিনীর জন্য অশুভপ্রার্থনা করেছিলেন। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, সোম, মঙ্গল ও বুধবার— এই তিনদিন তিনি স. আল্লাহ্‌ সকাশে নিবেদন করেছিলেন তার অশুভ নিবেদন। আর এ নিবেদন কবুল করা হয়েছিলো শেষ দিন, অর্থাৎ বুধবার জোহর ও আসরের মাঝামাঝি সময়ে। আর রসুল স. এর পবিত্র মুখমণ্ডলে আনন্দের আভাষ দেখেই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, তাঁর নিবেদন আল্লাহ্‌ কবুল করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর একদিন আমাদের উপরও নেমে এসেছিলো চরম সংকট। তখন আমরাও কাফেরদের জন্য বদদোয়া করেছিলাম। আল্লাহ্‌পাক তাঁর প্রিয়তম রসুলের উপস্থিতির বরকতে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন আমাদের প্রার্থনাও।

পরিখার যুদ্ধের সময় ঘটলো আর একটি চমকপ্রদ ঘটনা। গাতফান গোত্রের নাঈম ইবনে মাসউদ অতি সঙ্গোপনে দেখা করলেন রসুল স. এর সঙ্গে। বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল ! আমি মনেপ্রাণে ইসলাম গ্রহণ করেছি। কিন্তু আমার স্বগোত্রীয়রা একথা জানে না। এখন আমি কামনা করি আপনার আদেশ। আপনি যা বলবেন, আমি তাই করবো। রসুল স. বললেন, তুমি যেমন গোপনে এসেছো, তেমনি গোপনে গিয়ে তোমার গোত্রীয় ভ্রাতাদের সঙ্গে মিশে যাও। বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করো তাদের একের সঙ্গে অপরের, যেনো তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আমাদের দিক থেকে দৃষ্টি উঠিয়ে নিয়ে পথ খোঁজে পলায়নের। কৌশলাবলম্বনই তো যুদ্ধ।

আমি বলি, অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত নাঈম তখন বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! হে আল্লাহ্‌র বাণীবাহক! আপনি সদয় অনুমতি প্রদান করুন। আমি কৌশলাবলম্বন করি। সত্য-মিথ্যা বলে তাদের মধ্যে সৃষ্টি করি বিভেদ। রসুল স. তাঁকে অনুমতি দিয়েছিলেন। অনুমতি পেয়ে তিনি প্রথমে গেলেন বনীকুরায়জার বস্তিতে। তিনি ছিলেন তাদের পূর্বপরিচিত। তাই তারা ঔৎসুক্য নিয়ে সমবেত হলো তাঁর কাছে। তিনি বললেন, হে বনী কুরায়জা। তোমরা তো জানোই আমি তোমাদের একান্ত শুভানুধ্যায়ী। তারা বললো, তাতো জানিই। তিনি বললেন, তাহলে শোনো, তোমরা কুরায়েশ এবং গাতফানদের সঙ্গে যোগ দিয়েছো বটে, কিন্তু তাদের অবস্থা তো তোমাদের মতো। তোমরা মদীনার অধিবাসী। তোমাদের পরিবার-পরিজন ধন-সম্পদ সবই তো এখানে। তারা কিন্তু তাদের পরিবার পরিজন ধন-সম্পদ কোনো কিছুই এখানে নিয়ে আসেনি। আর যুদ্ধের পরিণাম কী হবে, তা কি নিশ্চিত করে বলা যায়। যদি তারা জয়ী হয়, তবে তোমরা হয়তো পাবে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের কিঞ্চিত অংশ। কিন্তু পরাজিত হলে? তারা

তা তোমাদের কথা আর ভাববেই না। প্রাণ বাঁচাতে পলায়ন করবে ঊর্ধ্বশ্বাসে। তোমাদেরকে রেখে যাবে মুসলমানদের তোপের মুখে। তাই আমি বলি, যেমন ব্যাধি, তার ব্যবস্থাপত্রও হওয়া দরকার তেমনি। উত্তম হয়, যদি তোমরা তাদের দলের কয়েকজন নেতাকে জিম্মি হিসেবে আটকে রাখতে পারো। এরকম করলে তারা আর তোমাদেরকে ফেলে পালিয়ে যেতে পারবে না। এক্ষুণি তোমরা তাদেরকে একথা জানাও। যদি তারা তোমাদের প্রস্তাবে সাড়া দেয়, তবে তো ভালোই। আর যদি অসম্মত হয়, তবে বুঝবে তাদের উদ্দেশ্য খুব একটা সুবিধের নয়। বনী কুরায়জার লোকেরা হজরত নাঈমের প্রস্তাবটিকে পছন্দ করলো খুব। এভাবে তাদের মধ্যে সংশয় সৃষ্টি করে দিয়ে হজরত নাঈম এবার আগমন করলেন প্রধান সেনাপতি আবু সুফিয়ান এবং অন্যান্য কুরায়েশ নেতৃবর্গের কাছে। বললেন, হে কুরায়েশ মণ্ডলবর্গ! তোমরা তো জানোই আমি ও আমার গোত্র তোমাদের কতো অন্তরঙ্গ। মোহাম্মদের প্রতি আমাদের কী মনোভাব, সেকথাও তোমাদের অজানা নয়। এক্ষুণে অন্তরঙ্গতার দাবি নিয়ে আমি তোমাদের কাছে গচ্ছিত রাখতে চাই একটি সঙ্গোপন হিতোপদেশ। কিন্তু কথা দিতে হবে, একথা তোমরা কিছুতেই প্রকাশ করতে পারবে না।

কুরায়েশ নেতৃবর্গ বললো, ঠিক আছে, কথা দিলাম। হজরত নাঈম বললেন, তাহলে শোনো, বনী কুরায়জাকে আর বিশ্বাস করা যায় না। তারা গোপনে গোপনে মোহাম্মদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। বলেছে, হে মোহাম্মদ! আমরা আপনার সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে মহা অন্যায় করে ফেলেছি। আমরা এখন অনুতপ্ত। এখন কীভাবে এর প্রায়শ্চিত্য করবো তা বলে দিন। যদি বলেন, তবে আমরা সুকৌশলে গাতফান ও কুরায়েশদের কয়েকজন নেতাকে আমাদের আওতায় নিয়ে আসি। তারপর তাদেরকে বন্দী করে সোপর্দ করি আপনার কাছে। আপনি তাহলে সহজেই তাদের শিরোশ্ছেদ করতে পারবেন। ফলে শত্রুরা হয়ে পড়বে ভীত-সন্ত্রস্ত। তখন আমাদের যৌথ আক্রমণের সামনে তারা আর তিষ্ঠাতেই পারবে না। হে মোহাম্মদ! এখন আপনার প্রসন্নতাই আমাদের কাম্য। মোহাম্মদ তাদের এ প্রস্তাবে সায় দিয়েছেন। সুতরাং সাবধান! বনী কুরায়জা যদি এরকম কোনো প্রস্তাব নিয়ে আসে তবে কিছুতেই তাতে সম্মতি দেওয়া যাবে না। এরপর হজরত নাঈম গেলেন তাঁর আপন গোত্রের লোকদের কাছে। তাদের মনেও সন্দেহ এবং ভয় ঢোকালেন বিভিন্ন কথা বলে।

হিজরী পঞ্চম সাল। শাওয়াল মাস আল্লাহ্পাক প্রলম্বিত পরিখার যুদ্ধের ইতি ঘটালেন এভাবে— আবু সুফিয়ান কুরায়েশ এবং গাতফান গোত্রের কিছুসংখ্যক লোক নিয়ে গঠন করলেন একটি প্রতিনিধি দল। তারপর ইকরামা ইবনে আবু জেহেল এবং ওরাকা ইবনে গাতফানের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটিকে পাঠালেন বনী

কুরায়জার নিকটে। তারা যেয়ে বনী কুরায়জাকে বললো, দ্যাখো, আমরা তো এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করবার জন্য আসিনি। আমাদের যুদ্ধাশ্ব ও উটগুলোও শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছে। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এবার শুরু করবো সর্বাত্মক যুদ্ধ। তোমারাও প্রস্তুত হও। মোহাম্মদের সঙ্গে এবার হোক আমাদের চূড়ান্ত বোঝাপড়া।

বনী কুরায়জা বললো, আজ শনিবার, তোমরা তো জানোই শনিবার আমাদের কাছে কীরূপ সম্মানার্হ। সুতরাং আজ তো আমরা যুদ্ধের ময়দানে নামতে পারবোই না। তাছাড়া এ সম্পর্কে আমাদের কিছু বক্তব্যও আছে। বক্তব্যটি হচ্ছে— যুদ্ধে আমাদের জয় যদি হয়, তবে তো ভালোই। আর যদি পরাজয় হয়, তবে তো তোমরা পালিয়ে গিয়ে প্রাণরক্ষা করতে পারবে। তখন একা পেয়ে মোহাম্মদের দল আমাদেরকে সমূলে উৎখাত করে ফেলবে। তাই আমরা চাই, তোমরা তোমাদের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে জামানতস্বরূপ আমাদের অধীনে রেখে দাও। প্রতিনিধি দল ফিরে গেলো। সেনাপতি আবু সুফিয়ানের কাছে খুলে বললো সব। সে এবং তাদের দলের নেতারা তখন বলে উঠলো, নাঈম ইবনে মাসউদের কথাই তাহলে ঠিক। বনী কুরায়জা বিশ্বাস ঘাতক। একথা ভেবেই তারা বনী কুরায়জাকে বলে পাঠালো, আমরা এরকম জামানত রাখতে অসম্মত। বনী কুরায়জার নেতারা তখন বললো, নাঈম তো তাহলে ঠিক কথাই বলেছে। বহিরাগতদের মনে রয়েছে দূরভিসন্ধি। তারা জয়ী হলে গণিমত নিয়ে সরে পড়বে। আর পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখলেই আমাদেরকে অসহায় অবস্থায় রেখে যাবে পালিয়ে। তখন বেঘোরে জীবন দেওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায়ই থাকবে না। এভাবে পারস্পরিক অবিশ্বাসের কারণে শত্রুবাহিনী হয়ে পড়লো হতোদ্যম। এর মধ্যে হঠাৎ এক রাতে শুরু হলো ভয়ংকর তুফান। তখন উনুনে চড়ানো ছিলো সৈন্যদের খাদ্যপ্রস্তুত করার ডেগ। প্রচণ্ড বাতাসে সেগুলো হয়ে গেলো লণ্ডভণ্ড। তাঁবুগুলো গেলো উড়ে। তাঁবুর খুঁটি, খুঁটির দড়ি সব কিছু ছড়িয়ে পড়লো এদিকে ওদিকে। উড়ন্ত খুঁটির আঘাত খেয়ে ঘোড়াগুলো পালাতে শুরু করলো দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। প্রচণ্ড শীতে সৈন্যরা কাঁপতে লাগলো ঠক ঠক করে। সকলে হয়ে গেলো কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

শত্রুবাহিনীর ছত্রভঙ্গ হওয়ার সংবাদ জানতে পেরে রসুল স. পরদিন সকালে তাদের অবস্থা জানার জন্য গুপ্তচররূপে প্রেরণ করলেন হজরত হুজায়ফা ইবনে ইয়ামিনকে। জায়েদ ইবনে জিয়াদের সূত্রে মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজীর উক্তিরূপে এরকম বর্ণনা করেছেন মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক। কোনো কোনো ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন ইব্রাহিম তাইমির কথা। উভয় বর্ণনায় এসেছে, একবার এক কুফাবাসী যুবক হজরত হুজায়ফা ইবনে ইয়ামিনের নিকটে জানতে

চাইলো, হে আবু আবদুল্লাহ! আপনি কি কখনো রসুল স. এর অনুপম সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ! আমার সৌভাগ্য হয়েছিলো কিছুদিনের পবিত্র সাহচর্য। যুবক বললো, আপনার সঙ্গে তিনি স. কীরূপ আচরণ করতেন? হজরত হুজায়ফা বললেন, আমরা তো ছিলাম তাঁর একান্ত অনুচর ও সহযোগী। যুবক বললো, আমরা তাঁকে পেলে পায়ে হেঁটে পথ চলতে দিতাম না। ঘাড়ে করে নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম। হজরত হুজায়ফা বললেন, তুমি তো জানো না, তখন কতোই না কষ্ট করতে হয়েছে— আমাদেরকে। আল্লাহ্র শপথ! পরিখার যুদ্ধের মহাসংকটময় দিনগুলোর ছবি তো এখনো আমার চোখে ভাসে। এক রাতের ঘটনা। প্রচণ্ডশীত পরেছিলো সে রাতে। সকলেই শীতার্ত। রসুল স. বললেন, আছো এমন কেউ, যে আমাকে এনে দিতে পারবে শত্রুদলের অভ্যন্তরীণ খবর। আল্লাহ্ তাকে দান করবেন জান্নাতের প্রবেশাধিকার। কারো পক্ষ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না। এরপর কিছুক্ষণ ধরে নামাজ পাঠ করলেন তিনি স.। তারপর আমাদের মুখোমুখি হয়ে পুনরাবৃত্তি করলেন আগের ঘোষণাটির। এবারেও কেউ সাড়া দিলো না। তিনি স. পুনরায় নামাজে নিমগ্ন হলেন। নামাজ শেষে পুনরায় বললেন, যে ব্যক্তি আজ শত্রুশিবিরে উপস্থিত হয়ে তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থার বিবরণ জেনে এসে আমাকে বলবে, সে হবে আমার জান্নাতের সঙ্গী। কিন্তু সকলেই তখন শীতে আড়ষ্ট, অনাহার ক্লিষ্ট এবং ভীত। তাই সাড়া পাওয়া গেলো না কারো পক্ষ থেকেই। রসুল স. তখন আমাকে ডাকলেন। বললেন, হুজায়ফা! আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! এই যে আমি। একথা বলেই আমি গিয়ে দাঁড়ালাম রসুল স. এর একেবারে সামনে। প্রচণ্ড শীতের প্রকোপে আমার উরু দু'টো তখন কাঁপছিলো থর থর করে। রসুল স. তাঁর পবিত্র হাত বুলিয়ে দিলেন আমার শরীরে। আমি হয়ে গেলাম সুস্থির ও শান্ত। তিনি স. আজ্ঞা করলেন, একাজ তোমাকেই করতে হবে। যাও, শত্রুদের অভ্যন্তরীণ খবরাখবর সংগ্রহ করে নিয়ে এসো। সোজা এসে দেখা কোরো আমার সঙ্গে। পথে আবার কোনো হাস্যকৌতুকের বৈঠকে বসে পোড়ো না যেনো। এরপর দোয়া করলেন— হে আমার আল্লাহ্! তুমি হুজায়ফাকে হেফাজত করো সম্মুখে-পশ্চাতে, দক্ষিণে-বামে, উপরে-নিচে সব দিক থেকে।

আমি আমার তূণ ভরে নিলাম তীর। কটিদেশে ঝুলিয়ে নিলাম তলোয়ার। তারপর নিঃশঙ্কচিত্তে যাত্রা করলাম শত্রুশিবিরের দিকে। মনে হচ্ছিলো, আমি যেনো নিরুদ্বিগ্ন মনে যাচ্ছি আমার কোনো নিকটাত্মীয়ের বাড়িতে। একসময় আমি মিশে গেলাম শত্রুসেনাদের সঙ্গে। তখনো চলছে উথাল পাথাল ঝড়। ফলে তাদের তখন বেহাল অবস্থা। তাঁবু, আসবাবপত্র, আহারের আয়োজন সবকিছু লণ্ডভণ্ড। ছুটন্ত ঘোড়াগুলোকে বেদম প্রহার করে বাগে আনতে চেষ্টা করছিলো

কেউ কেউ। একস্থানে দেখলাম, আবু সুফিয়ান এক বিক্ষিপ্ত অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে আগুন তাপাচ্ছে। মনে হলো, এই মুহূর্তে একটি তীর নিক্ষেপ করে মিটিয়ে দেই তার যুদ্ধের সাধ। কিন্তু সংযত হলাম এই ভেবে যে, আমি কেবল শত্রুদের অভ্যন্তরীণ গতিবিধি সংগ্রহের নির্দেশপ্রাপ্ত। সকলের বেহাল অবস্থা দেখে আবু সুফিয়ান নড়ে চড়ে বসলো। চিৎকার করে বলতে শুরু করলো, হে কুরায়েশ বাহিনী! ছুটাছুটি না করে প্রত্যেকেই তার সঙ্গীর হাত ধরে বসে থাকো। যেনো আমাদের ভিতরে প্রতিপক্ষের কোনো গুপ্তচর ঢুকে না পড়তে পারে। একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার পাশের একজনের হাত ধরে বসে পড়লাম। জিজ্ঞেস কররাম, তুমি কে? সে বললো, হায় আল্লাহ্! তুমি আমাকে চেনো না? আরে আমি তো অমুকের পুত্র অমুক। বুঝলাম, লোকটি হাওয়াযীন গোত্রের। আবু সুফিয়ান পুনরায় চিৎকার করে বললো, হে কুরায়েশ জনতা! আমরা তো এখানে চিরদিনের জন্য থাকতে আসিনি। আমাদের সাজ-সরঞ্জাম বাহন সবকিছু বিপর্যস্ত। বনী কুরায়জারা বিশ্বাসঘাতকতা করলো। প্রচণ্ড ঝড়ে ও শীতে আমাদের অবস্থাও জুবুথুবু। তাই আমি বলি, এখান থেকে কেটে পড়াই উত্তম। বলেই গাত্রোত্থান করলো সে। তার উটে আরোহন করে চলতে শুরু করলো মদীনা ছেড়ে। মুহূর্তমধ্যে সকলে অনুসরণ করলো তাকে। এদৃশ্য দেখে গাতফান গোত্রের লোকেরাও হলো প্রস্থানোদ্যত। আমি ফিরে এলাম রসুল স. সকাশে। দেখলাম, তিনি স. নামাজে নিমগ্ন। আমার উপস্থিতি টের পেয়ে নামাজ সমাপন করলেন তিনি স.। আমার দিকে মুখ ফেরাতেই আমি তাকে খুলে বললাম আনুপূর্বিক ঘটনা। সঙ্গে সঙ্গে উধাও হয়ে গেলো আমার আত্মীয়বাড়ি যাওয়ার মতো মনের অবস্থা। শীতও গায়ে লাগতে শুরু করলো আগের মতো। রসুল স. আমার অবস্থা টের পেয়ে হেসে দিলেন। নিশীথের বিদ্যুৎচমকের মতো ঝকঝক করে উঠলো তাঁর মুক্তাসদৃশ দন্তপাটি। আদর করে তিনি স. ডেকে নিলেন একেবারে কাছে। ঢেকে দিলেন তাঁর শীতবস্ত্রের একাংশ দিয়ে। আমার বুকের উপরে রাখলেন তাঁর পবিত্র হাত। সে স্বর্গীয় হাতের মধুর পরশ যে অবিস্মরণীয়। মনে নেই কখন যেনো নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লাম আমি। ভোরে জেগে উঠলাম রসুল স. এর দরদভরা ডাক শুনে। শুনতে পেলাম, তিনি স. আদর করে ডাকছেন, হুজায়ফা! ও হুজায়ফা। ওঠো। উঠে পড়ো।

আমি বলি, কাতাদা সূত্রে ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, ওই সময় কাফের বাহিনীর উপরে আক্রমণ চালিয়েছিলো অদৃশ্য ফেরেশতারা। কাফেরেরা কেবল শুনতে পেলো চতুর্দিক মুহুর্মুহু ধ্বনিত হচ্ছে ‘আল্লাহু আকবর’। তালহা ইবনে খুয়াইলিদ চিৎকার করে বলতে শুরু করলো, উপস্থিত জনতা!

সাবধান হও। মোহাম্মদ চালাতে শুরু করেছে তার ভয়ানক যাদু। সুতরাং প্রাণে বাঁচতে চাইলে পালাও। তার একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে পড়িমরি করে ছুটে পালাতে শুরু করলো শত্রুরা।

আমি আরো বলি, শায়েখ ইমামুদ্দিন ইবনে কাছীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেন, রসুল স. মহাবিশ্বের রহমত যদি না হতেন, তবে শত্রুদেরকে টুকরা টুকরা না করে ছাড়তেন না। শত্রুরা ধ্বংস হয়ে যেতো তেমনি করে, যেমন ভাবে সর্বগ্রাসী মহাপ্রভঞ্জনের আঘাতে মূলোৎপাটিত হয়েছিলো অবাধ্য আদ সম্প্রদায়।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত হুজায়ফা বলেছেন, শত্রুশিবির থেকে প্রত্যাবর্তনকালে আমি দেখলাম কুড়িজন অপার্থিব ঘোড়সওয়ারকে। তারা ছিলো শ্বেতশুভ্র উষ্ণীশ পরিহিত। তাদের একজন আমাকে বললেন, তোমার সাথীকে গিয়ে বোলো, আল্লাহ্ নিজে আপনার কর্ম সুসম্পন্ন করেছেন। আপনাকে মুক্ত করেছেন তাদের অনিষ্ট থেকে।

বোখারী ও মুসলিম তাঁদের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ করেছেন, হজরত জোবায়ের বলেছেন, পরিখার যুদ্ধকালীন এক রাতে রসুল স. বললেন, কে আমাকে এনে দিতে পারবে শত্রুদলের গতিবিধির সংবাদ? আমি জবাব দিলাম, আমি। পুনরায় তিনি একই প্রশ্নের অবতারণা করলেন। আমিও জবাব দিলাম একই ভাবে। তৃতীয় বার বললেন, বলো, কে আমাকে এনে দিতে পারবে শত্রুদলের গোপন তথ্য? আমি বললাম, আমি। রসুল স. তখন বললেন, প্রত্যেক নবীরই থাকে একজন বিশেষ সহচর। আর আমার বিশেষ সহচর হচ্ছে যোবায়ের।

বোখারী তাঁর 'সহীহ' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত সুলায়মান ইবনে সারীদ বলেছেন, পরিখার যুদ্ধক্ষেত্র যখন শত্রুমুক্ত হলো, তখন রসুল স. বললেন, এখন থেকে ওরা আর আমাদেরকে আক্রমণ করার সাহস পাবে না। এখন থেকে আমরাই ক্রমাগত প্রবলতর হতে থাকবো তাদের উপর। বোখারী আরো উল্লেখ করেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, রসুল স. জেহাদ, হজ এবং ওমরা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিন বার উচ্চারণ করতেন 'আল্লাহু আকবর'। তারপর বলতেন— লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুল্কু ওয়ালাহুল হাম্দু ইউহ্য়ী ওয়া ইউমিতু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন ক্বদীর। আয়িবূনা তায়িবূনা আবিদূনা সাজিদূনা লি রব্বিনা হামিদূনা সাদাকাল্লহু ওয়'াদাহু ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহমারা ওয়াহ্দাহু।

মোহাম্মদ ইবনে ওমর বলেছেন, পরিখার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছিলেন ছয় জন সাহাবী। আর ছয় জন নিহত হয়েছিলো বিরুদ্ধপক্ষীয়দের।

اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَ اِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ
وَ بَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَ تَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ﴿۱۰﴾
هُنَالِكَ ابْتُلِیَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ زُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِیْدًا ﴿۱۱﴾ وَ اِذْ
یَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَ الَّذِیْنَ فِیْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَ
رَسُوْلُهٗۤ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿۱۲﴾ وَ اِذْ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ یٰۤاَهْلَ
یَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ۚ وَ یَسْتَاْذِنُ فَرِیْقٌ مِّنْهُمُ
النَّبِیَّ یَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُیُوْتَنَا عَوْرَةٌ ۛؕ وَ مَا هِیَ بِعَوْرَةٍ ۛۚ اِنْ
یُّرِیْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا ﴿۱۳﴾ وَ لَوْ دُخِلَتْ عَلَیْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ
سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَاٰتَوْهَا وَ مَا تَلَبَّثُوْا بِهَاۤ اِلَّا یَسِیْرًا ﴿۱۴﴾ وَ لَقَدْ
كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا یُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ ؕ وَ كَانَ عَهْدُ
اللّٰهِ مَسْـُٔوْلًا ﴿۱۵﴾ قُلْ لَّنْ یَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ
الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَ اِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِیْلًا ﴿۱۶﴾ قُلْ مَنْ ذَا
الَّذِیْ یَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ
رَحْمَةً ؕ وَ لَا یَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِیًّا وَّ لَا نَصِیْرًا ﴿۱۷﴾

r যখন উহারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হইয়াছিল তোমাদের উপরের দিক ও নীচের দিক হইতে, তোমাদের চক্ষু বিস্ফারিত হইয়াছিল, তোমাদের প্রাণ হইয়া পড়িয়াছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করিতেছিলে;

r তখন মু'মিনগণ পরীক্ষিত হইয়াছিল এবং তাহারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হইয়াছিল।

r আর স্মরণ কর, মুনাফিকরা ও যাহাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তাহারা বলিতেছিল, 'আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূল আমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নহে।'

r আর উহাদের একদল বলিয়াছিল, 'হে ইয়াছরিববাসী! এখানে তোমাদের কোন স্থান নাই, তোমরা ফিরিয়া চল', এবং উহাদের মধ্যে একদল নবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করিয়া বলিতেছিল, 'আমাদের বাড়িঘর অরক্ষিত'; অথচ ঐগুলি অরক্ষিত ছিল না, আসলে পলায়ন করাই ছিল উহাদের উদ্দেশ্য।

r যদি বিভিন্ন দিক হইতে তাহাদের বিরুদ্ধে শত্রুগণের প্রবেশ ঘটিত, অতঃপর তাহাদিগকে বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত করা হইত, তবে তাহারা অবশ্য তাহাই করিয়া বসিত, তাহারা ইহাতে কালবিলম্ব করিত না।

r ইহারা তো পূর্বেই আল্লাহ্র সহিত অংগীকার করিয়াছিল যে, ইহারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে না। আল্লাহ্র সহিত কৃত অংগীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হইবে।

r বল, 'তোমাদের কোন লাভ হইবে না যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন কর তবে সেই ক্ষেত্রে তোমাদিগকে সামান্যই ভোগ করিতে দেওয়া হইবে।'

r বল 'কে তোমাদিগকে আল্লাহ্ হইতে রক্ষা করিবে যদি তিনি তোমাদের অমংগল ইচ্ছা করেন অথবা তিনি যদি তোমাদিগকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে কে তোমাদের ক্ষতি করিবে?' উহারা আল্লাহ্ ব্যতীত নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাইবে না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিলো তোমাদের উপরের দিক ও নিচের দিক হতে'। একথার মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে আক্রমণকারী বনী আসাদ, বনী গাতফান ও বনী কুরায়জাকে। উল্লেখ্য, পূর্ব প্রান্ত থেকে এক হাজার পৌত্তলিক সৈন্যসহ আক্রমণ চালিয়েছিলো মালেক ইবনে আউফ নজরী ও উয়াইনা ইবনে হোসাইন ফাযায়ী। বনী আসাদ নেতা তুলাইহা ইবনে খুয়াইলিদ আমাদীর নেতৃত্বে বনী আসাদ গোত্রও ছিলো তার সহযোগী। আর বনী কুরায়জার অধিনায়ক ছিলো হুয়াই ইবনে আখতাব।

'ও নিচের দিক থেকে' অর্থ পশ্চিম প্রান্তের বাত্নে ওয়াদীর দিক থেকে'। পশ্চিম দিক থেকে অভিযান চালিয়ে ছিলো বনী কেনানা ও কুরায়েশ। এ দলের অধিনায়ক ছিলো আবু সুফিয়ান। আর পরিখার দিক থেকে আক্রোমণোদ্যত হয়েছিলো আবুল আ'ওয়ার আমর ইবনে সুফিয়ান সালামী।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়েছিলো; তোমাদের প্রাণ হয়েছিলো কণ্ঠাগত।' একথার অর্থ— শত্রুদলের এরকম আক্রমণ প্রস্তুতি দেখে ভয়ের প্রভাব পড়েছিলো তোমাদের মনে ও চোখে-মুখে। ফলে তোমাদের চোখ হয়েছিলো বিস্ফারিত এবং কণ্ঠাগত হয়েছিলো প্রাণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করছিলে।' এ কথার অর্থ— কপটবিশ্বাসীরা তখন ধারণা করেছিলো, এবার মনে হয় আর রক্ষা নেই। মোহাম্মদ ও তাঁর একান্ত অনুচরদের ধ্বংস এবার অনিবার্য। আর দুর্বলচিত্ত বিশ্বাসীরা ভাবতে শুরু করেছিলো কী জানি কী হয়। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসীরা ছিলো বিশ্বাসে অনড়। তারা জানতো, আল্লাহ্র অঙ্গীকার সত্য এবং আশা করতো, অবশ্যই আসবে প্রতিশ্রুত সাহায্য ও বিজয়।

পরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'তখন মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিলো এবং তারা ভীষণভাবে পরীক্ষিত হয়েছিলো'। একথার অর্থ— তখন চরম সংকটের মাধ্যমে পরীক্ষা করে কপটবিশ্বাসী ও দুর্বলচিত্ত বিশ্বাসীদের থেকে পৃথক করে ফেলা হয়েছিলো বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীদেরকে। ওই ভীষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন কেবল বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীরা, যারা ছিলো প্রকৃত অর্থেই বিশ্বাসী।

এর পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'আর স্মরণ করো, মুনাফিকেরা ও যাদের আন্তরে ছিলো ব্যাধি, তারা বলছিলো, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা প্রতারণা ব্যতীত কিছু নয়।' এখানে 'মুনাফিকেরা ও যাদের অন্তরে ছিলো ব্যাধি' বলে বুঝানো হয়েছে কপট মা'কাব ইবনে কুশাইর, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই এবং তাদের অনুসারী ভীরু-কাপুরুষদেরকে।

বাগবী লিখেছেন, এখানে কপটবিশ্বাসীদের 'আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন' অর্থ— যে প্রতিশ্রুতি তাঁরা দিয়েছিলেন পারস্য ও রোম বিজয়ের। আর 'তা প্রতারণা ব্যতীত কিছু নয়' অর্থ সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন তো দূরের কথা, এখন আমাদের জীবন নিয়েই টানাটানি। মদীনা এখন অবরুদ্ধ সম্মিলিত শত্রুসেনার দ্বারা। সুতরাং মোহাম্মদের কৃত প্রতিশ্রুতি প্রতারণা ছাড়া অন্যকিছু নয়? এরকম ব্যাখ্যা সুদ্দী সূত্রে ইবনে আবী হাতেমের মাধ্যমে। আর বর্ণনাকারীরূপে এসেছে বশীর ইবনে মাতা'ব এর নাম।

এর পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'আর তাদের এক দল বলেছিলো, হে ইয়াছরীববাসী! এখানে তোমাদের কোনো স্থান নেই, তোমরা ফিরে চলো'। উল্লেখ্য, এরকম উক্তি করেছিলো আউস ইবনে কিবতী। আর 'ইয়াছরীব' অর্থ এখানে মদীনা। আবু উবায়দা বলেছেন, ইয়াছরীব হচ্ছে এক আরব ভূখণ্ড, যার একাংশে অবস্থিত মদীনাতুন্ নবী, অর্থাৎ নবী-নগরী।

বাগবী লিখেছেন, কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, রসুর স. আজ্ঞা করেছেন তোমরা এই নগরীকে ইয়াছরীব বলো না, বলো মদিনা। উল্লেখ্য, 'ইয়াছরীব' অর্থ— ভর্ৎসনা করা। লজ্জা দেওয়া। কোন অপরাধের কারণে লাঞ্ছনা ভোগ করা। 'মুছরিব' বলে ওই ব্যক্তিকে, যে ব্যয়কুণ্ঠ, কৃপণ, কামুক।

'মুক্বাম' অর্থ অবস্থান স্থল। আর এখানে 'ফিরে চলো' অর্থ পরিত্যাগ করো মোহাম্মদের সাহচর্য, পরিহার করো তার বন্ধুত্ব। অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকা তোমাদের জন্য অসমীচীন, সমীচীন হচ্ছে অংশীবাদীদের পক্ষাবলম্বন। এরকম করার মধ্যেই রয়েছে তোমাদের নিরাপত্তা। অথবা কথাটির অর্থ— ইসলাম ও মোহাম্মদ তোমাদের জন্য অবশ্য পরিত্যজ্য। সুতরাং চলে যাও এই স্থান থেকে অন্য কোনো নিরাপদ স্থানে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাদের মধ্যে একদল নবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে বলছিলো, আমাদের বাড়িঘর অরক্ষিত; অথচ ওইগুলি অরক্ষিত ছিলো না; আসলে পলায়ন করাই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য, এরকম অব্যাহতি প্রার্থনা করেছিলো বনী হারেছা ও বনী সালমা। এখানে অজুহাত হিসেবে উপস্থাপিত তাদের 'অরক্ষিত' কথাটির অর্থ— শত্রুর আক্রমণাশংকা, অথবা আশংকা চুরির।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'যদি বিভিন্ন দিক থেকে তাদের বিরুদ্ধে শত্রুগণের প্রবেশ ঘটতো, অতঃপর তাদেরকে বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত করা হতো, তবে তারা অবশ্য তাই করে বসতো, তারা এতে কালবিলম্ব করতো না'।

এখানে 'দুখিলাত' প্রবেশ করতো। অর্থ সংঘবদ্ধ শত্রুসেনাদের অনুপ্রবেশ ঘটতো মদীনায়। 'আ'লাইহিম' অর্থ তাদের উপর, তাদের আবাসস্থলে, তাদের বিরুদ্ধে। 'আল'ফিত্নাতা' অর্থ বিদ্রোহ, অমুসলমান ও মুসলমানের মধ্যে যুদ্ধ। 'লাআতাওহা' অর্থ যোগ দিতো বিদ্রোহীদের দলে। আর 'ওয়ামা তালাব্বাছু বিহা ইল্লা ইয়াসীরা' অর্থ তারা এতে কালবিলম্ব করতো না। অর্থাৎ তারা তখন আর গৃহে অবস্থান করতো না। কালবিলম্ব না করে 'লাব্বাইক' 'লাব্বাইক' বলতে বলতে মিশে যেতো বিদ্রোহীদের দলে। অধিকাংশ তাফসীরবেত্তা কথাটির অর্থ করেছেন এভাবেই। কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন, এখানে 'বিহা' (এতে, সেখানে) বলে বুঝানো হয়েছে মদীনাকে। অর্থাৎ তারা তখন খুব কম সংখ্যকই অবস্থান করতে পারতো মদীনায়। তাদেরকে করা হতো দেশান্তর, অথবা উড়িয়ে দেওয়া হতো তাদের গর্দান।

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'এরা তো পূর্বেই আল্লাহ্‌র সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিলো যে, এরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না'।

ইয়াজিদ ইবনে রুম্‌মান বলেছেন, উহুদ যুদ্ধের দিন বনী হারেছা সংকল্প করেছিলো, তারা বনী সালমাকে সংহার করবেই। কিন্তু তাদের সম্পর্কে যখন আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন তারা প্রদর্শন করে সংযম। বলে, আর কখনো আমরা এরকম বলবো না।

কাতাদা বলেছেন, বদর যুদ্ধে কিছুসংখ্যক লোক অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী হয়নি। যুদ্ধশেষে বিজয়ী যোদ্ধাদের মর্যাদা দেখে তারা অভিভূত হয়ে পড়ে। সংকল্প করে, এরকম সুযোগ যদি আমরা আবার পাই, তবে জান-প্রাণ দিয়ে লড়বো। তাদের কথাই বলা হয়েছে আলোচ্য বাক্যে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবে'। একথার অর্থ— কৃত অঙ্গীকার তারা পূর্ণ করেছিলো কিনা, সে সম্পর্কে পরকালে আল্লাহ্ তাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। আর শাস্তি দিবেন অঙ্গীকারভঙ্গের।

এর পরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'বলো, তোমাদের কোনো লাভ হবে না যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন করো'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি আপনার অনুচরবর্গকে জানিয়ে দিন, মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে কোনো লাভ নেই। কারণ প্রত্যেকের মৃত্যুক্ষণ সুনির্ধারিত। যথাসময়ে সে মৃত্যু এসে পড়বেই— স্বাভাবিক নিয়মে, অথবা যুদ্ধাহত অবস্থায়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবে সেই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেওয়া হবে'। একথার অর্থ— পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী। এখানকার সম্ভোগ্য উপকরণ অত্যধিক হলেও তা অত্যল্প। সুতরাং পৃথিবীতে দীর্ঘ জীবন পেলেও জানতে হবে, এখানকার ভোগ-সম্ভোগ সামান্যই। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— মনে করো যুদ্ধ থেকে পালিয়ে তোমরা প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হলে। জীবনযাপন ও শুরু করলে নিশ্চিন্তে। কিন্তু তারপর? তোমাদের ওই নিরুপদ্রব জীবন কি একসময় ফুরিয়ে যাবে না? মৃত্যু কি তোমাদেরকে গ্রাস করবে না?

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'বলো, কে তোমাদেরকে আল্লাহ্ থেকে রক্ষা করবে, যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গলের ইচ্ছা করেন, অথবা তিনি যদি তোমাদেরকে অনুগ্রহ করতে ইচ্ছা করেন, তবে কে তোমাদেরকে ক্ষতি করবে'?

এখানে 'সূআন' অর্থ অমঙ্গল, শাস্তি। 'আও আরদা বিকুম রহমাহ্' অর্থ যদি তোমাদেরকে অনুগ্রহ করতে ইচ্ছা করেন। এর সঙ্গে উহ্য রয়েছে এখানকার 'তবে

কে তোমাদের ক্ষতি করবে’ কথাটি। আরববাসীগণ বলেন ‘সাইফান ওয়া রুমছা’ (গলবন্ধ করে নিয়ে এসো তরবারী ও তীর)। সুতরাং বুঝতে হবে এখানকার ‘রক্ষা করবে’ কথাটির মধ্যে পরিত্রাণ বা নিষ্কৃতির ইঙ্গিত।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তারা আল্লাহ্ ব্যতীত নিজেদের কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না’। এখানে ‘ওলী’ অর্থ অভিভাবক, শুভানুধ্যায়ী, সুহৃদ, নিকটজন। আর ‘নাসীরা’ অর্থ সাহায্যকারী, অমঙ্গল বিদূরণকারী।

সূরা আহযাব ঃ আয়াত ১৮, ১৯, ২০

قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَ الْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ۚ وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ﴿۱۸﴾ اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚۖ فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ۗ اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ ۗ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿۱۹﴾ يَحْسَبُوْنَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا ۚ وَاِنْ يَّاْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِي الْاَعْرَابِ يَسْاَلُوْنَ عَنْ اَنْۢبَآئِكُمْ ۗ وَلَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ مَّا قٰتَلُوْٓا اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۲۰﴾

r আল্লাহ্ অবশ্যই জানেন তোমাদের মধ্যে কাহারা বাধাদানকারী এবং কাহারা তাহাদের ভ্রাতৃবর্গকে বলে, ‘আমাদের সঙ্গে আইস।’ উহারা অল্পই যুদ্ধে অংশ নেয়—

r তোমাদের ব্যাপারে কৃপণতাবশত আর যখন ভীতি আসে তখন তুমি দেখিবে, মৃত্যুভয়ে মুর্চ্ছাতুর ব্যক্তির মত চক্ষু উল্টাইয়া উহারা তোমার দিকে তাকায়। কিন্তু যখন ভয় চলিয়া যায় তখন উহারা ধনের লালসায় তোমাদিগকে তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করে। উহারা ঈমান আনে নাই, এইজন্য আল্লাহ্ উহাদের কার্যাবলী নিষ্ফল করিয়াছেন এবং আল্লাহ্র পক্ষে ইহা সহজ।

r উহারা মনে করে, সম্মিলিত বাহিনী চলিয়া যায় নাই। যদি সম্মিলিত বাহিনী আবার আসিয়া পড়ে, তখন উহারা কামনা করিবে যে, ভাল হইত যদি উহারা যাযাবর মরুবাসীদের সহিত থাকিয়া তোমাদের সংবাদ লইত! উহারা তোমাদের সংগে অবস্থান করিলেও উহারা যুদ্ধ অল্পই করিত।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ অবশ্যই জানেন তোমাদের মধ্যে কে বাধাপ্রদানকারী এবং কারা তাদের ভ্রাতৃবর্গকে বলে, আমাদের সঙ্গে এসো।

এখনে 'ভ্রাতৃবর্গকে বলে' অর্থ বলে মদীনার অধিবাসীবৃন্দকে। অর্থাৎ মুনাফিকেরা মদীনার অধিবাসীবৃন্দকে বলে, তোমরা আমাদের দলে ভিড়ে যাও। পরিত্যাগ করো মোহাম্মদের দল। নতুবা আমাদের আশংকা হয় তোমরা বেঘোরে প্রাণ হারাবে। 'আওক্ব' অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া। আর 'আয়িক্ব' অর্থ বাধাদানকারী। কাতাদা বলেছেন, মদীনার কপটবিশ্বাসীরাই রসুল স. এর সাহচর্য গ্রহণে অন্য মুসলমানদেরকে বাধা দান করতো। বলতো, মোহাম্মদ ও তার সঙ্গী-সাথীরা হচ্ছে গোশতের টুকরা, ওরাই আবু সুফিয়ান ও তার দলের লোকদের মুখের গ্রাস।

মুকাতিল বলেছেন, ইহুদীরা মদীনার কপটবিশ্বাসীদেরকে রসুল স. এর সংসর্গ ত্যাগ করতে উৎসাহিত করতো। বলতো, আবু সুফিয়ান ও তার বাহিনীর হাতে তোমরা নিজেদেরকে নিহত করতে চাও কেনো? সে একবার সুযোগ পেলে তোমাদের কাউকেই আস্ত রাখবে না। তোমরা আমাদের প্রতিবেশী। তাই তো তোমাদের অমঙ্গলাশংকায় আমাদের মন কাঁদে। সুতরাং বাঁচতে যদি চাও, তবে ভালোয় ভালোয় ভিড়ে যাও আমাদের সঙ্গে। ইহুদীদের এমতো প্রস্তাব খুব মনোপুত হলো কপটপ্রধান আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের। সে তার একান্ত অনুচরদেরকে নিয়ে বিভিন্ন কৌশলে সৃষ্টি করতে লাগলো বাধা। আবু সুফিয়ানের ভয় দেখিয়ে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করতে চাইলো মুসলমানদেরকে। বলতে শুরু করলো, মোহাম্মদের সঙ্গে তোমরা আর থাকবে কোন্ ভরসায়? সে তো তোমাদেরকে আবু সুফিয়ানের বাহিনীর হাতে নিহত করেই ছাড়বে। দেখেছো, অসংখ্য সৈন্য নিয়ে আবু সুফিয়ান আক্রমণোদ্যত। ভেবেছো তার হাত থেকে নিস্তার পাবে। সেতো তোমাদের কাউকেই ছাড়বে না। সুতরাং ভালো চাও তো আমাদের সঙ্গে এসো। চলো, সকলে যোগ দেই ইহুদীদের দলে। উল্লেখ্য, রসুল স. এর প্রিয়ভাজন সাহাবীগণ আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ও তার দলের লোকদের এরকম প্রস্তাবের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেননি। কারণ তাঁরা যে ছিলেন রসুল অন্তঃপ্রাণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা অল্পই যুদ্ধে অংশ নেয়'। একথার অর্থ— কপটচারীরা বাইরে বিশ্বাসী এবং অন্তরে অবিশ্বাসী। তাই জেহাদে অংশগ্রহণের কথা শুনলে বিভিন্ন অজুহাত তুলে যুদ্ধযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পেছন

থেকে করে বাগাড়ম্বর। জাগতিক স্বার্থসিদ্ধির আশায় প্রদর্শন করে কেবল বাহ্যিক আনুগত্য। আর তাদের এমতো প্রতারণার পক্ষে দাঁড় করায় বিভিন্ন রকমের অজুহাত। কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, মুনাফিকদের সম্পর্কে চূড়ান্ত মন্তব্য প্রকাশ পেয়েছে আলোচ্য বাক্যে। এখানে বলা হয়েছে তাদের যুদ্ধকালীন টালবাহানার কথা। তাদের ধারণা, এভাবে বিভিন্ন টালবাহানার মাধ্যমে যুদ্ধযাত্রা থেকে পৃথক হয়ে পড়লে রসুল স. ও তাঁর সহচরগণ হতোদ্যম হয়ে পড়বে। ফলে তারা শত্রুকে প্রতিহত করার সাহস ফেলবে হারিয়ে।

পরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'তোমাদের ব্যাপারে কৃপণতাবশত'। একথার অর্থ— হে বিশ্বাসীগণ। কপটাচারীরা কস্মিনকালেও তোমাদের কল্যাণকামী নয়। তাইতো তারা তোমাদের সহযোদ্ধা হওয়ার ব্যাপারে প্রকাশ করে এতো কার্পণ্যতা। তারা একেবারেই চায়না যে, তোমরা বিজয়ী হও এবং অধিকারী হও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের। এখানকার 'আশিহ্হাতুন' শব্দটি 'শাহিহুন' এর বহুবচন। এর অর্থ কৃপণ, লোভী।

এরপর বলা হয়েছে— 'আর যখন ভীতি আসে, তখন তুমি দেখবে, মৃত্যুভয়ে মূর্ছাতুর ব্যক্তির মতো চোখ উল্টিয়ে তারা তোমার দিকে তাকায়'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! যুদ্ধভীতির সম্মুখীন হলে আপনি কপটাচারীদেরকে চিনতে পারবেন সহজেই। দেখবেন, তখন তারা মৃত্যুর আশংকায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য ব্যক্তির মতো আপনার দিকে তাকিয়ে আছে ফ্যাল ফ্যাল করে।

এখানে 'তাদূরু আ'ইয়ুনুহুম' অর্থ মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে তোমার দিকে তাকায় অস্থির দৃষ্টিতে। মনে হয় ভয়ে তাদের চোখের তারা দু'টো যেনো অস্থির হয়ে ঘুরছে। আর 'মৃত্যুভয়ে মূর্ছাতুর ব্যক্তির মতো' হচ্ছে এখানে একটি উপযুক্ত উপমা। মুনাফিকদের যুদ্ধভীতি তাদের চোখে মুখে প্রকাশ পায় এভাবেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু যখন ভয় চলে যায়, তখন তারা ধনের লালসায় তোমাদেরকে তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করে'। এখানে তোমাদেরকে তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করে' অর্থ— হে বিশ্বাসীবৃন্দ! যখন তোমরা যুদ্ধে জয়লাভ করো, তখন বাকচাতুরীতে তারা তোমাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায়। তোমাদের নামে বের করে বিভিন্ন দুর্নাম। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানকার 'সালাকূকুম' অর্থ, তারা তোমাদেরকে জর্জরিত করে বাক্যবানে। কাতাদা বলেছেন, কথাটির অর্থ— যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনকালে তারা সমালোচনা করে তীর্যক ভাষায়। যেমন বলে— যুদ্ধলব্ধ সম্পদে তোমাদের অধিকার আমাদের চেয়ে অধিক নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা ইমান আনেনি, এজন্য আল্লাহ্ তাদের কার্যাবলী নিষ্ফল করেছেন। একথার অর্থ— তারা কপট, বাহ্যত বিশ্বাসী হলেও অন্তরে

অবিশ্বাসী। সুতরাং তাদেরকে ইমানদার বলে গণ্য করা যায় না। আর তাদের উদ্দেশ্যও অসাধু। আল্লাহ্পাক তাই তাদের কর্মকাণ্ডকে করে দিয়েছেন নিষ্ফল। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য সম্বলিত কর্ম ছাড়া অন্য সকল কর্ম এভাবে নিষ্ফলতাতেই পর্যবসিত হয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্র পক্ষে এটা সহজ'। একথার অর্থ— আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায় যেহেতু কোনো ব্যক্তি বা বস্তুনির্ভর নয়, বরং অভিপ্রায় প্রয়োগের ব্যাপারে যেহেতু তিনি চিরপবিত্র, চিরঅমুখাপেক্ষী ও চিরস্বাধীন, সেহেতু সকল প্রকার নির্ধারণই তাঁর পক্ষে সম্ভব ও সহজ। সুতরাং বুঝতে হবে মানুষের সাফল্য ও বৈফল্য সম্পূর্ণতই তাঁর অভিপ্রায় নির্ভর। আর এটাও তাঁর চিরন্তন অভিপ্রায় যে কপটাচারীদের অসাধু উদ্দেশ্যসম্বলিত কর্মকাণ্ডকে তিনি নিষ্ফল করবেনই।

এরপরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'তারা মনে করে সম্মিলিত বাহিনী চলে যায়নি'। একথার অর্থ— মুনাফিকেরা তখন পর্যন্ত মনে করেছিলো, আবু সুফিয়ান ও তার সম্মিলিত বাহিনী এখনো স্থান ত্যাগ করেনি। তাই তারা বসেছিলো মদীনার অভ্যন্তরেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'যদি সম্মিলিত বাহিনী আবার এসে পড়ে তখন তারা কামনা করবে যে, ভালো হতো যদি তারা যাযাবর মরুবাসীদের সঙ্গে থেকে তোমাদের সংবাদ নিতো'। একথার অর্থ— তারা মনে মনে ভাবে, যদি আবু সুফিয়ানের বাহিনী মদীনায় ঢুকেই পড়ে, তবে তারা পালিয়ে যাবে দূরের মরু অঞ্চলে। সেখানকার যাযাবরদের সঙ্গে মিশে গিয়ে গোপন করবে নিজেদের পরিচয়। আর সেখান থেকেই খবরাখবর রাখবে কী হলো আল্লাহ্র রসুল ও তাঁর সহচরবৃন্দের।

শেষে বলা হয়েছে— 'তারা তোমাদের সঙ্গে অবস্থান করলেও তারা যুদ্ধ অল্পই করতো'। একথার অর্থ— লৌকিকতা বা চক্ষুলজ্জার খাতিরে যদি তারা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হতো, তবে সারাক্ষণ বেঁচে থাকতে চেষ্টা করতো প্রতিপক্ষীয়দের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ থেকে। অস্ত্রধারণ করলেও করতো কখনো কখনো, অতি অল্প সময়ের জন্য।

সূরা আহ্যাব ঃ আয়াত ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ﴿٢١﴾ وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ

الْاَحْزَابَ ۙ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَ صَدَقَ اللّٰهُ وَ
رَسُوْلُهٗ ۫ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّآ اِيْمَانًا وَّ تَسْلِيْمًا ﴿٢٢﴾ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَ
مِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾ لِّيَجْزِىَ اللّٰهُ
الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَ يُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ اَوْ يَتُوْبَ
عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٢٤﴾ وَ رَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ؕ وَ كَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ
الْقِتَالَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ﴿٢٥﴾ وَ اَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ
مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَ قَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ
فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ﴿٢٦﴾

r তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে, তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্র মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ।

r মু'মিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখিল, উহারা বলিয়া উঠিল, 'ইহা তো তাহাই, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল যাহার প্রতিশ্রুতি আমাদিগকে দিয়াছিলেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল সত্যই বলিয়াছিলেন।' আর ইহাতে তাহাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পাইল।

r মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্র সহিত তাহাদের কৃত অংগীকার পূর্ণ করিয়াছে, উহাদের কেহ কেহ শাহাদাত বরণ করিয়াছে এবং কেহ কেহ প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। উহারা তাহাদের অংগীকারে কোন পরিবর্তন করে নাই;

r কারণ আল্লাহ্ সত্যবাদীদিগকে পুরস্কৃত করেন তাহাদের সত্যবাদিতার জন্য এবং তাঁহার ইচ্ছা হইলে মুনাফিকদিগকে শাস্তি দেন অথবা উহাদিগকে ক্ষমা করেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

r আল্লাহ্ কাফিরদিগকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরাইয়া দিলেন, তাহারা কোন কল্যাণ লাভ করে নাই। যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট; আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী।

r কিতাবীদের মধ্যে যাহারা উহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি তাহাদের দুর্গ হইতে অবতরণ করাইলেন এবং তাহাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করিলেন; এখন তোমরা উহাদের কতককে হত্যা করিতেছ এবং কতককে করিতেছ বন্দী।

'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখেরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে' অর্থ যারা আকাংখী হয় আল্লাহ্র নিকট থেকে পুণ্যের, পুণ্যময় দীদারের, অর্থাৎ পারলৌকিক সফলতার। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে আল্লাহ্ ও আখেরাতকে ভয় করার অর্থ আল্লাহ্র অনুগ্রহের আশা ও শাস্তির ভয় করা, বিশেষ করে আশা করা পরকালের পুরস্কারের এবং ভয় করা তিরস্কারের। যেমন আরবীভাষীরা বলেন 'আরজু যায়দান ওয়া ফাদ্বলাহু' (আমি জায়েদের করুণাকামী)। মুকাতিল বলেছেন, এখানে কথাটির অর্থ— যারা শংকিত থাকে আল্লাহ্ ও মহাবিচারদিবসের ভয়ে। আর 'আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে' অর্থ আল্লাহ্কে স্মরণ করে সুখে-দুঃখে সব সময়। উল্লেখ্য, অধিক স্মরণই হয় অব্যাহত আনুগত্যের কারণ। সেজন্যই এখানে আল্লাহ্কে ভয় করার সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়েছে তাঁকে অধিক স্মরণের কথা। অর্থাৎ যারা আল্লাহ্কে ভয় করে এবং তাঁকে অধিক স্মরণ করে, তারাই হয় তাঁর রসুলের একান্ত অনুগামী।

তোমাদের জন্য রসুলুল্লাহ্র মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ' অর্থ রসুল স. এর জীবনে এমন অনেক মহান আদর্শ রয়েছে, যা তোমাদের জন্য অবশ্য অনুসরণীয়। যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে অকুতোভয় অবস্থান গ্রহণ, যে কোনো বিপদাপদের সাথে ধৈর্যময় ও সহিষ্ণুতাশোভিত মোকাবিলা। অথবা কথাটির অর্থ— রসুল স. তোমাদের অগ্রণী। সুতরাং তাঁর অনুগমন তোমাদের জন্য অত্যাবশ্যক। আরবীভাষার রীতি অনুসারে এরকম অর্থ গ্রহণই সুসঙ্গত। যেমন 'ফীল বাইদ্বতে ইশরূনা মুন্না হাদীদ' অর্থ শিরত্রাণে কুড়িসের লোহা আছে। শব্দটি তাই 'ফুলাতুন' রূপে উস্ওয়াতুন' এবং ইফতিয়াল শব্দগঠন প্রক্রিয়ায় সাধিত। যেমন 'ইক্বতিদা' থেকে গঠিত হয়েছে 'কুদওয়াতুন'। শব্দটি ধাতুমূলের স্থলে নামপদ। সুতরাং এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— রসুলের অনুরাগী হওয়া তোমাদের জন্য অপরিহার্য। তিনি যেমন সত্যধর্ম প্রচার-প্রসারের দায়িত্বে আসক্তা নিবেদিত, তেমনি নিবেদিতপ্রাণ হওয়া উচিত তোমাদেরও। উহুদ যুদ্ধে উৎপাটিত হয়েছে তাঁর পবিত্র দন্ত, রক্তরঞ্জিত হয়েছে পবিত্র শরীর, আবার ওই যুদ্ধে তিনি হারিয়েছেন তাঁর প্রিয় পিতৃব্য হামযাকে। তৎসত্ত্বেও তো তিনি তাঁর মূল লক্ষ্যে অবিচল। সুতরাং তোমরাও অনড় ও অবিচল থাকো সত্যের পথে। তাঁর মতোনই পর্বতপ্রমাণ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার মাধ্যমে অতিক্রম করো বাধা-প্রতিবন্ধকতার সকল চড়াই-উৎরাই।

পরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'মুমিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখলো, তারা বলে উঠলো, এটাতো তা-ই, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল যার প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল সত্যই বলেছিলেন'।

এখানে প্রতিশ্রুতি অর্থ, ওই অঙ্গীকার যার কথা ঘোষিত হয়েছে সুরা বাকারায় এভাবে— তোমরা কি ধারণা কর, জান্নাতে প্রবেশ করবে এমনি এমনি......মনে রেখো, আল্লাহ্র সাহায্য অতি নিকটে'। এই আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— বিশ্বাসীগণকে পরীক্ষা করা হবে কঠোরভাবে, তাদেরকে চরম বিপদে পতিত করে যাচাই করা হবে তারা জান্নাতলাভের উপযোগী ইমানদার কিনা। উল্লেখ্য, পরিখার যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে সাহাবীগণের সে কথাই মনে পড়ে গিয়েছিলো। আলোচ্য আয়াতে উদ্ধৃত উক্তিটি তাঁরা করেছিলেন সে কারণেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'আর এতে তাদের ইমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেলো'। এখানে 'ইমান' (বিশ্বাস) অর্থ রসুল স. এর উক্তির উপরে অটল আস্থা। আর 'তাসলীম' (আনুগত্য) অর্থ আল্লাহ্তায়ালার সাধারণ বিধান ও নিয়তির বিধানকে সর্বান্তঃকরণে মেনে নেয়া। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায়ের প্রতি পূর্ণ সমর্পিত হওয়া।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্র সঙ্গে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে'। একথার অর্থ— সাহাবীগণ রসুল স. এর সঙ্গে প্রতিটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন বলে যে অঙ্গীকার করেছিলেন, সে অঙ্গীকার তারা যথারীতি পূর্ণ করেছেন। এখানে 'সদাক্ব' অর্থ অঙ্গীকারকারীরা তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের কেউ কেউ শাহাদত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অঙ্গীকারে কোনো পরিবর্তন করেনি'। একথার অর্থ— তাদের মধ্যে কেউ কেউ কৃত অঙ্গীকার পূরণ করতে গিয়ে আল্লাহ্র পথে জীবন দিয়েছে, কেউ কেউ অপেক্ষায় রয়েছে অঙ্গীকার পূরণের। এভাবে তারা তাদের কৃত অঙ্গীকারের প্রতি প্রদর্শন করে চলেছে যথাযথ সম্মান।

এখানকার, 'নহব' শব্দটির অর্থ 'মানত' এবং 'মৃত্যু' দু'টোই হয়। যদি শব্দটির অর্থ 'মৃত্যু' ধরা হয় তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তাদের মধ্যে কেউ কেউ অঙ্গীকার পূরণ করতে গিয়ে সম্মুখীন হয়েছে মৃত্যুর। যেমন হজরত হামযা। কিন্তু কোনো কোনো আলেম কথাটির অর্থ করেছেন— তারা প্রতিশ্রুতি পূরণের ক্ষেত্রে করেছে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। আরববাসীরা বলেন 'নাহিবু ফুলানুন ফী মাইসিরাতি ইয়াওমিহী ওয়া লাইলাতিহী' (সে চলার পথে দিন-রাত দু'টোকেই কাজে লাগিয়েছে)।

বোখারী, মুসলিম, তিরমিজি, ইবনে আবী শায়বারা, আবু দাউদ, ইবনে সা'দ এবং বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস ইবনে মালেক বলেছেন, আমার পিতৃব্য আনাস ইবনে নজর বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি বলে তীব্র মনোকষ্টে কালাতিপাত করতেন। তিনি পণ করলেন, আর কোনো যুদ্ধেই তিনি অনুপস্থিত থাকবেন না। এক সময় এসে পড়লো উহুদ যুদ্ধের ডাক। তিনি বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন যুদ্ধে। প্রথম দিকে পর্যুদস্ত হলো মুসলিম বাহিনী। রসুল স. এর পবিত্র বদন হলো রক্তরঞ্জিত। সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো, রসুল স. শহীদ হয়েছেন। একথা শোনার সাথে সাথে অনেকে অসি সম্বরণ করে বিমর্ষচিত্তে পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে রইলেন। আমার পিতৃব্য আনাস বললেন, হে আমার আল্লাহ! আমার সঙ্গীসাথীদের এমতো নির্বিকার অবস্থাকে আমি তোমার দরবারে পেশ করছি অজুহাত হিসেবে। একথাও নিবেদন করছি যে, অংশীবাদীরা যা করেছে তার প্রতি আমি ভয়ানক অতুষ্ট। এরপর তিনি মর্মাহত মুসলিম সৈন্যদের কাছে যেয়ে বললেন, কী ভাবছো তোমরা? তাঁরা বললেন, আমাদের প্রিয়তম নবী যখন শাহাদত বরণ করেছেন, তখন কী আর করতে পারি আমরা? তিনি বললেন, তাই যদি হয় তবে আমাদের আর বেঁচে থেকেই বা কী লাভ? যে ধর্মাদর্শের জন্য আমাদের প্রিয়তম নবী প্রাণোৎসর্গ করেছেন, সেই পবিত্র ধর্মাদর্শের জন্য জীবনদান করাই তো আমাদের একমাত্র কর্ম। চলো। অগ্রসর হও। তাঁর এ কথায় সম্বিত ফিরে পেলেন সকলে। উন্মুক্ত অসি হাতে ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে গেলেন শত্রুদের দিকে। হজরত সা'দ ইবনে মুয়াজও ছিলেন তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেছেন, আনাস ইবনে নজর তখন চরম উল্লসিত হয়ে বললো, হাঃ হাঃ আবু আমর! আমি ঘ্রাণ পাচ্ছি জান্নাতের। উহুদের রণপ্রান্তর এখন জান্নাতের সুরভিতে ভরপুর। একথা বলেই তিনি মত্ত শার্দুলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন দুশমনদের উপর। হজরত আনাস বলেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার প্রিয় পিতৃব্য পান করলেন শাহাদতের পেয়ালা। তাঁর শরীরে ছিলো তখন দুশমনদের তীর ও তলোয়ারের আশিটি আঘাত। তারা তাঁর নাক কান ইত্যাদি কেটে নিয়েছিলো বলে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে সনাক্ত করাও সম্ভব হয়নি। শেষে তাঁকে সনাক্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন তাঁর ভগ্নি বিশামা। আর আমাদের বদ্ধমূল ধারণাও হয়েছিলো এই যে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো আমার শহীদ পিতৃব্য এবং তাঁর মতো অন্যান্য শহীদগণকে লক্ষ্য করে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত খাব্বাব ইবনে আরত বলেছেন, রসুল স. এর সঙ্গে আমরা যারা হিজরত করেছিলাম, তাদের মধ্যে কেউ কেউ অল্পদিনের মধ্যে এ ধরাধাম ছেড়ে চলে যান। তাদের ত্যাগ তিতিক্ষার কোনো বিনিময়ই তাঁরা এ পৃথিবীতে পাননি। তাঁদের একজনের নাম মাসআব ইবনে উমায়ের। উহুদ যুদ্ধে

শহীদ হয়েছিলেন তিনি। ওই সময় তাঁর পরনে ছিলো একটি হ্রস্ব কম্বল। দাফনের সময় ওই কম্বলটি দ্বারা তাঁর শরীরকে পুরোপুরি আবৃত্ত করাও সম্ভব হয়নি। মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে পড়তো। আবার পা ঢেকে দিলে উন্মোচিত হয়ে পড়তো মস্তক। এ অবস্থা দেখে তখন রসুল স. বললেন, মাথার দিকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও আর পা ঢেকে দাও ইজখর ঘাস দিয়ে। আবার আমাদের হিজরতকারীদের অনেকেই পেয়েছিলেন দীর্ঘ হায়াত। তাঁরা যেমন উপভোগ করতে পেরেছিলেন দুনিয়ার নেয়ামত, তেমনি অধিকতর সমৃদ্ধ করতে পেরেছিলেন তাঁদের আখেরাতকেও।

তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, রসুল স. একবার হজরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্কে দেখিয়ে বললেন, কেউ যদি পৃথিবীতে চলমান কোনো জান্নাতবাসীকে দেখে পরিতৃপ্ত হতে চায়, সে যেনো দেখে একে। তালহা তো পূর্ণ করেছে তার পৃথিবীর আয়ুষ্কাল।

হজরত ঈসা ইবনে তালহা বর্ণনা করেছেন, একবার আমি ও আমার বোন উপস্থিত হলাম জননী আয়েশা সকাশে। জননী আয়েশার বড় বোন হজরত আসমাও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। তাঁদের তিনজনের মধ্যে শুরু হলো বাদানুবাদ। হজরত আসমা আমার বোনকে বললেন, আমার পিতা তোমার পিতার চেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। আমার বোন তাঁর কথা মানতে চাইলো না। শুরু করলো বিতর্ক। জননী আয়েশা তাঁদের দু'জনকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, এ ব্যাপারে আমি যদি সিদ্ধান্ত প্রদান করি তবে কি তা উত্তম হয় না? তাঁরা দু'জনে বললেন, অবশ্যই। জননী বললেন, একবার রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হলেন আমার পিতা আবু বকর। রসুল স. তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি আতীকুল্ল (নরকমুক্ত)। কিছুক্ষণ পর সেখানে উপস্থিত হলেন তালহা। রসুল স. তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, তালহা! যারা মানতপূরণ করেছে এবং পূরণ করেছে তাদের পৃথিবীর জীবন, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত।

তিরমিজির বর্ণনা এসেছে, হজরত মুয়াবিয়া বলেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, যারা তাদের পৃথিবীর আয়ুষ্কাল পূর্ণ করেছে, তালহা তাদের মধ্যে গণ্য।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত কায়েস ইবনে হাযেম বলেছেন, আমি দেখেছি, তালহার একটি হাত ছিলো পক্ষাঘাতগ্রস্ত। ওই হাত দিয়েই তিনি রসুল স.কে উহুদ যুদ্ধের সময় শত্রুর আক্রমণ থেকে হেফাজত করেছিলেন। শত্রুরা তার ওই হাতের উপরেই হেনেছিলো আঘাত। শত্রুর তীর ও তলোয়ারের আঘাতে চরমভাবে জখম হওয়া তাঁর ওই হাত পরবর্তী সময়ে হয়েছিলো পক্ষাঘাতের শিকার। সম্বলিতসূত্রে হজরত যোবায়েরের মাধ্যমেও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন তিরমিজি, ইবনে হাব্বান, হাকেম প্রমুখ।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'কারণ আল্লাহ্ সত্যবাদীদেরকে পুরস্কৃত করেন তাদের সত্যবাদীতার জন্য'। এখানে 'সত্যবাদীতার জন্য' অর্থ প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য, প্রতিশ্রুতি পূরণের বিনিময়ে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাঁর ইচ্ছা হলে মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন অথবা তাদেরকে ক্ষমা করেন'। একথার অর্থ— এবং আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায়ানুসারে তাদেরকে কপটাচারী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করতে হয়, অথবা ইচ্ছে করলে আল্লাহ্ তাদেরকে দান করেন বিশুদ্ধ তওবার সুযোগ, ফলে তারা মৃত্যুবরণ করতে পারে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে, ইমান নিয়ে।

এরপর বলা হয়েছে—'আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— তওবাকারীর প্রতি আল্লাহ্ ক্ষমাপরবশ এবং পরম দয়ার্দ্র।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ কাফেরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন, তারা কোনো কল্যাণ লাভ করেনি'। একথার অর্থ— গোটা আরবের অংশীবাদীরা সংঘবদ্ধ আক্রমণ করেও আল্লাহ্র রসুল ও তাঁর সহচরবৃন্দের কোনো ক্ষতি করতে পারলো না। আল্লাহ্ তাদের উপর চাপিয়ে দিলেন পরাজয়ের দ্বিগুণ গ্লানি। ফলে তারা আপনাপন জনপদে ফিরে যেতে বাধ্য হলো বুক ভরা ক্ষোভ ও আক্রোশ নিয়ে এবং কল্যাণবিবর্জিত অবস্থায়। না পেলো জয়ের আনন্দ, না লাভ করতে পারলো যুদ্ধলব্ধ সম্পদ।

এরপর বলা হয়েছে— 'যুদ্ধে মুমিনদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট'। একথার অর্থ— পরিখার এই চরম সংকটময় যুদ্ধে বিশ্বাসীদেরকে যথেষ্ট সাহায্য করলেন আল্লাহ্তায়ালা। তাই তো তারা পেলো নিরঙ্কুশ বিজয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী'। একথার অর্থ— আল্লাহ্পাক সর্বশক্তিমান বলেই প্রচণ্ড তুফানের মাধ্যমে তছনছ করে দিলেন অংশীবাদীদের বিশাল সমরায়োজন। আর মহাপ্রতাপশালী বলেই শায়েস্তা করলেন, ইসলামের শত্রুদেরকে। এভাবেই অবাধ্যদের উপরে কার্যকর হলো তাঁর রোষ ও প্রতিশোধ।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'কিতাবীদের মধ্যে যারা তাদেরকে সাহায্য করেছিলো, তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ থেকে অবতরণ করালেন'। একথার অর্থ— মদীনাবাসী হওয়া সত্ত্বেও ইহুদী বনী কুরায়জারা মিত্রশক্তি হিসেবে সাহায্য করেছিলো কুরায়েশ, গাতফান ও অন্যান্য আরবীয় অংশীবাদীর দলকে, সেই অপরাধে আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে বের করে দিলেন তাদের সুদৃঢ় দুর্গ থেকে।

এখানকার 'সীয়াসীউন' শব্দটি 'সীসাতুন' এর বহুবচন। এর অর্থ দুর্গ, নিরাপদ আশ্রয়, আত্মরক্ষার উপলক্ষ। উল্লেখ্য, আত্মরক্ষার উপলক্ষ বলেই কেউ কেউ হরিণের শিঙ, মোরগের নখর এবং তন্তুকরদের তাঁতের হাতিয়ারকে বলে 'সীসা'।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করলেন, এখন তোমরা তাদের কতককে হত্যা করেছো এবং কতককে করেছো বন্দী'। একথার অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালা বনী কুরায়জার অন্তরে সৃষ্টি করলেন মুসলমানদের শৌর্যবীর্যের ভীতি। ফলে তারা বাধ্য হলো মুসলমানদের কাছে অস্ত্রসমর্পণ করতে। মুসলমানেরাও তখন সহজে তাদের পুরুষদের উপরে কার্যকর করতে পারলো মৃত্যুদণ্ড এবং নারী ও শিশুদেরকে করতে পারলো বন্দী।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনানুসারে বনী কুরায়জার পুরুষের সংখ্যা ছিলো ছয়শত। হজরত সা'দ ইবনে মুয়াজের ভাষ্যানুযায়ী আবু আমরও এমতো অভিমতের প্রবক্তা। অপরিণতসূত্রে কাতাদা থেকে ইবনে আয়েজ বর্ণনা করেছেন, তাদের সংখ্যা ছিলো সাতশত। সুহাইল বলেছেন অনধিক আটশত। যথাসূত্রসহযোগে হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তাদের যুদ্ধক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা ছিলো চারশত। ইবনে ইসহাক লিখেছেন, এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের সংখ্যা ছিলো নয়শত। উল্লেখিত বর্ণনাবৈষম্যের সামঞ্জস্য সাধনার্থে বলা যেতে পারে যে, তাদের যুদ্ধক্ষম পুরুষের সংখ্যা চারশতই ছিলো, অবশিষ্টরা ছিলো তাদের সহযোগী। আর তাদের নারী ও শিশুর সংখ্যা ছিলো নয়শত। 'সাবীলুর রাশাদ' গ্রন্থে বলা হয়েছে, একহাজার।

সূরা আহযাব ঃ আয়াত ২৭

وَ اَوۡرَثَکُمۡ اَرۡضَهُمۡ وَ دِیَارَهُمۡ وَ اَمۡوَالَهُمۡ وَ اَرۡضًا لَّمۡ تَطَـُٔوۡهَا ؕ وَ کَانَ اللّٰهُ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرًا ﴿۲۷﴾

r আর তিনি তোমাদিগকে অধিকারী করিলেন উহাদের ভূমি, ঘরবাড়ী ও ধনসম্পদের এবং এমন ভূমি যাহাতে তোমরা এখনও পদার্পণ কর নাই। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্‌পাক বিনা যুদ্ধে মুসলমানদেরকে মালিক করে দিলেন বনী কুরায়জার জমি-জমা, বসতবাটি ও চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ারের। এর সঙ্গে দিলেন আরো অনেক ভূখণ্ডের অধিকার, যা কর্তৃত্বাগত হবে পরবর্তী সময়ে। আর এরকম বিজয় প্রদান আল্লাহ্‌র জন্য অতি সহজ। কারণ তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিধর।

মুকাতিল ও ইবনে জায়েদ বলেছেন, এখানে 'এমন ভূমির যাতে তোমরা এখনো পদার্পণ করোনি' বলে বুঝানো হয়েছে খায়বরকে। কাতাদা বলেছেন, মক্কা নগরীকে। হাসান বলেছেন, পারস্য ও সিরিয়াকে। ইকরামার অভিমত হচ্ছে, কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে ওই সকল অমুসলিম জনপদের কথা, যেগুলো বিজিত হবে পরবর্তী সময়ে।

বনী কুরায়জাদের পরিণাম মোহাম্মদ ইবনে ওমর তাঁর শায়েখ (শিক্ষক) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, পৌত্তলিকদের সম্মিলিত বাহিনী পরিখার যুদ্ধের অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে চলে যাবার পর ভীষণভাবে ভীত হয়ে পড়েছিলো বনী কুরায়জারা। ইমাম আহমদ, বোখারী ও মুসলিম সংক্ষিপ্তাকারে এবং অপর এক সূত্রে বায়হাকী ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবিদ বর্ণনা করেছেন হুমাইদ ইবনে হেলালের মাধ্যমে। আবার হজরত ইবনে আবী আওফা সূত্রে জারীর, ওরওয়ার মাধ্যমে বায়হাকী এবং মাজিশুন ও ইয়াজিদ ইবনে আসামের মাধ্যমে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন ইবনে সা'দও।

মোহাম্মদ ইবনে ওমরের বর্ণনাটি এরকম— পৌত্তলিকবাহিনী যখন পালিয়ে গেলো, তখন মুসলিম বাহিনী ছিলো রণক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। তাঁরা স্বগৃহে ফিরে এসে অস্ত্রসম্বরণ করলেন। রসুল স. উপস্থিত হলেন তাঁর প্রিয়তমা ভার্যা হজরত আয়েশার ঘরে। পানি চেয়ে নিয়ে ধৌত করলেন তাঁর পবিত্র মস্তক। বাগবী লিখেছেন, যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফিরে রসুল স. প্রথম পদার্পন করেছিলেন তার প্রিয়তমা পত্নী হজরত জয়নাব ইবনে জাহাশের প্রকোষ্ঠে। রসুল স. এর মাথা ধুয়ে দিয়েছিলেন তিনিই। মাথার এক পাশ ধোয়া হতে না হতেই সেখানে প্রবেশ করলেন হজরত আয়েশা। তিনি বলেছেন, ওই সময় বাইরে থেকে শ্রুত হলো সালামের আওয়াজ।

মোহাম্মদ ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, জননী আয়েশা বলেছেন, লোকটি বাইরে জানাযার খাট রাখার স্থানে দাঁড়ালো। উচ্চস্বরে বলতে লাগলো, হে যোদ্ধৃবৃন্দ! তোমাদেরকে অস্ত্রসম্বরণ করতে বললো কে? রসুল স. হতচকিত হয়ে বাইরে গেলেন। আমিও তাঁর পিছনে পিছনে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ালাম। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, লোকটি দাহিয়া কালবী। মাথা থেকে ধূলো ঝেড়ে ফেলছিলো সে।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, উকীষ পরিহিত লোকটি বললো, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! আল্লাহ্ আপনার প্রতি মহানুভবতা বর্ষণ করুন। আপনি তো অতিদ্রুত যুদ্ধাস্ত্র ও রণপোশ খুলে রেখেছেন। অথচ যেদিন থেকে শত্রুরা মদীনা অবরোধ করেছে, সেদিন থেকে এখনো ফেরেশতারা যুদ্ধসাজে সজ্জিত। আমরা হামরাউল আসাদ পর্যন্ত শত্রুসেনাদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদেরকে ভাগিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ্র নির্দেশ ছিলো এরকমই। এখন আপনার প্রতি আল্লাহ্র আদেশ হচ্ছে, এই মুহূর্তে

বনী কুরায়জার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। আমি আমার বাহিনী নিয়ে চললাম। ভূকম্পন তুলতে হবে তাদের দুর্গে। আপনিও আপনার সৈন্যসামন্ত নিয়ে সেখানে চলুন।

হুমাইদ ইবনে হেলাল বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তখন বললেন, আমার সঙ্গী সহচরেরা শ্রান্ত। দু'চারদিনের বিশ্রাম পেলে উত্তম হয়। হজরত জিবরাইল বললেন, আপনার এখন একমাত্র কাজ হচ্ছে বনী কুরায়জাকে আক্রমণ করা। তার পরের দায়িত্ব আমাদের। আমরা তাদেরকে ধরে ধরে এমনভাবে আছাড় মারবো, যেমন পাথরের উপরে আছড়ে ফেলা হয় ডিম। তারপর আমরা তাদেরকে এমনভাবে আতঙ্কগ্রস্ত করবো যে, দুর্গ থেকে বের হওয়া ছাড়া তাদের কোনো উপায়ন্তর থাকবে না।

জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. যখন ঘরে ফিরে এলেন, তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র নবী! আপনার সঙ্গে যে লোকটি কথা বললো, সে কে? তিনি স. বললেন, তুমি কি তাকে দেখতে পেয়েছো? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি স. বললেন, লোকটি কার মতো দেখতে বলতো? আমি বললাম, অনেকটা দাহিয়া কালবীর মতো। তিনি স. বললেন, তিনি জিবরাইল। তাঁর মাধ্যমে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমি যেনো এক্ষুণি বনী কুরায়জাকে আক্রমণ করি।

হুমাইদ আরো বর্ণনা করেন, হজরত জিবরাইল তাঁর কথা শেষ করেই যাত্রা করলেন বনী কুরায়জার বসতির দিকে। তাঁর সঙ্গীসাথীরাও অনুগামী হলো তাঁর। তাদের ধাবমান অশ্বখুরের দাপটে বনী গানামের বসতিতে পরিদৃষ্ট হলো ধূলোর মেঘ। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বলেছেন, তাদের যাত্রাপথের ধূলোর মেঘ এখনো আমার চোখে ভাসে। কাতাদা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ইবনে আবিদের বর্ণনা উল্লেখ করেছেন এভাবে—রসুল স. তখন মদীনার মুসলিম জনপদে প্রেরণ করলেন এক ঘোষক। সে ঘোষণা করলো— 'ওহে আল্লাহ্র আরোহী! আপনাপন বাহনে সমারূঢ় হও।' আবার হজরত বেলালকে নির্দেশ দিলেন, তুমি ঘোষণা করে দাও, যে আল্লাহ্র রসুলের পক্ষ থেকে এ ঘোষণা শুনেছে, সে যেনো বনী কুরায়জার বসতিতে পৌঁছার পূর্বে আসরের নামাজ আদায় না করে। আজ আসরের নামাজের স্থান হচ্ছে বনী কুরায়জার জনপদ।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বোখারী ও মুসলিম, জননী আয়েশা ও ইবনে উকবা থেকে বায়হাকী এবং হজরত কা'ব ইবনে মালেক থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তখন সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি তোমাদেরকে কঠোরভাবে আদেশ দিচ্ছি, তোমরা আজ বনী কুরায়জার বসতি ছাড়া অন্য কোথাও নামাজ পড়তে পারবে না। হজরত ইবনে ওমরের উদ্ধৃতি দিয়ে মুসলিম লিখেছেন, রসুল

স. সেদিন বলেছিলেন জোহরের নামাজ পাঠ করার কথা। যাহোক, রসুল স. এর এই নির্দেশ পালন করার ব্যাপারে সাহাবীগণের মধ্যে দেখা দিলো মতোপ্রভেদ। একদল ক্রমাগত পথ চলে বনী কুরায়জার বসতিতে যখন পৌঁছলেন তখন সূর্য পাটে বসেছে। শুরু হয়েছে মাগরিবের সময়। ওই সময়েই তাঁরা পাঠ করলেন আসর। তাঁরা বললেন, আমরা আল্লাহ্র রসুলের নির্দেশ পালন করেছি যথাযথভাবে। আর একদল পথ চলতে চলতে ভাবলেন, বনী কুরায়জার বসতিতে পৌঁছার আগেই আসরের নামাজের সময় শেষ হয়ে যাবে। আবার ওয়াক্ত মতো নামাজ আদায় করা শরিয়তের একটি ফরজ নির্দেশ। তাই তাঁরা পথিমধ্যেই সঠিক ওয়াক্তে আদায় করলেন আসর। তাঁরা মনে করলেন, গন্তব্যে পৌঁছতে বিলম্ব যাতে না হয়, সে কারণেই রসুল স. নির্দেশ দিয়েছিলেন ওরকম করে। পরে যখন বিষয়টি রসুল স. এর শ্রুতিগোচর হলো, তখন কোনো দলকেই কিছু বললেন না। অর্থাৎ একথা কোনো দলকে বললেন না যে তোমাদের আমল ভুল।

পর্যালোচনা ১. উল্লেখিত বর্ণনাবলীতে দেখা যায়, রসুল স. সাহাবীগণকে গন্তব্যে পৌঁছে আদায় করতে বলেছিলেন জোহর, অথবা আসর। এরকম বর্ণনাবৈষম্যের হেতু নির্ণয়ার্থে বলা যেতে পারে, নিশ্চয় তাঁদের একদল যাত্রা করেছিলেন অগ্রগামী বাহিনীরূপে। তাদেরকেই তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন গন্তব্যে পৌঁছে জোহর আদায় করার। আর পশ্চাদবর্তী বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন গন্তব্যে উপস্থিত হয়ে তারা যেনো পাঠ করেন আসর। অথবা বলা যেতে পারে, যারা ছিলেন তেজস্বী, দ্রুতগামী ও বনী কুরায়জার বসতির অধিকতর নিকটে বসবাসকারী, তাদেরকেই তিনি স. দিয়েছিলেন অকুস্থলে পৌঁছে জোহর পাঠ করার। আর অবশিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছিলেন আসরের।

পর্যালোচনা ২. বর্ণিত ঘটনার মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বিধানবেত্তাগণ যদি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টায় ভুলও করে বসেন, তবুও তিনি দোষী সাব্যস্ত হবেন না। সেকারণেই সাহাবীগণ তাঁর নির্দেশের বাস্তবায়ন দু'ভাবে করা সত্ত্বেও তিনি স. তাদের কোনো দলকেই সাধুবাদ যেমন দেননি, তেমনি করেননি তিরস্কারও।

'যাদুল মাআদ' রচয়িতা লিখেছেন, দু'টো দলই তাঁদের আপনাপন উদ্দেশ্য অনুসারে অর্জন করেছেন পুণ্য। তবে যাঁরা পথে সময়মতো নামাজ আদায় করেছেন তারা লাভ করেছেন দ্বিগুণ পুণ্য— একগুণ সঠিক সময়ে নামাজ পাঠ করার জন্য এবং আরেকগুণ প্রতিপালন করার জন্য রসুল স. এর নির্দেশের। আর একগুণ পুণ্যলাভ করেছে অকুস্থলে পৌঁছে নামাজ পাঠকারীরা। আর উভয় দলই যেহেতু রসুল স. এর নির্দেশের প্রতি ছিলেন সতত সতর্ক তাই তাঁদের সকলেই

ছিলেন পুণ্যাভিসারী। যা হোক, ওই অভিযানে রসুল স. বিজয় কেতন অর্পণ করেছিলেন হজরত আলীর হাতে। ওই কেতন পরিখার যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পরেও তা ছিলো অনবনমিত।

মোহাম্মদ ইবনে আমর, ইবনে হিশাম ও বালাজুরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. ওই অভিযানের সময় মদীনায় তাঁর প্রতিনিধিরূপে রেখে গিয়েছিলেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুমকে। এ সম্পর্কে মোহাম্মদ ইবনে ওমর ও বাগবীর বর্ণনা এরকম— পঞ্চম হিজরী। ২৩ জিলক্বদ। রসুল স. যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। শিরস্ত্রাণ ও বর্মসজ্জিত হয়ে হাতে তুলে নিলেন বর্শা। গলায় ঝুলিয়ে নিলেন ঢাল। আরোহণ করলেন ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন একটি অশ্বে। জুলু নামক স্থানে অস্ত্রসজ্জিত হলেন ছত্রিশজন অশ্বারোহী সাহাবী। অবশিষ্টরা ছিলেন পদাতিক। তাঁরা সকলে রসুল স.কে পরিবেষ্টন করে এগিয়ে চললেন বনী কুরায়জার বসবাসস্থলের দিকে।

ইবনে সা'দের বর্ণনায় এসেছে, ওই সময় রসুল স. এর সহযোদ্ধার সংখ্যা ছিলো তিন হাজার।

পর্যালোচনা ৩. বনী কুরায়জার ঘটনায় একথাই প্রতীয়মান হয় যে, নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ যাত্রা সিদ্ধ। কিন্তু পরবর্তী সময়ে রসুল স. এর বিদায় হজের ভাষণের মাধ্যমে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ করা হয়। অথবা বলা যেতে পারে, পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কেবল রসুল স. এর জন্য ওই অভিযানটির অনুমতি দেওয়া হয়েছিলো। যেমন হেরেম শরীফের অভ্যন্তরে রক্তপাত নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মক্কা বিজয়ের পরক্ষণে কেবল রসুল স. এর জন্যই সেখানে অল্পকিছুক্ষণের জন্য হত্যাকাণ্ড ঘটানো বৈধ করা হয়েছিলো। এরপর সেখানেও রক্তপাত নিষিদ্ধ হয়ে যায় চিরতরে। এরকমও বলা যেতে পারে যে, যুদ্ধের সূচনা হয়েছিলো তখন বনী কুরায়জার পক্ষ থেকেই। তারা আবির্ভূত হয়েছিলো পৌত্তলিকদের সম্মিলিত বাহিনীর মিত্রশক্তিরূপে। তাই নিষিদ্ধ মাস হওয়া সত্ত্বেও রসুল স. ওই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিলেন।

হজরত আবু রাফে' এবং হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. যখন বনী কুরায়জাদের বসবাস স্থলে উপনীত হলেন, তখন আরোহণ করলেন একটি গদিবিহীন গাধার উপর। সৈনিক সাহাবীগণ তখন পরিবেষ্টন করে রেখেছিলেন তাঁকে।

জননী আয়েশা থেকে হাকেম, বায়হাকী ও আবু নাঈমের বর্ণনায় এবং মোহাম্মদ ইবনে আমর ও ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তখন অভিযান চালিয়ে ছিলেন সাওবাইনের দিক থেকে। সেদিকে আগে থেকেই অবস্থান নিয়েছিলেন সশস্ত্র হারেছা ইবনে নোমান আনসারী ও তাঁর বাহিনী। রসুল স.

তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কোনো সুসজ্জিত সেনাবাহিনী কি তোমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছে? আনসারগণ জবাব দিলেন, হ্যাঁ, কিছুক্ষণ আগে এদিক দিয়ে অতিক্রম করেছেন খচ্চরারোহী দাহিয়া কালবী। তিনিই আমাদেরকে এখানে থাকতে বলেছেন সশস্ত্র প্রহরায়। তিনি আরো বলে গিয়েছেন, এপথেই শুভাগমন ঘটবে আল্লাহ্‌র রসুলের। হারেছা ইবনে নোমান বললেন, সে কারণেই তো আমরা দুই সারিতে বিভক্ত হয়ে এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি সশস্ত্র সান্ত্রীরূপে। রসুল স. বললেন, তোমরা যাকে দাহিয়া কালবী বলছো, তিনি ছিলেন আসলে জিবরাইল। তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন বনী কুরায়জার দুর্গে ভূকম্পন সৃষ্টির এবং তাদের অন্তরে ত্রাস সঞ্চারের। ইত্যবসরে সেখানে মুহাজির ও আনসারের একটি দল নিয়ে উপস্থিত হলেন হজরত আলী।

মোহাম্মদ ইবনে আমরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু কাতাদা বলেছেন, যখন আমরা বনী কুরায়জার দুর্গের সন্নিকটে উপস্থিত হলাম, তখন তারা বুঝতে পারলো, চূড়ান্ত বুঝাপড়া আজ হবেই হবে। হজরত আলী উত্তোলন করলেন মুসলিম বাহিনীর বিজয় পতাকা। দুর্গবাসী ইহুদীরা অকথ্য ভাষায় গালাগালি করতে লাগলো রসুল স. এবং তাঁর পবিত্র সহধর্মিণীগণের উদ্দেশ্যে। আমরা কোনো উচ্চবাচ্য করলাম না। নীরবে কেবল বুঝিয়ে দিলাম, তলোয়ারের দ্বারাই আজ হবে চূড়ান্ত মীমাংসা। ইত্যবসরে সেখানে আগমন করলেন রসুল স. স্বয়ং। দুর্গের কাছাকাছি একটি অসমতল প্রস্তরময় ভূমিতে উনা নামক কূপের পাশে শিবির স্থাপন করলেন তিনি স.। দৃশ্য দেখা মাত্র আলী আমাকে পতাকা হাতে দিয়ে এগিয়ে গেলেন রসুল স. এর দিকে। তিনি মনে প্রাণে চাইছিলেন ইহুদীদের অশ্রাব্য গালিগালাজ যেনো রসুল স. এর পবিত্র শ্রুতি পর্যন্ত না পৌঁছায়। তাই তিনি নিবেদন করলেন, মহামান্য রসুল! ওদের কাছাকাছি না ঘেষলেও চলে। তিনি স. বললেন, আলী! তুমি কি আমাকে ফিরে যেতে বলো! আমার ধারণা তুমি হয়তো ওদের কটুকাটব্য শুনেই একথা বলছো। আলী বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনার অনুমান যথার্থ। তিনি স. বললেন, তারা আমাকে এখনো দেখতে পায়নি বলেই এরকম করে বলতে পারছে। দেখলে আর বলতে পারবে না। একথা বলে রসুল স. দুর্গের দিকে আরো এগিয়ে গেলেন। তাঁর সামনে সামনে চলতে লাগলেন উসায়েদ ইবনে হুদায়ের। তিনি বলে উঠলেন, ওরে আল্লাহ্‌র দুশমন! মনে রেখো, তোমরা অনাহারে মৃত্যু মুখে পতিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা তোমাদেরকে অবরুদ্ধ করলাম। দেখি গহ্বরবাসী শেয়ালের মতো তোমরা কতক্ষণ বাস করবে দুর্গে। দেখতেই তো পাচ্ছো, তোমাদের রসদপত্রের সরবরাহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। দুর্গবাসীদের একজন বললো, হে উসায়েদ! তুমি তো আমাদের

মিত্রপক্ষীয়। খাজরাজদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় তোমরা আমাদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করেছিলে। মনে নেই? উসায়েদ বললেন, এখন আর তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোনো চুক্তিই নেই। নেই কোনো আত্মীয়তার বন্ধন।

রসুল স. দুর্গের আরো কাছে গেলেন। উচ্চস্বরে তাদের নেতাদের নাম ধরে ডেকে ডেকে বললেন, ওরে হতভাগা, বৃক্ষচর ও বক্রবক্তের ভ্রাতা! ওহে শয়তানের সহচর বিগ্রহবন্দনাকারী! জবাব দাও, আল্লাহ্ কি তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করেননি? তোমাদের উপরে কি আপতিত করেননি তাঁর রোষ? তবে তোমরা আমাকে গালমন্দ করছো কেনো? দুর্গের ভিতর থেকে জবাব এলো, হে আবুল কাসেম। আমরা তো আপনাকে গালমন্দ করিনি। আর আপনি তো মূর্খ ও বাচাল কোনোটাই নন।

দিবাবসান হলো। মুসলিম সৈনিকেরা সমবেত হলেন রসুল স. সকাশে। হজরত সা'দ ইবনে আবু উবায়দা কয়েক বস্তা খেজুর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ওই খেজুরই হলো সকলের রাতের আহার। আহারের প্রাক্কালে রসুল স. বললেন, খেজুর অতি উপাদেয় আহার্য।

পরদিন তিনি স. গাত্রোত্থান করলেন অতিপ্রত্যুষে। তীরন্দাজবাহিনীকে অবস্থান গ্রহণ করতে বললেন দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে। নির্দেশ মোতাবেক তাঁরা চতুর্দিক থেকে দুর্গ ঘিরে ফেলে বর্ষণ করতে শুরু করলেন তীর ও পাথর। দুর্গের ভিতর থেকে তীর ও পাথর ছুঁড়তে লাগলো ইহুদীরাও। সারাটা দিন কেটে গেলো এভাবেই। সন্ধ্যা হলো। মুসলিম বাহিনী রইলো আপনাপন অবস্থানে অটল। তাঁদের পক্ষ থেকে তীর ও পাথরও নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো উপর্যুপরি। কিন্তু ইহুদীরা হঠাৎ করে কেমন যেনো নিরুৎসাহিত হয়ে পড়লো। তীর ও পাথর নিক্ষেপ বন্ধ করে তারা প্রস্তাব পাঠালো সন্ধির। রসুল স. বলে পাঠালেন, ঠিক আছে, তাহলে আলোচনায় বসো। দুর্গ থেকে তারা আলোচনার জন্য পাঠালো নাব্বাস ইবনে কায়েসকে। সে এসে বললো, বনী নাজির যে সকল শর্তসহ আপনাদের সঙ্গে সন্ধি করেছিলো, আমরাও ওই সকল শর্তসহ সন্ধি করতে চাই। তাদের মতো আমরাও আমাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার পরিজন নিয়ে দেশান্তরে গমন করবো। উটের পিঠে যতটুকু মালমাত্তা নেওয়া সম্ভব তাই কেবল নিবো আমরা। আর তাদের মতোই ছেড়ে যাবো আমাদের অস্ত্রপাতি ও অবশিষ্ট সম্পদ। রসুল স. বললেন, না, তা সম্ভব নয়। নাব্বাস বললো, ঠিক আছে, আমরা পরিত্যাগ করে যাবো সবকিছু, সঙ্গে করে নিয়ে যাবো কেবল পরিবার পরিজনদের। রসুল স. বললেন, তা-ও সম্ভব নয়। বরং তোমরা বিনা শর্তে বের হয়ে এসো। তারপর আমরা যা সিদ্ধান্ত দিবো, তা-ই তোমাদেরকে মেনে নিতে হবে। নাব্বাস ফিরে গেলো। দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতেই উৎসুক ইহুদীরা ঘিরে ফেললো তাকে। নাব্বাস

তাদেরকে খুলে বললো সবকিছু। নির্বাক হয়ে গেলো সকলে। কা'ব ইবনে আসাদ কেবল বললো, শোনো বনী কুরায়েজ! বুঝতেই পাচ্ছো তোমরা এখন মহাসংকটে নিমজ্জিত। এ মহাসংকট থেকে পরিত্রাণের তিনটি উপায় আমি বলে দিতে পারি তোমাদেরকে, যদি তোমরা তা শুনতে চাও। গোত্রপতিরা বললো, ঠিক আছে, বলো দেখি তুমি কী বলতে চাও? কা'ব বললো, প্রথম প্রস্তাব হচ্ছে— তোমরা তো জানোই যে, মোহাম্মদ আল্লাহ্র নবী। একথা তো লেখা রয়েছে তোমাদের তওরাত গ্রন্থেই। সুতরাং তোমরা তাঁকে নবী বলে মেনে নাও। বায়াত গ্রহণ করো তাঁর পবিত্র হাতে হাত রেখে। এরকম করলে তোমরা সহজেই রক্ষা করতে পারবে তোমাদের জীবন, সম্পদ, সন্তান-সন্তুতি, পরিবার পরিজন সবকিছু। তিনি বনী ইসরাইল বংশদ্ভূত নন বলেই তো তোমরা ইর্ষান্বিত হয়ে তাঁকে অস্বীকার করছো। উপেক্ষা করছো মহা সত্যকে। ভেবে দ্যাখো, এতে করে কি তোমরা শেষ রক্ষা করতে পারবে? তাঁর সঙ্গে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা কি আমাদের উচিত হয়েছে? প্রথম থেকেই আমি ছিলাম এর ঘোর বিরোধী। কুলাঙ্গার হুয়াই ইবনে আখতাবই যতো নষ্টের মূল। দ্যাখো, এখন এতো বড় বিপদের সম্মুখীন হয়েও সে কেমন নির্বিকারচিত্তে ঝিমুচ্ছে। ইবনে জাওয়াসের কথা কি তোমাদের মনে নেই? তিনি বলেছিলেন, এই আবর উপদ্বীপে আবির্ভূত হবেন এক মহামান্য নবী! আমার জীবদ্দশায় যদি আমি তাকে পাই, তবে আমি অবশ্যই হবো তাঁর একনিষ্ঠ অনুগ। আর যদি তাঁর মহাআবির্ভাব ঘটে আমার মৃত্যুর পর, তবে তোমরা যারা বেঁচে থাকবে, তারা অবশ্যই হয়ো তার একনিষ্ঠ অনুসারী। সাবধান! এর অন্যথা কোরো না যেনো। মনে রেখো ওই মহামান্য নবীকে মেনে নিলে তোমরা হবে দ্বিগুণ সৌভাগ্যের অধিকারী। একগুণ তওরাত মান্য করার কারণে, আর একগুণ অনুসারী হওয়ার কারণে। সর্বশেষ প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থের। তাঁকে অবশ্যই জানিয়ো আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন। বোলো, আমি পৃথিবী পরিত্যাগ করেছি তাঁকে জেনে ও মেনে। সুতরাং হে বনী কুরায়জা জনগোষ্ঠী! এসো, আমরা সমর্পিত হই তাঁর পবিত্র হস্তে। জনতা সমস্বরে বলে উঠলো, না, না, তা হয় না। হতে পারে না। কোনো কিছুর বিনিময়েই আমরা পরিত্যাগ করতে পারি না তওরাত। তওরাতের পরিবর্তে অন্য কোনো গ্রন্থের বিধান মান্য করা আমাদের পক্ষে সম্ভবই নয়। কা'ব বললো, তাহলে আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব শোনো। এসো আমরা স্বহস্তে হত্যা করি আমাদের আপনাপন স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতিদের। তারপর জীবনপণ সংগ্রাম শুরু করি মোহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের বিরুদ্ধে। যদি নিহত হই, তবে আমাদের আর স্বজন-বিচ্ছেদের কোনো দুঃখ থাকবে না। আর যদি জয়ী হই, তবে নতুন করে রচনা করতে পারবো সংসার। জনতা বললো, নিরীহ স্বজনদের আমরা স্বহস্তে হত্যা করতে পারি কীরূপে? আর তাদেরকে হত্যা করলে আমাদের বেঁচে থাকার

স্বার্থকতাই বা কী? কা'ব বললো, তাহলে শোনো তৃতীয় প্রস্তাব— আজ শনিবার রাত। মোহাম্মদ ও তাঁর দলের লোকেরা ভালো করেই জানে যে, এরাত আমাদের কাছে কতো সম্মানের। তাই তারা আজ রাতে সময়াতিপাত করছে নিশ্চিন্তে। আজ রাতে আমাদের পক্ষ থেকে আক্রমণের আশংকা তাদের একেবারেই নেই। তাই এসো, আজ রাতে এক্ষুণি আমরা তাদেরকে আক্রমণ করি। এরকম করলে আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত। জনতা বললো, অসম্ভব। এরাতের মর্যাদাহানি ঘটানও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এ রাতের সম্মান নষ্ট করার কারণে আমাদের পূর্বসূরীদের অনেকে হয়েছে অভিসম্পাতগ্রস্ত। রূপান্তরিত হয়েছে শূকর ও বানরে। সুতরাং এ রাতের মর্যাদা বিনষ্ট করলে আমাদের উপরেও নেমে আসবে আল্লাহ্র আযাব। কা'ব বললো, আক্ষেপ মাতৃজঠর থেকে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর অবধি আজ পর্যন্ত তোমরা প্রকৃত বিবেকবান হতে পারলে না। ছা'লাবা ইবনে সাঈদ, উসায়েদ ইবনে সাঈদ ও উসাইয়েদ ইবনে উবাইয়েদ তখন বললো, হে বনী কুরায়জা জনতা! আল্লাহ্র শপথ! তোমরা ভালো করেই জানো যে, তিনি আল্লাহ্র সত্য রসুল। আমাদের তওরাতেও রয়েছে তাঁর অবয়বগত ও স্বভাবগত অবস্থার স্পষ্ট বিবরণ। আমাদের গোত্রের এবং বনী নাজিরের আলেমগণ সে কথা আমাদেরকে বহুবার শুনিয়েছেন। আমাদের জনগোষ্ঠীভূত ইবনে হাইয়্যান ছিলেন একজন সত্যাধিষ্ঠিত ব্যক্তি। তিনিও আমাদেরকে শেষ পয়গম্বের কথা বলে গিয়েছেন অনেক বার। আমাদের নেতা হুয়াই ইবনে আখতাবও জানেন তাঁর প্রকৃত পরিচয়। সুতরাং তাঁকে আমরা স্বীকার করবো না কেনো? জনতা একযোগে বলে উঠলো, না , না, তা হয় না। তওরাতের বিধানের স্থলে অন্য কোনো বিধান আমরা মানতেই পারি না। ছা'লাবা ও তাঁর সঙ্গী দু'জন যখন বুঝতে পারলেন, ইহুদীরা তাদের অস্বীকৃতিতে অটল তখন তাঁরা আর অন্যের জন্য অপেক্ষা না করেই দুর্গ থেকে বেরিয়ে উপস্থিত হলেন রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে। তাঁর পবিত্র হস্তে গ্রহণ করলেন ইসলামের বায়াত। এভাবে তাঁরা ইমানের সৌভাগ্য লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষা করতে সমর্থ হলেন নিজেদের ও তাঁদের পরিবার পরিজনের জীবন।

এবার আমর ইবনে মাসউদ বলে উঠলেন, হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা মোহাম্মদের সঙ্গে কৃত সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করেছো। আমি ওই সন্ধিচুক্তির অঙ্গীভূত নই। তাই চুক্তিভঙ্গের দায়ও আমার উপরে নেই। তবুও আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি একটি উত্তম প্রস্তাব। তোমরা ইসলাম গ্রহণ করতে না-ই যদি চাও, তবে মুসলমানদেরকে জিযিয়া দাও। তাহলেই রক্ষা পেতে পারে তোমাদের জান ও মাল। তোমাদেরকে তাহলে ইহুদী ধর্মত্যাগও করতে হয় না। বনী কুরায়জা জনতা বললো, অসম্ভব। জিযিয়ার দায় ঘাড়ে নিয়ে আমরা আরবদের কাছে ছোট হতে

পারি না। এর চেয়ে যে মৃত্যুও ভালো। আমর বললেন, তাহলে আমিও তোমাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলাম। বিদায়। একথা বলেই তিনি তাঁর দুই সন্তানকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন দুর্গ থেকে। চলতে চলতে উপস্থিত হলেন মুসলিম বাহিনীর তখনকার প্রতিরক্ষা-অধিনায়ক মোহাম্মদ ইবনে মুসলিমার সম্মুখে। প্রতিরক্ষা-অধিনায়ক জানতে চাইলেন তাঁর পরিচয়। তিনি বললেন, আমি আমর ইবনে মাসউদ। আর এ দু'জন আমার সন্তান। আমি রসুল স. এর সাক্ষাতপ্রার্থী। অধিনায়ক বললেন, হে আল্লাহ্! মর্যাদাবান ব্যক্তির সাহচর্য্য থেকে তুমি আমাকে বঞ্চিত কোরো না। একথা বলে পথ ছেড়ে দিলেন তিনি। আমর তাঁর দুই সন্তান নিয়ে সরাসরি পৌঁছে গেলেন রসুল স. সকাশে। রাত্রি অতিবাহিত করলেন সেখানেই। রসুল স. বলেছেন, অঙ্গীকার পূরণের বিনিময়ে আল্লাহ্ তোমাকে রক্ষা করেছেন।

ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়, ইহুদীরা তখন রসুল স. এর কাছে প্রস্তাব পাঠালো, আমরা এ ব্যাপারে আলোচনা করতে চাই আবু লুবাবার সঙ্গে। দয়া করে তাঁকে আমাদের দুর্গে পাঠিয়ে দিন। হজরত আবু লুবাবা ছিলেন ইহুদীদের মিত্র আউস গোত্রীয় আমর ইবনে আউফের বংশভূত। রসুল স. তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন তাদের দুর্গাভ্যন্তরে। ইহুদীরা তাঁকে জানালো সাদর অভ্যর্থনা। নারী ও শিশুরা শুরু করলো ক্রন্দন। হজরত আবু লুবাবার হৃদয় দ্রবীভূত হলো। তারা বললো, আবু লুবাবা! তুমি কী বলো? মোহাম্মদের ডাকে সাড়া দিয়ে আমরা কি সকলে দুর্গ থেকে বের হয়ে পড়বো? তিনি বললেন হ্যাঁ। কিন্তু হাতে ইশারা করলেন তাঁর কণ্ঠনালীর দিকে। অর্থাৎ ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন, তোমাদের সকলের কণ্ঠচ্ছেদন করা হবে। পরে তিনি স্বয়ং বলেছেন, ইশারা করার পরক্ষণেই আমার মনে হলো, একি করলাম আমি! আমি তো আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সঙ্গে করলাম প্রতারণা। ভঙ্গ করলাম গোপনীয়তা রক্ষার অঙ্গীকার। একথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি দৌড়ে বেরিয়ে এলাম দুর্গ থেকে। রসুল স. সকাশে উপস্থিত না হয়ে গেলাম মসজিদ প্রাঙ্গণে। মসজিদের একটি স্তম্ভের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ফেলে হলাম স্বেচ্ছাবন্দী। বললাম, আমি প্রতারক। এভাবে স্বেচ্ছাবন্দী হয়েই আমি নিজেকে নিজে শাস্তি দান করলাম। এভাবেই আমি বন্দী অবস্থায় অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করবো, যদি না আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করেন।

রসুল স. হজরত আবু লুবাবার বিষয়টি জানতে পেরে বললেন, সে যদি সোজা আমার কাছে আসতো, তবে আমিই তার পক্ষ হয়ে আল্লাহ্র কাছে মার্জনা চেয়ে নিতাম। কিন্তু সে যেহেতু স্বেচ্ছাশাস্তি নির্বাচন করেছে, সেহেতু বিষয়টি আর আমার অধিকারে নেই। এখন বিষয়টি সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র অভিপ্রায় ও অধিকারভূত। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই অবতীর্ণ হলো 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা

আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কোরো না। তোমাদের নিকটে যা গচ্ছিত রয়েছে, তা তো তোমরা ভালো করেই জানো'। এর কিছু দিন পর অবতীর্ণ হলো ক্ষমার শুভসংবাদ। জননী উম্মে সালমা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তখন আমার প্রকোষ্ঠে। সহসা আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি স. মৃদু মৃদু হাসছেন। নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তম বচনবাহক! কৃপা করে জানাবেন কি, আপনার এমতো হাসির কী কারণ? তিনি স. বললেন, আবু লুবাবার তওবা কবুল করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমি বললাম, আমি কি একথা তাকে জানাতে পারবো? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। আমি উঠে দরজার কাছে গেলাম। অনতিদূরেই ছিলো স্বেচ্ছাবন্দী অনাহারক্লিষ্ট আবু লুবাবা। আমি কিঞ্চিত উচ্চ আওয়াজে জানালাম, আবু লুবাবা! তোমার জন্য সাধুবাদ। আল্লাহ্ তোমাকে মার্জনা করেছেন। মুহূর্তমধ্যে ছড়িয়ে পড়লো শুভসমাচারটি। সাহাবীগণের কেউ কেউ জড়ো হয়ে তার বাঁধন খুলে দিতে উদ্যত হলো। আবু লুবাবা বললো, আল্লাহ্‌র শপথ। তোমরা কেউ আমার বাঁধন খুলো না। আমি চাই, আল্লাহ্‌র প্রিয়তম রসুল স্বয়ং আমাকে বন্ধনমুক্ত করুন। একটু পরেই ফজরের আজান ধ্বনিত হলো। রসুল স. মসজিদে গমন কালে বন্ধনমুক্ত করলেন আবু লুবাবাকে।

আলী ইবনে জায়েদ ইবনে জাদআনের উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম জয়নুল আবেদীন ইবনে হজরত ইমাম হোসাইন সূত্রে হান্নাদ ইবনে সালমা বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু লুবাবাকে বন্ধনমুক্ত করতে গিয়েছিলেন নবীনন্দিনী হজরত ফাতেমা। তিনি তখন বলে উঠলেন, আমি যে শপথ করেছি, রসুল স. স্বয়ং আমার বাঁধন খুলে না দেওয়া পর্যন্ত আমি এভাবেই থাকবো। রসুল স. একথা শুনতে পেয়ে বললেন, ফাতেমা তো আমারই অংশ। উল্লেখ্য, বর্ণনাটি প্রায়োন্নত পর্যায়ের।

হজরত আবু লুবাবা স্বয়ং বর্ণনা করেছেন, বনী কুরায়জা যখন অবরুদ্ধ, তখন আমি এক রাতে স্বপ্নে দেখলাম, আমি পতিত হয়েছি পূঁতিগন্ধময় কৃষ্ণপঙ্কে। অসহ্য দুর্গন্ধে আমি মৃতপ্রায়। কিন্তু আমার নিষ্কৃতিলাভের কোনো উপায়ই পরিদৃষ্ট হলো না। সহসা দেখলাম, নিকটেই একটি স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বিনী। অতি কষ্টে উঠে গিয়ে আমিও স্রোতস্বিনীতে দিলাম ডুব। সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি পেলাম অসহ্য দুর্গন্ধ থেকে। অনুভব করলাম অপার্থিব সুরভি। এ স্বপ্নের কথা আমি জানালাম শ্রদ্ধেয় আবু বকরকে। তিনি বললেন, তুমি কোনো দুঃখজনক ঘটনার ফাঁদে পড়বে। তারপর সেখান থেকে উদ্ধার পাবে আল্লাহ্‌র বিশেষ করুণায়। স্বেচ্ছাবন্দী অবস্থায় আমার বার বার মনে হচ্ছিলো পরম শ্রদ্ধেয় আবু বকরের কথা। অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হওয়া সত্ত্বেও তাই মনে আশা জাগতো, অবশেষে হয়তো মার্জনা লাভে বঞ্চিত হবো না। দিনের পর দিন গত হতে লাগলো। চরম অবসাদে দুর্বল হয়ে পড়লো শরীর। একসময় শ্রুতিও হয়ে গেলো বধিরপ্রায়। কিন্তু আমি একথাও

জানতাম যে, আমি রয়েছি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে। ইবনে হিশাম বলেছেন, তিনি স্বেচ্ছাবন্দী অবস্থায় অতিবাহিত করেছিলেন ছয় রাত। তাঁর সম্মানীয়া সহধর্মিণী নামাজের সময় হলে তাঁকে বন্ধনমুক্ত করতেন। নামাজ শেষে পুনরায় তাঁকে বেঁধে রাখতেন আগের মতো।

ইবনে উকবা বলেছেন, অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন, স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে তিনি কাটিয়েছিলেন কুড়ি রাত। 'বেদায়া' পুস্তকে রয়েছে, এই অভিমতটিই অধিকতর যথার্থ। ইবনে ইসহাক বলেছেন, তিনি বন্ধনাবস্থায় অতিবাহিত করেছিলেন পঁচিশ দিন। কেবল নামাজ ও প্রাকৃতিক প্রয়োজনের জন্য তাঁকে বন্ধন মুক্ত করতেন তাঁর আদরের কন্যা। উল্লেখ্য, উদ্ভূত বর্ণনা বৈষম্যের কারণে বলতে হয়, তাঁকে কখনো কখনো বন্ধনমুক্ত করতেন তাঁর পত্নী এবং কখনো কখনো তাঁর কন্যা। যে আয়াতের মাধ্যমে তাঁর ক্ষমাপ্রাপ্তির শুভসমাচার ঘোষিত হয়েছে, সে আয়াতখানি এই— 'আর অপর যারা অপরাধ স্বীকার করেছে, মিশ্রিত করেছে সৎ ও অসৎকর্ম, আশা করা যায় আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ কৃপাপরবশ, দয়াময়'।

বাগবী লিখেছেন, মুসলমানদের দ্বারা বনী কুরায়জা অবরুদ্ধ ছিলো পঁচিশ দিন। তাদের দুঃখ-কষ্ট পৌঁছেছিলো চরমে। তদুপরি আল্লাহ্পাক তাদের অন্তরে সঞ্চার করেছিলেন অসহনীয় আতঙ্ক। অবশেষে তারা রসুল স. এর নির্দেশ মানতে বাধ্য হয়। দুর্গ ছেড়ে বের হয়ে আসে সকলেই। রসুল স. হজরত মোহাম্মদ ইবনে মুসলিমাকে নির্দেশ দেন, ওদেরকে পিঠ মোড়া করে বাঁধতে এবং নারী ও শিশুদেরকে তাদের কাছ থেকে আলাদা করে ফেলতে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালামকে দায়িত্ব দেন নারী ও শিশুদের দেখা শোনার। এরপর একত্রিত করা হয় তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও মালমাত্তা। দেখা যায়, সেখানে রয়েছে পনেরো শত তরবারী, তিনটি লৌহবর্ম, দুই হাজার বর্শা, চামড়ানির্মিত ছোটবড় পনেরো শত ঢাল এবং প্রচুর সাংসারিক তৈজসপত্র ও মদ্যভাণ্ড। মদ্যভাণ্ডগুলো চুরমার করে দেওয়া হয় সঙ্গে সঙ্গে। তাদের উট ও গৃহপালিত পশুর সংখ্যাও ছিলো অনেক। রসুল স. সব কিছু দেখলেন। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলো আউস গোত্রের কিছু লোক। বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! বনী কুরায়জা ছিলো আমাদের মিত্র, খাজরাজদের নয়। আপনার নিশ্চয় স্মরণ আছে খাজরাজ নেতা ইবনে উবায়ের মিত্র বনী কায়নুকার সঙ্গে আপনি কীরূপ শিষ্টাচার প্রদর্শন করেছিলেন। খাজরাজদের খাতিরে আপনি মার্জনা করে দিয়েছিলেন বনী কায়নুকার তিনশত নিরস্ত্র এবং চারশত সশস্ত্র লোককে। আমাদের মিত্র বনী কুরায়জা তাদের কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত। সুতরাং আজ আমাদের খাতিরে তাদেরকে আপনি দয়া করে মার্জনা করে দিন। রসুল স. নিশ্চুপ রইলেন। তারা তবুও জেদ করতে লাগলো। রসুল স.

এবার মুখ খুললেন। বললেন, আচ্ছা, তোমরা কি এটাই উত্তম মনে করো না যে, বিষয়টির নিষ্পত্তি ঘটুক তোমাদের গোত্রের কারো মাধ্যমে? তারা সানন্দে বলে উঠলো, নিশ্চয়ই। তিনি স. বললেন, ঠিক আছে তাহলে সা'দ ইবনে মুয়াজই এ ব্যাপারে মীমাংসা করে দিক। উকবার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তখন বললেন, আমার সাহাবীগণের মধ্যে যাকে তোমরা ভালো মনে করো, তাকেই নির্বাচন করো মীমাংসাকারীরূপে। তখন তাঁরাই মীমাংসাকারীরূপে নির্বাচন করলো হজরত সা'দ ইবনে মুয়াজকে।

পরিখার যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন হজরত সা'দ ইবনে মুয়াজ। সাহাবীয়া হজরত রফীদার শুশ্রূশাধীনে তখন তাঁর তাঁবুতেই অবস্থান করছিলেন তিনি। উল্লেখ্য, হজরত রফীদা ছিলেন স্বেচ্ছাসেবিকা। কোনো পার্থিব বিনিময়ের আশায় নয়, কেবল আল্লাহ্‌র পরিতোষ অর্জনার্থে তিনি পরিচর্যা করতেন যুদ্ধাহত সাহাবীগণের। আউস গোত্রের নেতারা তাঁর তাঁবুতেই হজরত সা'দ চিকিৎসাধীন রয়েছেন জানতে পেরে সেদিকেই এগিয়ে গেলো। কাছে গিয়ে বললো, রসুল স. এর নির্দেশে তাঁকেই মীমাংসা করে দিতে হবে বনী কুরায়জার সমস্যাটির। হজরত সা'দ ইবনে মুয়াজ অগত্যা গাত্রোত্থান করলেন। তখনো তিনি পুরোপুরি নিরাময় হননি বলে তারা তাঁকে উঠিয়ে নেয় একটি তেজী গর্দভের উপর। গাধাটির পিঠে ছিলো পশমী কম্বলের সুদৃশ্য গদি। লাগাম ছিলো খেজুর গাছের আঁশের। হজরত সা'দ ছিলেন বেশ মোটাসোটা। আউস গোত্রের লোকেরা তাঁকে পরিবেষ্টন করে নিয়ে চললো বিচারস্থলের দিকে। যেতে যেতে তাঁকে লক্ষ্য করে তারা বললো, আবু আমর! আল্লাহ্‌র রসুল আপনার মিত্রভাইদের বিচারমীমাংসার ভার অর্পণ করেছেন আপনারই উপর। বুঝতেই পারছেন বনী কুরায়জার প্রতি শিষ্ট আচরণ প্রদর্শন করাই আল্লাহ্‌র রসুলের এমতো নির্বাচনের উদ্দেশ্য। সুতরাং এ বিষয়টি আপনি উপেক্ষা করবেন না। দেখেছেন তো ইতোপূর্বে ইবনে উবাইয়ের মিত্রদের সঙ্গে কীরূপ নম্র আচরণ প্রদর্শন করা হয়েছিলো। হজরত সা'দ কোনো কথা বললেন না। কিন্তু তারা বার বার এধরনের কথা বলে তাঁকে উত্যক্ত করতেই থাকলো। শেষে তিনি অতিষ্ট হয়ে বললেন, আমি তো দায়িত্ব পালন করবো আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে। সুতরাং এ ব্যাপারে কারো নিন্দা-প্রশংসার তোয়াক্কা আমি করি না। একথা শুনে জুহাক ইবনে খলিফা আনসারী ও অন্যান্যরা প্রমাদ গুণলেন। বললেন, আক্ষেপ! গোত্ররঞ্জনের দিন এবার শেষ। এদিকে হজরত সা'দের দৃঢ় ও নিরপেক্ষ মনোভাবের কথা প্রচার হয়ে গেলো আউস গোত্রীয়দের মধ্যে। আর ওদিকে জুহাক গিয়ে বনী কুরায়জাদেরকে সংবাদ দিলো, এবার তাদের আর রক্ষা নেই।

বোখারী ও মুসলিমের গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, দুর্গ অবরোধকালে রসুল স. বনী কুরায়জার বসতিতে নির্মাণ করেছিলেন একটি মসজিদ। হজরত সা'দ সেখানে

উপস্থিত হওয়ার প্রাক্কালে রসুল স. বললেন, হে আউস সম্প্রদায়। তোমরা তোমাদের নেতাকে দণ্ডায়মান হয়ে অভ্যর্থনা জানাও। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি স. বললেন, তোমাদের উত্তম স্বজনের সম্মানে দাঁড়িয়ে যাও। মুহাজিরগণের অভিমত্যানুসারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো কেবল আনসারগণকে উদ্দেশ্য করে। আর আনসারগণের অভিমত হচ্ছে, নির্দেশটি ছিলো সাধারণ। অর্থাৎ মুহাজির— আনসার সকলের উপরেই প্রযোজ্য ছিলো নির্দেশটি। ইমাম আহমদের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তখন আজ্ঞা করলেন, তোমাদের নেতাকে বরণ করার উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হও। বনী আবদে আশহালের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এর আদেশ পালনার্থে আমরা তখন সকলেই দণ্ডায়মান হলাম সারিবদ্ধ হয়ে।

হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, এরপর রসুল স. বললেন, সা'দ! বনী কুরায়জার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দাও। সা'দ বললেন, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তদানের অধিকারী তো আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুল। রসুল স. বললেন, সেই অধিকার এখন অর্পিত হলো তোমার উপর। সুতরাং প্রদান করো ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা। সা'দ একথা শুনে মুখোমুখি হলেন উপস্থিত জনমণ্ডলীর। বললেন, হে আনসার ও আউস ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমরা কি আমার সিদ্ধান্ত নির্বিবাদে মান্য করবে? জনতা জবাব দিলো, নিশ্চয়ই। আমরা তো তোমার অনুপস্থিতিতেই তোমাকে বিচারক মনোনীত করেছি। আর আমরা এমতো আশাও পোষণ করি যে, তুমি আমাদের প্রতি সদয় হবে, যেমন ইবনে উবাই সদয় হয়েছিলো তার মিত্রপক্ষীয় বনী কাইনুকার প্রতি। সা'দ বললেন, আবার ভেবে দেখো, তোমরা কি আল্লাহ্র সঙ্গে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, আমার সিদ্ধান্ত অবশ্যই মাননীয়? আনসার ও আউস জনতা সমস্বরে বলে উঠলো, অবশ্যই, অবশ্যই। এবার সা'দ তাঁর পাশে উপবিষ্ট মহামান্য রসুলের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, আমার পাশে উপবিষ্ট যিনি, তিনিও কি এব্যাপারে একমত? রসুল স. জবাব দিলেন, নিঃসন্দেহে। সা'দ এবার ঘোষণা দিলেন, বনী কুরায়জার প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদেরকে হত্যা করতে হবে। আর তাদের নারী ও শিশুরা হবে মুসলমানদের দাস-দাসী। তাদের ধনসম্পদও বণ্টন করে দেওয়া হবে মুসলমানদের মধ্যে। আর তাদের বসতবাটির অধিকারী হবে মুহাজির ও আনসারগণ। রসুল স. তাঁর এই রায় শুনে বললেন, তোমার সিদ্ধান্ত সপ্তাকাশ থেকে অবতীর্ণ আল্লাহ্র সিদ্ধান্তের অনুরূপ। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তখন বললেন, আজ অতি প্রত্যুষে এই সিদ্ধান্তই আমাকে জানিয়ে দিয়েছে আল্লাহ্র এক ফেরেশতা।

সেদিন সকালেই রসুল স. এর নির্দেশে কার্যকর করা হলো বিচারের রায়। হত্যা করা হলো বনী কুরায়জার সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে। আর আহত সাহাবী হজরত সা'দ ওই রাতেই দোয়া করলেন, হে আমার আল্লাহ্! যদি আর কখনো

কুরায়েশদের সঙ্গে আমাদের মোকাবিলা করতে হয়, তবে তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রেখো। আমার বড় সাধ, আমি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করি। তারা যে তোমার রসুলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। দিয়েছে অনেক দুঃখক্লেশ। শেষে বহিষ্কার করেছে তাঁকে তাঁর জন্মভূমি থেকে। তাই তাদের মুখোমুখি আমি হবোই। আর যদি কুরয়েশদের সঙ্গে আর যুদ্ধের প্রয়োজন না থাকে, তবে এই আঘাতকেই তুমি নির্ণয় করো আমার শাহাদাতের অজুহাতরূপে। তবে আমার মিনতি এতটুকুই, তাদের ধ্বংস প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত তুমি আমাকে মৃত্যু দিয়ো না। উল্লেখ্য, কুরায়েশদের না হলেও আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের দুশমন বনী কুরায়জার ধ্বংস প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন।

বনী কুরায়জার দুর্গ অবরোধের সমাপ্তি ঘটলো জিলহজ মাসের পাঁচ তারিখে বুধবারে। রসুল স. প্রত্যাবর্তন করলেন স্বগৃহে। তাঁর নির্দেশে বন্দীদেরকে আটকে রাখা হলো হজরত রমলা বিনতে হারেছের গৃহাঙ্গণে। পরদিন সকালে তিনি স. গমন করলেন বাজারের দিকে। নির্দেশ দিলেন আবুল জুহুম আদুবীর বাড়ীর পাশ থেকে আদুহ্জারুয ষাইত পর্যন্ত একটি লম্বা ও গভীর গর্ত খননের। গর্ত খনন শেষ হলে বললেন, ওদেরকে একজন একজন করে গর্তে বসিয়ে হত্যা করা হোক। তাদেরকে বধ করার জন্য প্রস্তুত হলেন হজরত আলী ও হজরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম। প্রথমে হাজির করা হলো হুয়াই ইবনে আখতাবকে। তার দু'হাত ছিলো পিছ মোড়া দিয়ে বাঁধা। আর পরনে ছিলো তার মৃত্যুদণ্ডকালীন পোশাক। পোশাকটিকে সে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে আগেই এমনভাবে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিলো, অন্য কেউ যেনো পোশাকটি ব্যবহার করতে না পারে। রসুল স. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ্র দুশমন! বলো এবার, আল্লাহ্ তোমাকে আমার কর্তৃত্বাগত করেছেন কিনা? হুয়াই বললো, অবশ্যই। তবে হে মোহাম্মদ! স্মরণ রাখবেন, আমি কিন্তু আপনাকে হেয় মনে করিনি। বরং সমকক্ষ মনে করেই মোকাবিলা করতে চেয়েছি আপনাকে। কিন্তু বিধি বাম। আল্লাহ্র অনুমোদন আপনার পক্ষে। সুতরাং আপনার উপরে প্রবল হতে পারবে কে? এরপর সে অন্যান্য বন্দীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, উপস্থিত জনতা! আল্লাহ্র বিধানে কোনো অমঙ্গল নেই। বনী ইসরাইলদের উপরে যা ঘটতে চলেছে, তা তাদের অনড় বিধিলিপি। আল্লাহ্র অমোঘ নির্ধারণ। একথা বলেই সে গর্তে প্রবেশ করে বসে পড়লো। পরক্ষণেই উড়িয়ে দেওয়া হলো তার গর্দান।

দুপুর হলো। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে ঝলসে যেতে লাগলো চরাচর। রসুল স. নির্দেশ করলেন, এখন বিরতি দাও। সকলে তৃষ্ণার্ত। সুতরাং পানি পান করো। বন্দীদেরকেও পান করাও। নির্দেশ প্রতিপালিত হলো। মধ্যাহ্নের বিরতি ও বিশ্রামের পর রসুল স. পুনরায় বধ্যভূমির সন্নিকটে উপস্থিত হলেন। পুনরায় শুরু

হলো বন্দীনিধন। প্রথমে আনা হলো কা'ব ইবনে আসাদকে। রসুল স. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী হে কা'ব! ইবনে জাওয়াস কি যথাসময়ে তোমাদেরকে সদুপদেশ দেয়নি? সে কি বলেনি যে, আমার আনুগত্য স্বীকারের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা? কা'ব বললো, হে আবুল কাসেম! তওরাতের শপথ! ইবনে জাওয়াস যথাসময়ে আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলো। কিন্তু আমার স্বজাতি আমাকে ধিক্কার দিয়ে বলবে, মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে আমি আপনার অনুগত হয়েছি; তারা যদি এরকম না বলতো, তবে অবশ্যই আমি আনুগত্য স্বীকার করতাম আপনার। আমি তো এখনো বিশুদ্ধ ইহুদী ধর্মমতের উপরে প্রতিষ্ঠিত। রসুল স. নির্দেশ দিলেন, একে নিয়ে যাও। কা'বকে গর্তের ভিতর নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেওয়া হলো। পরক্ষণেই কর্তন করা হলো তার মস্তক। উল্লেখ্য, কেবল প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের উপরেই কার্যকর করা হয়েছিলো মৃত্যুদণ্ড। আর প্রাপ্ত বয়সের চিহ্নরূপে ধরা হয়েছিলো নাভির নিচের পশম গজানোকে। ইমাম আহমদ এবং সুনান প্রণেতাগণ লিখেছেন, আতীয়া কারাজী বলেছেন, তখন আমি ছিলাম বালক। নাভির নিচের পশম গজায়নি বলেই তখন আমাকে রেহাই দেওয়া হয়েছিলো।

তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আসলাম আনসারী বলেছেন, বালকেরা প্রাপ্তবয়স্ক কিনা, তা দেখবার ভার ছিলো আমার উপর। যে সকল বালকের নাভির নিচের পশম গজিয়েছে দেখতে পেতাম তাদেরকে আমি পাঠিয়ে দিতাম বধ্যভূমিতে। আর তা না দেখতে পেলে গণ্য করতাম তাদেরকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদরূপে।

রেফা ইবনে শামুয়েল কারাজী বয়োপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও রসুল স. তাকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। কারণ তার জন্য সুপারিশ করেছিলেন রসুল স. এর খালা উম্মে মুনজির। তিনি ছিলেন ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামিনীদের দলভূতা। দুই কেবলার দিকেই নামাজ পাঠের সৌভাগ্য নসিব হয়েছিলো তাঁর। রেফা তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করলে তিনি রসুল স. এর নিকটে নিবেদন জানালেন, হে দয়াল নবী। মেহেরবানী করে আপনি রেফাকে আমার হস্তে সম্প্রদান করুন। সে ভবিষ্যতে নামাজ পাঠ করবে, উটের গোশত ভক্ষণ করবে। মনে প্রাণে গ্রহণ করবে ইসলাম। রসুল স. তাঁর নিবেদন মঞ্জুর করলেন। সেই থেকে রেফা মানুষ হতে লাগলেন হজরত উম্মে মুনজিরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। পরবর্তী সময়ে তিনি হয়েছিলেন খাঁটি মুসলমান। নিধনপর্ব শেষ হতে হতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। সবকিছুই ঘটেছিলো হজরত সা'দ ইবনে মুয়াজের চোখের সামনে। এভাবেই আল্লাহ্‌পাক তাঁকে দেখিয়েছিলেন তাঁর দোয়ার বাস্তব রূপ।

সেদিন বনী কুরায়জার রমণীদের মধ্যে হত্যা করা হয়েছিলো কেবল বানানা নাম্নী এক রমণীকে। সে ছিলো বনী নাজির সম্প্রদায়ের মেয়ে। কিন্তু তার বিয়ে হয়েছিলো বনী কুরায়জার এক যুবকের সাথে। তাদের দাম্পত্যপ্রণয় ছিলো অত্যন্ত গভীর। তখন অবরোধের শেষ পর্যায়। তাদের সকলেই বুঝলো, এবার আর তাদের নিস্তার নেই। বানানা তার স্বামীকে বললো, তোমাকে তো এবার আমার কাছ থেকে পৃথক করে ফেলা হবে। তাই যদি হয় তবে আমার আর বেঁচে থেকে কাজ কী? যুবক বললো, মোহাম্মদ জয়ী হলে তোমাকে হত্যা করবে না। করবে চিরদাসী। কারণ তার ধর্মে নারী হত্যার বিধান নেই। কিন্তু তুমি কারো দাসী হয়ে থাকবে, সে কল্পনাও আমার জন্য অসহনীয়। তার চেয়ে তুমি এক কাজ করো। ওই আটা পেশার যাঁতার চাকতিটি এখান থেকে নিচে গড়িয়ে দাও। যদি ওই চাকতির আঘাতে কোনো মুসলমান সৈনিক নিহত হয়, তবে সেই অপরাধে তোমাকে দেওয়া হবে মৃত্যুদণ্ড। আমি চাই তোমাকে মৃত্যুদণ্ডই দেওয়া হোক। বানানা তার স্বামীর কথামতো যাঁতার চাকতিটি দুর্গের একটি ফোকর দিয়ে নিচে গড়িয়ে দিলো। বাইরে তখন মধ্যাহ্নের প্রখর উত্তাপ। ওই সময় মুসলিম সৈন্যদের অনেকে দুর্গের দেয়ালের ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলো। চাকতি সোজা গড়িয়ে পড়লো সেরকম বিশ্রামরত এক সৈনিকের মাথায়। ফলে অল্পক্ষণের মধ্যে শাহাদত বরণ করলেন তিনি।

ওরওয়ার বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, যখন বনী কুরায়জার পুরুষদেরকে হত্যা করা হয়, তখন বানানা ছিলো আমার কাছে। প্রায় সারাক্ষণ হাস্য-কৌতুকে মেতে থাকা ছিলো তার স্বভাব। ওদিকে তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করা হচ্ছিলো, আর সে মাঝে মাঝেই কৌতুক করে বলছিলো, কী মজা! আজ বনী কুরায়জার পুরুষদেরকে বধ করা হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর বাইরে থেকে আওয়াজ এলো, বানানা কোথায়? সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো, এই যে আমি এখানে। আমি বললাম, হতভাগিনী! লোকটি তোমার কে? সে বললো, আমাকে ডাকা হচ্ছে হত্যা করার জন্য। আমি বললাম, কী কারণে? সে বললো, নিশ্চয় কোনো অপরাধ করেছি। জননী আয়েশা আরো বলেছেন, যার উপরে মৃত্যুর পরওয়ানা ঝুলছে, তার এরকম আনন্দ-উচ্ছলতা করার কথা আমি জীবনে শুনিনি। তার কথা আমার আজও মনে পড়ে যায়।

একটি সমস্যা ও তার সমাধান ঃ জমহুরের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, ভারী কোনো বস্তুর আঘাতে কাউকে হত্যা করলে কিসাস (হত্যার বদলে হত্যা) কার্যকর হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন, এমতোক্ষেত্রে কিসাস প্রযোজ্য নয়, যদিও আবু কুবাইসের মতো বৃহৎপাহাড়ের আঘাতে কাউকে হত্যা করা হয়। হত অথবা আহত হওয়ার ক্ষেত্রে কিসাস কার্যকর করা যাবে তখন, যখন ব্যবহার করা হবে

ধারালো কোনো অস্ত্র। সুরা বাকারায় 'কুতিবা আ'লাইকুমুল ক্বিসাস' আয়াতের তাফসীরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যথা স্থানে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

জুহুরী সূত্রে মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, মূর্খতার যুগে সংঘটিত বুআছ যুদ্ধের সময় বনী কুরায়জার যোবায়ের ইবনে বাতা বন্দী করেছিলো হজরত সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মামকে। কিন্তু সে তাঁকে হত্যা করেনি। বরং ছেড়ে দিয়েছিলো মস্তকের সামান্য কেশ কর্তন করে। তাদের দুর্গ অবরোধকালে যোবায়ের হয়ে গিয়েছিলো বৃদ্ধ। হজরত সাবেত তাকে চিনতে পেরে বললেন, হে আবু আবদুর রহমান! আমার কথা কি তোমার মনে আছে? আমি সাবেত। বৃদ্ধ যোবায়ের বললো, আমি কি তোমার কথা ভুলতে পারি। হজরত সাবেত বললেন, সেদিন আপনি আমাকে বধ না করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আজ আমি সে অনুকম্পার বিনিময় দিতে চাই। বৃদ্ধ বললো, মহৎব্যক্তিগণ তো এরকমই করেন। কল্যাণের বিনিময়ে দান করেন কল্যাণ। হজরত সাবেত তৎক্ষণাৎ রসুল স. সকাশে উপস্থিত হলেন। বললেন, হে মহাবিশ্বের রহমতের প্রতিভূ! আমার প্রতি রয়েছে বৃদ্ধ যোবায়েরের একটি অপরিশোধিত মহানুভবতা। তিনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। আজ আমিও বাঁচাতে চাই তার প্রাণ। সুতরাং আমার সবিনয় আরজ, দয়া করে তার প্রাণ ভিক্ষা দিন। রসুল স. বললেন, তথাস্তু। হজরত সাবেত বৃদ্ধের নিকটে গিয়ে বললেন, রসুল স. আপনার জীবন ভিক্ষা দিয়েছেন। সে বললো, আমি তো বৃদ্ধ। তদুপরি পরিবার পরিজনহীন। এভাবে একা একা বাঁচা কি সম্ভব? হজরত সাবেত পুনরায় ছুটে গেলেন রসুল স. সকাশে। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! যোবায়েরের পরিবার পরিজন বন্দী। দয়া করে তাদেরকে ছেড়ে দিন। রসুল স. বললেন, তাই করা হলো। হজরত সাবেত এবারে প্রায় দৌড়ে গিয়ে শুভসংবাদটি জানালেন যোবায়েরকে। সে এবার বললো হেজাজের কারো গৃহে যদি সাংসারিক সরঞ্জাম না থাকে, তবে সে জীবন ধারণ করবে কী করে? হজরত এবারো ছুটলেন রসুল স. এর কাছে। তিনি স. এবার যোবায়েরের বাজেয়াপ্ত করার মাল-সামানও ফেরত দিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ যোবায়ের এতেও নিরস্ত হলো না। বললো, সাবেত! ওই লোকটির তাহলে কী হবে, যে আমার জীবনের প্রতিচ্ছবি? সমাজের দিকদর্শন? আমি বলছি সেই কা'ব ইবনে আসাদের কথা। হজরত সাবেত বললেন, তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। বৃদ্ধ বললো, আর ওই লোকটি, সে ছিলো শহর বন্দর প্রান্তরের নেতা। সকলের কাছেই তো সে শ্রদ্ধার্হ। যুদ্ধের সময় সে সৈনিকদেরকে যোগাড় করে দিতো বাহন। অনটনের সময় যোগাতো আহার্য। সেই হুয়াই ইবনে আখতাব? তার খবর কী? হজরত সাবেত বললেন, একই পরিণতি লাভ করেছে সে-ও। বৃদ্ধ বললো, তাহলে বলো

গাজালা ইবনে শামুয়েলের সংবাদ। সে তো থাকতো সকল যুদ্ধে অগ্রগামী। চরম সংকটকালেও সে যুদ্ধ করতো কখনো বামে, আবার কখনো দক্ষিণে অবস্থান নিয়ে। হজরত সাবেত বললেন, সে-ও এখন বিগত। বৃদ্ধ এবার বললো, বনী কা'ব ইবনে কুরায়জা এবং বনী আমর ইবনে কুরায়জার সম্মেলন কেন্দ্রের সংবাদ কী? হজরত সাবেত বললেন, সম্মেলনকারীরাই তো বিপদিত। সুতরাং সম্মেলন ডাকবে কে? কেই-বা হাজির হবে সম্মেলন কেন্দ্রে? বৃদ্ধ বললো, সাবেত! শোনো, আমি যদি তোমার সামান্য ইষ্টও করে থাকি, তাহলে আমার মিনতি রক্ষা করো। আমাকেও পাঠিয়ে দাও তাদের কাছে। শপথ আল্লাহ্‌র! জীবনের প্রতি আমার আর কোনোই আগ্রহ নেই। যাদের নাম করলাম, তাদেরকে যখন দেখবো না, দেখবো কেবল তাদের শূন্য গৃহগুলো, তখন হাহাকার করে উঠবে আমার হৃদয়। আমি তা সহ্য করতে পারবো না। সুতরাং ভাই সাবেত! অনুরোধ করি, আমার অবর্তমানে তুমি একটু খেয়াল রেখো আমার পরিবার-পরিজনদের প্রতি। তোমার সাথীদেরকে বোলো, তারা যেনো তাদেরকে মুক্ত জীবনযাপনের অধিকার দেয়। আর তোমার প্রতি আমার এখনো যে অধিকারটুকুও বর্তমান আছে, তার দোহাই দিয়ে বলছি, অতি সত্বর আমাকে পাঠিয়ে দাও আমার সুহৃদ ও সঙ্গী সাথীদের কাছে। বিলম্ব যে অসহনীয়। ইবনে ইসহাক বলেছেন, হজরত সাবেত তার অভিপ্রায় পূরণ করেছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিভিয়ে দিয়েছিলেন তার প্রিয়জনবিচ্ছেদের যাতনা।

মোহাম্মদ ইবনে আমর বর্ণনা করেছেন, হজরত সাবেত তখন বললেন, যোবায়ের! তোমাকে হত্যা করা আমার সাধ্য বহির্ভূত। বৃদ্ধ যোবায়ের বললো, আরে রেখে দাও তোমার অজুহাত। কার হাতে আমি নিহত হলাম, সে ভাবনা আমার নেই। শেষে তার মস্তক ছেদন করলেন হজরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম। বৃদ্ধ যোবায়েরের স্বজন মিলনের অত্যুগ্র আগ্রহের কথা শুনে হজরত আবু বকর মন্তব্য করলেন, সে তার সুহৃদ স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হবে জাহান্নামে।

এরপর বনী কুরায়জার যাবতীয় সম্পদ বণ্টন করা হলো মুসলিম সৈনিকদের মধ্যে। মুসলামানদের সেনাসংখ্যা ছিলো তিন হাজার। তারমধ্যে ছত্রিশজন ছিলেন অশ্বারোহী এবং অবশিষ্টরা পদাতিক। তাই সমুদয় সম্পদ ভাগ করা হলো তিন বায়াত্তর ভাগে। শেষে বণ্টন করা হলো এভাবে— অশ্বারোহী দুই অংশ এবং পদাতিকেরা এক, রসুল স. এর তিনটি ঘোড়া ছিলো। কিন্তু তিনি স. অংশ নিয়েছিলেন কেবল একটি ঘোড়ার জন্য। একারণেই ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী বলেন, একজন সৈনিকের একাধিক ঘোড়া থাকলেও সে অংশ পাবে কেবল একটির জন্য। আর ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ বলেন, একজন সৈনিকের দুইয়ের অধিক ঘোড়া থাকলেও সে অংশ পাবে কেবল

দুইটি ঘোড়ার জন্য। উল্লেখ্য, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বণ্টনবিধি সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা সন্নিবেশ করা হয়েছে সুরা আনফালের তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

রসুল স. শহীদ খাল্লাদ ইবনে সুয়াইদের অংশও নির্ধারণ করেছিলেন। তাঁকে শহীদ করেছিলো ইহুদী রমণী বানানা। আবার অবরোধে অংশগ্রহণ করলেও স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণকারী হজরত সামান ইবনে মুহসীনের জন্যও অংশ নির্ধারণ করেছিলেন তিনি স.। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইমামত্রয় অভিমত প্রকাশ করেন, কোনো মুসলমান যুদ্ধে অংশ নেয়ার পর শত্রুদের পরাজয় অথবা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুসলিম রাষ্ট্রে একত্র করার আগে যদি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তার জন্যও অংশ নির্ধারণ করতে হবে।

উন্নত সূত্রসহযোগে ইবনে আবী শায়বা বর্ণনা করেছেন, গণিমতের অংশ সে-ই পাবে, যে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে। তিবরানী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সুউন্নত উন্নত উভয় প্রকার সূত্রসহযোগে। তবে তাঁর বর্ণনাটিকে উন্নত বলাই হবে অধিকতর সমীচীন। কারণ বর্ণনাটি উন্নীত হয়েছে হজরত ওমর পর্যন্ত। আবার ইমাম শাফেয়ীর বর্ণনাপরম্পরা উন্নীত হয়েছে হজরত আবু বকর পর্যন্ত।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, গণিমতের মাল মুসলিম রাষ্ট্রে এনে একত্র করার পর তা বিলি-বণ্টন করতে হবে। এর পূর্বে কোনো সৈনিক স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করলে অথবা নিহত হলে তার জন্য গণিমতের অংশ নির্ধারণ করা যাবে না। ফলে তাদের উত্তরাধিকারীও কিছু পাবে না। কিন্তু সাহায্যকারী বাহিনী যদি গণিমত একত্র করার পূর্বে শত্রুদেশে পৌঁছে যায়, তবে গণিমতের অংশ পাবে তারাও।

একটি সমীক্ষা ঃ জমহুর বলেন, অশ্বারোহী সৈনিককে দিতে হবে তিনটি অংশ। এক অংশ তার এবং দুই অংশ তার ঘোড়ার। ইমাম আবু হানিফা বলেন, অশ্বারোহীর অংশ দুটি— একটি তার এবং অপরটি তার ঘোড়ার। অবশ্য বনী কুরায়জার যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বণ্টনবিধি জমহুরের অভিমতের পক্ষে এবং ইমাম আবু হানিফার বিপক্ষে।

উপযোগ ঃ রসুল স. যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ (খুমুস) গ্রহণ করতেন। সেখান থেকে তিনি কাউকে মুক্ত করে দিতেন, অথবা কাউকে দান করে দিতেন। বনী কুরায়জার যুদ্ধের গণিমত হিসেবে তিনি তাদের খেজুর বাগানের এক পঞ্চমাংশও গ্রহণ করেছিলেন। আর বাগানের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছিলেন মাহমীয়া ইবনে জামুস জুবাইদিকে। অবশিষ্ট চার অংশ তিনি স. বণ্টন করে দিয়েছিলেন অবরোধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের মধ্যে।

যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী রমণীগণের জন্য রসুল স. কোনো অংশ নির্ধারণ করতেন না। তবে তাঁদেরকে আলাদাভাবে কিছু দিয়ে দিতেন। বনী কুরায়জার অবরোধে

যে সকল মহিয়সী রমণী অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন সর্বহজরত সাফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব, উম্মে আম্মারা, নাসিয়াহ, উম্মে আলা আনসারী, উম্মে সলীত, সুমাইয়া বিনতে কায়েস, উম্মে সা'দ ইবনে মুয়াজ এবং কাবশা বিনতে রাফে।

রসুল স. তখন হজরত সা'দ ইবনে উবাদার দায়িত্বে কিছু বন্দীকে বাজারে পাঠিয়েছিলেন তাদেরকে বিক্রয় করবার জন্য। উদ্দেশ্য ছিলো বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে কিনবেন কিছু অস্ত্রশস্ত্র। এরকম বলেছেন মোহাম্মদ ইবনে ওমর। তবে ইবনে ইসহাক বলেছেন, তিনি বন্দীবিক্রয়ের জন্য দায়িত্ব দিয়েছিলেন হজরত সাঈদ ইবনে জায়েদ আনসারীকে। আর বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে তিনি স. ক্রয় করেছিলেন ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র। যৌথ উদ্যোগে কিছু বন্দিনী ক্রয় করে ছিলেন হজরত ওসমান ইবনে আফ্ফান এবং হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ। তারপর তাঁরা বন্দিনীকে দুই ভাগে বিভক্ত করলেন। একভাগে রাখলেন বৃদ্ধা এবং অপরভাগে রাখলেন যুবতীদেরকে। বৃদ্ধাদের ভাগটি গ্রহণ করলেন হজরত ওসমান। ফলে তিনি হয়ে গেলেন প্রভূত সম্পদের অধিকারী। কারণ ওই বৃদ্ধারা ছিলো সম্পদ শালিনী। ইবনে সীরা লিখেছেন, ওই বৃদ্ধাদের নিকট থেকে সম্পদ পাওয়া গিয়েছিলো দীর্ঘ একমাস পর। তাই ওই সম্পদকে গণিমতের অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। হজরত ওসমান তাদেরকে ক্রয় করে প্রত্যেকের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন মুক্তিপণ। মুক্তিপণ পরিশোধের সময়ও বেঁধে দিয়েছিলেন তিনি। আর যথাসময়ে মুক্তিপণ যারা দিতে পেরেছিলো, তাদেরকে তিনি মুক্তিও দিয়েছিলেন যথারীতি।

বন্দিনীদের নিকট থেকে তাদের শিশু সন্তানদেরকে পৃথক করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন রসুল স. বণ্টনের সময়ে হোক অথবা বিক্রয়ের সময়ে। বলেছিলেন, মাতার নিকট থেকে তার সন্তান-সন্ততিকে পৃথক কোরো না, যতক্ষণ না শিশুরা বয়োপ্রাপ্ত হয়। জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, হে আল্লাহ্র রসুল! বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার চিহ্ন কী? তিনি স. বললেন, মেয়েরা যখন ঋতুবর্তী হয় এবং ছেলেদের যখন শুরু হয় স্বপ্নদোষ। হজরত উবাদা ইবনে সামেত থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং প্রত্যয়ন করেছেন হাকেম। হাদিসটি এরকম— রসুল স. বললেন, বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে শিশুদেরকে তাদের মাতাদের নিকট থেকে আলাদা কোরো না। নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! বয়োপ্রাপ্ত হয় কখন? তিনি স. বললেন, যখন বালিকারা হয় ঋতুবর্তী এবং বালকদের শুরু হয় স্বপ্নদোষ। ইবনে জাওজী বলেছেন, তিবরানী মন্তব্য করেছেন, হাদিসটির সূত্রপ্রবাহভূত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে হাসান বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। আলী ইবনে মাদামী তাকে দায়ী করেছেন অসত্যভাষণের দায়ে।

তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু আইয়ুব আনসারী বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো শিশুকে তার মাতা থেকে বিচ্ছিন্ন করবে, আল্লাহ্ তাকে তার প্রিয়জন থেকে বিচ্ছিন্ন করবেন মহাবিচারের দিবসে। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি উত্তম ও বিরল শ্রেণীর। হাকেম হাদিসটি প্রত্যয়ন করেছেন ইমাম মুসলিমের পদ্ধতিতে। তবে এর সূত্রপরম্পরা সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। কেননা এই সূত্রপরম্পরাভূত হুয়াই ইবনে আবদুল্লাহ্র কোনো বর্ণনাই বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থগুলোতে সংকলিত হয়নি। হাদিসটি তিরমিজি কর্তৃক প্রত্যয়িত হয়নি সেকারণেই। হাকেম তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থে হাদিসটি সংকলন করেছেন হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন থেকে। তিনি বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন যে ব্যক্তি কোনো শিশুকে তার মাতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, সে অভিশপ্ত। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। তবে এর সূত্রপরম্পরাভূত এক বর্ণনাকারী তালীক ইবনে মোহাম্মদ থেকে বিভিন্নভাবে তিনি হাদিসটি উপস্থাপন করেছেন। কখনো করেছেন হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন থেকে তালীকের মাধ্যমে, কখনো হজরত আবী বুরদা থেকে তালীকের মাধ্যমে,আবার কখনো কোনো তালীক থেকে রসুল স. পর্যন্ত অপরিণতসূত্রে। এমতোসূত্রপরম্পরা বৈষম্যের সমাধানার্থে বলা যেতে পারে, তালীক হাদিসটি শুনেছেন হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন এবং হজরত আবী বুরদা উভয়ের নিকট থেকে। ইবনে কাত্তান বলেছেন, তালীক কোনো সুপরিচিত বর্ণনাকারী নন। কাজেই তাঁর বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, সূত্রপরম্পরাটিকে অনির্ভরযোগ্য প্রমাণ করার উদ্দেশ্যেই ইবনে কাত্তান এরকম মন্তব্য করেছেন। নতুবা হাদিসটি তো আরো অনেক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ওই বর্ণনাগুলোর শব্দবিন্যাস বিভিন্ন রকমের হলেও সেগুলোর মর্মার্থ এক। অর্থাৎ মাতার নিকট থেকে তার শিশুকে পৃথক করে ফেলা নিষেধ।

স্বসূত্রে দারাকুতনী মায়মুন ইবনে আবু শোয়াইব থেকে উল্লেখ করেছেন, হজরত আলী একবার এক ক্রীতদাসীকে বিক্রয় করার সময় তার শিশুসন্তানকে পৃথক করে ফেললেন। রসুল স. একথা শুনতে পেয়ে ওই বিক্রয় ও বিক্রয়চুক্তিকে বাতিল করে দিলেন। আবু দাউদ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আলী ও মায়মুন ইবনে আবু শোয়াইবের উল্লেখ ব্যতিরেকে প্রায়োন্নত সূত্রে। ইবনে হুম্মান বলেছেন, প্রায়োন্নত সূত্রপরম্পরাগত হাদিস আমাদের নিকট অগ্রাহ্য নয়। আবার হাকেম হাদিসটি যথাসূত্রেই বর্ণনা করেছেন। আর একে প্রাধান্য দিয়েছেন বায়হাকীও।

মাসআলা ঃ বর্ণিত হাদিসসমূহের প্রেক্ষিতে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, দু'টি অপ্রাপ্তবয়স্ক ক্রীতদাস, যারা পরস্পর রক্তসম্পর্কিত স্বজন, তাদেরকে বিক্রয় বা

দানসূত্রে পৃথক করে দেওয়া যাবে না। তেমনি ঔরষজাত সম্পর্কীয় প্রাপ্তবয়স্ক ও অপ্রাপ্তবয়স্কের মধ্যেও ঘটানো যাবে না বিচ্ছেদ। এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। ইমাম আহমদ বলেছেন ঔরষজাত সম্পর্কীয় দুইজন প্রাপ্তবয়স্ক হলেও তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। ইমাম মালেকের অভিমত হচ্ছে, পৃথকীকরণ নিষিদ্ধ হওয়ার বিধানটি প্রযোজ্য হবে কেবল মা ও শিশুর ক্ষেত্রে। আর ইমাম শাফেয়ীর অভিমত হচ্ছে শিশুসন্তানকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করা যাবে না তার মাতৃবংশীয় অথবা পিতৃবংশীয়দের নিকট থেকে। যেমন— পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতা, মাতামহ, প্রমাতামহ এরকম আরো ঊর্ধ্বতন মাতৃবংশীয় ও পিতৃবংশীয়।

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদ পৃথকীকরণের অন্তরায় হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন বৈবাহিক নিষিদ্ধতার সম্পর্ককে। অর্থাৎ শিশুকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না কেবল তাদের নিকট থেকে যাদের সঙ্গে তার বিবাহ নিষিদ্ধ। কোনো কোনো হাদিসে স্বজনের শাখা ও মূল ব্যতিরেকেও অন্যদের ক্ষেত্রে পৃথকীকরণের নিষিদ্ধতা আরোপিত হয়েছে। হজরত আলী বলেছেন, একবার রসুল স. আমাকে দান করলেন অপ্রাপ্তবয়স্ক দু'টো বালক। আমি তাদের একজনকে বিক্রয় করে দিলাম। পরে তাদের একজনকে দেখে তিনি স. বললেন, আলী! আর একজন কৈ? আমি বললাম, বিক্রি করে দিয়েছি। তিনি স. বললেন, শীগগির ওকে ফেরত নিয়ে এসো। তিরমিজি লিখেছেন, হাদিসটি উত্তম ও বিরল শ্রেণীর। কিন্তু আবু দাউদ এর সমালোচনা করেছেন। বলেছেন, এই হাদিসের সূত্রপ্রবাহভূত মায়মুন ইবনে শোয়াইব হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আলী থেকে। অথচ তিনি হজরত আলীর সমসাময়িক নন। আমরা বলি, তবে তো প্রমাণিত হয়, হাদিসটি প্রায়োন্নত পর্যায়ের। আর আমাদের নিকট প্রায়োন্নত সূত্রের হাদিসও প্রামাণ্যরূপে গণ্য। হাদিসটি আবার ভিন্নতর পদ্ধতিতে সংকলন করেছেন হাকেম ও দারাকুতনী। যেমন— আবদুর রহমান ইবনে আবী লাইস বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী বলেছেন, একবার রসুল স. এর সম্মুখে আনা হলো কিছুসংখ্যক বন্দীকে। তিনি স. বললেন, এর মধ্যে ওই দুই ভাইকে নিয়ে বিক্রয় করে দিয়ে এসো। আমি দু'জনকে নিয়ে বাজারে গেলাম এবং তাদেরকে বিক্রয় করে দিলাম পৃথক পৃথক বিক্রেতার কাছে। ফিরে এসে একথা রসুল স.কে জানাতেই তিনি বলে উঠলেন, এক্ষুণি যাও, ওদেরকে ফেরত নিয়ে এসো। ওদেরকে বিক্রয় করতে হবে একসঙ্গে। বোখারী ও মুসলিমের রীতি অনুসারে এই হাদিসের সূত্র প্রত্যয়ন করেছেন হাকেম। আর এ সূত্রকে ত্রুটিমুক্ত বলেছেন ইবনে কাত্তান। বলেছেন, আলোচ্য প্রেক্ষাপটে হাদিসটি উত্তম শ্রেণীভূত ও নির্ভরযোগ্য। ইমাম আহমদ ও বাযযার আবার হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ভিন্নতর সূত্রে। ইবনে হুম্মাম মন্তব্য

করেছেন, তাঁদের সূত্রে রয়েছে বিচ্ছিন্নতা। তবে এতে করে কিছু আসে যায় না আমাদের দৃষ্টিতে। দারাকুতনী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তালীক ইবনে ইমরান থেকে এবং তিনি আবী বুরদা থেকে এবং তিনি হজরত আবু মুসা থেকে এভাবে— রসুল স. অভিসম্পাত দিয়েছেন তাকে, যে বিচ্ছেদ ঘটায় মাতা ও তার শিশু সন্তানের মধ্যে এবং ভাই ও ভাইয়ের মধ্যে। উল্লেখ্য, হাদিসের মাধ্যমে যখন দুই ভাইয়ের নিষিদ্ধতা জানা গেলো, তখন বুঝতে হবে, পৃথকীকরণের নিষিদ্ধতার মূলসূত্র হচ্ছে স্বজন ও মুহরিম। তবে দুধপান সম্পকীয় মুহরিম এর মধ্যে পড়ে না। অর্থাৎ মুহরিম না হলে নিষিদ্ধতা কার্যকর হবে না। যেমন নিষিদ্ধতা প্রযোজ্য হবে চাচাতো ভাইয়ের ক্ষেত্রে।

সমাধান ঃ কেউ যদি বিক্রয়কালে মাতা ও সন্তানের বিচ্ছেদ ঘটায়, সে গোনাহ্গার। কিন্তু তার বিক্রয়চুক্তি অকার্যকর নয়। এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মোহাম্মদ। কিন্তু ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেছেন, তার ওই বিক্রয়চুক্তিও হবে বাতিল। জন্মসূত্রের স্বজনদের ক্ষেত্রেও বলবত হবে একই বিধান— এরকম বলেছেন ইমাম আহমদ। আর ইমাম আহমদ বলেছেন, বিশেষভাবে বিক্রয়চুক্তি পণ্ড হবে জন্মসূত্রের স্বজনদের বেলায়। তিনি আরো বলেছেন, জন্মসূত্রে অথবা অন্য যে কোনো সূত্রের আত্মীয়দের ক্ষেত্রেও পণ্ড হবে বিক্রয়চুক্তি। অবশ্য সূত্রগত পার্থক্যই এরকম মতপৃথকতার কারণ। অর্থাৎ কোনো সংকেত ছাড়া যদি শরিয়তসম্মত বিধানে নিষিদ্ধতা আরোপিত হয়, তবে ওই নিষিদ্ধতা শরিয়তের বিধানকে করে অকার্যকর। এটাই হচ্ছে ইমামত্রয়ের অভিমত। ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর সহচরদ্বয়ের অভিমতে এমতোনিষিদ্ধতা অনিবার্য করে বিশৃঙ্খলাকে। কিন্তু তা বিক্রয়চুক্তিকে পণ্ড বা নাকচ করে না। কারণ বিক্রয়চুক্তির শর্তগুলো থাকে তখনো বিদ্যমান। সুতরাং উভয়পক্ষের অনুমোদন সিদ্ধ না হওয়ার কারণ এক্ষেত্রে নেই। অতএব, বুঝতে হবে নিষিদ্ধতা এখানে বলবত হয়েছে বহিরাগত একটি কারণে। যেমন শুক্রবার জুমআর আজানের পর নিষিদ্ধ হয়ে যায় ক্রয়-বিক্রয়। আর বাহ্যিক কারণে নিষিদ্ধতা আরোপিত হলে মূল ক্রয়-বিক্রয়ে কোনো বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় না। তবে অনিবার্য কোনো দোষের কারণে নিষিদ্ধতা আরোপিত হলে বিক্রয়চুক্তি পণ্ড বা নাকচ হওয়ার বিষয়টি হয় অনিবার্য।

ইমাম আবু ইউসুফের অভিমতের ভিত্তি হচ্ছে ওই হাদিস, যেখানে রসুল স. হজরত আলীকে নির্দেশ করেছিলেন বিক্রিত বস্তু ফেরত আনার। আর এরকম নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে তখনই, যখন বিক্রয়চুক্তি হয়ে যায় বরবাদ। আর ইমাম আবু হানিফা ফেরত আনার নির্দেশটিকে গণ্য করেছেন নাকচ করার দাবিরূপে। এই নাকচ করার দাবি দ্বারা বানচাল হয়ে যায় ইতোপূর্বের বিক্রয়চুক্তি। আপনাআপনি প্রথম চুক্তি বানচাল হয় না।

সমাধান ঃ হজরত উবাদা ইবনে সামেত কর্তৃক বর্ণিত হাদিস দ্বারা প্রতীয়মান হয়, দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক দাসদাসীর মধ্যে যে কোনো রকমের আত্মীয়তা থাকুক না কেনো, তাদের উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা সিদ্ধ। ইমাম আহমদ বলেন, অসিদ্ধ। কারণ হাদিসের শব্দগুলো সাধারণার্থক। আবার বর্ণিত হাদিসের প্রতিবাদী হয়েছেন ইবনে জাওজী।

আমাদের দলিল হচ্ছে, হজরত সালমা ইবনে আযওয়া কর্তৃক বর্ণিত ওই হাদিস যেখানে বলা হয়েছে, একবার আমরা হজরত আবু বকরের নেতৃত্বে যাত্রা করলাম বনী ফাযারার যুদ্ধে। প্রতিপক্ষীয়রা আমাদের হাতে বন্দী হলো। তাদের মধ্যে ছিলো আরবের এক সেরা সুন্দরী। তার ক্রোড়ে ছিলো একটি ফুটফুটে শিশু কন্যা। হজরত আবু বকর ওই রমণীকে সম্প্রদান করলেন আমার হাতে। মদীনায় ফিরে এলে রসুল স. আমাকে বললেন, সালমা! শিশু কন্যাটি আমার অধিকারে দাও। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! সবকিছুই তো আপনার। রসুল স. তখন মেয়েটির বিনিময়ে মুক্ত করে নিয়ে ছিলেন তিনজন মুসলিম বন্দীকে।

এক বর্ণনায় এসেছে, মিসরের রাজা মকুকস্‌ একবার রসুল স. এর নিকটে উপঢৌকনরূপে প্রেরণ করলেন দু'জন তরুণীকে। তাঁদের একজনের নাম মারীয়া কিবতীয়া এবং অন্যজনের নাম সীরিন। রসুল স. সীরিনকে সম্প্রদান করলেন হজরত হাস্‌সান ইবনে সাবেতের হাতে। আর মারীয়াকে রাখলেন নিজের জন্য। সীরিন জননী হয়েছিলেন আবদুর রহমান ইবনে হাস্‌সানের এবং মারীয়া জননী হয়েছিলেন রসুল স. এর পবিত্র পুত্র ইব্রাহিমের।

সমাধান ঃ যদি শিশুর সঙ্গে তার পিতা-মাতা দু'জনই থাকে, তবে তাদের একজনকেও পৃথক করে বিক্রয় করা যাবে না। আর যদি তার মায়ের সঙ্গে থাকে ফুফু, খালা অথবা ভাই, তবে কেবল মা ছাড়া অন্য সকলকে পৃথক করে বিক্রয় করা সিদ্ধ হবে। এরকম বলা হয়েছে জাহিরুর রেওয়ায়েতে। কেননা মায়ের তুলনায় অন্যদের ভালোবাসা কিছুই নয়। আর যদি ভ্রাতা-ভগ্নি মিলে তারা থাকে ছয়জন, তবে তাদের একজন ছোট-একজন বড় এভাবে জোড়ায় জোড়ায় বিক্রয় করা যাবে। যদি অপ্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে থাকে দাদী, ফুফু ও খালা, তবে দাদী ছাড়া অন্যদেরকে আলাদা করে বিক্রয় করা যাবে। আর যদি দাদী ছাড়া কেবল থাকে ফুফু, তবে তাকে পৃথক করে বিক্রয় করা যাবে না। মূল সূত্র হচ্ছে, অপ্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে তার অধিকসংখ্যক নিকটজন থাকলে তাদের মধ্য থেকে দূরবর্তীদেরকে পৃথক করে বিক্রয় করা যাবে। আর যদি একই স্তরের হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্য থাকে, যেমন পিতা, মাতা, খালা, ফুফু, তবে কাউকেই পৃথক করে বিক্রয় করা যাবে না। এমতাবস্থায় সবাইকে বিক্রয় করতে হবে একসাথে। অথবা কাউকেই বিক্রয় করা যাবে না। কিন্তু যদি তারা

শ্রেণীগতভাবে এক হয়, যেমন দুই ভাই, দুজন চাচা, তবে অপ্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে তাদের যে কোনো একজনকে রেখে অন্যদের বিক্রয় করা হবে সিদ্ধ।

সমাধান ঃ 'সাবীলুর রাশাদ' গ্রন্থে বলা হয়েছে, বনী কুরায়জার বন্দীদের মধ্য থেকে মা ও তার শিশুসন্তানকে আরবের পৌত্তলিক ও ইহুদীদের কাছে বিক্রয় করা হয়নি। তাদেরকে বিক্রয় করা হয়েছিলো কেবল মুসলমানদের কাছে। এরকম করার কারণ এই যে, অপ্রাপ্তবয়স্করা পৌত্তলিক ও ইহুদীদের সঙ্গে বেড়ে উঠবে তাদের স্ব স্ব অপধর্মমতানুসারে। কিন্তু মুসলমানদের সংসারে ওই শিশুরা হয়ে যায় মুসলমান। আল্লাহ্ই সমধিক পরিজ্ঞাত।

বনী কুরায়জার অবরোধকালে শহীদ হয়েছিলেন কেবল দু'জন— হজরত খাল্লাদ ইবনে সুয়াইদ এবং হজরত মুনজির ইবনে মোহাম্মদ।

উপযোগ ঃ ওই অবরোধ যুদ্ধে বন্দিনী হয়েছিলেন রায়হানা নাম্নী বনী নাজির গোত্রের এক রমণী। তিনি ছিলেন বনী কুরায়জাদের এক যুবকের পত্নী। বন্দী-বণ্টনকালে তিনি পড়লেন রসুল স. এর ভাগে। রসুল স. তাঁকে ইসলামের প্রতি আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু তিনি সাড়া দিলেন না। রসুল স. আশাহত হলেন। হজরত ইবনে সাইয়াকে ডেকে বললেন, তুমি চেষ্টা করে দেখোতো দেখি, তার মতিগতি ফেরে কিনা। হজরত ইবনে সাইয়া বললেন, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! আপনার জন্য আমার পিতামাতা উৎসর্গীকৃত। আল্লাহ্র ইচ্ছা হলে দেখবেন, অচিরেই তিনি আসবেন ইসলামের আশ্রয়ে। একথা বলেই হজরত সাইয়া গমন করলেন রায়হানার নিকটে। বললেন, স্বজাতির চিন্তা মনে হয় পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। দেখলেন তো, হুয়াই ইবনে আখতাবের শোচনীয় পরিণতি। আল্লাহ্র রহমত যেদিকে, সেদিকে থাকাই তো উত্তম। তাই আমার পরামর্শ শুনুন। ইসলাম গ্রহণ করুন। হয়তো রসুল স. স্বয়ং আপনার পানি গ্রহণ করবেন। এটা কি আপনার জন্য পরম সৌভাগ্য নয়? রায়হানা এবার নরম হলেন। ওদিকে রসুল স. তখন উপবিষ্ট ছিলেন তাঁর প্রিয় সহচরবৃন্দ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে। হঠাৎ সেখানে শ্রুত হলো কারো আগমনের আওয়াজ। রসুল স. বললেন, মনে হচ্ছে এ পদশব্দ ইবনে সাইয়ার। মনে হয় সে আগমন করছে রায়হানার ইসলাম গ্রহণের শুভসংবাদ নিয়ে। বলতে বলতেই হজরত ইবনে সাইয়া সেখানে হাজির হলেন। বললেন, হে প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ! শুভসমাচার শ্রবণ করুন। রায়হানা ইসলাম কবুল করেছেন।

রায়হানা ক্রীতদাসীরূপেই সারাজীবন সেবাযত্ন করেছিলেন রসুল স. এর। রসুল স. তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহ্র প্রিয়তম বাণীবাহক! আমাকে আপনার চরণসেবিকা হয়েই জীবনপাত করতে দিন। এতে করে আপনি যেমন প্রীত হবেন, তেমনি আমিও হবো কৃতজ্ঞ। রসুল স. দ্বিরুক্তি না করে তাঁর এই ব্যবস্থাকেই মেনে নিয়েছিলেন।

হজরত সা'দ ইবনে মুয়াজের পরলোকগমন ঃ বনী কুরায়জাদের পরাজয়ের অধ্যায় সমাপ্ত হলো। এদিকে হঠাৎ করেই অবনতি ঘটতে লাগলো হজরত সা'দ ইবনে মুয়াজের স্বাস্থের। ক্ষতস্থানের যন্ত্রণা বাড়তে লাগলো দিন দিন। রসুল স. হজরত আবু বকর ও হজরত ওমরকে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে দেখতে গেলেন। জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, যার আনুরূপ্যবিহীন অধিকারে মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্র জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি, আমি আমার ঘর থেকেই শুনতে পেলাম সা'দ ইবনে মুয়াজের বাড়ি থেকে ভেসে আসছে আমার পিতা ও ওমরের কান্নার আওয়াজ। ওমরের রোদন ধ্বনিই ছিলো তীব্রতর। আমি জানতাম, তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো গভীর সম্প্রীতি, যেমন বলা হয়েছে আল্লাহ্র বাণীতে 'রুহামাউ বায়নাহুম' (পরস্পরের প্রতি মায়াময়)।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, সা'দ ইবনে মুয়াজের জানাযা গমনকালে মুনাফিকেরা মন্তব্য করতে লাগলো, দেখেছো জানাযার খাটিয়া কতো হালকা। সে বনী কুরায়জাদের প্রাণ সংহারের আদেশ দিয়েছিলো বলেই তার এরকম অবস্থা। রসুল স. এর কানে একথা যেতেই তিনি স. বললেন, তার খাটিয়া বহন করছে ফেরেশতারা। তিরমিজি। হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, সা'দের চিরপ্রস্থানের কারণে আল্লাহ্র আরশও আন্দোলিত হচ্ছে। বোখারী, মুসলিম। হজরত বারা ইবনে আজীব বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. সকাশে পেশ করা হলো এক জোড়া চিত্তাকর্ষক রেশমী বস্ত্র। সাহাবীগণের কেউ কেউ বস্ত্রজোড়া নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। রসুল স. বললেন, তোমরা এই বস্ত্রের সৌন্দর্য দর্শনে মুগ্ধ হচ্ছো। শুনে রাখো, জান্নাতে সা'দ ইবনে মুয়াজের রুমাল হবে এর চেয়ে অনেক অনেক গুণ মনোমুগ্ধকর। বোখারী, মুসলিম।

ইলার ঘটনা ঃ ইলার ঘটনা ঘটেছিলো খায়বর যুদ্ধের পর। বাগবী লিখেছেন, একবার উম্মতজননীগণ এক জোট হয়ে রসুল স. সকাশে অধিকতর উন্নত খোরপোষ ও কিছু বিলাস সামগ্রীর দাবি উত্থাপন করলেন। অপ্রস্তুত ও অতুষ্ট হলেন রসুল স.। শপথ করলেন, একমাস যাবত তিনি স. তাঁদের কারো সঙ্গে শয্যাসম্পর্ক রাখবেন না। অবস্থান গ্রহণ করলেন একাকী এক প্রকোষ্ঠে। সাহাবীগণের সঙ্গেও বন্ধ করে দিলেন দেখা-সাক্ষাত। রোষান্বিত রসুলের এরকম অবস্থা দেখে সাহাবীগণ বলাবলি করতে লাগলেন, সম্ভবতঃ রসুল স. তাঁর সহধর্মিণীগণকে একেবারে পরিত্যাগ করেছেন। হজরত ওমর বললেন, আপনারা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। সত্বরই আমি আপনাদেরকে প্রকৃত অবস্থা জানাতে পারবো। একথা বলেই তিনি প্রবেশ করলেন রসুল স. এর নির্জন প্রকোষ্ঠে। নিবেদন করলেন, হে মহাবিশ্বের মহাবিস্ময়! আপনি কি আপনার পবিত্র ভার্যাগণকে পরিত্যাগ করেছেন। তিনি স. বললেন, না। তিনি পুনরায় নিবেদন

করলেন, হে আল্লাহ্র প্রিয়তম রসুল! আমি মসজিদে প্রবেশ করে জনগুঞ্জন শুনলাম। তারা বলছেন, আপনি তাঁদেরকে তালাক দিয়েছেন। একথা যে সত্য নয়, তাকি আমি তাঁদেরক জানাতে পারবো? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ, ইচ্ছে করলে জানাতে পারো। হজরত ওমর বলেন, এরপর আমি বেরিয়ে এসে মসজিদে সমবেত সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বললাম, হে জনতা! তোমাদের সন্দেহ সত্য নয়। রসুল স. তাঁর পবিত্র সহধর্মিণীগণকে পরিত্যাগ করেননি। ওই সময় অবতীর্ণ হলো— 'আর যখনই প্রাদুর্ভাব ঘটে তাদের নিকটে স্বস্তিদায়ক অথবা অস্বস্তিপ্রদায়ক কোনো বিষয়ের, তখনই তারা তা প্রচার করে। যদি তারা এরকম না করে বিষয়টি গোচরীভূত করতো রসুলের অথবা তাদের ধর্মাধ্যক্ষের, তাহলে উন্মোচিত হতো সত্যতথ্য'। হজরত ওমর আরো বলেন, তখনই আমার সামনে উদ্ভাসিত হলো প্রকৃত বিষয়ের স্বরূপ। এরপর উম্মতজননীগণের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হলো—

সূরা আহ্যাব ঃ আয়াত ২৮, ২৯, ৩০

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدۡنَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيۡنَ أُمَتِّعۡكُنَّ وَأُسَرِّحۡكُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ﴿٢٨﴾ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلۡمُحۡسِنَٰتِ مِنكُنَّ أَجۡرًا عَظِيمٗا ﴿٢٩﴾ يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأۡتِ مِنكُنَّ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖ يُضَٰعَفۡ لَهَا ٱلۡعَذَابُ ضِعۡفَيۡنِۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٗا ﴿٣٠﴾

r হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদিগকে বল, 'তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও উহার ভূষণ কামনা কর তবে আইস, আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করিয়া দেই এবং সৌজন্যের সহিত তোমাদিগকে বিদায় দেই।

r 'আর যদি তোমরা কামনা কর আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল ও আখিরাত, তবে তোমাদের মধ্যে যাহারা সৎকর্মশীল আল্লাহ্ তাহাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রাখিয়াছেন।'

r হে নবী-পত্নীগণ! যে কাজ স্পষ্টত অশ্লীল, তোমাদের মধ্যে কেহ তাহা করিলে তাহাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হইবে এবং ইহা আল্লাহ্র জন্য সহজ।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম নবী! আপনি আপনার সহধর্মিণীগণকে এই বলে চূড়ান্তভাবে সতর্ক করে দিন যে, তোমরা যদি পার্থিব জীবনের জাঁকজমক ও বিলাস-ব্যসন কামনা করো, তবে এসো, আমি তোমাদেরকে প্রতুল সম্ভোগ-সম্ভাবের ব্যবস্থা করে দেই এবং সৌজন্যের সঙ্গে তোমাদেরকে পরিত্যাগ করি।

এখানে 'যীনাতাহা' অর্থ পার্থিব ভোগ-বিলাসের উপকরণ। 'ফাতাআ'লাইনী' এর শাব্দিক অর্থ উপরে উঠে এসো। ব্যবহারিক অর্থ— আমার নিকট এসো। আর এখানে কথাটির মর্মার্থ— স্বেচ্ছায় তালাক নিতে এসো। 'উসাররিহ্‌কুন্‌না' অর্থ বিদায় করে দেই, দিয়ে দেই তালাক। আর 'সারাহান জামীলা' অর্থ সৌজন্যের সঙ্গে, ভদ্রজনোচিতভাবে।

পরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'আর যদি তোমরা কামনা করো আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল ও আখেরাত, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, আল্লাহ্ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন'।

বাগবী লিখেছেন, ওই সময় রসুল স. এর মোট নয় জন সহধর্মিণীগণের মধ্যে পাঁচজন ছিলেন কুরায়েশ বংশদ্ভূত। যেমন হজরত আবু বকরের কন্যা হজরত আয়েশা, হজরত ওমরের কন্যা হজরত হাফসা, আবু সুফিয়ানের কন্যা হজরত উম্মে সালমা এবং জামআর কন্যা হজরত সাওদা। আর অকুরায়েশ চারজন ছিলেন হজরত যয়নব বিনতে জাহাশ, হজরত মায়মুনা বিনতে হারেছ হিলালী, হজরত সাফিয়া বিনতে হুয়াই এবং হজরত জুয়াইরিয়া বিনতে হারেছ মুসতলকী।

আলোচ্য আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. সর্বপ্রথম গমন করলেন হজরত আয়েশার প্রকোষ্ঠে। তাঁকে পাঠ করে শোনালেন সদ্য অবতীর্ণ আয়াতদ্বয়। হজরত আয়েশা সানন্দে বরণ করলেন আল্লাহ্, তাঁর রসুল ও আখেরাতকে। তাঁর সপত্নীগণও একইভাবে মেনে নিলেন আখেরাতের কল্যাণকে। রসুল স. আনন্দিত হলেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন মহান আল্লাহ্‌র।

কাতাদা বর্ণনা করেছেন, উম্মতজননীগণ যখন সকলেই সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করলেন আল্লাহ্, তাঁর রসুল ও আখেরাতকে, তখন আল্লাহ্‌পাকও তাঁদের প্রতি প্রেরণ করলেন অভিনন্দনবাণী। সাথে সাথে রসুল স. এর উপরেও এই মর্মে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন যে, তিনি তাঁর সহধর্মিণীর সংখ্যা আর বাড়াতে পারবেন না। এরশাদ করলেন— 'এর পর আর কোনো নারী আপনার জন্য বৈধ নয়'।

আবু যোবায়েরের মাধ্যমে মুসলিম, নাসাঈ এবং আহমদ উল্লেখ করেছেন, হজরত জাবের বলেছেন, একবার হজরত আবু বকর রসুল স. এর অন্দর মহলে প্রবেশের অনুমতি চেয়ে নিরাশ হলেন। কিছুক্ষণ পর এলেন হজরত ওমর। তিনিও

অন্দরে প্রবেশের অনুমতি পেলেন না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর অবশ্য দু'জনেরই অনুমতি মিললো। দু'জনে প্রবেশ করে দেখলেন, মহামতি রসুল স. মুখ ভার করে বসে রয়েছেন তাঁর সহধর্মিণীগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে। হজরত ওমর রসুল স. এর অপ্রসন্ন অবস্থা দেখে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। মনে মনে ঠিক করলেন, আল্লাহ্‌র রসুলের এমতো বিষণ্ণতা দূর করতেই হবে। এমন কথা বলতে হবে, যাতে তিনি প্রসন্ন হন। একথা ভেবেই তিনি বলে ফেললেন, খারেজার কন্যা (আমার স্ত্রী) যদি আমার কাছে ব্যয়বহুল কোনোকিছুর জন্য আবদার শুরু করে, তবে আমি তার ঘাড় ভেঙে দিবো। রসুল স. তাঁর একথা শুনে হেসে ফেললেন। বললেন, দেখছো তো, আমাকে ঘিরে এরা সেরকমই আবদার জুড়েছে। এক জোট হয়ে দাবি তুলেছে, তাদের ভরন-পোষণের পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দিতে হবে। একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে হজরত আবু বকর মারমুখী হলেন তার প্রিয় কন্যা আয়েশার প্রতি। হজরত ওমরও তেড়ে গেলেন তাঁর কন্যা হাফসার দিকে। উভয়ে বললেন, খবরদার! যা রসুল স. এর কাছে নেই, তার জন্য কখনো আবদার জুড়ে দিয়ো না যেনো। রসুল স. তখন তেলাওয়াত করলেন 'আর যদি তোমরা কামনা করো আল্লাহ্, তাঁর রসুল ও আখেরাত, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, আল্লাহ্ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।'

এরপর রসুল স. নিভৃতে সাক্ষাত করলেন হজরত আয়েশার সঙ্গে। বললেন, আয়েশা! তোমার কাছে আমি একটি প্রস্তাব রাখছি। আশা করি তুমি ত্বরা না করে এ বিষয়ে ধীরে সুস্থে মতামত দিয়ো তোমার পিতা-মাতার সঙ্গে পরামর্শ করে। হজরত আয়েশা বললেন, বলুন। রসুল স. আলোচ্য আয়াতদ্বয় পাঠ করলেন। হজরত আয়েশা বললেন, আমি তো স্বেচ্ছায় কবুল করেছি আল্লাহ্‌কে, আল্লাহ্‌র রসুলকে ও আখেরাতকে। সুতরাং পিতা-মাতার সঙ্গে এ ব্যাপারে পরামর্শ করার কিছু তো দেখি না। তবে আপনার কাছে আমার মিনতি, এ ব্যাপারে আমার সপত্নীগণ যেনো কিছু না জানে। রসুল স. বললেন, কথা দিলাম, আমি তাদেরকে একথা জানাতে যাবো না। কিন্তু জিজ্ঞাসিত হলে আমি তো অপারগ। কারণ আমি আবির্ভূত হয়েছি সকলের মঙ্গলাকাংখী হয়ে। অশান্তি উৎপাদনকারীরূপে নয়।

বিশুদ্ধ বোখারী গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে, জুহুরী বলেছেন, রসুল স. শপথ করেছিলেন, একমাস তিনি বিচ্ছিন্ন থাকবেন তাঁর সহধর্মিণীগণের নিকট থেকে। ওরওয়ার বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, শপথের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরক্ষণেই রসুল স. শুভাগমন করেছিলেন আমার প্রকোষ্ঠে। আমি বলেছিলাম, হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তম রসুল! আপনি তো শপথ করেছিলেন এক মাসের। আজ তো অতিবাহিত হলো কেবল ঊনতিরিশ দিন। তিনি স. বললেন, এ মাস তো ছিলো ঊনতিরিশ দিনেরই।

অন্তর্নির্হিত আলোচনা ঃ রসুল স. ওই সময় তার পত্নীগণকে অর্পিত তালাক দিয়েছিলেন কিনা সে সম্পর্কে আলেমগণ মতপৃথকতা করেছেন। অপির্ত তালাক অর্থ— রসুল স. এর প্রস্তাব মেনে নিলেই তাঁদের সঙ্গে রসুল স. এর ঘটে যেতো বিবাহবিচ্ছেদ। কেউ কেউ বলেছেন, ওই তালাক অর্পিত তালাকই ছিলো। কিন্তু হাসান, কাতাদা এবং অধিকাংশ আলেম বলেছেন, প্রস্তাবটি অর্পিত তালাক ছিলো না। বরং রসুল স. তাঁদেরকে দিয়েছিলেন তালাক চাওয়ার অধিকার। অর্থাৎ যদি তাঁরা পার্থিবতা কামনা করতেন, তবুও রসুল স.কে তালাক দিতে হতো নতুন করে। কেননা আয়াতে বিজ্ঞাপিত হয়েছে 'এসো, তোমাদেরকে ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই এবং বিদায় করে দেই সৌজন্যের সঙ্গে'। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা পার্থিব ভোগ-সম্ভার গ্রহণ করলেও তাঁদের মুক্তির চাবিকাঠি থাকতো রসুল স. এর অধিকারেই।

সমাধান ঃ স্বামী যদি তার স্ত্রীকে স্বেচ্ছাবিচ্ছেদের অধিকার দেয়, তবে তা হবে অর্পিত তালাক (তালাকে তাফভীজ)। স্ত্রী ওই ইচ্ছা স্বাধীনতা কাজে লাগাতে পারবে ইচ্ছা স্বাধীনতার অধিকার প্রাপ্তির স্থানে। সেখান থেকে অন্যত্র গমন করলে ওই অধিকার তার আর থাকবে না, যেমনটি হয় ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ ক্রেতা-বিক্রেতা চুক্তিবদ্ধ হবার পর তাদের কেউ স্থান ত্যাগ করলে যেমন ইচ্ছা স্বাধীনতা বানচাল হয়ে যায়, তেমনি স্বেচ্ছাতালাকের অধিকার প্রাপ্তির পর স্ত্রী স্থানত্যাগ করলে অথবা অন্য কোনো কাজে লিপ্ত হয়ে পড়লে তার ওই অধিকার হয়ে যাবে বানচাল। কারণ অর্পিত তালাক মূলতঃ একটি কর্মের সমর্পণ। হেদায়া প্রণেতা এরকম বৈঠকের উপর সাহাবীগণের ঐকমত্যও উল্লেখ করেছেন।

ইবনে হুম্মামের মন্তব্য হচ্ছে, ইবনে মুনজির বলেছেন, স্ত্রী স্বামীপ্রদত্ত স্বেচ্ছাবিচ্ছেদের অধিকার কতোদিন সংরক্ষণ করতে পারবে, সে সম্পর্কে আলেমগণ মতপৃথকতা করেছেন। হজরত ওমর, হজরত ওসমান ও হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, ওই রমণী যতক্ষণ তার অধিকার প্রাপ্তির স্থানে অবস্থান করবে, তার প্রাপ্ত অধিকার বলবত থাকবে ততক্ষণ। ওই বৈঠক থেকে উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সে হয়ে যাবে তালাক গ্রহণের ইচ্ছা স্বাধীনতাচ্যুত।। এরকম বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন শায়েখ থেকেও। তবে ওই বর্ণনাগুলোর সূত্রপরম্পরা বিতর্কাহত। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্, আতা, মুজাহিদ, শা'বী, নাখয়ী, ইমাম মালেক, সুফিয়ান সওরী, আওজায়ী, শাফেয়ী, আবু সওর এবং আসহাবে রাযীর সিদ্ধান্তও এরকম। তবে জুহুরী, কাতাদা, আবু উবাদা ইবনে নসর প্রমুখের অভিমত হচ্ছে ওই বৈঠক থেকে উঠে যাওয়ার পরেও তার অধিকার ক্ষুণ্ন হয় না। ইবনে মুনজির বলেছেন, আমি এমতো অভিমতের সমর্থক। কারণ রসুল স. হজরত আয়েশাকে বলেছিলেন, পিতা-মাতার সঙ্গে পরামর্শ করে মতামত জানিয়ো, ত্বরা কোরো না। 'মাগনা' প্রণেতাও এরকম বর্ণনা উল্লেখ করেছেন হজরত আলী থেকে।

ইবনে মুনজিরের অভিমতের আবার সমালোচনা করেছেন ইবনে হুম্মাম। বলেছেন, তিনি হজরত আলী থেকে যে বর্ণনাটি উপস্থাপন করেছেন, তা সর্বসম্মত নয়। বরং হজরত আলী থেকে আর একটি বর্ণনাও রয়েছে, যা সাহাবীগণের ঐকমত্যের অনুরূপ। ইমাম আহমদ তাঁর 'বালাগাত' পুস্তকে স্পষ্ট করে লিখেছেন, আমার নিকট এর সংবাদটি পৌঁছেছে যে, হজরত ওমর, হজরত ওসমান, হজরত আলী, হজরত ইবনে মাসউদ ও হজরত জাবের বলেছেন, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক তার স্ত্রীকে প্রদত্ত স্বেচ্ছাবিচ্ছেদের অধিকার বলবত থাকবে বৈঠকের স্থায়িত্বকাল পর্যন্ত। স্ত্রী যদি সেখান থেকে উঠে অন্যত্র চলে যায়, তবে অবলুপ্ত হবে তার অধিকার। কোনো সাহাবীই এমতো অভিমতের বিরুদ্ধপ্রবক্তা নন।

এবার অবশিষ্ট রইলো সূত্রপরম্পরাগত সমালোচনার বিষয়টি। এতে করে অবশ্য মূল বিধানের উপর কোনো সন্দেহের ছায়াপাত ঘটবে না। কারণ সিদ্ধান্তটি ঐকমত্যসম্মত। উপরন্তু হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ ও হজরত ইবনে মাসউদের যে বক্তব্য আবদুর রাজ্জাক উল্লেখ করেছেন, তার সূত্রপরম্পরা সমালোচনার উর্ধ্বে। সুতরাং ইবনে মুনজিরের সূত্রপরম্পরাগত বিবরণ গ্রহণ করা ঠিক হবে না। কেননা রসুল স. এর 'ত্বরা কোরো না' কথার মর্ম অর্পিত তালাক নয়। আর 'এসো' আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই এবং তোমাদেরকে দেই সৌজন্যের সঙ্গে বিদায়' কথাটির উদ্দেশ্যও এরকম।

সমাধান ঃ স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে দেওয়া হলো ইচ্ছার স্বাধীনতা, তবে এমতোক্ষেত্রে অর্পিত তালাকের সংকল্প (নিয়ত) হবে অত্যাবশ্যক। কেননা স্বামী তার স্ত্রীকে নানাবিধ সাংসারিক বিষয়ে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিতে পারে।

সমাধান ঃ কেউ তার স্ত্রীকে বললো, তোমাকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দেওয়া হলো। প্রত্যুত্তরে স্ত্রী বললো, আমি গ্রহণ করলাম আমর ইচ্ছা স্বাধীনতাকে। এমতাবস্থায় স্ত্রী হবে ফেরৎযোগ্য, এক তালাক (তালাকে রজয়ী) প্রাপ্তা। এরকম অভিমত প্রকাশ করেছেন হজরত ওমর। হজরত ইবনে মাসউদ ও হজরত ইবনে আব্বাস। কারণ স্বামীর পক্ষ থেকে ইচ্ছা স্বাধীনতা অর্পণের অর্থই হচ্ছে স্ত্রীকে তালাক গ্রহণের স্বাধীনতা দেওয়া। আর স্ত্রীর পক্ষ থেকে ইচ্ছা স্বাধীনতা গ্রহণের অর্থই হচ্ছে প্রদত্ত তালাক গ্রহণ করা। বিষয়টি দাঁড়ায় এরকম— স্বামী বললো, আমি তোমাকে দিলাম তোমার ইচ্ছা স্বাধীনতা গ্রহণের সুযোগ অর্থাৎ আমি তোমাকে দিলাম তালাক গ্রহণের স্বাধীনতা। আর স্ত্রী বললো, আমি গ্রহণ করলাম ইচ্ছা স্বাধীনতাকে। অর্থাৎ গ্রহণ করলাম প্রদত্ত তালাক। তবে সর্বসম্মত অভিমত এই যে, এমতোক্ষেত্রে বর্তায় প্রত্যাবর্তনযোগ্য এক তালাক (তালাকে রজয়ী), তিন তালাক নয়। কোরআনের সাক্ষ্য এরকম। এভাবে সিদ্ধান্তটি দিয়েছেন ইমাম

শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ। তবে হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত থেকে বর্ণিত হয়েছে, এমতোক্ষেত্রে বর্তাবে তিন তালাক। সম্ভোগিত স্ত্রীদের ক্ষেত্রে এমতো সিদ্ধান্ত দিয়েছেন ইমাম মালেকও। কিন্তু স্ত্রী যদি স্বামী কর্তৃক তখন পর্যন্ত সম্ভোগিত না হয়ে থাকে, তবে এমতোক্ষেত্রে এক তালাকের মর্মকে মান্য করা যায়। হজরত জায়েদ ইবনে সাবেতের যুক্তি হচ্ছে, ইচ্ছা স্বাধীনতা প্রদানের ক্ষেত্রে তালাক গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করেন স্ত্রী। সুতরাং স্ত্রীর সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে তার উপর তার স্বামীর অধিকার না থাকাই সমীচীন। আর স্বামীই যদি তখন পর্যন্ত তালাক প্রদানের অধিকার সংরক্ষণ করলো, তবে তার তালাক অর্পণের অর্থই বা কী দাঁড়ায় ? তালাক প্রদানের অধিকার স্বামী সংরক্ষণ করে বলেই তো সে স্ত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা না করে তালাক প্রত্যাহর করতে পারে। তাই বিশেষভাবে স্ত্রী এমতো অধিকার সংরক্ষণ করতে পারবে তখনই যখন অর্পিত তালাকের অর্থ করা হবে তালাকে বায়েন (চূড়ান্ত তালাক বা তিন তালাক) তালাক চূড়ান্ত না হলে তার পশ্চাতে অবশ্য আগমন ঘটে প্রত্যাহারের বা রজায়াতের। কাজেই স্ত্রীর অধিকারভূত তালাককে তিন তালাক ধরে নেওয়াই সমীচীন।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী বলেছেন, স্ত্রীর ইচ্ছা স্বাধীনতা সাপেক্ষে অর্পিত বা সমর্পিত তালাকের ফলে বর্তাবে এক তালাক বায়েন। ইমাম আবু হানিফাও এরকম বলেন। কারণ অধিকার সমর্পণের পর কেবল স্ত্রীই হয় অধিকারের সংরক্ষণকারিণী। স্বামীর অধিকার তখন আর থাকে না। আর স্ত্রীর এই অধিকার প্রাপ্তিই তার জন্য অনিবার্য করে বায়েন তালাককে। আর তালাক ছাড়াও বায়েন তালাক বিধিসম্মত। কেননা সম্পদ প্রদানের শর্তে তালাকের আবেদন (খোলা তালাক) এবং সম্ভোগবিবর্জিতাদের তালাকও তো বায়েন তালাকরূপে গণ্য। সুতরাং এমতাবস্থায় এক তালাক অথবা তিন তালাক যা-ই হোক না কেনো, তালাক প্রত্যাহারের সুযোগ আর থাকেই না। এমতোক্ষেত্রে বায়েন তো বায়েনই। তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর ও হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, এমতাবস্থায় কার্যকর হবে বায়েন তালাক। আবার অপর এক বর্ণনায় এসেছে, এমতাবস্থায় কার্যকর হবে তালাকে রজয়ী। সুতরাং বিষয়টি বিতর্কাতীত নয়। কারণ এরকম পরস্পরাগত বিরোধের ক্ষেত্রে হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা হয় ব্যহত।

আমি বলি, বায়েন তালাক দু'ধরনের— লঘু ও গুরু। সুতরাং বিষয়টি নির্ভর করবে স্বামীর সংকল্পের উপর। অর্থাৎ সে যদি সংকল্প করে গুরু বায়েনের। তবে তা অবশ্যই হবে গুরু বায়েন। নতুবা তা হবে লঘু । কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দেওয়া গেলো, তবে এতে করে বায়েন তালাক প্রমাণিত হবে না। কারণ এতে করে বুঝা যায়, ইচ্ছার বিশুদ্ধ স্বাধীনতা সমর্পণ করা হয়েছে স্ত্রীর উপরে। অর্থাৎ সে নিজের প্রতি

তালাক গ্রহণের অধিকারভূত হলো। উল্লেখ্য, বায়েন তালাক বর্তে বক্তার উক্তির চাহিদা অনুসারে। এখানে পরিস্থিতি তাকে বাধ্য করেছে এক তালাক বায়েনের। তাই বলে সাধারণ দুই তিন তালাকে বায়েন এরকম নয়। যেমন 'আনতে বায়েন' কথাটির দ্বারা বুঝা যায়— তুমি বায়েন তালাকপ্রাপ্তা। এমতাবস্থায় তিন তালাকের নিয়ত করলে তিন তালাকই বর্তাবে। কিন্তু এখানে ব্যাপারটি তো সেরকম নয়। ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রদানের মধ্যে স্পষ্টতঃ বায়েন তালাকের কথা নেই। এখানে পরিস্থিতি অনুসারে কেবল বলা হচ্ছে বায়েন তালাকের কথা। আর এমতাবস্থায় স্বামী যদি বায়েন তিন তালাকের নিয়তও করে, তবু তা হবে এক তালাকে বায়েন। মনে রাখতে হবে নিয়ত সেখানেই কার্যকর হতে পারে যেখানে ভারসাম্য রক্ষা করার মতো কোনো উপযুক্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ যে শব্দে সংকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাবনা থাকে প্রকট। তবে স্বামী যদি তিনবার ইচ্ছার স্বাধীনতার সাথে তালাক সমর্পণ করে এবং তার উদ্দেশ্যের সংখ্যা যদি হয় সুপ্রকট, আর স্ত্রীও যদি সে স্বাধীনাকে লুফে নেয়, তবে এমতোক্ষেত্রে তিনটি বায়েন তালাকই বর্তাবে।

সমাধান ঃ স্ত্রী যদি তার স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত ইচ্ছার স্বাধীনতা সাপেক্ষে অর্পিত তালাকের প্রত্যুত্তরে বলে, আমি অধিকার দিলাম আমার স্বামীকে, তবে জমহুরের অভিমতে কোনো তালাকই বর্তাবে না। কেননা স্বামী তো তার স্ত্রীকে তালাক দেয়নি, সমর্পণ করেছে কেবল তার তালাক গ্রহণের অঘিকার, আর স্ত্রী সে তালাক গ্রহণ না করে গ্রহণ করেছে তার স্বামীর স্বামীত্বকে। কাজেই এ ক্ষেত্রে কোনো তালাকই বর্তাবে না। কিন্তু হজরত আলীর এক উক্তিতে এসেছে, এমতোক্ষেত্রে বর্তাবে এক তালাক রজয়ী (ফেরৎযোগ্য তালাক)। সম্ভবতঃ তিনি অধিকার কথাটির মর্ম গ্রহণ করেছেন তালাক বর্তে যাওয়া। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, জননী আয়েশার একটি বক্তব্য জমহুরের অভিমতের পরিপোষক। তাঁর বক্তব্যটি এরকম— রসুল স. আমাদেরকে দিয়েছিলেন ইচ্ছার স্বাধীনতা। আমরা তা ফিরিয়ে দিয়েছিলাম তাকেই। তিনি স. আর ভিন্নতর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এতে করেই প্রমাণিত হয় যে, এমতোক্ষেত্রে কোনো তালাকই বর্তাবে না।

আমি বলি, ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে, রসুল স. তাঁর পুতঃপবিত্রা সহধর্মিণী-গণকে অর্পিত তালাকের ইচ্ছা স্বাধীনতা দেননি, বরং দিয়েছিলেন তালাক কামনার ইচ্ছা স্বাধীনতা। কাজেই জননী আয়েশার বক্তব্যের দ্বারা হজরত আলীর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করা কতোখানি যৌক্তিক তা সহজেই অনুমান করা যায়।

সমাধান ঃ ইচ্ছাস্বাধীনতাসহ অর্পিত তালাকের সঙ্গে জড়িত থাকতে হবে 'নফস্' (সত্তা) শব্দটি। শব্দটি ব্যবহার করবে স্বামী অথবা স্ত্রী। যেমন স্বামী বলবে, তালাক প্রদানের আমার নিজের ইচ্ছা স্বাধীনতা তোমাকে অর্পণ করলাম। স্ত্রী বলবে, আমি তা গ্রহণ করলাম আমার নিজের উপর। উভয়েই যদি 'আমার নিজের ইচ্ছাস্বাধীনতা' বা 'আমার নিজের উপর' কথাটি বাদ দিয়ে শুধু 'আমি ইচ্ছা স্বাধীনতা অর্পণ করলাম' বাবলে 'আমি তা গ্রহণ করলাম' তবে তালাক বর্তাবে না। কারণ 'এখতিয়ার' বা 'ইচ্ছা' কথার মর্ম কেবল তালাক হতে পারে না। বরং হতে পারে অনেক কিছুই। অর্থাৎ কথাটি বহু অর্থ বোধক। যুক্তির মাপকাটিতেও কথাটির এরকম অর্থ করা যেতে পারে না। আর 'এখতিয়ার' কথাটি যখন নিজেই তালাকের মালিক নয়, তখন অপরকে তা তালাকের মালিক বানাতে পারে কীভাবে? কিন্তু যেহেতু সাহাবায়ে কেরামের ঐকমত্যসম্ভূত সিদ্ধান্তরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, স্ত্রী যদি স্বীয় সত্তায় সে এখতিয়ারকে মেনে নেয়, তবে তালাক বর্তাবে, তাই তাঁদের মর্যাদার দিকে লক্ষ্য করে আমরা যুক্তিবিরুদ্ধ তালাক বর্তানোর কথা বলি। কিন্তু তাঁদের সিদ্ধান্তানুসারে স্বামী স্ত্রীর কথার মধ্যে জড়িত থাকতে হবে 'নফস' কথাটি। কেননা 'এখতিয়ার' অস্পষ্ট অর্থবোধক। অর্থাৎ কথাটির অর্থ 'আমার ইচ্ছা' তোমার ইচ্ছা, অথবা অন্য কারো ইচ্ছাও তো হতে পারে। কাজেই অস্পষ্ট কথার দ্বারা সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। আর নিজের এখতিয়ারসম্ভূত শব্দে তালাক সংঘটিত হওয়া যেহেতু যুক্তিবহির্ভূত, তাই বুঝতে হবে বিধানটি স্বস্থলে সীমাবদ্ধ। আবার বিধানটি ঐকমত্যসম্ভূতও। তাই উদ্ভূত পরিস্থিতির চাহিদা সত্ত্বেও বদ্ধমূল নিয়ত সহযোগে 'নফস্' (নিজের, নিজের উপর) শব্দের ব্যবহার ব্যতীরেকে তালাক বর্তাবে না, যেহেতু এর উপরে ঐকমত্যও হয়নি।

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেন, পরিস্থিতি যখন উপযোগী হয় এবং স্বামী 'এখতিয়ার' শব্দের দ্বারাই তালাক ঘটাতে চায়, আর স্বামী-স্ত্রী উভয়েই চায় তালাক কার্যকর হোক, তবে স্বামীর সংকল্পই বিবেচিত হবে যথেষ্ট বলে। তালাক বর্তাবে কেবল 'এখতিয়ার' শব্দের ব্যবহারেই।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, শব্দের যে কোনো মর্মার্থ গ্রহণের সম্ভাবনা থাকুক না কেনো, সংকল্প এখানে অসহায়। কোনো কথা বললে বক্তার মনে যাই থাকুক না কেনো, সেটাই তার জন্য সঠিক হতে পারে। যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বললো, এক গ্লাস পানি পান করাও। একথার মধ্যে যদি তার উদ্দেশ্য তালাক থাকে, তবে কি তালাক বর্তাবে? সুতরাং 'এখতিয়ার' শব্দের দ্বারাও তালাক সংঘটিত হতে পারে না, তবে ঐক্যমতের প্রসঙ্গটি স্বতন্ত্র।

আমি বলি, 'এখতিয়ার' এর ভিন্নতর অর্থ গ্রহণ হবে অযৌক্তিক। যেহেতু শব্দটি দু'টি সম্ভাবনা থেকে মুক্ত নয়। হয় এর মর্মার্থ হবে নিজের অভিলাষ, অথবা হতে পারে অন্য কিছু। স্বামী যদি তার এমতো উক্তির মাধ্যমে সংকল্প করে অর্পিত তালাকের এবং স্ত্রীকে বলে দেয়, আমি নিজেকেই এখতিয়ার করলাম। তাহলে তালাক হয়ে যাবে। কারণ, এমতোক্ষেত্রে স্বামীর উক্তির ব্যাখ্যা ধরে নেওয়া হবে স্ত্রীর কথা। বুঝতে হবে, এখানে স্বামীর 'এখতিয়ার' শব্দটির সঙ্গে জড়িত ছিলো সম্ভাব্য তালাক। কাজেই তালাক এখানে বর্তাবেই।

সমাধান ঃ স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে ইচ্ছা স্বাধীনতা দেওয়া হলো, আর স্ত্রী যদি প্রত্যুত্তর করে বর্তমান ও ভবিষ্যত দ্বিত্বকালবোধক শব্দের দ্বারা, তবে তালাক বর্তাবে না। কথাটি অবশ্য যুক্তিবহির্ভূত। কারণ স্ত্রীর কথায় বর্তমানকালের সঙ্গে জড়িত রয়েছে ভবিষ্যতের সম্ভবনাও। আর যদি স্ত্রী বলে, আমি নিজেকে তালাক করে নিবো, তবে তার কথাটি যেহেতু ভবিষ্যৎকালবোধক, তাই এমতাবস্থায় তালাক বর্তাবে না।

'হেদায়া' রচয়িতা লিখেছেন, প্রকাশ্য যুক্তির বিপরীত হলেও উত্তমতার দিক থেকে জননী আয়েশার উক্তি ছিলো দিত্বকালবোধক শব্দে। তিনি বলেছিলেন, 'বাল আখতারাল্লহ্ ওয়া রসুলাহ্'। এভাবে তিনি রসুল স. এর উত্তরকে সঠিক বলে মেনে নিয়েছিলেন।

একটি সন্দেহ ঃ ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে, রসুল স. তাঁর প্রিয়তমা সহধর্মিণী হজরত আয়েশাকে দিয়েছিলেন তালাক চাওয়ার ইচ্ছা স্বাধীনতা, তালাক গ্রহণের ইচ্ছা স্বাধীনতা নয়। সুতরাং এমতোক্ষেত্রে তাঁর উক্তিকে দলিলরূপে গণ্য করা কি সমীচীন ?

সন্দেহভঞ্জন ঃ এখানকার আলোচ্য বিষয় এখতিয়ারের মর্মবোধক নয়। অর্থাৎ তালাক কামনা করা বা গ্রহণ করা নয়। বরং এখানকার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এখতিয়ারের সম্পর্ক সম্বন্ধে। অর্থাৎ রসুল স. তখন তাদের এখতিয়ারবোধক জবাব মেনে নিয়েছিলেন।

এরপরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'হে নবী পত্নীগণ! যে কাজ স্পষ্টত অশ্লীল, তোমাদের মধ্যে কেউ তা করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে'।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার 'ফাহিশা' শব্দটির অর্থ অবাধ্যতা, চরিত্রহীনতা, কটুভাষিতা। 'দ্বি'ফাইন' অর্থ অন্যান্য রমণী অপেক্ষা দ্বিগুণ। 'দ্বিফ্' শব্দটি সম্বন্ধ ও সম্পর্কার্থক। অর্থাৎ শব্দটি অর্থ প্রকাশ করে অন্য একটি শব্দ সমন্বয়ে। যেমন— উর্ধ্ব-অধঃ, পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী ইত্যাদি। কাজেই শব্দটি সমপরিমাণ দু'টি বস্তুর একত্রায়নক, 'আদ্বআ'ফুশ শাই' অথবা 'দ্বাআ'ফাতুশ্শাই' অর্থবোধক। এভাবে এর অর্থ দাঁড়ায়— আমি একত্র করেছি একটির সঙ্গে একটি

বস্তুর মতো আরেকটি বস্তুকে। এরকম দু'টি বস্তুর পুনঃ মিলনায়নকেই বলে 'দ্বি'ফাইন'। আবার কখনো কখনো একই রকম দু'টি বস্তুর একত্রায়নকেও 'দ্বি'ফাইন' বলা হয়। যেমন স্বামী-স্ত্রী। আবার কখনো কখনো সমপ্রকৃতির ও সমপরিমাণের মিশ্রিত বস্তুকেও 'দ্বিফ' বলা হয়ে থাকে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— ফা আতিহিম আ'জাবান দ্বি'ফাম্ মিনান্নার' (তাদেরকে প্রদান করো নরকের দ্বিগুণ শাস্তি। যেমন তারা নিজেরা হয়েছিলো ভ্রষ্ট এবং ভ্রষ্ট করে ছিলো আমাদেরকেও)। অর্থাৎ আমাদের শাস্তির তুলনায় তাদেরকে দাও দ্বিগুণ শাস্তি।

'দ্বিফ' শব্দটি কোনো সংখ্যার সঙ্গে সম্বন্ধিত বলে অর্থ প্রদান করবে ওই সংখ্যার দ্বিগুণ। যেমন একের দ্বিগুণ দুই, দশের দ্বিগুণ কুড়ি, দুই শতের দ্বিগুণ চারশত। আর 'দ্বি'ফাইন' (দ্বিবচনবোধক) শব্দের সম্বন্ধ যদি হয় একের সঙ্গে তবে অর্থ প্রদান করবে এরকম— এক আর দুই তিন।

'কামুস' অভিধানে রয়েছে, একই বস্তুর অনুরূপ বস্তুকে বলে 'দ্বিফ'। আর দু'টিকে বলে 'দ্বি'ফাইন'। অথবা 'দ্বিফ' বলে একটি বস্তুর দুইগুণ, তিনগুণ, চারগুণ ইত্যাদিকে। যেমন আরবীভাষীরা বলেন, 'লাকা দ্বি'ফাহু'। অর্থাৎ তোমার দুইগুণ অথবা তিনগুণ ইত্যাদি, যার কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। আবু দাহদাহের বর্ণনানুসারে 'দ্বিফ' অর্থ দ্বিগুণ। আল্লামা জাযায়ী তাঁর 'নেহায়া' গ্রন্থে এরকমই বলেছেন। তিনি প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন আরবীভাষীদের এই প্রবচনটিকে— 'ইন আ'তাইতানী দিরহামান ফালাকা দ্বি'ফুহু' (যদি তুমি আমাকে এক দিরহাম দাও, তবে তোমার জন্য থাকবে দুই দিরহাম)। সুতরাং বুঝতে হবে 'দ্বি'ফাইন' অর্থ দ্বিগুণ।

জুহুরী লিখেছেন, 'দ্বিফ' অর্থ অনেক, দ্বিগুণ নয়। এর ন্যূনতম সংখ্যা একগুণ, আর বৃহত্তম সংখ্যা অগণিত। হাদিস শরীফে এসেছে 'ইয়ুদ্ব'আফু সলাতাল জ্বামায়াতি আ'লা সলাতিল ফাজ্জি খমসাঁও ওয়া ইশরীনা দারাজাহ্' (একাকী নামাজ সম্পাদন অপেক্ষা জামাতের সঙ্গে নামাজ সম্পাদনের পুণ্য পঁচিশগুণ বেশী)। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন 'ইয়ুদ্বআ'ফাহু লাহু আদ্বআ'ফান কাছীরাহ্' (তার পুণ্যবৃদ্ধি করা হবে অনেকগুণে)। আর 'দ্বিফ' যে কেনো শব্দরূপে প্রকাশ করা হোক না কেনো, তার অর্থ হবে অধিক করা, বৃদ্ধি করা। বাগবী বলেছেন শব্দটি যে কোনোরূপে প্রকাশ করা হোক না কেনো, তা গণ্য হবে সমার্থক হিসেবে।

ক্বারী আবু উবায়দা ও ক্বারী আবু আমর বলেছেন, শব্দগঠন সূত্র 'তাফ্য়ীল' এর নিয়মে শব্দটি গঠিত হলে অর্থ হবে দ্বিগুণ। আর 'মুফায়িলাত' এর নিয়মে পরিগঠিত হলে অর্থ হবে কয়েক গুণ। একারণেই ক্বারী আবু আমর আলোচ্য আয়াতে ইয়ুদ্বাআ'ফ শব্দটির স্থলে উচ্চারণ করতেন 'ইয়ুদ্বআ'ফ'।

অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্তা উম্মত জননীগণের দ্বিগুণ শাস্তি বিধিবদ্ধ হওয়ার কারণ স্বরূপ এরকম বলা যেতে পারে যে, অধিক নেয়ামত প্রাপ্তগণের শাস্তিও অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। একারণেই স্বাধীন মানুষের ব্যভিচারের শাস্তি অপেক্ষা ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীদের শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে অর্ধেক। আরো একটি কারণ রয়েছে তাঁদের দ্বিগুণ শাস্তি নির্ধারণের। সেটি হচ্ছে উম্মত জননীগণের মন্দ স্বভাব রসুল স. এর মহান ব্যক্তিত্বের জন্য সম্মানহানিকর। এরূপ আচরণ নিঃসন্দেহে উম্মতগণের জন্য হৃদয়বিদারক। সুতরাং বুঝতে হবে একারণেই আল্লাহ্পাক তাঁদেরকে করেছিলেন নিষ্কলুষ, পুত-পবিত্রা, তাঁর প্রিয়তম রসুলের উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং এটা আল্লাহ্র জন্য সহজ'। উল্লেখ্য, এই বাক্যটি একটি আপ্ত বচন।

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَاۤ
اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَ اَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ﴿۳۱﴾ يٰنِسَآءَ
النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ
بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّ قُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿۳۲﴾
وَ قَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَ
اَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَ اَطِعْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ اِنَّمَا
يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيْرًا ﴿۳۳﴾ وَ اذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَ
الْحِكْمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ﴿۳۴﴾

r তোমাদের মধ্যে যে কেহ আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের প্রতি অনুগত হইবে ও সৎকার্য করিবে তাহাকে আমি পুরস্কার দিব দুইবার এবং তাহার জন্য আমি প্রস্তুত রাখিয়াছি সম্মানজনক রিয্ক।

r হে নবী-পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নহ; যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর তবে পর-পুরুষের সহিত কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলিও না, যাহাতে অন্তরে যাহার ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলিবে।

r আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করিবে এবং প্রাচীন যুগের মত নিজদিগকে প্রদর্শন করিয়া বেড়াইবে না। তোমরা সালাত কায়েম করিবে ও যাকাত প্রদান করিবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের অনুগত থাকিবে। হে নবী-পরিবার! আল্লাহ্ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হইতে অপবিত্রতা দূর করিতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করিতে।

r আল্লাহ্‌র আয়াত ও জ্ঞানের কথা যাহা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তাহা তোমরা স্মরণ রাখিবে; আল্লাহ্ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে অবহিত।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে নবী সহধর্মিণীগণ! তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পূর্ণ অনুগতা হবে ও হবে সৎকর্মপরায়ণা, তাকে আমি পুরস্কার দিবো দিগুণ এবং তার জন্য আমার কাছে জমা করে রেখেছি মর্যাদামণ্ডিত জীবনোপকরণ।

এখানে দ্বিগুণ পুরস্কার প্রদানের অর্থ— প্রথমতঃ তারা পুরস্কার লাভ করবেন আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের একান্ত আনুগত্যের জন্য। দ্বিতীয়ত তাঁরা পুরস্কৃত হবেন আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয়তম রসুলের পরিতোষ কামনায় অল্পে তুষ্ট হয়ে মহৎজীবনযাপনের কারণে। মুকাতিল বলেছেন, তখন প্রতিটি পুণ্যের প্রতিদান দেওয়া হবে কমপক্ষে দশগুণ করে।

'রিয্‌ক্বন কারীমা' অর্থ সম্মানজনক জীবনোপকরণ। অর্থাৎ জান্নাত। তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ রসুলের জীবনসঙ্গিনী বলেই হবেন এমতোসম্মানজনক জীবনোপকরণের অধিকারিণী।

পরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'হে নবীপত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মতো নও'। এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুলের সহধর্মিণীবৃন্দ! তোমরা যেহেতু সৃষ্টির সর্বোত্তম ব্যক্তিত্বকে স্বামীত্বে বরণ করেছো, হয়েছো তাঁর সুখ-দুঃখের অন্তরঙ্গ সঙ্গিনী, সেহেতু তোমাদের মহিমা স্বতন্ত্র, সাধারণ পুণ্যবতী অপেক্ষাও তোমাদের মর্যাদা উচ্চ, তেমনি তোমাদের দায়িত্বও অন্যাপেক্ষা অধিক মহিমাময়।

হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন— হে পুতপবিত্রা নবী ভার্যাকুল! অপরাপর সতী-সাধ্বীগণের মর্যাদা অপেক্ষা তোমাদের কৌলিন্য ও আভিজাত্য অধিক পূর্ণ ও প্রতিদানেও তোমরা আমার নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্না।

এখানকার 'আহাদ' শব্দটির মূলরূপ হচ্ছে 'ওয়াহাদ'। এর অর্থ 'ওয়াহিদ' বা একক। দ্বিবচন, বহুবচন ও সমষ্টিকে বিলোপ করার লক্ষ্যেই শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে। শব্দটি একবচন, বহুবচন, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ সকলক্ষেত্রেই সমরূপে ব্যবহার্য।

আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. এর পুণ্যবতী সহধর্মিণীগণই সকল রমণী অপেক্ষা অধিক মর্যাদাবতী। কিন্তু অন্য এক আয়াতে অধিকতর মর্যাদাবতীরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে ঈসা-জননী হজরত মরিয়মকে। যেমন— 'হে মরিয়ম! আল্লাহ্ মনোনীত করেছেন তোমাকে। করেছেন পবিত্রা। আর নির্ধারণ করেছেন তোমাকে বিশ্বের রমণীকূলের শীর্ষে'। এরূপ বর্ণনাবৈষম্যের সমাধানার্থে বলা যেতে পারে যে, হজরত মরিয়ম ছিলেন তাঁর সময়ের সারা বিশ্বের

রমণীকূলের শীর্ষস্থানীয়া । আর সর্বশেষ রসুলের সহধর্মিণীগণ হচ্ছেন সকল যুগের সকল রমণীর মস্তকমুকুট। এই ব্যাখ্যাটি আবার হয়ে যায় একটি হাদিসের পরিপন্থী। হাদিসটি এই— হজরত আনাস থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সারা পৃথিবীর রমণীকূলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক মহিমময়ী হচ্ছে ইমরান তনয়া মরিয়ম, খুয়াইলিদনন্দিনী খাদীজা, মোহাম্মদ-দুলালী ফাতেমা এবং ফেরাউন পত্নী আসিয়া। সুতরাং আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ হবে— হে রসুলের জীবনসঙ্গিনীগণ! তোমাদের অনন্যসাধারণ মর্যাদা সর্বজনবিদিত। সকলেই জানে, তোমাদের তুল্য মর্যাদা সাধারণ পুণ্যবতীগণের নেই।

জমহুরের সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, নারীকুলের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছেন রসুলনন্দিনী হজরত ফাতেমা। আর তাঁর মহিয়ষী ভার্যাগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা হচ্ছেন হজরত খাদিজা। অধিকন্তু ইমরান দুহিতা মরিয়ম, ফেরাউন পত্নী আসিয়া এবং সিদ্দীক-দুলালী হজরত আয়েশাও সর্বোত্তমাগণের দলভূত।

প্রবীণ হাদিসবেত্তাদ্বয়ের সুপ্রসিদ্ধ বোখারী ও মুসলিম গ্রন্থে এবং আহমদ, তিরমিজি ও ইবনে মাজার গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে, হজরত আবু মুসা আশয়ারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পুরুষ জাতির মধ্যে অনেকেই পূর্ণত্ব অর্জন করেছেন, কিন্তু নারী জাতির মধ্যে ফেরাউনপত্নী আসিয়া এবং ইমরান-কন্যা মরিয়ম ছাড়া আর কেউ পূর্ণত্ব অর্জন করতে পারেনি। আহার্যের মধ্যে ব্যঞ্জনসিক্ত রুটির কদর যেরকম, নারীকুলের মধ্যে আয়েশার সম্মানও তেমনই। বোখারী ও মুসলিমে আরো উল্লেখিত হয়েছে, হজরত আলী বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি স্থলে-অন্তরীক্ষে স্বনামধন্যা রমণী হচ্ছেন মরিয়ম বিনতে ইমরান ও খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ। কুরাইযের বর্ণনায় পাওয়া যায়, রসুল স. একথা বলার সময় ইঙ্গিত করেছিলেন আকাশ ও পৃথিবীর প্রতি। হজরত আয়েশা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তাঁর কন্যা ফাতেমাকে একবার বললেন, তুমি জান্নাতবাসিনীগণের শীর্ষস্থানীয়া, একথা শুনে কি তুমি প্রসন্ন নও?

হজরত হুজায়ফা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, এক রাতে আমার কাছে এমন এক ফেরেশতা আবির্ভূত হলো, যে আর কখনো এ পৃথিবীতে আসেনি। সে আমাকে অভিবাদন জানাবে বলে তার প্রভুপালনকর্তার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেছিলো। সে আমাকে অভিবাদন জানানোর পর বললো, শুভসংবাদ শ্রবণ করুন। আপনার কন্যা ফাতেমা হবে জান্নাতিনীগণের নেতৃস্থানীয়া। তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন বর্ণনাটি দুর্লভ শ্রেণীর।

এরপর বলা হয়েছে— 'যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো তবে পর-পুরুষের সঙ্গে কোমলকণ্ঠে এমন কথা বোলো না, যাতে যাদের অন্তরে ব্যধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয়'।

এখানে 'যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো' অর্থ যদি তোমরা বিরত থাকো আল্লাহ্র অবাধ্যতা ও তাঁর রসুলের অসন্তোষ থেকে। বাক্যটি শর্তযুক্ত। পূর্ববর্তী বাক্য এর পরিপূরক।

'পর-পুরুষের সঙ্গে কোমলকণ্ঠে কথা বোলো না' অর্থ নারীর কোমলকণ্ঠ অশুদ্ধচিত্তদের অন্তরে সৃষ্টি করে মন্দ প্রতিক্রিয়া। সুতরাং তোমরা এরকম আমল কখনোই কোরো না। বজায় রেখো তোমাদের অনন্যসাধারণ মর্যাদাকে। মনে রেখো, তোমরা সাধারণ কোনো নারী নও। তোমরা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসুলের জীবনসঙ্গিনী।

জাযারী তাঁর 'নেহায়া' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. নারীদের মধ্যে এমন ভাষায় বাক্যালাপ করতে নিষেধ করেছেন, যাতে নারীরা আকৃষ্ট হয়। 'খুদ্বু' শব্দটির অর্থ কোমলতা, সমপর্ণপ্রবণতা। জাযারী আরো লিখেছেন, হজরত ওমর যখন খলিফা তখন তিনি একদিন পথ অতিক্রমকালে দেখলেন একজন পুরুষ ও একজন নারী আলাপ করছে মধুর কণ্ঠে। তিনি পুরুষটির মাথায় এমনভাবে চাঁটি মারলেন যে, তার মাথা ফেটে গেলো। এজন্য তিনি পুরুষটিকে কোনো ক্ষতিপূরণও দেননি।

তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আমর ইবনে আবা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রীদের পরপুরুষের সঙ্গে আলাপ নিষিদ্ধ করেছেন।

দারাকুতনী আফরাদ গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. এইমর্মে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন যে, মানুষ যেনো নামাজে ও ক্রীতদাসী ব্যতীত অন্য কোনো নারীর নিকটে অশুভ বার্তা না বলে।

'মারদ্ব' অর্থ ব্যাধি, কপটতা। 'যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে' অর্থ ইমান দুর্বল হওয়ার কারণে যাদের অন্তরে প্রশ্রয় পায় মন্দ চিন্তা অথবা কাপট্য। উল্লেখ্য, পূর্ণ বিশ্বাসীদের অন্তর হয় পবিত্র ও প্রশান্ত। তাদের অন্তরে সতত বিদ্যমান থাকে আল্লাহ্র ভয়। তাই তাদের অন্তর সরল, কাপট্যের প্রভাবমুক্ত।

সমাধান ঃ নারীদের জন্য অবশ্যকর্তব্য যে, তারা পরপুরুষের সঙ্গে প্রয়োজনীয় বাক্যালাপ করবে কর্কশকণ্ঠে, যাতে পুরুষদের মনে সৃষ্টি হয় বিকর্ষণতা।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে'। একথার অর্থ— এবং তোমরা যখন কথা বলবে, তখন বজায় রাখবে ন্যায়ানুগতা।

এরপরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে'। একথার অর্থ— আপনগৃহের অবস্থানই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম। যদিও নিতান্ত প্রয়োজনবোধে বাইরে বেরুনোর অনুমতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং প্রাচীন যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না'।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, মহামান্যা নবী-পত্নীগণের জন্য আপন গৃহের বাইরে অবস্থান না করা একটি সাধারণ বিধান। নামাজ, হজ বা অন্যান্য মানবিক প্রয়োজনেও তাঁরা গৃহের বাইরে যেতে পারবেন না। পথভ্রষ্ট শীয়া সম্প্রদায় এরকমই ধারণা করে থাকে। একারণেই তারা রসুল স. এর প্রিয়তমা সহধর্মিণী হজরত আয়েশার পবিত্র চরিত্র সম্পর্কে অবতারণা করে অসঙ্গত আলোচনার । বলে, তিনি তো মদীনা থেকে চলে গিয়েছিলেন মক্কায়। সেখান থেকে বসরায়, যা ছিলো উষ্ট্রের যুদ্ধের ঘটনাস্থল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তারা কি একথা জানেনা যে, সে সময় মদীনার জীবনযাপন ছিলো নিরাপত্তাহীনতাকণ্টকিত। তিনি মদীনা থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার অল্পকাল পরেই শহীদ করা হয়েছিলো হজরত ওসমানকে। মিসরের বিদ্রোহীরা তখন মদীনায় এমনই বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিলো যে, হজরত তালহা এবং হজরত যোবায়েরও বাধ্য হয়েছিলেন মদীনা পরিত্যাগ করতে। তাঁরাই মক্কায় পৌঁছে উম্মতজননীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন বসরায় গিয়ে মুসলমানদের গৃহযুদ্ধ থামাবার। জননী প্রথমে তাঁদের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাঁরা তখন উপস্থাপন করলেন কোরআনের এই আয়াত— 'তাদের পরামর্শে কোনো কল্যাণ নেই। তবে হ্যাঁ, সদকার বিষয়ে, অথবা শুভকর্মে কিংবা মানবমণ্ডলীর মধ্যে মীমাংসার উদ্দেশ্যে'। বললেন, মহামান্যা মাতা! মুসলমানদের গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে আপনার বসরা গমন অতীব জরুরী। এরপর তিনি আর অমত করতে পারলেন না। চলে গেলেন বসরায়। চেষ্টা করলেন তাঁর অনুরক্ত ও হজরত আলীর ভক্তদের মধ্যে একটি আপোষরফা ঘটানোর । তাঁর প্রচেষ্টা প্রথমদিকে সফলও হলো। কিন্তু মুনাফিক ইহুদী আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবার ঘৃণ্য চক্রান্ত সে আপোষ মীমাংসাকে করে দিলো ছিন্নভিন্ন। সংঘটিত হলো অনভিপ্রেত উষ্ট্রের যুদ্ধ। মুসলমানের তরবারী রঞ্জিত হলো মুসলমানেরই রক্তে। সে এক মর্মবিদারক ও কলংকিত ইতিহাস। আমি বিষয়টির সবিস্তার বিবরণ উপস্থিত করেছি 'সাইফ মাসলুল' (শোণিতাক্ত অসি) গ্রন্থে।

এখানকার 'তাবাররুজ' শব্দটি বুৎপত্তি লাভ করেছে 'বারূজ' থেকে। এর অর্থ রূপ প্রদর্শন। রূপসজ্জা করে পরপুরুষের সমাজে বের হওয়া। ইবনে নাজীহ্ বলেন, 'তাবাররূজ' অর্থ ঠমক সহ চলা। এ জন্যই শব্দটির ভাষ্যগত অর্থ করা হয়েছে চমক প্রদর্শন।

'জাহিলিয়াতে উলা' বা মূর্খতার প্রাচীন যুগ অর্থ ইসলামপূর্ব অজ্ঞতার যুগ। আর অজ্ঞতার বর্তমান যুগ অর্থ বৃহৎপাপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়া। শা'বী বলেছেন, হজরত ঈসার আবির্ভাবের পর থেকে রসুল স. এর আবির্ভাবপূর্ব সময় হচ্ছে প্রাচীন অজ্ঞতার যুগ। আবুল আলীয়া বলেছেন, হজরত দাউদ ও হজরত

সুলায়মানের যুগই হচ্ছে মূর্খতার প্রাচীন যুগ। তখনকার রমণীকুল পরিধান করতো এক ধরনের সিলাইবিহীন কুর্তা, যা ছিলো উভয় দিকে উন্মুক্ত। হজরত ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়ে ইকরামা বলেছেন, হজরত নুহ ও হজরত ইদ্রিসের মধ্যবর্তী যুগকে বলে প্রাথমিক অন্ধকার যুগ। হজরত আদমের সন্তানগণ হয়ে গিয়েছিলো দু'টি ধারায় বিভক্ত। একদল বসবাস করতো পার্বত্য ভূমিতে এবং অপরদল বসবাস করতো সমতল ভূমিতে। পার্বত্যীয়রা ছিলো গৌরবর্ণের। কিন্তু তাদের নারীরা ছিলো কুরূপা। আর সমতল ভূমির পুরুষ ও রমণীরা ছিলো এর বিপরীত।

একদিন ইবলিস মানবরূপে আবির্ভূত হলো সমতলভূমিতে। এক পরিবারে সে কাজে যোগ দিলো শ্রমিকরূপে। কিছুদিন পর সে তৈরী করলো একটি বাঁশের বাঁশী। বাঁশীতে তুললো মনমাতানো সুর। সে সুরের মুর্ছনায় মোহিত হলো সমতল ভূমির নর-নারী। সমবেত হতে লাগলো তাকে কেন্দ্র করে। এভাবে শুরু হলো গানের আসর। নির্ধারিত দিনে গানের আসরে নারীরাও সেজে গুজে যোগ দিতে লাগলো পুরুষদের সাথে। এরকম এক আসরে একদিন এসে পড়লো এক পাহাড়ী। আসর শেষে সে ফিরে গিয়ে বিষয়টির আলোচনা করলো অন্যান্য স্বজাতীয় পাহাড়ীদের কাছে। তারাও ক্রমে ক্রমে এসে জড়ো হতে লাগলো সমতলভূমির গানের আসরগুলোতে। শুরু হলো নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা। ওই অবাধ মেলামেশার ঐতিহ্যই হচ্ছে মূর্খতার প্রথম যুগ। কিন্তু একথা মনে করা যাবে না যে, মূর্খতার দ্বিতীয় যুগও আছে। কারণ দ্বিতীয় ব্যতিরেকেই এরকম প্রথমের উল্লেখ কোরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে। যেমন 'আহলাকা আ'দিনিল উলা' (তোমরাই পরিবার প্রথম আদ)। এমতোক্ষেত্রে দ্বিতীয় আদের কোনো অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও এখানে বলা হয়েছে প্রথম আদের কথা।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা সালাত কায়েম করবে ও জাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের অনুগত থাকবে'। একথার অর্থ— তোমরা মেনে চলবে আল্লাহ্তায়ালার যাবতীয় আদেশ ও নিষেধ। এটাই সংযমশীলতা, যা তোমাদের মর্যাদাবতী হওয়ার একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'হে নবী পরিবার! আল্লাহ্ তো কেবল চান তোমাদের নিকট থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে'। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল পরিবারের সদস্যবৃন্দ! তোমাদেরকে আবিলতামুক্ত করাই আল্লাহ্র অভিপ্রায়। তিনি তো তোমাদেরকে করতে চান সম্পূর্ণরূপে পবিত্রাধিষ্ঠিত। বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য। পূর্ববর্তী বাক্যের সঙ্গে এর কোনো যোগসাজশ নেই। এখানে কেবল রসূল স. এর জীবনসঙ্গিনীগণই অন্তরভূতা নন তার সন্তান-সন্তুতীগণও এ সম্বোধনের অন্তর্ভূত। তাই এখানকার সম্বোধনটি

সন্নিবেশিত হয়েছে পুংলিঙ্গবাচক শব্দরূপে। বাক্যটি এখানে পরিবেশিত হয়েছে পূর্ববর্তী বাক্যের কারণরূপে। যেনো এখানে এ কথাটিই বলতে চাওয়া হয়েছে যে— হে নবীপত্নীগণ! যে সকল আদেশ-নিষেধকে মান্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তোমাদেরকে এবং নবী পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে, শয়তানী প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করাই তার উদ্দেশ্য।

'রিজ্‌সুন' অর্থ শয়তানী ক্রিয়াকলাপ, অপবাধপরায়ণ ও অপরাধমূলক ক্রিয়া। এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে ধর্মীয় ও স্বভাবগত অনিষ্টতা, যা আল্লাহ্‌পাকের পছন্দ নয়।

'আহলে বাইত' অর্থ রসুলেপাক স. এর মহাসম্মানিত পরিবার। ইকরামা ও মুকাতিল বলেছেন, এর অর্থ উম্মতজননীগণ। সাঈদ ইবনে যোবায়ের সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে একথাই এসেছে। তিনি তাঁর এমতো অভিমতের সমর্থনে উপস্থাপন করেন এই আয়াত— 'আল্লাহ্‌র আয়াত ও জ্ঞানের কথা যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তা তোমরা স্মরণ রাখবে'। ইবনে আবী হাতেমও এরকম বলেছেন। এরকম আরো বলেছেন ইকরামা সূত্রে ইবনে জারীর। উদ্ধৃত আয়াতখানিই তাঁদের অভিমতের প্রমাণ। কিন্তু এখানে তো ব্যবহৃত হয়েছে পুংলিঙ্গবাচক সর্বনাম। তাহলে 'আহলে বাইত' অর্থ যে কেবল উম্মতজননীগণ সেকথা কীরূপে মেনে নেয়া যায়? সুতরাং বুঝতে হবে রসুল স. এর সহধর্মিণীগণসহ তাঁর পরিবারের সন্তান-সন্ততিগণও এখানকার 'হে নবী পরিবার' সম্বোধনটির অন্তর্ভূত। আর পুরুষ-প্রাধান্যের কারণেই এখানে সকলকে সম্বোধন করা হয়েছে পুংলিঙ্গের শব্দাকৃতিতে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী এবং তাবেয়ীগণের একটি বিরাট দল, মুজাহিদ ও কাতাদাও যাঁদের মধ্যে রয়েছেন, বলেছেন, আহলে বাইতের অন্তর্ভূত হচ্ছেন হজরত আলী, হজরত ফাতেমা, হজরত হাসান ও হজরত হোসাইন। কেননা জননী আয়েশা বলেছেন একদিন রসুল স. গৃহাঙ্গণে উপস্থিত হলেন চাদরাবৃত হয়ে। চাদরটির উপরে ছিলো উটের পশমের নকশা আঁকা। একটুপরে সেখানে উপস্থিত হলো হাসান। তিনি স. তাকে চাদর দিয়ে ঢেকে নিলেন। এরপর এলো হোসাইন। তাকেও চাদরে ঢেকে নিলেন তিনি। অতঃপর এলো ফাতেমা। তিনি স. তাকেও টেনে নিলেন ওই চাদরের ভিতর। শেষে এলো আলী। রসুল স. তাকেও জাড়িয়ে নিলেন চাদরের ভিতরে। তারপর পাঠ করলেন এই আয়াত। মুসলিম।

হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ বলেছেন, যখন অবতীর্ণ হলো 'নাদউ আবনাআনা আবনাআকুম ওয়া নিসাআনা ওয়া নিসাআকুম ওয়া আনফুসানা ওয়া আনফুসাকুম' তখন রসুল স. আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইনের নাম উল্লেখ

করে বললেন, হে আল্লাহ্! এরাই আমার পরিবার, এরাই আমার আপনজন। এদের মধ্য থেকে তুমি অপরিচ্ছনতা দূর করে দাও। পুতপবিত্র করো এদের জীবন।

জননী উম্মে সালমা বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. ডাক দিলেন আলী-ফাতেমা-হাসান-হোসাইনকে। তারপর তাদেরকে কম্বলে ঢেকে নিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্! এরা আমার আহলে বাইত। সম্পর্কচ্যুত করো এদেরকে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে। পুণ্যময় করো এদের জীবন।

বর্ণিত হাদিসসমূহ ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই চারজনের মধ্যে আহলে বাইতকে সীমাবদ্ধ করা সমীচীন কিনা। বুদ্ধি ও যুক্তি এমতো সীমাবদ্ধতাকে অস্বীকার করে। প্রকৃত কথা হচ্ছে— আহল বা পরিবারবর্গ বলে বুঝানো হয় কেবল রসুল স. এর সহধর্মিণীগণকে। সেই সঙ্গে তাঁদের সন্তান-সন্ততি এবং অন্য সন্তান-সন্ততিরাও হয়ে যায় পরিবার পরিজনভূত। উল্লেখ্য, উম্মতজননীগণের প্রত্যেকেই ছিলেন পৃথক পৃথক প্রকোষ্ঠের অধিবাসিনী।

নবীপ্রবর ইব্রাহিমপত্নী হজরত সারাকে লক্ষ্য করে ফেরেশতারা বলেছিলো 'আতা'জ্বাবীনা মিন আমরিল্লাহি রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলাইকুম আহলাল বাইত' (হে নবী-পরিবার! আপনি কি আল্লাহ্র বিধানে বিস্ময়ান্বিত হচ্ছেন? আপনার উপর বর্ষিত হোক আল্লাহ্র রহমত ও বরকত)। লক্ষণীয়, নবীজায়াকেই এখানে সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে আহলে বাইত বলে। আর আলোচ্য বাক্যের সম্বোধনের লক্ষ্যও প্রধানতঃ উম্মতজননীগণ। জননী উম্মে সালমা বলেছেন, যখন অবতীর্ণ হলো 'আল্লাহ্ তো চান তোমাদের নিকট থেকে অপবিত্রতা দূর করতে' তখন রসুল স. ডাকলেন আলী-ফাতেমা ও হাসান-হোসাইন ভ্রাতৃদ্বয়কে। বললেন, এরা আমার আহলে বাইত। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল। আমি কি আহলে বাইতের অন্তর্ভূতা নই? তিনি স. বললেন, কেনো নও? ইনশাআল্লাহ্। বাগবী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন হাদিসটি। আলোচ্য হাদিসের মাধ্যমেও প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. এর সহধর্মিণীগণ ও কন্যা-জামাতা ও দৌহিত্রদ্বয় সকলেই আহলে বাইত। আর রসুল স. 'ইনশাআল্লাহ্' বলেছিলেন ভবিষ্যতের আশায় নয়, বরকতের উদ্দেশ্যে।

হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম বলেছেন, রসুল স. এর আহলে বাইত তারাই, যাদের জন্য হারাম সদকা ও জাকাত গ্রহণ। অর্থাৎ আলী, আকীল, আব্বাস ও হারেছ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সন্তান-সন্ততি। আর আলোচ্য আয়াতে পবিত্রকরণের যে কথা বলা হয়েছে তার অর্থ ইহজগতে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্তি এবং পরকালে মার্জনা।

উল্লেখ্য, এখানে রূপকভাবে পাপকে বলা হয়েছে অপবিত্রতা এবং সংযমকে বলা হয়েছে পবিত্রতা। কেননা পাপ শরীরনির্গত অথবা শরীরলগ্ন অপবিত্রতার মতোই। আর সংযমীদের জীবনও হয় ধোয়া ফর্সা পরিধেয় বস্ত্রের মতো। সুতরাং বুঝতে হবে পাপের অপবিত্রতা ও বাহ্যিক অপবিত্রতার মধ্যে রয়েছে ঘনিষ্ঠ তুল্যমূল্যতা। একারণেই ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, অপবিত্রতা দূরীকরণ অথবা পুণ্যার্জন যে উদ্দেশ্যেই ওজু করা হোক না কেনো, ওজুতে ব্যবহৃত পানি নাপাক।

হজরত ওসমান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওজু করে, তার অবয়ব থেকে ঝরে যায় পাপ। এমনকি নখের অভ্যন্তর থেকেও। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যখন কোনো মুসলমান বান্দা, অথবা বলেছেন বিশ্বাসী বান্দা ওজুকালে ভালো করে ধৌত করে তার মুখমণ্ডল তখন তার মুখ থেকে ঝরে যায় পাপরাশি এবং ঝরে ওই সকল পাপ যা সে অর্জন করেছিলো চোখে দেখে। মুসলিম।

শীয়া মতাবলম্বীরা এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ করে হজরত আলী, হজরত ফাতেমা, হজরত হাসান ও হজরত হোসাইন নিষ্পাপ এবং তাঁরাই রসুল স. এর প্রকৃত প্রতিনিধি। আর তাঁরা ছাড়া অন্য কারো তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা নেই। আর তাঁদের বংশদ্ভূত ইমামগণের ঐকমত্যই কেবল দলিলরূপে গ্রাহ্য। তারা বলে, আল্লাহ্‌তায়ালা যখন তাঁদেরকে পবিত্র করবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন, সেহেতু বুঝতে হবে তাঁরা মাসুম (নিষ্পাপ)। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রায় অবশ্য বাস্তবায়নব্য। আরো বুঝতে হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ্‌র এমতোঅভিপ্রায় ব্যক্ত হয়নি, তারা নিষ্পাপ নয়। আর খেলাফত ও ইমামতের প্রধান শর্তই হচ্ছে নিষ্পাপ হওয়া। সুতরাং আহলে বাইত নন বলে ইসলামের প্রথম খলিফাত্রয় খেলাফতের যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন না। যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন কেবল আহলে বাইত। বলা বাহুল্য, এ ধরনের ধ্যান-ধারণা কয়েকটি কারণে পরিত্যজ্য। যেমন—

১. আলোচ্য আয়াতে কোনো বিধান বর্ণনা করা হয়নি এবং এই আয়াত বিশেষভাবে হজরত আলী, হজরত ফাতেমা ও তাঁদের আত্মজদ্বয়ের সঙ্গে জড়িতও নয়। বরং বুঝতে হবে এখানে উম্মতজননীগণই প্রধানতঃ সম্বোধিতা। অবশ্য ওই মহাত্মাচতুষ্টয়ও এর অন্তর্ভুক্ত।

২. পবিত্রকরণের অভিপ্রায় দ্বারা যে মাসুম (নিষ্পাপ) ছিলেন, একথা প্রমাণ করা যায় না। যেমন ওজুর আয়াতে বলা হয়েছে 'মাইয়ুরিদুল্লাহু লি ইয়াজ্‌আলা আ'লাইকুম মিন হারজ্বি ওয়ালা কিউ ইয়ুরিদু লি ইয়ুত্বাহ্‌হিরাকুম মিন হারজ্বি' (এটা আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় নয় যে, তিনি তোমাদের জন্য প্রচলন করেন কষ্টকর বিষয়, বরং তিনি তো চান তোমাদেরকে পবিত্র করতে)। এই আয়াতের মাধ্যমে তাহলে তো একথাই প্রমাণিত হয় যে, সমস্ত মুসলমানই মাসুম।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্র অভিপ্রায়ের ভিত্তিতে পবিত্রকরণই এখানে মূল দাবি অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায় হচ্ছে তোমাদেরকে পাক করা। সুতরাং তোমরা ওজু করে মুক্ত হয়ে যাও লঘু ও গুরু অপবিত্রতা থেকে। এ রকম ব্যাখ্যা কিন্তু যথার্থ ও জড়তামুক্ত নয়। কেননা দু'টি আয়াতেই পবিত্রকরণের অভিপ্রায় শর্তযুক্ত, ওজুর আয়াতে ওজুর সঙ্গে এবং আলোচ্য আয়াতে সংযমের সঙ্গে। অর্থাৎ মানুষ যদি ওজু করে, তবে তাদের দেহ পবিত্র হয়ে যাবে। আর উম্মতজননীগণ যদি 'তাকওয়া' বা সংযম অবলম্বন করেন তাহলে তাঁরা হয়ে যাবেন পাপমুক্ত। অর্থাৎ ওজু হচ্ছে বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জনের শর্ত এবং সংযমের শর্ত আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জনের। ইতোপূর্বের আয়াতেও তাঁদেরকে সংযম অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এভাবে— 'পরপুরুষের সঙ্গে কোমল কণ্ঠে কথা বোলো না'। কাজেই এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, দৈহিক পবিত্রতা জড়িত পানি ব্যবহারের সাথে। আর আন্তরিক পবিত্রতা নির্ভরশীল সংযমের উপর।

৩. ইমামত ও খেলাফতের জন্য নিষ্পাপ হওয়া কোনো শর্ত নয়। কেননা, নিষ্পাপ ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে অন্যেরা খলিফা হয়েছেন। যেমন হজরত দাউদ ও হজরত সুলায়মানের উপস্থিতিতেই রাষ্ট্রনায়ক হয়েছিলেন তালুত। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'যখন তাদের নবী তাদেরকে বললো, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য রাজা করে পাঠিয়েছেন তালুতকে'।

এরপরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র আয়াত ও জ্ঞানের কথা যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তা তোমরা স্মরণ রাখবে'।

এখানে 'আয়াত' অর্থ কোরআন । আর 'হিকমত' (জ্ঞানের কথা) অর্থ না বলা প্রত্যাদেশ। অর্থাৎ রসুল স. এর পবিত্র বাণী বা হাদিস। মুকাতিল বলেছেন, এখানে 'আয়াতিল্লাহ্' অর্থ কোরআনের বিধান ও শুভনির্দেশনা।

বায়যাবী লিখেছেন, এখানে 'স্মরণে রাখবে' কথাটির মধ্যে রয়েছে দু'টি নির্দেশ। এক আল্লাহ্র অনুগ্রহের এমতো স্মরণ যে, আল্লাহ্ই দয়া করে তোমাদেরকে দান করেছেন তাঁর রসুলের সহধর্মিণী হওয়ার সৌভাগ্য। তোমাদের প্রকোষ্ঠগুলোকে বানিয়েছেন তাঁর প্রত্যাদেশের অবতরণস্থল। দুই. প্রত্যাদেশকালে আল্লাহ্র রসুলের যে ভাবান্তর ও অপার্থিব অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়, তোমরা হও তার প্রত্যক্ষদর্শিনী। এমতো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয়টিও কৃতজ্ঞচিত্তে অবশ্য স্মরণীয়। কারণ এমতো সুযোগ তোমাদেরকে করে অধিকতর ধর্মানুরাগিনী। আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ মান্যতার ক্ষেত্রে সৃষ্টি করে অতিরিক্ত ঐকান্তিকতা।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে অবহিত'। একথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা অবশ্যই সূক্ষ্মজ্ঞানী। তাই তিনি কৃপাপরবশ হয়ে তোমাদেরকে দান করেন ধর্মীয় বিষয়ে সংস্কারমূলক জ্ঞান। আর তিনি এ বিষয়টিও উত্তমরূপে অবগত যে, নবুয়ত লাভের যোগ্যতম ব্যক্তিত্ব কে। আর কারা হতে পারেন তাঁর সহধর্মিণী হওয়ার যোগ্য ও কারা হতে পারেন তাঁর পবিত্র সাহচর্যধন্য। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'পবিত্র নারী পবিত্র পুরুষের জন্য এবং পবিত্র পুরুষ পবিত্র নারীর জন্য'।

বাগবী লিখেছেন, একবার উম্মত জননীগণ রসুল স. সকাশে নিবেদন করলেন, আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র কালামে বারংবার উল্লেখ করেছেন কেবল পুরুষ জাতির কথা। নারী জাতি সম্পর্কে তো তেমন আলোচনা করেননি। তাহলে কি আমাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই? আমাদের আনুগত্য কি আল্লাহ্র দরবারে গ্রহণীয় নয়? তাঁদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে পরবর্তী আয়াত। হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে তিবরানী ও ইবনে মারদুবিয়াও এরকম বর্ণনা করেছেন। এরকম আরো বর্ণনা করেছেন কাতাদা সূত্রে ইবনে সা'দ। আর গ্রহণযোগ্য সূত্রপরম্পরায় হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, কতিপয় মহিলা সাহাবী একবার রসুল স. সকাশে নিবেদন জানালেন, কোরআন মজীদের প্রায় সর্বত্রই উল্লেখিত হয়েছে বিশ্বাসবান পুরুষের কথা। বিশ্বাসবতী নারীর প্রসঙ্গ সেখানে অনুপস্থিত। এর কারণ কী? তাঁদের এমতো প্রশ্নের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত। প্রায়োন্নত সূত্রে কাতাদা থেকে ইবনে জারীরও এরকম বর্ণনা করেছেন।

উত্তম সূত্রসহযোগে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত উম্মে আম্মারা রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, কোরআন মজীদের সর্বত্রই উপস্থাপন করা হয়েছে পুরুষদের প্রসঙ্গ। নারীদের প্রসঙ্গ যে একেবারেই নেই। তাঁর এমতো উক্তির সূত্রেই অবতীর্ণ হয়েছে পরবর্তী আয়াত।

মুকাতিল সূত্রে বাগবী লিখেছেন, একবার উম্মত জননী হজরত উম্মে সালমা ও হজরত কা'ব আনসারীর কন্যা হজরত আসীয়া রসুল স. সকাশে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! আমাদের প্রভুপালনকর্তা তাঁর বাণীতে আলোচনা করেছেন কেবল পুরুষদের সম্পর্কে। নারীদের সম্পর্কে যে তিনি কিছুই উল্লেখ করেননি। তাই মনে হয় নারীদের মধ্যে কল্যাণকর কিছু নেই। তাঁদের একথার অনুসরণেই অবতীর্ণ হয় এর পরের আয়াত।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত আসমা বিনতে উমাইস তাঁর স্বামী হজরত জাফর ইবনে আবী তালেবের সঙ্গে আবিসিনিয়া থেকে ফিরে এলেন। সাক্ষাত

করলেন উম্মতজননীগণের সঙ্গে। বললেন, মেয়েদের সম্পর্কে কি কোনোকিছু অবতীর্ণ হয়েছে? উম্মতজননীগণ বললেন, না। তখন তিনি সোজা উপস্থিত হলেন রসুল স. এর মহান সাহচর্যে। বললেন, হে আল্লাহ্‌র প্রেমাস্পদ! মেয়েরা কি অপাংক্তেয়া ও অবাঞ্ছিতা? রসুল স. বললেন, একথা বলছো কেনো? তিনি বললেন, যদি তারা এরকম না হতো তবে তাদের সম্পর্কে তো কোরআন মজীদে আলোচনা করা হতো। তাঁর এমতো কথার সূত্র ধরে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সূরা আহযাব ঃ আয়াত ৩৫

إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ ۙ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٣٥﴾

r অবশ্য আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সওম পালনকারী পুরুষ ও সওম পালনকারী নারী, যৌন অংগ হিফাযতকারী পুরুষ ও যৌন অংগ হিফাযতকারী নারী, আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী— ইহাদের জন্য আল্লাহ্ রাখিয়াছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ইন্‌নাল মুসলিমীনা ওয়াল মুসলিমাতি'। একথার অর্থ নিশ্চয় আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলে সমর্পিতপ্রাণ পুরুষ ও সমর্পিতপ্রাণ নারী।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাতি'। একথার অর্থ বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতী। এরপর ধারাবাহিকভাবে বলা হয়েছে অনুগত-অনুগতা, সত্যবাদী-সত্যবাদিনী, ধৈর্যশীল-ধৈর্যশীলা, বিনীত-বিনীতা, দানশীল-দানশীলা,

রোজাপালনকারী-রোজাপালনকারিণী, চরিত্রবান-চরিত্রবতী এবং আল্লাহ্কে স্মরণ-কারী ও আল্লাহ্কে স্মরণকারিণীদের কথা। শেষে বলা হয়েছে— এদের জন্যই আল্লাহ্ প্রস্তুত রেখেছেন মহামার্জনা ও মহাপ্রতিদান।

হজরত মুয়া'জ বর্ণনা করেছেন, একবার এক লোক রসুল স. এর মহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, হে রসুলগণের মুকুটমনি! সর্বাধিক পুণ্যের অধিকারী কোন মুজাহিদ? তিনি স. বললেন, যে আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে। লোকটি পুনরায় বললো, সর্বাধিক পুণ্যবান রোজাদার কে? তিনি স. বললেন, যে আল্লাহ্র সর্বাধিক জিকির করে। এভাবে সে একে একে প্রশ্ন করলো সর্বাধিক পুণ্যবান নামাজ, হজ, জাকাত ও দান-খয়রাতকারী সম্পর্কে। রসুল স. তাঁর প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে বললেন, যে আল্লাহ্র সর্বধিক জিকির করে। এরকম প্রশ্নোত্তর শুনে হজরত আবু বকর হজরত ওমরকে বললেন, সর্বাধিক জিকিরকারীই যে অধিকারী হলো সর্বাধিক পুণ্যের। রসুল স. বললেন, অবশ্যই।

বাগবী লিখেছেন, মুজাহিদ বলেছেন, যে ব্যক্তি মোটেও আল্লাহ্র স্মরণবিচ্যুত হয় না, বরং দাঁড়িয়ে বসে শুয়ে- সর্বাবস্থায় আল্লাহ্কে স্মরণ করে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত জিকিরকারী। আমি বলি, কলবের ফানা না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত জিকিরকারী হওয়া যায় না। যখন কলব আল্লাহ্র জিকিরে পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হয়, কেবল তখনই হৃদয়ে জাগ্রত থাকে আল্লাহ্র সতত স্মরণ।

রসুল স. বলেছেন, ইফরাদকারীরাই অগ্রগামী। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল? ইফরাদকারী কারা? তিনি স. বললেন, আল্লাহ্কে অধিক স্মরণকারী নারী ও পুরুষ। রসুল স. আরো বলেছেন, আল্লাহ্র শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দিতে পারে কেবল আল্লাহ্র জিকির। সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্র পথে জেহাদও কি জিকিরের সমতুল্য নয়? তিনি স. বললেন, না। জেহাদও জিকিরের তুল্য নয়। তবে যুদ্ধ করতে করতে যদি কোনো মুজাহিদের তলোয়ার ভেঙ্গে যায়, তবে তার মর্যাদা হবে অধিক। বায়হাকী তাঁর 'দাওয়াতুল কবীর' গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে ওমর সূত্রে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. সকাশে নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ সকাশে কে হবে অন্যাপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান। তিনি স. বললেন, অধিক জিকিরকারী রমণী ও পুরুষ। পুনঃ নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! আল্লাহ্র পথে যারা যুদ্ধ করে, তাদের চেয়েও কি? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ, যদি সে যোদ্ধা আল্লাহ্র দুশমন নিধন করতে গিয়ে ভেঙে ফেলে তার তরবারী। আহমদ, তিরমিজি। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি বিরল প্রকৃতির।

ইমাম মালেক বলেছেন, আমার নিকট পৌঁছেছে এই হাদিসটি— রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র স্মরণবিচ্যুতদের মধ্যে জিকিরকারীর অবস্থান এরকম, যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে পলায়নপর যোদ্ধাদের মধ্যে স্বস্থানে অটল কোনো মুজাহিদ, যেনো বিশুষ্ক বৃক্ষের একটি সতেজ শাখা, যেনো অন্ধকার গৃহে একটি প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ। জিকির-বিস্মৃতদের মধ্যে অবস্থানকারী জিকিরকারীকে দেখানো হয় তার জান্নাতের আবাস। আল্লাহ্ তাদের মার্জনা করেন পৃথিবীর সবাক ও নির্বাক প্রাণীকুলের সমতুল পাপকর্ম করলেও। ইবনে রযীন।

বাগবী লিখেছেন, আতা ইবনে আবী বেরাহ বলেছেন, যাদের কর্মকাণ্ড কেবল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হয়, তারাই আত্মসমর্পণকারী নারী ও পুরুষ। বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতী তারা, যারা মনে ও মুখে একথায় একনিষ্ঠ স্বীকৃতি দেয় যে, আল্লাহ্ আমাদের প্রভুপালনকর্তা, এবং মোহাম্মদ মোস্তফা স. আমাদের রসুল। অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী তারা, যারা আল্লাহ্র অমোঘ বিধান মেনে নেয় এবং পথ চলে তাঁর রসুলের আদর্শানুসারে। যারা তাদের রসনাকে মুক্ত রাখে অসত্যভাষণ থেকে তারাই সত্যবাদী ও সত্যবাদিনী। যারা অনুকূল-প্রতিকূল সকল অবস্থায় আল্লাহ্র আনুগত্যে অটল থাকে ধৈর্যশীল ও ধৈর্যশীলা তারাই। বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী বলে তাদেরকে, যারা অন্যের চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে গভীর একাগ্রতা ও নিবিষ্টচিত্ততার সঙ্গে সম্পন্ন করে তাদের নামাজ। যারা সপ্তাহে অন্তত একটি দিরহামও দান করে, তারাই অভিহিত হয় দানশীল দানশীলা বলে। চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ও ১৫ তারিখে যারা রোজা রাখে, তারাই রোজাপালনকারী ও রোজাপালনকারিণী। অবৈধ যৌনচরিতার্থতা থেকে যারা মুক্ত, তারাই চরিত্রবান ও চরিত্রবতী। আর যথানিয়মে ও যথাসময়ে যারা আদায় করে পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ, তারাই আল্লাহ্কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী।

'এদের জন্য আল্লাহ্ রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান' অর্থ— এতক্ষণ ধরে যে সকল গুণের অধিকারী ও অধিকারিণীদের কথা বলা হলো, তাদের দ্বারা কোনো পাপকর্ম সংঘটিত হলেও আল্লাহ্ তা ক্ষমা করে দিবেন। শুধু তাই নয়, তাদের আনুগত্যের জন্য দান করবেন মহাপ্রতিদানও।

যথাসূত্রসহযোগে কাতাদা থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. হজরত জায়েদ ইবনে হারেছার পক্ষ থেকে হজরত যয়নাব বিনতে জাহাশের নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। কিন্তু তিনি জ্ঞাপন করলেন অসম্মতি। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ۞

r আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকিবে না। কেহ আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলকে অমান্য করিলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হইবে।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের নির্দেশ বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীদের অবশ্যপালনীয়। সুতরাং তাঁরা কোনো নির্দেশ প্রকাশ করলে বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীরা আর ভিন্নতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেই না। যদি এরকম কেউ করে, তবে সে অবশ্যই হয়ে যায় সত্যপথচ্যুত।

বলা বাহুল্য, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হজরত যয়নাব প্রেরিত প্রস্তাব কবুল করেন। বাগবী লিখেছেন, রসুল স. হজরত জায়েদকে ক্রয় করেছিলেন ওকাজের মেলা থেকে। তারপর তাঁকে করে দিয়েছিলেন মুক্ত। এরপর তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন পোষ্যপুত্ররূপে। বয়োপ্রাপ্তির পর তিনি তার জন্য বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন হজরত যয়নাবের কাছে। হজরত যয়নাব মনে করেছিলেন প্রস্তাবটি রসুল স. এর পক্ষ থেকে। তাই প্রথমে নীরব রইলেন। কিন্তু যখন বুঝলেন এ হচ্ছে তাঁর পোষ্যপুত্রের পক্ষ থেকে প্রস্তাব, তখনই তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। আবার তা গ্রহণ করলেন আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর। প্রথমে তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্ও ছিলেন প্রেরিত প্রস্তাবে অনীহ। উল্লেখ্য, হজরত যয়নাব ছিলেন রসুল স. এর ফুফাতো বোন।

ইকরামার মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে ইবনে জারীর বলেছেন, রসুল স. হজরত জায়েদ ইবনে হারেছের জন্য হজরত যয়নাবের নিকট বিবাহের পয়গাম পাঠালেন। কিন্তু তিনি প্রস্তাবটি এই বলে প্রত্যাখ্যান করলেন যে, আমি তার চেয়ে বংশমর্যাদায় শ্রেষ্ঠা। তাঁর এমতো মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। এই আয়াতে 'মুমিন পুরুষ' এবং 'মুমিন নারী' বলে বুঝানো হয়েছে হজরত জায়েদ ও হজরত যয়নাবকে, যদিও বিধানটি সার্বজনীন।

এখানে 'ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না' কথাটির অর্থ— ইচ্ছানুসারে কোন কিছু গ্রহণ অথবা বর্জন করবে সে অধিকার থাকবে না বরং এমতোক্ষেত্রে

শিরোধার্য করে নিতে হবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তকে। আলোচ্য নির্দেশনার মধ্যে বিশ্বাসী নারী-পুরুষগণের মধ্যে রয়েছে একটি অনুপম শিক্ষা। এ শিক্ষাকে গ্রহণ করলে বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীরা সতত অনুরক্ত ও অনুগত থাকতে পারবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের।

'খিয়ারতু' ও 'খিয়ারুন' শব্দ দু'টো সমার্থক। এর অর্থ ইচ্ছাস্বাধীনতা। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্র রসুলের ইশারা-ইঙ্গিত বর্জিত একটি সাধারণ অনুজ্ঞাও অবশ্যপালনীয়। আরো প্রমাণিত হয় যে, যিনি ধর্মীয় জ্ঞানের ধারক-বাহক ও ধর্মীয় মর্যাদায় সমাসীন, তিনি সকল অবস্থায় মর্যাদাসম্পন্ন বংশীয়দের সমতুল। রসুল স. হজরত জায়েদের জন্য হজরত যয়নাবের নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন একারণেই।

ইবনে জায়েদের উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে আবী হাতেম উল্লেখ করেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত উম্মে কুলসুমকে কেন্দ্র করে। তিনি ছিলেন উকবা ইবনে আবী মুঈতের কন্যা। তিনিই মদীনায় হিজরতকারিণী প্রথম রমণী। তিনি তাঁর মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছিলেন রসুল স.কে এবং আশা করেছিলেন রসুল স. তাঁকে বিবাহ করবেন। কিন্তু রসুল স. যখন তাঁকে হজরত জায়েদের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন, তখন মর্মাহত হলেন তিনি ও তাঁর ভ্রাতা। বললেন, আমাদের ইচ্ছা ছিলো, এ বিবাহ করবেন স্বয়ং রসুল স.। তখনই অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াতের শেষ বাক্যটি। কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।

এখানে 'দ্বলালাম মুবীনা' অর্থ প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতা। উল্লেখ্য, আদেশ আমান্য করা হয় সাধারণতঃ দু'ভাবে— ১. আদেশকে আদেশ বলে মান্য করতে অস্বীকৃত হওয়া। এরকম করা স্পষ্টতই সত্যপ্রত্যাখ্যান বা কুফরী। ২. আদেশকে আদেশ বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও তা পালন করার ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন। অর্থাৎ এমতো অবমাননা বিশ্বাস সংযুক্ত নয়, কর্মসংশ্লিষ্ট।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হজরত যয়নাব ও তাঁর ভ্রাতা বিবাহ প্রস্তাবে সম্মত হলেন। বিষয়টি তাঁরা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলেন রসুল স. এর অধিকারে। রসুল স. হজরত জায়েদ ও হজরত যয়নাবের পরিণয় সম্পন্ন করলেন। নিজের পক্ষ থেকে তাঁদেরকে উপহার হিসেবে দিলেন দশ দীনার, ষাট দিরহাম, একটি চাদর, একটি কুর্তা, একটি ওড়না ও একটি লুঙ্গি। আর খাদ্যশস্য হিসেবে দিলেন পঞ্চাশ সের আটা ও চার মন খেজুর। কিছুদিন পর কোনো এক কার্যোপলক্ষে রসুল স. উপস্থিত হলেন হজরত জায়েদের গৃহে। দেখলেন, হজরত যয়নাব দাঁড়িয়ে আছেন একটি কামিজ ও দোপাট্টা পরিহিত অবস্থায়। তিনি ছিলেন অনিন্দ্যরূপসী কুরায়েশ বালা। রসুল স. এর ভাবান্তর জন্মালো। মুখে কেবল

বললেন সুবহানাল্লাহ্। আল্লাহ্ই অন্তরসমূহের বিবর্তক। তারপর ফিরে এলেন স্বগৃহে। পরে হজরত জায়েদের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি স. তাঁর অন্তরের ভাবান্তরের কথা তাঁকে জানালেন। হজরত জায়েদের অন্তরে তখন থেকে হজরত জয়নাবের প্রতি সৃষ্টি হলো বীতরাগ। কিছুদিন পর তিনি রসুল স. সকাশে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি জয়নবের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে চাই। তিনি স. বললেন, কেনো? যয়নব কি তোমার সঙ্গে অশোভন আচরণ করে? তিনি বললেন, শপথ আল্লাহ্র। আমি তাঁর নিকট ইষ্ট ব্যতীত অনিষ্ট কিছু পাইনি। তবে জাত্যাভিমান তার প্রকট। মাঝে মাঝে সে একথা প্রকাশও করে। রসুল স. বললেন, তোমার সহধর্মিণীকে তোমার কাছেই রাখো। তার ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করো। আবু জায়েদের সূত্রে ইবনে জারীর এরকমই বর্ণনা করেছেন। আরো বলেছেন, এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয় নিম্নের আয়াত।

সুরা আহযাব ঃ আয়াত ৩৭

وَ اِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِیْۤ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِ اَمْسِكْ عَلَیْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ اللّٰهَ وَ تُخْفِیْ فِیْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِیْهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ ۚ وَ اللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰىهُ ؕ فَلَمَّا قَضٰى زَیْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَیْ لَا یَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِیْنَ حَرَجٌ فِیْۤ اَزْوَاجِ اَدْعِیَآىِٕهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ؕ وَ كَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿۳۷﴾

r স্মরণ কর, আল্লাহ্ যাহাকে অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং তুমিও যাহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছ, তুমি তাহাকে বলিতেছিলে, 'তুমি তোমার স্ত্রীর সহিত সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আল্লাহ্কে ভয় কর।' তুমি তোমার অন্তরে যাহা গোপন করিতেছ আল্লাহ্ তাহা প্রকাশ করিয়া দিতেছেন; তুমি লোকভয় করিতেছিলে, অথচ আল্লাহ্কেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সংগত। অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সহিত বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করিল, তখন আমি তাহাকে তোমার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিলাম, যাহাতে মু'মিনদের পোষ্য পুত্রগণ নিজ স্ত্রীর সহিত বিবাহসূত্র ছিন্ন করিলে সেইসব রমণীকে বিবাহ করায় মু'মিনদের কোন বিঘ্ন না হয়। আল্লাহ্র আদেশ কার্যকরী হইয়াই থাকে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'স্মরণ করো, আল্লাহ্ যাকে অনুগ্রহ করছেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছো, তুমি তাকে বলেছিলে, তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখো এবং আল্লাহ্কে ভয় করো'।

এখানে 'স্মরণ করো' বলে সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স.কে। হজরত আনাস থেকে হাকেম বর্ণনা করেছেন, হজরত জায়েদ যখন রসুল স. সকাশে তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে অনুযোগ উত্থাপন করলেন, তখন রসুল স. বলেছিলেন, নিজের পত্নীকে নিজের কাছেই রাখো। আর তার সম্পর্কে আল্লাহ্কে ভয় করো। তখনই অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

এখানে 'আল্লাহ্ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যাকে অনুগ্রহ করেছো' কথাটির অর্থ— হে আমার রসুল! আমি জায়েদকে ইসলামের মতো শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ দানে ধন্য করেছি। আপনার অন্তরেও তার জন্য সৃষ্টি করে দিয়েছি ভালোবাসা। তাই তো সে হয়েছে আপনার প্রিয়ভাজন। হয়েছে আপনার প্রিয় পোষ্যপুত্র।

'যাওজ্বাকা' অর্থ তোমার স্ত্রী। অর্থাৎ হজরত যয়নাব বিনতে জাহাশ। 'আল্লাহ্কে ভয় করো' অর্থ তার ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করো। অর্থাৎ তার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটিয়ো না। কেননা সিদ্ধকর্মসমূহের মধ্যে তালাকই সর্বাপেক্ষা অসুন্দর।

এরপর বলা হয়েছে— 'তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করছো, আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন'।

হজরত আনাস থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, হজরত জায়েদ ও হজরত যয়নাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। হাসান বলেছেন, হজরত জায়েদ তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ ঘটানোর কথা বললে রসুল স. এর অন্তরে উদ্ভূত হয়েছিলো অনিচ্ছাকৃত প্রীতির। কিন্তু লজ্জা ও আত্মসম্মানবোধের কারণে তিনি স. তা প্রকাশ হতে দেননি।

কেউ কেউ বলেছেন, রসুল স. মনে মনে এরূপ ধারণা পোষণ করতেন যে, জায়েদ যয়নাবকে ছেড়ে দিলে তিনি স. তাঁকে বিয়ে করবেন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. হজরত যয়নাবের প্রতি অনুরাগ লালন করতেন অন্তরাভ্যন্তরে। কাতাদা বলেছেন, তিনি স. মনে মনে চাইতেন, হজরত জায়েদ যেনো হজরত যয়নাবকে পরিত্যাগ করেন।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা সূত্রে বাগবী লিখেছেন, জায়েদ ইবনে জাজআন বলেছেন, একদিন আমাকে ইমাম জয়নুল আবেদীন জিজ্ঞেস করলেন 'তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করছো আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন' এই আয়াত সম্পর্কে হাসান কী বলেন? আমি বললাম, তিনি বলেন, হজরত জায়েদ যখন বললেন, আমি যয়নাবকে পরিত্যাগ করতে চাই, তখন রসুল স. মনে মনে খুশী হলেন। কিন্তু মুখে বললেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও। তার

ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করো। ইমাম জয়নুল আবেদীন বললেন, তিনি ঠিক বলেননি। কথাটির প্রকৃত ব্যাখ্যা হবে এরকম— আল্লাহ্তায়ালা পূর্বাহ্নেই রসুল স.কে জানিয়ে দিয়েছিলেন, জায়েদ তার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করবে এবং যয়নাব হবে আপনার সহধর্মিণী। কিন্তু জায়েদ যখন তাঁর কাছে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন রসুল স. লজ্জাবশতঃ বললেন, 'তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই রাখো'। একথাটির কারণেই আল্লাহ্তায়ালা অপ্রসন্ন হয়েছেন এবং প্রিয়জনোচিত সংক্ষোভ প্রকাশের নিমিত্তে বলেছেন— আমি আপনাকে পূর্বাহ্নে প্রকৃত রহস্য জানিয়ে দেওয়ার পরেও আপনি কীভাবে বলতে পারলেন 'তাকে নিজের কাছে রাখো'? এরকম ব্যাখ্যাই নবী-রসুলগণের মর্যাদার অনুকূল। কোরআনের বক্তব্যও এমতো ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও সঠিক। কারণ এখানে আল্লাহ্ স্পষ্ট করে বলেই দিয়েছেন 'আপনি আপনার অন্তরে যা গোপন করছেন, আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন'। এছাড়াও পরবর্তী বাক্যে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে 'তখন আমি তাকে আপনার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করলাম'। রসুল স. নিজে থেকে হজরত যয়নাবের প্রতি মনে মনে অনুরাগ লালন করতেন, তবে সেকথাও তো আল্লাহ্পাক প্রকাশ করে দিতেন। কিন্তু সেরকম কিছু তো আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়নি। সুতরাং বুঝতে হবে প্রকৃত ব্যাপার ছিলো এরকম— আল্লাহ্তায়ালা যখন রসুল স.কে জানালেন, যয়নাব হবে আপনার স্ত্রী, তখন তিনি স. লজ্জিত হলেন। হজরত জায়েদ যখন যয়নাবকে ত্যাগ করবার সংকল্প প্রকাশ করলেন, তখন তিনি স. পড়ে গেলেন আরো লজ্জায়। তিনি স. নিজে পুত্রতুল্য জায়েদকে সখ করে কুরায়েশ গোত্রে বিয়ে দিয়েছেন। এখন আবার কী করে তাঁকে বিবাহবিচ্ছেদের অনুমতি দেন। আর তাঁকে কীভাবে বলেন যে, তাই করো। যয়নাব হবে আমারই স্ত্রী। রসুল স. এর মনের অবস্থা ছিলো এরকমই।

বাগবী লিখেছেন, ইমাম জয়নুল আবেদীনের ব্যাখ্যা উত্তম ও সুসঙ্গত। পক্ষান্তরে ওই ব্যাখ্যাটিও উপেক্ষণীয় নয় এবং নয় নবুয়তের শানের জন্য মর্যাদাহানিকর। যেমন— রসুল স. এর হৃদয়ে হজরত যয়নাবের জন্য সৃষ্টি হয়েছিলো অনুরাগ এবং তিনি স. মনে মনে ভাবতেন যে, যদি কখনো জায়েদ তাঁর স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, তবে তিনি স. তাকে বিবাহ করবেন। এরূপ ভাবা অন্যায় নয়। কারণ তা ছিলো স্বতোৎসারিত। এরকম স্বতোৎসারিত ভাবনা তিরস্কারযোগ্য কিছু নয়। হৃদয়োৎসারিত আবেগ ও অনুরাগ একটি স্বভাবজ বিষয় যদি তা গোপনীয়তা বিমুক্ত না হয়। তিনি স. তো আমল করেছিলেন আল্লাহ্র বিধানানুসারে, 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ'— এই দায়িত্ব প্রতিপালনার্থে। বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই রাখো এবং তার ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করো। এটাতো একটি উত্তম পরামর্শ। পাপ তো কিছুতেই নয়।

আমি বলি, এরূপ অবশ্যই উত্তম পরামর্শরূপে গ্রাহ্য এবং এর জন্য উত্তম বিনিময়ও অর্জিত হওয়ার আশা করা যায়। কারণ স্বভাবের বিরূদ্ধাচারী হওয়াই পুণ্যকর্ম। শরিয়ত তো এরকমই নির্দেশ করেছে। সুতরাং এটা অবশ্যই পুণ্যকর্ম। আল্লাহ্পাক তো বলেই দিয়েছেন— 'আর তারা নিজেদের উপরে প্রাধান্য দেয় অন্যদেরকে, যদিও থাকে তাদের একান্ত প্রয়োজন। আর যারা রিপুর প্ররোচনা থেকে মুক্ত থাকে, তারাই সফলকাম'।

হাসানের ব্যাখ্যার পরিপোষকরূপে উপস্থিত করা যায় রসুল স. এর ওই বাণী, যা তিনি স. হজরত যয়নাবকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন, সুবহানাল্লাহ্! আল্লাহ্ই অন্তর সমূহের বিবর্তনকারী। একথাই প্রমাণ করে যে, প্রথম দিকে রসুল স. হজরত যয়নাবকে বিয়ে করার ব্যাপারে মোটেও আগ্রহী ছিলেন না। আগ্রহী ছিলেন প্রিয় পোষ্যপুত্র হজরত জায়েদের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিতে। বিষয়টির বাস্তবায়নও তিনি ঘটিয়েছিলেন। অথচ হজরত যয়নাব চেয়েছিলেন রসুল স. এর ঘরণী হতে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আল্লাহ্তায়ালাই হজরত যয়নাবের মনোষ্কামনাকে অনুমোদন করেন এবং তাঁর প্রিয়তম রসুলের মনোভাব দেন পাল্টিয়ে। সে কারণেই তো রসুল স. এর অন্তরে জাগ্রত হয় হজরত যয়নাবকে বিয়ে করার বাসনা। সুতরাং এতে রসুল স. অভিযুক্ত হবেন কেনো? আর কেনোই বা বলা হবে, রসুল স. এর পরিবর্তিত চিন্তা নবুয়তের মর্যাদার পরিপন্থী?

এরপর বলা হয়েছে— 'তুমি লোকভয় করেছিলে, অথচ, আল্লাহ্কে ভয় করাই তোমার পক্ষে অধিকতর সঙ্গত'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তো এব্যাপারে আশংকা করছিলেন লোকনিন্দার। মনে করেছিলেন, পালিত পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করলে লোকে বলবে কী? অথচ লোকনিন্দার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে আপনার পক্ষে তো সমীচীন ছিলো আল্লাহ্র ভয়কে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবা। জানতে চেষ্টা করা যে, আল্লাহ্র অভিপ্রায় আসলে কী?

হজরত ওমর ও হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, রসুল স. এর জন্য আলোচ্য আয়াতাংশটি ছিলো অত্যন্ত কষ্টদায়ক। জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. যদি প্রত্যাদিষ্ট কোনো আয়াত গোপন করতেন, তবে গোপন করতেন এই আয়াতাংশখানি— 'তুমি লোকভয় করছিলে, অথচ আল্লাহ্কে ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সঙ্গত'।

বাগবী লিখেছেন, তাই বলে একথা বলা যাবে না যে, রসুল স. এর হৃদয়ে আল্লাহ্র ভয় অনুপস্থিত ছিলো। নবী-রসুলগণের হৃদয়, এমনকি প্রকৃত বিশ্বাসবানগণের হৃদয়ও কোনো মুহূর্তে আল্লাহ্র ভয়-লেশ শূন্য হয় না। তাছাড়া তিনি স. নিজেই বলেছেন, নিশ্চয় আমিই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র ভয়ে অধিক শংকিত ও সংযত।

আমি বলি, আল্লাহ্পাক স্বয়ং তাঁর বার্তাবাহকগণ সম্পর্কে বলেছেন— 'আর তারা শুধু ভয় করে আল্লাহ্কে। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ভয় তাদের নেই'। তাই বুঝতে হবে, এখানে ভয়ের প্রসঙ্গ তোলা হয়েছে সাধারণ রীতি অনুসারে, কথা প্রসঙ্গে তোলা হয়েছে লোকনিন্দাজনিত ভীতির কথা। সেই সঙ্গে এই বিষয়েও সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র ভয়ই অধিকতর প্রাধান্যপ্রাপ্তির যোগ্য। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে আমার নবী! আপনি তো ছিলেন লোকলজ্জার ভয়ে আড়ষ্ট। কিন্তু একজন সত্য নবী হিসেবে আল্লাহ্ভীতিও ছিলো আপনার অন্তরে। লোকনিন্দার আশংকায় আপনি আপনার অন্তরে গোপন করে রেখেছেন একটি বিষয়। আর আল্লাহ্র ভয়েই জায়েদকে দিয়েছেন সৎপরামর্শ। আবার আল্লাহ্র আদেশ পালনে কোনো কার্পণ্যও তো আপনি করেননি। 'তারা এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না' কথাটির মূল বক্তব্যও এরকম। সুতরাং বুঝতে হবে আল্লাহ্র বিধান পালন করতে গিয়ে নবী-রসুলগণ মানুষের নিন্দা-মন্দের কোনো তোয়াক্কাই করেন না। কিন্তু লোকনিন্দার ভয় অন্তরে লালন করা তো নিন্দিত কিছু নয়, বরং তা নন্দিত। কারণ, লজ্জা ইমানের অঙ্গ।

হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, লজ্জা সরাসরি একটি উত্তম বিষয়। হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, লজ্জা ও ইমান ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। যখন একটিকে উঠিয়ে নেওয়া হবে তখন উঠে যাবে অপরটিও। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখন একটি বিলুপ্ত হবে, তখন অপরটিও করবে তার পশ্চাদ্ধাবন। হাদিসটি গ্রন্থিত হয়েছে বায়হাকীর শো'বুল ইমানে।

প্রায়োন্নত সূত্রে জায়েদ ইবনে তালহা থেকে ইমাম মালেক, 'শো'বুল ইমানে' বায়হাকী এবং হজরত আনাস ও হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মাজা উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রতিটি বিষয়ের একটি প্রকৃতি আছে। আর ইসলামের প্রকৃতি হচ্ছে ব্রীড়া।

এই ঘটনা সম্পর্কে হজরত আনাসের বক্তব্য সংকলন করেছেন মুসলিম, নাসাঈ, আবু ইয়ালী, ইবনে আবী হাতেম, তিবরানী ও বাগবী। বাগবীর ভাষ্যটি এরকম— হজরত যয়নাবের ইদ্দতকাল যখন পূর্ণ হলো, তখন রসুল স. হজরত জায়েদকে বললেন, এবার যাও, যয়নাবকে গিয়ে আমার মনোভাব সম্পর্কে জানাও। হজরত জায়েদ নির্দেশ মতো হজরত যয়নাবের কাছে গিয়ে দেখলেন, তিনি আটার খামির প্রস্তুত করছেন। হজরত জায়েদ বলেন, তাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়ে জেগে উঠলো সম্ভ্রমবোধ। আমি দৃষ্টি অবনত করতে বাধ্য হলাম। মনে পড়লো, আমি সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের বিবাহের পয়গামবাহী। তাঁর

দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে আমি কেবল এতোটুকু বলতে পারলাম, আমাকে পাঠিয়েছেন রসুল স. স্বয়ং। তিনি আপনাকে স্মরণ করেছেন। প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, মহান প্রভুপালকের নির্দেশনা ব্যতীত আমার করার কিছুই নেই। এই বলে তিনি ঘরে গিয়ে দণ্ডায়মান হলেন নামাজের জন্য নির্ধারিত স্থানে। এরপর অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী বাক্যগুলো।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর জায়েদ যখন যয়নাবের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করলো, তখন আমি তাকে তোমার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম'।

'ওয়াত্বরা' অর্থ প্রয়োজন, আবশ্যকীয়তা। অর্থাৎ মন ভরে যাওয়া। পরিতৃপ্তির পর আগ্রহের তিরোহিতি। এরকমই হয়েছিলো হজরত জায়েদের ক্ষেত্রে। তিনি হজরত যয়নাবের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেললেন। হৃদয়ের অনুরাগ অন্তর্হিত হয়ে তদস্থলে প্রতিষ্ঠিত হলো তিতিবিরক্তি। তিনি তাঁকে তালাক দিলেন। এরপর ইদ্দতকাল অতিবাহিত হলে তিনি পরিণয়াবদ্ধা হলেন রসুল স. এর সঙ্গে। কোনো কোনো তাফসীরকার প্রয়োজন পূরণ হওয়া থেকে ব্যতিহার অর্থে গ্রহণ করেছেন তালাক।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বাইরে থেকে শুভপদার্পণ করলেন অন্দর মহলে। অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ করলেন জননী যয়নাবের প্রকোষ্ঠে। আমার ভালো মনে আছে, তাঁর বিয়েতে রসুল স. আমাদেরকে খাইয়েছিলেন গোশত-রুটি। আমন্ত্রিত অতিথিরা একে একে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। জননী যয়নাবের প্রকোষ্ঠে তখন আলাপচারিতায় লিপ্ত ছিলেন দু'জন অতিথি। রসুল স. তাই বেরিয়ে এলেন সেখান থেকে। দর্শন দিতে লাগলেন অন্যান্য সহধর্মিণীগণের দ্বারদেশে গিয়ে গিয়ে। তাঁদেরকে অভিবাদন জানালেন। কুশল জিজ্ঞেস করলেন। কেউ কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনার নতুন সঙ্গিনীটি কেমন? হজরত আনাস বলেছেন, কিছুক্ষণ পর আমি অথবা অন্য কেউ বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! অতিথিদ্বয় বিদায় নিয়েছেন। একথা শুনেই তিনি চলে গেলেন জননী জয়নাবের কক্ষে। আমিও অনুগামী হলাম তাঁর। ভেবেছিলাম নতুন জননীর গৃহে আমিও প্রবেশ করবো। কিন্তু তখন অবতীর্ণ হলো পর্দার আয়াত। সঙ্গে সঙ্গে আমার সম্মুখেই ঝুলিয়ে দেওয়া হলো পর্দা। বোখারী, আহমদ, তিরমিজি, হাকেম, ইবনে মারদুবিয়া, আবদ ইবনে হুমাইদ, বায়হাকী।

জননী যয়নাব তিনটি বিষয়ে তাঁর বিশেষত্ব প্রকাশ করতেন। তাঁর সপত্নীদের সামনে বলতেন, তোমাদেরকে বিয়ে দিয়েছেন তোমাদের অভিভাবকগণ। আর আমার বিবাহ ঠিক হয়েছে সপ্তাকাশের উপর থেকে আল্লাহ্র নির্বাচনে। সুতরাং আল্লাহ্ স্বয়ং আমার বিবাহের অভিভাবক।

শা'বী সূত্রে বাগবী লিখেছেন, জননী যয়নাব রসুল স.কে বললেন, আপনার অন্যান্য সহধর্মিণীদের চেয়ে আমি তিনটি বিশেষত্বের অধিকারিণী। আপনার ও আমার পিতামহ এক। আপনার আমার বিবাহ ঠিক হয়েছে সপ্তাকাশে আল্লাহ্ কর্তৃক। আর আমার বিবাহের ঘটক ছিলেন জিবরাইল আমিন।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. হজরত জয়নাবের পাণিগ্রহণকালে যেমন অলিমার আয়োজন করেছিলেন, তেমন অন্য সহধর্মিণীগণের জন্য করেননি। তিনি স. তখন বিবাহের ভোজ দিয়েছিলেন একটি ছাগল জবাই করে। নিমন্ত্রিতজনেরা পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করেছিলেন গোশত ও রুটি।

এরপর বলা হয়েছে— 'যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্রগণ নিজ স্ত্রীদের সঙ্গে বিবাহসূত্র ছিন্ন করলে সেই সব রমণীকে বিবাহ করায় মুমিনদের কোনো বিঘ্ন না হয়'।

এখানকার 'আদয়ীয়া' শব্দটি একবচনবোধক। এর বহুবচন 'দায়ীয়ুন'। শব্দটির অর্থ কথিত পুত্র। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! আমি যয়নাবের সঙ্গে আপনার বিবাহ দিয়ে এই বিষয়টিই প্রমাণ করতে চেয়েছি যে, কথিত পুত্র বা পোষ্য পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা সিদ্ধ। ঔরষজাত পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা যদিও নিষিদ্ধ। আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথাও প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাধারণ বিধান সমগ্র উম্মতের উপরে প্রয়োগযোগ্য।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র আদেশ কার্যকরী হয়েই থাকে'। একথার অর্থ— আল্লাহ্র আদেশের কার্যকারিতা সুনিশ্চিত, যেমন প্রমাণিত হয়েছে রসুল স. ও হজরত যয়নাবের বিবাহের বেলায়।

সূরা আহযাব ঃ আয়াত ৩৮, ৩৯, ৪০

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗ ؕ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ؕ وَ كَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرَا ۨ ﴿۳۸﴾ الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَ يَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ﴿۳۹﴾ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿۴۰﴾

r আল্লাহ্ নবীর জন্য যাহা বিধিসম্মত করিয়াছেন তাহা করিতে তাহার জন্য কোন বাধা নাই। পূর্বে যেসব নবী অতীত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের ক্ষেত্রেও ইহাই ছিল আল্লাহ্র বিধান। আল্লাহ্র বিধান সুনির্ধারিত।

r তাহারা আল্লাহ্র বাণী প্রচার করিত এবং তাঁহাকে ভয় করিত, আর আল্লাহ্কে ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভয় করিত না। হিসব গ্রহণে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

r মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নহে; বরং সে আল্লাহ্র রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ নবীর জন্য যা বিধিসম্মত করেছেন, তা করতে তার জন্য কোনো বাধা নেই'। একথার অর্থ— নবীগণের জীবনসঙ্গিনী নির্ধারণের বিষয়টি আল্লাহ্ কর্তৃক প্রবর্তিত বিধিমালার বাইরে নয়। সুতরাং তাঁদের জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহণ বিধিসম্মত। এক্ষেত্রে শরিয়তসম্মত কোনো সমস্যাই নেই।

এখানে 'হারজ্ব' অর্থ সংকীর্ণতা, সমস্যা, অন্তরায়, বাধা। 'ফীমা ফারদ্বল্লহু' কথাটির অর্থ যা বিধিসম্মত করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁর নবীর জন্য যে কয়জন জীবনসঙ্গিনী গ্রহণ নির্ধারণ করেছেন। আরববাসীরা বলেন, 'ফুরিদ্বা লাহু ফীদ্ দিওয়ান' (তার জন্য যা নির্ধারিত রয়েছে পর্যায় তালিকায়)। 'ফুরুদ্বুল আসকার' অর্থ সৈনিকের নির্ধারিত বেতন। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'ফারদ্ব' শব্দটির অর্থ 'হালাল' বা বৈধ। অর্থাৎ নবীর জন্য যা বৈধ করা হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'পূর্বে যে সব নবী অতীত হয়ে গিয়েছে, তাদের ক্ষেত্রেও এটাই ছিলো আল্লাহ্র বিধান। আল্লাহ্র বিধান সুনির্ধারিত'। এখানে পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে বিশেষভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে হজরত দাউদ ও হজরত সুলায়মানের প্রতি। তাঁদেরও স্ত্রীর সংখ্যা ছিলো অনেক। আর তাঁদের ওই অধিকসংখ্যক স্ত্রী গ্রহণও ছিলো সম্পূর্ণত বিধিসম্মত, যা আল্লাহ্ কর্তৃক সুনির্ধারিত। উল্লেখ্য, হজরত দাউদ এক রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন এবং পরে তাঁকে বিবাহ করেছিলেন। রসুল স. ও হজরত যয়নাবের বিবাহের বিষয়টি সে ধরনেরই। কালাবী তাই বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে হজরত দাউদের ওই ঘটনাটির দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন এখানকার 'সুন্নত' শব্দটির অর্থ বিবাহ। কেননা বিবাহ হচ্ছে নবীগণের সুন্নত। আবার কেউ কেউ বলেছেন, 'সুন্নত' অর্থ এখানে অধিকসংখ্যক স্ত্রী, যেমন ছিলো হজরত দাউদ ও হজরত সুলায়মানের।

পরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'তারা আল্লাহ্র বাণী প্রচার করতো, আর আল্লাহ্কে ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতো না'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি যেমন আল্লাহ্কে ভয় করে চলেন এবং তাঁর বাণী প্রচার করেন, আপনার পূর্ববর্তী নবী-রসুলগণও সেরকমই করতো।

এরপর বলা হয়েছে— 'হিসাব গ্রহণে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট'। একথার অর্থ— আল্লাহ্‌র নিকটে যখন সকলকে একদিন হিসাব বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য দাঁড়াতে হবে, তখন ভয় করে চলা উচিত শুধামাত্র তাকেই। অথবা কথাটির মর্মার্থ হবে— ভীতিসংকুল অবস্থায় পরিত্রাতা হিসেব আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

এরপরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'মোহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন'। একথার অর্থ— ওহে সমালোচকেরা! তোমরাই বলো, আমার নবী মোহাম্মদ কি জায়েদের জন্মদাতা পিতা? তোমরা ভুলে যাচ্ছো কেনো যে, তিনি তার পালকপিতা। সুতরাং তার ছেড়ে দেওয়া স্ত্রীকে তিনি বিবাহ করতে পারবেন না কেনো। পিতা ও পিতৃতুল নিশ্চয় এক কথা নয়।

প্রশ্ন করা যেতে পারে, হজরত কাসেম, হজরত তৈয়ব, হজরত তাহের ও হজরত ইব্রাহিম ছিলেন রসুল স. এর ঔরষজাত পুত্র। আর ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইনও তাঁর সন্তান। তাহলে 'মোহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন' এরকম বলা হলো কেনো ? এর জবাবে বলা যেতে পারে, রসুল স. এর পুত্র চতুষ্ঠয় পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন অতি শৈশবে। সুতরাং তাঁদেরকে 'পুরুষ' বা পূর্ণবয়স্ক কোনো ব্যক্তি বলা যায় না। আর ইমাম ভ্রাতৃদ্বয় তার সরাসরি সন্তান নন। সুতরাং তিনি তাদের পিতা— একথাও কিছুতেই বলা যায় না।

এরপর বলা হয়েছে— 'বরং সে আল্লাহ্‌র রসুল এবং শেষ নবী'। একথার অর্থ— নবী রসুলগণ অবশ্যই তাঁদের উম্মতের প্রতি হন পরম স্নেহপরবশ এবং তাদের কল্যাণাকাংখী। যেমন পিতা স্নেহ পরায়ণ ও কল্যাণকামী হন তাদের পুত্রদের প্রতি। এদিক থেকে তাঁরা অবশ্যই তাঁদের আপনাপন উম্মতের পিতা, বংশগত দিক দিয়ে নন।

এখানে 'খাতাম' অর্থ সমাপ্ত। আর 'খাতিম' অর্থ সমাপ্তকারী। 'খাতামান নবীয়্যীন' অর্থ সর্বশেষ নবী। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ হচ্ছে— নবুয়তের প্রবহমানতা যদি আমি মোহাম্মদ পর্যন্ত সমাপ্ত না করতাম, তবে তাকে করতাম কোনো প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের পিতা, যে নবী হতো তাঁর মহাতিরোধানের পর। আতার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক যেহেতু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, মোহাম্মদ মোস্তফা স.ই শেষ নবী, সেহেতু তিনি তাঁর কোনো পুত্রকেই প্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় পৌঁছাননি। ইবনে মাজার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. তাঁর অকালপ্রয়াত পুত্র হজরত ইব্রাহিম সম্পর্কে বলেছেন, সে বেঁচে থাকলে নবী হতো।

একটি প্রশ্ন ঃ রসুল স. সর্বশেষ নবী। কিন্তু একথাও তো ঠিক যে, হজরত ঈসা পুনরাবির্ভূত হবেন। তাহলে রসুল স. আর সর্বশেষ নবী থাকলেন কী করে?

জবাব ঃ হজরত ঈসার পুনরাবির্ভাব ঘটবে ঠিকই। কিন্তু তা নবী হিসেবে নয়, বরং শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা স. এর উম্মত হিসেবে এবং তিনি জীবনযাপন করবেন রসুল স. এর শরিয়তের বিধানানুসারে। সুতরাং রসুল স. এর সর্বশেষ নবী হওয়ার ক্ষেত্রে তিনি অন্তরায় নন।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ'। একথার অর্থ— সকল কিছুই আল্লাহ্র জ্ঞানায়ত্ত বলেই তিনি ভালোভাবে জানেন কাকে করতে হবে সর্বশেষ নবী। কার মাধ্যমে সমাপ্ত করতে হবে নবুয়তের ধারা।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, অন্যান্য নবী ও আমার দৃষ্টান্ত এরকম— যেমন নির্মিয়মান একটি প্রাসাদ। নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার শেষপ্রান্তে খালি রাখা হলো মাত্র একটি ইট বসাবার জায়গা। নবুয়তের ওই ইমারতের শূন্য স্থানটুকু পূরণ করা হলো আমাকে দিয়ে। এভাবেই আমার উপরে পরিসমাপ্ত হলো নবুয়তের প্রবহমানতা। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, ওই ইটটিই আমি। আর আমিই হলাম সর্বশেষ নবী।

হজরত যোবায়ের ইবনে মুতইম বলেছেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, আমার নাম অনেকগুলো। যেমন মোহাম্মদ, আহমদ, মাহী। আমার দ্বারা উৎখাত করা হয়েছে কুফরী। আমি হাশের (একত্রকারী)। মহাবিচারের দিবসে জনগণকে একত্রিত করা হবে আমারই পতাকাতলে। আমি খাতেম (পশ্চাদবর্তী)। তাই নবী হিসেবে সকলের শেষে ঘটেছে আমার আবির্ভাব। আমার পরে আর কোনো নবী আগমন করবে না।

হজরত আবু মুসা আশয়ারী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমার অনেকগুলো নাম রয়েছে। আমি মোহাম্মদ, আহমদ, মুকাফ্ফা, হাশের। আমারই নাম নবী উত্তওবা। আবার আমারই নাম নবীউর রহমত।

সূরা আহযাব ঃ আয়াত ৪১, ৪২

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾

r হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ কর,

r এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করো'। একথার অর্থ— হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত করো আল্লাহ্র জিকিরের সঙ্গে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা প্রতিটি পুণ্যকর্মের সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু জিকিরের জন্য কোনো সীমা নির্ধারণ করে দেননি। অক্ষমতার ক্ষেত্রে অবশ্য বিধানটি শিথিল হলেও হতে পারে। কিন্তু জিকিরের কোনো সীমানা আসলে নেই। নেই কোনো অজুহাতও। বিষয়টি শিথিল কেবল পাগলদের ক্ষেত্রে। অন্য সকলের ক্ষেত্রে বিধানটি অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই জিকির পরিত্যাগ করা যাবে না। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্র জিকির করে দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে.....'। এখানেও তেমনি বলা হয়েছে— তোমরা আল্লাহ্কে স্মরণ করো অধিক পরিমাণে। অর্থাৎ জিকির করো নিশিথে-দিবসে-জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সুস্থ-অসুস্থ-প্রকাশ্য-গোপন সকল অবস্থায়। মুজাহিদ বলেছেন, অধিক পরিমাণে জিকির করার মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্র কথা কখনোই বিস্মৃত না হওয়া। আমি বলি, এরকম অবস্থা লাভ হতে পারে কেবল তখন, যখন লাভ হয় ফানায়ে কলব বা আত্মিক বিনাশন। এমতাবস্থায় অন্তর্জগতে সতত জাগ্রত থাকে আল্লাহ্র জিকির।

পরের আয়তে (৪২) বলা হয়েছে— 'এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো'। এখানে 'সাব্বিহুহু বুকরাতান' অর্থ সমাপন করো ফজরের নামাজ। আর 'ওয়া আসীলা' অর্থ আরো সমাধা করো জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন কালাবী। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'তাসবীহ' অর্থ 'সুবহানাল্লহ্, আলহামদুলিল্লহ্ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লহু আকবর ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলীয়্যিল আ'জীম' পাঠ করা। অর্থাৎ 'তাসবীহ্' অর্থ এখানে সমার্থক শব্দে গঠিত বাক্যাবলী। যেমন তাসবীহ্ তাহমীদ, তাহলীল, তাকবীর। উল্লেখ্য এসকল কিছু সহযোগে গঠিত উপযুক্ত বাক্যাংশ অথবা সম্পূর্ণ বাক্যাংশ ওজু-বেওজু এমনি নাপাক অবস্থায়ও মনে মনে অথবা মুখে মুখে উচ্চারণ করা যায়।

আমি বলি, প্রথমোক্ত আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা নির্দেশ করেছেন সাধারণভাবে সকল অবস্থায় জিকিরমগ্ন থাকার কথা। এই জিকির হচ্ছে জিকরে খফি (প্রচ্ছন্ন জিকির)। আর আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে বিশেষ বিশেষ সময়ে সম্পাদব্য জিকির অর্থাৎ নামাজ পাঠ করার কথা। এই জিকির হচ্ছে জিকরে জলি (প্রকাশ্য জিকির)। অর্থাৎ ফরজ, সুন্নত ইত্যাদি প্রকাশ্যে প্রতিপালন করতে বলা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, এখানে বিশেষ করে সকাল-সন্ধ্যা 'তাসবীহ' পাঠ করতে বলা হয়েছে এ কারণে যে, এই দুই সময় দায়িত্বদল হয় দিবারাত্রির ফেরেশতা দলদ্বয়ের। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, আসরের সময় পৃথিবীতে নেমে আসে নতুন ফেরেশতার দল। তখন

বিগত দিনের ফেরেশেতারা উঠে যায় উর্ধ্বাকাশে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আমার বান্দারেদকে কী অবস্থায় দেখে এসেছো? ফেরেশতারা বলে, আমরা গতকাল আসরের সময় গিয়ে তাদেরকে নামাজরত অবস্থায় দেখেছি, আবার আজ আসরের সময় দেখে এলাম নামাজরত অবস্থায়। বোখারী, মুসলিম।

কোনো কোনো জ্ঞানপ্রবীণ বলেছেন, আগের আয়াতের 'উজকুর' (স্মরণ করো) এবং এই আয়াতের 'সাববিহুহু' (পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করো) দু'টো ক্রিয়াই কার্যকর হবে এখানকার 'বুকরাতাঁও ওয়া আসীলা' (সকাল-সন্ধ্যায়) কথাটির উপর এবং বক্তব্যটি দাঁড়াবে— নামাজ সমূহ এবং অন্যান্য ইবাদত সমাধা করো উদাসীনতাবিবর্জিতভাবে, নিবিষ্টচিত্তে। হজরত আবুজর গিফারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, বান্দা যতক্ষণ মনোযোগের সঙ্গে নামাজ পাঠ করে, ততক্ষণ আল্লাহ্ও মনোযোগী থাকেন তার প্রতি। আর যখন এদিকে ওদিকে মন দেয়, তখন আল্লাহ্ও তার উপর থেকে উঠিয়ে নেন তাঁর মনোযোগ। আহমদ, নাসাঈ, আবুদাউদ, দারেমী।

হজরত আনাস থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, যখন অবতীর্ণ হলো 'নিশ্চয় আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী দরূদ প্রেরণ করেন তাঁর নবীর প্রতি' তখন হজরত আবু বকর নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র প্রিয়তম রসুল! আল্লাহ্ আপনাকে দয়া করে যে বিশেষ মর্যাদা দান করলেন, আমাকেও অংশদানে ধন্য করুন। তাঁর এমতো নিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সূরা আহযাব ঃ আয়াত ৪৩, ৪৪

هُوَ الَّذِىۡ يُصَلِّىۡ عَلَيۡكُمۡ وَمَلٰٓٮِٕكَتُهٗ لِيُخۡرِجَكُمۡ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوۡرِ‌ ؕ وَكَانَ بِالۡمُؤۡمِنِيۡنَ رَحِيۡمًا ﴿۴۳﴾ تَحِيَّتُهُمۡ يَوۡمَ يَلۡقَوۡنَهٗ سَلٰمٌ ۖۚ وَاَعَدَّ لَهُمۡ اَجۡرًا كَرِيۡمًا ﴿۴۴﴾

r তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁহার ফিরিশ্তাগণও তোমাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে অন্ধকার হইতে তোমাদিগকে আলোকে আনিবার জন্য, এবং তিনি মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু।

r যেদিন তাহারা আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাত করিবে, সেদিন তাহাদের প্রতি অভিবাদন হইবে 'সালাম'। তিনি তাহাদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন উত্তম প্রতিদান।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও তোমাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে'।

বাগবী লিখেছেন, 'সালাত' যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়, তবে তার অর্থ হয় অনুগ্রহ, অনুকম্পা, করুণা, কৃপা, দয়া বা রহমত। আর যদি হয় ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে, তবে তার অর্থ হয় অনুগ্রহ প্রার্থনা বা ক্ষমা প্রার্থনা। কেউ কেউ বলেছেন, বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র সালাত অর্থ বান্দার উত্তম জিকিরকে তার স্বজাতীয়দের মধ্যে বিস্তার করা। আবার কেউ কেউ বলেছেন, 'সালাতুল্লাহ' বা আল্লাহ্‌র সালাত অর্থ আল্লাহ্ প্রশংসা করেন তাঁর বান্দার। 'কামুস' গ্রন্থে রয়েছে, 'সালাত' অর্থ করুণাকামনা, মার্জনাযাচনা, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রসুল স. এর প্রতি সাধুবাদ। আর রুকু সেজদাসহ ইবাদত। কামুস রচয়িতার বাক্যে আরো জানা যায়, সালাত শব্দটি বহু অর্থবোধক। ভাষাবিদগণের মতে একই সময়ে একই বাক্যে বহু অর্থবোধক কোনো শব্দের বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ যদি ব্যাকরণসিদ্ধ হয়, তবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্ তোমাদের উপরে করেন অনুগ্রহ এবং ফেরেশতারা তোমাদের জন্য কামনা করেন মার্জনা।

জমহুর বলেন, বহু অর্থবোধক কোনো শব্দের বহু অর্থের একত্রায়ণ সিদ্ধ নয়। তাই বুঝতে হবে আলোচ্য আয়াতে 'সালাত' শব্দটি রূপকার্থে সাধারণভাবে সন্নিবেশিত। অর্থাৎ শব্দটি এখানে রূপকার্থক হলেও এর মধ্যে নিহিত রয়েছে রূপক-তাত্ত্বিক উভয় দিক। অর্থাৎ তোমাদের কর্মের মূল্যায়ন ও প্রীতিপ্রদর্শনের বিষয়ে দৃষ্টিনিবদ্ধ করেন আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী, যুগপৎ আল্লাহ্ বর্ষণ করেন করুণা এবং তাঁর ফেরেশতারা কামনা করেন মার্জনা।

অধিকাংশ ভাষা বিশারদগণ বলেন, সালাত অর্থ দোয়া করা। যেমন— 'সল্লাইতু আলাইহি' (আমি তার জন্য দোয়া করেছি)। রসুল স. নির্দেশ করেছেন, পানাহারের জন্য আমন্ত্রণ পেলে তা গ্রহণ করা উচিত। আর রোজা অবস্থায় থাকলে আমন্ত্রণকারীর জন্য করা উচিত দোয়া। যেমন আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন— 'সাললি আ'লাইহিম' (হে নবী! তাদের জন্য দোয়া করুন। আপনার দোয়া তাদের জন্য প্রশান্ত।)।

নামাজে দোয়া প্রার্থনা করা হয় বলেই নামাজের নাম 'সালাত'। যেমন— ইহ্‌দিনাস্ সিরাত্বল মুসতাক্বীম' (আমাকে চালনা করো সরল সঠিক পথে)। এখানে আংশিক অবস্থাকে গ্রহণ করা হয়েছে সামগ্রিক অর্থে। এ রীতিটি সুপ্রচল। আর এভাবে 'সালাতুল্লাহ্' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্‌র দোয়া। অর্থাৎ তিনি নিজের পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের জন্য কামনা করেন রহমত ও মাগফিরাত। এভাবেই তিনি তাঁর আপন মহিমায় ও অভিপ্রায়ে নিজের উপরে আনিবার্য করে নেন বান্দার

উপরে করুণা বর্ষণ করাকে। উল্লেখ্য, 'কাতাবা আলা নাফসিহীর রহমত' কথাটির মর্মার্থও তাই। এভাবে কামনা করা ও অনিবার্য করে নেওয়ার উদ্দেশ্য দাঁড়ায় একটিই। একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, দৃঢ় কামনাই পরিগ্রহ করে অনিবার্য বাস্তবরূপ। তবে একথাটিও মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্তায়ালা কোনো কিছু করতে বাধ্য নন। কারণ তিনি চিরঅমুখাপেক্ষী এবং তিনি তাঁর অভিপ্রায় প্রয়োগের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন, চিরমুক্ত। বরং বলা যেতে পারে, তিনি কেবল করুণাপরবশ হয়েই নিজের উপরে অনুগ্রহ বর্ষণ করার কাজটিকে আবশ্যিক করে নিয়েছেন। আর 'সালাত' অর্থ যদি 'দোয়া' বলে নেওয়া হয়, তবে শব্দটিকে বহু অর্থবোধক বলার অবকাশ বা আবশ্যক আর থাকে না। বনী ইসরাইলেরা হজরত মুসাকে প্রশ্ন করেছিলো, আমাদের পালনকর্তা কি সালাত সম্পন্ন করেন? প্রশ্নটি হজরত মুসাকে বিব্রত করেছিলো। আল্লাহ্পাক বিব্রতকর অবস্থা থেকে তাঁর প্রিয় নবীকে উদ্ধারার্থে প্রত্যাদেশ করলেন— হে আমার নবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও, তোমাদের প্রভুপালনকর্তাও সালাত সম্পন্ন করেন, কিন্তু তাঁর ওই সালাত পরিণত হয় রহমতে, যে রহমত পরিবেষ্টন করে রয়েছে সকল কিছুকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'অন্ধকার থেকে তোমাদেরকে আলোকে আনবার জন্য'। একথার অর্থ— আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও তাঁর ফেরেশতাদের অনুগ্রহপ্রার্থনার বদৌলতেই তোমাদেরকে আনা হয় সত্যপ্রত্যাখ্যানপ্রবৃত্তি ও অবাধ্যস্বভাবের অন্ধকার থেকে বিশ্বাস ও আনুগত্যের অমল আলোয়। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদেরকে দূরবর্তীতার তমসা থেকে কখনো কখনো আনেন তাঁর নৈকট্যের আলোকচ্ছটায়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— এবং তিনি বিশ্বাসীদের প্রতি সীমাহীন করুণাপরবশ। তাঁর অনুগ্রহ, ফেরেশতাদের দোয়া ইত্যাদিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

পরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'সেদিন তারা আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাত করবে, সেদিন তাদের প্রতি অভিবাদন হবে সালাম। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন উত্তম প্রতিদান'।

এখানে 'তাহিয়্যাতুহুম' অর্থ সেদিন তারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে লাভ করবে অভিবাদন। আর 'ইয়াওমা ইয়াল্কাওনাহু' অর্থ যেদিন তারা সাক্ষাত করবে আল্লাহ্র সাথে। অর্থাৎ সেদিন সমুপস্থিত হবে তাদের মৃত্যু, পুনরুত্থানপর্ব, জান্নাত গমনের লগ্ন, অথবা আল্লাহ্ দর্শনের সময়।

'সালাম' অর্থ শান্তি-সম্ভাষণ। অর্থাৎ বিশ্বাসীরা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অভিবাদন হিসেবে লাভ করবে শান্তি-সম্ভাষণ। অর্থাৎ তিনি জান্নাতবাসীদেরকে জান্নাতে রাখবেন মহা শান্তিতে। আর 'আজরান কারীমা' অর্থ সম্মানজনক পুরস্কার, উত্তম প্রতিদান। অর্থাৎ জান্নাত। অথবা তাঁর দর্শন ও সন্তোষ।

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ﴿٤٥﴾
وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا ﴿٤٦﴾

r হে নবী ! আমি তো তোমাকে পাঠাইয়াছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদাতা ও সতর্ককারীরূপে,

r আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাঁহার দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।

এখানে 'শাহিদান' অর্থ সাক্ষীরূপে। ইবনে মোবারকের বর্ণনায় এসেছে, সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এমন কোনো দিন আসে না, যেদিন রসুল স. এর সম্মুখে তাঁর উম্মতগণকে উপস্থিত না করা হয়। তাই তিনি স. তাঁর উম্মতকে দেখলেই চিনতে পারেন। সেকারণেই তিনি তাদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করতে পারবেন। দেখলেই বলতে পারবেন, হ্যাঁ, এই ব্যক্তি আমার উম্মত। অথবা তিনি সাক্ষ্যদাতা হবেন এই অর্থে— মহাবিচারের দিবসে তাঁর উম্মতেরা পূর্ববর্তী নবী-রসুল সম্পর্কে এইমর্মে সাক্ষ্য প্রদান করবেন যে, তাঁরা তাঁদের আপনাপন উম্মতের নিকট যথারীতি আল্লাহ্র বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। তখন তিনি স. সাক্ষ্য দিবেন, হ্যাঁ। আমার উম্মত সত্য সাক্ষ্য দিয়েছে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী, তিরমিজি, নাসাঈ ও ইবনে মাজা উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে ডাকা হবে নবী নুহকে। বলা হবে, তুমি কি তোমার সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে আমার বাণী যথাযথরূপে পৌঁছে দিয়েছিলে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের ডেকে বলা হবে, নুহের বক্তব্য কি সত্য? তারা বলবে, না। নবী নুহকে পুনর্বার জিজ্ঞেস করা হবে, তোমার বক্তব্যের পক্ষে কি কোনো সাক্ষী আছে? নবী নুহ বলবেন, হ্যাঁ। সর্বশেষ বাণীবাহক ও তাঁর উম্মতেরাই আমর সাক্ষী। উল্লেখ্য, এরকম হাদিস রয়েছে অনেক।

'মুবাশ্শিরান' অর্থ সুসংবাদ দাতারূপে। অর্থাৎ তাদের প্রতি জান্নাতের শুভবারতাদাতা, যারা বিশ্বাস করেছে সকল নবী-রসুলকে। আর 'নাজীরা' অর্থ সতর্ককারীরূপে বা ভীতিপ্রদর্শনকারীরূপে। অর্থাৎ ভীতিপ্রদর্শনকারী তাদের প্রতি যারা অস্বীকার করেছে নবী-রসুলগণকে।

পরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে'। একথার অর্থ— আল্লাহ্পাক তাঁর

রসুলকে এইমর্মে প্রেরণ করেছেন, যেনো তিনি কেবল আল্লাহ্‌র আদেশানুসারে চালিয়ে যান তাঁর আহ্বানকর্ম— জান্নাতের দিকে, অথবা আল্লাহ্‌র আনুরূপ্যবিহীন দীদারের দিকে। উল্লেখ্য, এখানে 'তাঁর অনুমতিক্রমে' বলে আহবানকর্মকে করা হয়েছে সীমায়িত। কারণ এ দায়িত্বটি অনেক গুরু। আল্লাহ্‌পাকের বিশেষ সহায় ও সামর্থ্য না থাকলে এ গুরুদায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা যায় না কিছুতেই। বিশেষ করে আল্লাহ্‌র দীদারের বিষয়টি সুকঠিন। তাই এর প্রতি আহবানও অত্যন্ত গুরুতর। আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ না পেলে আল্লাহ্‌র বান্দাকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে উপনীত করানো সম্পূর্ণতই অসম্ভব। সেকারণেই এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'আপনি যদি কাউকে গন্তব্যে পৌঁছাতে চান, তবে সক্ষম হবেন না। গন্তব্যে উপনীত করাতে পারেন আল্লাহ'।

হজরত রবীয়া জারাশী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, একবার আমি স্বপ্নে দেখলাম, দু'জন লোক এসে দাঁড়ালো আমার পাশে। একজন বললো, এই ব্যক্তি কি নিদ্রাভিভূত? অন্য জন বললো, হ্যাঁ, নিদ্রাভিভূত কেবল তাঁর চোখ। কিন্তু তাঁর কান ও হৃদয় জাগ্রত। তাই তিনি নিদ্রামধ্যেও শোনেন ও বোঝেন। আর একজন কে যেনো বললো, জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি নির্মাণ করলো একটি প্রাসাদ। আয়োজন করলেন অতিথি আপ্যায়নের। তারপর মানুষকে নিমন্ত্রণ জানানোর জন্য পাঠিয়ে দিলেন এক ঘোষককে। ঘোষক নির্দেশ পালন করলেন যথাযথভাবে। তাঁর আহবান শুনে কেউ এসে জড়ো হলো ওই প্রাসাদে। ভোজনপর্ব সমাধা করে হলো পরিতৃপ্ত। আমন্ত্রণকারীও খুশী হলেন খুব। বঞ্চিত হলো কেবল তারা, যারা তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করলো না। রুষ্টও হলেন তিনি ওই আমন্ত্রণপ্রত্যাখ্যানকারীদের উপরে। এখানে আমন্ত্রণকারী অর্থ স্বয়ং আল্লাহ্, যিনি মহাবিশ্বের মহাপ্রভু-পালয়িতা। ওই প্রাসাদ হচ্ছে ইসলাম। ঘোষক হচ্ছেন নবীকুলশিরোমণি রসুলে পাক স.। আর পানাহারের আয়োজন হচ্ছে জান্নাত।

'সিরাজাম মুনীরা' অর্থ উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। এখানে উজ্জ্বল প্রদীপ বলে বুঝানো হয়েছে রসুল স.কে। অর্থাৎ পথভ্রষ্টতার ঘোর অন্ধকারে হেদায়েতের সমুজ্জ্বল প্রদীপ। প্রকৃত কথা হচ্ছে, রসুল স. মানুষের প্রতি সত্যগ্রহণের আহবান জানাতেন মৌখিকভাবে। আর আত্মিকভাবে তিনি স. হচ্ছেন সমুজ্জ্বল প্রদীপ, বিশ্বাসীরা ওই প্রদীপের আলোক দ্বারা আলোকিত করে নেয় তাদের বক্ষাভ্যন্তর। এভাবে তারাও আসত্তা রঞ্জিত হয় তাদের প্রিয়তম নবীর আভ্যন্তরীন রঙে। যেমন ধরাপৃষ্ঠকে আলোকিত করে দিবাকর। আর অন্ধকার গৃহ আলোকিত হয় প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের আলোয়। সাহাবায়ে কেরামই এমতো আলোকিত ব্যক্তিগণের পথিকৃত। অর্থাৎ

সমুজ্জ্বল প্রদীপের আলোয় সরাসরি ও সর্বপ্রথম আলোকিত হবার ও করবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন তাঁরাই। তাঁদের মাধ্যমে আলোকিত হয়েছেন তাবেয়ীগণ। তাঁদের মাধ্যমে আলোকিত হয়েছেন তাবে তাবেয়ীন। এভাবে প্রজন্মপরম্পরায় বায়াতের প্রেমময় বন্ধন ও বিশুদ্ধ আনুগত্যের মাধ্যমে এমতো আলোকায়নের আয়োজন চলতেই থাকবে মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত।

আতা ইবনে ইয়াসার বর্ণনা করেছেন, একবার আমি হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আসকে বললাম, আপনি তওরাত পাঠ করেছেন। সেখানে নাকি রসুল স. এর বৈশিষ্ট্যাবলীর বিবরণ রয়েছে। দয়া করে তার কিছু বর্ণনা করবেন কী? তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ! তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলীর বিবরণ কিছু কিছু কোরআনেও রয়েছে। তওরাতের বিবরণ এরকম— সর্বশেষ রসুল হবেন শুভসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী, হবেন দুস্থ জনতার আশ্রয়স্থল। আরো হবেন আমার অতি অন্তরঙ্গ দাস ও প্রেরিত পুরুষ। আমি তাঁর নাম রেখেছি 'মুতাওয়াক্কিল'। তাই তিনি স্বযোগ্যতা ও স্বশক্তির উপরে নির্ভরশীল হবেন না। সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করবেন কেবল আমার উপরে। তাঁকে দান করা হয়েছে অনেক সুন্দর স্বভাব। তিনি বাজারে শোরগোলকারী হবেন না। অন্যায়ের প্রতিশোধ নিবেন না অন্যায়ের দ্বারা। বরং তিনি হবেন ক্ষমাপ্রবণ। স্বসম্প্রদায়ের লোকদেরকে সম্পূর্ণ বশে না আনা পর্যন্ত তাঁর পৃথিবীর জীবন সাঙ্গ হবে না। তাঁর মহাপ্রস্থান সংঘটিত হবে তখন, যখন মানুষ স্বতঃস্ফুর্তভাবে বলবে— লা ইলাহা ইল্লাল্লহ। তাঁর দ্বারাই উন্মোচন করা হবে অন্ধ চক্ষু, বধির কর্ণ ও পর্দাচ্ছাদিত হৃদয়ের দরোজা। বোখারী। আতা ইবনে সালাম থেকে দারেমীও এরকম বর্ণনা করেছেন।

হজরত রবী ইবনে আনাসের একটি বর্ণনা বায়হাকীর 'দালায়েলুন নবুয়ত' পুস্তকে গ্রন্থিত হয়েছে এভাবে— 'আমি জানি না আমাকে নিয়ে কী করা হবে? এবং তোমাদেরকে নিয়েই বা করা হবে কী'? অর্থাৎ মৃত্যুর পরে আমার কিংবা তোমাদের ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে সে ব্যাপারে আমি কোনোকিছুই অবগত নই— এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরপর অবতীর্ণ হলো 'আল্লাহ্ আপনার পূর্বাপর ভুল মার্জনা করার জন্য......, তখন কিছু সংখ্যক মুসলমান বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনাকে অভিনন্দন। মহাবিচারের দিবসে আপনার সঙ্গে কী আচরণ করা হবে, তা আর অস্পষ্ট রইলো না। কিন্তু আমাদের পরিণতি সম্পর্কে তো আমরা কিছুই জানলাম না। তাদের একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত।

وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ﴿٤٧﴾ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعْ اَذٰىهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿٤٨﴾

r তুমি মু'মিনদিগকে সুসংবাদ দাও যে, তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট রহিয়াছে মহাঅনুগ্রহ।

r আর তুমি কাফির ও মুনাফিকদের কথা শুনিও না, উহাদের নির্যাতন উপেক্ষা করিও এবং নির্ভর করিও আল্লাহ্‌র উপর; কর্মবিধায়করূপে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— 'হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি বিশ্বাসীগণকে এইমর্মে শুভবারতা প্রদান করুন যে, তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে রয়েছে সুবিশাল অনুকম্পা।

ইকরামা ও হাসান বসরী থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, এখানে 'ফজলে কাবীরা' (মহানুগ্রহ) বা সুবিশাল অনুকম্পা অর্থ জান্নাত।

পরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'আর তুমি কাফের ও মুনাফিকদের কথা শুনিও না, তাদের নির্যাতন উপেক্ষা করিও'। একথার অর্থ— হে আমার বার্তাবাহক! আপনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও কপটদের অপমন্তব্যসমূহের প্রতি কর্ণপাত করবেন না । উপেক্ষা করবেন তাদের দ্বারা প্রাপ্ত নিগ্রহ-নির্যাতনকে। উল্লেখ্য, আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর প্রিয়তম রসুলকে নির্দেশ দিয়েছেন সত্যপ্রত্যাখ্যান ও কাপট্যের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় অবস্থানের।

হজরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদা বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ— হে আমার বচনবাহক! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও কপটাচারীদের দিক থেকে যতো বিপদই আসুক না কেনো, আপনি তার বিরুদ্ধে করুন ধৈর্যাবলম্বন।

'দায়্' অর্থ উপেক্ষা করুন, ছেড়ে দিন, পরিত্যাগ করুন। অর্থাৎ কোনো পরওয়াই করবেন না।

জুজায বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের অর্থ— আপনি তাদের সঙ্গে বিতণ্ডায় লিপ্ত হবেন না। চেষ্টা করবেন না প্রতিশোধ গ্রহণের। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে বলতে হয়, আলোচ্য বিধানটি রহিত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং নির্ভর করিও আল্লাহ্র উপর; কর্মবিধায়করূপে আল্লাহ্ই যথেষ্ট'। একথার অর্থ— আপনি সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভর করবেন কেবল আল্লাহর উপরে। দেখবেন আপনার সকল কর্মই তাঁর অপার কৌশলে সম্পন্ন হয়েছে সুচারুরূপে। কেননা কর্মবিধায়করূপে তিনিই আপনার জন্য যথেষ্ট। আর একথাও নিশ্চিত জানবেন যে, তিনি আপনাকে কারো মুখাপেক্ষী করেও রাখবেন না।

বায়যাবী লিখেছেন, আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয় রসুলকে বিভুষিত করেছেন পাঁচটি বিশেষ গুণে। যেমন— তিনি 'শাহেদ' (সাক্ষ্যদাতা), 'মুবাশশির' (সুসংবাদদাতা), 'নাজীর' (ভীতিপ্রদর্শনকারী), 'দায়ী ইল্লাল্লহ্' (আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারী) এবং 'মুনীর' (সমুজ্জ্বল প্রদীপ)। আর আল্লাহ্পাক তাঁর এসকল বিশেষ গুণের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে দিয়েছেন বিভিন্ন নির্দেশ। কিন্তু 'শাহেদ' সম্পর্কে সামঞ্জস্যশীল কোনো আদেশ তিনি করেননি। সুসংবাদ দিতে বলেছেন বিশ্বাসীদেরকে, অবিশ্বাসীদেরকে করতে বলেছেন ভীতি প্রদর্শন। মানুষকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করতে বলেছেন তাঁরই অনুমতিক্রমে এবং সমুজ্জ্বল প্রদীপের প্রেক্ষিতে নির্দেশ করেছেন, আল্লাহ্র কর্মবিধায়নের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হতে। কারণ, ওই পরম সত্তাই তাঁকে দান করেছে সত্যের সুউজ্জ্বল দলিল। সুতরাং তিনিই তো কর্মবিধায়করূপে হবেন তাঁর প্রিয়তম বাণীবাহকের জন্য যথেষ্ট।

সূর আহযাব ঃ আয়াত ৪৯

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٤٩﴾

r হে মু'মিনগণ! তোমরা মু'মিন নারীগণকে বিবাহ করিবার পর উহাদিগকে স্পর্শ করিবার পূর্বে তালাক দিলে তোমাদের জন্য তাহাদের পালনীয় কোন ইদ্দত নাই যাহা তোমরা গণনা করিবে। তোমরা উহাদিগকে কিছু সামগ্রী দিবে এবং সৌজন্যের সহিত উহাদিগকে বিধায় করিবে।

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ্য বিধান প্রযোজ্য হবে কেবল মুসলিম রমণীদের ক্ষেত্রে। অবশ্য গ্রন্থধারিণীরাও এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাদের কথা এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়নি। এতে করে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বিশ্বাসবতীকে বিবাহ করাই উত্তম।

'ছুম্মা ত্বলাকতুমুহুন্না' অর্থ বিবাহ করবার পর যদি তালাক দাও। একথার মাধ্যমেই বাগবী প্রমাণ করেন যে, বিবাহপূর্ব তালাক ধর্তব্য নয়। কেননা তালাকের ভিত্তিই হচ্ছে বিবাহ। অতএব কেউ যদি কোনো রমণীকে বলে, তোমাকে যদি আমি বিয়ে করি তবে তুমি তালাক, এরপর সে ওই রমণীকে বিয়ে করলেও তার উপর তালাক কার্যকর হবে না। আবার এরকম উক্তি করার পরও বিবাহের পর তালাক কার্যকর হবে না যে, আমি কোনো রমণীকে বিয়ে করলেই সে তালাক হয়ে যাবে। এরকম অভিমত ব্যক্ত করেছেন হজরত আলী, হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত মুয়াজ, হজরত জাবের, হজরত আয়েশা, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, সাঈদ ইবনে যোবায়ের, ওরওয়া, কাসেম, তাউস, হাসান, ইকরামা, আতা, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার, মুজাহিদ, শা'বী, কাতাদা প্রমুখ। ইমাম শাফেয়ীর সিদ্ধান্তও এরকমই।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেন, উপরে বর্ণিত দু'টি অবস্থাতেই তালাক কার্যকর হবে। ইব্রাহিম নাখয়ী, ইমাম আবু হানিফা এবং সাহেবাইনের অভিমতও এরকম। এভাবে দাসমুক্তিকেও কেউ কেউ মালিকানার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে। যেমন কেউ বললো, আমি যখন দাস-দাসীর মালিক হবো, তখন তারা হবে মুক্ত। অথবা বলে, আমি যখন অমুক দাস বা দাসীর মালিক হবো, তখন সে মুক্ত। এমতাবস্থায় দাস-দাসী ক্রয় করলেও তারা মুক্ত হবে না।

রবীয়া, আওজায়ী ও মালেক বলেন, কেউ যদি কোনো মহিলাকে নির্দিষ্ট করে বলে, তাকে যদি আমি বিয়ে করি তবে সে তালাক, তবে ওই মহিলাকে বিয়ে করার পরক্ষণে সে তালাক হয়ে যাবে। আর যদি এভাবে নির্দিষ্ট না করে, তবে তালাক বর্তাবে না।

ইকরামার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, লোকেরা হজরত ইবনে মাসউদের সঙ্গে একটি ভুল সিদ্ধান্তের সংযোগ ঘটিয়েছে। তিনি এরকম বলতেই পারেন না যে, কোনো লোক কোনো রমণীকে নির্দিষ্ট করে বললো, তুমি তালাক হয়ে যাবে যদি আমি তোমাকে বিয়ে করি— এমতাবস্থায় ওই লোক ওই রমণীকে বিয়ে করলে সে তালাক হয়ে যাবে। এরকম বললে তো তা হয়ে যায় আল্লাহ্তায়ালার কথার বিপরীত। কারণ আল্লাহ্ বলেছেন 'তোমরা বিশ্বাসবতীদেরকে বিবাহ করবার পর তাদেরকে তালাক দিলে.....'। সুতরাং তাঁর কথা কিছুতেই আল্লাহ্র কথার বিরুদ্ধে যেতে পারে না। কেননা তালাকের ঘোষণাতো বিবাহের আগে কিছুতেই হওয়া সম্ভব নয়। অতএব, লোকে তাঁর সম্পর্কে এ ব্যাপারে যা বলে তা ভুল।

ইমাম শাফেয়ীর অভিমতের সমর্থনে বাগবী উপস্থাপন করেন একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বিবাহের

পূর্বে তালাক হয় না। আমি বলি হাকেম হাদিসটি সংকলন করেছেন তাঁর ‘মুসতাদরাক’ গ্রন্থে। হাদিসটির সূত্রপরম্পরাগত যথার্থতাও নিরূপণ করেছেন তিনি। আরো বলেছেন, বোখারী ও মুসলিম হাদিসটি কেনো যে, তাঁদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি, সে কথা ভেবে আমি অবাক হয়ে যাই। কেননা তাঁদের শর্তানুসারেই হাদিসটি বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত।

ইমাম আহমদ বলেন, কেউ যদি বিবাহকে তালাকের শর্তাধীন করে, তবে বিবাহ করার পরক্ষণেই তালাক কার্যকর হবে। আর কেউ যদি দাসমুক্তিকে করে তার মালিকানার শর্তাধীন, তবে এমতোক্ষেত্রে ইমাম আহমদের পাওয়া যায় দুটি পরস্পরবিরোধী অভিমত। ইমাম মালেক বলেন, কেউ যদি বলে, আমি অমুক জায়গার অমুক গোত্রের অমুক রমণীর পাণিগ্রহণ যদি করি, তবে সে হয়ে যাবে তালাক, তবে বিবাহ করার সঙ্গে সঙ্গে সে হয়ে যাবে তালাক। আর এরকম নির্দিষ্ট করে কোনো কিছু না বললে তালাক বর্তাবে না।

ইবনে জাওজী ইমাম আহমদের অভিমতের প্রেক্ষিতে উপস্থাপন করেছেন ছয়টি হাদিস। যেমন— ১. আমর ইবনে শোয়াইব তাঁর পিতার মাধ্যমে পিতামহের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যাকে বিয়ে করা হয়নি তার উপর তালাক প্রযোজ্য নয়। তেমনি প্রযোজ্য নয় কোনো দাসের মুক্তি তাকে ক্রয় অথবা অধিকারভূত করার আগে। অধিকার করার আগে তাকে অন্য কারো কাছে বিক্রয় করার ঘোষণাও সিদ্ধ নয়। ইমাম আহমদের পদ্ধতিতে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে জাওজী। সুনান রচয়িতাগণও এর বর্ণনাকারী। তিরমিজি বলেছেন, এই অধ্যায়ে যতগুলো হাদিস লিপিবদ্ধ রয়েছে, তন্মধ্যে এই হাদিসটিই অধিকতর নির্ভরযোগ্য। বায্যারের বর্ণনায় হাদিসটি এসেছে এভাবে— বিয়ের আগে তালাক হয় না। মালিকানায় না এনেও দাসমুক্ত করা যায় না। বায়হাকী তাঁর খেলাফিয়াতে লিখেছেন, বোখারী বলেছেন, এই প্রসঙ্গে হাদিসগুলোর মধ্যে এই হাদিসটি অধিকতর যথার্থ।

২. হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল থেকে তাউসের মাধ্যমে আমর ইবনে শোয়াইব বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, অধিকৃত হওয়ার পূর্বে তালাক বর্তাবে না, এবং দাসকে করা যাবে না মুক্ত অথবা বিক্রয়। মানত ও অনধিকৃত বিষয়ের উপরে অচল। দারাকুতনী। অপর এক সূত্রেও দারাকুতনী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এভাবে— রসুল স. বলেছেন, বিবাহ ব্যতীত তালাক সিদ্ধ নয়, যদি না নির্দিষ্ট করে কোনো রমণীর নামোল্লেখ করা হয়। হাদিসটির সূত্রপ্রবাহ এরকম ঃ দারাকুত্নী ইব্রাহিম আবু ইসহাক দ্বারীর, তিনি ইয়াজিদ ইবনে আয়াজ, তিনি জুহুরী, তিনি সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, তিনি হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল, তিনি রসুল স. থেকে। ইবনে হাজার বলেন, ইয়াজিদ ইবনে আয়াজ বর্ণনাকারী হিসেবে

পরিত্যক্ত। জাহাবী তাঁর 'ইসতিয়াব' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ইমাম মালেক বলেছেন, ইয়াজিদ ইবনে আয়াজ অসত্যভাষী। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন বলেছেন, সে বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল, অকর্মণ্য। আহমদ ইবনে সার বলেছেন, সে নিজেই হাদিস তৈরী করে। বোখারী ও মুসলিম লিখেছেন, তার বর্ণনা অস্বীকৃত। আবু দাউদ বলেছেন, তার বিবরণ পরিহার্য। নাসাঈ বলেছেন, সে মিথ্যাবাদী, তাই তার বিবৃতি পরিহরণীয়।

৩. দারাকুতনী বলেছেন, আমার নিকট বাকীয়া ইবনে ওয়ালিদ, ছওর ইবনে ইয়াজিদের মাধ্যমে খালেদ ইবনে মা'দান সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু ছা'লাবা খাশানী বলেছেন, একবার আমার পিতৃব্য আমকে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে মিলেমিশে কাজকর্ম করো, আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিবো। আমি বললাম, আমি যদি তাকে বিবাহ করি, তবে আমার পক্ষ থেকে তার জন্য রইলো তিনতালাক। কিছুদিন পরে তাকে বিবাহ করার কামনা জাগলো আমার মনে। আমি তখন বিষয়টি জানালাম রসুল স.কে। তিনি স. বললেন, তুমি নির্দ্বিধায় তাকে বিবাহ করতে পারো। কেননা বিবাহপূর্ব তালাক অকার্যকর। তাঁর নির্দেশানুসারে আমি বিবাহ করলাম আমার ওই পিতৃব্যপুত্রীকে। তার উদরাভ্যন্তর থেকেই জন্ম লাভ করেছে আমার দুই পুত্র আসাদ ও সাঈদ।

জারাসী তাঁর 'মীযান' গ্রন্থে লিখেছেন, নাসাঈ প্রমুখ বলেছেন, বাকীয়া ইবনে ওয়ালিদ যদি 'হাদ্দাছনা' (আমি বর্ণনা করেছি) বলে বর্ণনা করে থাকেন, তবে তাঁর বর্ণনা নির্ভরনীয়। কিন্তু অনেক সমালোচক মন্তব্য করেছেন, বাকীয়া এক্ষেত্রে একজন বর্ণনাকারীর নাম গোপন করেছেন। সুতরাং তিনি 'আমি অমুকের নিকট থেকে শুনে বর্ণনা করছি' যদি এরকম বলেনও, তবুও তাঁর বর্ণনা প্রামাণ্য হবে না। অবশ্য ছওর ইবনে ইয়াজিদ একজন বলিষ্ঠ বর্ণনাকারী। কিন্তু তিনি আবার কাদরিয়া সম্প্রদায়ভূত বলে পরিচিত। বাকীয়া এই হাদিসের সূত্রপরম্পরামধ্যে ছওর ইবনে ইয়াজিদের নামোল্লেখ করেছেন। সুতরাং বর্ণনাটি প্রামাণ্য পদবাচ্য নয়। ইবনে হুম্মামও বর্ণনাটির সমালোচনা করেছেন। আর এর সূত্রপরম্পরাভূত আলী ইবনে কারীনকে অসত্যবাদী বলে সাব্যস্ত করেছেন আহমদ। আমি বলি, ইবনে জাওজী যে সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন, দারাকুতনীর পদ্ধতি কিন্তু তা নয়। তাঁর সূত্রপ্রবাহে আলী ইবনে কারীনের নাম নেই।

৪. হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! কেউ যদি বলে, আমি অমুক রমণীকে যেদিন বিবাহ করবো, সেদিনই সে তালাক হয়ে যাবে, তবে তার পরিণতি কী? তিনি স. বললেন, তার তালাক তো অধিকারবর্হির্ভূত। দারাকুতনী।

এই হাদিসের সূত্রে আমর ইবনে খালেদের মাধ্যমরূপে এসেছে আবু খালেদের নাম। জাহাবী বলেছেন, আবু খালেদ বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। ইবনে হুম্মাম, আহমদ এবং ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন বলেছেন, সে অসত্যবাদী।

নাফে' সূত্রে ইবনে আদী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, বিবাহ ব্যতীত তালাক সিদ্ধ হবে না। ইবনে হাজার বলেন, হাদিসটির সূত্রপ্রবাহ সুদৃঢ়।

৫. হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তাউস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র বিধানসম্মত না হলে মানত পরিপূরণ বাধ্যতামূলক নয়। তেমনি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার মানত পূরণ করতে হবে না। অধিকার স্বীকৃত নয়, এমতোক্ষেত্রে তালাক অথবা মুক্তিও অকার্যকর। দারাকুতনী। ইবনে হাজার বলেছেন, হাকেম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ভিন্ন একটি সূত্রে, যার কতিপয় বর্ণনাকারী অপরিচিত।

হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ কখনো একথা বলেননি যে, বিয়ের পূর্বে তালাক হয়। আর যদি তিনি এরকম বলেই থাকেন, তবে তার এমতো মন্তব্যকে ধরতে হবে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির অনবধানতা বলে। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা বিশ্বাসিনীগণকে বিবাহ করবার পর তাদের স্পর্শ করবার পূর্বে তালাক যদি দাও'। এখানে তো এমন বলা হয়নি যে, তোমরা তাদেরকে তালাক দিবে, তারপর বিয়ে করবে।

কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, 'বিবাহের পূর্বে তালাক বর্তে না'। এই হাদিসের কোনো একটি সূত্রও সুপরিণত অথবা যথাযথ নয়। অপরিণত সূত্রের যে বিবরণটিকে এক্ষেত্রে সর্বাধিক যথাযথ বলে ধরে নেওয়া হয়, সে হাদিসটির বর্ণনাকারী তাউস। তিনি বর্ণনাটি শুরু করেছেন 'রসুল স. বলেছেন' বলে। কিন্তু তিনি সাহাবী নন। আবার কোনো সাহাবীর নিকট থেকে শুনেও তিনি হাদিসটি বর্ণনা করেননি। তাই বিবরণটি সাহাবী পর্যন্তও উপনীত হয়নি।

৬. জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার আবু সুফিয়ান ইবনে হরবকে ইয়েমেন রাজ্যের নাজরানে নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন। বিদায়ের প্রাক্কালে তাকে একথাটিও স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, যাকে বিয়ে করা হয়নি, লোকেরা যেনো তাকে তালাক না দেয়। আর দাস অধিকারভূত হওয়ার আগে যেনো না দেয় দাসমুক্তির ঘোষণা।

ইমাম আবু হানিফার অভিমতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়— শর্তযুক্ত তালাক মূলতঃ তালাকই নয়। কোনো বিষয়কে শর্তযুক্ত করা হলে হেতু কিন্তু হেতুই থেকে যায়। সে হেতুর দ্বারা অবধারিত হয় না কোনো কিছুই। আর 'তুমি তালাক হয়ে যাবে যদি ঘরে প্রবেশ করো' অথবা 'তুমি তালাক হয়ে যাবে যদি আমি তোমাকে

বিয়ে করি' কথা দু'টো তো শপথের পর্যায়ের। ওই শপথই তো গৃহে প্রবেশ ও বিবাহের অন্তরায়। আবার গৃহে প্রবেশ ও বিবাহ হচ্ছে তালাকের শর্ত। একারণেই শর্তের সঙ্গে জড়িতকরণ তালাকের পথের অন্তরায়। তাই এরকম জড়িতকরণ তালাককে অবধারিত করতে পারে না। তালাক অনিবার্য হওয়া ও তালাকের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হওয়া সম্পূর্ণ পৃথক দু'টি বিষয়। তবে শর্তের উপস্থিতিতে তালাক কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু থেকেই যায়। আর শর্তসাপেক্ষে তালাক আবার তালাকই নয়। সুতরাং এ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত থেকে দলিল গ্রহণ করা ঠিক হবে না। অবশিষ্ট রইলো ওই সকল হাদিস, যে গুলোতে বলা হয়েছে— বিবাহপূর্ব তালাক অসিদ্ধ। হাদিসগুলোর মধ্যে আবার হজরত ইবনে ওমর এবং হজরত আবু ছা'লাক খাশানী থেকে বর্ণিত হাদিস দু'টো যথাসূত্রসম্বলিত নয়।

একটি সন্দেহ ঃ শর্তযুক্ত তালাক যখন তালাকই নয়, তখন কেউ যদি কোনো অপরিচিত রমণীকে বলে, তুমি তালাক হয়ে যাবে যদি গৃহে প্রবেশ করো। অথবা কোনো অপরিচিত রমণীকে বলে, তুমি তালাক হয়ে যাবে যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি, বাক্য দু'টো তো একই ধরনের। দু'টো বাক্যের মর্মার্থও এক। তাহলে প্রথমাবস্থায় তালাক বর্তাবে না এবং দ্বিতীয় অবস্থায় তালাক বর্তাবে এরকম বলা হবে কেনো?

সন্দেহর নিরসন ঃ আমরা তো ইতোপূর্বে বলেই দিয়েছি যে, তালাক ও দাসমুক্তি শর্তযুক্ত হলে কার্যকর হয় না। কার্যকর হয় শপথের রূপ পরিগ্রহ করার জন্য। সমস্যাটিকে আমরা ব্যাখ্য করি এভাবে— শপথ দু'ধরনের; পাপের আশংকায় আল্লাহ্র ভয়ে কৃত শপথ এবং নিজের ক্ষতির আশংকায় কৃত শপথ। এই আশংকাই কার্যকর হওয়ার পথের অন্তরায়। এখন যদি তালাক ও দাসমুক্তি ঘোষণাকারীর ক্ষতির কারণ হয়, এমতোক্ষেত্রে কার্যকর হবে শপথ। তাই তালাক যেমন বর্তাবে, তেমনি কার্যকর হবে দাসমুক্তি। কিন্তু তালাক অথবা দাসমুক্তিকে যদি কোনো অপরিচিত রমণী অথবা অপরিচিত দাসের গৃহে প্রবেশের সঙ্গে শর্তায়িত করা হয়, তবে তাতে শর্ত যুক্তকারীর কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। আর অপরিচিত রমণী অথবা দাসের গৃহে প্রবেশ করাতে কোনো প্রতিবন্ধকতাও নেই। কাজেই বিষয়টি শপথের পর্যায়ে পড়ে না। সুতরাং এমতোক্ষেত্রে তালাক অথবা দাসমুক্তি কার্যকর হবে না।

ইবনে হুম্মান বলেছেন, আমাদের মত ও পথ পরিপুষ্ট হয়েছে হজরত ওমর, হজরত ইবনে ওমর ও হজরত ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হাদিস দ্বারা, যে হাদিসগুলো ইবনে আবী শায়বা কর্তৃক তাঁর 'মুসান্নিফ' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে মালেক, কাসেম, ইবনে মোহাম্মদ, ওমর ইবনে আবদুল আজিজ, শা'বী, নাখয়ী, জুহরী, আসওয়াদ, আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান এবং মাকহুল শামীর

মাধ্যমে। তাই আমরা বলি— কেউ যদি বলে, আমি অমুককে যদি বিবাহ করি তবে সে তালাক হয়ে যাবে অথবা বলে, যে রমণীকে আমি বিয়ে করবো সে তালাক হয়ে যাবে, কিংবা বলে, অমুক মহিলাকে যদি আমি বিবাহ করি, তাহলে সে তালাক— এই তিন অবস্থাতেই তালাক কার্যকর বলে রায় দিয়েছেন উল্লেখিত আলেমগণ। আর তাঁদের এমতো অভিমত সমর্থিত হয়েছে সাইয়্যেদ ইবনে মুসাইয়্যেব, আতা, হান্নাদ ইবনে আবী সুলায়মান ও শোরাইহ্ কর্তৃক।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, শর্তযুক্ত তালাকও তালাক। তাই শর্ত তালাক কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নয়। বাধা সৃষ্টি হয় কেবল ফলাফলে। যেমন ইচ্ছা স্বাধীনতার শর্তে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির অন্তরায় নয়। বরং বিক্রয় চুক্তির বাস্তবায়ন বা মালিকানা অর্জিত হয় ইচ্ছা স্বাধীনতার সমাপ্তি অথবা ইচ্ছা স্বাধীনতা বাতিল করাতে। হজরত আবু ছা'লাবা খাশানীর হাদিসে একথা বলাও হয়েছে পরিষ্কার করে। আবার ওই হাদিস বর্ণিত হয়েছে ইবনে জাওজীর মতো কট্টর সূত্রসমালোচক থেকেও। হাদিসটির সূত্র সম্পর্কে তাঁর কোনো বিরূপ মন্তব্যও নেই। 'বিবাহের পূর্বে তালাক নেই' এবং এর সমার্থক হাদিসগুলোতে বিবাহের সঙ্গে তালাককে শর্তযুক্ত করতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং বিবাহপূর্ব তালাক সিদ্ধ হওয়ার কোনো অর্থই হয় না। আর কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি এরকম অর্থহীন কথা বলতে পারেনও না। কথাটি যেনো এরকম— জন্মের পূর্বে নামাজ ফরজ হয় না।

এখানে 'তোমাদের জন্য তাদের পালনীয় কোনো ইদ্দত নেই যা তোমরা গণনা করবে' কথাটির অর্থ বিবাহকৃত স্ত্রীকে তালাক দিলে তাকে যে ইদ্দত পালন করতে হয়, সেই ইদ্দত প্রযোজ্য নয় ওই রমণীদের ক্ষেত্রে যাদেরকে তালাক দেওয়া হয় স্পর্শ করার পূর্বে।

এখানে 'লাকুম' অর্থ তোমাদের জন্য। কথাটির মাধ্যমে এটাই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তাদের ইদ্দত গণনা করবে পুরুষ। কেননা সন্তানের বংশপরিচয় সংযুক্ত পুরুষদের সঙ্গে, নারীদের সঙ্গে নয়।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, কোনো জিম্মি (জিযিয়া প্রদানের মাধ্যমে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত মুসলিম রাজ্যের বিধর্মী) তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, আর তাদের ধর্মে যদি ইদ্দতের নিয়ম না থাকে, তবে ওই তালাকপ্রাপ্তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে না। আর যদি তাদের সেরকম প্রথা কিছু থাকে, তবে তা তাকে দিয়ে পালন করাতেই হবে।

মুসলমানদের যুদ্ধংদেহী প্রতিপক্ষদের দেশ থেকে কোনো বিধর্মিণী যদি মুসলমান হয়ে মুসলিম রাষ্ট্রে চলে আসে, তবে তার জন্য কোনো ইদ্দতের বিধান নেই। ইচ্ছে করলেই ওই রমণী তাৎক্ষণিকভাবে বিবাহবদ্ধা হতে পারে। কেননা

শরিয়তের বিধানানুসারে মুসলমানদের আক্রমণাত্মক প্রতিপক্ষীয়রা জড়পদার্থতুল্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মতো। মুসলমানেরা তাদের জানমাল সব কিছুর মালিক। তবে ওই রমণী যদি অন্তঃসত্তা হয়, তবে তাকে বিবাহের জন্য অপেক্ষা করতে হবে তার সন্তানপ্রসব পর্যন্ত। কেননা তার গর্ভস্থিত শিশুর রয়েছে নির্দিষ্ট বংশপরিচয়। ইমাম আবু হানিফা বলেন, গর্ভবস্থাতেও ওই রমণী বিবাহবদ্ধা হতে পারবে। কিন্তু তার স্বামীর সঙ্গে তার সম্ভোগকর্ম রাখতে হবে স্থগিত। যেমন অন্তঃসত্তা ব্যাভিচারিণীকে বিবাহ করা সিদ্ধ। কিন্তু সন্তান প্রসবের পূর্বে তার স্বামী তাকে সম্ভোগ করতে পারবে না। ইমাম আবু হানিফার প্রথমোক্ত অভিমতটি সমধিক বিশুদ্ধ।

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমরা তাদেরকে কিছু সামগ্রী দিবে এবং সৌজন্যের সঙ্গে তাদেরকে বিদায় করবে'।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই বিধানটি প্রযোজ্য হবে মোহরানা নির্ধারিত না থাকলে। আর মোহরানা নির্ধারিত থাকলে পরিশোধ করতে হবে মোহরানার অর্ধেক। আর এমতাবস্থায় অতিরিক্ত কোনোকিছু আর দিতে হবে না। হজরত ইবনে আব্বাসের এমতো উক্তি অনুসারে বলতে হয় আলোচ্য বিধানটি প্রযোজ্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। কাতাদা বলেছেন, আয়াতটি রহিত এবং তা রহিত হয়েছে এই আয়াতের মাধ্যমে—'ফানিসফু মা ফারাদ্বতুম' (যা নির্ধারিত তার অর্ধেক)। উল্লেখ্য, দু'টো সামাধানের কোনবিন্দু একটিই। সম্ভোগ বিবর্জিতারা পাবে তার নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক। এর অধিক কোনো পাওনা তার নেই। সুতরাং তাকে এর অতিরিক্ত কিছু দেওয়া ওয়াজিব তো নয়ই, মোস্তাহাবও নয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এমতাবস্থায় অর্ধেক মোহরের সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু দেওয়া মোস্তাহাব। এই দৃষ্টি ভঙ্গি অনুযায়ী এখানকার 'কিছু সামগ্রী দিবে' কথাটি মোস্তাহাব অর্থ প্রকাশক।

হাসান ও সাঈদের মতে এই আয়াতের বিধানে অতিরিক্ত কিছু দেওয়া ওয়াজিব। আর অর্ধেক মোহর দেওয়া ওয়াজিব সুরা বাকারায়। 'যা নির্ধারিত তার অর্ধেক' আয়াতের মাধ্যমে। অতিরিক্ত দেওয়া আবশ্যিক না অভিপ্রেত এবং ওই অতিরিক্তের পরিমাণই বা কতটুকু সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে সুরা বাকারার তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

সূরা আহযাব ঃ আয়াত ৫০

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِيْٓ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَ بَنٰتِ

عَمِّكَ وَ بَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَ بَنٰتِ خَالِكَ وَ بَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ۫ وَ امْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا ۗ خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْۤ اَزْوَاجِهِمْ وَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۵۰﴾

r হে নবী! আমি তোমার জন্য বৈধ করিয়াছি তোমার স্ত্রীগণকে, যাহাদের মাহ্‌র তুমি প্রদান করিয়াছ এবং বৈধ করিয়াছি ফায় হিসাবে আল্লাহ্ তোমাকে যাহা দান করিয়াছেন তন্মধ্যে হইতে যাহারা তোমার মালিকানাধীন হইয়াছে তাহাদিগকে, এবং বিবাহের জন্য বৈধ করিয়াছি তোমার চাচার কন্যা ও ফুফুর কন্যাকে, মামার কন্যা ও খালার কন্যাকে, যাহারা তোমার সঙ্গে দেশ ত্যাগ করিয়াছে এবং কোন মু'মিন নারী নবীর নিকট নিজকে নিবেদন করিলে এবং নবী তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলে সেও বৈধ,— ইহা বিশেষ করিয়া তোমারই জন্য, অন্য মু'মিনদের জন্য নহে; যাহাতে তোমার কোনো অসুবিধা না হয়। মু'মিনদের স্ত্রী এবং তাহাদের মালিকানাধীন দাসিগণ সম্বন্ধে যাহা নির্ধারিত করিয়াছি, তাহা আমি জানি। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে নবী! আমি তোমার জন্য বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীগণকে, যাদের মোহর তুমি পরিশোধ করেছো'।

এখানকার 'উজুর' শব্দটি 'আজুর' এর বহুবচন। এর অর্থ মোহর। মোহর হচ্ছে স্ত্রী সম্ভোগের সম্মানজনক বিনিময়। রসুল স. বিবাহ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পুণ্যবতী পত্নীগণকে মোহরানা পরিশোধ করতেন। তাই এখানে বলা হয়েছে 'যাদের মোহর তুমি প্রদান করেছো'। অথবা এরকম বলা হয়েছে একারণে যে, তাৎক্ষণিকভাবে মোহরানা পরিশোধ করা উত্তম। আর ওই উত্তম পন্থাই ছিলো রসুল স. এর পন্থা। এটাই সর্ববাদীসম্মত অভিমত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং বৈধ করেছি ফায় হিসেবে আল্লাহ্ যা দান করেছেন তন্মধ্যে থেকে যারা তোমার মালিকানাধীন হয়েছে তাদেরকে'। এখানে 'মা আফাআল্লাহু আ'লাইকা' অর্থ আল্লাহ্ আপনাকে 'ফায়' হিসাবে যা দান করেছেন। যুদ্ধ ব্যতীত হস্তগত যা হয়, তাকে বলে 'ফায়'। যেমন রসুল স. এর প্রিয়

পুত্র হজরত ইব্রাহিমের জননী হজরত মারিয়া কিবতীয়াকে উপঢৌকন হিসেবে পাঠিয়েছিলো মিসরের সম্রাট। আবার যুদ্ধবন্দিনী হিসেবে রসুল স. যাঁদেরকে পেয়েছিলেন তাঁরাও 'ফায়' এর অন্তর্ভূতা। যেমন উম্মত জননী সাফিয়্যা ও উম্মত জননী হজরত জুয়াইরীয়া।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি তোমার চাচার কন্যা ও তোমার ফুফুর কন্যাকে, মামার কন্যা ও খালার কন্যাকে, যারা তোমার সঙ্গে দেশত্যাগ করেছে'। এতে করে বোঝা যায়, পিতৃকুল ও মাতৃকুল কুরায়েশ ও জোহরা গোত্রের রমণীদেরকে বিবাহ করার অধিকার রসুল স. এর ছিলো। আর 'দেশত্যাগ করেছে' বলে এখানে বোঝানো হয়েছে ওই সকল কুরায়েশ ও বনী জোহরার রমণী, যাঁরা হিজরত করেছিলেন। একথায় আরো প্রমাণিত হয় যে, তাঁর পিতৃকুল ও মাতৃকুলের যে সকল রমণী হিজরত করেননি, তাদেরকে বিবাহ করা রসুল স. এর জন্য বৈধ ছিলো না।

সুদ্দী ও আবু সালেহের মাধ্যমে তিরমিজি ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস উল্লেখ করেছেন, আবু তালেব তনয়া হজরত উম্মে হানী বলেছেন, মক্কাবিজয়ের পর রসুল স. আমার কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। আমি অক্ষমতা প্রকাশ করলাম। তিনি স.ও আর অগ্রসর হলেন না। এরপর যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন আমি আর তাঁর জন্য বৈধই থাকলাম না। কারণ আমি তাঁর চাচার কন্যা হলেও হিজরতকারিণী ছিলাম না। ছিলাম তুলাকা। তিরমিজি ও হাকেম হাদিসটিকে আখ্যা দিয়েছেন যথাক্রমে উত্তমসূত্রবিশিষ্ট ও যথাসূত্রসম্বলিত বলে।

হজরত উম্মে হানীর মুক্ত ক্রীতদাস হজরত আবু সালেহ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. যখন উম্মে হানীর নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি এখন স্বাস্থ্যহীনা। শিশুটিও অপ্রাপ্তবয়স্ক। এরপর তাঁর শিশু যখন বড় হলো, তখন তিনি নিজেই রসুল স. এর কাছে পাঠালেন বিবাহের প্রস্তাব। রসুল স. তখন বললেন, না, এখন আর তা সম্ভব নয়। বলেই তিনি স. পাঠ করলেন আলোচ্য আয়াত।

হজরত আবু সালেহ থেকে ইসমাইল ইবনে আবু খালেদের মাধ্যমে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত উম্মে হানী বলেছেন, রসুল স. আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু 'ওয়া বানাতি আম্মিকা ওয়া বানাতি আম্মাতিকা ....' এই আয়াতে রসুল স. এর সঙ্গে আমার বিবাহকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ আমি ছিলাম না হিজরতকারিণী।

বাগবী লিখেছেন, কিছুকাল পর এই বিধানটি রহিত হয়। অর্থাৎ রসুল স. এর জন্য হিজরতকারিণী নয় এমন রমণীকে বিবাহ করার নিষেধাজ্ঞাটি তুলে নেওয়া

হয়। কেউ কেউ আবার বলেছেন, এখানে 'হিজরত' অর্থ ইসলাম। এভাবে 'যারা তোমার সঙ্গে দেশত্যাগ করেছে' কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— যারা আপনার সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেছে। রসুল স. বলেছেন, যারা নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ বর্জন করে, তারাই হিজরতকারী। বোখারী। এই হাদিসের আলোকে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— বিধর্মী রমণী, সে ইহুদী বা খৃষ্টান যেই হোকনা কেনো, তাকে বিবাহ করা রসুল স. এর জন্য ছিলো নিষিদ্ধ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং কোনো মুমিন নারী নবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করিলে এবং নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সে-ও বৈধ'। একথার অর্থ— কোনো বিশ্বাসবতী যদি বিনা মোহরানায় স্বতঃপ্রণোদিতা হয়ে নিজেকে রসুল স. এর নিকটে সমর্পণ করতে চান এবং রসুল স. যদি তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হন, তবে তাঁকে বিবাহ করাও তাঁর জন্য বৈধ। এখানে 'বিশ্বাসবতী' বলে এই বৈধতাকে সীমায়িত করা হয়েছে। অতএব বুঝতে হবে, কোনো বিধর্মিণী যদি এভাবে সমর্পিতা হতে চায়, তবুও তাকে রসুল স. বিবাহ করতে পারবেন না। অবশ্য বিদ্বানগণ এবিষয়ে মতপ্রভেদ করেছেন।

বিবাহের জন্য প্রধান শর্ত দু'টি— ইজাব (প্রস্তাব) ও কবুল (সম্মতি)। রসুল স. এর জন্যও এ দু'টো শর্ত কার্যকর। স্বেচ্ছাসমর্পণেচ্ছু রমণীর নিবেদন এমতোক্ষেত্রে হবে ইজাব। আর 'কবুল' হবে রসুল স. এর পক্ষ থেকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটা বিশেষ করে তোমারই জন্য, অন্য মুমিনদের জন্য নয়, যাতে তোমার কোনো অসুবিধা না হয়'। এ কথার অর্থ— হে আমার নবী! এই বিধানটি প্রযোজ্য কেবল আপনার বেলায়। অন্যান্য বিশ্বাসীগণের ক্ষেত্রে এই নিয়ম অচল। তাদের জন্য মোহরানা প্রদান অত্যাবশ্যক। বিবাহ পড়ানোর সময় মোহরানার উল্লেখ করা হোক অথবা না হোক, সম্ভোগের পরে অথবা মৃত্যুর পরে হলেও তাদের স্ত্রীদেরকে মোহরানা পরিশোধ করতে হবে আবশ্যিকভাবে।

উল্লেখ্য, আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে রসুল স. এর অত্যুচ্চ মর্যাদা ও মহিমাকে। অর্থাৎ তিনিই কেবল পারেন মোহরানা ছাড়া বিবাহ করতে, অন্য কেউ নয়। এখানাকার 'খলিসাহ্' শব্দটি ধাতুমূল বিশেষণ। এখানে এর বিশেষ্য 'হিবা' বা সম্প্রদান লুপ্ত। অর্থাৎ হে নবী! বর্ণিত আত্মসম্প্রদান রীতিটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য কেবল আপনার ক্ষেত্রে , অন্য কারো ক্ষেত্রে নয়।

ইবনে সা'দের বর্ণনায় এসেছে, ইকরামা বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে উম্মে শুরাইক দৌসীয়াকে লক্ষ্য করে। মুনীর ইবনে আবদুল্লাহ্ দৌসি সূত্রে ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, হজরত উম্মে শুরাইক রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে আত্মসম্প্রদান করেন। পরমা সুন্দরী ওই মহিয়সী রমণীকে রসুল স.

সানন্দে পত্নীরূপে গ্রহণও করেন। জননী আয়েশা তখন বলেন, স্বেচ্ছাসমর্পিতারা কল্যাণীয়া নয়। জননী উম্মে শুরাইক বলেন, আমি তো আত্মসমর্পিতা হয়েছি মহানতম রসুলের পবিত্রতম চরণে। আর আল্লাহ্র বাণীতেও আমি 'বিশ্বাসবতী' বলে প্রত্যয়িতা। জননী আয়েশা তখন রসুল স.কে লক্ষ্য করে বলেন, আল্লাহ্ আপনার মনোবাঞ্ছা অপূর্ণ রাখেন না।

আবু রযীনের সূত্রে ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. ইচ্ছা করলেন, তিনি তাঁর এক স্ত্রীকে পরিত্যাগ করবেন। কথাটি যখন জানাজানি হয়ে গেলো, তখন তাঁর সকল সহধর্মিণী তাঁদের পালার অধিকার উঠিয়ে নিলেন। বললেন, এখন থেকে তিনি স. তাঁর ইচ্ছা মতো যে কারো ঘরে নিশিযাপন করতে পারবেন। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াতের 'ইন্না আহ্লাল্না লাকা' থেকে পরবর্তী আয়াতের 'তুরজ্বী মানতাশাউ' পর্যন্ত।

উল্লেখ্য, চারের অধিক পত্নী সংরক্ষণ বৈধ কেবল রসুল স. এর বেলায়। আর 'খলিসাতান' শব্দটি ব্যবহারের কারণে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, রসুল স. এর বিবাহপদ্ধতি ছিলো স্বতন্ত্রবৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। অর্থাৎ কোনো বিশ্বাসবতীর আত্মনিবেদন বৈধ ছিলো কেবল রসুল স. এর নিকটে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন, 'বিবাহ' বা আত্মনিবেদনের পদ্ধতিতে বিবাহ সম্পন্ন হতে পারে অন্যদের বেলাতেও। প্রথমোক্ত অভিমতের প্রবক্তা হচ্ছেন সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, জুহুরী, মুজাহিদ, আতা, রবীয়া, মালেক ও শাফেয়ী। তাঁরা বলেন 'বিবাহ' (নিকাহ) শব্দটির স্পষ্ট উল্লেখ ব্যতিরেকে বিবাহের চুক্তি সম্পাদিত হবে না। অবশ্য রসুল স. এর ব্যতিক্রম। তাঁর বিবাহই কেবল সম্পাদিত হতে পারে কন্যার আত্মনিবেদনের পদ্ধতিতে।

আমি বলি, ইমাম আহমদও এমতো অভিমতের প্রবক্তা। তবে ইমামগণের মতভেদের প্রেক্ষিতে তিনি আবার বলেছেন, 'হিবা' শব্দের দ্বারাও বিবাহ সুসম্পন্ন হতে পারে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, যে বাক্যের দ্বারা স্থায়ীভাবে অধিকার হস্তান্তরিত হয়, সেই বাক্যের দ্বারা বিবাহও সুসম্পন্ন হতে পারে। যেমন— হিবা, ক্রয়-বিক্রয়, সদকা, অধিগ্রহণ ইত্যাদি।

ধার-কর্জ অথবা পারিশ্রমিকের উল্লেখে অবশ্য স্থায়ী অধিকার হস্তান্তরিত হয় না। যেমন— কোনো রমণী যদি কাউকে বলে, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অথবা কর্জরূপে আমি নিজেকে সমর্পণ করলাম, তবে তার একথায় বিবাহ সম্পন্ন হবে না। কারণ এতে স্থায়ী অধিকারের বিষয়টির নিশ্চয়তা নেই। ইমাম কারখী বলেছেন, এভাবেও বিবাহ সুসম্পন্ন হতে পারে। কারণ এতে রয়েছে সুবিধা অর্জনের অধিকার। আর বিবাহের মূল উদ্দেশ্যই তো হচ্ছে সুবিধা অর্জন, কারো অস্তিত্বের অধিকার অর্জন নয়। আমরা বলি, ওই শব্দ দু'টোর দ্বারা স্থায়ী সুবিধা

অর্জিত হয় না। তাই শব্দ দু'টো বিবাহের ক্ষেত্রে রূপকার্থেও প্রয়োগযোগ্য নয়। 'অসিয়ত' শব্দটিও এরকম। কেননা 'অসিয়ত' দ্বারা অধিকার হস্তান্তরিত হয় মৃত্যুর পর। তাহাবী বলেন, 'অসিয়ত' তবুও কিছুটা অধিকার নিশ্চিত করে। তাই 'অসিয়ত' শব্দটির উল্লেখের মাধ্যমে বিবাহ সুসম্পন্ন হতে পারে।

ইমাম কারখী বলেছেন, 'অসিয়ত' যদি বর্তমান প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করে, তবে 'অসিয়ত' শব্দটির উল্লেখের মাধ্যমেও বিবাহ সিদ্ধ হতে পারে। যেমন কেউ বললো 'আমার কন্যাকে আমি এক্ষুণি তোমার জন্য অসিয়ত করলাম'। এ কথার অর্থ— এক্ষুণি আমি তোমার সঙ্গে আমার কন্যার বিয়ে দিয়ে দিলাম। এতাবস্থায় অসিয়তের রূপকার্থ হবে—বিবাহ। আমরা বলি, 'অসিয়ত' কথাটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক রয়েছে মৃত্যুর। অর্থাৎ অসিয়তের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর। আর বিবাহের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় তাৎক্ষণিকভাবে। সুতরাং বিবাহ এবং অসিয়তকে এক করা যায় না।

কেউ কেউ আবার বলেছেন, সুনির্দিষ্টরূপে 'নিকাহ' বা 'বিবাহ' উল্লেখ ব্যতিরেকে বিবাহ সিদ্ধই নয়। এমনকি রসুল স. এর ক্ষেত্রেও নয়। কেননা আলোচ্য আয়াতেই বলা হয়েছে 'এবং নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে'। এখানে রয়েছে 'নিকাহ' শব্দটির স্পষ্ট উল্লেখ। এর পূর্বের 'হিবা' (নিবেদন, সম্প্রদান) শব্দটিও রূপকার্থে বিবাহ।

শাফেয়ীর অভিমতের সমর্থনে বায়যাবী বলেছেন, শব্দ অনুসারী হয় অর্থের। তাই রসুল স. এর মোহরানা বিহীন বিবাহ অর্থগত দিক থেকে সুনির্দিষ্ট বলেই একথা মেনে নিয়েছেন গোটা আলেম সমাজ। তেমনি 'হিবা' এর মাধ্যমে শুভপরিণয় সিদ্ধ হওয়াও কেবল রসুল স. এর জন্যই সিদ্ধ। কেননা এর অর্থও বিবাহ। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বায়যাবীর এমতো মন্তব্যকে সঠিক বলা যায় কি? কেননা 'হিবা' যে রূপকার্থে বিবাহ সে কথা সর্বজনবিধিত। সুতরাং এরূপ রূপকার্থ কেবল রসুল স. এর জন্য সুনির্দিষ্ট করা হবে কেনো? আবার 'হিবা' অর্থ যে 'নিকাহ' সেকথা কেবল তাঁর ক্ষেত্রে খাটবে, এরকম বলারও কোনো যুক্তি নেই। ভুলে গেলে চলবে না যে, শব্দটির মধ্যে 'নিকাহ' অর্থ নিহিত রয়েছে রূপকার্থে।

একটি সন্দেহ ঃ 'হিবা' শব্দের প্রকৃত অর্থ স্বত্বাধিকারী করে দেওয়া। কোনোকিছুর ক্রয় বিক্রয়, দান-খয়রাতও স্বত্ব হস্তান্তরের অধিকার লাভ করে। আর এখানে যে 'হিবা' উল্লেখ করা হয়েছে, তার অর্থ বিনিময় ব্যতিরেকে সুবিধা উপভোগের ইচ্ছাস্বাধীনতা দেওয়া। সুতরাং এখানে যদি কেবল রসুল স. এর খাতিরে 'হিবা' শব্দটি রূপকার্থে উল্লেখ করা হয়ে থাকে, তবে অন্যদের জন্য শব্দটির অর্থ 'বিবাহ' একথা কেমন করে বলা যেতে পারে?

সন্দেহের নিরসন ঃ 'হিবা' শব্দের রূপকার্থ সুবিধা উপভোগের ইচ্ছাস্বাধীনতা দেওয়া, তা বিনিময় সাপেক্ষে অথবা বিনিময়বিহীন যেভাবেই হোক না কেনো। শুধুমাত্র বিনিময়বিহীন সুবিধাভোগের ইচ্ছাস্বাধীনতা দেওয়া শব্দটির রূপক অর্থ নয়। একারণেই রসুল স. এর জন্য বিনিময় বিবর্জিত 'হিবা'র রূপক অর্থ বিবাহ, আর অন্যদের জন্য এর রূপক অর্থ বিবাহ বিনিময় বা মোহরানা সহকারে। 'হিবা'র সাধারণ অর্থ বিবাহ একথা বলার কোনো অবকাশই নেই।

ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, প্রকৃত কথা হচ্ছে প্রমাণ করতে হবে 'হিবা'র রূপকার্থের প্রকৃতি। ইমাম শাফেয়ীর মতে শব্দটির রূপকার্থ করার কোনো কারণই নেই। তাই তিনি বলেন, এখানে শব্দটির রূপকার্থ করতে যাওয়া অবান্তর। তাঁর এমতো দাবির প্রেক্ষিতে তিনি দাঁড় করিয়েছেন দু'টো যুক্তি— একটি সংক্ষিপ্ত এবং অপরটি বিস্তারিত।

সংক্ষিপ্ত যুক্তিটি এরকম— রূপক অর্থ গ্রহণ করতে হলে উভয় প্রকার অর্থই গ্রহণীয় বলে মেনে নেওয়া উচিত। অর্থাৎ শক্যার্থ বলে মর্মার্থ এবং রূপকার্থ বলে শক্যার্থ। যেমন— 'ওয়াহাবতুকা হাজাছ্ ছওবু' অর্থাৎ আমি তোমাকে দান করলাম এই কাপড় এর অর্থ করতে হবে— এই কাপড়ের সাথে আমি তোমার বিয়ে দিলাম। আবার 'এই কাপড়ের সাথে তোমার বিয়ে দিলাম' এর অর্থ করতে হবে— আমি তোমাকে দান করলাম এই কাপড়। কিন্তু ব্যাকরণবেত্তাগণের নিকটে এরকম বাকরীতি অচল।

আর বিস্তারিত যুক্তিটি হচ্ছে— 'তাযবীজ্' বা 'নিকাহ' এর আভিধানিক অর্থ দু'টো বস্তুকে মিলিয়ে দেওয়া, একত্রিত করা। অধিকারী ও অধিকৃত এবং মালিক ও ক্রীতদাসের মধ্যে কিন্তু মিলন অথবা একত্রায়ণ সম্ভব নয়। সেকারণেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেউ একজন যদি মনিব হয়, তবে বিবাহ হয়ে যাবে বানচাল। সুতরাং 'হিবা' অর্থ মালিকানা বা স্বত্বাধিকারী করে দেওয়ার অর্থে বিবাহ মনে করা অবিশুদ্ধ।

এবার উপস্থাপন করা হচ্ছে ইমাম শাফেয়ীর অভিমতের বিপরীতে আমাদের দলিল। 'নিকাহ' ও 'হিবা' শব্দ দু'টোর মধ্যে যদি রূপক সম্পর্ক না-ই থাকে, তবে তো রসুল স. এর বিবাহ ও অবিশুদ্ধ হওয়া উচিত। সুতরাং বুঝতে হবে শব্দ দু'টোর মধ্যে রূপক অর্থ বিদ্যমান। অতএব, বিনিময় বিবর্জিত বিবাহ ও 'হিবা'র মধ্যে রূপক অর্থ বিদ্যমান থাকলে সাধারণ বিবাহ ও 'হিবা'র মধ্যেও রূপক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ বিশেষ অর্থের মধ্যে সাধারণ অর্থ বিদ্যমান থাকেই।

আমাদের দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে, ‘হিবা’ অর্থ স্বত্বাধিকারী করে দেওয়া। আর স্বত্বাধিকারীর রয়েছে অধিকৃত বস্তু ভোগ করার অধিকার। এমতো অধিকার তার লাভ হয় বিবাহের দ্বারাই। আর এরকম হয় রূপক পদ্ধতিতেই। তবুও কথা থেকে যায়, ‘নিকাহ’ ও ‘হিবা’র মধ্যে কারণ ও কারণিক সম্পর্ক যদি থাকে, তাহলে ‘নিকাহ’ এর অর্থ হবে ‘হিবা’। তখন বিষয়টি হবে পূর্বনির্ণীত। এর জবাবে বলা যায়, বিষয়টি সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে শরয়ী বিধানের সূত্র গ্রন্থে। সেখানে বলা হয়েছে কারণ বলে কারণিকের অর্থ করা যায় না। সুতরাং কারণ যদি শরিয়ত সমর্থিত হয়ে, তবে তা হবে উত্তম।

বিবাহের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে উপস্বত্ব ভোগের স্বত্ব অধিকার অর্জন, মালিকানা প্রতিষ্ঠা নয়। বরং মালিকানারও প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বত্বের অধিকার অর্জন। অথচ ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, অধিকারী ও অধিকৃতের মধ্যে মিলন যেমন হয় না, তেমনি হয় না বিবাহ। তাহলে তাঁর অভিমতটির ভিত্তি আর রইলো কই?

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ বলেছেন, বিবাহ করেননি এরকম কোনো রক্ষিতা রমণী রসুল স. এর নিকটে ছিলো না। বরং তাঁর জীবনসঙ্গিনী হিসেবে ছিলেন তাঁর পুণ্যময়ী পত্নীগণ ও ক্রীতদাসীগণ। আর আলোচ্য আয়াতের ‘নিজেকে নিবেদন করলে’ কথাটি হচ্ছে মোহরবিহীন বিবাহের প্রস্তাব যা পূর্বশর্ত। শা’বীর বক্তব্যানুসারে মাত্র একজন রমণী ছিলেন রসুল স. এর প্রতি স্বেচ্ছা সমর্পিতা। তাঁর নাম হয়রত যয়নাব বিনতে খুজাইমা আনসারী। তাঁকে বলা হতো ‘সর্বহারাদের জননী’। আর কাতাদার বক্তব্যানুসারে এরকম ছিলেন আরো একজন। তাঁর নাম হজরত মায়মুনা বিনতে হারেছ। ইমাম জয়নুল আবেদীন, জুহাক ও মুকাতিল বলেছেন, হজরত উম্মে শুরাইক বিনতে জাবের আসাদীয়াও ছিলেন এই পর্যায়ের।

হজরত আলী ইবনে হোসাইনের মাধ্যমে ইবনে সা’দ, ইবনে আবী শায়বা, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, তিবরানী এবং ইকরাম সূত্রে ইবনে সা’দ বলেছেন, এরূপ স্বেচ্ছা নিবেদিতা ছিলেন হজরত উম্মে শুরাইক বিনতে জাবের। ওরওয়া ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এরূপ রমণী ছিলেন বনী সুলাইম গোত্রের হজরত খাওলা বিনতে হাকীম।

এরপর বলা হয়েছে— ‘মুমিনদের স্ত্রী ও তাদের মালিকানাধীন দাসীগণ সম্বন্ধে যা নির্ধারণ করেছি তা আমি জানি’।

এখানে ‘মা ফারদ্বনা’ অর্থ আমি যা নির্ধারণ করে দিয়েছি। অর্থাৎ আমি যা করে দিয়েছি ওয়াজিব। ফী ‘আয্ওয়াজ্বিহিম’ অর্থ তাদের স্ত্রীদের সম্পর্কে। অর্থাৎ তাদের বিবাহ, মোহর, নিশিযাপনের নির্দিষ্ট তারিখ, মোহর নির্ধারণ না করা

থাকলে সম্ভোগের পরে মোহরের অনিবার্যতা, একসঙ্গে সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রী রাখার অনুমতি ইত্যাদি। আর 'ওয়ামা মালাকাত আইমানুকুম' অর্থ তোমাদের মালিকানাধীন দাসীগণ— ক্রয়কৃত অথবা অন্য কোনো উপায়ে প্রাপ্ত, যারা তাদের মনিবদের জন্য বৈধ, কিন্তু ইহুদী, খৃষ্টান, অগ্নিউপাসিকা ও প্রতিমাপূজারিণী যারা নয়। উল্লেখ্য, এরকম ক্রীতদাসী রাখা যাবে অনির্দিষ্ট সংখ্যক। কিন্তু তাদের জন্য নিশিযাপনের কোনো দিনক্ষণও নির্দিষ্ট থাকবে না।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— হে আমার নবী! যে সকল স্বভাবজ আচরণ থেকে মুক্ত থাকা দুরূহ, সেগুলো আল্লাহ্পাক ক্ষমা করে দেন। কেননা তিনি ক্ষমাপরবশ ও পরম দয়াবান।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা যখন বললেন, ওই ললনাদের লজ্জিত হওয়া উচিত, যারা স্বতঃপ্রণোদিতা হয়ে বিবাহবদ্ধা হতে চায়, তখন অবতীর্ণ হয় নিম্নের আয়াত।

সূরা আহযাব ঃ আয়াত ৫১

تُرْجِيْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِيْٓ اِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ ؕ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَ يَرْضَيْنَ بِمَآ اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ﴿۵۱﴾

r তুমি উহাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তোমার নিকট হইতে দূরে রাখিতে পার এবং যাহাকে ইচ্ছা তোমার নিকট স্থান দিতে পার। আর তুমি যাহাকে দূরে রাখিয়াছ তাহাকে কামনা করিলে তোমার কোন অপরাধ নাই। এই বিধান এইজন্য যে, ইহাতে উহাদের তুষ্টি সহজতর হইবে এবং উহারা দুঃখ পাইবে না আর উহাদিগকে তুমি যাহা দিবে তাহাতে উহাদের প্রত্যেকেই প্রীত থাকিবে। তোমাদের অন্তরে যাহা আছে আল্লাহ্ তাহা জানেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তুমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট থেকে দূরে রাখতে পারো এবং যাকে ইচ্ছা নিকটে টানতে পারো'।

আলোচ্য আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো, তখন জননী আয়েশা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি দেখছি, আপনার প্রভুপালনকর্তা আপনার ইচ্ছা তাৎক্ষণিকভাবে পূরণ করে দেন। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা তখন বললেন, আমি ওই সকল রমণীদের কথা মনে করে লজ্জায় মরে যাই, যারা

উপযাচিকা হয়ে আল্লাহ্‌র রসুলের অঙ্কশায়িনী হবার প্রস্তাব দেয়। তিনি আরো বলেছেন, এই বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর আমি একথাও বললাম হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার চোখে গুঁতো দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হলো যে, আপনার প্রিয়তম প্রভুপালক অতি দ্রুত পূরণ করেন আপনার মনোষ্কামনা।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরবেত্তাগণের মতপ্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে এ সম্পর্কে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ অভিমতটি এরকম— আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে রসুল স. এর মহাপুণ্যবতী পত্নীগণের গৃহে তাঁর নিশিযাপনের পালা সম্পর্কে। প্রথমদিকে নিশিযাপনে সমতারক্ষা ছিলো তাঁর জন্য আবশ্যিক। এই আয়াতের মাধ্যমে তাঁর ওই আবশ্যিকতাকে রহিত করা হয়। এই মর্মে অনুমতি দেওয়া হয় যে, তিনি স. তাঁর ইচ্ছামতো পালা নির্ধারণ করতে পারবেন। সমতা রক্ষা তাঁর উপরে আর ওয়াজিব নয়।

আবু জায়েদ ও ইবনে জায়েদ বলেছেন, উম্মত জননীগণ যখন অন্যান্য বিত্তপতিদের ঘরের গৃহিণীর মতো বিলাসী জীবন যাপনের জন্য দাবি উত্থাপন করলেন, তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। ওই দাবির প্রেক্ষিতে রসুল স. অপ্রসন্ন হন এবং এক মাসের জন্য তাঁর সকল পত্নীগণ থেকে পৃথক হয়ে যান। তখন অবতীর্ণ হয় ইচ্ছাস্বাধীনতার বিধান। আল্লাহ্‌পাক তাঁর প্রিয়তম রসুলকে এই মর্মে নির্দেশ দেন যে, হে আমার রসুল! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে জানিয়ে দিন, পৃথিবীর ভোগ-সামগ্রীই যদি তোমাদের কামনা হয়, তবে ইচ্ছে করলে তোমরা তোমাদের পাওনা কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিয়ে বিদায় গ্রহণ করো। আর যদি তোমাদের উদ্দেশ্য হয় আখেরাত, তাহলে আমার সঙ্গে থাকতে পারো। কিন্তু বিলাসী জীবনের দাবি আর তোমরা উত্থাপন করতে পারবে না। আমিই ইচ্ছা মতো নির্ধারণ করবো তোমাদের ভরণ-পোষণের সামগ্রীর পরিমাণ। আর আমি আমার ইচ্ছা মতো যার ঘরে যখন ও যতদিন খুশী নিশিযাপন করতে পারবো। আমার মহাপ্রস্থানের পর তোমরা আর কখনো কারো সঙ্গে বিবাহবদ্ধা হতে পারবে না। কারণ আমি সমগ্র উম্মতের জনক সদৃশ আর তোমরাও সমগ্য উম্মতের জননী। বলা বাহুল্য, উম্মতজননীগণ রসুল স. এর সকল শর্তই মেনে নিলেন সানন্দচিত্তে।

আমি বলি, এমতো ব্যবস্থাপনা কেবল রসুল স. এর জন্য নির্ধারিত নয়। 'মৃত্যুর পরে অন্য কোথাও বিবাহবদ্ধা হতে পারবে না', কেবল এই বিধানটি ছাড়া অন্য সকল বিধান তাঁর উম্মতের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য, যদি তাদের থাকে একাধিক জীবনসঙ্গিনী।

বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. তাঁর পত্নীগণের কাউকে নিশিযাপনের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছিলেন কিনা, সে সম্পর্কে পরিলক্ষিত হয় বর্ণনাবৈষম্য। কেউ কেউ বলেছেন, নিশিযাপনের অধিকার থেকে

তিনি স. কাউকেই বঞ্চিত করতেন না। কেবল জননী সাওদা ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তিনি ছিলেন বয়োঃপ্রবীণা। তাই তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর রাতের অধিকার দিয়ে দিয়েছিলেন জননী আয়েশাকে। তাছাড়া জননী আয়েশাকে তিনি ভালোও বাসতেন অত্যধিক। আবার কেউ কেউ বলেছেন, নিশিযাপনের ইচ্ছাস্বাধীনতা লাভের পর রসুল স. তাঁর কয়েকজন পত্নীকে রাত্রিযাপনের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছিলেন। মনসুরের মাধ্যমে আবু রযীন সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর উম্মতজননীগণ এই ভেবে শংকিতা হন যে, রসুল স. না আবার কাউকে পরিত্যাগ করে বসেন। তাঁরা তাই সমবেতভাবে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র প্রিয়তম বাণীবাহক! আমাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করুন। আমরা যেনো আপনার সত্তা ও সম্পদ থেকে বঞ্চিতা না হই। আপনি আপনার ইচ্ছামতো আমাদেরকে অধিক ঘনিষ্ঠ করুন অথবা করুন অপেক্ষাকৃত কম ঘনিষ্ঠ, আমরা চাই, আপনি আমাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ যেনো না ঘটান। রসুল স. তাঁদেরকে আশ্বস্ত করলেন। তবে তাঁর রাত্রিযাপনের তালিকায় করলেন কিঞ্চিত পরিবর্তন। সমতা রক্ষা করে চলতে লাগলেন কেবল জননী আয়েশা, জননী হাফসা এবং জননী উম্মে সালমার মধ্যে। অন্যদেরকে করলেন সমতা-বহির্ভূতা। তাঁদের পালা নির্ধারণ করলেন ইচ্ছামতো অনিয়মিতভাবে। তাঁরা হলেন জননী উম্মে হাবীবা, জননী সাওদা, জননী সাফিয়্যা, জননী মায়মুনা এবং জননী জুয়াইরিয়া।

হজরত মু'আজ সূত্রে বোখারী বর্ণনা করেছেন, জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. তাঁর কোনো পত্নীর পালার তারিখে অন্য কোনো পত্নীর কাছে গমন করতে চাইলে তাঁর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে নিতেন। এরকম করতেন তিনি এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর। হজরত মু'আজ বলেছেন, আমি তখন বললাম, হে জননী! এরকম অবস্থায় আপনি কী বলতেন। তিনি বললেন, আমি বলতাম, আপনাকে আটকাবার অধিকার তো আমার নেই। থাকলে তো আমি আপনাকে আর কারো কাছে যেতেই দিতাম না।

মুজাহিদ বলেছেন, এখানকার 'যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট থেকে দূরে রাখতে পারো' কথাটির অর্থ— হে আমার নবী! আপনি ইচ্ছা করলে আপনার কোনো স্ত্রী থেকে পৃথকও থাকতে পারেন। আবার ইচ্ছা হলে হতে পারেন তাঁর শয্যাসঙ্গী। কেউ কেউ বলেছেন কথাটির অর্থ— আপনি ইচ্ছা করলে কাউকে দিতে পারেন তালাক এবং ইচ্ছা করলে তাঁকে রাখতে পারেন আপনার পরিণয়াবদ্ধা করে। হাসান বসরীর ব্যাখ্যা এরকম— আপনার উম্মতভূতাদের মধ্যে যাকে খুশী আপনি আপনার জীবনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে না-ও করতে পারেন। উল্লেখ্য, রসুল স. কাউকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালে সে প্রস্তাব প্রত্যাহার

না করা পর্যন্ত ওই রমণীকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাবার অধিকার অন্য কারো ছিলো না। কেউ কেউ কথাটির অর্থ করেছেন— যদি কোনো বিশ্বাসবতী উপযাচিকা হয়ে আপনার গৃহসঙ্গিনী হবার প্রস্তাব উত্থাপন করে, তবে আপনি ইচ্ছা করলে সে প্রস্তাব গ্রহণও করতে পারেন, অথবা করতে পারেন প্রত্যাখ্যান।

বাগবী লিখেছেন, যাঁরা স্বতঃপ্রণোদিতা হয়ে রসুল স. এর জীবনসঙ্গিনী হবার অভিলাষ ব্যক্ত করেছিলেন, তাঁদের একজন ছিলেন হজরত খাওলা বিনতে হাকীম। তাঁর সম্পর্কে জননী আয়েশা বলেছেন, তার কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। ভাবলাম একজন নারী কীভাবে এরকম সম্ভ্রমবিবর্জিতা হয়? কিন্তু যখন অবতীর্ণ হলো 'তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট থেকে দূরে রাখতে পারো এবং যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট স্থান দিতে পারো' তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আল্লাহ্‌ তো দেখছি আপনার কোনো বাসনাই অপূর্ণ রাখেন না।

এরপর বলা হয়েছে— 'আর তুমি যাকে দূরে রেখেছো, তাকে কামনা করলে অপরাধ নেই'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তালাক ছাড়াই যার কাছ থেকে পৃথক হয়ে আছেন, পুনরায় ইচ্ছে করলে তাকে সান্নিধ্য দানে ধন্য করতে পারেন। এরকম করা আপনার পক্ষে অশোভন কিছু নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এই বিধান এই জন্য যে, এতে তাদের তুষ্টি সহজতর হবে এবং তারা দুঃখ পাবে না। আর তাদেরকে তুমি যা দিবে, তাতে তাদের প্রত্যেকেই প্রীত থাকবে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! এই বিধান অবতীর্ণ হওয়ার ফলে আপনার আচরণে আপনার পত্নীগণ আর মান-অভিমানের কষ্ট পাবে না। কারণ তারা এখন বিশ্বাস করবে, আপনি সাময়িকভাবে কাউকে কাছে টেনে নেওয়া এবং কাউকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার অধিকার আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই পেয়েছেন। সুতরাং আপনার নিকটবর্তী ও দূরবর্তী হওয়া, এই উভয় অবস্থাই কল্যাণকর। বরং এই ভেবে সকলে কৃতজ্ঞচিত্ত হবে যে, সাময়িকভাবে দূরে সরিয়ে দিলেও আপনি কাউকে পরিত্যাগ তো আর করেননি। আর আপনি যা কিছু করেন, তা তো আল্লাহ্‌র বিধানানুসারেই করেন। আল্লাহ্‌র বিধানে তুষ্ট থাকাই তো বিশ্বাসী-বিশ্বাসিনীগণের স্বভাব।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদের অন্তরে যা আছে, আল্লাহ্‌ তা জানেন। আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ ও সহনশীল।

এখানে 'তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ্‌ তা জানেন' কথাটির মধ্যে রয়েছে রসুল স. এর সহধর্মিণীগণের জন্য একটি সতর্ক সংকেত। অর্থাৎ এখানে তাঁদেরকে এই মর্মে সতর্ক করা হয়েছে যে— হে রসুলপত্নীগণ! আল্লাহ্‌র রসুলের সকল কার্যকলাপের প্রতি তোমাদেরকে থাকতে হবে বাহ্যিক ও আন্তরিকভাবে প্রসন্ন। মনে রাখতে হবে তাঁর প্রতি হৃদয়ের সুপ্ত অসন্তোষও তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ।

সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় করো। সরিয়ে দাও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আন্তরিক অসন্তোষ, যদি সে রকম কোনো কিছুর অস্তিত্ব তোমাদের অন্তরে এখনো থাকে। কেউ কেউ কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— হে আমার রসুল! আপনি যদি আপনার পত্নীগণের কারো কারো প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করেন এবং তাঁদের মধ্যেও যদি কেউ কেউ হয় আপনার প্রতি অতিরিক্ত অনুরক্তা, তবে সে সঙ্গোপন ভাবনাটিও আল্লাহ্র অজানা নয়। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ। সে কারণেই তো আমি দান করেছি এই ইচ্ছা স্বাধীনতা, যাতে করে আপনার গোপন অভিলাষ পরিপূরণে কোনো অন্তরায় আর না থাকে।

'আল্লাহ্ সহনশীল' অর্থ তিনি সকল কিছু জানা সত্ত্বেও সহনশীলতাকেই প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। তাৎক্ষণিকভাবে পাপের শাস্তি প্রদান করেন না। দান করেন আত্মোপলব্ধি ও তওবার অবকাশ।

ইকরামা সূত্রে ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্পাক যখন তাঁর প্রিয় রসুলকে পত্নীগৃহে নিশিযাপনের ইচ্ছাস্বাধীনতা প্রদান করলেন এবং তাঁর পুতঃপবিত্রা সহধর্মিণীগণও যখন তা সানন্দে মেনে নিলেন তখন অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত। বলা হলো—

সূরা আহযাব ঃ আয়াত ৫২

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْۢ بَعْدُ وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ رَّقِيْبًا ﴿٥٢﴾

r ইহার পর, তোমার জন্য কোন নারী বৈধ নহে এবং তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নহে যদিও উহাদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে; তবে তোমার অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে এই বিধান প্রযোজ্য নহে। আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! পত্নীগণের প্রকোষ্ঠে নিশিযাপনের ব্যাপারে আজ যে ইচ্ছা স্বাধীনতার বিধান প্রবর্তন করা হলো, এরপর থেকে আপনি নতুন করে আর কাউকে বিবাহ করতে পারবেন না। কাউকে তালাক দিয়েও ঘরে আনতে পারবেন না নতুন স্ত্রী। তেমনি কেউ পরলোকগতা হলেও কাউকে করতে পারবেন না তার স্থলবর্তিনী।

বাগবী লিখেছেন, রসুল স. যখন তাঁর সহধর্মিণীগণকে পৃথিবীর বিলাসী জীবন অথবা আখেরাতের কল্যাণ, যে কোনো একটিকে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দিলেন, তখন তাঁরা বেছে নিলেন আখেরাতকে। আল্লাহ্ তখন তাঁর রসুলকে দিলেন সমতারক্ষার দায়িত্ব থেকে মুক্তি। সে বিধানকেও যখন তাঁরা সানন্দে মেনে নিলেন, তখন আল্লাহ্ তাঁদের মর্যাদা দিলেন বাড়িয়ে। তাঁর প্রিয়তম রসুলের উপরে জারী করলেন, যা আছে তার চেয়ে অতিরিক্ত স্ত্রী গ্রহণের নিষেধাজ্ঞা। এক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তদস্থলে অন্য কারো পাণিগ্রহণও হয়ে গেলো তাঁর জন্য নিষিদ্ধ। হজরত ইবনে আব্বাস এবং কাতাদা এরকমই বলেছেন।

আলোচ্য বিধানটি চিরস্থায়ী ছিলো কিনা অথবা পরবর্তী সময়ে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে অধিক স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারে অনুমতি তিনি স. পেয়েছিলেন কিনা, সে সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতপৃথকতা পরিলক্ষিত হয়। আবদুর রাজ্জাক, সাঈদ ইবনে মনসুর, ইবনে সা'দ, আহমদ, আবদ ইবনে হুমাইদ, আবু দাউদ, তিরমিজি ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, জননী আয়েশা সূত্রে আতা বলেছেন, মহাপ্রয়াণের পূর্ব পর্যন্ত যে কোনো রমণীকে বিবাহ করা রসুল স. এর জন্য ছিলো সিদ্ধ। সিদ্ধ ছিলো না কেবল মুহরিম রমণী। 'যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট থেকে দূরে রাখতে পারো এবং যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট স্থান দিতে পারো' এই আয়াতই তার প্রমাণ। এই আয়াত (৫১) অবতীর্ণ হয়েছে 'এর পর তোমার জন্য কোনো নারী বৈধ নয়' (আয়াত ৫২) এর পরে। কিন্তু আয়াত দু'টোর সন্নিবেশনে এখানে ঘটেছে অগ্র-পশ্চাৎ।

বাগবী লিখেছেন, ইকরামা ও জুহাক বলেছেন, আলোচ্য আয়াতাংশের মর্মার্থ হচ্ছে— ইতোপূর্বে যে সকল বৈশিষ্ট্যসম্পন্না রমণীকে আপনার জন্য বৈধ বলা হয়েছে, তারা ছাড়া অন্য কোনো রমণীকে বিবাহ করা আপনার জন্য সিদ্ধ নয়। হজরত উবাই ইবনে কা'বকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, রসুল স. এর প্রিয়তম জীবনসঙ্গিনীগণ যদি সকলে এক যোগে পরলোকগমন করতেন, তবে কি তিনি স. নতুন করে কোনো রমণীর পাণি গ্রহণ করতে পারতেন না? তিনি বললেন, এরকম কোনো বিধিনিষেধ তো তাঁর উপরে ছিলো না। বলা হলো, তা হলে 'এরপর তোমার জন্য কোনো নারী বৈধ নয়' কথাটির অর্থ কী? তিনি বললেন, আরে তুমি কি এই আয়াত পাঠ করোনি— 'হে নবী! আমি তোমার জন্য বৈধ করেছি......... যারা তোমার সঙ্গে দেশত্যাগ করেছে' (আয়াত ৫০)। সুতরাং বুঝতেই পারছো, এই আয়াতে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মতো বৈশিষ্ট্যসম্পন্না যারা নয়, তাদেরকে বিবাহ না করার কথাই বলা হয়েছে এখানে। আবু সালেহ বলেছেন, তিনশত জন রমণীর পাণিগ্রহণের অনুমতিপ্রাপ্ত ছিলেন তিনি স.। তবে তাঁদেরকে অবশ্যই হতে হতো তাঁর চাচা, ফুফু, মামা ও খালার কন্যা, যারা তাঁর মতো হিজরত করেছিলেন।

মুজাহিদ বলেছেন, মুসলিম রমণীগণকে বিবাহ করার পর রসুল স. এর জন্য ইহুদী অথবা খৃষ্টান রমণী বিবাহ করা আর বৈধ ছিলো না। এটাও সিদ্ধ ছিলো না যে, তিনি স. তাঁর কোনো মুসলিম স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তদস্থলে ঘরে আনবেন কোনো অমুসলিম রমণী। মোট কথা কোনো বিধর্মিণীই উম্মতজননী হবার যোগ্য নয়। তবে গ্রন্থধারিণীদেরকে ক্রীতদাসীরূপে রাখা তাঁর জন্য ছিলো বৈধ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নয়'।

জুহাক কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— হে আমার নবী! এরপর থেকে আপনি আপনার কোনো পত্নীকেই পরিত্যাগ করতে পারবেন না। তাঁদেরকে তালাক দিয়ে তদস্থলে আনতে পারবেন না নতুন কাউকেও। অর্থাৎ যাঁরা এখন আপনার স্ত্রীরূপে বর্তমান, তাঁরা সকলেই বিশ্বাসবানদের জননী। সুতরাং তাঁদেরকে পরিত্যাগ করা আপনার জন্য নিষিদ্ধ। সুতরাং আপনার মহাপ্রয়াণের পরেও তাঁরা থাকবেন এই উম্মতের মাতৃস্থানীয়া। আর তখন কোনো উম্মতই তাঁদেরকে পত্নীরূপে পাবার চিন্তা করতে পারবে না। অন্য রমণীর ক্ষেত্রে তাদের জন্য এমতো নিষেধাজ্ঞা নেই।

ইবনে জায়েদ বলেছেন, মূর্খতার যুগে পত্নী বিনিময়ের কুপ্রথার প্রচলন ছিলো। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে সেই প্রথাটি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ক্রীতদাসী বিনিময় দোষের নয়।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, একদিন রসুল স. এর গৃহে অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ করলো উয়াইনা ইবনে হোসাইন। রসুল স. এর পাশে তখন উপবিষ্টা ছিলেন জননী আয়েশা। রসুল স. উয়াইনাকে বললেন, তুমি অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করলে কেনো? সে বললো, যুবক হবার পর থেকে আমি তো কারো ঘরে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করিনি। তারপর বললো, এই গৌরবর্ণের মহিলাটি কে? রসুল স. বললেন, বিশ্বাসীদের জনয়িত্রী আয়েশা। সে বললো, আমি কি এক সুন্দরী রমণীর সঙ্গে এঁকে বিনিময় করতে পারি? রসুল স. বললেন, ওই কুপ্রথাটিকে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। একথা শোনার পর সে সেখান থেকে চলে গেলো। জননী জিজ্ঞেস করলেন, লোকটি কে? রসুল স. বললেন, এক মূর্খ জননেতা।

এরপর বলা হয়েছে— 'যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে'। একথার অর্থ— কোনো রমণীর রূপে যদি আপনি মুগ্ধ হন, তবুও আপনি আপনার বর্তমান স্ত্রীগণের কাউকে সরিয়ে অথবা না সরিয়ে তাকে বিবাহ করতে পারবেন না।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত জাফর ইবনে আবু তালেবের স্ত্রী ছিলেন খুবই সুন্দরী। তিনি শহীদ হওয়ার পর রসুল স. তাঁর বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করার প্রস্তাব পাঠালেন। তখনই অবতীর্ণ হলো আলোচ্য নিষেধাজ্ঞাটি।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবে তোমার অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে এই বিধান প্রযোজ্য নয়'। একথার অর্থ— কিন্তু অধিকারভুক্ত দাসী বিনিময় নিষিদ্ধ নয়। আর এই বিধানটি সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। উল্লেখ্য, এই বিধানটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. মিসররাজ মকুকাসের পক্ষ থেকে উপঢৌকনরূপে প্রাপ্ত হলেন দু'জন দাসী। একজনের নাম মারিয়া এবং অন্যজনের নাম সিরীন। তিনি স. মারিয়াকে রাখলেন এবং সিরীনকে দিয়ে দিলেন অন্যের অধিকারে। আরো উল্লেখ্য, হজরত মারিয়াই ছিলেন রসুল স. এর প্রিয় পুত্র হজরত ইব্রাহিমের সম্মানিতা জননী।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সমস্তকিছুর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন'। একথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা সর্ববিষয়ে সতত সজাগ দ্রষ্টা। তাই তাঁর বান্দাগণের আনুগত্য ও অবাধ্যতা সকল কিছুই তাঁর দর্শনায়ত্ব। সুতরাং বান্দাগণের উচিত তাঁকে ভয় করে চলা এবং শরিয়তের বিধি-বিধানের সীমা-সরহদ রক্ষা করে চলা।

সমাধান ঃ কাউকে বিয়ে করতে চাইলে তাকে দেখে নেওয়া সিদ্ধ। হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমরা কাউকে বিবাহ করতে চাইলে তার ওই সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখে নিতে পারো, যেগুলো বিবাহেচ্ছাকে করে প্রবল। আবু দাউদ।

হজরত মুগীরা ইবনে শো'বা বর্ণনা করেছেন, আমি এক মহিলার কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালাম। রসুল স. একথা শুনে বললেন, তুমি কি তাকে দেখেছো? আমি বললাম, না। তিনি স. বললেন, আগে তাকে দ্যাখো। দ্যাখাই হবে তোমাদের উভয়ের সমঝোতার ভিত্তি। আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারেমী।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, এক লোক বিয়ে করতে চাইলো জনৈকা আনসার রমণীকে। রসুল স. একথা জানতে পেরে তাকে বললেন, আগে তাকে দেখে নাও। কারণ আনসার রমণীদের চাউনি কিন্তু বিশেষ এক ধরনের। মুসলিম।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. হজরত যয়নাব বিনতে জাহাশকে বিবাহ করার সময় অনেক লোককে নিমন্ত্রণ করলেন। যথাসময়ে সকলে সমবেত হলো। ভোজনপর্বও সমাধা হলো যথারীতি। এরপর অনেকে চলে গেলেও কেউ কেউ সেখানেই বসে মগ্ন হয়ে গেলো আলাপচারিতায়। রসুল স. তাঁর স্বভাবগত লজ্জার কারণে মুখ ফুটে কাউকে চলে যেতেও বলতে পারছিলেন না। বরং নিজেই উঠে চলে গেলেন বাইরে। তখন কেউ কেউ তাঁর মনোভাব আঁচ করতে পেরে একে একে বিদায় নিলো। কিছুক্ষণ পর তিনি স. ফিরে এসে দেখলেন, তখনও তিনজন লোক গৃহাঙ্গনে বসেই রয়েছে।

তিনি স. তাদেরকে দেখে পুনরায় বাইরে চলে গেলেন। হজরত আনাস আরো বর্ণনা করেছেন, ওই তিন জন লোকও এবার প্রস্থান করলো। আমি একথা রসুল স. কে গিয়ে জানালাম। রসুল স. ফিরে এলেন। প্রবেশ করলেন হজরত যয়নাবের ঘরে। আমিও তাঁর পিছু পিছু সে ঘরে প্রবেশ করতে চাইলাম। তিনি স. আমার সামনেই টাঙ্গিয়ে দিলেন পর্দা। ঠিক তখনই অবতীর্ণ হলো—

সূরা আহযাব ঃ আয়াত ৫৩, ৫৪

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْذَنَ
لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ ۙ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ
فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ؕ
اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ ۫ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٖ
مِنَ الْحَقِّ ؕ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ
حِجَابٍ ؕ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ؕ وَمَا كَانَ
لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَاۤ اَنْ تَنْكِحُوْۤا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖۤ
اَبَدًا ؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ﴿۵۳﴾ اِنْ تُبْدُوْا شَيْـًٔا اَوْ
تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿۵۴﴾

r হে মু'মিনগণ! তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়া না হইলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য না করিয়া ভোজনের জন্য নবী-গৃহে প্রবেশ করিও না। তবে তোমাদিগকে আহ্বান করিলে তোমরা প্রবেশ করিও এবং ভোজনশেষে তোমরা চলিয়া যাইও; তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হইয়া পড়িও না। কারণ তোমাদের এই আচরণ নবীকে পীড়া দেয়, সে তোমাদিগকে উঠাইয়া দিতে সংকোচ বোধ করে। কিন্তু আল্লাহ্ সত্য বলিতে সংকোচ বোধ করেন না। তোমরা তাহার পত্নীদের নিকট হইতে কিছু চাহিলে পর্দার অন্তরাল হইতে চাহিবে। এই বিধান তোমাদের ও তাহাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র। তোমাদের কাহারও পক্ষে আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্ট দেওয়া সংগত নহে এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার পত্নীদিগকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য কখনও বৈধ নহে। আল্লাহ্র দৃষ্টিতে ইহা ঘোরতর অপরাধ।

r তোমরা কোন বিষয় প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ— আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে মু'মিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া না হলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে ভোজনের জন্য নবীগৃহে প্রবেশ কোরো না'।

ইবনে শিহাব জুহুরী সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, যখন মদীনায় রসুল স. এর শুভপদার্পন ঘটলো, তখন আমি ছিলাম দশ বছরের বালক। আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমি তাঁর ঘনিষ্ট সেবার সুযোগ পেয়েছিলাম দশ বছর ধরে। যখন তাঁর মহাপ্রস্থান ঘটলো, তখন আমার বয়স হয়েছিলো কুড়ি বৎসর। যেহেতু আমি তাঁর ও উম্মতজননীগণের বিশেষ খাদেম ছিলাম, তাই পর্দার বিধান সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানি আমিই। পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়েছিলো জননী জয়নাবের শুভবিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর তাঁর ঘরে রসুল স. পদার্পন করবার পরক্ষণে। হজরত আনাসের এর পরের বর্ণনা ইতোপূর্বের বিবরণের অনুরূপ। জুহুরী সূত্রে বোখারীও এরকম বর্ণনা করেছেন। তাঁর অপর এক বর্ণনায় এসেছে, সুসম্পন্ন হলো রসুল স. এবং হজরত যয়নাবের শুভবিবাহ। তিনি স. তখন আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন অনেক লোককে। তারা চলে যাবার পর রসুল স. প্রবেশ করলেন তাঁর নবপরিণীতা পত্নীর প্রকোষ্ঠে। কিছু সংখ্যক লোক তখনও গৃহাঙ্গনে বসে গল্পগুজব চালিয়ে যাচ্ছিলো। এমন সময় অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত।

হজরত আনাসের আর এক বিবরণে এসেছে, জননী যয়নাবের বিবাহে ওলীমা করা হয়েছিলো গোশত ও রুটির। আমাকে দেওয়া হয়েছিলো লোকজনকে নিমন্ত্রণ করার দায়িত্ব। আমি লোকজনকে ডেকে আনতে শুরু করলাম। দলে দলে লোক এসে খেয়ে যেতে লাগলেন। এভাবে আপ্যায়নপর্ব শেষ হলো। আমি জানালাম, হে আল্লাহ্র রসুল! সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ হয়েছে। আর কেউ বাকী নেই। তিনি স. বললেন, ঠিক আছে, তাহলে সবকিছু গুটিয়ে নাও। আমি দেখলাম, তিনজন লোক তখনো সেখানে বসে কথাবার্তা বলছে। রসুল স. তাদের উপস্থিতিতে সংকোচবশতঃ তাঁর নবপরিণীতা বধুর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করতে পারছিলেন না। তাই সময়ক্ষেপণের জন্য তাঁর অন্যান্য পত্নীগণের সঙ্গে দেখা করতে লাগলেন। প্রথমে গেলেন জননী আয়েশার গৃহদ্বারে। তাঁর সঙ্গে সালাম বিনিময় করলেন। জননী আয়েশা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনার মঙ্গল হোক। আপনার নতুন বধুটি কেমন? এভাবে তিনি স. তাঁর অন্যান্য সহধর্মিণীগণের সঙ্গেও শান্তিসম্ভাষণ বিনিময় সৌজন্যালাপ করতে লাগলেন। এরপর ফিরে এসে দেখলেন তখনো ওই তিনজন আলাপচারিতায় মশগুল। তাই রসুল স. পুনরায় গমন করলেন জননী আয়েশার কাছে। সেখানে থেকে ওই

তিনজনের বিদায়ের সংবাদ যখন পেলেন, তখন এসে প্রবেশ করলেন জননী যয়নাবের কামরায়। সেখানে প্রবেশ করেই কামরার দরজায় ঝুলিয়ে দিলেন পর্দা। আর তখনই অবতীর্ণ হলো পর্দার আয়াত।

বোখারীর এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, জননী যয়নাবের বিবাহে রসুল স. করেছিলেন আড়ম্বরপূর্ণ ওলীমার আয়োজন। নিমন্ত্রিত অতিথিবর্গকে পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করানো হয়েছিলো গোশত ও রুটি। আহারের পর অতিথিরা চলে যাবার পরেও দেখা গেলো দু'জন লোক খোশগল্পে মত্ত। তিনি স. কিছুটা অস্বস্তিবোধ করলেন। সময় কাটানোর জন্য দেখা করতে লাগলেন তাঁর অন্যান্য সহধর্মিণীগণের সঙ্গে। তাঁদের সঙ্গে শুভাশীষ ও শান্তি সম্ভাষণ বিনিময় করে যেতে লাগলেন। ফিরে এলেন তখন, যখন জানতে পারলেন ওই দু'জনের প্রস্থানের সংবাদ। এরপর প্রবেশ করলেন তাঁর নববধুর প্রকোষ্ঠে। ভেতরে পা রেখে গৃহদ্বারে পর্দা ঝুলিয়ে দিতে না দিতেই অবতীর্ণ হলো পর্দার আয়াত। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম পর্দার বাইরে।

তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, ওই বিবাহের মজলিশের আমি ছিলাম রসুল স. এর সার্বক্ষণিক পরিচারক। ভোজনপর্বের পর নিমন্ত্রিতজনেরা চলে গেলে রসুল স. তাঁর সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করতে চাইলেন । দেখলেন, তখনো কিছুসংখ্যক লোক সেখানে বাক্যালাপ করে চলেছে। তিনি স. নিজেই তখন সেখান থেকে চলে গেলেন। ফিরে এলেন তাদের চলে যাবার পর। প্রবেশ করলেন জননী জয়নাবের ঘরে। তারপর আমার সামনেই ঝুলিয়ে দিলেন দরজার পর্দা। আমি সেখান থেকে ফিরে এসে কথাটা জানালাম আবু তালহাকে। তিনি বললেন, তুমি যদি ঠিক বলে থাকো, তবে দেখো, এ সম্পর্কে নিশ্চয় অবতীর্ণ হবে কোনো বিধান। তাই হলো অবতীর্ণ হলো পর্দার বিধান। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি উত্তম সূত্রবিশিষ্ট।

বিশুদ্ধ সূত্রে তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, একবার রসুল স. ও আমি একই দস্তরখানায় বসে আহার করছিলাম। হঠাৎ হাজির হলেন ওমর। রসুল স. তাঁকে আহারে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন। তিনিও এসে বসে পড়লেন আমাদের সঙ্গে। আহারকালে অসতর্কতাবশতঃ আমার হাতের আঙ্গুল লেগে গেলো তাঁর হাতের আঙ্গুলের সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন, উহ্। তারপর বললেন, নারীজাতি যদি আমার কথা শুনতো, তাহলে কেউ আপনাকে দেখতেও পেতো না। এর পরেই অবতীর্ণ হয় পর্দার বিধান। বোখারী এবং নাসাঈও এরকম বর্ণনা করেছেন।

ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, একবার এক লোক রসুল স. এর ঘরে এসে গ্যাঁট হয়ে বসে রইলো। রসুল স.

পরপর তিনবার উঠে দাঁড়ালেন। তবু সে উঠবার কোনো উদ্যোগই নিলো না। ইত্যবসরে সেখানে উপস্থিত হলেন ওমর। তিনি রোষকষায়িত নেত্রে লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি আল্লাহ্‌র রসুলকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছো কেনো? রসুল স. বললেন, আমি তো একে একে তিনবার উঠে দাঁড়ালাম। তবু সে গাত্রোত্থানের উদ্যোগ নিলো না। ওমর তখন বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি যদি নারী জাতির ব্যাপারে একটা কিছু বিহিত করতেন, তবে তা হতো অত্যুত্তম। আর আপনার পুতঃপবিত্রা সহধর্মিণীগণ তো অপরাপর রমণীদের সমমর্যাদাসম্পন্না নন। সুতরাং তাঁদের জন্য পৃথক বিধান যদি হতো, তবে তাঁরা হতেন আরো অধিক সম্মানার্হা। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পর্দার বিধান। আমি সুরা বাকারার তাফসীরে এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করেছি। যথাস্থানে তা দ্রষ্টব্য।

হজরত ওমর প্রায়ই বলতেন, তিনটি বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত লাভ করেছিলো আল্লাহ্‌র বিধানের আনুকূল্য— ১. আমি নিবেদন করেছিলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি যদি মাকামে ইব্রাহিমকে নামাজের স্থান বানিয়ে দিতেন। আমার এমতো নিবেদন উপস্থাপিত হবার পরপরই অবতীর্ণ হলো 'মাকামে ইব্রাহিমকে নামাজের স্থান বানিয়ে দিন'। ২. একবার আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র বচনবাহক। আপনার গৃহে বিভিন্ন রকমের লোকসমাগম ঘটে। উম্মতজননীগণও তাদের সামনে দেখা দেন। ব্যাপারটা আমার কাছে মনে হয় অশোভন। সুতরাং আপনি তাঁদেরকে পর্দার মধ্যে রাখুন। আমার এমতো প্রস্তাবের প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয় পর্দার আয়াত। ৩. উম্মতজননীগণ যখন একজোট হয়ে পার্থিব স্বাচ্ছ্যন্দোপকরণের দাবি তুললেন, তখন আমি তাঁদেরকে বললাম, আপনারা ভেবেছেন কী? মনে রাখবেন, যদি আপনারা রসুল স.কে পরিত্যাগ করেন, তবে আল্লাহ্ আপনাদের চেয়েও উত্তম জীবনসঙ্গিনী দান করবেন তাঁকে। আমার একথাতেই আল্লাহ্ অবতীর্ণ করলেন তাঁর প্রত্যাদেশিত বাণীরূপে। হজরত আনাস থেকে নাসাঈও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. এর সহধর্মিণীগণ রাতের বেলায় প্রকৃতির ডাকে বাড়ীর বাইরে খোলা ময়দানের দিকে চলে যেতেন। ওমর বলতেন, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! সম্মানিতা উম্মতজননীগণের জন্য পর্দার ব্যবস্থা করলে ভালো হতো মনে হয়। রসুল স. তাঁর এরকম কথায় তেমন ভ্রূক্ষেপ করতেন না। একবার রাতে বাইরে গেলেন জননী সাওদা। তিনি ছিলেন স্থূলকায়। তাই স্বল্পআলোতেও তাঁকে দেখলে চেনা যেতো। ওমর পর্দার ব্যাপারে ছিলেন অত্যুৎসাহী। তাই পথে তিনি তাঁকে দেখতে পেয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, আমি কিন্তু আপনাকে চিনে ফেলেছি। এঘটনার পর পরই অবতীর্ণ হয় পর্দার বিধান সম্বলিত আয়াত। বাগবী লিখেছেন, এই ঘটনাটিই পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার বিশুদ্ধতম প্রেক্ষিত।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, ওমরকে বিশেষভাবে মর্যাদায়িত করেছে চারটি বিষয়— ১. তিনি বদরের যুদ্ধবন্দীদেরকে হত্যা করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর ওই সিদ্ধান্তকে আল্লাহ্ পছন্দ করেছিলেন। অবতীর্ণ করেছিলেন 'আল্লাহ্র যদি আগাম সিদ্ধান্ত নির্দ্ধারিত না থাকতো.........'। ২. তিনি রসুল স. এর ভার্যাগণকে পর্দায় রাখবার পরামর্শ দিতেন। তাই জননী যয়নাব বলতেন, খাত্তাবতনয় দেখি আমাদের প্রতিও ঈর্ষাপরায়ণ। অবশেষে তাঁর ঘরেই অবতীর্ণ হয় পর্দার আয়াত। বলা হয় 'যদি তোমরা তাদের নিকট কল্যাণজনক কিছু জানতে চাও, তবে জিজ্ঞেস করো পর্দার অন্তরাল থেকে'। ৩. রসুল স. তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন, হে আমার পরম প্রভুপালক! তুমি ওমরের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিমান করো। ৪. রসুল স. এর মহাতিরোভাবের পর তিনিই সর্বপ্রথম হজরত আবু বকরের খেলাফতের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর নিকট সর্বপ্রথম বায়াতও গ্রহণ করেছিলেন তিনিই।

হাফেজ ইবনে হাজার উপরে বর্ণিত বর্ণনাবৈষাম্যসমূহের সমন্বয়নার্থে বলেছেন, জননী যয়নাবের ঘটনার কিছুকাল পূর্বেই ঘটেছিলো হজরত ওমরের ঘটনা। সুতরাং বিষয়টি দ্বন্দ্বদীর্ণ নয়। আর একই আয়াতের অবতরণের প্রেক্ষিত অনেক হওয়াতে দোষের কিছু নেই।

এখানকার 'ইল্লা আঁইয়ু'জানা লাকুম' অর্থ তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া না হলে অর্থাৎ যখন তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হবে, কেবল তখনই তোমরা প্রবেশ করতে পারবে নবীগৃহে। মনে রাখতে হবে, কেবল আমন্ত্রণই নবীগৃহে প্রবেশের জন্য যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন পৃথক অনুমতি। কথাটি অধিকতর স্পষ্ট হয়েছে আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে, বাক্যাংশটির মাধ্যমে। আর এখানকার 'গইরা নাজিরীনা ইনাহু' (আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে) এর 'ইনা' শব্দটি ধাতুমূল। যেমন বলা হয় 'আনাত ত্বয়ামু' (আহার্য প্রস্তুত হয়েছে, সম্পন্ন হয়েছে রন্ধনকর্ম)। আবার 'আনাল হামীম' (পানি খুব গরম হয়েছে)। 'কামুস' গ্রন্থে রয়েছে 'আনা' 'আইনান' ও 'ইনান' অর্থ প্রস্তুতির সময় সমাগত। যেমন বলা হয় 'বালাগা হাজাশ শাইয়ু ইনাহু' (বস্তুটির প্রস্তুতিপর্ব পৌঁছেছে শেষ পর্যায়ে)।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবে তোমাদেরকে আহবান করলে তোমরা প্রবেশ কোরো এবং ভোজন শেষে তোমরা চলে যেয়ো; তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পোড়ো না। কারণ তোমাদের এই আচরণ নবীকে পীড়া দেয়, সে তোমাদেরকে উঠিয়ে দিতে সংকোচ বোধ করে। কিন্তু আল্লাহ্ সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেন না'।

বায়যাবী লিখেছেন, বক্তব্যটির মর্মার্থ— হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা বিনা আহ্বানে ভোজনস্থলে প্রবেশ কোরো না। আর ভোজন শেষে অনতিবিলম্বে স্থান ত্যাগ কোরো। কারণ, তোমাদের অনৌচিত্তিক উপস্থিতি আমার নবীকে বিব্রত করে। তিনি লজ্জাবশতঃ একথা বলতেও পারেন না। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে সংকোচবোধ করেন না। কারণ সুশিক্ষা দান তাঁরই দায়িত্বভূত। আর সুশিক্ষা তো তাঁর কৃপারই নিদর্শন।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা তার পত্নীগণের নিকট থেকে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল থেকে চেয়ো'। এখানে 'কিছু চাইলে' অর্থ নিত্য-প্রয়োজনীয় কিছু ধার বা অনুদান হিসাবে চাইলে অথবা ফেরত দিতে চাইলে ধার নেওয়া কোনো কিছু।

বাগবী লিখেছেন, পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. এর সহধর্মিণীগণের দিকে দৃষ্টিপাত করা আর বৈধ ছিলো না, তাঁরা পর্দাচ্ছাদিত অবস্থায় থাকুক অথবা না থাকুক।

এরপর বলা হয়েছে— 'এই বিধান তোমাদের ও তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র'। একথার অর্থ— পর্দা রক্ষার এমতো বিধান এমনই একটি বিধান, যেখানে শয়তানের কুমন্ত্রণার প্রবেশাধিকার মাত্রই নেই। তাই এই বিধান তোমাদের এবং তোমাদের ধর্মমাতাগণের আন্তরিক পবিত্রতার রক্ষাকবচ বলে সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করে নাও এবং তদনুযায়ী আমলও করো।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদের কাহারো পক্ষে আল্লাহ্র রসুলকে কষ্ট দেওয়া সঙ্গত নয় এবং তার মৃত্যুর পর তার পত্নীদেরকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য কখনো বৈধ নয়। আল্লাহ্র দৃষ্টিতে এটা ঘোরতর অপরাধ'।

ইবনে জায়েদ সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, একদিন রসুল স. হঠাৎ জানতে পারলেন, কেউ একজন নাকি বলেছে, সে তাঁর পরলোকগমনের পর তাঁর কোনো এক পত্নীকে বিবাহ করবে। এর কিছুকাল পরেই অবতীর্ণ হয় উদ্ধৃত বাক্যাংশটি।

হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, আয়াতের এই অংশটি অবতীর্ণ হয়েছে ওই ব্যক্তির কারণে, যে বলেছিলো, রসুলের লোকান্তরিত হওয়ার পর আমি বিয়ে করবো তার অমুক বিবিকে। সুফিয়ান বলেছেন, এমতো উক্তি সে করেছিলো জননী আয়েশাকে লক্ষ্য করে।

সুদ্দী বলেছেন, আমি জানতে পেরেছি, তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্ বলেছিলো, কী! মোহাম্মদ আমাদের চাচাতো বোনের সঙ্গে আমাদেরকে পর্দা করতে বলে! আবার সে বিয়ে করেছে আমাদের অনেকের প্রাক্তন বিবিকে। ঠিক আছে, সুযোগ যদি আসে তবে তার চিরবিদায়ের পর আমরাও বিবাহ করবো তাঁর বিবিদেরকে। আলোচ্য আয়াতাংশটি অবতীর্ণ হয় এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করেই।

আবু বকর ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আমর সূত্রে ইবনে সা'দ লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে। সে বলেছিলো, মোহাম্মদের মৃত্যুর পর আমি বিয়ে করবো আয়েশাকে। জুয়াইবীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এক লোক রসুল স. এর সহধর্মিণীগণের কোনো একজনের ঘরে বসে আলাপ করছিলো। সে ছিলো ওই উম্মতজননীর চাচাতো ভাই। রসুল স. সেখানে পৌঁছে তাকে জানিয়ে দিলেন, এখন থেকে তুমি আর তোমার চাচাতো বোনের সঙ্গে এরকম খোলামেলা আলাপ করতে পারবে না। সে বললো, আমি তো কথা বলছি আমার পিতৃব্যপুত্রীর সঙ্গে। আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা তো মন্দ কিছু বলিনি। রসুল স. বললেন, দ্যাখো, আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক ব্রীড়াসম্পন্ন কেউ নয়। আর আমিও নই ব্রীড়াবিবর্জিত। একথা শুনে লোকটি বিদায় নিলো। রাস্তায় আমার সঙ্গে দেখা হতেই বললো, আমার চাচাতো বোনের সঙ্গে আমাকে কথা বলতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। ঠিক আছে, তার পরলোকগমনের পর আমিও এর শোধ নিবো। বিয়ে করবো তার স্ত্রীকে। হজরত ইবনে আব্বাস আরো বলেছেন, লোকটি তার এমতো উক্তির কারণে পরে অনুতপ্ত হয় এবং প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মুক্ত করে দেয় একটি ক্রীতদাস এবং আল্লাহ্‌র পথে দান করে দশটি উট। হজও করে পদব্রজে।

বাগবী লিখেছেন, জুহুরী সূত্রে মুয়াম্মার বলেছেন, রসুল স. এর পত্নীগণকে বিবাহ করার নিষিদ্ধতা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি স. আলীয়া বিনতে জুবিয়ান নাম্মী তার এক স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন। পরে তিনি হন জনৈক ব্যক্তির সহধর্মিণী এবং হন বেশ কয়েকজন সন্তান-সন্ততির জননীও।

বায়যাবী লিখেছেন, রসুল স. এর ওই সকল পত্নী বিবাহনিষিদ্ধ হওয়ার বিধানের বাইরে, যারা সুযোগ পাননি তাঁর সঙ্গে একান্তবাসের। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমরের শাসনকালে আশয়াস্ ইবনে কায়েস বিয়ে করেছিলেন মুস্তায়ীজাকে। হজরত ওমর তাকে প্রস্তরনিক্ষেপের মাধ্যমে হত্যা করতে মনস্থ করলেন। কারণ মুস্তায়ীজা ছিলেন রসুল স. এর সহধর্মিণী। কিন্তু পরে তিনি জানতে পারলেন মুস্তায়ীজার সঙ্গে রসুল স. এর একান্ত মিলন হওয়ার আগেই তিনি স. তাঁকে পরিত্যাগ করেছিলেন। তখন তিনি পরিত্যাগ করলেন আশয়াসকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত।

এখানে 'আ'জীমা' অর্থ গুরুতর অপরাধ। আমি বলি, রসুল স. এর পত্নীগণকে বিবাহ করা নিষেধ একারণে যে, তিনি স. অন্যদের মতো মৃত নন। বরং তিনি স. তাঁর সমাধিতে সততজীবন্ত। সেকারণেই তাঁর সম্পত্তির ওয়ারিছ কেউ নয় এবং তাঁর পত্নীগণও নয় বিধবা। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কেউ আমার সমাধির সন্নিকটে এসে সালাম দিলে আমি তা সরাসরি শুনি। আর দূরদেশীদের সালাম আমার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।

পরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে— 'তোমরা কোনো বিষয় প্রকাশ করো, অথবা গোপন রাখো— আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ'। একথার অর্থ— যদি তোমার মনে থাকে আল্লাহ্র রসুলকে কষ্ট দেওয়ার গোপন কামনা, অথবা থাকে তাঁর পত্নীগণকে বিবাহ করবার অপবিত্র অভিলাষ, তবে তা কিছুতেই থাকবে না আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞানের বাইরে। কারণ তিনি যে সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানধর।

বাগবী লিখেছেন, এই আয়াতের লক্ষ্যস্থল ওই লোক, যে মনে মনে ভাবতো, রসুল স. এর মহাপ্রস্থানের পর সে বিয়ে করবে জননী আয়েশাকে। আর এখানকার 'আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ' অর্থ মানুষের অন্তরের গোপনতম কামনাও তাঁর অবিদিত নয়। সুতরাং কেউ অন্তরে রসুল স. এর পুতঃপবিত্রা সহধর্মিণীগণের কাউকে বিবাহ করবার মতো জঘন্য লালসা লালন করলে তিনি তা অবশ্যই জানবেন এবং যথাসময়ে এমতো অপরাধীর উপরে প্রয়োগ করবেন যথোপযুক্ত শাস্তি।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. চিরসম্মানীয়া সহধর্মিণীগণের কাউকে বিবাহ করবার অভিলাষ ছিলো একটি চরম শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সেকারণেই যে ব্যক্তি এরকম বলেছিলো, সে সানুতপ্ত মনে কাফফারারূপে মুক্ত করে দিয়েছিলো একজন ক্রীতদাস এবং আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে দিয়েছিলো দশটি উট। তারপর হজ সমাপন করেছিলো পায়ে হেঁটে।

বাগবী লিখেছেন, পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর উম্মতজননীগণের পিতা ও ভ্রাতাগণ বলতে লাগলেন, আমরাও এখন থেকে উম্মতজননীগণের সঙ্গে কথা বলবো পর্দার অন্তরাল থেকে। তাঁদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো—

সূরা আহযাব ঃ আয়াত ৫৫

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيٓ ءَابَآئِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآئِهِنَّ وَلَآ إِخْوَٰنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ إِخْوَٰنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ أَخَوَٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ ۗ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٥﴾

r নবী-পত্নীদের জন্য তাহাদের পিতৃগণ, পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, ভগ্নীপুত্রগণ, সেবিকাগণ এবং তাহাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসিগণের ব্যাপারে উহা পালন না করা অপরাধ নহে। হে নবী-পত্নীগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর, আল্লাহ্ সমস্ত কিছু প্রত্যক্ষ করেন।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— উম্মতজননীগণকে যে সকল লোকের সঙ্গে পর্দা পালন করতে হবে না, তাঁরা হচ্ছেন তাঁদের পিতাগণ, পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, ভগ্নীপুত্রগণ, সেবিকাগণ এবং তাঁদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীগণ। লক্ষণীয়, চাচা ও মামার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। কারণ, ভ্রাতুষ্পূত্র ও ভগ্নিপুত্রের উল্লেখের পর তাঁদের উল্লেখের আর প্রয়োজন পড়ে না। আর রক্তগত সম্পর্কের দিক থেকে উম্মতজননীগণ তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্রগণের ফুফু এবং ভগ্নিপুত্রগণের খালা।

ওরওয়া ইবনে যোবায়ের সূত্রে বোখারী বর্ণনা করেছেন, জননী আয়েশা বলেছেন, আমার দুধপান সম্পর্কীয় চাচা আফলাহ্ একবার আমার গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তখনো পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। তবু আমি আমার সেই দুধ চাচাকে বললাম, রসুলুল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিরেকে আমি আপনাকে অনুমতি দিতে পারি না। তিনি চলে গেলেন। এরপর রসুল স. যখন এলেন, তখন আমি ঘটনাটি তাঁকে খুলে বললাম। তিনি স. বললেন, তুমি তাকে অনুমতি দিতে পারতে। আমি বললাম, তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী। আমাকে তো দুধ পান করিয়েছিলো তাঁর ভ্রাতৃবধু। তিনি স. বললেন, আরে বোকা! তোমার হাত ধূলিধূসরিত হোক। তিনি তো তোমার চাচা, পিতৃসমতুল। ওরওয়া বলেন, একারণেই জননী আয়েশা বলতেন, বংশগতভাবে যারা মুহরিম, দুধপান সম্পর্কেও তারা মুহরিম।

এখানে 'ওয়ালা নিসাইহিন্না' (সেবিকাগণ) বলে ওই সকল রমণীর কথা বলা হয়েছে, যারা স্বাধীনা। আর 'মা মালাকাত আইমানুহুন্না' (দাস-দাসীগণ) অর্থ ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীরা। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে কেবল ক্রীতদাসীগণকে। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে সুরা নুরের তাফসীরে।

শেষে বলা হয়েছে— 'হে নবীপত্নীগণ! আল্লাহ্কে ভয় করো'। একথার অর্থ— হে রসুলের সহধর্মিণীবৃন্দ! পর্দার বিধানের পরিপন্থী আমল করার ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করো। মনে রেখো, এই বিধান সেই আল্লাহ্র, যিনি মহাবিশ্বের এক ও একক অধিপতি। আর তিনি তাঁর বিধানবিরোধীদেরকে শাস্তি দিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম।

সর্বশেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সমস্ত কিছু প্রত্যক্ষ করেন'। একথার অর্থ— সকলের সকল কিছুই আল্লাহ্র প্রত্যক্ষগোচর। সুতরাং তিনি পুণ্যকর্মশীলাদেরকে করবেন পুরস্কৃত এবং তিরস্কৃত করবেন পাপলিপ্তাদেরকে।

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿۵۶﴾

r আল্লাহ্ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁহার ফিরিশ্‌তাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মু'মিনগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাহাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে'।

হজরত ইবনে আব্বাস কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়তম রসুলের উপর বর্ষণ করেন করুণা এবং তাঁর ফেরেশতারাও কৃপাপ্রার্থী হন তাঁর প্রিয় রসুলের জন্য। এক বর্ণনায় এসেছে, কথাটির অর্থ— আল্লাহ্ তাঁর নবীকে দান করেন বরকত এবং ফেরেশতারাও তাঁর প্রিয় সখার জন্য করেন ক্ষমাপ্রার্থনা। হাদিস শরীফসমূহের বর্ণনাদৃষ্টে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, 'সালাত' শব্দটি আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পৃক্ত হলে এর অর্থ দাঁড়াবে রহমত, অনুগ্রহ, করুণা, মহিমা। আর ফেরেশতাদের সঙ্গে সম্পর্কিত হলে অর্থ দাঁড়াবে দোয়া, প্রার্থনা বা ক্ষমাপ্রার্থনা। আর মানুষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হলে অর্থ হবে— তোমরা অনুগ্রহপ্রার্থী হও তোমাদের মহামহিম রসুলের জন্য, দোয়া করো, যেনো তাঁর উপরে হয় আল্লাহ্‌র রহমতের সীমাহীন বর্ষণ। আর তার প্রতি প্রেরণ করো শান্তি সম্ভাষণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'হে মু'মিনগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করো। এবং তাঁকে যথাযথভাবে সালাম জানাও'।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, জীবনে অন্ততঃপক্ষে একবার রসুল স. এর উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ করা অত্যাবশ্যক। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেক এরকম বলেছেন। তাহাবীর অভিমতও এরকমই। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, উদ্ধৃত বিধানটি অপরিহার্য হওয়ার দাবিদার। সুতরাং জীবনে একবারের জন্য হলেও রসুল স. এর প্রতি প্রেরণ করতে হবে দরূদ। কারণ আমাদের কাছে আদেশসূচক বাক্যের অন্তর্গত বিধানের পৌনঃপুনিকতা সুস্বীকৃত নয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন, নামাজের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পরে দরূদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব। এরকম বলেছেন ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদও।

উল্লেখ্য, উম্মতের মতানৈক্যের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্র করুণা। তাই দেখা যায়, নামাজের মধ্যেই দরূদ পাঠের মূল্যায়ন সূচিত হয়েছে পৃথক পৃথকভাবে। যেমন ইমাম আবু হানিফার ও ইমাম মালেকের মতে নামাজের ভিতরের দরূদ শরীফ যথাস্থানে পাঠ করা সুন্নত। ইমাম শাফেয়ীর মতে ফরজ। ইমাম আহমদের অভিমত পাওয়া যায় দু'টি— এক বর্ণনানুসারে ফরজ এবং অপর বর্ণনানুসারে সুন্নত। এরকম বলেছেন ইবনে জাওজী। অনেকে বলেন, রসুল স. এর নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ ওয়াজিব হয়ে যায়।

ইমাম কারখী বলেছেন, নামাজে দরূদ পাঠ করা ফরজ— এই অভিমতের প্রবক্তারা প্রমাণ উপস্থিত করেন হজরত সহল ইবনে সা'দ থেকে দারাকুতনীর পদ্ধতিতে ইবনে জাওজী কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস দ্বারা, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যারা নামাজের মধ্যে দরূদ পাঠ করে না তাদের নামাজ হয়ে যায় পণ্ড। দারাকুতনী বলেছেন, এই হাদিসের সূত্রপ্রবাহভূত বর্ণনাকারী আবদুল মুহাইমিন ইবনে আব্বাস ইবনে সহল ইবনে সা'দ বর্ণনাকারী হিসেবে অবলিষ্ঠ। ইবনে হাব্বান তাই বলেছেন, বর্ণনাটি প্রামাণ্য নয়।

ইবনে জাওজীর বর্ণনায় এসেছে, ওজুবিহীন নামাজ নামাজই নয়। ওজুর পূর্বক্ষণে আল্লাহ্র নামোচ্চারণ না করলে ওজুই হয় না। দরূদবিহীন নামাজও নামাজ নয়। আনসারগণের প্রতি যার দরূদ নেই, তার নামাজ অগ্রাহ্য। এই হাদিসেরও এক বর্ণনাকারী অবলিষ্ঠ আবদুল মুহাইমিন। তাই তার বর্ণনা দলিলরূপে গণ্য নয়। কিন্তু উবাই ইবনে আব্বাস ইবনে সহল ইবনে সা'দ তাঁর পিতা ও পিতামহ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সুপরিণতসূত্রে। আলেমগণের কেউ কেউ বলেছেন, আবদুল মুহাইমিন কর্তৃক বর্ণিত হাদিস বিশুদ্ধতার নিকটবর্তী। তাঁরা আরো বলেছেন, উবাই ইবনে আব্বাস বিতর্কাহত।

হজরত আবু মাস্উদ আনসারী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যে নামাজ পাঠ করলো, অথচ আমার প্রতি আমার বংশধরদের প্রতি দরূদ পাঠ করলো না তার নামাজ গ্রহণযোগ্য নয়। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন দারাকুতনীর পদ্ধতিতে ইবনে জাওজী। ইবনে জাওজী মন্তব্য করেছেন, হাদিসটির সূত্রপ্রবাহভূত বর্ণনাকারী জাবের জু'ফী বর্ণনাকারীরূপে অশক্ত। আরো বলেছেন, জাবের জু'ফী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন দু'টি সূত্রে— একবার হজরত ইবনে মাসউদ পর্যন্ত পরিণতসূত্রে। আর একবার সুপরিণতসূত্রে। এই সূত্রবৈপরীত্যই বর্ণনাটিকে করেছে অদৃঢ়। ইবনে হুম্মাম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে মাসউদ থেকে এবং বলেছেন, ইবনে জাওজীর অভিমতানুসারে এই হাদিসের এক বর্ণনাকারী জাবের দুর্বল। তিনিই বর্ণনাটির সূত্রবৈষম্য ঘটিয়েছেন। বর্ণনা করেছেন পরিণত ও সুপরিণত দু'রকম সূত্রে।

হাকেম ও বায়হাকী বনী হারেছ গোত্রের ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাব্বাক সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন তোমরা তাশাহ্হুদ পাঠ করার পরে পাঠ কোরো— 'আল্লাহুম্মা সল্লি আ'লা মুহাম্মাদ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদ ওয়াবারিক আ'লা মুহাম্মাদ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদ। কামা সল্লাইতা ওয়াবারাকতা ওয়া তার হামতা আ'লা ইবরহীম ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ'। হারেছ ইবনে হাজাম বলেছেন, কেবল হারেছী ব্যতীত হাদিসটির অন্য সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। সমালোচিত শুধু হারেছ।

ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, 'যারা আমার উপর দরূদ পাঠ করে না, তাদের নামাজ হয় না' এই হাদিসটির সূত্রশৃঙ্খল শিথিল। হাদিসবেত্তাগণ এরকমই মন্তব্য করেছেন। যদি হাদিসটিকে যথাসূত্রসম্বলিত বলে মেনে নেওয়া হয়, তবে এর মর্মার্থ দাঁড়াবে— দরূদশরীফ বিবর্জিত নামাজ অপূর্ণ। অথবা মর্মার্থ হবে— কেউ যদি তার সারাজীবনের কোনো এক ওয়াক্তের নামাজে একবারও দরূদ শরীফ না পড়ে তবে তার নামাজ বৃথা।

হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, এই হাদিসের সূত্র অপেক্ষা হজরত ফুজালা ইবনে উবাইদ কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের সূত্রপরম্পরা অধিকতর সুদৃঢ়। তিনি বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. এক লোককে নামাজের মধ্যে দোয়া করতে শুনলেন। কিন্তু সে দরূদ পাঠ করলো না। নামাজ শেষে তিনি স. তাকে ডেকে অন্যান্যদেরকে শুনিয়ে বললেন, এই লোকটি তার দোয়াকে করেছে সংক্ষিপ্ত। জেনে রাখো, নামাজে প্রথমে বর্ণনা করতে হয় আল্লাহ্র স্তব-স্তুতি। তারপর দরূদ পাঠ করতে হয় আমার উপর। তারপর চাইতে হয় যা রয়েছে চাওয়ার। আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিজি, ইবনে হাব্বান, ইবনে খুজাইমা, হাকেম।

তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এভাবে— হজরত ফুজালা বলেছেন, রসুল স. মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় এক লোক এসে নামাজ পড়তে শুরু করলো। নামাজ শেষে বললো, হে আল্লাহ্ আমাকে মার্জনা করো। কৃপা করো। রসুল স. বললেন, ওহে নামাজী! তুমি তো তাড়াহুড়া করলে। জেনে নাও, নামাজ শেষে তোমাকে বসতে হবে। প্রথমে প্রকাশ করতে হবে আল্লাহ্র প্রশংসা। তারপর আমার প্রতি পাঠ করতে হবে দরূদ। তারপর চাইতে হবে, যা কিছু তোমার প্রয়োজন। বর্ণনাকারী বলেছেন, কিছুক্ষণ পর সেখানে উপস্থিত হলো আর এক লোক। সে নামাজ শেষে প্রকৃষ্ট বাক্যে বর্ণনা করলো আল্লাহ্র প্রশংসা ও মহিমা। তারপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো রসুল স. এর উপর। রসুল স. বললেন, ওহে নামাজী! এবার তোমার একান্ত প্রার্থনা প্রকাশ করো। তোমার প্রার্থনা এবার গৃহীত হবে। তিরমিজি, নাসাঈ এবং আবু দাউদও এরকম বর্ণনা করেছেন।

আমি বলি, নামাজে তাশাহ্হুদের পর দরূদ শরীফ পাঠ করা যে অত্যাবশ্যক, সে কথা প্রমাণ করা যায় এভাবে— আলোচ্য আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নামাজের মধ্যেকার দরূদ শরীফ পাঠের। এর দৃষ্টান্ত রয়েছে অন্যান্য আয়াতেও। যেমন— 'ওয়া রব্বাকা ফাকাব্বির' এই আয়াতে বলা হয়েছে নামাজের তাকবীরে তাহরীমার (প্রথম তাকবীরের) কথা। 'ক্বমু লিল্লাহি ক্বনিতীন' এসেছে নামাজের কিয়ামের উল্লেখ। 'ওয়াস্‌জুদু ওয়ারকাউ' তে নির্দেশ করা হয়েছে নামাজের রুকু ও সেজদাকে। আবার 'ফাক্বরাউ মা তাইয়াস্‌সারা মিনাল ক্বুরআন' তে নির্দেশ এসেছে নামাজের ক্বেরাতের। হজরত কা'ব ইবনে উজরা কর্তৃক বর্ণিত হাদিসেও রয়েছে একথার প্রমাণ। হজরত আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে, একবার রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনার প্রতি শান্তিসম্ভাষণের পদ্ধতি তো আমরা জানি। বলি, আস্‌সালামু আ'লাইকা আইয়ুহান নাবীয়্যু ওয়া রহমাতুল্লহি ওয়া বারাকাতুহু। কিন্তু দরূদ কীভাবে পাঠ করতে হয় তাতো আমরা জানি না। তিনি স. বললেন, তোমরা পাঠ কোরো 'আল্লাহুম্মা সল্লিআ'লা মুহাম্মদ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মদ........ শেষ পর্যন্ত। মতৈক্য সহকারে মুসলিম উম্মত একথা স্বীকার করে নিয়েছে যে, নামাজে তাশাহহুদ পাঠের পর দরূদ শরীফ পাঠ করতে হবে। তবে এরকম করা সুন্নত না ওয়াজিব কেবল সে সম্পর্কে ঘটেছে মতানৈক্য। বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমেও একথা প্রমাণিত হলো যে, দরূদ শরীফ পাঠ করতে হবে তাশাহ্হুদের পর। আর যারা বলেন রসুল স. এর নাম উচ্চারণ করার পরক্ষণেই দরূদ পাঠ করতে হবে, তাঁরা প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ওই ব্যক্তির নাসিকা ধূলিধূসরিত হোক, যে আমার নাম শুনেও দরূদ পাঠ করে না। মৃত্তিকায়িত হোক ওই ব্যক্তির নাকও, যে রমজান মাস পেলো, অথচ মাফ করিয়ে নিতে পারলো না তার পাপরাশি। আর ধূলায়িত হোক ওই লোকের নাসিকাও, যে তার বৃদ্ধ পিতা-মাতার যে কোনো একজনকে পেয়েও অর্জন করে নিতে পারলো না জান্নাত। তিরমিজি, ইবনে হাব্বান।

হজরত জাবের ইবনে সামুরা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যার সামনে আমার নাম উল্লেখ করা হলো, অথচ তা শুনে যে আমার উপরে দরূদ পাঠ করলো না, সে যদি নরকে প্রবেশ করতে চায় তো করুক। আল্লাহ্ যদি তাকে দূরেই রাখতে চান তো রাখুন। সুপরিণত সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, একবার জিবরাইল আমাকে বললো, যার সামনে আপনার নাম উচ্চারণ করা হলো, অথচ তা শুনেও যে আপনার উদ্দেশ্যে দরূদ পাঠ করলো না, সে যদি দোজখে যেতে চায়, তবে আল্লাহ্ তাকে দূরেই রেখে দিন। হাদিসদ্বয় সংকলন করেছেন তিবরানী।

হজরত জাবের থেকে সুপরিণত সূত্রে ইবনে সুন্নী উল্লেখ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার নাম শ্রবণ করা সত্ত্বেও দরূদ পাঠ করে না, সে হতভাগা। হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার নাম উচ্চারিত হতে শুনেও যে ব্যক্তি আমার উদ্দেশ্যে দরূদ পাঠ করে না, সে কৃপণ। হাদিসটি বর্ণনা করেছে তিরমিজি এবং বলেছেন, বর্ণনাটি উত্তম, বিশুদ্ধ ও দুষ্প্রাপ্য শ্রেণীর। ইমাম আহমদ ও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম হোসাইন থেকে। তাঁর নিকট থেকে আবার সুপরিণতসূত্রে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, আমার নাম শোনার পরেও যার দরূদ পরিত্যক্ত হলো, তার পরিত্যক্ত হলো জান্নাতও। হজরত আনাস থেকে যথাসূত্রে নাসাঈ উল্লেখ করেছেন, যার সাক্ষাতে আমার নাম উচ্চারিত হবে, আমার উদ্দেশ্যে দরূদ শরীফ পাঠ করা হবে তার কর্তব্য। যে আমার উদ্দেশ্যে দরূদ প্রেরণ করে একবার, আল্লাহ্ তার উপরে রহমত বর্ষণ করে দশবার।

দরূদ শরীফ পাঠের ফযীলত ও তাৎপর্য ঃ আবদুর রহমান ইবনে আবী লাইলা বর্ণনা করেছেন, একবার আমার সাক্ষাত ঘটলো হজরত কা'ব ইবনে উজরা সঙ্গে। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি হাদিস উপহার দিবো, যা আমি রসুল স. এর নিকট থেকে শুনেছি স্বকর্ণে? আমি বললাম, অবশ্যই। তিনি বললেন, একবার আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! আমরা তো জানি, কীভাবে আপনাকে সালাম করতে হয়। কিন্তু আপনার প্রতি এবং আপনার অভিমত বংশধরগণের প্রতি কীভাবে দরূদ পাঠ করতে হয়, তাতো আমরা জানি না। তিনি স. বললেন, এভাবে— 'আল্লাহুম্মা সল্লি আ'লা মুহাম্মদ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদ কামা সল্লাইতা আ'লা ইব্রহীম। ওয়া আ'লা আলি ইব্রহীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা মুহাম্মাদ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদ, কামা বারকতা আ'লা ইব্রহীম ওয়া আ'লা আলি ইব্রহীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ'। বোখারী, মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনায় 'আ'লা ইব্রহীম' এর স্থলে এসেছে 'ওয়া আ'লা আলি ইব্রহীম'।

হজরত আবু হামীদ সায়েদী বলেছেন, একবার সাহাবীগণ রসুল স. সকাশে নিবেদন করলেন, হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ! আপনার উপরে আমরা কীভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবো তা শিখিয়ে দিন। তিনি স. বললেন এভাবে— 'আল্লাহুম্মা সল্লি আ'লা মুহাম্মাদ ওয়া আযওয়াজ্বিহী ওয়া জুররিয়্যাতিহী কামা সল্লাইতা আ'লা ইব্রহীম। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আযওয়াজ্বিহী ওয়া জুররিয়্যাতিহী কামা বারকতা আ'লা ইব্রহীম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপরে দরূদ পাঠ করবে একবার, আল্লাহ্ তার উপরে রহমত বর্ষণ করবেন দশবার। মুসলিম। হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি আমার উপরে

একবার দরূদ পড়বে, আল্লাহ্ তার উপরে রহমত বর্ষণ করবেন দশবার। মার্জনা করবেন তার দশটি পাপ এবং তার মার্যাদা বাড়িয়ে দিবেন দশগুণ। বোখারী, আহমদ, নাসাঈ, হাকেম। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। হজরত ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহাবিচারের দিবসে ওই ব্যক্তি হবে আমার অধিকতর নৈকট্যভাজন, যে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে অত্যধিক। তিরমিজি। তাঁর নিকট থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, ধরাপৃষ্ঠে কিছুসংখ্যক ফেরেশতা থাকে পরিভ্রমণরত। উম্মতের সালাম আমার কাছে পৌঁছে দেওয়াই তাদের কাজ। নাসাঈ, দারেমী।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, কেউ আমার কাছে সালাম প্রেরণ করলে আল্লাহ্ আমার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন আমার রূহকে। তখন আমি দান করি তার সালামের প্রত্যুত্তর। আবু দাউদ, বায়হাকী। তাঁর নিকট থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমাদের গৃহগুলোকে কবর বানিয়ো না। আর অপরিচ্ছন্ন রেখো না আমার সমাধিকে। আর আমার প্রতি প্রেরণ কোরো নিরবচ্ছিন্ন দরূদ। তোমরা যেখানেই থাকো না কেনো, তোমার দরূদ আমার কাছে পৌঁছানো হবে।

হজরত আবু তালহা বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. আমাদের মধ্যে উপস্থিত হলেন প্রফুল্ল বদনে। বললেন, জিবরাইল এই মাত্র বলে গেলো, আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করেছেন তুমি আমার প্রিয়তম রসুলকে গিয়ে বলো, তিনি কি একথা জেনে খুশী হবেন না যে, যে ব্যক্তি তার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে আমি তার উপরে রহমত বর্ষণ করবো দশবার? আর যে একবার তার প্রতি সালাম প্রেরণ করবে, আমি তার উপরে শান্তি বর্ষণ করবো দশবার? নাসাঈ, দারেমী।

হজরত উবাই ইবনে কা'ব বর্ণনা করেছেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি আপনার প্রতি অগণিতবার দরূদ পাঠ করি। তাই জানতে চাই, এর কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে কী? তিনি স. বললেন, যতোবার ইচ্ছা ততোবারই পাঠ করতে পারো। যতবেশী পাঠ করবে ততোই উপকৃত হবে। আমি বললাম , যদি আমি আমার জিকির ও দোয়ার এক চতুর্থাংশ সময় দরূদ শরীফের জন্য নির্ধারণ করি? তিনি স. বললেন, তা-ও করতে পারো। তবে যতো করবে ততোই লাভ। বললাম, যদি নির্ধারণ করি দুই তৃতীয়াংশ সময়। তিনি স. বললেন, তা-ও করতে পারো। তবে যতো করবে ততোই মঙ্গল। পুনরায় বললাম, যদি আমার দোয়া প্রার্থনার পুরোটা সময় নির্ধারণ করি দরূদ শরীফের জন্য? তিনি স. জবাব দিলেন, তাহলে তো তিরোহিত হবে তোমার সকল দুশ্চিন্তা। পূর্ণ হবে মনোবাসনা। আর নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে তোমার যাবতীয় পাপরাশি। তিরমিজি।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার একথা জেনে যদি কেউ আনন্দিত হতে চায় তবে সে শুনে রাখুক, কেউ যদি আমার পরিবার পরিজনদের জন্য দোয়া করে তবে সে কল্যাণ লাভ করবে তার গোটা পরিবারের জন্য। আর সে যেনো দোয়া করে এভাবে— 'আল্লাহুম্মা সল্লি আ'লা মুহাম্মাদিনিন্ নবীয়্যিল উম্মি ওয়া জুররিয়্যাতিহী ওয়া আহলি বাইতিহী ওয়া আযওয়াজ্বিহী উম্মাহাতিল মু'মিনীন ওয়া জুররিয়্যাতিহী ওয়া আহলি বাইতিহী কামা সল্লাইতা আ'লা ইব্রহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আবু দাউদ।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বলেছেন, যে ব্যক্তি রসুল স. এর প্রতি দরূদ পাঠ করে একবার, আল্লাহ্ এবং তার ফেরেশতারা তাঁর উপরে করুণা বর্ষণ করেন সত্তরবার।

হজরত রওয়াইফা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ওই ব্যক্তির জন্য আমার শাফায়াত করা হবে ওয়াজিব, যে ব্যক্তি দরূদ পাঠকালে বলবে 'আল্লাহুম্মা আন্যিলহুল মাকআ'দাল মুক্বাররাবা ইনদাকা ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি ওয়াজাবাত্ লাহু শাফাআতী' (হে আল্লাহ্! মহাবিচারের দিবসে তুমি আমাকে মোহাম্মদ স. এর নৈকট্যভাজন কোরো)।

হজরত আবুদর রহমান ইবনে আউফ বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. তাঁর গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে উপস্থিত হলেন একটি উদ্যানে। তারপর সেজদাবনত হয়ে কাটিয়ে দিলেন অনেকক্ষণ। তাঁর এমতো প্রলম্বিত সেজদা দেখে একবার আমার মনে হলো, তিনি স. তবে কি পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করলেন? সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁর নিকটবর্তী হলাম। তিনি স. মস্তক উত্তোলন করে বললেন, কী হয়েছে? আমি আমার সংশয়ের কথা জানালাম। তিনি স. বললেন, জিবরাইল আমাকে একটি শুভবারতা জানালো। বললো, আল্লাহ্ আপনার সন্তোষ সাধনার্থে বলে পাঠিয়েছেন, যে ব্যক্তি আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করবে, আমি তার প্রতি অবতীর্ণ করবো রহমত এবং যে ব্যক্তি আপনার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করবে সালাম, আমিও তাকে প্রতিদানে দিবো শান্তিসম্ভাষণ। আহমদ।

হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন, রসুল স. এর প্রতি দরূদ পাঠ না করা পর্যন্ত সকল প্রার্থনা আটকে থাকে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে, ঊর্ধ্বে উত্থিত হয় না এতোটুকুও। তিরমিজি।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আমের ইবনে রবীয়া বর্ণনা করেছেন, আমার পিতা বলেছেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, কেউ আমার উপরে যতোবার দরূদ পাঠ করবে, ফেরেশতারাও তার উপরে করুণা বর্ষণ করবে ততোবার। এখন আল্লাহ্র বান্দাগণের ইচ্ছা, তারা দরূদ পাঠ করবে অধিক, না অনধিক। বাগবী।

হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করবে, তার আমলনামায় পুণ্য লেখা হবে এক কীরাত। আর এক কীরাত পুণ্যের পরিমাণ উহুদ পর্বতের সমান। উত্তম সূত্র সহযোগে আবদুর রাজ্জাক হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর জামে গ্রন্থে।

হজরত আবু দারদা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় দশবার করে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে, সে অর্জন করবে আমার শাফায়াত। তিরমিজি তাঁর 'কবীর' গ্রন্থে হাদিসটি সংকলন করেছেন উত্তমসূত্র পরম্পরা সহযোগে।

বিবেচনায়ন ঃ হজরত আবু বকর সিদ্দীক বলেছেন, একবার আমি রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক লোক এসে রসুল স. কে সালাম বললো। তিনি স. তার সালামের প্রত্যুত্তর করলেন। তারপর তাঁকে পাশে বসালেন। কার্য সমাধার পর লোকটি চলে গেলে রসুল স. বললেন, আবু বকর! লোকটির এক দিনের পুণ্যকর্ম সারা বিশ্বের পুণ্যকর্মের সমতুল। আমি বললাম, কীভাবে? তিনি স. বললেন প্রতিদিন সকালে যে আমার প্রতি এমনভাবে দশবার দরূদ পাঠ করে, যা হয়ে যায় সমগ্র সৃষ্টির দরূদ পাঠের সমান। আমি বললাম, আমি কি তা জানতে পারি? তিনি স. বললেন, নিশ্চয়ই। সে বলে— 'আল্লাহুম্মা সল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন নাবীয়্যী আদাদা মান সল্লা মিন খলক্বিকা ওয়া সল্লি আ'লা মুহাম্মাদ কামা ইয়ামবাগী লানা আন্ নুসাল্লি আলাইহি ওয়া সল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন নাবীয়্যী কামা আমারতানা আন্ নুসাল্লি আলাইহ্।'

হজরত আবু বকর সিদ্দীক আরো বলেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, আমার প্রতি দরূদপাঠ করলে এমনভাবে পাপরাশি দূর হয়, যেমন পানি দূর করে দেয় অগ্নির অস্তিত্ব। একজন ক্রীতদাস মুক্ত করা অপেক্ষা দরূদ পাঠ উত্তম। আর রসুল স.কে ভালোবাসা আল্লাহ্র পথে বুকের তাজা খুন ঝরানো অপেক্ষা উত্তম। অথবা বলেছেন, উত্তম আল্লাহ্র পথে তরবারী চালনার চেয়েও।

মাসআলা ঃ দরূদ ও সালাম কেবল পঠিত হতে পারে নবী-রসুলগণের উদ্দেশ্যে। তবে তাঁদের সঙ্গে অন্যকে যুক্ত করেও দরূদ পাঠ করা যায়। কিন্তু তাঁদেরকে বাদ দিয়ে সরাসরি অনবী অথবা অরসুল কারো প্রতি দরূদ পাঠ বৈধ নয়। যেমন 'আয্‌যা' ও 'জ্বাললা' শব্দ দু'টো ব্যবহৃত হয় কেবল আল্লাহ্র মহিমা প্রকাশার্থে। কিন্তু নবী-রসুলগণ মহিমান্বিত হওয়া সত্ত্বেও কেবল তাঁদের জন্য শব্দ দু'টোর ব্যবহার সিদ্ধ নয়। তবে আল্লাহ্র নামের সঙ্গে তাঁদের নামের উল্লেখ থাকলে শব্দ দু'টোর ব্যবহার দূষণীয় নয়। বিষয়টির সবিস্তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে সুরা তওবার তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যায়।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝٥٧

r যাহারা আল্লাহ্ ও রাসূলকে পীড়া দেয়, আল্লাহ্ তো তাহাদিগকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি তাহাদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

প্রথমে বলা হয়েছে—'ইন্নাল লাজীনা ইউজূনাল্লহ'। এর অর্থ— নিশ্চয় যারা পীড়া দেয় আল্লাহ্কে। বাগবী লিখেছেন, এখানে 'যারা পীড়া দেয়' বলে বুঝানো হয়েছে ইহুদী, খৃষ্টান ও অংশীবাদীদেরকে। তাদের পীড়া দেওয়ার নমুনা এরকম— ইহুদীরা বলে, 'হজরত উযায়ের আল্লাহ্র পুত্র' 'আল্লাহ্র হাত ময়লাযুক্ত' 'আল্লাহ্ মুখাপেক্ষী এবং আমরা ধনী' ইত্যাদি। আর খৃষ্টানেরা বলে 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনের মধ্যে তৃতীয়'। আর অংশীবাদীরা বলে 'ফেরেশতারা আল্লাহ্র কন্যা' ' প্রতিমাগুলো আল্লাহ্র সমকক্ষ' ইত্যাদি।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন— আদম সন্তান আমার উপরে অসত্যারোপ করে। এটা তাদের অন্যায়। তারা আমাকে গালি দেয়। এটাও অপরাধ। তারা বলে 'আল্লাহ্ যেভাবে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, সেভাবে দ্বিতীয়বার আর সৃষ্টি করবেন না' অথচ প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা দ্বিতীয় সৃষ্টি সহজ। এটাই আমার প্রতি তাদের অসত্যারোপের নমুনা। তারা আরো বলে 'আল্লাহর সন্তান আছে' 'ফেরেশতারা আল্লাহ্র কন্যা'। অথচ আমি এক, অদ্বিতীয়। কারো পিতা-পুত্র হওয়া থেকে আমি চিরপবিত্র, চির অসমকক্ষ। এভাবেই তারা গালি দেয় আমাকে। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় কথাটি এসেছে এভাবে— তারা বলে, আল্লাহ্র সন্তান-সন্ততি আছে। অথচ আমি এ সকল কিছু অপেক্ষা অনেক ঊর্ধ্বে। ভার্যা গ্রহণ থেকে আমি তো চিরপবিত্র। তারা তো আমাকে বুঝতেই পারে না। বোখারী।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন— আদম সন্তানেরা কালচক্রকে অশুভ বলে আমাকে ক্লেশ দেয়। অথচ কালচক্র আমিই। আমিই একমাত্র বিধানদাতা। আমিই দিবারাত্রির বিবর্তক। বোখারী, মুসলিম। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ক্লেশ দেওয়ার অর্থ আল্লাহ্র পরম সত্তা ও গুণবত্তাকে কলুষিত করা। ইকরামা বলেছেন 'ক্লেশ দেয়' অর্থ মুর্তি নির্মাণ করে।

আবু যারআর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, আমি স্বকর্ণে রসুল স.কে উল্লেখ করতে শুনেছি, আল্লাহ্ বলেন— তার চেয়ে বড় জালেম আর কে, যে আমার সৃষ্টির সাদৃশ্য তৈরী করে। যদি তাদের সামর্থ্য থাকে, তবে তারা একটা পিপিলীকা সৃষ্টি করে দেখায় না কেনো? অথবা সৃষ্টি করে না কেনো একটি শস্যদানা অথবা যব। বোখারী, মুসলিম।

বোখারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, প্রতিমা নির্মাণকারীকে মহাবিচারের দিবসে শাস্তি প্রদান করা হতেই থাকবে, যতক্ষণ না সে প্রাণসঞ্চার করতে পারবে ওই মুর্তির। ফলে তার শাস্তি হবে প্রলম্বিত।

কোনো কোনো আলেম 'পীড়া দেয়' কথাটির অর্থ করেছেন— তারা পাপবিজড়িত হয় ও আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে। কেননা সৃষ্টির মতো সুখ-দুঃখ অনুভব করা থেকে আল্লাহ্ চিরপবিত্র।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়া রসূলাহু'। এর অর্থ— এবং পীড়া দেয় তাঁর রসুলকে। রসুলকে পীড়া দেওয়ার নমুনা এরকম— তারা আমার রসুলকে রক্তরঞ্জিত করেছে। উৎপাটিত করেছে তাঁর পবিত্র দন্ত। কেউ কেউ বলেছে, তিনি যাদুকর। কেউ বলেছে, উন্মাদ। কেউ বলেছে, কবি। উল্লেখ্য, এমতো ব্যাখ্যা তাদের মনোভাবের অনুকূল, যারা একই সময়ে একটি শব্দের দু'টি অর্থ গ্রহণকে সিদ্ধ মনে করেন। কিন্তু জমহুরের মতে এখানকার 'ইউজুনা' শব্দের অর্থ একটাই। আর তা হচ্ছে— তারা এমন কর্ম করে, যা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের দৃষ্টিতে অপ্রীতিকর। অথবা বলা যেতে পারে, এখানকার 'পীড়া দেয় আল্লাহ্কে' কথাটির মধ্যে নিহিত রয়েছে তাঁর রসুলেরই মহান মর্যাদা। অর্থাৎ এখানে রসুলকে কষ্ট দেওয়াই আল্লাহ্কে কষ্ট দেওয়া। যেনো বলা হয়েছে— তারা আল্লাহ্র রসুলকে পীড়া দিয়ে প্রকারান্তরে পীড়া দিয়েছে আল্লাহ্কেই।

আউফির সূত্রে ইবনে আবী হাতেম উল্লেখ করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. যখন হজরত সাফিয়া বিনতে হুয়াইকে বধু বেশে ঘরে তুললেন, তখন কিছুসংখ্যক লোক হয়ে উঠলো সমালোচনামুখর। তাদের ওই সমালোচনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

জুহাক সূত্রে জুয়াইবীর বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ও তার সাঙ্গপাঙ্গদেরকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্যে আয়াত। পুতঃপবিত্রা জননী আয়েশার নামে তারা কলংক রটিয়েছিলো। রসুল স. তখন সকলকে সমবেত করে তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। বলেন, যারা আমাকে ক্লেশ দেয় এবং ক্লেশদাতাদের আশ্রয় দেয় তাদের গৃহে, তাদের যদি সাহস থাকে তো আমার সামনাসামনি হয়ে প্রতিবাদ করুক। তার এমতো ভাষণ দানের পরেই অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

হজরত আনাস ও হজরত আবু হুরায়রা কতৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ্ বলেন যে ব্যাক্তি আমার কোনো ওলীর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে, বর্ণনান্তরে শত্রুতা পোষণ করে, সে যুদ্ধংদেহী হয় আমার বিরুদ্ধেই। আমার সকল কর্ম সংশয়াতীত কিন্তু আমি সংশয়াকুল হই বিশ্বাসীগণের প্রাণবিয়োগের সময়। যেহেতু মৃত্যু তাদের নিকট অপ্রিয়। আর আমি তাদেরকে অতুষ্টও করতে চাই না। কিন্তু মৃত্যু তো অবধারিত। পার্থিব অনাসক্তিই বিশ্বাসীদেরকে আমার নৈকট্য ভাজন করে। সুতরাং এরকম যারা নয়, তারা আমার নৈকট্যভাজন হওয়ার সৌভাগ্য পায় না। আর কোনো ইবাদতই ফরজ ইবাদতের সমতুল নয়।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. জানিয়েছেন মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ বলবেন, ওহে আদম সন্তানেরা! আমি পীড়িত হয়ে পড়েছিলাম । অথচ তুমি আমার শুশ্রূষা করোনি। মানুষ বলবে হে আল্লাহ! হে মহাবিশ্বের মহানতম অধিপতি। তুমি পীড়িত হও কিরূপে? আল্লাহ বলবেন, তুমি তো জানতে আমার অমুক বান্দা পীড়িত হয়ে পড়েছিলো। একথা শুনেও তুমি তার সেবাযত্ন করোনি। যদি করতে তবে দেখতে পেতে। আমি সেখানেই উপস্থিত। হে আদমের বংশধর! আমি তোমার নিকট যাচ্না করেছিলাম আহার্য। কিন্তু তুমি তা দাওনি .... শেষ পর্যন্ত। মুসলিম।

আমি বলি, যখন আল্লাহর ওলীর সঙ্গে শত্রুতা অর্থ আল্লাহর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ এবং তাঁর ওলীগণের অসুস্থতা তাঁর নিজের অসুস্থতা, তখন বুঝতে হবে বিষয়টি রীতিমত রহস্যময়। কিন্তু একথাটিও ভাল করে বুঝে নিতে হবে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর ওলীর এমতো সম্পর্ক অনুমান ও অনুভবের অতীত। আর সাধারণ ওলীর সঙ্গে যদি আল্লাহ্র এরকম ঘনিষ্ঠ সর্ম্পক হয়, তবে তাঁর প্রিয়তম রসুলের সঙ্গে তাঁর সর্ম্পক কতো ঘনিষ্ঠ তা নিশ্চয় অননুমাননীয়। সুতরাং তাঁকে ক্লেশ দেওয়ার অর্থ যে আল্লাহ্কে ক্লেশ দেওয়া তা বলাই বাহুল্য। আলোচ্য আয়াতে তাই আল্লাহ্র রসুলকে পীড়া দেওয়াকেই বলা হয়েছে আল্লাহ্কে পীড়া দেওয়া।

বর্ণিত হাদিস সমুহের আলোকে কেউ কেউ 'যে আল্লাহকে পীড়া দেয়' কথাটির অর্থ করেছেন যে পীড়া দেয় আল্লাহ্র ওলীকে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ওয়াসআলুল ক্বরীয়াতা' (জনপদকে জিজ্ঞেস করো)। এর অর্থ জিজ্ঞেস করো জনপদবাসীকে। এরকম অর্থ করতে হয় সম্বন্ধপদকে অনুক্ত মেনে নিয়ে। আমি বলি, এরকম ব্যাখ্যা অযথার্থ। কারণ এতে করে রসুল স. এর প্রসঙ্গ চলে যায় নেপথ্যে। আর ওলীগণের প্রসঙ্গ পায় অগ্রাধিকার, যা অচিন্তনীয়। যদি কেউ বলে, রসুল স. ও তো আল্লাহর ওলী। তাই এখানে সাধরণভাবে ওলীগণের উল্লেখের পর বিশেষভাবে এসেছে রসুল স. এর উল্লেখ। সমষ্টির বিবরণ দানের পর একক ব্যক্তিত্বের আলোচনা সুসমঞ্জস বাকবিন্যাসের পরিপন্থী নয়। কিন্তু এরকম জবাবও অগ্রাহ্য। কারণ এতে করে পুনরাবৃত্তি ঘটবে বিশ্বাসীগণের প্রসঙ্গের, যা অযৌক্তিক ও অশোভন।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ তো তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি'। আলোচ্য আয়াতাংশে প্রচ্ছন্ন রয়েছে একটি প্রশ্নময় বক্তব্য। যেনো বলা হয়েছে— আমরা তো আদিষ্ট হয়েছি আমাদের প্রিয়তম রসুলের প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করতে। কিন্তু যারা এরকম করেনা, উপরন্তু তাঁকে বিভিন্ন ভাবে ক্লেশ পৌঁছায়, তাদের প্রতিফল কী? এই প্রশ্নের জবাবই আলোচ্য আয়াতাংশে ধ্বনিত হয়েছে এভাবে— পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীতে তারা অভিশপ্ত এবং তাদের জন্যই প্রস্তুত রাখা হয়েছে অপমানজনক শাস্তি।

মাসআলাঃ রসুল স. এর ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, বংশ, ধর্ম অথবা গুণ সম্পর্কে সরাসরি অথবা ইঙ্গিতার্থক দোষ অন্বেষণ কিংবা সমালোচনা কুফরী। এরকম নিন্দুক ও সমালোচক ইহকাল ও পরকালে অভিশপ্ত। জাগতিক শাস্তির মাধ্যমে তার পাপক্ষয় হবে না। কবুল করা হবে না তার তওবাও। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, যে ব্যক্তি রসুল স. এর প্রতি অন্তরে বিরূপ ধারণা রাখে, সে ধর্মত্যাগী (মুরতাদ)। তাঁর প্রতি কটুক্তি যে করে, সে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী (কাফের)। তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তওবা করলেও তার শাস্তি রহিত হবে না। ফেকাহ্ তত্ত্ববিদগণ বলেন, এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা, তাঁর প্রধান শিষ্যদ্বয় ও ইমাম মালেক। এক বর্ণনানুসারে হজরত আবু বকর সিদ্দীকের অভিমতও এরকম।

রসুল স. এর দোষ বর্ণনাকারীর উপরে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতেই হবে, যদিও সে অকপটে দোষ স্বীকার করে অথবা তওবা করে কিংবা অপরাধ অস্বীকার করে। কুফরীর অন্যান্য অপরাধ প্রদান করা হয় সাক্ষ্যের দ্বারা, যদি অপরাধী তার দোষ অস্বীকার করে। কিন্তু রসুল স.এর দোষ বর্ণনাকারী তার দোষ অস্বীকার যদি করে এবং তার সপক্ষে যদি সাক্ষীও উপস্থিত করে, তবু তার উপর থেকে মৃত্যুদণ্ড অপসারণ করা যাবে না। কারণ দোষ স্বীকার অর্থ তওবা। আর তওবা করলেও এমতাবস্থায় সে শাস্তিযোগ্য। আলেমগণ এমনও বলেছেন, নেশাপান করেও যদি কেউ মত্ততাবশতঃ রসুল স. এর নিন্দা করে, তবুও তার উপরে কার্যকর করতে হবে মৃত্যুদণ্ডের বিধান। তবে এমতাবস্থায় যদি সে বলপ্রয়োগিত হয়, তবে সে ক্ষমার্হ। তখন তার অবস্থা হবে জ্ঞানবুদ্ধিবিবর্জিত পাগলের মতো।

খাত্তাবী বলেছেন, আমি বুঝতে পারি না এরূপ দুর্বৃত্তকে বধ করার ব্যাপারে আলেমগণ আবার মতোবিরোধ করেন কেনো? তবে একথা ঠিক যে, আল্লাহ্র অধিকার লংঘনের ব্যাপারে যদি কাউকে বধ করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে এবং এমতাবস্থায় যদি অপরাধী তওবা করে নেয়, তবে তার উপর থেকে মৃত্যুদণ্ডের বিধান উঠিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এভাবে যদি কোনো লোক বলপ্রয়োগ ছাড়াই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় অশ্লীলতাহীন কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে, তবে তাকে ধর্মত্যাগী সাব্যস্ত করা যাবে না।

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٥٨﴾

r যাহারা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে পীড়া দেয় এমন কোন অপরাধের জন্য যাহা তাহারা করে নাই; তাহারা অপবাদের ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।

এখানে 'বুহতান' ও 'ইছমান' শব্দদু'টো তানভীন সহযোগে সন্নিবেশিত হয়েছে অপবাদ ও পাপের বিশালত্ব বুঝানোর জন্য। মুকাতিল বলেছেন, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আলীকে লক্ষ্য করে। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্যস্থল। আমি বলি, আলোচ্য আয়াত অবতরণের প্রেক্ষিত সুনির্ধারিত হলেও এর বক্তব্য সাধারণার্থক। অর্থাৎ যে কোনো বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীর প্রতি কেউ যদি এমন পাপের কথা বলে তাদেরকে কষ্ট দেয়, যা তারা করেননি, তবে তারা অবশ্যই বহন করবে অপবাদ ও পাপের গুরুভার।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ওই ব্যক্তিই মুসলমান, যার হাত ও রসনা থেকে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ। আর ওই ব্যক্তিই ইমানদার, যার পক্ষ থেকে সংশয়মুক্ত থাকে মুসলমানের জীবন ও সম্পদ। তিরমিজি, নাসাঈ।

জননী আয়েশার সমালোচনা করা প্রকারান্তরে রসুল স. এর সমালোচনা করা, সে সমালোচনা জ্ঞানভিত্তিক হোক, অথবা যুক্তি ভিত্তিক। এমনকি বর্ণনাগত দিক থেকেও। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে জুহাকের মাধ্যমে জুয়াইবীর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমার পক্ষ থেকে কে প্রতিবাদ করবে যে আমার মনে কষ্ট দেয় এবং নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেয় কষ্টদাতাকে? এখানে রসুল স. 'ওই ব্যক্তি' বলে বুঝিয়েছেন মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে। আর 'আমাকে কষ্ট দেয়' বলে বুঝিয়েছেন যে কষ্ট দেয় আমার আয়েশাকে। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয় আলোচ্য আয়াতে শাস্তির হুমকি দেওয়া হয়েছে তাদের প্রতি, যারা কলংক লেপন করেছিলো জননী আয়েশার পুতঃপবিত্র চরিত্রে। অনুরূপ যারা হজরত আলীকে কটুকথা বলেছিলো, তারাও কষ্ট দিয়েছিলো রসুল স.কে। কেননা হজরত আলীও ছিলেন তাঁর একান্ত প্রিয়ভাজন। তিনি স. বলেছেন, হে আলী! তুমি আমার। আমি তোমার। হজরত বারা ইবনে আজীব থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

উল্লেখ্য, সাধারণ সাহাবীগণের সমালোচনা করার অর্থও রসুল স.কে যাতনা দেওয়া। যেমন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফফাল বর্ণনা করেছেন, রসুল স.

আজ্ঞা করেছেন, আল্লাহ্কে ভয় করো, আল্লাহ্কে ভয় করো। আমার পৃথিবী পরিত্যাগের পর তোমরা আমার সাহাবীগণকে সমালোচনার পাত্র বানিয়ো না। যে তাদেরকে ভালোবাসবে, সে ভালোবাসবে আমাকে। আর যে তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে, সে ঘৃণা পোষণ করবে আমার প্রতিও। তাদেরকে যে কষ্ট দেয়, সে কষ্ট দেয় আমাকে এবং অপ্রসন্ন করে আমার আল্লাহ্কে। আর আল্লাহ্ শীঘ্রই তাকে পাকড়াও করে শাস্তিদান করবেন। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি এবং বলেছেন, বর্ণনাটি দুষ্প্রাপ্য শ্রেণীর।

জুহাক ও কালাবীর বর্ণনায় এসেছে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কতিপয় ব্যভিচারী সম্পর্কে। তারা রাতের আঁধারে পথে পথে পায়চারী করতো। আর উত্যক্ত করতো ওই রমণীদেরকে যারা রাতের বেলা বের হতো প্রকৃতির প্রয়োজন পূরণার্থে। শিষ্টা রমণীদের পশ্চাদ্ধাবন করতো তারা। আর মুখরা রমণীদের বেলায় করতো পশ্চাদপসরণ। ক্রীতদাসীদেরকেই সাধারণত হন্যে হয়ে খুঁজে ফিরতো তারা। কেননা তাদেরকে অপকর্মে রাজি করানো ছিলো সহজ। কিন্তু সকল রমণীদের দেহবরণী যেহেতু ছিলো প্রায় একই রকম, তাই কখনো কখনো স্বাধীনা রমণীগণও পড়ে যেতো তাদের খপ্পরে। ওই সকল রমণী তাদের স্বামীদেরকে জানাতে লাগলো তাদের বিব্রতকর অবস্থার কথা। স্বামীরা জানালো রসুল স.কে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। এরপর পরবর্তী আয়াতের মাধ্যমে স্বাধীনা রমণী ও ক্রীতদাসীদের পোশাক-পরিচ্ছদের পার্থক্য নির্ণয় করে দেওয়া হয়।

ইবনে সা'দ তাঁর তাবাকাত গ্রন্থে হজরত আবু মালেক সূত্রে লিখেছেন, এরকম হাদিস হাসান এবং মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজী সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। রসুল স. এর মহাপুণ্যবতী সহধর্মিণীগণ যখন প্রকৃতির ডাকে রাতে বের হতেন, তখন তাঁদেরকেও ওই মুনাফিকেরা বিরক্ত করতে শুরু করলো। তাঁরা বিষয়টি রসুল স. এর গোচরে আনলেন। তিনি স. তখন ওই সকল দুরাচারকে ডেকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তারা বললো, আমরা তো তাঁদেরকে দাসী মনে করেছিলাম। তাদের এরকম চতুর উক্তির প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত। বলা হয়—

সূর আহযাব ঃ আয়াত ৫৯

يَآاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَ بَنٰتِكَ وَ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

r হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মু'মিনদের নারীগণকে বল, তাহারা যেন তাহাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টানিয়া দেয়। ইহাতে তাহাদিগকে চেনা সহজতর হইবে, ফলে তাহাদিগকে উত্ত্যক্ত করা হইবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মু'মিনদের নারীগণকে বলো, তারা যেনো তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়'। এখানে 'জ্বালবাব্' অর্থ চাদর। এর বহুবচন 'জ্বালাববি'। 'জ্বালবাব' বলে ওই চাদরকে, যার দ্বারা আবৃত করা হয় কামিজ ও দোপাট্টা।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর এক রাতে সাওদা গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন স্থূলাঙ্গী। সেকারণে তিনি পর্দাবৃত থাকলেও তাঁকে অনেকেই চিনতে পারতেন। ওমর ইবনে খাত্তাবও তাই তাঁকে চিনতে পেরে বললেন, হে উম্মতজননী! আপনি কিন্তু আমার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেননি, আমি আপনাকে চিনে ফেলেছি। ভেবে দেখুন, এভাবে গৃহের বাইরে আসা কি আপনার জন্য শোভন, না সমীচীন। একথা শুনে অপ্রস্তুত হলেন সাওদা। তৎক্ষণাৎ ফিরে এলেন স্বগৃহে। জননী আয়েশা আরো বলেছেন, ওই সময় রসুল স. আমার প্রকোষ্ঠে সম্পন্ন করেছিলেন তাঁর রাতের আহার। তখন তাঁর হাতে ছিলো একটি হাড্ডি। সাওদা সোজা তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি প্রয়োজনবশতঃ বাড়ী থেকে বের হয়েছিলাম। আর ওমর কিনা আমাকে এরকম এরকম করে বললো। রসুল স. এর ভাবান্তর হলো। অবতীর্ণ হতে শুরু করলো প্রত্যাদেশ। প্রত্যাদেশের অবতরণ সমাপ্ত হলো। তিনি স. বললেন, নারীদেরকে বাইরে বেরোনোর অনুমতি দেওয়া হলো। প্রয়োজনবশতঃ তোমাদের বহির্গমন সিদ্ধ। আমি বলি 'বহির্গমন সিদ্ধ' অর্থ তোমাদের জন্য বড় চাদরে আচ্ছাদিত হয়ে বাইরে বেরুনো সিদ্ধ।

হজরত আবু উবাদা ও হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মুসলমানদের পুরনারীগণকে এইমর্মে এখানে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেনো আপাদমস্তক চাদরাবৃত হয়ে বাইরে বেরোয়। খোলা রাখে যেনো কেবল চক্ষু। আর তাদের এমতো বেশভুষা দেখে যেনো তাদেরকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায় ক্রীতদাসীদের থেকে। এখানকার 'মিন জ্বালাবীবিহিন্না' কথাটির 'মিন' অব্যয়টি আংশিক অর্থ প্রকাশক। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়িয়েছে— চাদরের কিয়দংশ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এতে তাদের চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না।' একথার অর্থ— স্বাধীনা রমণীদেরকে যেভাবে বলা হলো, সেভাবে যদি তারা পৃথক পরিচ্ছদরীতিটি মান্য করে চলে, তবে দুরাচার কপটাচারীরা আর তাদেরকে উত্যক্ত করার সাহস পাবে না।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— অসতর্কতা ও পার্থক্য নির্দেশক পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান না করার কারণে ইতোপূর্বে যে সকল অঘটন ঘটেছে, সে সকল কিছু সম্পর্কে আল্লাহ্ কাউকে অভিযুক্ত করবেন না। অর্থাৎ অতীতের অসুন্দর আচরণসমূহকে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন। কারণ তিনি মহাক্ষমাপরবশ ও পরম দয়ার্দ্র।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, একবার এক ক্রীতদাসী স্বাধীনাগণের মতো পর্দা করে হজরত ওমরের পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলো। হজরত ওমর তার পর্দা উন্মোচন করলেন। বললেন, হতভাগিনী! মুক্ত রমণীদের মতো পর্দা করেছো কেনো? একথা বলে তিনি তার আবরণী ছুঁড়ে ফেলে দিলেন দূরে।

সূরা আহযাব ঃ আয়াত ৬০, ৬১, ৬২

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّ الْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٦٠﴾ مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ﴿٦١﴾ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿٦٢﴾

r মুনাফিকগণ এবং যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যাহারা নগরে গুজব রটনা করে, তাহারা বিরত না হইলে আমি নিশ্চয়ই তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবল করিব; ইহার পর এই নগরীতে তোমার প্রতিবেশীরূপে উহারা স্বল্প সময়ই থাকিবে—

r অভিশপ্ত হইয়া; উহাদিগকে যেখানেই পাওয়া যাইবে সেখানেই ধরা হইবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হইবে।

r পূর্বে যাহারা অতীত হইয়া গিয়াছে তাহাদের ব্যাপারে ইহাই ছিল আল্লাহ্র রীতি। তুমি কখনও আল্লাহ্র রীতিতে কোন পরিবর্তন পাইবে না।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! শুনে রাখুন, কপটাচারীরা যদি তাদের কাপট্য পরিত্যাগ না করে, ফিরে যদি না আসে নিরপরাধ নারীগণকে উত্যক্ত করার মতো মহাঅপরাধ থেকে, ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরের অধিকারীরা যদি বিরত না হয় তাদের নিরবচ্ছিন্ন দুষ্কর্ম থেকে এবং কুৎসা রটনাকারীরা যদি না ছেড়ে দেয় তাদের কুৎসারটনাপ্রবণতা, তবে আমি তাদের

উপরে আপনাকে করে দিবো প্রবল। তখন আপনার নগরের দুরাচারেরা তাদের পৃথিবীর অভিশাপগ্রস্ত জীবনযাপনের সুযোগ আর বেশী দিন পাবে না। আমার নির্দেশেই আপনি তাদেরকে তখন সহজে শায়েস্তা করতে পারবেন। ধরতে পারবেন তাদেরকে যত্রতত্র এবং হত্যাও করতে পারবেন তাদেরকে নির্মমরূপে।

এখানকার 'মুরজিফূনা' শব্দটির ধাতুমূল হচ্ছে 'রজফাতুন'। এর অর্থ— ভূমিবাস্প, প্রচণ্ড আলোড়ন। রসুল স. যখন মদীনার আশেপাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করতেন, তখন মুনাফিকেরা বলে বেড়াতো, মুসলিমবাহিনী ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। অথবা বলতো, তারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে যত্রতত্র পালিয়ে বেড়াচ্ছে। মদীনার বাইরে শত্রুদের এক বিশালবাহিনী আক্রমণোদ্যত। কালাবী বলেছেন, মুসলমানদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে দেওয়াই ছিলো তাদের এমতো অপপ্রচারের উদ্দেশ্য। তারা চাইতো, মুসলমানদের জীবনযাত্রা হোক অশান্ত ও দুশ্চিন্তাকবলিত।

'তোমার প্রতিবেশীরূপে তারা স্বল্প সময়ের জন্য থাকবে অভিশপ্ত হয়ে' কথাটির অর্থ— আমি আমার রসুলকে নির্দেশ দিবো যুদ্ধের। অথবা তাঁর মাধ্যমে সৃষ্টি করাবো এমন পরিবেশ, যাতে তারা আর স্বজনপদে তিষ্ঠাতে না পারে। যেনো বাধ্য হয় দেশান্তরিত হতে অথবা বাধ্য হয় প্রাণদণ্ডের নির্দেশ মেনে নিতে।

'মাল্‌উ'নীন' অর্থ অভিশপ্ত। কথাটির দ্বারা সুচিহ্নিত করা হয়েছে কপটাচারীদেরকে। 'তাক্বতীলা' অর্থ নির্দয়ভাবে হত্যা।

এরপরের আয়াতে (৬২) বলা হয়েছে— 'পূর্বে যারা অতীত হয়ে গিয়েছে তাদের ব্যাপারে এটাই ছিলো আল্লাহ্‌র রীতি। তুমি কখনো আল্লাহ্‌র রীতিতে কোনো পরিবর্তন পাবে না' একথার অর্থ— এটাই আল্লাহ্‌র চিরন্তন রীতি যে, তিনি তাঁর প্রিয় বাণীবাহকগণকে বিজয়ী করেন এবং তাঁদের শত্রু কপটাচারী ও দুর্বৃত্তদেরকে প্রদান করেন নির্মম শাস্তি। এমন কেউই নেই যে, তাঁর এমতো রীতিকে করতে পারে অকার্যকর। তিনি যে অজেয়।

সূরা আহযাব ঃ আয়াত ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮

يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۖ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ۖ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا ﴿٦٣﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ﴿٦٤﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٦٥﴾ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ

يٰلَيْتَنَآ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَ اَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ﴿٦٦﴾ وَ قَالُوْا رَبَّنَآ اِنَّآ
اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَ كُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا ﴿٦٧﴾ رَبَّنَآ اٰتِهِمْ
ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَ الْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ﴿٦٨﴾

r লোকে তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'ইহার জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌রই আছে।' তুমি ইহা কী করিয়া জানিবে? সম্ভবত কিয়ামত শীঘ্রই হইয়া যাইতে পারে।

r আল্লাহ্ কাফিরদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছেন এবং তাহাদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন জ্বলন্ত অগ্নি;

r সেখানে উহারা স্থায়ী হইবে এবং উহারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাইবে না।

r যেদিন উহাদের মুখমণ্ডল অগ্নিতে উলটপালট করা হইবে সেদিন উহারা বলিবে, 'হায়, আমরা যদি আল্লাহ্‌কে মানিতাম ও রাসূলকে মানিতাম!'

r তাহারা আরও বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করিয়াছিলাম এবং উহারা আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল;

r 'হে আমাদের প্রতিপালক! উহাদিগকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং উহাদিগকে দাও মহাঅভিসম্পাত।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! ইহুদী, খৃষ্টান ও পৌত্তলিকেরা আপনাকে বিব্রত করণার্থে উপহাসছলে আপনাকে বিভিন্নভাবে প্রশ্নবানে জর্জরিত করে। বলে, কখন সংঘটিত হবে কিয়ামত? ইহুদী ও খৃষ্টানেরা জানে তাদের আপনাপন ধর্মগ্রন্থে কিয়ামতের কোনো সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণের উল্লেখ নেই। আর পৌত্তলিকদের তো ধর্মগ্রন্থ বলে কিছুই নেই। তাই তারা সকলে মিলে আপনাকে এব্যাপারে উত্যক্ত করে আপনাকে অপদস্থ করতে চায়। আপনি তাদেরকে বলুন, কিয়ামত তো অবশ্যম্ভাবী। হয়তো তা খুব বেশী দূরেও নয়। কিন্তু তার সঠিক দিনক্ষণ কেবল আল্লাহ্ই জানেন। মানুষ, জ্বিন বা ফেরেশতা কাউকেই তিনি এ সম্পর্কে জ্ঞানদান করেননি। আমাকেও নয়।

'লাআ'ল্লা' অর্থ সম্ভবতঃ। কিন্তু আল্লাহ্‌র বাণীতে শব্দটি সবসময় সুনিশ্চিতার্থকরূপে সন্নিবেশিত হয়ে থাকে। আর আলোচ্য আয়াত হচ্ছে ওই সকল লোকের প্রতি হুমকি, যারা মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান এবং মহাবিচারদিবসকে অস্বীকার করে এবং যারা এ সম্পর্কে উপহাসমূলক প্রশ্ন করে কষ্ট দেয় রসুল স.কে।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ কাফেরদেরকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত অগ্নি (৬৪); সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং তারা কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না' (৬৫)। একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা অভিশপ্ত। চিরবহ্নিমান দোজখই তাদের স্থায়ী ঠিকানা। আর সেখানে তাদের কোনো সুহৃদ ও পরিত্রাতা থাকবে না।

এরপরের আয়াতে (৬৬) বলা হয়েছে— 'যেদিন তাদের মুখমণ্ডল অগ্নিতে উলটপালট করা হবে, সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহ্কে মানতাম ও রসুলকে মানতাম'। একথার অর্থ— জ্বলন্ত উনুনে চাপানো হাঁড়িতে যেমন গোশত উলটপালট করে ভূনা করা হয়, তেমনি করে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে ওলটপালট করা হবে দোজখের আগুনে। তখন তারা আক্ষেপ করে বলবে, হায়, পৃথিবীতে থাকতে আমরা যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করতাম, তাহলে আজ এরকম দুর্দশা আমাদের হতো না। উল্লেখ্য, এখানে 'মুখমণ্ডল' বলে অর্থ নেওয়া হয়েছে গোটা শরীরের। অর্থাৎ তখন তাদের সারা শরীরই ওলটপালট করে ভাজা হবে। অথবা বলা যেতে পারে, মুখমণ্ডলই শরীরের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সুতরাং মুখমণ্ডল অগ্নিদগ্ধ হওয়ার অর্থ সমস্ত শরীর অগ্নিদগ্ধ হওয়া।

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (৬৭, ৬৮) মর্মার্থ হচ্ছে— ওই দগ্ধমান সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তখন বলবে, আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলো আমাদের সমাজপতি ও বিত্তপতিরা। তারাই ছিলো পথচ্যুতির বিভিন্ন পন্থার উদ্ভাবক। তাদের আনুগত্যের কারণেই আজ আমরা পতিত হয়েছি অন্তহীন দুর্ভোগে। সুতরাং হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! তাদেরকে দাও আমাদের চেয়ে দ্বিগুণ শাস্তি। তদুপরি আপতিত করো কঠিন অভিসম্পাত। এখানে 'লা'নান কাবীরা' অর্থ মহাঅভিসম্পাত বা কঠিন অভিসম্পাত।

সূরা আহযাব ঃ আয়াত ৬৯, ৭০, ৭১

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا ؕ وَ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ﴿٦٩﴾ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧١﴾

r হে মু'মিনগণ! মুসাকে যাহারা ক্লেশ দিয়াছে তোমরা উহাদের ন্যায় হইও না; উহারা যাহা রটনা করিয়াছিল আল্লাহ্ উহা হইতে তাহাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন; এবং আল্লাহ্র নিকট সে মর্যাদাবান।

r হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল;

r তাহা হইলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম ত্রুটিমুক্ত করিবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করিবেন। যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করে, তাহারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করিবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে মুমিনগণ! মুসাকে যারা ক্লেশ দিয়েছে তোমরা তাদের মতো হয়ো না, তারা যা রটনা করেছিলো, আল্লাহ্ তা থেকে তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন'।

ঘটনার সবিস্তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী, তিরমিজি, আহমদ, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুবিয়া, আবদুর রাজ্জাক ও আবদ ইবনে হুমাইদ কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসে। যেমন— রসুল স. বলেছেন, নবী মুসা ছিলেন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও ব্রীড়াবনত ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর শরীর এমনভাবে ঢেকে রাখতেন যে, তাঁর শরীরের কোনো অংশের চামড়াও কেউ দেখতে পেতো না। তাঁর এমতো আবরণের কারণে লোকেরা মনে করতে শুরু করলো, নিশ্চয় তাঁর শরীরে কোনো বড় রকমের খুঁত আছে। অথবা তাঁর অণ্ডকোষ বৃহদাকৃতির। তাই তাঁর রাখঢাকের এতো কড়াকড়ি। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলেন এমতো অপবাদ থেকে তিনি তাঁর প্রিয় নবীকে পবিত্র করবেন। একদিন এক নির্জনঘাটে তিনি গোসল করতে নামলেন। পরিধেয় বস্ত্র রেখে দিলেন তটদেশের একটি পাথরের উপর। গোসল সেরে তীরে উঠলেন। পরিধেয় বস্ত্রের দিকে হাত বাড়াতেই পাথরটি হঠাৎ চলতে শুরু করলো। তিনিও ছুটলেন তার পিছু পিছু। পাথরটি শেষে গিয়ে থামলো বনী ইসরাইলদের একটি জনসমাবেশের পাশে। তিনি তাড়াতাড়ি পাথরের উপরে রক্ষিত পরিধেয় বস্ত্রটি নিয়ে শরীর আবৃত করলেন। ইত্যবসরে বনী ইসরাইলেরা দেখে ফেললো যে, তাঁর শরীর সম্পূর্ণ নিরোগ। সেই থেকে অপসৃত হলো তাদের অপধারণাটি। নবী মুসা তখন পাথরটির উপরে হলেন ভয়ানক ক্ষিপ্ত। হাতের লাঠি দিয়ে ওই পাথরটিকে তিনি প্রহার করলেন। আল্লাহ্র শপথ! ওই প্রহারের ফলে পাথরটির উপরে মুদ্রিত হলো তিন, চার অথবা পাঁচটি অক্ষয় দাগ। উল্লেখ্য, এটাই হচ্ছে আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত নির্দোষ প্রমাণের ঘটনা।

আবুল আলীয়া বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'রটনা' অর্থ কারূনের রটনা। সে এক বারবণিতাকে উৎকোচ দিয়ে বলিয়ে নিতে চেয়েছিলো যে, নবী মুসার সঙ্গে রয়েছে তার গোপন প্রণয়। আল্লাহ্ সেই অপবাদ থেকে রক্ষা

করেছিলেন তাঁর প্রিয় নবীকে। আর কারূনকে করেছিলেন ভূপ্রোথিত। সুরা ক্বসাসের তাফসীরে এসেছে ঘটনাটির সবিস্তার বিবরণ। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যায়।

তীহ্ প্রান্তরে বসবাসকালে এক সময় নবী হারুনের মহাঅন্তর্ধান ঘটলো। বনী ইসরাইলেরা তখন বলতে লাগলো, মুসাই গোপনে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে তার ভাইকে। আল্লাহ্ তখন এমতো অপবাদ থেকে তাঁর প্রিয় নবীকে মুক্ত করলেন। তাঁর নির্দেশে ফেরেশতারা হজরত হারুনের জানাযা নিয়ে উপস্থিত হলো বনী ইসরাইলদের সামনে। তখন তারা বিশ্বাস করলো, হজরত হারুনের পরলোকগমন ছিলো স্বাভাবিক নিয়মানুকূল। হজরত আলী এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন ইবনে মুনী', ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুবিয়া ও হাকেম।

হজরত আবদুল্লাহ্ থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার উপস্থিত জনতার মধ্যে বণ্টন করে দিলেন কিছু সম্পদ। আড়ালে একজন মন্তব্য করলো, এবারের বণ্টন আল্লাহ্র অভিপ্রায় অনুযায়ী হয়নি। বর্ণনাকারী বলেন, একথা আমি রসুল স. কে জানাতেই তিনি স. অপ্রসন্ন হলেন খুব। ক্রোধে তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল হয়ে গেলো রক্তাভ। বললেন, আল্লাহ্ নবী মুসার উপরে সদয় হোন। তিনি তো আমার চেয়ে অধিক কষ্ট পেয়েও ধৈর্যধারণ করেছিলেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্র নিকট সে মর্যাদাবান'। এখানে 'ওয়াজীহান' অর্থ ইজ্জত, সম্মান, মর্যাদা। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্র নিকটে নবী মুসার মর্যাদা ছিলো অত্যধিক। তাই তিনি যা যাচ্না করতেন, তা-ই পেতেন। হাসান বসরীও এরকম বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি ছিলেন আল্লাহ্র একান্ত প্রিয়ভাজন ও অনুগ্রহধন্য।

পরের আয়াতে (৭০) বলা হয়েছে— 'হে মুমিনগণ! আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো'। একথার অর্থ— হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্র নিকটে যা অপ্রিয়, তা পরিত্যাগ করো। যেমন তাঁর প্রিয়তম রসুলের উপরে অপবাদারোপ। এরকম পাপকর্মগুলোও তোমরা আল্লাহ্র ভয়ে পরিত্যাগ করো এবং কথা বলো সঠিকভাবে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার 'সাদীদা' কথাটির অর্থ সঠিক বচন। কাতাদা অর্থ করেছেন— ন্যায্য কথা। কেউ কেউ বলেছেন— সত্যকথা। আবার কারো কারো মতে— সত্যের গন্তব্যে উপস্থিত হওয়ার সহায়ক বক্তব্য। প্রকৃত কথা হচ্ছে, বর্ণিত অর্থগুলোর মূল মর্ম হচ্ছে— সত্যকথা, যার মধ্যে মিথ্যার লেশমাত্র নেই।

কেউ কেউ বলেছেন, জননী যয়নাব সম্পর্কে নিন্দুকেরা যে সকল উদ্ভট রটনা প্রস্তুত করেছিলো, আলোচ্য আয়াতে দেওয়া হয়েছে ওই উদ্ভটতা পরিত্যাগের নির্দেশ। বিরত থাকতে বলা হয়েছে ওই সকল অপবচন থেকেও যেগুলো আরোপ করা হয়েছিলো জননী আয়েশার পুণ্যময় চরিত্রের উপর। আর ইকরামা বলেছেন, এখানকার 'ক্বওলান্ সাদীদা' অর্থ পবিত্র কলেমা 'লাইলাহা ইল্লাল্লহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লহ্'।

এর পরের আয়াতে (৭১) বলা হয়েছে— 'তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম ত্রুটিমুক্ত করবেন'। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন— তাহলে তিনি গ্রহণ করবেন তোমাদের পুণ্যকর্মসমূহকে। মুকাতিল অর্থ করেছেন— তিনি পুতপবিত্র করে দিবেন তোমাদের কর্মকাণ্ডসমূহকে। অর্থাৎ তিনি তোমাদের কার্যকলাপকে করে দিবেন গ্রহণোপযোগী ও প্রতিদানপ্রাপ্তির উপযোগী। আবার কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে— তাহলে তিনি তোমাদেরকে সামর্থ্য দান করবেন পুণ্যকর্ম সম্পাদনের।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন'। একথার অর্থ— এবং তোমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তোমাদের পুণ্য সংকল্প ও কার্য্যাবলীকে করবেন সুদৃঢ়। ফলে তোমরা হতে পারবে পাপমুক্ত।

শেষে বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে'। একথার অর্থ—এভাবে আল্লাহ্র বিশেষ সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে যারা তাঁর ও তাঁর রসুলের আনুগত্যসহ জীবন অতিবাহিত করবে, তারা অবশ্যই লাভ করবে ঐহিক ও পারত্রিক সফলতা। অধিকারী হবে পরম সৌভাগ্যের।

সূরা আহযাব ঃ আয়াত ৭২, ৭৩

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ؕ إِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ﴿٧٢﴾ لِّيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ وَ الْمُشْرِكٰتِ وَ يَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٧٣﴾

r আমি তো আসমান, যমীন ও পর্বতমালার প্রতি এই আমানত পেশ করিয়াছিলাম, উহারা ইহা বহন করিতে অস্বীকার করিল এবং উহাতে শংকিত হইল, কিন্তু মানুষ উহা বহন করিল; সে তো অতিশয় যালিম, অতিশয় অজ্ঞ।

r পরিণামে আল্লাহ্ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে শাস্তি দিবেন এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীকে ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আমিতো আকাশ-পৃথিবী ও শৈলশ্রেণীর প্রতি উপস্থাপন করতে চেয়েছিলাম এই আমানত, কিন্তু তারা এ প্রস্তাবে শংকিত হলো এবং এ আমানত বহন করতে হলো অস্বীকৃত। কিন্তু মানুষ অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করলো এই গুরুভার। মানুষ তো তাই আত্মঘ্ন ও অর্বাচীন।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ জানতে গেলে চারটি বিষয়ে রাখতে হবে পরিষ্কার ধারণা। সে চারটি বিষয় হচ্ছে— ১. আমানত কী ২. আকাশ-পৃথিবী-পর্বতমালা বলে এখানে দেওয়া হয়েছে কিসের ইঙ্গিত ৩. 'পেশ করেছিলাম' বলে যে সম্বোধন করা হয়েছিলো, তা কি করণিক, না ভাবগত ৪. বহন করা এবং অস্বীকার করার স্বরূপই বা কী?

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আমানত' অর্থ আনুগত্য এবং ওই ফরজ দায়িত্বসমূহ, যেগুলোর বাস্তবায়ন আল্লাহ্ তাঁর বান্দাগণের জন্য করেছেন অত্যাবশ্যক। আকাশ-পৃথিবী-গিরিশ্রেণীকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ বলেছিলেন, গ্রহণ করো এ গুরুদায়িত্ব। যদি এ দায়িত্ব বাস্তবায়নে সক্ষম হও তবে পাবে উত্তম প্রতিদান, আর সক্ষম না হলে পাবে শাস্তি।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমানত অর্থ নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, জাকাত প্রদান করা, রমজানের রোজা পালন করা, আল্লাহ্র গৃহে হজ সমাধা করা, সত্য কথা বলা এবং ওজনে কম না দেওয়া। এ সকল দায়িত্ব পালন ব্যতিরেকে আমানতদারীর দাবি করা অন্যায়। মুজাহিদ বলেছেন, ফরজ দায়িত্বসমূহ সুসম্পন্ন করার অর্থই ধর্মরক্ষা করা। আবুল আলীয়া বলেছেন, সকল বিধিনিষেধই আমানতের অন্তর্ভূত।

জায়েদ ইবনে আসলাম বলেছেন, আমানত রক্ষার অর্থ রোজা সম্পাদন, অপবিত্রতার গোসল সমাপন এবং অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জন। আর অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্থ হিংসা না করা, কারো প্রতি শত্রুমনোভাবাপন্ন না হওয়া, পার্থিব সম্পদের প্রতি লালসাতুর না হওয়া এবং অহংকার না করা।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস বলেছেন, আল্লাহ্ মানুষের গোপনাঙ্গ সৃষ্টি করেছেন আগে। তারপর বলেছেন, এটা তোমাদেরকে প্রদত্ত একটি আমানত। চক্ষু-কর্ণও আমানত। যার নিকট এ সকল আমানত সুসংরক্ষিত নয়, সে ইমানদার নয়।

কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, আমানত অর্থ গচ্ছিত সম্পদের হেফাজত করা এবং অঙ্গীকার পূর্ণ করা। বিশ্বাসীগণের কর্তব্য হচ্ছে অন্যের সঙ্গে আমানত ও অঙ্গীকারের ব্যাপারে প্রতারণা না করা, বৃহৎ বিষয়ে হোক, অথবা হোক ক্ষুদ্র বিষয়ে। বলা হয়ে থাকে, এমতো অভিমতের প্রবক্তা হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস। এমতো অভিমতের ভিত্তিতে একথাই সাব্যস্ত হয় যে, আমানত অর্থ শরিয়তের বিধি-নিষেধসমূহ।

'আকাশ-পৃথিবী ও পর্বতমালা' অর্থ এখানে পরিদৃশ্যমান আকাশ-পৃথিবী ও পর্বতরাজি, আকাশ-পৃথিবীর অধিবাসীরা নয়। আর পেশ করার অর্থ বাচনিক সম্বোধনের মাধ্যমে বলা, ইশারা ইঙ্গিত বা অনুপ্রেরণা সম্পাতের মাধ্যমে প্রকাশ ঘটানো নয়। বাগবী লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও পরবর্তী যুগের আলেমগণ এরকম ব্যাখ্যাই করেছেন।

আল্লাহ্তায়ালা আকাশ-পৃথিবী ও পর্বতরাজির প্রতি এই মর্মে প্রস্তাব উপস্থাপন করেছিলেন যে, তোমরা আমানত কি বহন করতে চাও? তারা বললো, আমানত কী? আল্লাহ্পাক বললেন, বিশেষ গুরুদায়িত্ব, যা পালন করলে পাবে উত্তম পুরস্কার। আর পালন না করলে ভোগ করবে শাস্তি। তারা বললো, না, এরকম গুরুদায়িত্ব বহনের যোগ্যতা আমাদের নেই। হে আমাদের প্রভুপালক! আমরা তো চাই কেবল তোমার অভিপ্রায় ও আদেশের বাধ্যগত প্রতিপালনকারী হতে। পুরস্কার অথবা তিরস্কার কোনোটাই আমরা চাই না। উল্লেখ্য, আকাশ-পৃথিবী-পর্বতমালার এমতো জবাব হঠকারিতামূলক ছিলো না। ছিলো আল্লাহ্র বিধানের প্রতি সম্মাননাপ্রসূত। এরকম জবাবের মাধ্যমে তারা ঘোষণা করেছে কেবল তাদের অসমর্থতাকেই। এরকমও বলা যাবে না যে, আল্লাহ্ তাদের উপর আমানতের বোঝা চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ এটা তাঁর আদেশ যেমন ছিলো না, তেমনি ছিলে না আকাশ-পৃথিবী-পর্বতের অবাধ্যতাও। আর আল্লাহ্ এরকম চাইলে তারাও তা পালন করতে বাধ্য হতো। অস্বীকার করতে পারতো না।

কতিপয় বিদ্বান বলেছেন, আল্লাহ্পাক যে আমানত বহনের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন তা ছিলো আক্ষরিক অর্থেই বাচনিক। আর এমতো প্রস্তাবের লক্ষ্য ছিলো আকাশ-পৃথিবীর সকল সপ্রাণ সৃষ্টি। এমতো ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করলে বলতে হয়, আলোচ্য বাক্যে সম্বন্ধপদ রয়েছে উহ্য। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ওয়াস্আলিল ক্বরইয়াতা' (জনপদকে জিজ্ঞেস করো)। অর্থাৎ জিজ্ঞেস করো জনপদবাসীকে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানে সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে আকাশ-পৃথিবী-পর্বতমালাকেই। আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতবাসীকে নয়। এখানে পেশ করার অর্থ তাদের স্বভাবগত সামর্থ্যের উপরে আস্থা স্থাপন করা। আর এখানে অস্বীকার করার অর্থ স্বভাবগত যোগ্যতাহীনতাকে প্রকাশ করা।

আকাশ-পৃথিবী-পর্বতমালাকে আমানত বহনের যোগ্যতা দেওয়া হয়নি। দেওয়া হয়েছে মানুষকে। তবুও তাদেরকে এখানে 'জালেম' (অত্যাচারী) ও 'অজ্ঞ' (জাহেল) বলা হয়েছে একারণে যে, তাদের মধ্যে রয়েছে অতিউৎসাহ ও প্রবৃত্তির প্রাবল্য। এদিক থেকে দেখতে গেলে মানুষের এদু'টো বৈশিষ্ট্য দৃশ্যতঃ সম্মানহানিকর মনে হলেও আদতে তা নয়। বরং অতিউৎসাহ ও উচ্চাকাঙ্খাই তো মহৎ কোনো কর্মকাণ্ডে মানুষকে ঝুঁকি নিতে উদ্ধুদ্ধ করে। সুতরাং এখানে আকৃতিগতভাবে 'জুলুম' ও 'জুহুল' শব্দ দু'টো নিন্দার্হ হলেও মূলতঃ প্রশংসা প্রকাশক।

বায়যাবী লিখেছেন, সম্ভবত 'আমানত' অর্থ এখানে বিবেক ও শরিয়তের দায়িত্বভার। বিবেক হচ্ছে মানুষের ক্রোধ ও কুপ্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রক। আর শরিয়ত প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে উগ্রতা ও প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটেই বায়যাবী লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে আনুগত্যের যে মহামর্যাদার কথা বলা হয়েছে, এই আয়াতে করা হয়েছে তার পোষকতা। গচ্ছিত বস্তু অবশ্য ফেরতযোগ্য বলেই আনুগত্যকে বলা যায় আমানত। অপরদিকে আনুগত্যও অবশ্যবাস্তবায়নব্য। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্র আনুগত্য সত্যিই অত্যন্ত গুরুভার, তাই আকাশ-পৃথিবী-শৈলমালা তা বহন করতে অস্বীকৃত হয়েছিলো। হয়েছিলো ভীতশংকিত। অথচ মানুষ সে গুরুভার বহন করতে সম্মত হয়েছিলো অবলীলায়, শতসীমাবদ্ধতা ও শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও। সুতরাং মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে, সে তার অত্যুগ্র আবেগকে করবে সংযত ও সংহত এবং দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যকর্মকে রাখবে সতত জাগ্রত। আর এরকম করলে সে লাভ করবে মহাসাফল্য। ইহকালেও। পরকালেও।

আমি বলি, এরকম গুরুভারের কথা বলা হয়েছে অন্য একটি আয়াতেও। যেমন— 'আমি যদি এই কোরআন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে দেখতে পেতে আল্লাহ্র ভয়ে পাহাড় হয়ে গিয়েছে ছিন্ন ভিন্ন। আমি এ সকল উপমা বর্ণনা করি মানুষের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে, যেনো তারা চিন্তা-গবেষণা করে। বায়যাবীর ব্যাখ্যানুসারে বলা যায়, আলোচ্য আয়াতেও সন্নিবেশিত হয়েছে এধরনের উপমা। অবশ্য আয়াতদ্বয়ের উদ্দেশ্য এক নয়। কিছুসংখ্যক বিদ্বজ্জনও মনে করেন, জড় পদার্থকে সম্বোধন ও তাদের প্রত্যুত্তর প্রদান বিবেকবহির্ভূত। সেকারণেই তাঁরা বিষয়টিকে রাখতে চান উপমার বৃত্তে। এমতো জটিলতা নিরসনার্থে তাই কেউ কেউ বলেছেন, উর্ধ্বমার্গ ও নিম্নমার্গ সৃষ্টি করার পর আল্লাহ্পাক উভয়ের মধ্যে সৃষ্টি করে দেন বোধশক্তি। এরপর বলেন, তোমাদের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি অবশ্যপালনীয় একটি বিধান। যে এ বিধান পালন করবে, তার জন্য প্রস্তুত রেখেছি জান্নাত। আর যে পালন করবে না, তার জন্য

তৈরী করে রেখেছি জাহান্নাম। উভয়ে তখন জবাব দিলো, হে মহাপবিত্র মহামহিম প্রভুপালক! তুমি আমাদেরকে যেমন ইচ্ছাবিবর্জিতরূপে সৃষ্টি করেছো, আমরা সেরকমই তোমার অভিপ্রায়ক্রীড়নক হিসেবে থাকতে চাই। ইচ্ছাধিকারী হয়ে আমরা দায়িত্বপালনে অক্ষম। আর আমরা তো পুণ্যপ্রত্যাশীও নই। তখন আল্লাহ্ আদমকে সৃষ্টি করে এই গুরুভার গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন। হজরত আদম প্রবল প্রেমাতিশয্যবশতঃ সে গুরুভার কবুল করে নিলেন তৎক্ষণাৎ। গুরুদায়িত্ব নির্দ্বিধায় চাপিয়ে দিলেন স্বীয় সত্তার উপর। এভাবে হয়ে গেলেন নিজের উপরে জুলুমকারী। মুজাহিদের এরকম ব্যাখ্যামূলক মন্তব্য সংকলন করেছেন ইবনে আবী হাতেম। সে মন্তব্যের মধ্যে একথাটিও সন্নিবেশিত হয়েছে যে, হজরত আদমের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ এবং জান্নাত থেকে নির্গমনের মধ্যবর্তী সময়ের পরিসর ছিলো জোহর থেকে মাগরিব।

কোনো কোনো জ্ঞানী বলেছেন, আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে জড়পদার্থ জ্ঞানবুদ্ধিহীন। কেননা তারা আমাদের ভাষা বুঝতে পারে না। কিন্তু তারা আল্লাহ্পাকের নির্দেশ উপলব্ধি করে ঠিকই। আনুগত্য করে বুঝে সুঝেই। তাঁর উদ্দেশ্যে হয় সেজদাবনত। আল্লাহ্তায়ালা আকাশ-পৃথিবীকে আদেশ করেছিলেন 'ই'তিয়া ত্বওয়া'ন আও কারহান' (এগিয়ে এসো অনুগত অথবা অনানুগত হয়ে)। প্রত্যুত্তরে তারা বলেছিলো 'আতাইনা ত্বয়িয়ী'ন' (আমরা এসেছি অনুগত হয়ে)। অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে—'কতক প্রস্তর ফেটে যায়, তার থেকে উৎসারিত হয় প্রস্রবণ আবার কতক প্রস্তর অধঃপতিত হয় আল্লাহ্র ভয়ে)'। আর এক আয়াতে এসেছে— 'আপনি কি দেখেন নি নভোবাসী ও ভূপৃষ্ঠবাসীরা অবশ্যই আল্লাহ্কে সেজদা করে। আরো সেজদা করে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, পর্বতমালা, তরু শ্রেণী ও চতুষ্পদ প্রাণীরা'।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'হামালাহাল ইনসান' কথাটির 'ইনসান' অর্থ হজরত আদম। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক তখন শুধু হজরত আদমকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আমি আকাশ-পৃথিবী-পর্বতের নিকটে উপস্থাপন করেছিলাম আমার আমানত। তারা এ ভার বহন করতে অসম্মত। তুমি কি এ আমানত দায়িত্ব ও কর্তব্যসহ গ্রহণ করবে? হজরত আদম নিবেদন করলেন, হে আমার জীবন-মৃত্যুর অধিকর্তা! দায়িত্ব ও কর্তব্য কী? আল্লাহ্পাক বললেন, যদি পুণ্যকর্ম করো, তবে পাবে স্বর্গ ও আমার একান্ত সন্নিধান। আর পাপ করলে প্রবেশ করবে নরকে। হজরত আদম তখন নির্দ্বিধায় তুলে নিলেন আমানতের বোঝা। বললেন, হে আমার দয়াময় প্রভুপালক! আমি আমানত গ্রহণ করলাম প্রসন্নচিত্তে। আল্লাহ্ বললেন, তুমি যখন এ গুরুভার নির্দ্বিধায় গ্রহণ করলে, তখন জেনে রেখো, আমিও হবো তোমার সাহায্যকারী। তোমার চোখের উপর ঝুলিয়ে দিবো একটি পর্দা।

ফলে পাপ চাক্ষুষ করার সঙ্গে সঙ্গে যদি তোমার অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়, তবে তুমি আর সে পাপকর্ম দেখতেই পাবে না। আত্মরক্ষা করতে থাকবে পাপ থেকে। তোমার রসনা রক্ষার জন্য সৃষ্টি করে দিবো দু'টি চোয়াল ও একটি তালু। অশ্লীল অশ্রাব্য বাক্য উচ্চারণের উপক্রম হলে চোয়াল ও তালু বন্ধ করে দিয়ো। বেঁচে থাকতে পারবে অপবিত্র উচ্চারণ থেকে। আর তোমার গোপনাঙ্গের হেফাজতের জন্য ব্যবস্থা করে দিবো পরিচ্ছদের। সুতরাং যে স্থানে নগ্ন হওয়া নিষেধ, সে স্থানে কখনো বস্ত্র উন্মোচন কোরো না। তাহলে আত্মরক্ষা করতে পারবে নিজেকে অশ্লীলতা থেকে।

মুজাহিদ বলেছেন, হজরত আদমের আমানতের দায়িত্বভার গ্রহণ এবং বেহেশত থেকে নির্গমনের মধ্যের সময়ের ব্যবধান ছিলো জোহর ও আছরের নামাজের মধ্যবর্তী সময়ের সমপরিমাণ। এ সম্পর্কে আমি বলি, আমানতের প্রতিফলনের স্থান জান্নাত নয়। জান্নাত হচ্ছে আমানতের সুষ্ঠু দায়িত্বপালনের পুরস্কার। সে কারণেই আমানত গ্রহণের পর হজরত আদমকে আর জান্নাতে থাকতে দেওয়া হয়নি। পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিলো পৃথিবীতে। পৃথিবী যেহেতু আখেরাতের শস্যক্ষেত্র, তাই আমানতের দায়িত্ব বহনের আমল করতে হয় পৃথিবীতেই। বপন এখানে। আর কর্তন সেখানে।

বাগবী লিখেছেন, স্বসূত্রে নাক্কাশ বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, অযত্নে রক্ষিত একটি পাথরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে আমানতকে। সে প্রস্তর উত্তোলনের আহবান জানানো হলো প্রথমে আকাশ-পৃথিবী-পর্বতকে। কিন্তু কেউই এগিয়ে এলো না। দূরে থেকেই প্রকাশ করলো তাদের অক্ষমতা। শেষে এগিয়ে এলেন আবেগায়িত আদম। পাথরটিকে তিনি নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, আদেশ পেলে আমি ওঠাতে পারবো পাথরটিকে। আল্লাহ্ বললেন, ওঠাও তো দেখি। হজরত আদম এক ঝটকায় পাথরটিকে ওঠালেন তাঁর উরুদেশ বরাবর। তারপর রেখে দিলেন। বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি তো এটাকে আরো উপরে তুলতে পারবো। আকাশ ও পৃথিবী সমস্বরে বললো, ওঠাও। হজরত আদম এবার পাথরটি উত্তোলন করে স্থাপন করলেন আপন স্কন্ধে। তারপর ইচ্ছা করলেন মাটিতে নামিয়ে রাখতে। আল্লাহ্ বললেন, না, আর হয় না। এখন আর তুমি এ পাথর মাটিতে নামিয়ে রাখতে পারো না। মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত এ পাথর বহন করে চলবে তোমার বংশধরেরা।

জুজায ও অন্যান্য ভাষ্যকারেরা বলেন, এখানে 'আমানত' অর্থ আনুগত্য, সে আনুগত্য স্বভাবগত হোক অথবা হোক বাধ্যগত। আর আমানত পেশ করার অর্থ এখানে আনুগত্যের আহ্বান। সে আনুগত্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হোক, অথবা হোক আদেশারোপিত। আর আমানতের ভারোত্তলন অর্থ, আমানতের আত্মসাৎ। আমানত কার্যকর করা থেকে বিরত থাকা। যে ব্যক্তি আমানত কার্যকর করে না,

আমানত বহনের ক্ষেত্রে পরিচয় দেয় দায়িত্বহীনতার, তাকেই বলে আমানতবহনকারী। এমতাবস্থায় আমানত বহনে অস্বীকৃতি অর্থ সাধ্যানুসারে আমানত কার্যকর করা। আর আমানত বহনের ক্ষেত্রের ত্রুটিবিচ্যুতির কারণকেই এখানে বলা হয়েছে 'জুলুম' এবং 'জুহুল'। যেমন আল্লাহ্পাক স্বয়ং বলেছেন— 'ইয়াহ্মিলূনা আছক্বলাহুম' (নিজের বোঝা তার নিজেরই উপর)। এমতো ব্যাখ্যাব্যপদেশে হাসানের একটি উক্তি প্রণিধাননীয়। তাঁর মতে 'হামালাহাল ইনসান' কথাটির 'হামালা' দ্বারা বুঝানো হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও কপটাচারীদেরকে, যারা আল্লাহ্র আমানত বহনের ক্ষেত্রে করে প্রতারণামূলক পশ্চাদাপসরণ।

বাগবী লিখেছেন, প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটি পরবর্তী যুগের আলেমগণের। আমি বলি, আলোচ্য আয়াতে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে, আমানত বহনকারী একমাত্র মানব জাতি। সুতরাং যদি আমানতের অর্থ করা হয় আনুগত্য ও শরিয়তের দায়িত্বভার, তবে মানুষের বিশেষত্ব আর থাকে কোথায়? কারণ জ্বিন ও ফেরেশতারাও তো শরিয়তের দায়িত্বপ্রাপ্ত। আর এমতাবস্থায় ফেরেশতারাই হবে অগ্রগামী। কেননা তারা নিষ্পাপ। তাই তাদের আনুগত্যও নির্ভুল। তারা সারাক্ষণ ব্যাপৃত থাকে আল্লাহ্পাকের পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনায়। অপরপক্ষে মানব জাতির অনেকে আত্ম-অত্যাচারী। কোরআনের ভাষায় বলা হয়েছে 'জলিমুল লিনাফসিহী'। কিছু লোক আবার মধ্যপথাবলম্বী। কোরআনের ভাষায় তাদেরকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে 'মুকতাসিদ'। আবার কেউ কেউ কল্যাণের পথানুসারী, যাদেরকে কোরআনের পরিভাষায় বলা হয়েছে 'সবিকুম্ বিল খয়রাত'। এ সকল কারণেই সুফী দার্শনিকগণ বলেন, 'আমানত' অর্থ জ্ঞানের আলো, বিবেকের জ্যোতি এবং প্রেমানল। জ্ঞানের আলোর মাধ্যমে অর্জিত হয় যুক্তিসিদ্ধ প্রত্যয়ন এবং আল্লাহ্র পরিচয়ের পথ। আর সে পথের সকল অন্তরায় দগ্ধিভূত হয়ে নিঃশেষ হয়ে যায় প্রেমের আগুনে। পথ হয় সুগম ও সুপরিষ্কৃত। আল্লাহ্র নৈকট্যভাজন ফেরেশতাদের উন্নতির স্তর সুনির্ধারিত ও সীমাবদ্ধ। উন্নততর স্তরে আরোহণের সুযোগ ও যোগ্যতা তাদের নেই। যেমন আল্লাহ্পাক বলেন— 'ওয়ামা মিন্না ইল্লা লাহু মাক্বামুম মা'লূম' (আমার দিক থেকে তাদের প্রত্যেকের মর্যাদা সুনির্ধারিত)। এমতো সীমাবদ্ধতাকে পোড়াতে পারে কেবল ভালোবাসার আগুন। আর সে প্রেম বুকে ধারণ করে কেবল মানুষ। তাই তাদের সম্মুখেই কেবল উন্মোচিত হতে পারে আল্লাহ্র রহস্যময় পরিচয়।

আমি হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানির মহামূল্যবান বক্তব্য থেকে এতোটুকুই উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি যে, আমানত হচ্ছে একটি দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য বৈভব। পরমতম ও পবিত্রতম সত্তার জ্যোতিসম্পাত ধারণ করার যোগ্যতাই হচ্ছে

আমানত। আর সে যোগ্যতা আছে কেবল মানুষের। ইমান ও পুণ্যকর্ম মানুষকে স্থাপন করতে পারে ফেরেশতাদের সমান্তরালে। এমতাবস্থায় অর্জিত হতে পারে আল্লাহ্‌র গুণবত্তাজাত জ্যোতিসম্পাত ধারণের যোগ্যতা। কিন্তু তাঁর সত্তাজাত জ্যোতির প্রতিফলন ধারণ করতে পারে কেবল ওই রহস্যময় মুকুর, যা মৃত্তিকা থেকে উদ্ভূত। হজরত আদম এমতো যোগ্যতাধারী ছিলেন বলেই হতে পেরেছিলেন আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি (খলিফা)। তাঁর সৃজন সম্পন্নকালে আল্লাহ্‌পাক ফেরেশতামণ্ডলীকে বলেছিলেন, 'আমি যা জানি তোমরা তা জানো না'। এখানে 'আমি যা জানি' অর্থ আমি যে আমানত সম্পর্কে জানি। অর্থাৎ আমার সত্তা থেকে উৎসারিত জ্যোতির প্রতিবিম্ব ধারণ করতে পারে কেবল মৃত্তিকাজাত আদম, একথা আমি জানি, কিন্তু তোমরা জানো না। আবার 'জুলুম' (অত্যাচার) ও 'জুহুল' (অজ্ঞতা) শব্দ দু'টোর ইঙ্গিত এদিকেই। দু'ধরনের শক্তি দেওয়া হয়েছে মানুষকে— হিংস্র পশুর শক্তি এবং গৃহপালিত পশুর শক্তি। হিংস্র পশুশক্তি বলে মানুষ আরোহণ করতে পারে উন্নতর আধ্যাত্মিক স্তরে। আর গৃহপালিত পশুশক্তি তাকে যোগায় কঠোর তপস্যার স্পৃহা ও আল্লাহ্‌র পথে ক্লেশ সহ্য করার ক্ষমতা। এ শক্তি দু'টোর ভিত্তি বা উৎসস্থলও মৃত্তিকা। সুতরাং 'জুলুম' এবং 'জুহুল' মানুষের দু'টি প্রশংসনীয় গুণ। পরম প্রাপ্তি। এ দু'টো গুণের কারণেই সে হতে পারে খেলাফতের অধিকারী।

সূর্যালোক শোষণ ও সংরক্ষণ হচ্ছে মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য। একারণেই সূর্যালোকস্নাত মাটি থেকে উৎপন্ন হতে পারে লতাগুল্ম ও বৃক্ষরাজি। কিন্তু আলোককণার এমতো বৈশিষ্ট্য নেই। শোষণ ও সংরক্ষণ যোগ্যতা না থাকার কারণে আলো তাই মাটির মতো নিজে উপকৃত হতে পারে না। উপকার প্রদান করতে পারে না অন্যকেও। ফেরেশতারা নূরের, আর মানুষ মাটির। উভয়ের মধ্যে তাই রয়েছে মৌলিক তারতম্য। ফেরেশতারা নৈকট্যভাজন। কিন্তু তাদের নৈকট্যের পরিসর সীমিত। আর মানুষ নৈকট্যের (কুরবতের) মর্যাদায় ফেরেশতাদের সমান্তরাল না হলেও (বন্ধুত্বের বেলায়তের) মর্যাদায় ফেরেশতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অবশ্য নবী-রসুলগণই পরিপূর্ণ মানুষ। আর নবীগণ ও ফেরেশতাগণ উভয়েই পরিপুষ্ট ও উপকৃত হন আল্লাহ্‌র গুণবত্তার জ্যোতি থেকে, যে গুণবত্তা আবার তাঁর সত্তাসম্পৃক্ত। তাই তাঁর গুপ্ত নাম (ইসমে আলবাতেন) সমূহ থেকে ফয়েজ আহরণ করেন ফেরেশতারা। আর প্রকাশ্য নাম (ইছমে আজ্‌জাহের) থেকে ফয়েজ শোষণ করেন নবী-রসুলগণ। এটাই তাঁদের সকলের সূচনাস্থল (মাবদায়ে তা'য়ুন)। সুতরাং মনে রাখতে হবে নবুয়তের পরিপোষক হচ্ছে সত্তাজাত জ্যোতি বা জাতি নূর। ফেরেশতারা এই নুরের প্রতিবিম্ব ধারণ করতে পারে না। কেননা তাদের অস্তিত্বে মৃত্তিকার উপাদান নেই। মৃত্তিকা রয়েছে

কেবল মানুষের অস্তিত্বে। তাই সাধারণ মানুষ সাধারণ ফেরেশতা অপেক্ষা এবং বিশেষ মানুষ (নবী-রসুল) বিশেষ ফেরেশতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আবার জান্নাতও নির্ধারণ করা হয়েছে কেবল মানুষের জন্য। জান্নাতের সুখ-সম্ভার আস্বাদন করার যোগ্যতা ফেরেশতাদের নেই। বেহেশতে তারা প্রবেশ করবে কেবল দায়িত্ব পালনার্থে। প্রস্থানও করবে যথারীতি। সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার অধিকার ও যোগ্যতা তাদের নেই।

যাঁরা বলেন, আমানত অর্থ শরিয়তের গুরুদায়িত্ব এবং সে দায়িত্ব মানুষ ঘাড়ে উঠিয়ে নিয়েছে স্বেচ্ছায়, তাঁরা 'জুলুম' ও 'জুহুল' শব্দ দু'টোকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— মানুষ অবিবেচনাপ্রসূত ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে আবেগতাড়িত অবস্থায় শরিয়তের বোঝা উঠিয়ে নিয়ে নিশ্চয় জুলুম করেছে স্বীয় সত্তার উপর। আর এ গুরুভার ওঠাতে না পারলে যে অশুভ পরিণামের সম্মুখীন হতে হবে, সেকথাটি সম্পর্কে সে চিন্তা-ভাবনাও করেনি। সুতরাং সে অজ্ঞ নয় তো কী? কিন্তু মনে রাখতে হবে এখানে 'অত্যাচার' ও 'অজ্ঞতা' শব্দ দু'টোর দ্বারা মানুষকে আসলে তিরস্কার করা হয়নি। বরং এ দু'টো শব্দের মাধ্যমে এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মানুষের প্রকৃত বৈশিষ্ট্যকে।

বায়যাবী মনে করেন, আলোচ্য আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের পরিপোষক। তাই তিনি বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেন এভাবে— আমানত হচ্ছে এক বিশাল বোঝা। কোনো বুদ্ধিমান এবং শক্তিমান ব্যক্তি এমতো বোঝা ওঠানোর দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবে না। অথচ প্রেমোন্মত্ত মানুষ শতসীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই বিশাল বোঝা আল্লাহ্র দানরূপে গ্রহণ করেছে অবলীলায়। এখন এই আমানত রক্ষণাবেক্ষণ তার অত্যাবশ্যক দায়িত্বের অন্তর্ভূত। সুতরাং এ গুরুদায়িত্ব পালনে যে যত্নবান হবে, সে সফল হবে পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবী উভয় স্থানে। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে বায়যাবী 'সেতো অতিশয় জালেম, অতিশয় অজ্ঞ' কথাটির মর্মার্থ করেছেন এভাবে— মানবজাতি কৃত অঙ্গীকার পূরণ করেনি। আমানতের দাবির প্রতি দেয়নি যথাযথ মনোযোগ। সুতরাং সে সীমালংঘনকারী ও অজ্ঞ। অবশ্য তাই বলে একথা বলা যাবে না যে, সকল মানুষ এরকম অপস্বভাবের। অঙ্গীকার পূরণ এবং আমানতের দাবি বাস্তবায়নে নবী-রসুল-আওলিয়া-পুণ্যবানেরা সতত সজাগ।

'বাহরে মাওয়াজ' প্রণেতা লিখেছেন, আমানত এমন এক দুর্বহ দায়িত্ব যে, আকাশ-পৃথিবীর মতো বিশাল সৃষ্টিও এ দায়িত্ব দর্শনে হয়ে পড়েছিলো ভীত-সন্ত্রস্ত। অথচ মানুষ অগ্র-পশ্চাৎ কিছু না ভেবেই আমানতকে বুকে তুলে নিলো। সুতরাং সে অবশ্যই সীমালংঘক। আর আমানতের দায়িত্ব বহন না করলে যে শাস্তি পেতে হবে, সে বিষয়টিও তার অজানা। সুতরাং অজ্ঞ সে তো অবশ্যই। আমার মতে ব্যাখ্যাটি যথার্থ নয়। কেননা আলোচ্য আয়াতে 'ইনসান' (মানুষ)

বলে বোঝানো হয়েছে হজরত আদমকে। তিনিই আমানতের প্রথম বাহক। আর তিনি অবশ্যই ছিলেন নিষ্পাপ, ন্যায়নিষ্ঠ ও জ্ঞানী। আমানতের দাবিও তিনি পরিপূরণ করেছিলেন যথাযথভাবে। এখানে 'ইন্নাহু' (সে তো) বলে নির্দেশ করা হয় তাঁকেই।

মান্যবর সুফী-তাপসগণ বলেছেন, মানুষ আল্লাহ্‌র মারেফত বা পরিচিতি বিস্মৃত হয় বলেই সে 'জালেম' ও 'জাহেল'। পৃথিবীতে এসে সে হারিয়ে ফেলে আল্লাহ্‌র সত্তাজাত জ্যোতিসম্পাতের প্রতিবিম্ব ধারণের যোগ্যতা। সে যোগ্যতাই আল্লাহ্‌র 'ফিতরত' বা স্বভাব ধর্ম নামে পরিচিত। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ওই ফিতরতের উপরেই। অথচ অধিকাংশ মানুষ এ সম্পর্কে জানে না। হৃত বস্তুর কল্যাণ সম্পর্কে সে অনবগত। আবার অনবহিত প্রাপ্ত বস্তুর অকল্যাণের বিষয়েও।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রতিটি নবজাতক জন্মগ্রহণ করে ফিতরতের উপর। এরপরে তার পিতামাতা তাকে বানিয়ে দেয় ইহুদী, খৃষ্টান, অথবা অগ্নিউপাসক।

আমি বলি, এখানকার 'জুলুম' কথাটির অর্থ ক্রোধ এবং 'জুহুল' (মূর্খতা) অর্থ প্রবৃত্তি। বাস্তবক্ষেত্রে শুভাশুভ নির্ণীত হয় এ দু'টোর প্রায়োগিক পৃথকতার উপর। ক্রোধকে যদি আল্লাহ্‌র শত্রুনিধন, কঠোর দায়িত্ব পালন অথবা সাধনাসংকুলতার পাথেয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তবে তা হবে প্রশংসার্হ। যেমন আল্লাহ্‌পাক বলেছেন— 'আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে সুদৃঢ় দুর্গের মতো সারিবদ্ধভাবে'। একথা অবশ্যস্বীকার্য যে, আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে সুদৃঢ় সংকল্প ও তেজস্বী পদবিক্ষেপ। পক্ষান্তরে ক্রোধকে যদি ব্যবহার করা হয় দুর্বল জনতাকে দাবিয়ে রাখবার জন্য, অহংকার প্রকাশ ও অপঅভিলাষ চরিতার্থ করবার জন্য, তবে তা নিন্দার্হ তো হবেই। যেমন আল্লাহ্‌পাক ঘোষণা করেছেন— 'জেনে রেখো, জালেমদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত'। আরো বলেছেন— 'আল্লাহ্ তো আত্মদর্পীদেরকে ভালোবাসেন না'।

একথাটিও মেনে না নিয়ে উপায় নেই যে, ক্রোধ ও প্রবৃত্তির কল্যাণকর ব্যবহার নির্ভর করে অন্তঃকরণের পবিত্রতার উপর। তৎসঙ্গে ভূতচতুষ্টয়ের পরিশুদ্ধতার উপরেও। যেমন রসুল স. বলেছেন, আদম সন্তানদের শরীরে রয়েছে এমন একটি গোশতপিণ্ড, যা অপরিশুদ্ধ হলে তার সমস্ত শরীর অপরিশুদ্ধ হয় এবং যা পরিশুদ্ধ হয়ে গেলে পরিশুদ্ধ হয় সমস্ত শরীর। শুনে রাখো, ওই গোশতপিণ্ডটির নাম কলব।

আল্লাহ্‌পাক ঘোষণা করেছেন 'যে ব্যক্তি এটাকে পবিত্র করেছে, সে সফলতা লাভ করেছে। আর যে একে রেখেছে অপবিত্র, সে হয়েছে ধ্বংসপ্রাপ্ত'। একথাও

অবিস্মরণীয় যে, শরিয়তের বিধিবিধানসমূহ প্রবর্তিত হয়েছে প্রবৃত্তি পরিশোধনার্থেই। তাই বলতে হয়, মানুষ জালেম ও জাহেল যাতে না হয়, সেকারণেই তাদের উপরে চাপানো হয়েছে আমানতের বোঝা। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মানবজাতি জালেম ও জাহেল। তাই আমি তাদের উপরে চাপিয়ে দিয়েছি আমানতের বোঝা। সে-ও তা বরণ করে নিয়েছে সানন্দে। সুতরাং এখন সে আমানত বহনে নৈষ্ঠিক ও ঐকান্তিক হলে পবিত্রতা অর্জন করতে পারবে অপকৃষ্টস্বভাব থেকে। স্বীয় যোগ্যতাকে করতে পারবে উন্নততর অনুগ্রহ অর্জনের অনুকূল। এভাবে হয়ে যেতে পারবে জালেমের বিপরীতে আদেল বা ন্যায়নিষ্ঠ এবং জাহেলের বিপরীতে আলেম বা জ্ঞানী। উভয় জগতে হতে পারবে রবাহূত ও বাঞ্ছিত। আর 'আমানত' অর্থ যদি ধরা হয় পরমসত্তাজাত জ্যোতি, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— যেহেতু মানুষ জালেম ও জাহেল, তাই সে উত্তোলন করতে সমর্থ হয়েছে আমানতের গুরুভার। অর্থাৎ যে জালেম ও জাহেল, সে-ই আমানত বহনের যোগ্য (যে আঁধার, সে-ই তো আলোকিত হওয়ার অধিকারী)।

সবশেষে বলতে হয়, 'আমানত' অর্থ আনুগত্য, অবশ্যপালনীয় বিধান, আল্লাহ্‌র মারেফত, নৈকট্যভাজনতার স্তর বিশেষ যাই হোক না কেনো, সকল অবস্থায় ধরে নিতে হবে ক্রোধ ও প্রবৃত্তির রয়েছে দু'টি দিক। একটি শুভ এবং অপরটি অশুভ। আত্মশুদ্ধি ঘটলে এ দু'টোর প্রচেষ্টা ও পরিণতি হয় কল্যাণকর। আর আত্মশুদ্ধির অভাবে এ দু'টোই ডেকে আনে মহা অকল্যাণ। আর উভয় অবস্থায় ক্রোধ ও প্রবৃত্তিকে চিহ্নিত করা যেতে পারে আমানতের বোঝা চাপানোর কারণরূপে।

পরের আয়াতে (৭৩) বলা হয়েছে— 'পরিণামে আল্লাহ্ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে শাস্তি দিবেন'। এখানকার 'লিইয়ুআজ্‌জিবা' (শাস্তি দিবেন) কথাটির 'লাম' (জন্য) অব্যয়টি পরিণতি প্রকাশক। এভাবে বলতে চাওয়া হয়েছে— আমানত গ্রহণ করার পরিণতিতেই তাদের উপরে নেমে আসবে শাস্তি। যেমন একটি কবিতায় বলা হয়েছে 'লিদ্‌দু লিল মওত ওয়াব্‌নু লিল্ খরাব' (জীবনের পরিণাম মৃত্যু এবং নির্মাণের পরিণাম ধ্বংস)।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীরাই আমানতের দাবি পরিপূরণ করে যথাযথভাবে। সেকারণেই আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর করুণার মেঘপুঞ্জ থেকে তাদের উপরে বর্ষণ করেন মার্জনার অপার্থিব বৃষ্টি। আর সে বৃষ্টিতে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায় তাদের পাপরাশির প্রভাব। এটা সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ্ তাঁর বিশ্বাসভাজন বান্দাগণের প্রতি ক্ষমাপরবশ ও দয়াবান।

উদ্ধৃত আয়াতাংশের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে কুতাইবা বলেছেন, আল্লাহ্ বলেছেন— আমি কি শরিয়তের দায়িত্বভার এবং স্বভাবগত যোগ্যতা এমনভাবে উপস্থাপন করিনি, যাতে করে সুষ্পষ্ট হয়ে যায় সত্যপ্রত্যাখ্যান ও কপটাচরণের মূল প্রকৃতি? একথাও যেনো সকলের জানা হয়ে যায় যে তারা শাস্তিযোগ্য। পক্ষান্তরে বিশ্বাস ও তার সুফল লাভের বিষয়টিকেও তো আমি করে দিয়েছি সুস্পষ্ট, যাতে করে সত্যান্বেষীরা সহজে খুঁজে পেতে পারে তাদের প্রকৃত সুহৃদ। এমতো সত্যান্বেষী বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীদের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো আল্লাহ্তায়ালা নিশ্চয় ক্ষমা করে দিবেন। আমি বলি, মারেফতের পথাভিসারী বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীরা শেষ পর্যন্ত পেয়ে যান আল্লাহ্র অন্তরালহীন ও আনুরূপ্যবিহীন সত্তাজাত জ্যোতিসম্পাতের নিরবচ্ছিন্ন বর্ষণ।

উল্লেখ্য, মানুষ স্বভাবগতভাবেই জালেম ও জাহেল। তাই শতসতর্কতা সত্ত্বেও তার দ্বারা ভুলত্রুটি হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। তাই আমানতবাহীদেরকে সবশেষে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে একথা বলে যে— আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তাই তিনি আমানতবহনকারী নারী-পুরুষকে যেমন ক্ষমা করবেন, তেমনি প্রদান করবেন যথাপুরস্কার।

আলহামদুলিল্লাহ্! সুরা আহযাবের তাফসীর সমাপ্ত হলো আজ পহেলা মহররম ১২০৭ হিজরী সনে।

সূরা সাবা

মক্কায় অবতীর্ণ এই সুরায় রয়েছে ৬টি রুকু ও ৫৪টি আয়াত।

সুরা সাবা ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬,৭, ৮, ৯

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ○

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الَّذِىۡ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الۡاَرۡضِ وَ لَهُ الۡحَمۡدُ فِى الۡاٰخِرَةِ ‌ؕ وَهُوَ الۡحَكِيۡمُ الۡخَبِيۡرُ ۞ يَعۡلَمُ مَا يَلِجُ فِى الۡاَرۡضِ وَمَا يَخۡرُجُ مِنۡهَا وَمَا يَنۡزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا

يَعْرُجُ فِيْهَا ؕ وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ۝٢ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ ؕ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ ۙ عٰلِمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَلَآ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرُ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝٣ لِّيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝٤ وَالَّذِيْنَ سَعَوْ فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ۝٥ وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ وَيَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝٦ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ اِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝٧ اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ ؕ بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلٰلِ الْبَعِيْدِ ۝٨ اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنْ نَّشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۝٩

r সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্ত কিছুরই মালিক এবং আখিরাতেও প্রশংসা তাঁহারই। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ববিষয়ে অবহিত।

r তিনি জানেন যাহা ভূমিতে প্রবেশ করে, যাহা উহা হইতে নির্গত হয় এবং যাহা আকাশ হইতে নাযিল হয় এবং যাহা কিছু উহাতে উত্থিত হয়। তিনিই পরম দয়ালু, অতিশয় ক্ষমাশীল।

r কাফিররা বলে, 'আমাদের নিকট কিয়ামত আসিবে না।' বল, 'আসিবেই, শপথ আমার প্রতিপালকের, নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট উহা আসিবে।' তিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত; আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁহার অগোচর নহে অণূ পরিমাণ কিছু কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু; ইহার প্রত্যেকটি আছে সুস্পষ্ট কিতাবে।

r ইহা এইজন্য যে, যাহারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ তিনি তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিবেন। ইহাদেরই জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিয্ক।

r যাহারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে ভয়ংকর মর্মন্তুদ শাস্তি।

r যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহারা জানে যে, তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাই সত্য; ইহা পরাক্রমশালী প্রশংসার্হ আল্লাহ্র পথ নির্দেশ করে।

r কাফিররা বলে, 'আমরা কি তোমাদিগকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দিব যে তোমাদিগকে বলে, 'তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িলেও তোমরা নূতন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হইবেই?'

r সে কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে অথবা সে কি উন্মাদ? বস্তুত যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহারা শাস্তি ও ঘোর বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।

r উহারা কি উহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে, আসমান ও যমীনে যাহা আছে তাহার প্রতি লক্ষ্য করে না? আমি ইচ্ছা করিলে উহাদিগকে সহ ভূমি ধসাইয়া দিব অথবা উহাদের উপর আকাশখণ্ডের পতন ঘটাইব; আল্লাহ্র অভিমুখী প্রতিটি বান্দার জন্য ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্ত কিছুরই মালিক'। একথার অর্থ— আল্লাহই যেহেতু সকলের ও সকল কিছুর একক স্রষ্টা, স্বত্বাধিকারী, পালক, ব্যবস্থাপক, নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক, সেহেতু প্রকাশ্য-গোপন সরব-নীরব সকল স্তব-স্তুতির অধিকারীও কেবল তিনিই।

লক্ষণীয়, বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, কেউ কেউ কোনো কোনো বিষয়ে কখনো কখনো হয়ে যায় প্রশংসার যোগ্য। এরকম হওয়ার কারণ এই যে, তাদের নিকটে পৌঁছে যায় আল্লাহ্তায়ালার কোনো কোনো অনুগ্রহ। ফলে রূপক অর্থে তারাও হয়ে যায় প্রশংসার্হ। প্রকৃত অর্থে সকল প্রশংসা কেবলই আল্লাহ্র।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আখেরাতেও প্রশংসা তাঁরই'। এই বাক্যটি প্রথমোক্ত বাক্যের প্রলম্বায়ন। প্রথমোক্ত বাক্যটি ছিলো সাধারণার্থক। আর এই বাক্যটি সীমিতার্থক। সুতরাং বলা যেতে পারে, ইহজগতে সাধারণভাবে সকল

প্রশংসা আল্লাহ্র এবং পরকালে প্রশংসাসমূহ বিশেষভাবে কেবলই আল্লাহ্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রথম বাক্যটিতে উল্লেখিত স্তুতিবাদ সাধারণার্থক নয়। বরং ইহজগতের স্তুতিবাদ হচ্ছে পার্থিব বদান্যতার স্বীকৃতিস্বরূপ প্রকাশিত স্তুতিবাদ। যেহেতু দাতা একমাত্র তিনিই, তাই প্রশংসা লাভেরও তিনি একক অধিকর্তা। আবার পরজগতের স্তুতিবাদের অধিকারীও কেবল তিনি। সুতরাং বুঝতে হবে দু'টো বাক্যই সীমিতার্থক, সাধারণার্থক কোনোটাই নয়। অর্থাৎ রূপকার্থক প্রশংসা আল্লাহ্র প্রশংসার অন্তর্ভূত হওয়া সম্ভবই নয়। তাই প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ্। আর পরের বাক্যে বলা হয়েছে 'লাহুল হামদ'। এভাবে প্রথমে প্রশংসা-বন্দনাকে রাখা হয়েছে অনির্দিষ্টার্থক এবং পরে বিষয়টিকে করা হয়েছে সুনির্দিষ্ট। এভাবে এখানে একথাটিই বুঝিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে যে, পরকালে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের প্রশংসা সম্পূর্ণরূপে অচল। অর্থাৎ রূপকার্থেও সেখানে কেউ প্রশংসাভাজন নয়।

কোনো কোনো বিদ্বান বলেন, পরলোকের প্রশংসা অর্থ স্বর্গবাসীদের প্রশংসা। আল্লাহ্পাক স্বয়ং তাঁর বচনামৃতে স্বর্গবাসীদের প্রশংসাবন্দনার উল্লেখ করেছেন এভাবে— ১. আলহামদু লিল্লাহিললাজী হাদানা লিহাজা ওয়ামা কুন্না লি নাহতাদিয়া লাওলা আন হাদানাল্লহ্' ২. ওয়া ক্বলুল হামদু লিল্লাহিল্লাজী সদাক্বনা ওয়ায়্দাহু ৩. আলহামদু লিল্লাহিল লাজী আজহাবা আ'ন্নাল হাজানা।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ববিষয়ে অবহিত'। একথার অর্থ তিনি প্রজ্ঞাময় বলেই সুদৃঢ় করেছেন ধর্মীয় বিধানাবলীকে। আর তিনি সকলের এবং সকলকিছুর প্রকাশ্য-গোপন সকল অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত। কারণ তিনি সর্বজ্ঞও।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে, যা তা থেকে নির্গত হয় এবং যা আকাশ থেকে নাজিল হয় এবং যা কিছু তাতে উত্থিত হয়। তিনিই পরম দয়ালু, অতিশয় ক্ষমাশীল'। একথার অর্থ— তিনি উত্তমরূপে অবগত, বৃষ্টির পানি কীভাবে প্রবেশ করে ভূগর্ভে, মৃত্তিকামধ্যে কীভাবে বিলীন হয় মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মরদেহ, কোথায় বা মৃত্তিকাগর্ভে সঞ্চিত হয়ে আছে খনিজ সম্পদ। এভাবে তিনি এ বিষয়টিও অবগত যে, কীভাবে মৃত্তিকাপৃষ্ঠে সমুদ্গত হয় সবুজ উদ্ভিদ। কীভাবে যত্রতত্র প্রবাহিত হয় নদ-নদী-ঝরণা। আবার কীভাবেই বা পরবর্তী পৃথিবীতে সমুত্থিত হবে মৃতগলিত সমাহিত মানুষ। আকাশ থেকে অবতীর্ণ অপার্থিব বাণীসম্ভার, ফেরেশতামণ্ডলী এবং জীবনোপকরণ সম্পর্কেও তিনি তো অতি উত্তমরূপে অবহিত। আরো অবহিত মানুষের প্রার্থনা, পুণ্যকর্ম ও পুণ্যবাহী ফেরেশতাগণের ঊর্ধ্বারোহণ সম্পর্কেও। পরমতম দয়াপরবশ তিনি। তাইতো অবতীর্ণ করেন মানুষের প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ। আরো অবতীর্ণ করেন যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশে অক্ষম মানুষের জন্য যাচিত ও অযাচিত অনুগ্রহ ও মার্জনা। কারণ তিনি যে নিরতিশয় মার্জনাকারী।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— কাফেরেরা বলে, আমাদের নিকট কিয়ামত আসবে না। বলো, আসবেই, শপথ আমার প্রতিপালকের, নিশ্চয় তোমাদের নিকট তা আসবে। তিনিই অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত'। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, মহাপ্রলয় হবে না। আপনি বলুন, শপথ আল্লাহ্‌র। মহাপ্রলয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তার সঠিক দিনক্ষণ আল্লাহ্‌ কাউকে জানাননি। কারণ বিষয়টি অদৃশ্য জ্ঞানের অন্তর্ভূত। আর সত্তাগতভাবে তিনিই কেবল অদৃশ্য বিষয়াবলীর পরিজ্ঞাতা।

উল্লেখ্য, সত্তাগতভাবে কেবল আল্লাহ্‌ই অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। কিন্তু তিনি কখনো কখনো তাঁর প্রিয়ভাজনগণের কাউকে কাউকে অদৃশ্য বিষয়সমূহের কিছু কিছু জ্ঞান দান করেন। তাই আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশনা ব্যতিরেকে বিষয়টির স্বীকৃতি অথবা অস্বীকৃতি সিদ্ধ নয়। তাই কেবল ঘটিতব্য বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়াই যথেষ্ট। যেমন আল্লাহ্‌পাক জানিয়েছেন, কিয়ামত হবেই। তাই অদৃশ্যের এ বিষয়টিকে স্বীকার করে নিতে হবে। কিন্তু এর দিন তারিখ যেহেতু জানানো হয়নি, তাই এ ব্যাপারে থাকতে হবে নিশ্চুপ। নিজেদের পক্ষ থেকে দিন তারিখ অনুমান করার চেষ্টা করা যাবে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁর অগোচর নয় অণুপরিমাণ কিছু'। একথার অর্থ— অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের এমনকিছু নেই, যা আল্লাহ্‌র জ্ঞানায়ত্ত নয়। যারা মনে করে আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে কেবল আল্লাহ্‌র বর্তমানকালের জ্ঞানের কথা, তাদের ধারণা ভুল। কারণ, অদৃশ্য বিষয়ের সার্বভৌম জ্ঞান যে কেবলই তাঁর, সেই বিষয়টিকেই এখানে প্রকাশ করা হয়েছে চিরন্তন প্রকাশরূপে। অর্থাৎ তিনি যেহেতু 'আ'লীমুল গইব' (সকল অদৃশ্য বিষয়াবলীর পরিজ্ঞাতা), তাই কিয়ামতের সঠিক দিনক্ষণ সম্পর্কেও তিনি সম্যক অবগত। অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবী কিয়ামতের বিষয়েও তিনি 'আ'লীমুল গইব'।

উল্লেখ্য, ঘটমানকালের অনেক বিষয় মানুষও জানে। এ সম্পর্কে সুরা আনয়ামের 'তাওয়াফ্‌ফাতহু রসূলুনা' আয়াতের তাফসীরে খোলামেলা আলোচনা করা হয়েছে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে। একবার রসুল স. সকাশে নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহ্‌র বচনবাহক! যুদ্ধলিপ্ত দু'জন সৈনিক কখনো কখনো মৃত্যুবরণ করে একসাথে। আবার প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে একই সঙ্গে মৃত্যুরবণ করে বহুসংখ্যক লোক। কোনো কোনো শিশু আবার প্রাণত্যাগ করে মাতৃজঠরেই। তাহলে মৃত্যুর ফেরেশতা কীভাবে একসাথে প্রাণসংহার করে এতগুলো প্রাণীর? তিনি স. বললেন, সারাপৃথিবী মৃত্যুদূত আজরাইলের চোখের সামনে, যেমন আমার সামনে রয়েছে এই বাসনখানি। সুতরাং তার দৃষ্টি ও আওতা থেকে কেউই গোপন নয়।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সকলকিছুই আল্লাহ্র আনুরূপ্যহীন দৃষ্টিতে সতত পরিদৃশ্যমান। কারণ তিনি কালাতীত। তেমনি সকল স্থানের সকল কিছুও তাঁর গোচরায়ত্ত। কারণ তিনি স্থানাতীত। স্থান, কাল তাঁর সৃষ্টি। আর তিনি স্থান ও কালসম্ভূত সকলকিছুর একক সৃজয়িতা ও পালয়িতা।

উপযোগ ঃ মহাকালদর্শন লাভ করেন কোনো কোনো মহামনিষীও। হাদিস শরীফেও এর প্রমাণ রয়েছে। যেমন বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একদিন সুর্যগ্রহণ দেখা দিলো। রসুল স. তাঁর সহচরবৃন্দসহ দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে নামাজ পাঠ করলেন। নামাজ শেষে তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! আমরা লক্ষ্য করলাম, নামাজ পাঠকালে একবার আপনি হাত বাড়িয়ে দিলেন। মনে হলো আপনি যেনো কিছু ধরার চেষ্টা করছেন। এরপর একবার দেখলাম, আপনি হঠাৎ কিছুটা পিছিয়ে এলেন। তিনি স. বললেন, সহসা আমার সামনে সমুদ্ভাসিত হলো জান্নাত। ফল ভারাবনত বৃক্ষগুলিকে মনে হলো একেবারে কাছে। ফল চয়ন করার জন্য তখন আমি বাড়িয়ে দিলাম হাত। যদি ওই ফল আমি ছিঁড়ে নিতে পারতাম, তবে তা আমার গোটা উম্মত মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত খেয়ে শেষ করতে পারতো না। কিন্তু পরক্ষণে নয়নগোচর হলো জাহান্নাম। উহ্ কী ভয়ংকর! এরকম বীভৎস দৃশ্য আমি আগে কখনো দেখিনি। দেখলাম জাহান্নামের অধিকাংশই নারী। উল্লেখ্য, পরকালে মহাবিচারপর্ব সমাপনের পর মানুষ যাবে জান্নাতে ও জাহান্নামে। অথচ রসুল স. তা পৃথিবীতে অবস্থানের সময়েই দেখতে পেলেন। এটাই হচ্ছে মহাকাল দর্শনের একটি দৃষ্টান্ত।

একটি সন্দেহ ঃ এমনও তো হতে পারে যে, রসুল স. এর ওই দর্শন ছিলো স্বপ্নদর্শনের মতো কোনোকিছু। সম্ভবতঃ তিনি স. জান্নাত ও জাহান্নাম দর্শন করেছিলেন উপমার জগতের (আলমে মেছালের) প্রতিচ্ছবিরূপে।

সন্দেহের নিরসন ঃ রসুল স. বলেছেন, ওই ফল যদি আমি ছিঁড়ে আনতে পারতাম, তবে গোটা উম্মত তা কিয়ামত পর্যন্ত খেয়েও শেষ করতে পারতো না। তাঁর এরকম কথাতেই প্রমাণিত হয় যে, তিনি স. তখন দেখেছিলেন প্রকৃত জান্নাত ও জাহান্নাম। তাদের প্রতিচ্ছবি নয়।

হজরত জাবের থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি জান্নাত দর্শন করেছি। আবু তালহার সহধর্মিণীকেও দেখেছি সেখানে।

হজরত আনাস থেকে আহমদ, আবু দাউদ ও জিয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, স্বর্গযাত্রার সময় পথিমধ্যে আমি দেখলাম কিছুসংখ্যক লোককে। তাদের হাতের নখগুলো ছিলো তাম্রনির্মিত। তারা নিজে নিজে ওই নখগুলো দিয়ে আঁচড় কাটছিলো তাদের মুখে ও বুকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ভ্রাতা জিবরাইল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা মানুষের গোশত ভক্ষণকারী, নিন্দুক, মানুষের সম্ভ্রম বিনষ্টক।

হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমাকে তখন দেখানো হলো এক বনী ইসরাইলী রমণীকে। তাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছিলো বিড়াল হত্যার কারণে। একটি বিড়ালকে আটকে রেখেছিলো সে। তাকে সে আহার দিতো না, আবার ছেড়েও দিতো না। এমতাবস্থায় বিড়ালটি অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আরো দেখানো হলো ওমর ইবনে আমের খাযায়ীকে। সে তার নাড়িভুঁড়ি হেঁচড়িয়ে চলছিলো। সে ছিলো ধর্মের নামে ষাঁড় ছেড়ে দেওয়ার কুপ্রথাটির প্রথম প্রবর্তক।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু; এর প্রত্যেকটি আছে সুস্পষ্ট কিতাবে'।

অধিকাংশ তাফসীরবেত্তাগণ বলেন, এখানকার 'লা ইয়া'যুবু আনহু' (তাঁর অগোচর নয় অণুপরিমাণ কিছু) কথাটির অর্থ কোনোকিছুই তাঁর অবহিতির বাইরে নয়। আর 'অগোচর' বলে যদি অর্থ নেওয়া হয় জ্ঞানবহির্ভূত অদৃশ্য বিষয় এবং 'সুস্পষ্ট কিতাব' এর অর্থ যদি করা হয় আল্লাহ্র জ্ঞান কিংবা সুরক্ষিত ফলক, তাহলে আলোচ্য বাক্যের দ্বারা একথাই প্রকাশ পায় যে, তাঁর নিকটে অদৃশ্য বলে কোনোকিছুই নেই। আর তাঁর অদৃশ্য জ্ঞানের আংশিক প্রকাশ হচ্ছে 'সুস্পষ্ট কিতাব' বা লওহে মাহফুজ (সুরক্ষিত ফলক)।

কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে প্রস্তুতকৃত বিষয়ের নিন্দনীয় সূচনা দ্বারা অপ্রস্তুত বিষয়ের প্রশংসা করা হয়েছে। ব্যাকরণের ভাষায় একে বলে অপ্রস্তুত প্রশংসা বা ব্যাজস্তুতি। যেমন বলা হয়— সাদেকের একটিই দোষ, তা হচ্ছে সে একজন বিজ্ঞ বিদ্বান। তেমনি এখানকার বক্তব্যটি হবে— অণুপরিমাণ কোনো কিছুই আল্লাহ্র অগোচর নয়, কেবল সুরক্ষিত ফলকে যা লিপিবদ্ধ রয়েছে। এভাবে অর্থ দাঁড়ায়— অদৃশ্য কোনোকিছুই যখন আল্লাহ্র অগোচর নয়, তখন সুরক্ষিত ফলকের বিবরণ আবার তাঁর অগোচর হয় কীরূপে?

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'এটা এজন্য যে, যারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ, তিনি তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিজিক'। একথার অর্থ— বান্দার কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে প্রতিপালন করা কোনো বিশ্বাসবানের পক্ষে সম্ভব নয়। কিছু না কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি তার থাকবেই। কিন্তু আল্লাহ্ অতিশয় কৃপাপরবশ। তাই তিনি তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অক্ষমতার সীমাবদ্ধতাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর তাদের সৎকর্মসমূহের প্রতিদান হিসেবে তাদেরকে দান করবেন জান্নাতের মহাসম্মানিত উপজীবিকা, যা হবে অনায়াসলব্ধ ও অন্য কারো বদান্যতাবিবর্জিত।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করবার চেষ্টা করে, তাদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর মর্মন্তুদ শাস্তি'। একথার অর্থ— যারা

আমার নিদর্শনবলীকে নিষ্ক্রিয় করবার অপপ্রয়াস চালায়, এ সম্পর্কে মানুষকে করে তুলতে চেষ্টা করে বীতশ্রদ্ধ, তারা নিঃসন্দেহে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। তাদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে জাহান্নামের ভয়াবহ ও মর্মন্তুদ শাস্তি। কাতাদা বলেছেন, এখনে 'রিজ্বসুন' অর্থ নিকৃষ্ট শাস্তি। আর 'আলীম' অর্থ মর্মন্তুদ, যন্ত্রণাদায়ক।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তারা জানে যে, তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা-ই সত্য, এটা পরাক্রমশালী প্রশংসার্হ আল্লাহ্র প্রতি পথনির্দেশ করে'।

এখানে 'যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে' বলে বুঝানো হয়েছে ওই সকল গ্রন্থধারীকে যারা ইসলাম কবুল করেছিলেন। যেমন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম ও তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ। কাতাদা বলেছেন, কথাটির অর্থ হজরত সাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁদের অনুসারীগণ। যদি তা-ই হয়, তবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে— মহাবিচারের দিবসে সাহাবীগণ ও তাঁদের অনুসারীগণ প্রত্যক্ষ করবেন, কোরআন সত্য। এখন তাঁরা কোরআনকে সত্য জানেন দলিলপ্রমাণের ভিত্তিতে। কিন্তু সেদিন তাঁরা চাক্ষুষ করবেন সে সত্যের স্বরূপ।

'ইয়াহ্দি' অর্থ পথপ্রদর্শন করেন আল্লাহ্, অথবা পথ দেখায় কোরআন। আর 'ইলা সিরাত্বি' অর্থ ইসলামের দিকে।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'কাফেরেরা বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দিবো, যে তোমাদেরকে বলে, তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়লেও তোমরা নতুন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হবেই'?

এখানে 'কাফেরেরা বলে' অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলে। অর্থাৎ মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান ও বিচারদিবসের প্রতি যারা অবিশ্বাসী, তারা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে'। আর এমন এক ব্যক্তি' অর্থ এখানে রসুল স.। অর্থাৎ ওই ব্যক্তিই সংবাদ দেয় কিয়ামত, হাশর, নশর ইত্যাদির।

'মুয্যিক্বতুম কুললা মুমায্যাক্বিন' অর্থ তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়লেও। অর্থাৎ মৃত্যুর পর তোমরা মাটির সঙ্গে মিশে গেলে, বন্যার তোড়ে কোথাও ভেসে গেলে, অথবা বায়ুতাড়িত হয়ে দিগ্বিদিকে নিক্ষিপ্ত হলেও।

'ইন্নাকুম লাফী খলক্বিন্ জ্বাদীদ' অর্থ, তোমরা উত্থিত হবে নতুন সৃষ্টিরূপে। কথাটি একটি প্রবাদবচন। কেননা 'ইবুনাব্বিউকুম' এর মধ্যেই মূল বক্তব্যটি বিদ্যমান। উল্লেখ্য, রসুল স. কুরায়েশ কুলোদ্ভব এবং তিনি স. সকলের নিকট সুপরিচিত ও সুপ্রসিদ্ধ। তৎসত্ত্বেও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তাঁর নাম উচ্চারণ না করে এখানে বলেছে 'এমন ব্যক্তি'। এতে করে প্রকাশ পেয়েছে তাদের চরম হঠকারিতা, অজ্ঞতা ও রসুল স. এর প্রতি হেয় মনোভাব। আর মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান ইত্যাদি তো ছিলো তাদের বোধবুদ্ধির বাইরে।

এরপরের আয়াতে (৮)বলা হয়েছে— 'সে কি আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করে অথবা সে কি উন্মাদ'? একথার অর্থ— ইচ্ছাকৃতভাবেই সে আল্লাহ্র প্রতি করে অসত্যারোপ। অথবা সে উন্মাদ। হঠাৎ যা মনে হয়, তা-ই বলে ফেলে। বক্তব্য সঠিক হোক অথবা হোক অঠিক।

উল্লেখ্য, এখানে যেহেতু মিথ্যার বিপরীতে এসেছে উন্মাদ হওয়ার কথা, তাই কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে রয়েছে আরেকটি স্তর, যা সত্য-মিথ্যা কোনোটাই নয়। তা হচ্ছে উন্মাদনা। কিন্তু এরকম ব্যাখ্যা দৌর্বল্যদুষ্ট। কেননা 'ইফতারা' (অসত্য) এবং 'ফিজর' (মিথ্যা) সমান্তরাল নয়। ইচ্ছাকৃত মিথ্যাবচনকে বলে 'ইফতারা' এবং ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত মিথ্যাভাষণকে বলে ফিজর'। দু'টোই মিথ্যা। কারণ দু'টোই সত্যের বিপরীত।

এরপর বলা হয়েছে— 'বস্তুত যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, তারা শাস্তি ও ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে'। একথার অর্থ— আল্লাহ্র রসুল আল্লাহ্ সম্পর্কে কোনো মিথ্যা উদ্ভাবন করেননি, এরকম করা তাঁর জন্য অসম্ভব। আর উন্মাদ তিনি তো মোটেও নন। সুতরাং যারা তাঁর কথা অবিশ্বাস করে, অস্বীকার করে আখেরাতকে, তারা পড়ে আছে চরম পর্যায়ের বিভ্রান্তিতে এবং লিপ্ত রয়েছে আখেরাতের শাস্তিযোগ্য কর্মকাণ্ডে। এভাবে এখানে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অপউক্তির প্রতিবাদ করা হযেছে জোরে শোরে। আর তারা যে চরম বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত সে কথাও জানানো হয়েছে অতি দৃঢ়তার সঙ্গে।

'দ্বলালিন বায়ী'দ' অর্থ ঘোর বিভ্রান্তি। এখানে 'বায়ী'দ' (ঘোর, চরম) শব্দটি বিশেষণরূপে আধিক্যপ্রকাশক। উল্লেখ্য, তাদের শাস্তির কারণ হচ্ছে 'দ্বলাল' বা বিভ্রান্তি। অথচ এখানে শাস্তির কারণের পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে 'শাস্তি'র কথা। এভাবে এখানে একথাটিই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তদের শাস্তি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'তারা কি তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে, আসমান ও যমীনে যা আছে, তার প্রতি লক্ষ্য করে না? আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে সহ ভূমি ধসিয়ে দেবো অথবা তাদের উপর আকাশখণ্ডের পতন ঘটাবো'। একথার অর্থ— তারা তাদের চতুর্দিকে এবং উপরে ও নিচে দৃষ্টিপাত করে এই মহাসৃষ্টির মহাসৃজয়িতার কথা ভাবতে চেষ্টা করে না কেনো? তাঁর এমতো অতুলনীয় সৃজননৈপুণ্য দর্শন করে কেনো একথা বুঝতে চেষ্টা করে না যে, যিনি এমতো সর্বশক্তিধর তাঁর পক্ষে মৃত্যুর পরে পুনর্জীবন দান করা অতি সহজ। এই মহাসত্য যিনি প্রচার করেন, সেই প্রত্যাদিষ্ট পুরুষকেই বা কীভাবে প্রত্যাখ্যান করা যায়? তিনি যে আগে থেকেই সত্যবাদী বলে সুপরিচিত। আর তাঁকে উন্মাদই বা বলা যায় কীভাবে? তিনি তো পূর্ব থেকেই বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ বলে সুপ্রসিদ্ধ।

'তারা কি দ্যাখেনা' (আফালাম ইয়ারাও) কথাটির মাধ্যমে এখানে শুরু করা হয়েছে ভীতিপ্রদর্শন। যেনো বলা হয়েছে— তারা কি চক্ষুবিবর্জিত, না দৃষ্টিহীন? যেখানেই তারা যাক না কেনো, দেখবে তারা আছে আল্লাহ্র দু'টি বিশাল সৃষ্টি আকাশ-পৃথিবীর আবেষ্টনীর মধ্যে। তিনি তো তাদেরকে যে কোনো মুহূর্তে করতে পারেন ভূপ্রোথিত। অথবা আকাশ থেকে অবতীর্ণ করতে পারেন সংহারপ্রবণ শাস্তি। যেমন তিনি আকাশ থেকে প্রস্তরবর্ষণ করে নিশ্চিত করে দিয়েছিলেন সাদুমবাসীদেরকে। আর তোমাদের অপরাধ তো তাদেরই মতো। তারা যেমন প্রেরিত পুরুষকে অস্বীকার করেছিলো, তোমরাও তো করে চলেছো সেরকমই।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র অভিমুখী প্রতিটি বান্দার জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে'। একথার অর্থ— যারা আল্লাহ্র পথের পথিক তাদের কাছে এই মহাসৃষ্টি নিশ্চয় আল্লাহ্তায়ালার সৃজনৈপুণ্য ও তাঁর একক অস্তিত্বের প্রমাণ। আরো প্রমাণ মহাপ্রলয়ের, মহাপুনরুত্থানের। কেননা আল্লাহ্ অভিমুখী হওয়ার কারণে তাদের চিন্তা-চেতনা পরিশুদ্ধ ও সঠিক সিদ্ধান্তপ্রদায়ক।

সূরা সাবা ঃ আয়াত ১০, ১১

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ؕ يٰجِبَالُ اَوِّبِىْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ۚ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ۙ﴿۱۰﴾ اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِى السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۱۱﴾

r আমি নিশ্চয় দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম এবং আদেশ করিয়াছিলাম, 'হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সংগে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর' এবং বিহংগকুলকেও, তাহার জন্য নমনীয় করিয়াছিলাম লৌহ—

r 'যাহাতে তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈয়ার করিতে এবং বুননে পরিমাপ রক্ষা করিতে পার' এবং তোমরা সৎকর্ম কর, তোমরা যাহা কিছু কর আমি উহার সম্যক দ্রষ্টা।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি নিশ্চয় দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম'। একথার অর্থ— আমি অসংখ্য বিশ্বাসবানের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি আমার প্রিয় নবী দাউদকে। এখানে 'ফাদ্বলান' অর্থ শ্রেষ্ঠত্বরূপ অনুগ্রহ। হজরত সুলায়মানের উক্তিরূপে অন্য এক আয়াতেও বলা হয়েছে— এমতো শ্রেষ্ঠত্বের কথা। যেমন— 'আলহামদুলিল্লাহিল লাজী ফাদ্বদ্বল্না আ'লা কাছীরিম মিন ইবাদিহীল মু'মিনীন' (যাবতীয় প্রশংসা ওই আল্লাহ্র, যিনি আমাকে মহিমান্বিত করেছেন তাঁর অনেক বিশ্বাসবানগণের মধ্যে'।

উল্লেখ্য, নবী দাউদের এমতো শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হয়েছিলো তাঁর প্রতি অবতারিত যবুর শরীফের কারণে। আর তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র প্রিয় নবী। তাঁর কণ্ঠস্বরও ছিলো অত্যন্ত শ্রুতিসুখকর। লোহা গলে মোমের মতো নরম হয়ে যেতো তাঁর করস্পর্শে। এসকল অনুগ্রহসম্ভারও তাঁকে করেছিলো অনন্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আদেশ করেছিলাম, হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ঘোষণা করো'।

এখানকার 'আওবিবি' শব্দটির ধাতুমূল 'ইয়াব'। এর অর্থ প্রত্যাবর্তন করা, অনুগামী হওয়া। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— আমি আদেশ করেছিলাম, ওহে শৈলশ্রেণী! আমার প্রিয় নবী দাউদ যখন আমার প্রশংসা-বন্দনায় নিমগ্ন হয়, তখন তোমরাও হয়ো তার অনুগামী। অথবা 'ইয়াব' অর্থ এখানে পবিত্রতা বর্ণনা। 'আওয়াবা' অর্থ 'সাব্‌বাহা'— তসবীহ্ পাঠ করা, পবিত্রতা বর্ণনা করা, অন্য দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আল্লাহ অভিমুখী হওয়া। 'আওয়াব' এর ধাত্যর্থ দিনমান পথপরিক্রমণ এবং রাতে যাত্রাবিরতি। এরকম বলেছেন কুতাইবি। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে গিরিমালাসমূহ! তোমরা দিবাভাগে দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা বর্ণনা করো। কেউ কেউ কথাটির অর্থ করেছেন— তুমি দাউদের সুরে সুর মিলিয়ে আমার প্রশংসা করো।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং বিহঙ্গকুলকেও'। বায়যাবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যটি আসলে এরকম— আমার পক্ষ থেকে আমি দাউদকে দান করেছি অনুগ্রহসম্ভার। আল্লাহ্‌র নির্দেশেই পাহাড় ও পাখিরা সহগায়ক হতো তাঁর বন্দনাগীতির। উল্লেখ্য, স্বমহিমার উচ্ছ্বাস, প্রশাসনিক প্রতাপ ও কর্তৃত্বের প্রচণ্ডতার বিকাশের স্থলে এখানে সাধিত হয়েছে বাকরীতির অপহ্নুতির ব্যবহার। যেনো বলা হয়েছে— আমারই নির্দেশে বিবেকহীন সৃষ্টিও বিবেকবানদের মতো তসবীহ্ পাঠ করতো দাউদের সঙ্গে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত দাউদ যখন তাঁর বন্দনাকে উচ্চকিত করতেন, তখন তার প্রতিধ্বনি ভেসে আসতো গিরিকন্দর থেকে। এটাই ছিলো গিরিশ্রেণীর বন্দনা। আর উড্ডীয়মান পাখিরা পক্ষবিস্তার করে স্থির হতো তাঁর মাথার উপরে।

এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে— হজরত দাউদ গিরিগহ্বরে প্রবিষ্ট হয়ে শুরু করতেন তাঁর প্রভুপালনকর্তার বন্দনাসঙ্গীত। সে সঙ্গীতে কণ্ঠ মেলাতো গিরিমালা সমূহও। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত দাউদ যখন আল্লাহ্‌র প্রশংসাকীর্তন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যেতেন, তখন পর্বতশ্রেণী আল্লাহ্‌র হুকুমে শুরু করতো তাঁর প্রশংসাকীর্তনের প্রত্যুচ্চারণ। আল্লাহ্‌র প্রিয় নবীকে প্রফুল্ল রাখাই ছিলো তাদের এমতো প্রত্যুচ্চারণের উদ্দেশ্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'তার জন্য নমনীয় করেছিলাম লৌহ'। একথার অর্থ— আমি আরো একটি অনুগ্রহ প্রদান করেছিলাম দাউদকে। তাঁর করস্পর্শে লোহা হয়ে যেতো গলিত মোম অথবা খামিরকৃত আটার মতো নমনীয়।

বাগবী লিখেছেন, ঐতিহাসিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হজরত দাউদ বনী ইসরাইলদের রাজা থাকাকালে প্রজাসাধারণের অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শনের জন্য মাঝে মাঝে রাতের বেলা ছদ্মবেশে রাস্তায় বের হতেন। কারো সাথে সাক্ষাত হলে জিজ্ঞেস করতেন, আপনাদের রাজা কেমন লোক বলুন দেখি। তারা জবাব দিতো, বড়ই প্রজাবৎসল। একদিন আল্লাহ্তায়ালা মানবাকৃতিতে পাঠালেন এক ফেরেশতা। তার সাথে দেখা হতেই তিনি অভ্যাস মতো জিজ্ঞেস করলেন, বলো হে পথিক! তোমাদের মহারাজ লোকটি কেমন? ফেরেশতা বললো, মন্দ না। তবে একটা ব্যাপার তাঁর জন্য বড়ই বেমানান। হজরত দাউদ চমকে উঠে বললেন, কোনটা? ফেরেশতা বললো, তিনি নিজের ও তাঁর পরিবারবর্গের জন্য ব্যয় করেন রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে। কুতাইবা বর্ণনা করেছেন, তখন হজরত দাউদ প্রার্থনা জানালেন, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! তুমি উপজীবিকার একটি উপলক্ষ আমাকে দান করো, যাতে স্বহস্ত উপার্জিত অর্থের মাধ্যমে আমার সংসারের ব্যয় নির্বাহ হয়। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রার্থনা কবুল করলেন। তাঁকে শিখিয়ে দিলেন লৌহবর্ম তৈরীর কলাকৌশল। সঙ্গে দিলেন একটি অলৌকিক ক্ষমতা। তিনি কোনো লৌহ খণ্ড হাতে নিলেই তা হয়ে যেতো গলিত মোমের মতো মোলায়েম। তখন তিনি ওই লৌহখণ্ড হাতে নিয়ে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে লৌহবর্ম বানাতে পারতেন। তিনিই ছিলেন লৌহবর্মের প্রথম নির্মাতা। প্রতিদিন তিনি নির্মাণ করতেন একটি বর্ম এবং তা বিক্রয় করতেন ছয় হাজার দিরহামে। দুই হাজার দিরহাম ব্যয় করতেন সংসারের জন্য এবং বাকী চার হাজার বিলিয়ে দিতেন দুস্থ প্রজাসাধারণের মধ্যে।

হজরত মিকদাম ইবনে মাদী কারাব থেকে বোখারী ও আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, স্বহস্ত উপার্জন অপেক্ষা উত্তম জীবনোপকরণ আর নেই। আল্লাহ্র নবী দাউদ ভক্ষণ করতেন স্বহস্ত উপার্জনলব্ধ আহার্য। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, তিনি স্বোপার্জিত আহার্য ছাড়া অন্য কিছু ভক্ষণ করতেন না।

পরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'যাতে তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরী করতে এবং বুননে পরিমাপ রক্ষা করতে পারো এবং তোমরা সৎকর্ম করো, তোমরা যা কিছু করো আমি তার সম্যক দ্রষ্টা'। একথার অর্থ— যাতে করে হে আমার নবী! তুমি নির্মাণ করতে পারো এমন বর্ম যা সমস্ত শরীরকে রক্ষা করে এবং যে বর্মের বুনন হয় বিশেষ কৌশলে সম্পন্ন। যথাস্থানে আঁটা থাকে খিল। ফাঁকগুলো যেনো থাকে মধ্যম মাপের। যেনো বর্মটি না হয় অতি হালকা, অথবা অতি ভারী। আর

হে নবী ও নবীর পরিবারবর্গ! আল্লাহ্ প্রদত্ত কৌশলের কারণে যেহেতু তোমরা লাভ করেছো সাংসারিক স্বচ্ছলতা, তাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে তোমরা নিয়োজিত হও নিরবচ্ছিন্ন পুণ্যকর্মে। একথাও স্মরণে রেখো যে, তোমাদের সকল কার্যকলাপই আমার দৃষ্টিবদ্ধ। যথাসময়ে আমি দান করবো তোমাদের পুণ্যকর্মসমূহের যথাপুরস্কার।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ পবিত্র। তাই পবিত্র বস্তুই তাঁর প্রিয়। তিনি তাঁর নবীগণকে যে নির্দেশ দিয়েছেন, সে নির্দেশ দিয়েছেন বিশ্বাসীদেরকেও। বলেছেন, হে নবীগণ! তোমরা ভক্ষণ করো হালাল আহার্য এবং সম্পন্ন করো উত্তম কর্ম।

সূরা সাবা ঃ আয়াত ১২, ১৩, ১৪

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ وَاَسَلْنَا لَهٗ
عَيْنَ الْقِطْرِ ؕ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ؕ وَمَنْ
يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿١٢﴾ يَعْمَلُوْنَ لَهٗ
مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ
رّٰسِيٰتٍ ؕ اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ؕ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ
الشَّكُوْرُ ﴿١٣﴾ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖٓ اِلَّا
دَآبَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ ۚ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ
كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ﴿١٤﴾

r আমি সুলায়মানের অধীন করিয়াছিলাম বায়ুকে যাহা প্রভাতে এক মাসের পথ অতিক্রম করিত এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করিত। আমি তাহার জন্য গলিত তাম্রের এক প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়াছিলাম। তাহার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে জিন্নদের কতক তাহার সম্মুখে কাজ করিত। উহাদের মধ্যে যে আমার নির্দেশ অমান্য করে তাহাকে আমি জ্বলন্ত অগ্নি-শাস্তি আস্বাদন করাইব।

r উহারা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, ভাস্কর্য, হাওযসদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত ডেক নির্মাণ করিত। আমি বলিয়াছিলাম, 'হে দাউদপারিবার! কৃতজ্ঞতার সংগে তোমরা কাজ করিতে থাক। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ।'

r যখন আমি সুলায়মানের মৃত্যু ঘটাইলাম তখন জিন্নদিগকে তাহার মৃত্যু বিষয় জানাইল কেবল মাটির পোকা যাহা তাহার লাঠি খাইতেছিল। যখন সে পড়িয়া গেল তখন জিন্নেরা বুঝিতে পারিল যে, উহারা যদি অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকিত তাহা হইলে উহারা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকিত না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি সুলায়মানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে যা প্রভাতে এক মাসের পথ অতিক্রম করতো এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করতো'।

হাসান বলেছেন, সম্রাট নবী সুলায়মান বায়ুতে ভর করে উষাকালে যাত্রা করতেন। দ্বিপ্রহরে যাত্রা ক্ষান্ত দিতেন ইসতেখারে, যা অবস্থিত ছিলো দ্রুতগতিসম্পন্ন বাহনের এক মাসের পথের দূরত্বে। পরদিন দ্বিপ্রহরে আবার যাত্রা করতেন তিনি। রাতে গিয়ে থামতেন ব্যবিলনে। এ যাত্রাটির দূরত্বও ছিলো দ্রুতগামী বাহনারোহীর এক মাসের পথের দূরত্বে। বর্নিত হয়েছে, তিনি প্রাতঃরাশ সম্পন্ন করতেন বাইরে এবং সমরখন্দে করতেন সান্ধ্যভোজন।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি তার জন্য গলিত তাম্রের এক প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছিলাম'। এখানে 'আল ক্বিতর' অর্থ বিগলিত তাম্র। আল্লাহ্পাক তাঁর জন্য তাম্রকে প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন জলস্রোতের মতো। তাই এখানে বলা হয়েছে 'আইনাল ক্বিতর' (তাম্র-প্রস্রবণ)।

বাগবী লিখেছেন, ওই তাম্র-নির্ঝর প্রবহমান ছিলো মাত্র তিন দিন। আর ঘটনাটি ঘটেছিলো ইয়েমেনে। ওই তাম্রস্রোতের মাধ্যমে সেখানকার লোকেরা উপকৃত হয় বহুল পরিমাণে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে কতিপয় জ্বিন তার সম্মুখে কাজ করতো'। এখানে 'ইজন' অর্থ আদেশে, অভিপ্রায়ে, অথবা অনুগত হয়ে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের মধ্যে যে আমার নির্দেশ অমান্য করে তাকে আমি জ্বলন্ত অগ্নি-শাস্তি আস্বাদন করাবো'। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'আজাবিস্ সায়ীর' অর্থ দোজখের শাস্তি। আবার কেউ কেউ বলেছেন, পার্থিব বিপদাপদ। আমি বলি, 'ইজন' অর্থ যদি আদেশ হয়, তবে 'আজাবিস্ সায়ীর' কথাটির অর্থ হবে পারত্রিক শাস্তি। কারণ পরকালই হচ্ছে পুরস্কার-তিরস্কার প্রাপ্তির প্রকৃত স্থান। আর 'ইজন' অর্থ অভিপ্রায় ধরা হলে, কথাটির অর্থ ইহজাগতিক শাস্তি গ্রহণ করাই হবে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ।

একটি সন্দেহ ঃ জ্বিনদের দ্বারা কর্ম সম্পাদন করা যদি আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় হয়ে থাকে, তবে জ্বিনেরা তার অন্যথা করতে পারবে কীভাবে? আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় তো অবশ্যবাস্তবায়নব্য।

সন্দেহের নিরসন ঃ 'মিনাল জ্বিননি' (জ্বিনদের কতক) কথাটির 'মিন' আংশিক অর্থপ্রকাশক। আর আংশিক অর্থ এখানে অধিকাংশ। অর্থাৎ অধিকাংশ জ্বিনই কাজ করতো। তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা হতো একজন ফেরেশতা দ্বারা। কেউ অবাধ্য হলে ওই ফেরেশতা তাকে পিটিয়ে সোজা করে দিতো। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— অধিকাংশ জ্বিন হজরত সুলায়মানের নির্দেশ অনুসারে কর্মরত থাকতো। আর এটাই ছিলো আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়। অথবা বলা যেতে পারে, এখানে 'মাঁইইয়াযিগ' অর্থ যে জ্বিন আদেশ পালনে গড়িমসি করতো, প্রকাশ করতো বিদ্রোহাত্মক মনোভাব, তাকে প্রহার করে সোজা করে দিতো ওই ফেরেশতা। অর্থাৎ 'নির্দেশ অমান্য করে' কথাটির অর্থ এখানে— নির্দেশ লংঘনের ইচ্ছা করে।

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'তারা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, ভাস্কর্য, হাউজসদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত ডেক নির্মাণ করতো'।

এখানে 'মাহারীব' অর্থ সৃদৃঢ় প্রাসাদ, সুউচ্চ মসজিদ, সুউন্নত বসতবাটি। 'মাহারীব' শব্দটি 'মিহরাব' এর বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ 'হরব' (যুদ্ধ) করা, আক্রমণ প্রতিহত করা। আর সুউচ্চ প্রাসাদও বিরূপ প্রাকৃতিক প্রভাবকে প্রতিহত করে।

বাগবী লিখেছেন, বায়তুল মাকদিস মসজিদের নির্মাণ কার্য শুরু হয় হজরত দাউদের আমলে। যখন মসজিদের প্রাচীর এক মানুষ সমান নির্মাণ করা হলো, তখন প্রত্যাদেশ এলো, হে দাউদ! তোমার মাধ্যমে এ মসজিদের নির্মাণকর্ম সমাপ্ত হওয়া আমার অভিপ্রায় নয়। তোমার উত্তরসূরী সুলায়মানকে আমি দান করবো নবুয়ত ও সাম্রাজ্যাধিকার। আর সে-ই সুসম্পন্ন করবে এ মসজিদের নির্মাণ। এর কিছুকাল পরেই হজরত দাউদের মহাতিরোভাব ঘটলো। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন তাঁর প্রিয় পুত্র হজরত সুলায়মান এবং তিনিই সুসম্পন্ন করলেন বায়তুল মাকদিস মসজিদের নির্মাণপর্ব। ওই নির্মাণপর্বে তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন শুভ-অশুভ উভয় প্রকার জ্বিনকে। কয়েকটি দলে বিভক্ত করে দিয়েছিলেন তিনি তাদেরকে। তাদের কাজের প্রকৃতিও ছিলো বিভিন্ন রকম। আর মসজিদ নির্মাণে ব্যবহৃত শ্বেতমর্মর পাথরগুলো তিনি তাদেরকে দিয়ে উত্তোলন করিয়েছিলেন খনি থেকে।

মসজিদ নির্মাণ ছাড়াও ওই শ্বেতমর্মরগুলো দিয়ে তিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন সুরক্ষিত দুর্গ, নগর-প্রাকার ও অনেক বসতবাটি। বনী ইসরাইলেরা ছিলো বারোটি গোত্রে বিভক্ত। তাদের প্রত্যেক গোত্রের জন্য তিনি জ্বিনদের দ্বারা নির্মাণ

করিয়ে নিলেন পৃথক পৃথক সুরক্ষিত নগরী। মসজিদ নির্মাণ করালেন সবার শেষে। জ্বিনদের এক এক উপদলের দায়িত্ব ছিলো এক এক রকমের। কেউ খনি থেকে পাথর তুলতে লাগলো। কেউ তুলতে লাগলো সোনারূপা। কেউ সমুদ্রাভ্যন্তর থেকে সংগ্রহ করে আনলো মনি-মুক্তা। কেউ আবার আনলো মেশক আম্বর ও অন্যান্য সুগন্ধিদ্রব্য। এভাবে সবগুলো নির্মাণসামগ্রী মিলে হয়ে গেলো বিশাল স্তূপ। সেগুলো গণনা অথবা পরিমাপ করার সাধ্য কারো ছিলো না।

এরপর ডেকে আনা হলো স্থপতি ও প্রকৌশলীদেরকে। তারা পাথরগুলোকে করিয়ে নিলো মসৃণ ও নির্দিষ্ট পরিমাপের। মণি-মুক্তা দিয়ে অংকন করিয়ে নিলো বিভিন্ন রকমের নয়নাভিরাম নকশা। দেয়াল ও মেঝে নির্মাণ করা হলো শ্বেত ও পীতবর্ণ মর্মরপ্রস্তর দিয়ে। মেঝেতে বিছিয়ে দেওয়া হলো ফিরোজা বর্ণের গালিচা। এভাবে এক সময় সমাপ্ত হলো নির্মাণকর্ম। দেখা গেলো বায়তুল মাকদিসের মতো চিত্তাকর্ষক প্রাসাদ তৎকালীন পৃথিবীতে আর একটিও নেই। ঘোর অন্ধকার রাতেও মসজিদটি সমুদ্ভাসিত হতে লাগলো পূর্ণিমার চাঁদের মতো। হজরত সুলায়মান বনী ইসরাইলদের বিদ্বান ও সুধী সমাবেশে ঘোষণা করলেন, আমি এই সুদৃশ্য মসজিদ ভবনটিকে নির্মাণ করিয়েছি কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে। এর বাহির ও ভিতরের সমস্তকিছু একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বায়তুল মাকদিস নির্মাণ সমাপনের পর নবী সুলায়মান আল্লাহ্ সকাশে প্রার্থী হয়েছিলেন তিনটি বিষয়ে। আল্লাহ্ তাঁকে দান করেছিলেন দু'টি। সম্ভবতঃ তৃতীয়টিও। ওই তিনটি বিষয় হচ্ছে— ১. আল্লাহ্ যেনো দান করেন প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, যাতে যে কোনো জটিলতার সমাধানে তিনি গ্রহণ করতে পারেন ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত ২. যেনো তাঁর সকল সিদ্ধান্ত হয় আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তের পূর্ণ অনুকূল ৩. তাঁকে যে বিশাল সাম্রাজ্য দেওয়া হয়েছে, এরকম সাম্রাজ্য যেনো ভবিষ্যতে আর কেউ না পায়। তিনি আরো নিবেদন করেছিলেন, হে আমার পরম প্রভুপালক! যে আমার এই মসজিদে দুই রাকাত নামাজ পাঠ করবে, তাকে তুমি নিষ্পাপ করে দিয়ো সদ্যজাত শিশুর মতো। আমি আশা করি, আল্লাহ্ তাঁর এই নিবেদনটিও কবুল করে নিয়েছেন। বাগবী।

হজরত আনাস ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, স্বগৃহে পঠিত নামাজের পুণ্য একগুণ। সাধারণ মসজিদে পঠিত নামাজের পুণ্য পঁচিশ গুণ। জামে মসজিদে পাঁচশ গুণ। মাসজিদে আকসায় এক হাজার গুণ, আমার এই মসজিদে পঞ্চাশ হাজার গুণ এবং কাবাগৃহে একলক্ষ গুণ। ইবনে মাজা।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তিনটি মসজিদ ব্যতীত তোমাদের বাহন অন্য কোনো স্থানে বেঁধো না— মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা ও আমার মসজিদ।

সমাধান ঃ সোনারূপা ইত্যাদি দ্বারা মসজিদ অলংকৃত করা যায় কিনা, সে সম্পর্কে বিদ্বানগণের মধ্যে রয়েছে মতপৃথকতা। কেউ কেউ বলেছেন, এরকম করা মাকরূহ। কারণ এতে করে সম্পদের অপচয় হয়। রসুল স.ও এরকম করার অনুমতি দেননি। তাঁর পিতৃব্যপুত্র হজরত ইবনে আব্বাসও একবার আজ্ঞা করেছিলেন, তোমরা মসজিদকে কখনো অতিঅলংকৃত কোরো না, যেমন করে থাকে ইহুদী ও খৃষ্টানেরা।

আবার কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেছেন, মসজিদ অলংকরণ পুণ্যের কাজ। কারণ এতে প্রকাশ পায় মসজিদেরই মাহাত্ম্য। হজরত সুলায়মানের আমল এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 'হেদায়া' রচয়িতা লিখেছেন, কেউ যদি তার নিজস্ব সম্পদ দ্বারা মসজিদকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে, তবে তা হবে সিদ্ধ। কিন্তু মসজিদের তত্ত্বাবধায়কের পক্ষে এরকম করা সিদ্ধ নয়। তিনি ব্যয় করতে পারবেন কেবল জরুরী নির্মাণকর্মের জন্য। নকশা ইত্যাদি করা তার জন্য সিদ্ধ নয়। যদি কোনো তত্ত্বাবধায়ক এরকম কিছু করেই ফেলে, তবে তাকে ক্ষতিপূরণ করতে হবে তার নিজস্ব সম্পদ দিয়ে। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, মসজিদ অলংকরণের চেয়ে দুস্থ জনতাকে সাহায্য করা অধিকতর উত্তম। কিন্তু অধিকাংশ বিদ্বজ্জন বলেন, মসজিদে রঙবেরঙের নকশা আঁকা, কাঠ অথবা চুন-সুড়কির মশলার দ্বারা চিত্রিত করা, সোনা-পানির ব্যবহার ইত্যাদি জায়েয। এতে কোনো অসুবিধা নেই। অর্থাৎ এতে পাপ-পুণ্য কোনোটাই নেই।

ইবনে হুম্মাম বলেছেন, মসজিদ সুসজ্জিত করা হলো। সুচিত্রিত হলো মসজিদ গাত্র, মিহরাব। অথচ সে মসজিদে নামাজ নিয়মিত হলো না। অথবা সেখানে যাওয়া আসা করে মুষ্টিমেয় নামাজী। কখনো ওঠে শোরগোল। লোকেরা সেখানে লিপ্ত হয় দুনিয়াবী কথাবার্তায়। মনে হয় যেনো কারো গৃহের বৈঠকখানা। এরকম অবস্থায় সুচিত্রিত মসজিদ নির্মাণ অবশ্যই মাকরূহ।

আমি বলি, হজরত সুলায়মানের ঘটনার প্রেক্ষিতে রসুল স. এর হাদিসকে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। কারণ অতীতকালের নবী-রসুলগণের দ্বারা প্রবর্তিত প্রথা আমাদের উপরেও প্রযোজ্য, যদি না তার বিপরীতে আমাদের শরিয়তে কিছু বলা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, হজরত সুলায়মানের সময়ের মানুষের মন-মানসিকতা ও সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে আমাদের সময়ের পরিবেশ ও পরিস্থিতি তুলনীয় নয়। হজরত সুলায়মান ছিলেন দোর্দণ্ড প্রতাপশালী নৃপতি। তাই সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গিয়ে তাঁকে বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নিতে হতো। যেমন— তাঁর প্রজাকুলের মধ্যে জ্বিনেরা ছিলো দুর্বিনীত, সতত চঞ্চল। অবকাশ পেলেই তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করতো। তাই তাদেরকে সবসময় রাখতে হতো কাজ দিয়ে। হজরত সুলায়মান তাই তাদেরকে সারাক্ষণ লাগিয়ে রাখতেন

প্রাসাদ নির্মাণ, অলংকরণ ও অন্যান্য কাজে। রসুল স.কে এরকম বিব্রত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়নি। তাঁর উম্মতও এসকল কিছু থেকে মুক্ত। তাই হজরত সুলায়মানের সময়ে যা জায়েয, রসুল স. এর সময়ে তা নিরর্থক। ঐতিহাসিকেরা বলেন, বখতে নসরের আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত বায়তুল মাকদিসের নির্মাণশৈলী ও অলংকরণ ছিলো অটুট। সে তার দুর্ধর্ষ বাহিনীকে দিয়ে ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছিলো বনী ইসরাইলের প্রাসাদ, দুর্গ, নগরপ্রাকার ও অন্যান্য স্থাপনা। মসজিদও ধ্বংস করেছিলো সে। খুলে নিয়ে গিয়েছিলো মসজিদের মূল্যবান পাথর ও অন্যান্য সামগ্রী।

'তামছীল' এর বহুবচন 'তামাছীল'। এর অর্থ ভাস্কর্য, মূর্তি, বিগ্রহ, প্রতিমা। আর এখানে 'ভাস্কর্য' বলে বুঝানো হয়েছে পিতল, তামা, সীসা ও মর্মরপ্রস্তর নির্মিত মূর্তিকে। উল্লেখ্য, জ্বিনেরা হজরত সুলায়মানের উদ্দেশ্যে ইয়েমেনে নির্মাণ করেছিলো এক বিস্ময়কর স্থাপত্য। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত সুলায়মান জ্বিনদের দ্বারা নির্মাণ করাতেন সাধারণতঃ পশুপাখিদের মূর্তি। মসজিদের মধ্যেও তিনি অংকন করিয়েছিলেন ফেরেশতামণ্ডলী, নবী-রসুল ও খ্যাতনামা মনিষীগণের চিত্র। উদ্দেশ্য ছিলো, ওই সকল পুণ্যবানগণের স্মৃতি যেনো মানুষের অন্তরে জাগ্রত হয় এবং মানুষ যেনো তাঁদের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয় আল্লাহ্‌র ইবাদতে। উল্লেখ্য, হজরত সুলায়মানের শরিয়তে সপ্রাণ সৃষ্টির ছবিঅংকন ও মূর্তিনির্মাণ ছিলো সিদ্ধ।

আমি মনে করি, নিষ্প্রাণ বস্তুর ছবি অংকনকেই এখানে বলা হয়েছে 'তামাছীল'। কারণ তাঁর পূর্বেও মানুষের মধ্যে মূর্তিপূজার প্রচলন ছিলো। আর তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণের শরিয়তে তা ছিলো নিষিদ্ধও। যেমন স্বয়ং হজরত ইব্রাহিম তাঁর পিতা ও তাঁর স্বজাতিকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন— এসব কিসের মূর্তি, যেগুলোর সঙ্গে রয়েছে তোমাদের ঘনিষ্ঠতা।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, মূর্তিনির্মাতারা নরকে যাবে। তার নির্মিত মূর্তিকে পরজগতে করা হবে সপ্রাণ। আর সপ্রাণ মূর্তিই শাস্তি দিবে তাকে নরকাভ্যন্তরে। হজরত ইবনে আব্বাস আরো বলেছেন, মূর্তি যদি নির্মাণ করতেই হয় তবে মূর্তি নির্মাণ কোরো নিষ্প্রাণ বস্তুর। বোখারী, মুসলিম। বর্ণিত হাদিসে কেবল এই উম্মতের মূর্তি-নির্মাতাদের কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে সকল যুগের সকল উম্মতের মূর্তিনির্মাতাদের কথা। কেননা বাক্যটি বিবৃতিমূলক। আর বিবৃতিমূলক বক্তব্য কখনো রহিত হয় না।

সুপরিণতসূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে মূর্তি প্রস্তুত করবে, তাকে দেওয়া হবে শাস্তি। মহাবিচারের দিবসে তাকে বলা হবে, তোমার প্রস্তুতকৃত প্রতিমায় প্রাণসঞ্চার করো। কিন্তু সে তো কিছুতেই প্রাণসঞ্চার করতে পারবে না।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পুনরুত্থান দিবসে অভ্যুদয় ঘটবে সুদীর্ঘ এক গ্রীবাধারীর। তার চোখ, কান, মুখ সবই থাকবে। সে বলবে, তিন শ্রেণীর লোকের জন্য আমাকে নিয়োগ করা হয়েছে শাস্তিদাতারূপে— ওই জালেম, যে সীমালংঘনকারী; ওই অংশীবাদী, যে আল্লাহ্র ইবাদতে সমকক্ষ নির্ধারণ করে অন্যকে এবং ওই হতভাগা, যে নির্মাণ করে মূর্তি।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন— ওই ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে, যে নির্মাণ করে আমার সৃষ্টির অনুকৃতি।

বর্ণিত হাদিসসমূহের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, মূর্তিনির্মাণের নিষিদ্ধতা কেবল এই উম্মতের উপরে প্রযোজ্য নয়, প্রযোজ্য পূর্বাপর সকল উম্মতের উপরে।

একটি সন্দেহ ঃ হজরত ঈসাও তো নির্মাণ করতেন মৃত্তিকানির্মিত পাখি। সে পাখি আবার জীবন্ত হয়ে উড়েও চলে যেতো। তাঁর এমতো কর্মটি তো আল্লাহ্ কর্তৃক অনুমোদিতও।

সন্দেহের নিরসন ঃ যা আল্লাহ্ কর্তৃক অনুমোদিত, তা তো কখনো দূষণীয় হতে পারে না। হজরত ঈসা যা করতেন, তাতে ছিলো আল্লাহ্রই আদেশ ও তার বাস্তবায়ন। হজরত ঈসা এমতোক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশপালনকারী মাত্র। অন্যান্য প্রতিমাপ্রস্তুতকারীরা তো এরকম নয়। তাদের নির্মাণকর্ম আল্লাহ্র নির্দেশনির্ভর নয়। তাদেরকে তো নির্দেশ দেওয়া হবে তাদের স্বহস্তনির্মিত প্রতিমাগুলোতে প্রাণ সঞ্চারের। কিন্তু তারা তা কিছুতেই পারবে না।

এখানকার 'জ্বিফান' শব্দটি 'জ্বিফনাতুন' এর বহুবচন। এর অর্থ বৃহৎ পেয়ালা। 'কাল জ্বাওয়াব' কথাটির 'জ্বাওয়াব' শব্দটি 'জ্বাবিয়াতুন' এর বহুবচন। এর অর্থ হাউজ বা চৌবাচ্চা। কামুস। বৃহৎ বৃহৎ চৌবাচ্চাকে 'জ্বাবিয়া' বলা হয় একারণে যে, সেখানে জমা থাকে অনেক পানি। বাগবী লিখেছেন, হজরত সুলায়মানের এক পেয়ালায় রক্ষিত আহার্য দ্বারা পরিতৃপ্ত হতে পারতো হাজার হাজার মানুষ।

আর এখানকার 'রসিয়াত' অর্থ সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত ডেকচি। এর পায়াগুলো থাকতো ভূপ্রোথিত। আর সেগুলো আকারে এতো বিশাল ছিলো যে, সেগুলোকে নাড়াচাড়াও করা যেতো না। নামানোও যেতো না উনুনের উপর থেকে। আবার ওগুলোকে শূন্যে উত্তোলনও ছিলো অসম্ভব। ইয়েমেনে স্থাপিত ওই ডেকচিগুলোতে উঠতে হতো মই দিয়ে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি বলেছিলাম, হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তোমরা কাজ করতে থাকো'।

এখানে 'শুকরান' (কৃতজ্ঞতা) শব্দটির তানভীন ন্যূনতা প্রকাশক। অর্থাৎ ন্যূনপক্ষে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা তো প্রকাশ করো। উল্লেখ্য, আল্লাহ্র নেয়ামতের

যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ তাঁর কোনো সৃষ্টির পক্ষেই সম্ভব নয়। অথবা বলা যেতে পারে, 'তানভীন' সন্নিবেশিত হয়েছে এখানে কর্মপদ হওয়ার কারণে। অর্থাৎ এটা উল্লেখিত ক্রিয়ার কারণ। তাই বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আল্লাহ্র অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আনুগত্য প্রকাশ করো। জাফর সুলায়মান বলেছেন, আমি ছাবেতের নিকট থেকে শুনেছি, হজরত দাউদ তাঁর নিজের ও পরিবারবর্গের ইবাদতের জন্য দিনে ও রাতে বিভিন্ন সময় নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। ওই সময়সূচী অনুযায়ী আমল করলে দেখা যেতো দিবারাত্রির কোনো সময়ই তাঁর বসতবাটি ইবাদত-বন্দেগীশূন্য নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ'। একথার অর্থ— কায়মনবাক্যে অধিকাংশ সময় ইবাদত বন্দেগীতে মগ্ন, আমার এরকম বান্দার সংখ্যা অতি নগণ্য। আর সার্বক্ষণিক কৃতজ্ঞচিত্ত থাকে, তেমন বান্দার সংখ্যা তো আরো কম। এ অবস্থা আসে তখন, যখন কলব ফানা হয় এবং অর্জিত হয় হুজুরে আগাহী (সতত চৈতন্যময়তা)। উল্লেখ্য, এরকম সার্বক্ষণিক কৃতজ্ঞতাবোধ লালন করা সত্ত্বেও কৃতজ্ঞতার পুরোপুরি হক আদায় করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। কেননা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মানসিকতা এবং অনুপ্রেরণাও আল্লাহ্র একটি দান। আর এ দানের জন্যও তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা জরুরী। এভাবে উপর্যুপরি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কি কারো পক্ষে সম্ভব? সুতরাং যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিষয়টি সবসময় মানুষের নাগালের বাইরেই থেকে যায়। একারণেই বলা হয়— ওই ব্যক্তিই প্রকৃত অর্থে কৃতজ্ঞ, যে বুঝতে পারে, সে যথাকৃতজ্ঞতা জানাতে অক্ষম।

ইব্রাহিম তাইমী বর্ণনা করেছেন, এক লোক হজরত ওমরের সাহচর্যে দোয়া করতে শুরু করলো, হে আমার আল্লাহ্! আমাকে স্বল্পসংখ্যকদের দলভূত করে দাও। হজরত ওমর বললেন, এটা আবার কোন ধরনের দোয়া। লোকটি বললো, কেনো, শোনেননি, আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র বাণীতে উল্লেখ করেছেন। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ। লোকটি তার প্রার্থনার সমর্থনে আরো একটি আয়াত উচ্চারণ করতে চাইলো। হজরত ওমর বললেন, প্রত্যেকেই ওমরের চেয়ে বেশী জানে।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'যখন আমি সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম তখন জ্বিনদেরকে তার মৃত্যু বিষয় জানালো কেবল মাটির পোকা যা তার লাঠি খেয়েছিলো।'

বাগবী লিখেছেন, বিদ্বানগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন, হজরত সুলায়মান বায়তুল মাকদিসের নির্জন প্রকোষ্ঠে গিয়ে গভীরভাবে ইবাদতে নিমগ্ন হতেন। কখনো কখনো সেখানেই রেখে আসতে হতো তাঁর খাদ্য ও পানীয়। বৎসরের পর বৎসর ধরে এটাই ছিলো তাঁর নিয়ম। এই নিয়ম পালন করতে করতেই এক সময় তিনি পাড়ি দেন পরপারে। তাঁর পরলোকগমনের বৃত্তান্তটি এরকম—

প্রতিদিন সকালে বায়তুল মাকদিসে মাথা তুলে দাঁড়াতো একটি উদ্ভিদের চারা। তিনি উদ্ভিদটিকে তার নাম ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন। যদি তা বৃহৎ বৃক্ষের অংকুর হতো, তবে তিনি তা উঠিয়ে লাগিয়ে দিতেন কোনো বাগানে। আর কোনো ঔষধি হলে লিখে রাখতেন তার নাম। একবার তিনি দেখলেন মসজিদের মেহরাবে উদগত হয়েছে একটি কচি চারা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে তুমি। সে বললো, শিশু বৃক্ষ। তিনি বললেন, এখানে বিকশিত হলে কেনো? সে বললো, মসজিদ ধ্বংস করবার জন্য। তিনি বললেন, অসম্ভব। আমি বেঁচে থাকতেই কি আল্লাহ্ এ মসজিদ ধ্বংস করবেন? তবে মনে হয়, আমার পরকালযাত্রার পর তোমার কারণেই ধ্বংস হবে এই মসজিদ। একথা বলে তিনি চারাটিকে তুলে নিয়ে লাগিয়ে দিলেন সুন্দর একটি বাগানে। দোয়া করলেন, হে আমার আল্লাহ্! আমার পরলোকগমনের খবর তুমি জ্বিনদের কাছে গোপন রেখে দিয়ো, যেনো মানুষ একথা বুঝতে পারে যে, জ্বিনেরা অদৃশ্যের সংবাদ জানে না। উল্লেখ্য, তখনকার জ্বিনেরা গর্ব করে বলতো, আমরা গায়েবের খবর জানি। ভবিষ্যতের সংবাদও আমাদের জানা। কোনো কোনো মানুষ আবার তাদের এমতো দাবি স্বীকারও করে নিতো।

দোয়া শেষ করে হজরত সুলায়মান প্রবেশ করলেন তাঁর নির্জন প্রকোষ্ঠে। লাঠিতে ভর দিয়ে শুরু করলেন নামাজ। নামাজরত অবস্থাতেই মহাপ্রস্থান ঘটলো তাঁর। মানুষ ও জ্বিনেরা একথা বুঝতেও পারলো না। তারা মাঝে মাঝে উঁকি মেরে দেখতো, হজরত সুলায়মান গভীরভাবে নামাজে মগ্ন। দীর্ঘকাল ধরে এভাবে নামাজে মগ্ন থাকা ছিলো হজরত সুলায়মানের অভ্যাস। তাই তিনি যে আর নেই, সেকথা তাদের মনে উদয়ও হলো না। তাঁর ভয়ে আগের মতোই তারা করে যেতো শ্রমসাধ্য কাজ। এভাবে কেটে গেলো পুরো একটি বৎসর। তার লাঠিতে ধরেছিলো ঘুণ অথবা উইপোকা। ফলে লাঠিটি একসময় ভেঙে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিষ্প্রাণ শরীর লুটিয়ে পড়লো মাটিতে।

উইপোকার বদৌলতে জ্বিনেরা মুক্তি পেয়েছিলো কঠিন শ্রম থেকে। তাই তারা উইপোকার উদ্দেশ্যে জানায় কৃতজ্ঞতা। হজরত ইবনে আব্বাস এরকম বলেছেন। ইবনে ইয়াজিদ সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, হজরত সুলায়মান মৃত্যুদূতকে বলে রেখেছিলেন, আমার বিদায়ের সময় অত্যাসন্ন হলে জানাবেন। ওইদিন মৃত্যুদুত জানালেন, চিরবিদায়ের ক্ষণ সমুপস্থিত। প্রস্তুত হোন। হজরত সুলায়মান তাঁর প্রকোষ্ঠমধ্যে নির্মাণ করালেন আর একটি কাঁচের ঘর। তারপর ওই ঘরে প্রবেশ করে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। ওই অবস্থাতেই শুরু করলেন নামাজ। কিছুক্ষণ পর ওই অবস্থাতেই পরলোকগমন করলেন তিনি। কিন্তু লাঠিকে অবলম্বন করে তাঁর শরীর দাঁড়িয়ে রইলো আগের মতোই। মানুষ ও জ্বিনেরা মনে করলো

তিনি নামাজ পাঠ করে চলেছেন গভীর মনোযোগের সঙ্গে। এদিকে তাঁর লাঠিতে ধরলো ঘুণেপোকা। ফলে দীর্ঘ এক বৎসর পর লাঠিটি ভেঙে পড়লো। তিনি লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। জনতা তখন কাঁচের ঘর ভেঙে তাঁর দেহ বের করে আনলো। সৎকার করলো যথারীতি। তারা হিসেব করে দেখলো, বৎসরখানেক আগেই সম্পন্ন হয়েছে তাঁর পরকালযাত্রা।

এখানকার 'দাব্বাতুল আরদ্বি' অর্থ মাটির পোকা বা ঘুণে পোকা। এই পোকা ভক্ষণ করে শুকনো কাঠ। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ কাঠখেকো পোকা, ঘুণে পোকা জাতীয় কোনো পোকা।

'তা'কুলু মিনসাআতাহ্' অর্থ তাঁর লাঠি খাচ্ছিলো। যেমন বলা হয় 'নাসা'তুল গানামা' (আমি ছাগল তাড়িয়েছি)। এই শব্দটি থেকেই বুৎপত্তি লাভ করেছে 'মিনসাআতু' (যদ্দ্বারা তাড়ানো হয়)।

এরপর বলা হয়েছে— 'যখন সে পড়ে গেলো, তখন জ্বিনেরা বুঝতে পারলো যে, তারা যদি অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকতো তাহলে তারা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতো না'।

এখানে 'অদৃশ্য বিষয়' অর্থ হজরত সুলায়মানের পরকালযাত্রার সংবাদ। 'আল আ'জাবিল মুহীন' অর্থ লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। উল্লেখ্য, হজরত সুলায়মানের হুকুমে জ্বিনদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে হতো। লাঞ্ছিত করা হতো তাদেরকে। আবার দাবি করতো, তারা অদৃশ্য বিষয়াবলীর সংবাদ জানে। কিন্তু হজরত সুলায়মানের লোকান্তরিত হওয়ার সংবাদ যখন বৎসরখানেক ধরে তারা জানতেই পারলো না, তখন মানুষের কাছে এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, জ্বিনেরা আসলে অদৃশ্যের বিষয়ে কিছুই জানে না।

বাগবী লিখেছেন, ইতিহাসবেত্তাগণ বলেছেন, হজরত সুলায়মান সিংহাসনে আরোহণ করেন তেরো বৎসর বয়সে। এর চার বৎসর গত হওয়ার পর তিনি শুরু করেন বায়তুল মাকদিস নির্মাণের কাজ। চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন তিনি। তারপর পরলোকগমন করেন তিপ্পান্ন বৎসর বয়সে।

ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, আমার কাছে আলী ইবনে রিবাহ বর্ণনা করেছেন, আলী উল্লেখ করেছেন, একবার ফারওয়াহ ইবনে সুলাইক গাতফানী রসুল স. এর মহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ! মূর্খতার যুগে সাবাবাসীরা ছিলো মহাপ্রতাপশালী। আমার ধারণা তারাও ইসলামের দিকে এগিয়ে আসবে। আমি কি তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারি? রসুল স. বললেন, তাদের ব্যাপারে এখনো আমাকে প্রত্যাদেশ করা হয়নি। তাঁর এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো—

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۖ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾

r সাবাবাসীদের জন্য তো উহাদের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শনঃ দুইটি উদ্যান, একটি ডান দিকে, অপরটি বাম দিকে, উহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালক প্রদত্ত রিয্‌ক ভোগ কর এবং তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। উত্তম নগরী এবং ক্ষমাশীল প্রতিপালক।'

ফারওয়া ইবনে সুলাইক গাতফানীর মাধ্যমে আবু সুবরা নাখয়ী সূত্রে বাগবী বর্ণনা করেছেন, একবার এক লোক রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললো, হে প্রত্যাদিষ্টপুরুষ! দয়া করে 'সাবা' সম্পর্কে কিছু বলুন। সাবা কি পুরুষ? নারী? না কোনো স্থান? তিনি স. বললেন, সাবা একজন লোকের নাম। জন্মগতভাবে সে আরববাসী। তার ছিলো দশজন পুত্র। তার মধ্যে ছয়জন পাড়ি জমালো দক্ষিণ দিকে। বসতি গড়ে তুললো ইয়েমেনে। অবশিষ্ট চার জন চলে গেলো উত্তরাঞ্চলে। বসবাস করতে শুরু করলো সিরিয়ায়। ইয়েমেনে বসবাসকারী ছয়জনের নাম ছিলো কুন্দাহ, আশআর, আযদ, মাদহাজ, আনমার ও হুমাইর। একজন প্রশ্ন করলো, আনমার কে? তিনি স. বললেন, যার নিকট থেকে উদ্ভব হয়েছে খাছআম ও বুজাইলার। সিরিয়ায় যারা গিয়েছিলো, তাদের নাম আমেলা, জুযাম, লাখাম ও গাছ্‌ছান। ইমাম আহমদ প্রমুখ হজরত ইবনে আব্বাস থেকে সুপরিণত সূত্রে এরকম বর্ণনা করেছেন। সাবা ছিলো ইয়াশজাবের পুত্র। ইয়াশজাব পুত্র ছিলো ইয়ারবের এবং ইয়ারব কাহ্‌তানের।

ওই সাবা সম্প্রদায়ের কথাই বলা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। প্রথমে বলা হয়েছে— সাবাবাসীদের জন্য তো তাদের বাসভূমিতে ছিলো এক নিদর্শন ঃ দুইটি উদ্যান, একটি ডান দিকে, অপরটি বামদিকে। তাদেরকে বলা হয়েছিলো, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকপ্রদত্ত রিজিক ভোগ করো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। উত্তমনগরী এবং ক্ষমাশীল প্রতিপালক'।

এখানে 'জ্বান্নাতাইনি' অর্থ দুই সারি বাগান। অর্থাৎ সাবা নগরীর দক্ষিণ ও উত্তর পাশে ছিলো দু'টি নয়নাভিরাম উদ্যান। অথবা বলা যায়, তাদের প্রায় প্রত্যেকের বসতবাটির ডানে ও বাঁয়ে ছিলো মনোরম কানন। অবশ্য তাদের পথের দু'ধারে বাগান থাকতোই। আর পথিকেরা ছিলো ওই সকল বাগানের ফল চয়ন ও ভক্ষণের অনুমতিপ্রাপ্ত।

‘ওয়াশকুরুলাহু’ অর্থ, এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আদেশের একনিষ্ঠ অনুগামী হও।

‘কুলু মির রিযক্বি রব্‌বিকুম’ (তোমরা তোমাদের প্রতিপালকপ্রদত্ত জীবনোপকরণ উপভোগ করো) কথাটি এখানে নবীবচন। অর্থাৎ তাদের প্রতি প্রেরিত নবী তাদেরকে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়। তোমরা আল্লাহ্‌প্রদত্ত আহার্যসামগ্রী ভক্ষণ করো এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে তাঁরই বাধ্যানুগত হও।

‘বালদাতুন ত্বয়্যিবাতুন’ অর্থ পবিত্র বা উত্তম নগরী, সেখানে ছিলো ফল-ফসলের বিপুল সমারোহ। ছিলো চাষাবাদযোগ্য ভূমি। সুদ্দী ও মুকাতিল বলেছেন, সাবাদের ফলের বাগানগুলো ছিলো ফলে ফলে ভরা। কোনো রমণী শূন্য টুকরী মাথায় নিয়ে ওই সকল বাগানে ঘুরে বেড়ালেই তার টুকরী ভরে যেতো ফলে। আলাদা করে তাকে আর ফল পেড়ে নিতে হতো না। ইবনে জায়েদ বলেছেন, তাদের বাগানগুলোতে মাছি-মশাও ছিলো না। ছিলো না কোনো সাপ-খোপের বাসাও। উকুনবিশিষ্ট বস্ত্র পরিহিত কেউ ওই এলাকার রাস্তা ধরে গেলে উকুনগুলো আর জীবন রক্ষা করতে পারতো না। এমনই পরিচ্ছন্ন ছিলো তাদের নগরী। ওই নগরীকে এখানে ‘ত্বয়্যিবাতুন’ বলা হয়েছে সে কারণেই।

‘রব্‌বুন গফুর’ অর্থ ক্ষমাশীল প্রতিপালক। মুকাতিল বলেছেন, কথাটির মর্মার্থ— তোমরা যদি তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। তবে তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্‌বাহ বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক সাবা জনগোষ্ঠীর পথপ্রদর্শনার্থে প্রেরণ করেছিলেন বারোজন নবী। তাঁরা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতেন আল্লাহ্‌প্রদত্ত অনুগ্রহসম্ভারের কথা। বলতেন, কৃতজ্ঞচিত্ত হও এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে পালন করো আল্লাহ্‌র বিধিবিধানসমূহ।

সূর সাবা ঃ আয়াত ১৬

فَاَعۡرَضُوۡا فَاَرۡسَلۡنَا عَلَیۡہِمۡ سَیۡلَ الۡعَرِمِ وَ بَدَّلۡنٰہُمۡ بِجَنَّتَیۡہِمۡ جَنَّتَیۡنِ ذَوَاتَیۡ اُکُلٍ خَمۡطٍ وَّ اَثۡلٍ وَّ شَیۡءٍ مِّنۡ سِدۡرٍ قَلِیۡلٍ ﴿۱۶﴾

r পরে উহারা অবাধ্য হইল। ফলে আমি উহাদের উপর প্রবাহিত করিলাম বাঁধভাংগা বন্যা এবং উহাদের উদ্যান দুইটিকে পরিবর্তন করিয়া দিলাম এমন দুইটি উদ্যানে যাহাতে উৎপন্ন হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউ গাছ এবং কিছু কুল গাছ।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'পরে তারা অবাধ্য হলো। ফলে আমি তাদের উপর প্রবাহিত করলাম বাঁধভাঙা বন্যা'। একথার অর্থ— সাবাবাসীরা তাদের নবীগণের কথা শুনেই চলতো। কিন্তু পরে হয়ে পড়লো দুর্বিনীত। নবীগণকে বলতে শুরু করলো, আমাদের ফল-ফসল সকলকিছুই যে আল্লাহ্প্রদত্ত নেয়ামত, তাতো আমরা স্বীকার করতে পারি না। এগুলো তো আমাদেরই পরিশ্রমের ফসল। ঠিক আছে, এগুলো যদি আল্লাহ্রই দান হয়, তবে তাকে বলো, তিনি যেনো এগুলো উঠিয়েই নেন। তাদের এমতো অস্বীকৃতি ছিলো অনড়। তাই আল্লাহ্পাক তাদের উপরে আপতিত করলেন প্লাবনের শাস্তি। ওই প্লাবনে ভেঙে গেলো তাদের বাঁধ, বাড়িঘর, বাগান ও ক্ষেতখামার। ওই বাঁধভাঙা প্রচণ্ড বন্যাই ইতিহাসে 'সাইলাল ইরাম' নামে খ্যাত।

'আল আ'রিম' অর্থ কঠিন বিপদ, অসহনীয় যাতনা। যেমন বলা হয় 'আ'রিমার রজুলু' (লোকটি অসৎ স্বভাবের হয়েছে, হয়েছে দুর্বৃত্ত)। অথবা 'সাইলাল আ'রিম' অর্থ অতিবর্ষণজনিত প্লাবন। বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্পাক তাদেরকে প্লাবিত করেছিলেন লাল পানির বন্যায়। কেউ কেউ শব্দটির অর্থ করেছেন— উপত্যকা। 'আ'রিম' এর বুৎপত্তি ঘটেছে 'আ'রমাতুন' থেকে। 'আ'রমাতুন' অর্থ কষ্টকর, শক্তি। কেউ কেউ বলেছেন, 'আ'রিম' অর্থ বাঁধ। এমনও পাওয়া যায়, 'আ'রিম' অর্থ জংলী ইঁদুর। রাণী বিলকিস্ কৃষিক্ষেত্রে সেচকাজের সুবিধার্থে নির্মাণ করিয়েছিলেন একটি বিশাল বাঁধবিশিষ্ট জলাধার। একটি জংলী ইঁদুর মাটি কেটে ছিদ্র করে দিয়েছিলো ওই বাঁধে। 'কামুস' রচয়িতা লিখেছেন, উপত্যকাভূমিতে সংরক্ষিত জলাশয়কে বলে 'আ'রামাতুন'। 'আ'রিম তার বহুবচন। কেউ কেউ বলেছেন, 'আ'রিম ' বহুবচন হলেও এর একবচন হয় না। যেমন এক বচন হয় না 'নিস্ওয়াতুন' এবং 'নিসাউন' এর।

বাগবী লিখেছেন, হুমাইরী ভাষায় 'আ'রিম' অর্থ বাঁধ। হজরত ইবনে আব্বাস এবং ওয়াহাব প্রমুখ বলেছেন, 'আ'রিম' ছিলো সাবাবাসীদের একটি পানি নিয়ন্ত্রক বাঁধ। সাবাবাসীরা প্রায়শ উপত্যকাভূমির পানির অধিকার নিয়ে গোত্রীয় দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়তো। তাদের দ্বন্দ্ব নিরসনার্থে সাবার রাণী বিলকিস একটি স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। উপত্যকাভূমিতে প্রস্তর ও লৌহস্তম্ভ সহযোগে নির্মাণ করিয়ে দিলেন একটি বিশাল বাঁধ। বর্ষাকালের পাহাড়বিধৌত পানি জমা হয়ে থাকতো ওই বাঁধবিশিষ্ট বিশাল জলাশয়ে। বারোটি নালা ছিলো বাঁধটির। সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা হতো সুদৃঢ় তোরণ দ্বারা। প্রয়োজনে সেগুলো খুলে জমিতে পানি সিঞ্চন করা হতো। আবার প্রয়োজন শেষে দেওয়া হতো বন্ধ করে। দীর্ঘদিন ধরে এনিয়মেই স্বচ্ছন্দে চাষাবাদ চলে আসছিলো। কিন্তু এক সময় উদ্ধত হয়ে পড়লো তারা। হয়ে পড়লো অবাধ্য ও কৃতঘ্ন। আল্লাহ্ তখন তাদেরকে শাস্তি দানের জন্য

পাঠালেন একটি জংলী ইঁদুর। ইঁদুরটি বাঁধের কোনো কোনো স্থানে ছিদ্র করে দিলো। ফলে বাঁধভাঙা প্লাবনে প্লাবিত হলো সারা দেশ। বাড়ি-বাগান-ক্ষেতখামার সবকিছু ভেসে গেলো প্রচণ্ড বন্যার তোড়ে।

ওয়াহাব বলেছেন, কোনো এক জ্যোতিষী সাবাবাসীদেরকে একবার বললো, একটি জংলী ইঁদুর তোমাদের সর্বনাশ করবে। ছিদ্র করে দিবে তোমাদের বাঁধ। তার কথা শুনে তারা প্রমাদ গুণলো। শেষে বুদ্ধি আঁটলো, প্রস্তরস্তম্ভগুলো যেখানে যেখানে মাটি দ্বারা পূর্ণ করা হয়েছে, সে সকল স্থানে বসিয়ে রাখতে হবে একটি করে পোষা বিড়ালকে। তাই করলো তারা। কিন্তু যখন শাস্তির সময় অত্যাসন্ন হলো, তখন আবির্ভূত হলো সেই লাল অদ্ভূত জংলী ইঁদুর। একস্থানে এসে সে আক্রমণ করে বসলো একটি প্রহরী বিড়ালকে। ভয়ে বিড়ালটি পালিয়ে গেলো সেখান থেকে। ইঁদুরটি সেখানকার মাটি কেটে কেটে মাটির ভিতরে প্রবেশ করতে লাগলো। বিড়ালগুলো সমবেত হয়ে ইঁদুরটিকে ধরার জন্য মাটি আঁচড়াতে লাগলো। ফলে বাঁধের মাটি আলগা হয়ে যেতে লাগলো অতি দ্রুত। এক সময় পানির প্রচণ্ড চাপে ধসে পড়লো সেখানকার দেয়াল। ভেঙে গেলো ঐতিহাসিক আ'রিম বাঁধ। বন্যায় ভেসে গেলো সমগ্র দেশ। বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত হলো মানুষের আবাস, বাগান, ক্ষেত-খামার। কিছুসংখ্যক লোক অতি দ্রুতগতিতে পালিয়ে গিয়ে কোনোক্রমে প্রাণ বাঁচালো বটে, কিন্তু অধিকাংশই জীবন হারালো বানের পানিতে ডুবে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাদের উদ্যান দু'টিকে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দু'টি উদ্যানে যাতে উৎপন্ন হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউগাছ এবং কিছু কুল গাছ'।

এখানকার 'উকুল' অর্থ ফলমূল। 'কামুস' গ্রন্থে এরকমই বলা হয়েছে। 'খামত্ব' শব্দটি এখানে 'উকুল' এর বিশেষণ। 'খামত্ব' অর্থ তিক্ত, বিস্বাদ। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ এরাক বৃক্ষ, যার ফল হয় বিস্বাদ। আর ফলগুলোর আকার হয় কুলের মতো। বাগবী লিখেছেন, 'উকুল' অর্থ ফল। আর 'খামত্ব' অর্থ এরাক ও পিলু ফল। অধিকাংশ তাফসীরবেত্তা এরকমই বলেছেন। মুবাররাদ বলেছেন, গুটিকে বলে 'খামত্ব', যার ফল হয় তিতা। ইবনে আরাবী বলেন, খসখস ফলের মতো দেখতে 'কসওয়াতুস্সামাগ' কে বলে 'খামত্ব' যা ধরে আর ঝরে যায়। কোনো কাজে আসে না।

'আছল' বলে ঝাউ অথবা ঝাউয়ের মতো, বরং ঝাউ অপেক্ষা বৃহৎ এক ধরনের গাছকে। আর এখানকার 'ক্বলীল' শব্দটি 'সিদ্‌রিন' এর বিশেষণ। 'সিদ্‌রিন' অর্থ কুল বা বরই। কুল অবশ্য একটি উৎকৃষ্ট ফল। কিন্তু এখানে বলা

হয়েছে কিছু কুল গাছ উৎপন্ন হওয়ার কথা, অধিক নয়। বাগবী বলেছেন, এখানে নিকৃষ্ট জংলী কুল গাছের কথা বলা হয়েছে, আস্বাদ্য উৎকৃষ্ট কুল গাছের কথা নয়। জংলী বরইয়ের স্বাদ বেমজা। আর এর পাতাও কোনো কাজে আসে না।

উল্লেখ্য, উৎকৃষ্ট বৃক্ষ এবং নিকৃষ্ট বৃক্ষের বাগান দৃশ্যতঃ একই রকম। তাই এখানে নিকৃষ্ট বৃক্ষের সমাবেশকেও বাগানই বলা হয়েছে। অথবা বলা যেতে পারে, আগাছাভরা জঙ্গলকে এখানে বাগান বলা হয়েছে উপহাসছলে।

সূরা সাবা ঃ আয়াত ১৭, ১৮, ১৯

ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ؕ وَ هَلْ نُجٰزِيْۤ اِلَّا الْكَفُوْرَ ﴿۱۷﴾ وَ جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّ قَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ ؕ سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِيَ وَ اَيَّامًا اٰمِنِيْنَ ﴿۱۸﴾ فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ وَ مَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿۱۹﴾

r আমি উহাদিগকে এই শাস্তি দিয়াছিলাম উহাদের কুফরীর জন্য। আমি কৃতঘ্ন ব্যতীত আর কাহাকেও এমন শাস্তি দেই না।

r উহাদের ও যেসব জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম সেইগুলির মধ্যবর্তী স্থানে দৃশ্যমান বহু জনপদ স্থাপন করিয়াছিলাম এবং ঐসব জনপদে ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, 'তোমরা এইসব জনপদে নিরাপদে ভ্রমণ কর দিবস ও রজনীতে।'

r কিন্তু উহারা বলিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের সফরের মন্‌যিলের ব্যবধান বর্ধিত কর।' উহারা নিজেদের প্রতি যুলুম করিয়াছিল। ফলে আমি উহাদিগকে কাহিনীর বিষয়বস্তুতে পরিণত করিলাম এবং উহাদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলাম। ইহাতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে—সাবাবাসীরা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিলো। সেই সঙ্গে তারা ছিলো অকৃতজ্ঞও। সত্যপ্রত্যাখ্যান ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের অবমাননার কারণেই আমি তাদেরকে বাঁধভাঙ্গা বানের পানিতে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিলাম। যারা কৃতঘ্ন, তারা ছাড়া অন্যদের উপরে আমি এরকম সর্বনাশা শাস্তি অবতীর্ণ করি না।

পরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'তাদের এবং যে সকল জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম, সেগুলির মধ্যবর্তী স্থানে দৃশ্যমান বহু জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং ওই সব জনপদে ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা করেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলাম, তোমরা এইসব জনপদে নিরাপদে ভ্রমণ করো দিবস ও রজনীতে'।

এখানকার 'জাআ'লনা' শব্দটি সম্পর্কযুক্ত ১৬ সংখ্যক আয়াতের 'বাদ্দালনা' (পরিবর্তন করে দিলাম) কথাটির সঙ্গে, যদিও 'বাদ্দালনা' এর প্রতিক্রিয়া ঘটেছে পরবর্তীতে। এখানে এই যোজক অব্যয় (ওয়াও) সন্নিবেশিত হয়েছে কেবল বাকরীতির যোগসূত্র রক্ষার্থে।

'বাইনাহুম' অর্থ তাদের মধ্যে অর্থাৎ সাবাবাসীদের মধ্যে। আর 'বাইনাল কুরাল্ লাতী বারাকনা ফীহা' অর্থ, ওই জনপদসমূহ যেখানে আমি ঢেলে দিয়েছিলাম প্রাচুর্য। অর্থাৎ নদীবিধৌত জনপদ সিরিয়া। ওই জনপদ ছিলো ফল ও ফসলে ভরা। জনপদবাসীরা তাই জীবনযাপন করতো স্বাচ্ছন্দ্যে।

'কুরান জহিরাতান' অর্থ, দৃশ্যমান জনপদ। অর্থাৎ পাশাপাশি বা অগ্রপশ্চাত করে সাজানো জনপদ। 'ওয়া কদ্দারনা ফীহাস্ সায়রা' অর্থ, আমি সেখানে নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম ভ্রমণ। সুব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম ভ্রমণের। অর্থাৎ নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তে ভ্রমণ করা যাবে এক জনপদ থেকে আর এক জনপদে। সকালে এক জায়গায়। দ্বিপ্রহরে আরেক জায়গায়। এরকম ভ্রমণে পানাহারের সামগ্রী সঙ্গে নেওয়ারও প্রয়োজন পড়বে না। কারন, পথের দু'পাশে রয়েছে ফলভরা বৃক্ষ। ক্ষুধার্ত হলে অথবা যখন তখন ইচ্ছে করলে যে কোনো গাছ থেকে পছন্দ মতো ফল পেড়ে খাওয়া যায়। উল্লেখ্য, তখন সাবা থেকে সিরিয়ার পথের দু'পাশে ছিলো যেমন জনবসতি, তেমনি ছিলো অবিচ্ছিন্ন ফলের বাগান। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, রাস্তার ধারের ওই জনবসতিগুলোর সংখ্যা ছিলো চার হাজার সাত শত।

কাতাদা বলেছেন, কোনো মহিলা খালি ঝাঁকা মাথায় নিয়ে ওই রাস্তা দিয়ে কিছুক্ষণ চলার পর দেখতে পেতো, গাছ থেকে পাকা ফল পড়ে পড়ে তার ঝাঁকা পূর্ণ হয়েছে। এরকম অবস্থা ছিলো সাবা থেকে সিরিয়া পর্যন্ত। 'সীরু ফীহা' অর্থ পথের অবস্থা এই, কাজেই তোমরা নিঃসন্দেহে পরিভ্রমণ করো দিবারাত্রির যেকোনো সময়ে।

'আমিনীন' অর্থ নিরাপদে, নিরাপত্তার সাথে। অর্থাৎ এ পথে নেই কোনো শত্রুভীতি অথবা হিংস্র পশুর আক্রমণাশংকা। ক্ষুধা-তৃষ্ণার দুর্ভাবনাও এ পথে অনুপস্থিত।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'কিন্তু তারা বললো, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের সফরের সরাইখানার ব্যবধান বর্ধিত করো'। একথার

অর্থ— সাবাবাসীদের কাছে অতিরিক্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ক্লান্তিকর মনে হতে লাগলো। মনে হতে লাগলো, এর চেয়ে যেনো শ্রমবহুল জীবনই উত্তম। তাই তারা প্রার্থনা জানালো, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! তুমি ইয়েমেন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগকে করে দাও বৃক্ষগুল্মহীন ধু ধু মরুভূমি। আমরা এখন থেকে ক্লেশকর ভ্রমণে অভ্যস্ত হতে চাই। ভ্রমণকালে সাথে নিতে চাই মরুচারী পথিকদের মতো বিভিন্ন ভ্রমণসামগ্রী। এভাবে আমরা দল বেঁধে বাণিজ্য করবো। মানুষের কাছে গর্বভরে বলতে পারবো, আমাদের উপার্জন আমাদেরই বুদ্ধি ও শ্রমজাত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিলো। আমি তাদেরকে কাহিনীর বিষয়বস্তু করলাম এবং তাদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিলাম। এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে।' একথার অর্থ— সাবাবাসীরা ছিলো সীমালংঘনকারী। নতুবা তারা এমন বেপরোয়া ভাব কিছুতেই প্রকাশ করতে পারতো না। আমিও তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রস্তাবের যথোপযুক্ত জবাব দিলাম। তাদেরকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করলাম যে, তারা হয়ে গেলো কিংবদন্তীর পাত্র-পাত্রী। তাদের অপকীর্তির গল্প উচ্চারিত হতে থাকলো মানুষের গল্পের আসরে। কোনো জনপদবাসী বিপদগ্রস্ত হলে মানুষ মন্তব্য করতো— এদের পরিণতিতো দেখা যায় সাবাবাসীদের মতো।

শা'বী বলেছেন, সাবা জনপদ যখন বিরান হয়ে গেলো, অধিকাংশ জনতা গ্রহণ করলো মৃত্যুর আস্বাদ, তখন অবশিষ্টরা হয়ে পড়লো ছত্রভঙ্গ। এক এক দল ছড়িয়ে পড়লো এক এক দিকে। গাচ্ছানেরা গেলো সিরিয়ায়। আম্মানের দিকে গেলো আসাদ এবং তেহামায় গিয়ে বসবাস শুরু করলো খাজায়াহ্ গোত্র। ইরাকের দিকে চলে গেলো জাযীমারা। আর বনী আ'নমারের আউস খাজরাজেরা বসতি স্থাপন করলো গিয়ে ইয়াছরীবে। তাদের মধ্যে ইয়াছরীব বা মদীনায় সর্বপ্রথম আউস ও খাজরাজদের পূর্ব পুরুষ আমর ইবনে আমের আসলামী।

'সব্‌র' অর্থ ধৈর্যশীল। অর্থাৎ পাপ থেকে আত্মসংবরণকারী। বিপদাপদে সহিষ্ণু অথবা আনুগত্যের উপরে সতত প্রতিষ্ঠিত। আর 'শাকুর' অর্থ প্রাপ্ত অনুগ্রহের সবিনয় স্বীকৃতি প্রদানকারী। কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী। মুকাতিল বলেছেন, উম্মতে মোহাম্মদীর বিশ্বাসবান ব্যক্তিরাই ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ। মাতরাফও এরকম বলেছেন। আমি বলি, যারা প্রকৃতই বিশ্বাসী, তারা সর্বাবস্থায়ই ধৈর্যশীল অবস্থায় কৃতজ্ঞ হয়। এ পৃথিবী পরীক্ষাগার। এখানকার সুখ ও সুখের উপকরণও পরীক্ষা। বিশ্বাসীগণকে এখানে পদে পদে পরীক্ষা করা হয়। দুঃখ ও সুখ দিয়ে মাপা হয় তার ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতাবোধকে। তাদের জন্য মৃত্যু যেমন একটি পরীক্ষা, তেমনি জীবনও। যেমন আল্লাহ্‌পাক ঘোষণা করেছেন— 'তিনি সৃষ্টি করেছেন জীবন ও মৃত্যু, প্রমাণ করবার জন্য তোমাদের মধ্যে কে পুণ্যকর্ম করে'। এ কারণেই

বিশ্বাসীরা পাপ থেকে আত্মরক্ষা করে। বিপদে আপদে ধারণ করে ধৈর্য। আর আল্লাহ্‌র আনুগত্যকে আশ্রয় করে সুদৃঢ়রূপে। তাই প্রতিটি বিপদই হয় তাদের অনবধানতার প্রায়শ্চিত্ত। বিপদে ধৈর্য ধারণ ও স্বাচ্ছন্দ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ইমানদারদের জন্য অত্যাবশ্যক। আর ধৈর্য ধারণের সামর্থ্যপ্রাপ্তিও আল্লাহ্‌প্রদত্ত একটি বিশেষ নেয়ামত। সুতরাং নেয়ামতেরও শোকরগোজার করা প্রয়োজন।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. বলেন, প্রিয়তম জনের নিকট থেকে আগত বিপদ তাঁর করুণা অপেক্ষা অধিক আস্বাদ্য। তাই বিপদ-মুসিবতের সময়েও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা জরুরী। জনৈক কবি বলেছেন—

মিলন লগ্নে আমি হই আমার ক্রীতদাস
বিরহই আমাকে রাখে দাসত্বের হালে

রসুল স. বলেছেন, ইমানের দু'টি অংশ— ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা। বায়হাকী হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তাঁর শো'বুল ইমানে। আমি বলি, একজন ইমানদার সর্বাবস্থায় পূর্ণ ইমানদার— উভয় অবস্থার সমন্বয়ক। একটি নিয়ে তারা কখনো তৃপ্ত হতে পারে না।

সূরা সাবা ঃ আয়াত ২০, ২১

وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٠﴾ وَمَا كَانَ لَهٗ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِيْ شَكٍّ ۗ وَ رَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ﴿٢١﴾

r উহাদের সম্বন্ধে ইবলীস তাহার ধারণা সত্য প্রমাণ করিল, ফলে উহাদের মধ্যে একটি মু'মিন দল ব্যতীত সকলেই তাহার অনুসরণ করিল;

r উহাদের উপর শয়তানের কোনো আধিপত্য ছিল না। কাহারা আখিরাতে বিশ্বাসী এবং কাহারা উহাতে সন্দিহান তাহা প্রকাশ করিয়া দেওয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তোমার প্রতিপালক সর্ব বিষয়ে হিফাযতকারী।

প্রথমে বলা হয়েছে—'তাদের সম্বন্ধে ইবলিস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করলো'। কোনো কোনো ভাষ্যকার এখানকার 'আলাইহিম' (তাদের উপরে, তাদের সম্বন্ধে) কথাটির সংযোগ ঘটিয়েছেন সাবাবাসীদের সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— সাবাবাসীদের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যান কারী ছিলো, তাদের উপরে ফলপ্রসূ হলো শয়তানের চিন্তা-চেতনা ও পরিকল্পনা। মুজাহিদ বলেছেন, এখানকার

'তাদের' সর্বনামটি সংযুক্ত হবে সাধারণভাবে সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সঙ্গে। ইবলিস আল্লাহ্পাকের উদ্দেশ্যে বলেছিলো, 'তোমার মহামর্যাদার শপথ! অবশ্যই আমি সকল মানুষকে বিভ্রান্ত করবো। তাদের অধিকাংশকেই তুমি কৃতজ্ঞরূপে পাবে না'। তার এমতো অপচিন্তার প্রতিফলন সে ঘটায় অনেক মানুষের মধ্যে। কেবল বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীরা এর ব্যতিক্রম।

ইবনে কুতাইবা লিখেছেন, ইবলিস কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ প্রার্থনা করলো। আল্লাহ্তায়ালা তা অনুমোদন করলেন। ইবলিস বললো, 'অবশ্যই আমি আদম সন্তানদেরকে করবো বক্র পথের পথিক'। তার এমতো অপধারণা বাস্তবরূপ লাভ করেছিলো সাবা জনগোষ্ঠীর অধিকাংশের উপর।

এরপর বলা হয়েছে— 'ফলে তাদের মধ্যে একটি মু'মিন দল ব্যতীত সকলেই তার অনুসরণ করলো'। এখানে 'মিনাল মু'মিনীন' (তাদের মধ্যে একটি মুমিন দল) কথাটির অর্থ সাবাবাসীদের অন্তর্ভূত বিশ্বাসীদের একটি দল। অথবা গোটা মানবজাতির মধ্যে বিশ্বাসীদের দল।

সুদ্দী বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বিশ্বাসীরা ধর্মের মৌলিক বিষয়াবলীতে কখনোই শয়তানের অনুসরণ করে না। এক আয়াতে তাই ঘোষিত হয়েছে— 'নিশ্চয় আমার প্রকৃত বান্দাগণের উপর তোমার কোনো কর্তৃত্ব নেই'। এমতো বাক্যের প্রেক্ষাপটে 'মিন' (মধ্যে, হতে) অব্যয়টি বিবরণার্থক। আবার কেউ কেউ বলেছেন আংশিকার্থক। অর্থাৎ কিছুসংখ্যক বিশ্বাসী এর ব্যতিক্রম, যারা আল্লাহ্র প্রতি একান্ত অনুগত, অবাধ্য নয়।

পরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'তাদের উপর শয়তানের কোনো আধিপত্য ছিলো না'। একথার অর্থ সাবা জনগোষ্ঠীভূত বিশ্বাসীদের উপরে শয়তানের কোনো প্রভাব ছিলো না। অথবা মানুষের মধ্যে যারা বিশ্বাসবান, তাদের উপরে শয়তানের কোনো প্রভাব নেই। বলাবাহুল্য, শয়তান মানুষের মধ্যে যে প্রভাব বিস্তার করে, তা-ও আল্লাহ্ কর্তৃক অনুমোদিত। যেমন— 'তাদের মধ্যে তুই কথার দ্বারা যাকে পারিস তাকে সত্যচ্যুত কর। তাদেরকে আক্রমণ কর তোর পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে। অংশগ্রহণ কর তাদের অর্থ, সম্পদ ও সন্তান সন্ততিতে। আর তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দে'।

হাসান বলেছেন, শয়তান মানুষের প্রতি অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা আক্রমণ চালায় না। বরং তাদেরকে দেয় মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। করে দুরাশা ও ছলনাগ্রস্ত। সে কারণেই তারা হয় প্রবঞ্চিত, প্রতারিত।

এরপর বলা হয়েছে— 'কারা আখেরাতে বিশ্বাসী এবং কারা তাতে সন্দিহান, তা প্রকাশ করে দেওয়াই ছিলো আমার উদ্দেশ্য'।

এখানে 'ইল্‌লা লি না'লামা' কথাটির শাব্দিক অর্থ যেনো আমি জেনে নিতে পারি, কে আমার অনুগত এবং কে নয়। কিন্তু এভাবে অর্থ করলে একথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ নন এবং তাঁর জ্ঞান নয় অনাদি ও অনন্ত। তাই কথাটির শাব্দিক অর্থ এখানে গ্রহণীয় নয়। কারণ আল্লাহ্পাক অতি অবশ্যই সর্বজ্ঞ। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সকলকিছুই তাঁর জ্ঞানায়ত্ত। অবশ্য সে জ্ঞানের প্রকাশ নিত্যনতুন। অর্থাৎ সে জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে ক্রমে ক্রমে ধারাবাহিকভাবে। সুতরাং বুঝতে হবে এখানকার 'ইলম' (জানা) অর্থ প্রকাশ করা, অর্থাৎ কোনোকিছুর প্রকাশপূর্ব অবস্থা যেমন তাঁর জ্ঞানায়ত্ত, তেমনি জ্ঞানায়ত্ত তার প্রকাশপরবর্তী অবস্থাও। তাঁর অসীম ও আনুরূপ্যবিহীন জ্ঞানের অভ্যন্তরেই আবর্তিত হয় সকল স্থানসম্ভূত ও কালসম্ভূত বিষয়। কখনো অনস্তিত্বরূপে, কখনো অস্তিত্বসহকারে। যেমন জায়েদ নামক কোনো ব্যক্তির অনস্তিত্ব-অস্তিত্ব, জন্ম-মৃত্যু, উত্থান-পতন ইত্যাদি। সৃষ্টি সতত সঞ্চরণশীল ও পরিবর্তনশীল। কিন্তু তাঁর জ্ঞান অপরিবর্তনীয়। তাই তাঁর অভিপ্রায়ানুসারে তাঁর জ্ঞান বাস্তবজগতে ক্রিয়াশীল হয়। কিন্তু সৃষ্টির কোনোপ্রকার ক্রিয়াশীলতাই তাঁর জ্ঞানের উপরে ছায়াপাত করে না। করতে পারে না। তাই 'যেনো আমি জেনে নিতে পারি' কথাটির অর্থ হবে এখানে আমি তো জানিই কে বিশ্বাসী এবং কে অবিশ্বাসী। কিন্তু আমার এই সংগুপ্ত জ্ঞান আমি বাস্তবজগতে প্রকাশ করি এজন্য যে, অন্যদের সামনেও যেনো উন্মোচিত হয় বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের পরিচয়। এই বিষয়টিই এখানে প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে যে— তা প্রকাশ করে দেওয়াই ছিলো আমার উদ্দেশ্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ে হেফাজতকারী'। একথার অর্থ— কাল ও কালজ বিষয়াবলীর সংরক্ষক কেবলই আল্লাহ্। সুতরাং বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে তিনি সকলকেই রক্ষা করে চলেছেন। কারো সম্পর্কে তিনি কখনো উদাসীন নন। সে কারণে সকলকেই তিনি দান করবেন যথোপযুক্ত প্রতিদান— পুরস্কার অথবা তিরস্কার।

সূরা সাবা ঃ আয়াত ২২, ২৩

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ ۚ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَ مَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَّمَا لَهٗ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ ﴿٢٢﴾ وَ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗٓ

اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ ؕ حَتّٰۤی اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا ۙ قَالَ رَبُّكُمْ ؕ قَالُوا الْحَقَّ ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْكَبِیْرُ ﴿۲۳﴾

r বল, 'তোমরা আহ্বান কর উহাদিগকে যাহাদিগকে তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে ইলাহ্ মনে করিতে। উহারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছুর মালিক নহে এবং এতদুভয়ে উহাদের কোন অংশও নাই এবং উহাদের কেহ তাঁহার সহায়কও নহে।'

r যাহাকে অনুমতি দেওয়া হয় সে ব্যতীত আল্লাহ্‌র নিকট কাহারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হইবে না। পরে যখন উহাদের অন্তর হইতে ভয় বিদূরিত হইবে তখন উহারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করিবে, 'তোমাদের প্রতিপালক কী বলিলেন?' তদুত্তরে তাহারা বলিবে, 'যাহা সত্য তিনি তাহাই বলিয়াছেন।' তিনি সমুচ্চ, মহান।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদী জনগোষ্ঠীকে বলুন, আল্লাহ্‌র দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে যাদেরকে তোমরা উপাস্য বলে স্থির করেছো, তাদের কাছে তোমাদের প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা জানাও। পরিত্রাণ চাও আপতিত বিপদাপদ থেকে। কিন্তু জানোতো, আকাশ ও পৃথিবীর অণুপরিমাণ কোনোকিছুর উপরেও তাদের কোনো কর্তৃত্ব নেই। অধিকার নেই পিপীলিকা সদৃশ কোনো প্রাণীর মঙ্গলামঙ্গল নির্ধারণের। কারো আর্তি-আকুতি শ্রবণের ক্ষমতা থেকেও তারা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। হে অপরিণামদর্শী ও অজ্ঞ জনতা! ভেবে দ্যাখো, সৃষ্টি কি কখনো স্রষ্টার সমতুল হয়? উপাসক কি কখনো হয় উপাস্যের সমকক্ষ?

আকাশ ও পৃথিবী সতত দৃশ্যমান বলেই এখানে বিশেষ করে করা হয়েছে এ দু'টোর উল্লেখ। অথবা বলা যেতে পারে, তাদের কোনো কোনো উপাস্য আকাশী— যেমন ফেরেশতামণ্ডলী, নক্ষত্রপুঞ্জ। আবার তাদের কোনো কোনো মাবুদ পৃথিবীসম্পৃক্ত। যেমন প্রস্তর অথবা মৃত্তিকাপ্রতিমা। কিংবা বলা যায়, তাদের মঙ্গল-অমঙ্গলের কিছু বাহ্যিক উপকরণ নভজ ও পার্থিব। আর 'মিন জহীর' কথাটির মর্মার্থ এখানে— তোমাদের উপাস্যগুলোর কেউও কোনোটাই আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি ও এতদুভয়ের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে অণুপরিমাণ সহায়তা করার যোগ্যতা রাখে না।

পরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'যাহাকে অনুমতি দেওয়া হয় সে ব্যতীত আল্লাহ্র নিকট কারো শাফায়াত ফলপ্রসূ হবে না।' একথার অর্থ— মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্পাক শাফায়াত করার অনুমতি দিবেন কেবল নবী-রসুল, ফেরেশতা ও আউলিয়াগণকে। আর তাঁরাও শাফায়াত করবেন কেবল বিশ্বাসীদের জন্য। অবিশ্বাসী ও অংশীবাদীদের জন্য নয়। কেননা তাদের শাফায়াত করার অনুমতি তাঁরা পাবেন না।

আলোচ্য বাক্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে শাফায়াতকারী ও শাফায়াতপ্রাপ্তদের যোগ্যতার কথা। অর্থাৎ যারা শাফায়াতপ্রাপ্তির যোগ্য, কেবল তাদেরকে শাফায়াত করবার অনুমতিপ্রাপ্ত হবেন অনুমোদনপ্রাপ্ত শাফায়াতকারীরা। এখানকার 'লাহু' (তার জন্য) কথাটির 'হু' সর্বনামটি শাফায়াতকারীর সঙ্গে সংযোজিত হয়ে থাকতে পারে। আবার সংযোজ্য হতে পারে তার সঙ্গেও, যার জন্য শাফায়াত করা হবে।

পৌত্তলিকেরা বলতো, আমরা জানি, যে সকল ফেরেশতা ও প্রতিমার পূজা আমরা করি, তারা আল্লাহ্র সমকক্ষ নয়। কিন্তু আমরা মনে করি, তাদের পূজা করলে তারা আমাদের জন্য আল্লাহ্সমীপে সুপারিশ করবে। তাদের এমতো অপবচনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

এরপর বলা হয়েছে— 'পরে যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় বিদূরিত হবে তখন তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, তোমাদের প্রতিপালক কী বললেন? তদুত্তরে তারা বলবে, যা সত্য তিনি তা-ই বলেছেন। তিনি সমুচ্চ, মহান'।

এখানকার 'ফুয্যিয়া' শব্দটির ধাতুমূল 'তাফযীয়'। এর অর্থ আতঙ্ক দূরীকরণ। যেমন 'তামরীদ্ব' অর্থ রোগ বিতাড়ন। প্রথম বাক্যে শাফায়াতকারী ও তার যোগ্যতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আলোচ্য বাক্যের 'কুলুবিহীম' (তাদের অন্তর) কথাটির 'তাদের' সর্বনামটি সংযোজ্য হবে শাফায়াতকারী এবং যাদের জন্য শাফায়াত করা হবে উভয়ের সঙ্গে। আর এখানকার 'ভয় বিদূরিত হবে' কথাটি সম্পর্কযুক্ত হবে একটি উহ্য বাক্যের সঙ্গে। পূর্ববর্তী বাক্য দৃষ্টে এটাই অনুমিত হয়। সেখানে বলা হয়েছিলো— শাফায়াতকারী ও শাফায়াতযোগ্য উভয়েই তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে অপেক্ষা করতে থাকবে অনুমতির। একবার হৃদয়ে জাগ্রত হবে আশা, আরেকবার নিরাশা। অথবা বলা যেতে পারে, আল্লাহ্পাকের ঘোষণা শুনে এবং তাঁর প্রবল পরাক্রম প্রত্যক্ষ করে তারা তখন হয়ে পড়বে সংজ্ঞাহীন। আমি বলি, ফেরেশতাগণও আল্লাহ্র আদেশ শুনে ভয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। যেমন হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ যখন আকাশগামী ফেরেশতাদের প্রতি কোনো নির্দেশ ঘোষণা করেন, তখন ভয়ে ও অক্ষমতাবোধে তারা ঝাপটাতে থাকে তাদের ডানা।

তাদের ওই ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ শুনে মনে হয়, যেনো সুবিশাল কোনো প্রস্তরখণ্ডে আছাড় খাচ্ছে লৌহশৃঙ্খল। একসময় ধীরে ধীরে তাদের ভয় দূর হয়ে যায়। তখন তারা একে অপরকে বলে, তোমাদের পালনকর্তা কী বললেন? কেউ জবাব দেয়, তিনি বলেন, তিনি মহাপ্রতাপশালী। সর্বশ্রেষ্ঠ। তাদের সেই কথোপকথন শুনে নেয় আকাশে আড়ি পেতে থাকা শয়তান। তার কাছ থেকে জেনে নেয় তার নিম্নবর্তী শয়তানেরা। এভাবে ওই সংবাদ নেমে আসে ধরাপৃষ্ঠে। সুফিয়ান সওরী তাঁর দুই হাত ঈষৎ তেরসাকারে অঙ্গুলিগুলি স্তরে স্তরে সজ্জিত করে বলতেন, এভাবে শয়তানেরা সজ্জিত হয়ে ক্রমে ক্রমে উঠে যায় আকাশে। সকলের উপরে যারা থাকে, তারা যা শুনতে পায় তা তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দেয় তার নিম্নবর্তীকে। সে জানিয়ে দেয় তার নিচের শয়তানকে। প্রাপ্ত সংবাদ পৃথিবীতে পৌঁছে যায় এভাবেই। তারপর তা জানানো হয় জ্যোতিষীদেরকে। জ্যোতিষীরা এর সঙ্গে মিথ্যার প্রলেপ লাগিয়ে তা প্রচার করে ভবিষ্যদ্বাণীরূপে। কখনো কখনো সংবাদ নিচে নেমে আসার আগেই শয়তানেরা আক্রান্ত হয় ফেরেশতাদের ছুঁড়ে মারা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড দ্বারা। ফলে তারা কেউ হয় ভস্মীভূত, কেউ আহত।

হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে জনৈক আনসারী থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, এক দীর্ঘ হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন,আমাদের মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ যখন কোনো নির্দেশ জারী করেন, তখন আরশবহনকারী ফেরেশতারা বর্ণনা করে তাঁর প্রশংসা ও মহিমা। সেই প্রশংসা ও মহিমার প্রতিধ্বনি উচ্চারিত হয় নিকটবর্তী আকাশের ফেরেশতাদের কণ্ঠেও। এর মধ্যে ঘোষিত নির্দেশটি পৌঁছে যায় পৃথিবীর নিকটতম আকাশের ফেরেশতাদের কাছে। তারাও সশ্রদ্ধ স্তব-স্তুতি বর্ণনার মধ্যে দিয়ে সম্মান জানায় মহিমময় নির্দেশটির প্রতি। আরশবাহী ফেরশতাদের সন্নিকটবর্তী ফেরেশতারা তখন বলে, আপনাদের পালনকর্তা কী নির্দেশ ঘোষণা করলেন? আকাশবাহী ফেরেশতারা তখন জানিয়ে দেয় ঘোষিত নির্দেশের সবিস্তার বিবরণ। এভাবে উপরের ও নিচের আকাশের ফেরেশতাদের আলাপচারিতার মাধ্যমে আল্লাহ্প্রদত্ত নির্দেশটি অবতীর্ণ হতে থাকে। আড়ি পেতে থাকা শয়তান তার কিছু কিছু শুনতে পায় এবং তা পৌঁছে দেয় নিম্নবর্তী শয়তানদের কাছে। এভাবে পৃথিবীস্থিত শয়তানের কাছে নেমে আসে ওই সংবাদ। আড়ি পাতা শয়তান ফেরেশেতাদের দৃষ্টিগোচর হলে তারা তার দিকে ছুঁড়ে মারে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিপিণ্ড। ফলে জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায় সে। আর তারা দেখতে না পেলে শয়তান রক্ষা পায় এবং প্রাপ্ত সংবাদ শেষ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে জ্যোতিষী ও যাদুকরদের কাছে। আবার তারা ওই সংবাদ কিছু কিছু মিথ্যাসহ ফলাও করে প্রচার করে জনসমক্ষে।

হজরত নাওয়াস ইবনে সামআন সূত্রে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ যা অভিপ্রায় করেন, তা ব্যক্ত করেন প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। তা শুনে প্রকম্পিত হয় আকাশ। আর আকাশবাসীরা সেজদায় লুটিয়ে পড়ে হয়ে যায় সংজ্ঞাহীন। সংজ্ঞা ফিরে পাওয়ার পর সর্বপ্রথম মস্তক উত্তোলন করেন জিবরাইল। আল্লাহ্ তাঁর সঙ্গে কথোপকথন শুরু করেন প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। এরপর জিবরাইল যখন ফেরেশতাদের কাছে ফিরে আসেন, তখন তারা বলে, আমাদের মহামহিম প্রভুপালক কী বিধান অবতীর্ণ করলেন? জিবরাইল বলেন, তিনি যা কিছু বলেন, তা-ই সত্য। তিনি সমুচ্চ, তিনি মহান। ফেরেশতারাও তখন সমস্বরে বলে ওঠে একই কথা। পরিশেষে জিবরাইল যথাস্থানে পৌঁছে দেন ওই প্রত্যাদেশ।

'ক্বলু' অর্থ বলে। অর্থাৎ শাফায়াতের অনুমতি লাভের প্রাক্কালে উদ্ভূত শংকা দূর হলে তারা বলে। 'মাজা ক্বলা রব্বুকুম' অর্থ তোমাদের প্রভুপালনকর্তা কী বললেন। এরপরের 'ক্বলু' অর্থ তারা একে অপরকে লক্ষ্য করে বলে। 'আলহাক্ব' অর্থ সত্য, মহাসত্য। 'আল আ'লীয়ুল কাবীর' অর্থ সমুচ্চ, মহান। অর্থাৎ এমন সমুচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ যে, তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে তখন কোনো নবী অথবা ফেরেশতা তাঁর উদ্দেশ্যে কথা বলতে সাহস পাবে না।

বাগবী লিখেছেন, মহাপ্রলয়ের ভয়ে ফেরেশতারাও আতংকিত হয়। মুকাতিল, সুদ্দী ও কালাবী বলেছেন, হজরত ঈসা ও রসুল স. এর মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান ছিলো ৫৫০ বৎসর। মতান্তরে ৬০০ বৎসর। ওই সময়টা ছিলো প্রত্যাদেশশূন্য। ওই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ফেরেশতারা কোনো প্রত্যাদেশ শুনতে পায়নি। শুনতে পেলো তখন, যখন এ নশ্বর ধরাধামে মহাআবির্ভাব ঘটলো শেষ পয়গম্বর মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর। কিন্তু তখনকার প্রথম প্রত্যাদেশ শুনেই তটস্থ হলো ফেরেশতারা। তারা ধারনা করলো, নিশ্চয় কিয়ামত অত্যাসন্ন। কারণ তারা জানতো শেষ রসুল স. এর মহাআবির্ভাব মহাপ্রলয়ের একটি পূর্বাভাষ। তাই প্রত্যাদেশ শোনার সঙ্গে সঙ্গে তারা ভয়ে আতংকে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললো। জিবরাইল প্রত্যাদেশ নিয়ে অবতীর্ণ হতে লাগলেন পৃথিবীতে। পথিমধ্যে বিভিন্ন আকাশের সংজ্ঞা ফিরে পাওয়া ফেরেশতারা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, তোমাদের প্রভুপালনকর্তা কী বললেন? কেউ কেউ বললো, তিনি যা প্রত্যাদেশ করেছেন, তা সত্য। মহাসত্য।

একটি সন্দেহ ঃ মুকাতিল, কালাবী প্রমুখের অভিমতানুসারে আলোচ্য বাক্য পূর্ববর্তী বাক্যের সঙ্গে বক্তব্যগত দিক থেকে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু তা কী করে সম্ভব! আগের বাক্যটির প্রসঙ্গ শাফায়াত এবং পরবর্তী বাক্য প্রত্যাদেশসম্পর্কীয়।

সন্দেহের নিরসন ঃ উদ্ভূত জটিলতা নিরসনার্থে বলা যেতে পারে যে, ইতোপূর্বে আলোচিত 'যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা জানে যে, তোমার

প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা সত্য; এটা পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ করে' (আয়াত ৬)। এই আয়াতে 'যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে' বলে বুঝানো হয়েছে ফেরেশতামণ্ডলীকে। এরপর থেকে এ পর্যন্ত উপস্থাপিত আয়াতগুলো ভিন্ন প্রসঙ্গের। সুতরাং এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে গ্রন্থ আপনাকে দেওয়া হয়েছে, তা সত্য। একারণেই এর অবতরণকালে ফেরেশতারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়। কেননা তারা জানে কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত কিয়ামতের বিষয়টি। এক সময় তাদের আতঙ্কভাব স্তিমিত হয়, তখন তারা পরস্পর পরস্পরকে বলে, তোমাদের মহান প্রভুপ্রতিপালক কী বললেন? তাদের একদল জবাব দেয়, তিনি অবতীর্ণ করেন মহাসত্য। তিনি মহামহিমময়, মহামর্যাদাশালী।

কোরআন ব্যাখ্যাতাগণের একটি দলের অভিমত এই যে, আলোচ্য আয়াতে দেওয়া হয়েছে পৌত্তলিকদের অবস্থার বিবরণ। হাসান ও ইবনে জায়েদ বলেছেন, মৃত্যুকালে পৌত্তলিকেরা আপতিত হয় মহাআতঙ্কে। কিন্তু তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের লক্ষ্যে কিছুক্ষণের জন্য তাদের আতংক দূর করে দেওয়া হয়। বলা হয়, তোমাদের প্রভুপ্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাঁর নবী-রসুলগণের মাধ্যমে যা প্রেরণ করা হয়েছে, তাতে কী বলা হয়েছে? তারা বলে, তাঁরা যা বলেছেন, তা সত্য। কিন্তু তখন অতিক্রান্ত হয় তওবার সময়। তাই তাদের এমতো স্বীকৃতি আল্লাহ্ কর্তৃক আর গৃহীত হয় না।

আমি বলি, এমতো ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হলে স্বীকার করতে হবে, আলোচ্য আয়াতের যোগসূত্র রয়েছে 'হুয়া মিনহা ফী শাককিন' আয়াতের সঙ্গে। অর্থাৎ অংশীবাদীরা সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান থাকে সারা জীবন। তাদের ওই সন্দেহ দূর হয়ে যায় মৃত্যুর পর। তখন অর্জিত হয় তাদের চাক্ষুষ প্রতীতি। কিন্তু তখনকার এমতো স্বীকৃতি বৃথা।

সূরা সাবা ঃ আয়াত ২৪, ২৫, ২৬

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۭ قُلِ اللّٰهُ ۙ وَ اِنَّآ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝٢٤ قُلْ لَّا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّآ اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝٢٥ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ۭ وَ هُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ۝٢٦

r বল, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী হইতে কে তোমাদিগকে রিজিক দান করেন?' বল, 'আল্লাহ্। হয় আমরা না হয় তোমরা সৎপথে স্থিত অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত।'

r বল, 'আমাদের অপরাধের জন্য তোমাদিগকে জবাবদিহি করিতে হইবে না এবং তোমরা যাহা কর সে সম্পর্কে আমাদিগকেও জবাবদিহি করিতে হইবে না।'

r বল, 'আমাদের প্রতিপালক আমাদের সকলকে একত্র করিবেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করিয়া দিবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী, সর্বজ্ঞ।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বলো, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী থেকে কে তোমাদেরকে রিজিক দান করেন? বলো, আল্লাহ্'।

এখানকার প্রশ্নটি স্বীকৃতিমূলক। অর্থাৎ প্রশ্নের মাধ্যমে সম্বোধিত জনকে উৎসাহিত করাই এখানে উদ্দেশ্য, যেনো সম্বোধিতরা নির্দ্বিধায় একথা মেনে নেয় যে, আল্লাহ্ই সকলের একক ও সমকক্ষহীন জীবনোপকরণপ্রদাতা, প্রভুপালনকর্তা। ২২ সংখ্যক আয়াতের সঙ্গে এই আয়াতের রয়েছে বক্তব্যগত সংযোগসূত্র। অর্থাৎ অংশীবাদীদের পূজ্যপ্রতিমাগুলো অণুপরিমাণ কোনোকিছুর মালিক নয়, সুতরাং জীবিকাপ্রদাতা তো তারা হতেই পারে না— একথাটিই স্পষ্ট করা হয়েছে আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে। এখানে আল্লাহ্তায়ালা প্রশ্নের অবতারণা করে নিজেই আবার তার জবাব দিয়েছেন। যেনো বক্তব্যটি এরকম— হে আমার রসুল! অংশীবাদীদের অপধারণার প্রেক্ষিতে আপনি জানিয়ে দিন, তোমাদের জীবিকাপ্রদাতা কিন্তু আল্লাহ্ই। অন্য কেউ নয়। সুতরাং আল্লাহ্কে ছেড়ে অন্যের উপাসনা তোমরা করবে কেনো? আর আকাশ-পৃথিবী থেকে তোমাদেরকে জীবিকা দান করেন কে — এরকম প্রশ্নের জবাব জানা থাকা সত্ত্বেও অংশীবাদীরা নিশ্চুপ থাকতে পারে। তাই হে আমার রসুল! প্রকৃত জবাবটি আপনিই নিজ মুখে তাদেরকে জানিয়ে দিন। বলুন, 'আল্লাহ্'।

এরপর বলা হয়েছে— 'হয় আমরা, না হয় তোমরা সৎপথে স্থিত অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে একথাও বলুন, আমরা একত্ববাদী, আর তোমরা অংশীবাদী। আমাদের বিশ্বাস পরস্পরবিরোধী। এমতাবস্থায় এরকম তো হতে পারে না যে, আমাদের উভয়েই সঠিক অথবা উভয়েই বেঠিক। বরং এরকমই অনিবার্য যে, আমাদের কোনো একটি দল সৎপথপ্রাপ্ত এবং অন্য দল পথভ্রষ্ট। আমরা কেবল আল্লাহ্কেই জীবিকাদাতা বলে মানি এবং উপাসনা করি কেবল তাঁর। তোমরাও তাঁকে জীবিকাপ্রদাতা বলে হয়তো জানো, কিন্তু উপাসনা করো অন্যের। সুতরাং যুক্তির মাপকাঠিতে কে পথপ্রাপ্ত এবং কে পথচ্যুত, তা কি আর অননুমেয় থাকে?

পরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'বলো, আমাদের অপরাধের জন্য তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে না এবং তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আমাদেরকেও জবাবদিহি করতে হবে না।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদীদেরকে বিষয়টি এভাবে বোঝাতে চেষ্টা করুন যে, হে মক্কার জনগোষ্ঠী! আমাদের বিশ্বাসে ও কর্মে বিঘ্ন উপস্থিত কোরো না। তোমাদের দৃষ্টিতে আমরা যদি ধর্মীয় বিষয়ে অপরাধ করেই থাকি, তবে সে অপরাধের জন্য তো তোমরা দায়ী হবে না। আবার তোমাদের বিশ্বাস ও কর্মে তোমরা যা করে থাকো, সে ব্যাপারে আমরাও অভিযুক্ত হবো না। প্রত্যেকেই ভোগ করবে তার আপনাপন কৃতকর্মের ফল।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'বলো, আমাদের প্রতিপালক আমাদের সকলকে একত্র করবেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করে দিবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী, সর্বজ্ঞ'।

এখানে 'ইয়াফতাহু' অর্থ ফয়সালা করবেন, দ্বন্দ্ব দূর করবেন সঠিক সিদ্ধান্ত প্রয়োগের মাধ্যমে। সত্যানুসারীদেরকে করবেন পুরস্কৃত এবং তিরস্কৃত করবেন অসত্যানুগামীদেরকে।

'আলফাত্তাহ' অর্থ ফয়সালাপ্রদানকারী, মীমাংসাকারী, বিচারক, মহাবিচারক, যিনি সমাধান দেন জটিল, দুর্বোধ্য ও অমীমাংসিত বিষয়ে। আর 'আলআ'লীম' অর্থ সর্বজ্ঞ। অর্থাৎ কখন কাদের মধ্যে কোন বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করতে হবে, সে ব্যাপারে নির্ভুল ও প্রাজ্ঞ। কেননা তাঁর জ্ঞান সর্বত্রগামী।

উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতত্রয়ের প্রথমটিতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সমালোচনা করা হয়েছে। পরেরটিতে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে কল্যাণকামনা দ্বারা। আর শেষোক্তটিতে দেওয়া হয়েছে প্রচ্ছন্ন হুমকি। স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে, পৃথিবীতে যে যা-ই করুক না কেনো, একদিন এ পৃথিবী পরিত্যাগ করতেই হবে সকলকে। জবাবদিহির জন্য দাঁড়াতে হবে আল্লাহ্ সকাশে। তখন তিনি পথপ্রাপ্ত ও পথচ্যুতদের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। কারণ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিবেন তিনিই। যেহেতু তিনি সর্বজ্ঞও।

সূরা সাবা ঃ আয়াত ২৭, ২৮, ২৯, ৩০

قُلْ اَرُوْنِيَ الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَآءَ كَلَّا ؕ بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٧﴾ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ

بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨﴾ وَ
يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٩﴾ قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ
يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٣٠﴾

r বল, 'তোমরা আমাকে দেখাও যাহাদিগকে শরীকরূপে তাঁহার সহিত জুড়িয়া দিয়াছ তাহাদিগকে। না, কখনও না, বরং তিনি আল্লাহ্, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

r আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

r তাহারা জিজ্ঞাসা করে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হইবে?'

r বল, 'তোমাদের জন্য আছে এক নির্ধারিত দিবস, যাহা তোমরা মুহূর্তকাল বিলম্বিত করিতে পারিবে না, আর ত্বরান্বিতও করিতে পারিবে না'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা আমাকে দেখাও যাদেরকে শরীকরূপে তাঁর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছো তাদেরকে'। এখানে 'আরূনী' অর্থ আমাকে দেখাও। মর্মার্থ— আমাকে বলে দাও। 'ইলহাক্ব' অর্থ জুড়ে দেওয়া, মিলিয়ে দেওয়া। মর্মার্থ— কোন যোগ্যতার মাপকাঠিতে তোমরা তোমাদের অলীক উপাস্যগুলোকে আল্লাহ্‌র সমান্তরালে স্থাপন করেছো? তারা কি কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে? কারো কল্যাণ কিংবা অকল্যাণ করবার সামর্থ্য কি তাদের আছে? ক্ষমতা কি আছে কাউকে জীবনোপকরণ প্রদানের? যদি এসকল যোগ্যতা তোমরা তাদের মধ্যে না-ই পাও, তবে কী করে তাদেরকে তোমরা আল্লাহ্‌র সমকক্ষ মনে করতে পারো?

এরপর বলা হয়েছে— 'না, কখনো নয়'। একথার অর্থ— হে মুশরিকেরা শোনো। সৃজন, কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ধারণ, জীবনোপকরণপ্রদান— এসকল কোনো একটি গুণও যখন তোমাদের পূজিত প্রতিমাগুলোর নেই, তখন নিশ্চিত জেনো, কখনোই তারা আল্লাহ্‌র সমকক্ষ অথবা অংশীদার নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'বরং তিনি আল্লাহ্; পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'। একথার অর্থ— অন্য কেউ বা কোনোকিছু নয়, কেবল আল্লাহ্ই আনুরূপ্যবিহীনভাবে মহাপ্রতিপত্তিশালী ও বিজ্ঞ। সুতরাং হে অংশীবাদীরা! এই মুহূর্তে অংশীবাদ পরিত্যাগ করো। উপাস্য হিসেবে চিরদিনের জন্য গ্রহণ করো এক আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের আশ্রয়।

পরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি'।

এখানকার 'কাফ্ফাহ্' শব্দটি একটি অনুক্ত বিশেষণের বিশেষণ। যেনো বলা হয়েছে— আপনার প্রেরণ সমগ্র মানবজাতির জন্য। এখানে 'কাফযাহ্' শব্দটি ব্যতিক্রমবিহীন সাধারণার্থক। তাই এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়াবে— সমগ্র মানবজাতির জন্য আপনার রেসালাত সাধারণ। কেউই আপনার রেসালাতের বাইরে নয়। আবার এরকমও হতে পারে যে, 'কাফ্ফাহ্' এখানে আধিক্য প্রকাশক। অর্থাৎ এখানকার বক্তব্যটি হবে— একমাত্র আপনিই গোটা মানব সম্প্রদায়কে আপনার রেসালতের বলয়ে একত্র করতে সক্ষম।

হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমাকে পাঁচটি বিষয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হয়েছে। আমার পূর্বে আর কাউকে এই বৈশিষ্ট্যসমূহ দেওয়া হয়নি। সেগুলো হচ্ছে— ১. এক মাসের দূরত্বে অবস্থানকারী শত্রুও আমার ভয়ে ভীত হয়, ২. আমার জন্য সারা পৃথিবীর যে কোনো স্থান মসজিদ, তাই যে কোনো স্থানে তোমরা নামাজ আদায় করতে পারো এবং পানির অভাবে যে কোনো স্থানের মাটি দিয়ে করতে পারো তায়াম্মুম, ৩. আমার জন্যই হালাল করে দেওয়া হয়েছে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, ৪. আমাকে দেওয়া হয়েছে শাফায়াতের অধিকার এবং ৫. পূর্ববর্তী নবীগণ প্রেরিত হয়েছিলেন বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীর পথপ্রদর্শনার্থে। কিন্তু আমি প্রেরিত হয়েছি সমগ্র মানবজাতির জন্য। বোখারী, মসুলিম।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমাকে দেওয়া হয়েছে এমন ছয়টি বিশেষত্ব, যা অন্য কোনো নবীকে দেওয়া হয়নি। যেমন— ১. অল্প কথায় গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত ভাব প্রকাশ করবার ক্ষমতা ২. আমার সম্পর্কে আমার শত্রুদের অন্তরে সৃষ্টি করা হয়েছে প্রচণ্ড ভীতি ৩. আমার জন্য বৈধ করা হয়েছে সমরলব্ধ সম্পদ ৪. পৃথিবীর সকল স্থানের মৃত্তিকাকে করা হয়েছে আমার জন্য নামাজ পাঠের উপযোগী ও সকল স্থানের মাটি উপযোগী করা হয়েছে তায়াম্মুমের ৫. বিশ্বমানবতার পথপ্রদর্শনার্থে আমি প্রেরিত এবং ৬. আমার মাধ্যমেই সমাপ্ত হয়েছে প্রবহমান নবুয়ত।

আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ এরকমও হতে পারে যে— আমি তো আপনাকে প্রেরণ করেছি প্রতিরোধকারীরূপে। তাইতো আপনি ইহজগতে ভ্রষ্টপথানুগামী-দেরকে প্রতিহত করেন পথভ্রষ্টতা থেকে। আবার পরজগতে তাদের প্রতিবন্ধক হবেন নরকগমনের। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমার দৃষ্টান্ত এরকম ঃ এক লোক অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করলো। তার আলো যখন ছড়িয়ে পড়লো, তখন চতুর্দিক থেকে এসে ওই আগুনে ঝাঁপিয়ে

পড়তে লাগলো কীটপতঙ্গের দল। লোকটিও প্রাণপনে তাদেরকে প্রতিহত করেই চললো। আমিও তেমনি তোমাদেরকে কটিদেশ আঁকড়ে ধরে বাঁচাতে চেষ্টা করছি, আর তোমরা বার বার ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছো নরকানলে। বোখারী, মুসলিম।

'কাফফাহ্' শব্দটি এখানে 'আন্নাস' (মানবজাতি) এর অবস্থা প্রকাশক। গুরুত্ব প্রকাশের জন্য এখানে অবস্থাপ্রকাশক শব্দটিকে উল্লেখ করা হয়েছে আগে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির পথপ্রদর্শনার্থে প্রেরণ করেছি। সুতরাং পৃথিবীর সকল বর্ণের ও সকল গোত্রের ও সকল দেশের মানুষ— আপনার ধর্মপ্রচারের বৃত্তভূত। অবশ্য অধিকাংশ ব্যাকরণবেত্তা এরকম বাক্যবিন্যাসের সমর্থক নন।

এখানে 'বাশীরা' অর্থ জান্নাতের সুসংবাদদাতা। আর 'নাজীরা' অর্থ নরকের ভীতি প্রদর্শনকারী।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না'। একথার অর্থ—আপনি যে সমগ্র মানবতার পথপ্রদর্শক ও তাদের কল্যাণকামী, একথা অধিকাংশ লোক জানে না। তাই অনেকে মনে করে আপনি তাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করে চলেছেন।

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'তারা জিজ্ঞেস করে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বলো, এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে'? একথার অর্থ— মক্কার মুশরিকেরা রসুল স. ও তাঁর সহচরবৃন্দকে প্রত্যাখ্যানের উদ্দেশ্যে উপহাস ছলে বলে, তোমরা বলো, তোমাদের কথা না মানলে আমাদের উপরে আপতিত হবে শাস্তি। কিন্তু কই, শাস্তি-টাস্তি কোনোকিছুরই তো দেখা সাক্ষাত নেই। তাহলে কীভাবে আমরা তোমাদেরকে সত্যবাদী বলে মানি। সত্যবাদীই যদি তোমরা হও, তবে বলো, কখন অবতীর্ণ হবে তথাকথিত শাস্তি।

এরপরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'বলো, তোমাদের জন্য আছে এক নির্ধারিত দিবস, যা তোমরা মুহূর্তকাল বিলম্বিত করতে পারবে না। আর ত্বরান্বিতও করতে পারবে না'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! তাদের দম্ভোক্তির জবাবে আপনি বলুন, তোমাদের জন্য শাস্তির সময় সুনির্ধারিত। ওই সুনির্ধারিত সময়কে তোমরা মুহূর্তকাল অগ্রপশ্চাত করতে পারবে না। যথাসময়ে যথোপযুক্ত শাস্তি তোমরা পাবেই।

এখানে 'মীআ'দু ইয়াওমিন' অর্থ প্রতিশ্রুত দিবস বা সময়। আর 'দিবস' অর্থ এখানে মহাপ্রলয় দিবস, অথবা মহাবিচারের দিবস। আর 'নির্ধারিত দিবস বিলম্বিত অথবা ত্বরান্বিত করতে পারবে না' অর্থ তোমাদের আয়ুষ্কাল সুনির্দিষ্ট।

সুতরাং তোমরা তোমাদের আয়ুর প্রলম্বায়ন অথবা ত্বরায়ণ কোনোটাই করতে পারবে না। উল্লেখ্য, অংশীবাদীদের প্রশ্নটি ছিলো দাম্ভিকতাদুষ্ট ও ব্যঙ্গাত্মক। তাই তার জবাবও দেওয়া হয়েছে হুমকির মাধ্যমে।

সূরা সাবা ঃ আয়াত ৩১, ৩২, ৩৩

وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِيْ بَيْنَ
يَدَيْهِ ؕ وَلَوْ تَرٰۤى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚۖ يَرْجِعُ
بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ ِۨالْقَوْلَ ۚ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ
اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَاۤ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ﴿۳۱﴾ قَالَ الَّذِيْنَ
اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْۤا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى
بَعْدَ اِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ﴿۳۲﴾ وَ قَالَ الَّذِيْنَ
اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ اِذْ
تَاْمُرُوْنَنَاۤ اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَ نَجْعَلَ لَهٗۤ اَنْدَادًا ؕ وَ اَسَرُّوا النَّدَامَةَ
لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ؕ وَ جَعَلْنَا الْاَغْلٰلَ فِيْۤ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ هَلْ
يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۳۳﴾

r কাফিরগণ বলে, 'আমরা এই কুরআনে কখনও বিশ্বাস করিব না, ইহার পূর্ববর্তী কিতাবসমুহেও নহে।' হায়! তুমি যদি দেখিতে যালিমদিগকে যখন তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হইবে তখন উহারা পরস্পর বাদ-প্রতিবাদ করিতে থাকিবে, যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইত তাহারা ক্ষমতাদর্পীদিগকে বলিবে, 'তোমরা না থাকিলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হইতাম।'

r যাহারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তাহারা, যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইত তাহাদিগকে বলিবে, 'তোমাদের নিকট সৎপথের দিশা আসিবার পর আমরা কি তোমাদিগকে উহা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলাম? বস্তুত তোমরাই তো ছিলে অপরাধী।'

r যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইত তাহারা ক্ষমতাদর্পীদিগকে বলিবে, 'প্রকৃতপক্ষে তোমরাই তো দিবারাত্র চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, আমাদিগকে নির্দেশ দিয়াছিলে যেন আমরা আল্লাহ্‌কে অমান্য করি এবং তাঁহার শরীক স্থাপন করি।' যখন তাহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন তাহারা অনুতাপ গোপন রাখিবে এবং আমি কাফিরদের গলদেশে শৃংখল পরাইব। উহাদিগকে উহারা যাহা করিত তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে।

অংশীবাদীরা একবার গ্রন্থধারী (ইহুদী, খৃষ্টান)দেরকে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কি মনে করো মোহাম্মদ সত্য সত্যই নবী? গ্রন্থধারীরা বললো, হ্যাঁ। তাঁর কথা লেখা আছে আমাদের তওরাত ও ইঞ্জিলে। একথা শুনে রোষতপ্ত অংশীবাদীরা যা বলেছিলো সে কথাই উল্লেখ করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথমোক্তটির প্রথমাংশে এভাবে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, আমরা কোরআনকে যেমন বিশ্বাস করবো না, তেমনি বিশ্বাস করবো না পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহকেও।

এরকমও হতে পারে যে— এখানে 'আললাজী বাইনা ইয়াদাইহ্' অর্থ রসুল স. এর পুতঃপবিত্র ব্যক্তিত্ব। এক বিবৃতিতে এমনও বলা হয়েছে যে, কথাটির অর্থ মহাবিচার দিবস, স্বর্গ ও নরক।

এরপর বলা হয়েছে— 'হায়! তুমি যদি দেখতে, জালেমদেরকে যখন তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হবে তখন তারা পরস্পর বাদ-প্রতিবাদ করতে থাকবে। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তারা বলবে, তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হতাম'।

এখানে 'লাও তারা' (তুমি যদি দেখতে) বলে বুঝানো হয়েছে রসুল স.কে। অথবা কথাটি সাধারণার্থক। অর্থাৎ যে কেউ যদি দেখতো। 'ইয়ারজিউ' অর্থ পরস্পর বাদ-প্রতিবাদ করতে থাকবে। একে অপরের বিরুদ্ধে হবে প্রতিবাদমুখর। অংশীবাদী জনগোষ্ঠীর ব্রাত্যজনেরা তাদের সমাজের কুলীনদেরকে বলবে, তোমরা না থাকলে আমরা তখন অবশ্যই হতে পারতাম বিশ্বাসবান।

পরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'যারা ক্ষমতাদর্পী ছিলো তারা, যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তাদেরকে বলবে, তোমাদের নিকট সৎপথের দিশা আসবার পর আমরা কি তোমাদেরকে তা থেকে নিবৃত্ত করেছিলাম? বস্তুতঃ তোমরাই তো ছিলে অপরাধী'।

এখানে 'আল্লাজীনা তুদ্বয়ী'ফু' বলে বুঝানো হয়েছে সাধারণ জনতাকে, যারা তাদের সমাজপতিদের অনুসারী হয়। আর 'আল্লাজীনাস্ তাক্‌বারু' বলে বুঝানো হয়েছে প্রভাবশালী সমাজপতিদেরকে, যারা গণ্য হয় অভিজাত বলে। 'আ নাহনু সদাদ্‌নাকুম' অর্থ আমরা কি তোমাদেরকে নিবৃত্ত করেছিলাম? প্রশ্নটি এখানে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ দাঁড়ায়— আমরা তো তোমাদেরকে

সত্যপথ গ্রহণ করতে বাধা দেইনি। তোমরাই তো স্বেচ্ছায় হয়ে গিয়েছিলে সত্যবিমুখ। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে প্রকাশিত বক্তব্যের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের সাধারণ জনতা সত্য-মিথ্যার বিষয়টিকে যাচাই করে দেখে না। ইচ্ছাকৃতভাবে অন্ধ অনুসরণ করে তাদের নেতাদের। পরিত্যাগ করে নবী-রসুলগণের বিশুদ্ধপথ।

এরপরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে, প্রকৃতপক্ষে তোমরাই তো দিবারাত্রি চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে'। একথার অর্থ— অংশীবাদী জনতা তাদের প্রতাপশালী নেতাদেরকে বলবে, একথা ঠিক যে, তোমরা বলপ্রয়োগ করে আমাদেরকে সত্যবিমুখ করোনি। কিন্তু তোমরা ছিলে চক্রান্তপ্রবণ। চক্রান্তের জালে কীভাবে আমাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা যায়— এটাই ছিলো তোমাদের সার্বক্ষণিক পরিকল্পনা। আমাদের পক্ষে সে কঠিন চক্রান্তের জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা সহজ ছিলো না। বিদ্বজ্জন বলেছেন, এখানে দিবারাত্রির চক্রান্ত অর্থ— কালচক্রের প্রতারণা, প্রলম্বিত আশার ছলনা, সুদীর্ঘ ও নিরাপদ জীবনের লালসা।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেনো আমরা আল্লাহ্কে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক স্থাপন করি'। একথার অর্থ— তোমরা আমাদেরকে সবসময় পরামর্শ দিতে, আমরা যেনো আল্লাহ্কে অস্বীকার করি এবং স্থির করি তাঁর সমকক্ষ।

এখানে 'আন নাকফুরা' (যেনো আমরা অমান্য করি) কথাটির 'আন্' (যেনো) অব্যয়টি ব্যাখ্যামূলক, অথবা ধাতুমূল। এর অন্তে একটি যের প্রদায়ক 'রা' ধরে নিতে হবে।

এরপর বলা হয়েছে— 'যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে এবং আমি কাফেরদের গলদেশে শৃঙ্খল পরাবো। তাদেরকে তারা যা করতো, তার প্রতিফল দেওয়া হবে'। একথার অর্থ— তাদের ইতর ও অভিজাত শ্রেণী উভয়ে যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা পথভ্রষ্ট করা এবং পথভ্রষ্ট হওয়ার আপেক্ষকে গোপন রাখবে, যেনো একে অপরকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারে। অথবা বলা যায়, এখানে, আসাররু' (তারা গোপন করবে) শব্দটির 'আ' বর্ণটি ধাত্যর্থ বিলোপক। যেমন বলা হয় 'আশকাইতুহু' (আমি বিলুপ্ত করেছি তার অভিযোগ)। সেক্ষেত্রে 'আসাররু' শব্দটির মর্মার্থ দাঁড়াবে 'আজহারু'। অর্থাৎ গোপনীয়তা বিলুপ্ত হয়ে তখন প্রকাশ হয়ে পড়বে তাদের অনুতাপ।

এখানে 'আললাজীনা কাফারু' (যারা কুফরি করেছে) না বলে কেবল 'তাদের' সর্বনামটি ব্যবহার করলেই যথেষ্ট হতো। অর্থাৎ বলা যেতো 'তাদের গলদেশে'

কিন্তু তৎসত্ত্বেও 'কাফারু' ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদের অপপরিণতির সংবাদটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যে, তাদের কণ্ঠদেশকে তখন শৃঙ্খলিত করা হবেই।

আবু রযীন সূত্রে সুফিয়ান আসেমের মাধ্যমে ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, মক্কাবাসী দু'জন লোক ছিলো পরস্পরের বন্ধুস্থানীয়। এক সময় তাদের একজন চলে গেলো সিরিয়ায়। সেখানেই বসবাস করতে শুরু করলো সে। এরপর যখন রসুল স. নবুয়তের দায়িত্ব লাভ করলেন, তখন তাঁর সম্পর্কে মক্কাবাসী বন্ধু লিখে জানালো তার প্রবাসী বন্ধুকে। প্রত্যুত্তর এলো, তার নবুয়তের সামাজিক প্রতিক্রিয়ার কথা লিখে জানাও। সে জবাব দিলো— কুরায়েশ গোত্রের দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা তাঁর আনুগামী। জবাব পাঠ করে সে তৎক্ষণাৎ ফিরে এলো মক্কায়। বন্ধুকে বললো, আমাকে নবুয়তের দাবিদার লোকটির কাছে নিয়ে চলো। সে জানতো নবী-রসুলগণের অনুসারীরা সাধারণতঃ দরিদ্র শ্রেণীরই হয়। সে তার বন্ধুর সঙ্গে রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হলো। বললো, আপনি কিসের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানান? রসুল স. বললেন, অমুক অমুক নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাসমূহের প্রতি। সে বলে উঠলো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি সত্যি সত্যিই আল্লাহ্‌র রসুল। রসুল স. বললেন, কী করে বুঝলে? সে বললো, নবীগণের প্রাথমিক অনুসারীরা আসে সমাজের অবহেলিত শ্রেণী থেকে। এঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত।

সূরা সাবা ঃ আয়াত ৩৪, ৩৫, ৩৬

وَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٤﴾ وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ۙ وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿٣٥﴾ قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

r যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করিয়াছি উহার বিত্তশালী অধিবাসীরা বলিয়াছে, 'তোমরা যাহা সহ প্রেরিত হইয়াছ আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করি।'

r উহারা আরও বলিত, 'আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধিশালী; সুতরাং আমাদিগকে কিছুতেই শাস্তি দেওয়া হইবে না।'

r বল, 'আমার প্রতিপালক যাহার প্রতি ইচ্ছা তাহার রিয্ক বর্ধিত করেন অথবা সীমিত করেন; কিন্তু অধিকাংশ লোকই ইহা জানে না।'

আলোচ্য আয়াতত্রয় অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. ওই লোকটিকে ডেকে আনলেন। বললেন, দ্যাখো, তুমি যেমন বলেছো, তেমনভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ্‌র আয়াত। প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে—আমি যখনই কোনো জনপদে নবী-রসুল প্রেরণ করি, তখনই দ্যাখা যায় ওই জনপদবাসীদের বিত্তপতিরা তা প্রত্যাখ্যান করে বসেছে। বলেছে, তোমরা যে নবুয়তের দাবি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছো, আমরা তা অস্বীকার করি।

এখানে 'মুতরাফীন' অর্থ সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে দিনাতিপাতকারী, বিত্তশালী। বিত্তশালীরা সাধারণতঃ ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে। বিত্তহীনদের প্রতি প্রদর্শন করে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য। তারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করলে সে প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে তাই জড়িত থাকে উপহাস ও আত্মম্ভরিতা। বলে, আমরাই আল্লাহ্‌র অধিক প্রিয়। নাহলে তিনি আমাদেরকে এতো ধনসম্পদ দান করতেন না।

পরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— 'তারা আরো বলতো, আমরা ধনে জনে সমৃদ্ধিশালী; সুতরাং আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেওয়া হবে না'। একথার অর্থ— ওই সকল বিত্তশালীরা একথাও বলতো যে, আমরা সম্পদে-স্বজনে সমৃদ্ধ। আল্লাহ্‌ই এই সমৃদ্ধি আমাদেরকে দিয়েছেন। তাই আমরা মনে করি, ইহকালে আমরা যেমন সম্মানিত, তেমনি সম্মানিত হবো পরকালেও।

এরপরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— 'বলো, আমার প্রতিপালক যার প্রতি ইচ্ছা তার রিজিক বর্ধিত করেন অথবা সীমিত করেন'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি জনতাকে জানিয়ে দিন, এই পৃথিবী হচ্ছে পরীক্ষাগার। আল্লাহ্ এখানে মানুষকে পরীক্ষা করেন সম্পদ, সুস্থতা, স্বজন ও সম্মান দিয়ে। আবার কাউকে পরীক্ষা করেন এর বিপরীতভাবে। সুতরাং পার্থিব নিশ্চিন্তি ইতর-ভদ্রের মাপকাঠি হতে পারে না। আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা এবং যাকে যতোটুকু ইচ্ছা অঢেল জীবনোপকরণ দান করেন অথবা তাদের জীবনোপকরণকে করেন সংকুচিত। বিত্তপতি হওয়া না হওয়ার বিষয়টি মানুষের অধিকারায়ত্ত নয়।

সূরা সাবা ঃ আয়াত ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫

وَمَآ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِیْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰۤی اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ۫ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ

بِمَا عَمِلُوْا وَ هُمْ فِي الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِيْٓ
اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴿٣٨﴾ قُلْ اِنَّ رَبِّيْ
يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَ يَقْدِرُ لَهٗ ؕ وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ
شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٣٩﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ
جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اَهٰٓؤُلَآءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ﴿٤٠﴾
قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ ۚ
اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ ﴿٤١﴾ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
نَّفْعًا وَّلَا ضَرًّا ؕ وَنَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِيْ
كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا
هٰذَآ اِلَّا رَجُلٌ يُّرِيْدُ اَنْ يَّصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُكُمْ ۚ وَ
قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّآ اِفْكٌ مُّفْتَرًى ؕ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا
جَآءَهُمْ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٤٣﴾ وَمَآ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ كُتُبٍ
يَّدْرُسُوْنَهَا وَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيْرٍ ﴿٤٤﴾ ؕ وَكَذَّبَ
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۙ وَمَا بَلَغُوْا مِعْشَارَ مَآ اٰتَيْنٰهُمْ فَكَذَّبُوْا
رُسُلِيْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٤٥﴾ ع

r তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নহে যাহা তোমাদিগকে আমার নিকটবর্তী করিয়া দিবে; তবে যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাহারাই তাহাদের কর্মের জন্য পাইবে বহুগুণ পুরস্কার; আর তাহারা প্রাসাদে নিরাপদে থাকিবে।

r যাহারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিবে তাহারা শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে।

r বল, 'আমার প্রতিপালক তো তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা রিয্ক বর্ধিত করেন এবং যাহার প্রতি ইচ্ছা সীমিত করেন। তোমরা যাহা কিছু ব্যয় করিবে তিনি তাহার প্রতিদান দিবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ রিয্কদাতা'।

r স্মরণ কর, যেদিন তিনি ইহাদের সকলকে একত্র করিবেন এবং ফিরিশতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, 'ইহারা কি তোমাদেরই পূজা করিত?'

r ফিরিশ্তারা বলিবে, 'তুমি পবিত্র, মহান! তুমিই আমাদের অভিভাবক, উহারা নহে; বরং উহারা তো পূজা করিত জিন্নদের এবং উহাদের অধিকাংশই ছিল উহাদের প্রতি বিশ্বাসী।

r 'আজ তোমাদের একে অন্যের উপকার কিংবা অপকার করিবার ক্ষমতা নাই।' যাহারা যুলুম করিয়াছিল তাহাদিগকে বলিব, 'তোমরা যে অগ্নি-শাস্তি অস্বীকার করিতে তাহা আস্বাদন কর।'

r ইহাদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন ইহারা বলে, 'তোমাদের পূর্বপুরুষ যাহার ইবাদত করিত এই ব্যক্তিই তো তাহার ইবাদতে তোমাদিগকে বাধা দিতে চাহে।' ইহারা আরও বলে, 'ইহা তো মিথ্যা উদ্ভাবন ব্যতীত কিছু নহে' এবং কাফিরদের নিকট যখন সত্য আসে তখন উহারা বলে, 'ইহা তো এক সুস্পষ্ট যাদু।'

r আমি ইহাদিগকে পূর্বে কোন কিতাব দেই নাই যাহা ইহারা অধ্যয়ন করিত এবং তোমার পূর্বে ইহাদের নিকট কোন সতর্ককারীও প্রেরণ করি নাই।

r ইহাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল। উহাদিগকে আমি যাহা দিয়াছিলাম, ইহারা তাহার এক দশমাংশও পায় নাই, তবুও উহারা আমার রাসূলদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল। ফলে কত ভয়ংকর হইয়াছিল আমার শাস্তি।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দিবে, তবে যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে'। একথার অর্থ— সম্পদ ও স্বজনের বাহুল্য ও প্রাচুর্য আমার নৈকট্যভাজন হওয়ার সহায়ক নয়। আমার নৈকট্য লাভ করা যায় কেবল বিশ্বাস ও পুণ্যকর্মের মাধ্যমে। এরকমও হতে পারে যে, এখানকার 'বিল্লাতী' কথাটির 'বা' অব্যয়টি একটি অতিরিক্ত সংযোজন। যদি তাই হয় তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তোমাদের সম্পদ ও স্বজন এমন কোনো বস্তু নয়, যা তোমাদেরকে আল্লাহ্র সমীপবর্তী করতে পারে।

'ইল্লা মান আমানা' (তবে যারা ইমান এনেছে) ব্যতিক্রমটি এখানে পার্থক্য নির্দেশক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তবে একথা ঠিক যে, যারা বিশ্বাসী ও

পুণ্যবান তারা হতে পারবে আল্লাহ্‌র নৈকট্যভাজন। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। অথবা বলা যেতে পারে, ব্যতিক্রমটি এখানে মিলিতার্থক। আর 'তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দিবে' বাক্যে কর্মপদীয় সর্বনাম এখানে 'তোমাদেরকে' থেকে ব্যতিক্রম করে দিয়েছে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি কাউকে আল্লাহ্‌র সন্নিকটবর্তী করতে পারে না। তবে বিশ্বাসী ও পুণ্যবানদের সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি এরকম পারে। কারণ তারা সম্পদ ব্যয় করে পুণ্যকর্মে এবং সন্তান-সন্তুতিকে শিক্ষা দেয় পুণ্যকর্মের। এমন হওয়াও সম্ভব যে, এখানে 'যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে' বাক্যটির পূর্বে একটি সম্বন্ধপদ উহ্য আছে। যদি তা-ই থাকে তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— কিন্তু পুণ্যবান বিশ্বাসীদের সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি তাদেরকে প্রিয়ভাজন করবে আল্লাহ্‌র।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারাই তাদের কর্মের জন্য পাবে বহুগুণ পুরস্কার; আর তারা প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে।' একথার অর্থ— ওই সকল পুণ্যবান বিশ্বাসীর পুণ্যকে আল্লাহ্‌পাক বহুগুণ বাড়িয়ে দিবেন— দশগুণ থেকে সাতশত গুণ। অথবা আরো অনেক গুণ, যেমন আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছা।

এখানে 'আলগুরাফ' অর্থ উর্ধ্বোত্তলিত। কথাটির দ্বারা এখানে বলা হয়েছে বেহেশতের সুউন্নত প্রাসাদসমূহকে। হাদিস শরীফে ওই প্রাসাদসমূহের বিভিন্ন বিবরণ এসেছে। আমি সেগুলোকে সন্নিবেশিত করেছি সুরা ফুরক্বানের তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যায়।

পরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করবার চেষ্টা করবে তারা শাস্তি ভোগ করতে থাকবে'। একথার অর্থ— আমার নিদর্শনরাজি অজেয়। সুতরাং যারা এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, তারা পরাস্ত হবেই। ভোগ করতে থাকবে অন্তহীন শাস্তি।

এরপরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'বলো, আমার প্রতিপালক তো তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা রিজিক বর্ধিত করেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা সীমিত করেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দিবেন।'

এখানে বলা হয়েছে একটি ব্যক্তির জীবনোপকরণ হ্রাস-বৃদ্ধির কথা। আর ৩৬ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জীবনোপকরণের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটানোর কথা। এ সম্পর্কে 'বাহরে মাওয়াজ' প্রণেতা লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বিত্তপতিদের বৈত্তিকদর্পের প্রেক্ষিতে। আর আলোচ্য আয়াতে বিরূপ সমালোচনা করা হয়েছে কৃপণতার। উৎসাহ দেওয়া হয়েছে পুণ্যকর্মে অর্থ ব্যয়ের প্রতি। বলা হয়েছে— তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দিবেন, তাৎক্ষণিকভাবে পৃথিবীতে, অথবা একবারে পরবর্তী পৃথিবীতে।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়াল্লহু খইরুর রযিক্বীন'। এর শাব্দিক অর্থ তিনিই রিজিকদাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রিজিকদাতা। কিন্তু মর্মার্থ— দাতা আল্লাহ্ই, অন্য কেউ নয়। সুতরাং বুঝতে হবে 'রিজিকদাতাগণ' কথাটি এখানে রূপকার্থক। প্রকৃতার্থকতার সঙ্গে এর কোনো সম্পৃক্তি নেই।

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (৪০, ৪১) মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! মহাবিচারের দিবসের ওই সময়ের কথা স্মরণ করুন, যেদিন আমি ফেরেশতাদেরকে ডেকে বলবো, পৃথিবীতে তো একদল লোক তোমাদের পূজা করতো। করতো না? ফেরেশতারা জবাব দিবে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! তুমি পবিত্রাতিপবিত্র। মহানতম। আমাদের একমাত্র অভিভাবক তো তুমিই। ওই সকল মূর্খ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক? তারা তো আসলে জ্বিনদেরকে ফেরেশতা জ্ঞানে পূজা করতো। তারা তো তাদেরকেই উপাস্য বলে জানতো।

এখানে 'জ্বামীআ'ন' (একত্র করবেন) কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্পাক যেমন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের নেতাদেরকে একত্রিত করবেন, তেমনি একত্র করবেন তাদের সাধারণ জনতাকেও। তাদেরকেও, যারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্র আত্মজা জ্ঞানে পূজা করতো। মনে করতো, ফেরেশতাগণ তাদের পক্ষে আল্লাহ্র দরবারে সুপারিশ করবে। আল্লাহ্তায়ালা সেদিন ফেরেশতাদেরকে এরকম প্রশ্ন করবেন তাদের পূজারীদের নিরাশ করার লক্ষ্যে। লক্ষণীয়, মূর্তিপূজারীদের মূর্তি অথবা অগ্নিপূজারীদের অগ্নিকে আল্লাহ্পাক প্রশ্ন করবেন না। প্রশ্ন করবেন কেবল ফেরেশতামণ্ডলীকে। এতে করে একথাই প্রমাণিত হয় যে, জবাব দিতে পারে কেবল ফেরেশতারা। কারণ তারা সপ্রাণ। আর প্রতিমা, প্রস্তর, অগ্নি এসকলকিছু তো অপ্রাণ, নিরেট জড় পদার্থ। সুতরাং ওগুলো সম্বোধিত হবার অযোগ্য।

'আলজ্বিন' অর্থ এখানে শয়তান। অর্থাৎ ওই সকল শয়তান যারা ফেরেশতা পূজার প্রতি মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিলো। বুঝিয়েছিলো, আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন বলেই তো এই বিশাল সৃষ্টির শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছে ফেরেশতারা। সুতরাং তাদেরকে পূজা করে সন্তুষ্ট রাখা খুবই জরুরী। এরকম করলে তারা হবে তোমাদের সুপারিশকারী। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, শয়তানেরাই ফেরেশতারূপে আবির্ভূত হতো ফেরেশতাপূজারীদের কাছে। আর তারা তাদেরকে ফেরেশতা মনে করেই পূজা করতো।

'আকছারুহুম' অর্থ তাদের অধিকাংশ। অর্থাৎ অধিকাংশ অংশীবাদী। 'বিহিম' অর্থ তাদের প্রতি বিশ্বাসী। অর্থাৎ শয়তানকে উপাস্য বলে বিশ্বাসী।

এরপরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'আজ তোমাদের একে অন্যের উপকার কিংবা অপকার করবার ক্ষমতা নেই'। একথার অর্থ— সেদিন মানুষ, জ্বিন বা ফেরেশতা কেউই একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারবে না। করতে পারবে না কেউ কারো উপকার কিংবা অপকার। কারণ তখন সকল সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষভাবে হবে কেবল আল্লাহ্র।

এরপর বলা হয়েছে— 'যারা জুলুম করেছে তাদেরকে বলবো, তোমরা যে অগ্নিশাস্তি অস্বীকার করতে তা আস্বাদন করো'। 'জুলুম' অর্থ অপাত্রে স্থাপন। অযথার্থ ব্যবহার। অংশীবাদীরা তাদের উপাসনা নিবেদন করে অযথার্থ স্থানে। আল্লাহ্ ভেবে অর্চনা-বন্দনা করে অন্যের। একারণেই তাদেরকে এখানে বলা হয়েছে 'জালেম'।

এরপরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'তাদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত তেলাওয়াত করা হয় তখন তারা বলে, তোমাদের পূর্বপুরুষ যার ইবাদত করতো এই ব্যক্তিই তো তার ইবাদতে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায়'। একথার অর্থ— মক্কাবাসীদের সম্মুখে আমার প্রিয়তম রসুল যখন আমার বাণী পাঠ করে শোনায় তখন তারা বলে, দ্যাখো, মোহাম্মদ ধর্মদ্রোহী। সে আমাদের বাপ-দাদাদের ধর্মপালনে সৃষ্টি করতে চায় অন্তরায়। সুতরাং বুঝে নাও, সে যা কিছু আমাদেরকে পাঠ করে শোনাচ্ছে, তা আল্লাহ্র বাণী নয়। তা তার নিজস্ব রচনা।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা আরো বলে, এটাতো মিথ্যা উদ্ভাবন ব্যতীত কিছু নয় এবং কাফেরদের নিকটে যখন সত্য আসে তখন তারা বলে, এতো এক সুস্পষ্ট যাদু।'

এখানে 'হক' (সত্য) অর্থ নবুয়ত, ইসলাম, অথবা কোরআন। এমতাবস্থায় এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়— নবুয়তের আলো, ইসলামের আহ্বান, অথবা কোরআনের পথনির্দেশ যখন তাদের কাছে পৌঁছলো তখন তারা চিন্তা-ভাবনা না করেই বলে ফেললো, মোহাম্মদ যা পাঠ করে শোনায়, তা তার স্বরচিত শ্লোক, সুস্পষ্ট যাদু। উল্লেখ্য, কোরআনের অর্থগত দিক লক্ষ্য করে তারা বলতো, কোরআন মোহাম্মদের নিজস্ব রচনা, আর ভাষাশৈলীর দিকে লক্ষ্য করে বলতো, এটা তো এক সুস্পষ্ট যাদু।

এরপরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'আমি এদেরকে পূর্বে কোনো কিতাব দেইনি, যা এরা অধ্যয়ন করতো এবং তোমার পূর্বে এদের নিকট কোনো সতর্ককারীও প্রেরণ করিনি'।

এখানে 'মিন কুতুবিন' (কোনো কিতাব) কথাটির মর্মার্থ— এমন কোনো নভজ গ্রন্থ আমি তাদেরকে দেইনি, যাতে রয়েছে অংশীবাদিতার অনুমোদন। 'মিন নাজীর' (কোনো সতর্ককারী) এর মর্মার্থ— এমন কোনো নবীও প্রেরণ করিনি, যিনি তাদেরকে আহ্বান জানিয়েছেন অংশীবাদিতার দিকে। তারা কেউই এরকম বলেননি যে, অংশীবাদিতা পরিত্যাগের অর্থ ধর্মদ্রোহিতা। তাহলে মক্কার অংশীবাদীরা এরকম কথা বলে কেনো? কেনো অসত্যারোপ করে আমার নবী এবং আমার কোরআনের প্রতি।

এরপরের আয়াতে (৪৫) বলা হয়েছে— 'এদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিলো'। একথার অর্থ— মক্কাবাসী অংশীবাদীরা যেমন এখন সত্যের বিরোধিতা করছে, তেমনি বিরোধিতা করতো তাদের পূর্বসূরী আ'দ, ছামুদ ইত্যাদি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদেরকে আমি যা দিয়েছিলাম, এরা তার এক দশমাংশও পায়নি, তবু তারা আমার রসুলগণকে মিথ্যা বলেছিলো। ফলে কতো ভয়ংকর হয়েছিলো আমার শাস্তি'। একথার অর্থ— পূর্ববর্তী অবাধ্যরা ছিলো জ্ঞানে গুণে ধনে জনে মক্কার অংশীবাদীদের চেয়ে অনেক বেশী প্রবল। তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির এক দশমাংশও মক্কার পৌত্তলিকদের নেই। কিন্তু এতো কিছু নেয়ামত পাওয়া সত্ত্বেও পূর্বযুগের অবাধ্যরা কৃতজ্ঞচিত্ত হওয়ার বদলে হয়েছিলো অহংকারী। হেয় মনে করে প্রত্যাখ্যান করেছিলো প্রেরিত পুরুষগণের সদুপদেশ। তাদের প্রতি করেছিলো অসত্যারোপ। কিন্তু এর ফল হয়েছিলো অত্যন্ত ভয়ংকর। আমাকর্তৃক আপতিত সর্বগ্রাসী শাস্তির মাধ্যমে চিরতরে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো তারা। সুতরাং মক্কাবাসীরা কি ভেবেছে? এভাবে ক্রমাগত সীমালংঘন করলে কি তারা পার পেয়ে যাবে?

আলোচ্য আয়াতে 'অসত্যারোপ' (কাজ্জাবা, কাজ্জাবু) শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে দু'বার। প্রথমোক্তটি আধিক্যপ্রকাশক। পরেরটি তেমন নয়। অথবা বলা যেতে পারে, প্রথমটির কর্মপদ এখানে অনুল্লেখিত। এভাবে অর্থ হয়েছে— সাধারণ ও সামষ্টিক অসত্যারোপ। আর দ্বিতীয়টির কর্মপদ উল্লেখিত এবং এভাবে শব্দটি হয়েছে সীমিতার্থক। 'বাহরে মাওয়াজ' রচয়িতা লিখেছেন, এখানে 'তারা অসত্যারোপ করেছে' অর্থ অসত্যারোপ করেছে মক্কাবাসীরা।

সূরা সাবা ঃ আয়াত ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০

قُلْ اِنَّمَآ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا ۗ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۭ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ

بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ﴿٤٦﴾ قُلْ مَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ط
اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ج وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿٤٧﴾ قُلْ اِنَّ
رَبِّيْ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ج عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿٤٨﴾ قُلْ جَآءَ الْحَقُّ
وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ ﴿٤٩﴾ قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَآ
اَضِلُّ عَلٰى نَفْسِيْ ج وَاِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوْحِيْٓ اِلَيَّ رَبِّيْ ط
اِنَّهٗ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ ﴿٥٠﴾

r বল, 'আমি তোমাদিগকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিতেছি ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দুই-দুইজন অথবা এক-একজন করিয়া দাঁড়াও, অতঃপর তোমরা চিন্তা করিয়া দেখ— তোমাদের সংগী আদৌ উন্মাদ নহে। সে তো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র।'

r বল, 'আমি তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাহি না, তাহা তো তোমাদেরই; আমার পুরস্কার তো আছে আল্লাহ্‌র নিকট এবং তিনি সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা।'

r বল, 'আমার প্রতিপালক সত্যের দ্বারা অসত্যকে আঘাত করেন; তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা।'

r বল, 'সত্য আসিয়াছে এবং অসত্য না পারে নুতন কিছু সৃজন করিতে, আর না পারে পুনরাবৃত্তি করিতে।'

r বল, 'আমি বিভ্রান্ত হইলে বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই এবং যদি আমি সৎপথে থাকি তবে তাহা এইজন্য যে, আমার প্রতি আমার প্রতিপালক ওহী প্রেরণ করেন। তিনি সর্বশ্রোতা, সন্নিকট'।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বলো, আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি— তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দুই দুইজন অথবা এক একজন করে দাঁড়াও, অতঃপর তোমরা চিন্তা করে দ্যাখো— তোমাদের সঙ্গী আদৌ উন্মাদ নয়'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদী জনগোষ্ঠীকে বলুন, হে আমার স্বজাতি! উত্তেজিত হয়ো না। শান্ত হও। আমার একটি শুভপরামর্শ শোনো। তোমরা একা একা অথবা যৌথভাবে আমার বিষয়ে প্রকৃত তত্ত্ব উদঘাটনের জন্য সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করো। ভালো করে চিন্তাভাবনা করে

দ্যাখো, তাহলেই বুঝতে পারবে আমার মহান মনোবৃত্তি ও শুভ উদ্দেশ্য সম্পর্কে। ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমরা আমাকে বলছো উন্মাদ। কিন্তু আসলে কি আমি তাই? আমি যে তোমাদের মহাজীবনের মহাকল্যাণের পথপ্রদর্শক। আমি যে রসুল।

এখানে 'দাঁড়াও' অর্থ উদ্যোগ গ্রহণ করো, সত্যোদ্ধারের মানসে কোমর বেঁধে নেমে পড়ো। এরকম বক্তব্যভঙ্গি প্রকাশ করা হয়েছে অন্য এক আয়াতেও। যেমন— 'তোমরা নিষ্ঠার সঙ্গে দাঁড়িয়ে যাও পিতৃহীনদের সঙ্গে'। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করো।

'মাছনা ওয়া ফুরাদা' অর্থ চিন্তা করে দ্যাখো, উত্তেজিত হয়ো না। পরামর্শ বিনিময় করো জোড়ায় জোড়ায়, অথবা একা একা। এভাবে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলেই তোমাদের সামনে প্রতিভাত হবে সত্যের স্বরূপ। তখন একথা পরিষ্কার বুঝতে পারবে যে, তোমাদের স্বজন মোহাম্মদ উন্মাদ কিছুতেই নয়। তিনি তো আল্লাহ্র বার্তাবাহক। তাঁর উদ্দেশ্য ও কর্মকাণ্ড মহান। না হলে এক বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রথাসর্বস্ব ও অবরুদ্ধ চিন্তা-চেতনার বিরুদ্ধে তিনি একা প্রতিবাদ করে যেতে পারেন কীভাবে?

এরপর বলা হয়েছে— 'সে তো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র'। এ কথার অর্থ— তিনি তো তোমাদের সুহৃদ সতর্ককারী। তোমাদেরকে তিনি বারংবার মহাসত্যের আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে বলছেন। বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেছেন মহাবিশ্বের মহাসৃজয়িতা ও মহাপালয়িতা আনুরূপ্যবিহীন এক আল্লাহ্র প্রতি। এইমর্মে সাবধানও করে দিচ্ছেন যে, মহাসত্যের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ না করলে শাস্তি অনিবার্য। আর সেই শাস্তি বেশী দূরেও নয়। আসন্ন। বরং অত্যাসন্ন।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'আর আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করো' এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো, তখন রসুল স. সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন, ওহে বনী ফিহির! ওহে বনী আদী! তাঁর এমতো উচ্চকিত আহ্বান শুনে কুরায়েশ জনতা সমবেত হলো সাফা পাহাড়ের পাদদেশে। রসুল স. বললেন, এখন আমি যদি বলি, এই পাহাড়ের বিপরীত প্রান্ত থেকে একদল সশস্ত্র অশ্বারোহী আক্রমণোদ্যত, তবে তোমরা আমার একথা কি বিশ্বাস করবে? জনতা জবাব দিলো, অবশ্যই। কারণ তোমাকে আমরা কখনো অসত্য উচ্চারণ করতে দেখিনি। রসুল স. বললেন, তবে শোনো, আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত এক সুহৃদ সতর্ককারী। একথা শোনার

সঙ্গে সঙ্গে রাগে গর গর করতে লাগলো আবু লাহাব। বললো, তোমার মরণ হোক। এজন্যেই তাহলে তুমি আমাদেরকে ডেকেছিলে? এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয় 'তাবব্াত ইয়াদা আবী লাহাবিঁউ.......'।

পরের আয়াতে (৪৭) বলা হয়েছে— 'বলো, আমি তোমাদের নিকট কোনো পারিশ্রমিক চাইনা, তা তো তোমাদেরই'। কোনো কোনো আলেম উদ্ধৃত আয়াতাংশটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে বলুন, হে আমার স্বজন-পরিজন! মহাসত্য প্রচারের মানসে আমি যে শ্রম দিয়ে চলেছি, তার জন্য আমি তো তোমাদের কাছে পার্থিব বিনিময় প্রত্যাশী নই। এখন তোমাদের মধ্যে যার ইচ্ছা হয়, সে তার প্রভুপালনকর্তার পথ ধরুক। তবে তোমরা পথপ্রাপ্ত হও, এটাই আমার একান্ত কামনা।

আমি বলি, সকল দ্বীনদার আলেম এবং আরেফ রসুল স. এর স্বজন পরিজন, তাঁরা রসুল স. এর বংশগত আত্মীয় হোন, অথবা না হোন। আর তাঁদের ভালোবাসা হচ্ছে আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের উপলক্ষ।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমার পুরস্কার তো আছে আল্লাহ্র নিকট এবং তিনি সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা'। একথার অর্থ— আমি একনিষ্ঠভাবে যে সত্যপ্রচার করে চলেছি, তার বিনিময় আল্লাহ্ই আমাকে দিবেন, পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবী উভয় স্থানে। অথবা কেবল পরবর্তী পৃথিবীতে। আর আল্লাহ্ তো তোমাদের ও আমার আচরণ অবশ্যই প্রত্যক্ষ করছেন। তিনি যে সর্বদ্রষ্টা। সুতরাং তোমরা অংশীবাদিতা পরিহার করো। পরিগ্রহণ করো মহাসত্যকে। এভাবে পরিপূরণ করো আল্লাহ্র অধিকার। আল্লাহ্ও তোমাদের অধিকার পরিপূরণ করবেন। নতুবা তোমাদের জন্য শাস্তি অবধারিত।

একবার রসুল স. হজরত মুয়াজকে বললেন, হে মুয়াজ! তুমি কি জানো, বান্দার উপরে আল্লাহ্র এবং আল্লাহ্র উপরে বান্দার অধিকার কী? তিনি বললেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলই এ সম্পর্কে অধিক অবগত। তিনি স. বললেন, বান্দার উপরে আল্লাহ্র অধিকার হচ্ছে— তারা কেবল আল্লাহ্র ইবাদত করবে। তাঁর সঙ্গে কাউকে বা কোনোকিছুকে অংশীদার করবে না। আর আল্লাহ্র উপরে বান্দার অধিকার হচ্ছে— যারা শিরিক করবে না, তাদেরকে তিনি শাস্তি দিবেন না।

এরপরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'বলো, আমার প্রতিপালক সত্যের দ্বারা অসত্যকে আঘাত করেন'।

এখানে 'ইয়াক্বজিফু' অর্থ ছুঁড়ে মারেন, আঘাত হানেন। অর্থাৎ পথভ্রষ্টতাকে অপসারণের নিমিত্তে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাগণের মধ্য থেকে কাউকে কাউকে মনোনীত করেন তাঁর বার্তাবাহক। তাঁদেরকে সাহায্য করেন প্রত্যাদেশ দ্বারা।

অথবা কথাটির মর্মার্থ হবে— সত্যের দ্বারা আঘাত করেন অসত্যকে। এভাবে অসত্যকে বিদূরিত করে তদস্থলে প্রতিষ্ঠা করেন সত্যের। কিংবা বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আল্লাহ্ই মহাসত্যের বাণী ছড়িয়ে দেন পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে। এভাবে দূর করে দেন অসত্যের অন্ধকার।

ইমাম আহমদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত মিকদাদ বলেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, এ পৃথিবীর এমন কোনো গৃহ অথবা তাঁবু থাকবে না, যেখানে আল্লাহ্ পৌঁছাবেন না ইসলামের বাণী, সম্মানিত জনদেরকে সম্মানের সঙ্গে, অথবা লাঞ্ছিতদেরকে লাঞ্ছনার সঙ্গে। অর্থাৎ সসম্মানে যারা ইসলাম কবুল করবে না, তাদেরকে ইসলাম কবুল করতে হবে লাঞ্ছনার সঙ্গে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা'। একথার অর্থ প্রকাশ্য গোপন সকল বিষয়ে সম্যক অবগত বলেই কেবল তিনিই জানেন, কে তাঁর প্রত্যাদেশের ভার বহনে অধিক যোগ্য এবং মহান ইসলামের শেষ পরিণতি গিয়ে দাঁড়াবে কোথায়। কীভাবেই বা তিনি অবিশ্বাসের অমানিশা সরিয়ে পৃথিবীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ফোটাবেন ইসলামের আলো।

এরপরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'বলো, সত্য এসেছে এবং অসত্য না পারে নতুন কিছু সৃজন করতে, আর না পারে পুনরাবৃত্তি করতে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি জনসমক্ষে ঘোষণা করুন, সত্য সমাগত। সুতরাং অসত্যের অবলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী। সৃজন অথবা পুনরাবৃত্তায়ন অসত্যের ক্ষমতাভূত নয়। অপর এক আয়াতেও এরকম ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন— 'তিনি মহাসত্যকে নিক্ষেপ করেন অসত্যের উপর। পরাস্ত করেন তাকে। আর অকস্মাৎ সে অন্তর্হিত হয়'। কাতাদা বলেছেন, এখানে 'অসত্য' অর্থ ইবলিস। সে যেমন কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, তেমনি মৃত্যুর পর কাউকে করতে পারে না পুনর্জীবিতও। কালাবীও এরকম বলেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'অসত্য' অর্থ পৌত্তলিকদের প্রতিমা।

বাগবী লিখেছেন, মক্কার অংশীবাদীরা রসুল স.কে প্রায়শ বলতো, তুমি পিতৃপুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগকারী। তাদের এমতো অপবচনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে পরবর্তী আয়াত (৫০)।

বলা হয়েছে— 'বলো, আমি বিভ্রান্ত হলে বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই এবং যদি আমি সৎপথে থাকি তবে তা এই জন্য যে, আমার প্রতি আমার প্রতিপালক ওহী প্রেরণ করেন'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে আরো বলুন, ঠিক আছে, তোমাদের কথা অনুসারে আমার আনীত ধর্মমত যদি ভ্রষ্টই হয়ে থাকে, তবে সে ভ্রষ্টতার পরিণাম তো ভোগ করবো আমিই। কিন্তু তোমরা তো

দেখছো, আমি মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন কোনো ব্যক্তি নই। নই অন্য কারো মতো পার্থিব সম্মান বা বিত্তবিলাসী। আর আমি এই ধর্মমতের প্রবক্তা মাত্র, স্রষ্টা বা নির্মাতা তো নই। কারো কাছ থেকে অক্ষরজ্ঞানও আমি গ্রহণ করিনি। আমি অক্ষরের অমুখাপেক্ষী (উম্মি)। আমি প্রত্যাদেশ আহরণ করি অক্ষরাতীত সূত্র থেকে সরাসরি। সুতরাং অক্ষরের মুখাপেক্ষীদের মতো আমি সাধারণ কোনো ব্যক্তি নই। আমি নবী। তাই তোমাদের উচিত আমার অনুগত হওয়া, যাতে করে আমার অনুসরণে তোমরাও পেয়ে যাও সুপথ।

এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াত রসুল স. এর রেসালতের একটি প্রকৃষ্ট দলিল। অন্য এক আয়াতে বিষয়টি পরিস্ফুট করা হয়েছে এভাবে— 'ইন্ দ্বলাল্তু ফাইন্নামা আদ্বিল্লু আ'লা নাফ্সী'। এর সারমর্ম হচ্ছে— যেমন কর্ম তেমন ফল। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আমি পথভ্রষ্ট হলে তার পরিণাম ভোগ করতে হবে আমাকেই। আর ভ্রষ্টতার আগমন ঘটে কুপ্রবৃত্তির কারণে। কুপ্রবৃত্তি স্বয়ং ভ্রষ্ট এবং অসৎকর্মের প্ররোচক। আর যদি আমি কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করি তবে আমি পেয়ে যাবো হেদায়েত। অন্য আর এক আয়াতে বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে এভাবে— 'যে কোনো কল্যাণ তোমার নিকট পৌঁছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এবং যে কোনো অকল্যাণ পৌঁছে তোমার নিজের পক্ষ থেকে'।

শেষে বলা হয়েছে— 'তিনি সর্বশ্রোতা, সন্নিকট'। একথার অর্থ তিনি পথপ্রাপ্ত-পথভ্রষ্ট নির্বিশেষে সকলের সংলাপই শুনতে পান। কারণ তিনি সর্বশ্রোতা। আর আনুরূপ্যবিহীনভাবে তিনি তাঁর সৃষ্টির সন্নিকটেও।

সূরা সাবা ঃ আয়াত ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪

وَلَوْ تَرٰۤى اِذْ فَزِعُوْا فَلَا فَوْتَ وَاُخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ۙ﴿۵۱﴾ وَّقَالُوْۤا اٰمَنَّا بِهٖ ۚ وَاَنّٰى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ ۚ﴿۵۲﴾ وَّقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ۚ وَيَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ ﴿۵۳﴾ وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ كَمَا فُعِلَ بِاَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا فِيْ شَكٍّ مُّرِيْبٍ ﴿۵۴﴾

r তুমি যদি দেখিতে যখন ইহারা ভীতবিহবল হইয়া পড়িবে, তখন ইহারা অব্যাহতি পাইবে না এবং ইহারা নিকটস্থ স্থান হইতে ধৃত হইবে,

r এবং ইহারা বলিবে, 'আমরা তাহাতে ঈমান আনিলাম।' কিন্তু এত দূরবর্তী স্থান হইতে উহারা নাগাল পাইবে কিরূপে?

r উহারা তো পূর্বে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; উহারা দূরবর্তী স্থান হইতে অদৃশ্য বিষয়ে বাক্য ছুঁড়িয়া মারিত।

r ইহাদের ও ইহাদের বাসনার মধ্যে অন্তরাল করা হইয়াছে, যেমন পূর্বে করা হইয়াছিল ইহাদের সমপন্থীদের ক্ষেত্রে। উহারা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তুমি যদি দেখতে তারা ভীত-বিহব্বল হয়ে পড়বে'। এখানে 'ফাযিউ' অর্থ মরণকালে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা ভীত হবে খুব। কাতাদা কথাটির অর্থ করেছেন— কবরে যখন তাদেরকে ওঠানো হয়, তখন তারা হয়ে পড়ে সাংঘাতিক সন্ত্রস্ত। 'লাও' (যদি) অব্যয়টি এখানে শর্তপ্রকাশক! এর পরিণতি এখানে অনুক্ত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! আপনি যদি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মৃত্যুকালীন অথবা কবর আযাবের সময়ের ভীত-বিহবল অবস্থা দেখতেন, তবে দেখতেন, কী বীভৎস সে দৃশ্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'তখন তারা অব্যাহতি পাবে না এবং তারা নিকটস্থ স্থান থেকে ধৃত হবে'।

'ফালা ফাওতা' অর্থ আল্লাহ্‌র আক্রমণ থেকে রেহাই পাবে না। 'মিম্ মাকানিন ক্বরীব' অর্থ ভূপৃষ্ঠ থেকে তাদেরকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে মৃত্তিকাভ্যন্তরে। অথবা বলা যেতে পারে, তাদেরকে হাশরের ময়দান থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে নরকের দিকে। জুহাক বলেছেন, কথাটির মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে বদর যুদ্ধের। অংশীবাদীরা তখন হয়ে পড়েছিলো আতংকগ্রস্ত এবং তাদের কাউকে কাউকে ধরা হয়েছিলো রণপ্রান্তরের আশপাশ থেকে। কিন্তু জুহাকের এমতো ব্যাখ্যা 'ফালা ফাওতা' (তখন তারা অব্যাহতি পাবে না) কথাটির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কেননা বদরযুদ্ধে বন্দী অংশীবাদীরা পরে অর্থদণ্ড প্রদানের মাধ্যমে অব্যাহতি পেয়ে গিয়েছিলো। তাছাড়া পরবর্তী আয়াতও (৫২) তাঁর ব্যাখ্যার অনুকূল নয়। যেমন— 'এবং তারা বলবে আমরা তার উপর ইমান আনলাম'। অর্থাৎ আমরা ইমান আনলাম মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর প্রতি। কিন্তু বদর যুদ্ধে নিহত ও বন্দী মুশরিকেরা এরকম কথা বলেনি। আবু জেহেল তো শেষ নিশ্বাস ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত অনড় ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানে। মারাত্মক আহত অবস্থায় যখন সে ভূতলশায়ী, তখন হজরত আবুদল্লাহ্ ইবনে মাসউদ তার দাড়ি ধরে বলেছিলেন, সেই আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, যিনি লাঞ্ছিত করলেন তাঁর শত্রুকুলকে। আবু জেহেল মৃত্যুপথযাত্রী হয়েও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিলো, আরে! আমি লাঞ্ছিত হলাম কখন। স্বগোত্রীয়রা যাকে হত্যা করে, সে কি লাঞ্ছিত?

প্রকৃত কথা হচ্ছে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা 'আমরা ইমান আনলাম' এরকম বলবে মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হলে। অথবা তারা বিশ্বাসের ঘোষণা দিবে তাদের পুনরুত্থানের সময়, যখন প্রত্যক্ষ করবে মহাবিচার দিবসের মহাআতঙ্ক। সেখান থেকে তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে দোজখের দিকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু এতো দূরবর্তী স্থান থেকে তার নাগাল পাবে কীরূপে'?

এখানকার 'তানাউশ' শব্দটির ধাতুমূল 'নওশ'। এর অর্থ— হাতে নেওয়া, বাসনা, কামনা, চলা, দৃঢ়তার সঙ্গে গাত্রোত্থান করা। এরকম বলা হয়েছে 'কামুস' অভিধান গ্রন্থে। উল্লেখ্য, ইমান আনার স্থান এই পৃথিবী। পরবর্তী পৃথিবী তো ইমানের প্রতিফল প্রদানের স্থান। সুতরাং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের হাতছাড়া হয়ে যাবে ইমান গ্রহণের স্থান ও সময়। সুতরাং তারা আর শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবে কীরূপে? এদিকে ইঙ্গিত করেই এখানে বলা হয়েছে— এতো দূরবর্তী স্থান থেকে তারা নাগাল পাবে কীরূপে? অর্থাৎ এখন আখেরাতের এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দানের সময়ে এসে তারা কী করে আর ফিরে পাবে সুদূর অতীতের পৃথিবীর জীবন ও সময়? অতীত কি কখনো ফিরে আসে?

এরপরের আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— 'এরা তো পূর্বে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলো'। একথার অর্থ— এরাই তো তারা, যারা সময় থাকতে সাবধান হয়নি। অবিশ্বাস করেছে রসুল, কোরআন ও আখেরাতকে। আর আল্লাহ্‌কে তো অস্বীকার করেছেই। প্রকাশ্যে পূজা করেছে প্রতিমার। উল্লেখ্য, রসুল স.কে অবিশ্বাস করার কথা ৪৬ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে এভাবে— 'মাবি সাহিবিকুম মিন জিন্‌নাহ' (তোমাদের সঙ্গী আদৌ উন্মাদ নয়)। কোরআন অস্বীকারের কথা বলা হয়েছে 'জ্বাআল হাক্বক্ব' কথাটির মাধ্যমে ৪৯ সংখ্যক আয়াতে এবং ৫১ সংখ্যক আয়াতের 'উখিজু' (ধৃত হবে) কথাটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে শাস্তির ইঙ্গিত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা দূরবর্তী স্থান থেকে অদৃশ্য বিষয়ে বাক্য ছুঁড়ে মারতো'। একথার অর্থ— তারা সত্য থেকে দূরে অবস্থান করতো বলে রসুল স. এবং আখেরাত সম্পর্কে মন্তব্য করতো অনুমানের ভিত্তিতে, চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকেই। যেমন কোনো লোক অদেখা বস্তুর প্রতি অনুমানে তীর নিক্ষেপ করলো, আবার এরকমও ধারণা রাখলো যে, তার নিশানা অব্যর্থ। আলোচ্য বাক্যে এরকম লোকের সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের।

মুজাহিদ বলেছেন, মক্কার মুশরিকেরা আন্দাজে অনুমানে বিভিন্ন প্রকার অপমন্তব্যের মাধ্যমে রসুল স.কে আক্রমণ করতো। কখনো তাঁকে বলতো যাদুকর। কখনো বলতো পাগল। আবার কখনো বলতো কবি। এটাই হচ্ছে

তাদের দূরবর্তী স্থান থেকে অদৃশ্য বিষয়ে বাক্যবান ছুঁড়ে মারা। কাতাদা বলেছেন, তারা নিক্ষেপ করতো কল্পনার তীর। বলতো, পরকাল বলে কিছু নেই। বেহেশত-দোজখেরও কোনো অস্তিত্ব নেই।

শেষোক্ত আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে— 'এদের এবং তাদের কামনার মধ্যে অন্তরাল করা হয়েছে, যেমন পূর্বে করা হয়েছিলো এদের সমপন্থীদের ক্ষেত্রে। তারা ছিলো বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে'।

এখানে 'মা ইয়াশতাহুন' অর্থ তারা যা কামনা করে। অর্থাৎ মহাবিচারের দিবসে তারা কামনা করবে ইমান গ্রহণের সুফল, নরক থেকে পরিত্রাণ ও পৃথিবীতে পুনঃপ্রত্যাবর্তন। এমনও হতে পারে যে, পানাহারের সামগ্রীও তারা সেখানে কামনা করবে। কারণ পার্থিব জীবনে এগুলোই ছিলো তাদের কাম্য। সুতরাং মহাবিচার দিবসেও তারা খাদ্যপানীয়ের প্রতি অনুভব করবে স্বভাবজ আকর্ষণ।

এখানকার 'আশইয়া' শব্দটি 'শীয়া' এর বহুবচন। এর অর্থ দল। অর্থাৎ তাদের মতো যে দলগুলো অতীতায়িত হয়েছে, তারাও ছিলো এদের মতোই সমান সন্দেহপ্রবণ ও বিভ্রান্ত। 'ফী শাক্কিন' অর্থ সন্দেহের মধ্যে। অর্থাৎ মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান ইত্যাদি সম্পর্কে তারা ছিলো এদের মতোই সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান। আর 'মুরীব' অর্থ বিভ্রান্তিকর, সংশয় উদ্রেকক। শব্দটি 'শাক্কিন' (সন্দেহ) শব্দের বিশেষণ এবং আধিক্যপ্রকাশক।

আলহামদু লিল্লাহ্। সুরা 'সাবা'র তাফসীর সমাপ্ত হলো আজ ২০ শে মহররম ১২০৭ হিজরী সনে।

সূরা ফাতির

সুরা ফাতির সুরা মালায়িকা নামেও পরিচিত। ৬ রুকু এবং ৪৫ আয়াত বিশিষ্ট এই সুরা অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়।

সূরা ফাতির ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ جَاعِلِ الۡمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِیۡۤ اَجۡنِحَةٍ مَّثۡنٰی وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ ؕ يَزِيۡدُ فِی الۡخَلۡقِ مَا يَشَآءُ ؕ

إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١﴾ مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢﴾ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٣﴾ وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٤﴾ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ٝ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ﴿٥﴾ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ؕ اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿٦﴾ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

r সকল প্রশংসা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্রই— যিনি বাণীবাহক করেন ফিরিশ্তাদিগকে যাহারা দুই দুই, তিন তিন অথবা চার চার পক্ষবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টিতে যাহা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

r আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোনো অনুগ্রহ অবারিত করিলে কেহ উহা নিবারণকারী নাই এবং তিনি কিছু নিরুদ্ধ করিতে চাহিলে তৎপর কেহ উহার উন্মুক্তকারী নাই। তিনি পরাক্রমশালী। প্রজ্ঞাময়।

r হে মানুষ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ্ ব্যতীত কি কোন স্রষ্টা আছে, যে তোমাদিগকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী হইতে রিয্ক দান করে? তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। সুতরাং কোথায় তোমরা বিপথে চালিত হইতেছ।

r ইহারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে তোমার পূর্বেও রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হইয়াছিল। আল্লাহ্র নিকটই সকল বিষয় প্রত্যানীত হইবে।

r হে মানুষ! নিশ্চয়ই আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদিগকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই আল্লাহ্ সম্পর্কে তোমাদিগকে প্রবঞ্চিত না করে।

r শয়তান তো তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাহাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ কর। সে তো তাহার দলবলকে আহ্বান করে কেবল এই জন্য যে, উহারা যেন জাহান্নামী হয়।

r যাহারা কুফরী করে তাহাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি এবং যাহারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য আছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আলহামদু লিল্লাহি ফাত্বিরিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি'। এর অর্থ সকল প্রশংসা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র।

এখানকার 'ফাত্বির' শব্দটি উৎসারিত হয়েছে 'ফিত্বরত' থেকে, এর অর্থ ফেঁড়ে ফেলা, ছিঁড়ে ফেলা। মর্মার্থ—অনস্তিত্ব বিলোপ করে তদস্থলে অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা। 'ফাত্বির' কর্তৃপদীয় শব্দ এবং এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে অতীতকালার্থে। অর্থাৎ আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন আকাশসমূহ ও পৃথিবী। সেকারণে 'ফাত্বির' আল্লাহ্র গুণবাচক একটি নাম।

এরপর বলা হয়েছে— 'যিনি বাণীবাহক করেন ফেরেশতাদেরকে দুই দুই তিন তিন অথবা চার চার পক্ষবিশিষ্ট'।

এখানে 'রুসুলান' অর্থ বাণীবাহক, যারা আল্লাহ্র বাণী পৌঁছে দেন প্রেরিত পুরুষগণকে এবং পুণ্যবানগণকে, যথাক্রমে প্রত্যাদেশ ও অনুপ্রেরণা প্রক্ষেপণের মাধ্যমে। অথবা বলা যেতে পারে, এই বাণীবাহক ফেরেশতারাই আল্লাহ্ ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যের যোগসূত্র। তাঁদের মাধ্যমেই আল্লাহ্র মহিমা ও অনুগ্রহ পৌঁছানো হয় সৃষ্টিকুলকে।

'জ্বায়ি'ল' এখানে যদিও কর্তৃপদের শব্দরূপ, তথাপিও তা বর্তমান ও ভবিষ্যতকালের অর্থ প্রকাশক। শাব্দিক সম্বন্ধযুক্ত, প্রকৃত নয়। সুতরাং এমতাবস্থায় শব্দটি আল্লাহ্র নামের বিশেষণ হবে না। হবে বিশেষণের স্থলাভিষিক্ত।

'আজ্বনিহাতিন্' (পক্ষসমূহ) এর বিশেষণ হচ্ছে 'মাছনা' (দুই দুই), 'ছুলাছা' (তিন তিন) এবং 'রুবাআ' (চার চার)। কাতাদা ও মুকাতিল বলেছেন, কোনো কোনো ফেরেশতার রয়েছে দুটি ডানা। কোনো কোনো ফেরেশতার তিনটি। আবার কারো কারো ডানা রয়েছে চারটি। তবে এ সংখ্যা সীমাবদ্ধ নয়। এর প্রমাণ রয়েছে পরবর্তী বাক্যেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান'।

মুসলিম তাঁর বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থে 'লাক্বদ রআ মিন আয়াতি রব্বিহীল কুবরা' আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন হজরত ইবনে আব্বাসের একটি বিবরণ, সেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. হজরত জিবরাইলকে দেখেছিলেন তাঁর আসল আকৃতিতে। দেখেছিলেন, তিনি ছয় শত পক্ষবিশিষ্ট। ইবনে হাব্বানের বিবরণে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমি সিদরাতুল মুনতাহার পাশে জিবরাইলকে দেখেছিলাম তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে। দেখেছিলাম তার সাতশত পাখা। আর ওই পাখাগুলো থেকে ঝরে পড়ে মোতি, পান্না।

'আলখালক্ব' অর্থ সৃষ্টি। অর্থাৎ ফেরেশতাসহ আল্লাহ্র সকল সৃষ্টি। 'ইয়াযীদু ফীলখালক্ব' অর্থ তিনি সৃষ্টিকে বৃদ্ধি ঘটান। অর্থাৎ সৃষ্টিতে বৈচিত্র প্রবর্তিত হয় তাঁর অভিপ্রায়ানুসারেই। 'ইয়াযীদ' শব্দটি সকল প্রকার অতিরিক্ত প্রকাশক, তা আকৃতিগত হোক, অথবা হোক প্রকৃতিগত। মনোমুগ্ধকররূপ, সুমিষ্ট কণ্ঠ, উন্নত চরিত্র, প্রখর বুদ্ধি সব অতিরিক্ততাই শব্দটির অঙ্গীভূত।

জুহুরী মনে করেন, এখানে 'বৃদ্ধি করেন' বলে বুঝানো হয়েছে রূপ-সৌন্দর্য বৃদ্ধির কথা। কাতাদা বলেছেন, লোলুপ দৃষ্টি। কারো কারো মতে জ্ঞান, পৃথকীরকণ যোগ্যতা, প্রখর বিবেক 'বৃদ্ধি করেন' কথাটির অন্তর্ভূত। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, এর কোনো নির্ধারিত কোনো সীমারেখা নেই।

'আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান' অর্থ তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিধর বলেই তাঁর বৃদ্ধি করার ইচ্ছা অবশ্য কার্যকর হয়।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোনো অনুগ্রহ অবারিত করলে কেউ তা নিবারণকারী নেই এবং তিনি কিছু নিরুদ্ধ করতে চাইলে তৎপর কেউ তার উন্মুক্তকারী নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ যা চান, তা-ই হয়। তিনি যদি কারো প্রতি অনুগ্রহের দুয়ার নিরর্গল করে দেন, তখন তা যেমন কেউ রুদ্ধ করতে পারে না, তেমনি যদি কারো প্রতি নিরুদ্ধ করেন দানের দরোজা, তবে তা উন্মোচন করবার ক্ষমতাও কেউ রাখে না।

এখানে 'ইয়াফতাহি' অর্থ উন্মুক্ত করা, খোলা। মর্মার্থ— দান করা। ওই দান পার্থিবও হতে পারে। যেমন— বৃষ্টি, উপজীবিকা, নিরাপত্তা, সুস্থতা, জ্ঞান, সম্মান, রাজত্ব, নেতৃত্ব, সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি। আবার তা হতে পারে পারত্রিকও। যেমন— ইমান, ধর্মবোধ, নবুয়ত, পুণ্য কর্মের অনুপ্রেরণা, সামর্থ্য ইত্যাদি।

এখানে 'নিবারণকারী নেই' অর্থ আল্লাহ্ যাকে অনুগ্রাহয়িত করতে চান, তাকে প্রতিহত করার শক্তি কারো নেই। কারণ তাঁর অভিপ্রায় অপ্রতিরোধ্য। আর 'কেউ তার উন্মুক্তকারী নেই' অর্থ আল্লাহ্র অনুগ্রহ ভাণ্ডারের দুয়ার একবার কারো জন্য রুদ্ধ করা হলে, সে দুয়ার উন্মুক্ত করবার সাধ্যও কারো নেই। এখানে 'লাহা' (তার) সর্বনামটি সম্পর্কযুক্ত হবে অনুগ্রহের সঙ্গে। আর 'লাহু (তার) সর্বনামটি প্রযুক্ত হবে 'মা ইয়ুমসিকু' (কিছু নিরুদ্ধ করতে চাইলে) এর সঙ্গে।

'মা ইয়ুমসিকু' কথাটির 'মা' (যা কিছু) অব্যয়টি এখানে সাধারণার্থক। 'অনুগ্রহ' যেমন এর আওতাভূত, তেমনি আওতাভূত গজবও। তবে এখানকার বক্তব্য বিন্যাস দৃষ্টে সহজেই অনুমিত হয় যে, আল্লাহ্র গজব অপেক্ষা রহমতই প্রবল।

'তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' অর্থ তিনি চিরস্বাধীন পরাক্রমশালী। সুতরাং তার প্রতিপক্ষ হওয়া অসম্ভব। আর তিনি যেহেতু প্রজ্ঞাময়ও, তাই তাঁর প্রতিটি পরিকল্পনা ও পরিপ্রবর্তনা হয় প্রজ্ঞাময়।

বোখারী ও মুসলিম তাঁদের আপনাপন বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হজরত মুগীরা ইবনে শো'বা বলেছেন, রসুল স. তাঁর প্রতি নামাজ শেষে পাঠ করতেন— 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আ'লা কুললি শাইইন ক্বদীর। লা মানিআ' লিমা আ'ত্বইতা ওয়ালা মুয়তী লিমা মানা'তা ওয়ালা ইয়ানফাউ জাল জ্বাদদি মিনকাল জ্বাদ্দু।'

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'হে মানুষ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ করো। আল্লাহ্ ব্যতীত কি কোনো স্রষ্টা আছে, যে তোমাদেরকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী থেকে রিজিক দান করে? তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং কোথায় তোমরা বিপথে চালিত হচ্ছো'? একথার অর্থ— হে মানুষ! তোমাদের অস্তিত্ব ও অস্তিত্বরক্ষাকারী সকল উপকরণই আল্লাহ্র অনুগ্রহ। সুতরাং তোমরা আমার এমতো অনুগ্রহের যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। বলো, আকাশ-পৃথিবী থেকে আমি যেমন তোমাদেরকে জীবনোপকরণ প্রদান করি, তেমন করে জীবনোপকরণ কী আর কেউ দেয়? না দিতে পারে? সুতরাং এখনো কেনো তোমরা একথা মেনে নিচ্ছোনা কেনো? এখনো আঁকড়ে ধরে রয়েছো অংশীবাদিতার মতো ঘৃণ্য অপবিত্রতা? একবারের জন্যও কি ভেবে দেখেছো তোমাদের যাত্রা কোনদিকে?

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'তারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তবে তোমার পূর্বেও রসুলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হয়েছিলো'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনার প্রতি অসত্যারোপ করছে বলে আপনি মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না।

কারণ এটা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের চিরায়ত আচরণ। আপনার পূর্বসূরীগণের প্রতিও তাদের আপনাপন সম্প্রদায়ের অবাধ্যরা মিথ্যা আরোপ করেছিলো। তারা তখন ধৈর্যধারণ করেছিলো। সুতরাং আপনিও ধৈর্যধারণ করুন।

এখানে 'রসুলুন'(রসুলগণ) শব্দটিতে তানভীনের ব্যবহার করা হয়েছে মহামর্যাদার প্রতীক হিসেবে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী রসুলগণও ছিলেন মহামর্যাদাসম্পন্ন পবিত্র ও দীর্ঘজীবনের অধিকারী এবং দৃঢ়সংকল্পক।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র নিকটই সকল বিষয় প্রত্যানীত হবে'। একথার অর্থ— অবশেষে সকলকে তো আল্লাহ্ সকাশে উপস্থিত হতেই হবে। তখন তিনি সকলকে যথোপযুক্ত প্রতিফল দান করবেন। তখন আপনি ধৈর্যধারণের প্রতিদান হিসেবে হবেন মহাপুরস্কারের অধিকারী। আর আপনার বিরুদ্ধবাদীরা পাবে মহাশাস্তি।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'হে মানুষ! নিশ্চয়ই আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য, সুতরাং পার্থিব জীবন যেনো তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেনো কিছুতেই আল্লাহ্ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রবঞ্চিত না করে'। একথার অর্থ— হে মনুষ্য সম্প্রদায়! তওবা করলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে মার্জনা করবেন, আল্লাহ্র এই প্রতিশ্রুতিটি অবশ্যই সত্য। তাই বলে পৃথিবীর প্রতি মোহাচ্ছন্ন হয়ে তোমরা আবার আমার কথা ভুলে বোসো না যেনো। আর শয়তানের প্রবঞ্চনা থেকেও অবলম্বন কোরো সাবধানতা। সে আমার মার্জনার প্রতি তোমাদেরকে অতি আস্থাশীল করে তুলবে। এই মর্মে কুমন্ত্রণা দিবে যে, পাপ করলে ক্ষতির কিছু নেই। এক সময় তওবা করে নিলেই চলবে। আর আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল। ব্যাপারটা তো বিষভক্ষণ করেও বিষের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে নিশ্চিত থাকার মতো।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'শয়তান তো তোমাদের শত্রু, সুতরাং তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ করো'। একথার অর্থ— শয়তানের সঙ্গে তোমাদের শত্রুতা শুরু থেকেই। সুতরাং তাকে তোমরা কখনোই সুহৃদ বলে গ্রহণ কোরো না। সব সময় তাকে শত্রু হিসেবেই জেনো। কর্ম সম্পাদন কোরো তার প্ররোচনার বিপরীতে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সে তো তার দলবলকে আহ্বান করে কেবল এই জন্য যে, তারা যেনো জাহান্নামী হয়'। একথার অর্থ— মানুষকে জাহান্নামী করাই শয়তানের উদ্দেশ্য। আর পাপাচারী না হওয়া পর্যন্ত তা সম্ভব নয়। তাই সে সকলকে আহ্বান করে পাপের দিকে।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'যারা কুফরী করে, তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি এবং যারা ইমান আণে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও মহাপুরষ্কার।' একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যান যারা করে, তাদের জন্য অপেক্ষা করছে দোজখের কঠিন শাস্তি এবং বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আছে ক্ষমা ও মহাউপহার।

সূরা ফাতির ঃ আয়াত ৮, ৯

اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا ؕ فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ۖؗ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝ وَاللّٰهُ الَّذِىْۤ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ۝

r কাহাকেও যদি তাহার মন্দ কর্ম শোভন করিয়া দেখান হয় এবং সে ইহাকে উত্তম মনে করে, সেই ব্যক্তি কি তাহার সমান যে সৎকর্ম করে?' আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। অতএব উহাদের জন্য আক্ষেপ করিয়া তোমার প্রাণ যেন ধ্বংস না হয়। উহারা যাহা করে আল্লাহ্ তাহা জানেন।

r আল্লাহ্ই বায়ু প্রেরণ করিয়া উহা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চারিত করেন। অতঃপর আমি উহা নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি, অতঃপর আমি উহা দ্বারা ধরিত্রীকে উহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করি। এইরূপেই মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করিয়া উঠানো হইবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'কাউকে যদি মন্দকর্ম শোভন করে দেখানো হয় এবং সে একে উত্তম মনে করে, সেই ব্যক্তি কি তার সমান, যে সৎকর্ম করে'।

এখানে 'ফারাআহু হাসানান্' অর্থ তাকে দেখানো হয় শোভনরূপে। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক যাকে সহায়তাবিহীন অবস্থায় পরিত্যাগ করেন, তার বোধ-বুদ্ধি-বিবেক হয়ে যায় বিকৃত। তখন তার চোখে অসুন্দরকেই সুন্দর বলে মনে হয় এবং সুন্দরকে মনে হয় অসুন্দর। শয়তানই তাকে এরকম বিকৃত রুচিসম্পন্ন করে তোলে। এধরনের লোক কি ওই সকল মানুষের সমমর্যাদাসম্পন্ন কখনো হতে পারে, যারা শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত, প্রকৃতই সৎকর্মশীল?

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন'। এখানে 'ফাইন্নাললহা' কথাটির 'ফা' হয়েছে যোজক অব্যয়। সুতরাং বুঝতে হবে, এখানে কিছু কথা রয়েছে অনুক্ত। ওই অনুক্ত কথাসহ বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হে আমার রসুল! আপনি কখনো এমতো ধারণা করবেন না যে, আপনি ইচ্ছা করলে কাউকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারবেন। তাহলে তো আল্লাহ্র অভিপ্রায়ের আর মূল্যই রইলো না। আর সমান হয়ে গেলো আল্লাহর সাহায্যপুষ্ট এবং সাহায্যবিহীন দু'জনেই। এরকম হওয়া কি শোভন, না সম্ভব? সুতরাং মনে রাখুন, হেদায়েত ও গোমরাহী সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র অভিপ্রায়নির্ভর।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতএব, তাদের জন্য আক্ষেপ করে আপনার প্রাণ যেনো ধ্বংস না হয়। তারা যা করে আল্লাহ্ তা জানেন'।

এখানে 'হাসরাত' অর্থ আক্ষেপ। এর একবচন 'হসরত'। শব্দটি এখনে কর্মপদরূপে বিবেচ্য। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা ইমান গ্রহণ করছে না বলে আপনি ব্যথিত হবেন না। প্রশ্রয় দিবেন না আত্মহননপ্রবণ আক্ষেপণকে। উল্লেখ্য, রসুল স. মনে প্রাণে চাইতেন মক্কাবাসীরা সকলেই ইসলামের ছায়াতলে সমবেত হয়ে লাভ করুক ক্ষমার সাফল্য। কিন্তু তারা বার বার তাঁর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতো। ফলে প্রচ্ছন্ন আক্ষেপানলে নিরন্তর দগ্ধীভূত হতেন তিনি। সে কারণেই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে শব্দটির বহুবচনার্থক রূপ। অথবা বলা যেতে পারে, প্রকৃতই তাদের অপকর্ম ছিলো অসংখ্য। সেকারণে তাঁর আক্ষেপও ছিলো অপরিমেয়। আর সে জন্যই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচনার্থক 'হাসরাত'।

বাগবী লিখেছেন, আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছে আবু জেহেল ও তার সঙ্গী সাথীদেরকে উপলক্ষ করে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে জুহাকের মাধ্যমে জুয়াইবীর বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. আল্লাহ সকাশে নিবেদন জানালেন, হে আমার আল্লাহ! ওমর ইবনে খাত্তাব অথবা আবু জেহেলের মাধ্যমে তুমি তোমার ধর্মকে শক্তিশালী করো। আল্লাহ গ্রহণ করলেন হজরত ওমরকে। আর ওই ঘটনাকে উপলক্ষ করেই অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত।

সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছে বেদাতী ও প্রবৃত্তিপূজকদেরকে লক্ষ্য করে। কাতাদা বলেছেন খারেজীরাও এর অর্ন্তভুক্ত, যারা মনে করে মুসলমানদের হত্যা করা এবং তাদের সম্পদ লুট করা তাদের জন্য বৈধ। অন্য মহাপাপীরা এই আয়াতের লক্ষ্যস্থল নয়। কারণ তারা পাপ করলেও পাপকে পাপই জানে, খারেজীদের মতো পাপকে কখনো পুণ্য মনে করে না।

'তারা যা করে আল্লাহ তা জানেন' কথাটির অর্থ এখানে— আল্লাহ্ তাদের সকল কর্মকাণ্ডের খবর রাখেন। সুতরাং হে আমার রসুল! আপনি নিশ্চিত থাকুন, যথাসময়ে যথোপযুক্ত শাস্তি তারা পাবেই।

পরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ই বায়ু প্রেরণ করে তা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চারিত করেন। অতঃপর আমি তা নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি। অতঃপর আমি তার দ্বারা ধরিত্রীকে তাঁর মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করি। এইরূপেই মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করে ওঠানো হবে'।

এখানে 'ফাতুছীরু সাহাবান' কথাটি পূর্বোক্ত প্রসঙ্গের পুনরালোচনা। যেনো জ্ঞানপূর্ণ বিষয় সরাসরি উপলব্ধি হয় মস্তিষ্কে। অর্থাৎ যে আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছামতো কাউকে বিভ্রান্ত এবং কাউকে সৎপথে পরিচালিত করেন, সেই আল্লাহ্ই বায়ু প্রেরণ করেন। আর ওই বায়ু দ্বারা আকাশে সঞ্চারিত করেন মেঘমালা।

'ফা আহ্ইয়াইনা বিহী' তদ্দ্বারা আমি জীবিত করি। অর্থাৎ বৃষ্টির মাধ্যমে আমি সঞ্জিবীত করি বিশুষ্ক মৃত্তিকা। 'বিহী' অর্থ (তদ্দ্বারা) কথাটির 'তৎ' বা 'তা' সর্বনামটি এখানে পানির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কেননা বৃষ্টি বর্ষিত হয় মেঘ থেকে। অথবা সর্বনামটি এখানে মিলিত মেঘের সঙ্গে। কেননা মৃত্তিকার জীবন্ত হওয়ার নিমিত্ত পানি এবং পানির নিমিত্ত মেঘ। আর ভূমিকে সঞ্জীবিত করার অর্থ এখানে ভূমিকে শস্য শ্যামল করে দেওয়া। আর ভূমির মৃত্যু হচ্ছে তার উৎপাদন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলা । উল্লেখ্য, এই উপমাটির মাধ্যমে এখানে বুঝাতে চেষ্টা করা হয়েছে পুনরুত্থানের বিষয়টি। বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, মানুষের মৃত্যুপরবর্তী পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী। আর ওই পুনরুত্থান বৃষ্টিস্পর্শে বিশুষ্ক ভূমির সঞ্জীবিত হওয়ার মতো।

কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে জীবন দানের প্রকৃত তত্ত্বের। হজরত ইবনে ওমর সূত্রে মুসলিম কতৃক বর্ণিত একটি হাদিসে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন— এরপর আল্লাহ অবতীর্ণ করবেন শিশিরপাতের মতো বারিপাত। ফলে পুনরুজ্জীবনপ্রাপ্ত হয়ে সমুত্থিত হবে দেহাবয়বগুলো।

আবু শায়েখ তাঁর 'আল উজমা' গ্রন্থে লিখেছেন, ওয়াহাব বলেছেন, অগ্নিসমূদ্রের সূচনা হবে আল্লাহর জ্ঞানসমুদ্রে। আর তার পরিণতি হবে তার অভিপ্রায়সাগরে। তন্মধ্যে থাকবে গোস্পদে রক্ষিত জমাট সলিল। আল্লাহ ওই জমাট সলিল থেকে চল্লিশ দিন যাবৎ বৃষ্টিবর্ষণ করবেন কম্পমান ভূমির উপর, যা থেকে মানুষ উত্থিত হবে উদ্ভিদের আত্মপ্রকাশের মতো। অতঃপর জান্নাত ও জাহান্নাম থেকে সকল রূহ্ এনে স্থাপন করা হবে সিঙ্গায়। এরপর ইসরাফিল আদেশ পাবেন ফুৎকারদানের। ধ্বনিত হবে সিঙ্গার মহাফুৎকার। তখন রূহ্গুলো সম্পর্ক স্থাপন করবে তাদের নিজ নিজ দেহের সঙ্গে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, শিঙ্গার দুই ফুৎকারের মধ্যে ব্যবধান হবে চল্লিশ। জনতা জিজ্ঞেস করলো, হে আবু হোরায়রা, চল্লিশ আবার কী? দিন না মাস? তিনি বললেন, জানি

না। জনতা বললো, তাহলে কী চল্লিশ বৎসর? তিনি বললেন, তা-ও বলতে পারবো না। ওই সময় আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানিবর্ষণ করবেন। ফলে উদ্ভিদ গজানোর মতো গজিয়ে উঠবে পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত মানুষ। আর তাদের নতুন জীবন গঠিত হবে তাদের আপন আপন নিতম্বের একটি হাড়কে লক্ষ্য করে।

সুলায়মান সূত্রে ইবনে মোবারক বলেছেন, পুনরুত্থানের পূর্বে চল্লিশ দিবস যাবৎ বর্ষিত হবে জমাট পানি। ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, শিঙ্গার দুই ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময়ে আরশের মূল উপত্যকা থেকে উৎসারিত হবে জল প্রবাহ। আর দুই ফুৎকারের ব্যবধান হবে চল্লিশ বৎসর। ফলে নতুনভাবে জন্মলাভ করবে সবরকমের প্রাণী— মানুষ, পশু, পাখি। তাদের মধ্যে দিয়ে কেউ পথ অতিক্রম করলে সহজেই চিনতে পারবে তার পরিচিত জনকে। এরপর মুক্ত করে দেওয়া হবে আত্মাগুলোকে। সেগুলো তখন প্রবিষ্ট হবে আপন আপন শরীরে।

সূরা ফাতির আয়াত ১০

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ۭ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ۭ وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۭ وَمَكْرُ اُولٰٓئِكَ هُوَ يَبُوْرُ ﴿١٠﴾

r কেহ সম্মান ও ক্ষমতা চাহিলে সে জানিয়া রাখুক, সকল সম্মান ও ক্ষমতা তো আল্লাহ্রই। তাঁহারই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ সমুত্থিত হয় এবং সৎকর্ম উহাকে উন্নীত করে, আর যাহারা মন্দ কর্মের ফন্দি আঁটে তাহাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। তাহাদের ফন্দি ব্যর্থ হইবেই।

প্রথমে বলা হয়েছে — 'কেউ সম্মান ও ক্ষমতা চাইলে সে জেনে রাখুক সকল সম্মান ও ক্ষমতা তো আল্লাহরই'।

এখানে 'সম্মান ও ক্ষমতা' অর্থ ইহত্রিক ও পারত্রিক সম্মান ও ক্ষমতা। আলোচ্য ব্যাক্যের ব্যাখ্যাব্যপদেশে ফাররা বলেছেন, কেউ যদি জানতে চায় যাবতীয় সম্মান কার, তবে সে যেনো জেনে নেয়, সকল সম্মান আল্লাহ্র। সুতরাং আলোচ্য ব্যাক্যের প্রকাশ্য অর্থ এই দাঁড়ায়— কেউ যদি সম্মানাকাঙ্খী হয়, তবে সে যেনো তা যাচনা করে সাকুল্য সম্মানাধিকারী আল্লাহ্ সকাশে। আর সম্মানপ্রাপ্তির যোগ্যতা হচ্ছে আনুগত্য। কারণ তিনি দাতা আর অন্যরা গ্রহিতা। অংশীবাদীরা একথা জানে না বলেই তারা সুখ্যাতি ও সুনামের জন্য প্রার্থী হয় তাদের মিথ্যা

দেব-দেবীদের কাছে। কিন্তু আল্লাহ্‌পাক এমতো অপপদ্ধতিকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দিয়েছেন। যেমন— 'তারা যশ ও মান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌কে ছেড়ে দিয়ে উপাসনা করে অন্যের। না, না, কখনোই এরকম নয়'। কপটবিশ্বাসীরা আবার সম্মানিত হতে চায় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের দৃষ্টিতে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ বলেন— 'তারা কি তাদের নিকট সুখ্যাতি আশা করে? অবশ্যই যাবতীয় সম্মান আল্লাহ্‌র'।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ সমুত্থিত হয়'। এখানে পবিত্র বাক্য অর্থ— 'সুবহানাল্লহ্‌', 'আলহামদুলিল্লাহ্‌', 'ওয়াল্লহু আকবার', 'ওয়া লা ইলাহা ইল্লাহুয়া', 'তাবারাকাল্লহ্‌' ইত্যাদি।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং সৎকর্ম তাকে উন্নীত করে'। এখানে উন্নীত হওয়া অর্থ গৃহীত হওয়া। এরকম বলেছেন কাতাদা। অথবা উন্নীত হয় বলে এখানে বুঝানো হয়েছে ওই সকল ফেরেশতাকে, যারা বর্ণিত পবিত্র বাক্যাবলী লিখে নিয়ে উঠে যায় আরশবাহী ফেরেশতাদের কাছে। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, 'সুবহানাল্লাহ্‌', 'আলহামদুলিল্লাহ্‌', ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লহু', 'ওয়াল্লহু আকবার', 'তাবারাকল্লহ্‌'— এই পাঁচটি বাক্য পাঠ করলে একজন ফেরেশতা সঙ্গে সঙ্গে তা হাতের তালুতে নিয়ে তার ডানার নিচে লুকিয়ে ফেলে। তারপর শুরু করে ঊর্ধ্বারোহণ। পথে যে ফেরেশতাদের সঙ্গে সাক্ষাত হয় তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করে ওই বাক্যগুলোর পাঠকের জন্য। শেষে ওই ফেরেশতা আল্লাহ্‌র সমীপে উপনীত হয়ে সমর্পণ করে ওই বাক্যগুলো। আল্লাহ্‌র বাণীতেও একথার সমর্থন রয়েছে। যেমন— 'ইলাইহি ইয়াসআ'দুল কালিমুত্‌ তুয়্যিবু' (পবিত্র বাক্যাবলী উন্নীত হয় তার সমীপে)। এরকম বর্ণনা করেছেন হাকেম, বাগবী প্রমুখ। হাদিসটি আবার সুপরিণতসূত্রে ছা'লাবী ও ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে।

'আয়্‌মালুস্‌ সালিহ্‌' অর্থ সৎকর্ম। 'ইয়ারফাঊহু' অর্থ উহাকে উন্নীত করে। কালাবী ও মুকাতিল বলেছেন, এখানে কর্তৃবাচক প্রথম 'হু'(উহা) সর্বনামটি সম্পর্কিত হবে 'পবিত্র বাণীসমূহ' এর সঙ্গে। আর দ্বিতীয় 'হু'(উহা) সম্পৃক্ত হবে সৎকর্মের সঙ্গে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— পবিত্র বাক্যাবলী (আল্লাহ্‌র এককত্ব ও পবিত্রতা প্রকাশক বাক্য) গ্রহণযোগ্যতা আনয়ন করে সৎকর্মের। যতক্ষণ পর্যন্ত সৎকর্মের ভিত্তি আল্লাহ্‌র এককত্বের বিশ্বাসের উপরে হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন, এখানকার কর্তৃবাচক সর্বনাম 'হু' সম্পর্কযুক্ত হবে আল্লাহ্‌র সঙ্গে এবং এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— যে কর্ম কেবল আল্লাহ্‌র

উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয় তাকেই বলে 'আমলে সালেহ্' বা সৎকর্ম। আর প্রচারপ্রবণহীন অথবা জনরঞ্জনবিমুক্ত ওই সৎকর্মই ঊর্ধ্বদেশে উন্নীত হয়। সুতরাং বুঝতে হবে উদ্দেশ্যের সাধুতাই পবিত্র বাক্য ও সৎকর্ম গৃহীত হওয়ার কারণ।

সাধারণ তাফসীরবেত্তাগণের মতে সৎকর্মই পবিত্র বাক্যাবলীকে গ্রহণের উপযোগী করে দেয়। আর 'আলকালিমু' (বাক্য) এখানে বহুবচন নয়, একবচন। তবে জাতিবাচক। এ জন্য 'আত্‌ত্বয়্যিবাতু'র স্থলে উল্লেখিত হয়েছে 'আত্‌ত্বয়্যিবু'। অথবা বলা যেতে পারে, এখানে 'পবিত্র বাণীসমূহ' অর্থ কিছুসংখ্যক পবিত্র বাণী। অর্থাৎ ওই সকল বাণী যার ভিত্তি উদ্দেশ্যের (নিয়তের) সাধুতার উপর। হজরত ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনে যোবায়ের, ইকরামা প্রমুখের অভিমত এরকমই।

হাসান ও কাতাদা বলেছেন, এখানে 'পবিত্র বাণীসমূহ' অর্থ আল্লাহ্‌র জিকির। আর 'সৎকর্ম' হচ্ছে ফরজ কর্মসমূহ। যে ব্যক্তি জিকির করে, কিন্তু ফরজ দায়িত্ব পালন করে না, তার জিকির প্রত্যাখ্যাত হয়। এভাবে কখনো ইমানের বিকাশ ঘটে না। ইমান তো হৃদয়জ বিষয়। আর সৎকর্ম তার পরিচায়ক। যার কথা পবিত্র, অথচ যে সৎকর্মশূন্য, আল্লাহ্‌পাক তার কথাগুলো ছুঁড়ে মারেন তার মুখের উপর। আর যার কথা ও কর্ম পুণ্যময়, আল্লাহ্‌পাক সেটাকে গ্রহণ করেন। আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যার্থ এটাই।

পবিত্র হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে, কর্ম ব্যতীত কথা আল্লাহ্‌র দরবারে উন্নীত হয় না। কথা ও কর্মের সঙ্গে সংকল্পের সাধুতা অপরিহার্য। বিশুদ্ধ নিয়ত ছাড়া কেবল কথা ও কর্ম গ্রহণীয় নয়।

আমি বলি, আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যার্থ এরকম নয় যে, কর্মবিহীন বিশ্বাস নিরর্থক। কেননা রসুল স. জানিয়ে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়— আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। তাঁর কোনো সমকক্ষ ও অংশীদার নেই, মোহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রসুল, ঈসাও তাঁর বান্দা ও রসুল, তিনি আল্লাহ্‌র এক পুতঃপবিত্র সেবিকার সন্তান এবং তিনি আল্লাহ্‌র বাণী, যা আল্লাহ্ প্রক্ষিপ্ত করেছিলেন মরিয়মের প্রতি, তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রক্ষিপ্ত রূহ এবং যে আরো সাক্ষ্য দেয় জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, তবে সে প্রবেশ করবে জান্নাতে, তার কার্যকলাপ যেরকমই হোক না কেনো। হাদিসটি বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন হজরত উবাদা ইবনে সামেত থেকে। সুতরাং আয়াতের অন্তরার্থ হবে— পবিত্র বাণীসমূহ সমুত্থিত হয়। গৃহীতও হয়। তার সঙ্গে যদি থাকে সৎকর্ম, তাহলে তা হয় সোনায় সোহাগা। এমতাবস্থায় উচ্চারিত পবিত্র বাণী গৃহীত হয় আরো অধিক বিনিময় সহকারে।

এখন আসা যাক, ওই হাদিসের মর্মবিশ্লেষণে, যেখানে বলা হয়েছে— 'সৎকর্ম ব্যতীত কেবল কথা নিরর্থক'। এমতোক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে কপটবিশ্বাসীদের কথা। তাদের মুখের কথা তাদের মনের বিপরীত। অনেক সময় এ-ও দেখা যায় যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াও হয় মুখের কথার বিপরীত। এমতাবস্থায় মনের বিপরীত ও কথার বিপরীত কর্মাবলী তো ছলনা বা প্রতারণা। সুতরাং তা তো নিরর্থক হবেই। এভাবে ওই সকল কর্মও নিরর্থক পদবাচ্য, যা পরিশুদ্ধ সংকল্পহীন এবং যা মনের বিশ্বাসের বিপরীত। কেউ কেউ আবার বলেছেন, সৎকর্মাবলী পবিত্র বাক্য উচ্চারণকারীর মর্যাদাকে সমুন্নত করে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আর যারা মন্দ কার্যের ফন্দি আঁটে তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। তাদের ফন্দি ব্যর্থ হবেই'।

কুরায়েশ গোত্রপতিরা তাদের মন্ত্রণালয়ের বৈঠকে রসুল স.কে প্রতিহত করবার জন্য বিভিন্ন ফন্দি ফিকির করতো। তাদের ওই অপকর্মের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে আলোচ্য বাক্যে। আবুল আলীয়া এরকমই বলেছেন। অন্য এক আয়াতে বিষয়টির উল্লেখ এসেছে এভাবে— 'সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আপনার বিরুদ্ধে এইমর্মে চক্রান্ত করে যে, আপনাকে তারা বন্দী করবে, হত্যা করবে, না হয় দেশান্তর করবে'। কালাবী বলেছেন, এখানে বলা হয়েছে তাদের কথা, যারা অসদাচরণ করে। মুজাহিদ ও শহর ইবনে হাওশাব বলেছেন, এখানে উল্লেখ করা হয়েছে অহংকারীদের প্রসঙ্গ।

'হুয়া ইয়াবূর' অর্থ ব্যর্থ হবেই। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক তা ধ্বংস করে দিবেন। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'তারা চক্রান্ত করে। চক্রান্ত সৃষ্টি করেন আল্লাহ্ও। অবশেষে আল্লাহ্র উদ্যোগই সফল হয়'। অথবা বলা যেতে পারে, কথাটির অর্থ— আল্লাহ্পাক অবশ্যই নিশ্চিহ্ন করে দেন মদগর্বিতদের কার্যকলাপ।

সূরা ফাতির ঃ আয়াত ১১, ১২, ১৩, ১৪

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ؕ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ؕ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖۤ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿۱۱﴾ وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرٰنِ ۖ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ؕ وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّ تَسْتَخْرِجُوْنَ

حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَ تَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ
وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۲﴾ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ يُوْلِجُ النَّهَارَ فِي
الَّيْلِ ۙ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ
ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ وَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا
يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ﴿۱۳﴾ اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ۚ وَ
لَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ؕ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ
بِشِرْكِكُمْ ؕ وَ لَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ ﴿۱٤﴾ ع

r আল্লাহ্ তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্তিকা হইতে; অতঃপর শুক্রবিন্দু হইতে, অতঃপর তোমাদিগকে করিয়াছেন যুগল! আল্লাহ্র অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভ ধারণ করে না এবং প্রসবও করে না। কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয় না এবং তাহার আয়ু হ্রাস করা হয় না, কিন্তু তাহা তো রহিয়াছে 'কিতাবে'। ইহা আল্লাহ্র জন্য সহজ।

r দরিয়া দুইটি একরূপ নহেঃ একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অপরটির পানি লোনা, খর। প্রত্যেকটি হইতে তোমরা তাজা গোশ্ত আহার কর এবং আহরণ কর অলংকার যাহা তোমরা পরিধান কর, এবং তোমরা দেখ উহার বুক চিরিয়া নৌযান চলাচল করে যাহাতে তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করিতে পার এবং যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

r তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করান এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করান রাত্রিতে, তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে করিয়াছেন নিয়মাধীন; প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। তিনিই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিপালক। আধিপত্য তাঁহারই। এবং তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক তাহারা তো খর্জুর আঁটির আবরণেরও অধিকারী নহে।

r তোমরা তাহাদিগকে আহ্বান করিলে তাহারা তোমাদের আহ্বান শুনিবে না এবং শুনিলেও তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিবে না। তোমরা তাহাদিগকে যে শরীক করিয়াছ তাহা উহারা কিয়ামতের দিন অস্বীকার করিবে। সর্বজ্ঞের ন্যায় কেহই তোমাকে অবহিত করিতে পারে না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে, অতঃপর শুক্রবিন্দু থেকে, অতঃপর তোমাদেরকে করেছেন যুগল'।

পুনরুত্থান যে আত্মিক নয়, শরীরী, তার প্রমাণ পাওয়া যায় আলোচ্য আয়াতে। কারণ প্রথম সৃষ্টির আলোচনায় আসে মানুষের জটিল অস্তিত্বের শরীরী বিকাশের কথা। প্রথম সৃজন জটিল হওয়া সত্ত্বেও যখন পরিদৃশ্যমান, তখন পরবর্তী সৃজন সহজ হওয়া সত্ত্বেও কেবল আত্মার মতো অপরিদৃশ্যমান থাকবে কেনো। সুতরাং স্বীকার করতে হবে শারীরিক পুনরুত্থানই বাস্তবসম্মত।

এখানে মানব সৃজনের উপকরণরূপে নির্ধারণ করা হয়েছে দু'টি পদার্থকে— মৃত্তিকা ও শুক্রবিন্দু। একথার অর্থ, মানুষের প্রথম পিতা হজরত আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে সরাসরি মৃত্তিকা থেকে এবং এরপরের সকল মানুষকে অস্তিত্বশীল করা হয়েছে শুক্রবিন্দু থেকে। এভাবে মানবায়নের দূরতম ও নিকটতম উৎস হয়েছে মাটি ও শুক্রকণা। আর মানুষ আগমনের নিয়ম হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে যুগলবন্দী মানব ও মানবী। যথার্থই আলোচ্য বাক্যের শেষে বলে দেওয়া হয়েছে এভাবে— 'অতঃপর তোমাদেরকে করেছেন যুগল।'

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র অজ্ঞাতসারে কোনো নারী গর্ভধারণ করে না এবং প্রসব ও করে না।' একথার অর্থ আল্লাহ্র জ্ঞান সর্বত্রগামী। সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানায়ত্ত। নারীর গর্ভধারণ ও প্রসবও এর ব্যতিক্রম নয়।

এর পর বলা হয়েছে— 'কোনো দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধিকরা হয় না এবং তার আয়ু হ্রাস করাও হয় না। কিন্তু তা তো রয়েছে কিতাবে। এটা আল্লাহ্র জন্য সহজ'। একথার অর্থ— মানুষের আয়ুষ্কাল সুনির্ধারিত ও লওহে মাহফুজে সুলিখিত। ওই নির্ধারণের কোনো হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না। আর এরকম নির্ধারণ আল্লাহ্র জন্য মোটেও অসহজ নয়।

'ইল্লা ফী কিতাব' অর্থ কিতাবে বা লওহে মাহফুজে, সুরক্ষিত ফলকে। অথবা কিরামুন কাতিবীনের রোজনামচায়। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, লওহে মাহফুজে লিখিত আছে, অমুকের আয়ু হবে এতো বৎসর। তার জীবনের একদিন অতীত হলেও তার হিসাব রাখা হয়। লিখে রাখা হয়, তার এতোদিন আয়ু কমলো।

কোনো কোনো বিদ্বান আলোচ্য ব্যাক্যের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— লওহে মাহফুজে লেখা আছে, অমুকের হায়াত এতোদিন। সে যদি পুণ্যকর্ম করে তবে তার আয়ু এতোদিন করবো । আর যদি অপকর্ম করে, তবে আয়ু কমে যাবে এতোদিন। সকলকিছু পূর্বাহ্নে লিখিত রয়েছে লওহে মাহফুজে। রসুল স. এর এক হাদিসেও এসম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন— একমাত্র দোয়া

ব্যতীত অন্য কোনো কিছুই লওহে মাহফুজের বিধান খণ্ডাতে পারে না। আর শিষ্ট স্বভাব ব্যতীত কোনো কিছুই বয়সের বৃদ্ধি ঘটাতে পারে না। হজরত সালমান ফারসী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি।

পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'দরিয়া দু'টি একরূপ নয়— একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অপরটির পানি লোনা, খর'। কেউ কেউ বলেছেন 'ফুরাত' অর্থ সুমিষ্ট। তৃষ্ণানিবারক। 'সাইগুন' অর্থ সুপেয়, যা সহজে গলাধঃকরণ করা যায়। 'উজাজুন' অর্থ খর লবণাক্ত। কেউ কেউ বলেছেন, এমন লোনা যে কণ্ঠনালীতে দাহ উপস্থিত করে।

আলোচ্য বাক্যে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে। আর প্রমাণ প্রকাশ করা হয়েছে আল্লাহ্তায়লার পূর্ণ শক্তিমত্তার। মানবজাতি অখণ্ড হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের স্রোতরূপে পাশাপাশি অথচ পৃথকরূপে প্রবহমান। এতো তারই মহাপরাক্রমের প্রকাশ।

এরপর বলা হয়েছে— 'প্রত্যেকটি থেকে তোমরা তাজা গোশত আহার করো '। একথার অর্থ লবণাক্ত ও সুপেয় দু'টো সমুদ্রই আবার তোমাদের জন্য পার্থিব উপকরণপ্রদায়ক। সুমিষ্ট ও খর উভয় পানিতে বিচরণ করে মৎস্যকুল। তোমরা সেগুলোকে ধরো এবং ভক্ষণ করো।

উদ্ধৃত বাক্য দু'টো এখানে সমুদ্র দু'টোর বিশেষণ, যা আলোচিত হয়েছে প্রসঙ্গক্রমে। অথবা বলা যেতে পারে বিশেষণ না হয়ে বাক্য দু'টো হয়েছে এখানে দৃষ্টান্তের পরিপূরক। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— দু'টো সমুদ্র পৃথক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও সমুদ্র হিসেবে সমতুল। তেমনি বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী মানুষ হিসেবে এক। কিন্তু মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যের বিচারে তাদের মধ্যে রয়েছে আকাশ পাতাল ব্যবধান। সেই মূল উদ্দেশ্যের কথা এক আয়াতে বলা হয়েছে এভাবে— 'আমি মানুষ ও জ্বিনকে কেবল আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যে ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি'। এরকমও বলা যেতে পারে যে, অবিশ্বাসীদের চেয়েও লবণাক্ত সমুদ্র উত্তম। কেননা এর পানি সুপেয় না হলেও এর অভ্যন্তরস্থিত মৎস্য আহার করা যায়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আহরণ করো অলংকার যা তোমরা পরিধান করো'। একথার অর্থ — লবণাক্ত সাগর থেকে তোমরা আহরণ করো মণি-মুক্তা, যা ব্যবহার করো অলংকাররূপে। কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেছেন, মিঠা পানির সাগর থেকেও মণি-মুক্তা আহরিত হয়। লবণাক্ত সাগরে অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় মিঠা পানির অন্তর্গত প্রস্রবণ। ওই পানি লবণাক্ত পানির সঙ্গে মিশে যায়। এতে করে সৃষ্টি হয় মণি-মুক্তা।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমরা দেখ, তার বুক চিরে নৌযান চলাচল করে যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পারো এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো'।

এখানে 'ফীহি মাওয়াখিরা' অর্থ তার বুক চিরে। অর্থাৎ ওই সাগর দু'টোর বুক চিরে। এখানে 'মাওয়াখিরা' শব্দটি 'মাখিরাহ্' এর বহুবচন। এর অর্থ চিরে, বিদীর্ণ করে। অর্থাৎ সাগরের বুক বিদীর্ণ করে চলাচল করে জলযানসমূহ।

'মিন ফাদ্বলিহি' অর্থ অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পারো। অর্থাৎ সমুদ্র বাণিজ্যের মাধ্যমে তোমরা পেতে পারো আল্লাহ্র অনুগ্রহ রূপী পার্থিব বৈভব।

এখান কার 'লাআ'ল্লাকুম' কথাটির 'লাআ'ল্লা' আশাপ্রকাশক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আশা করা যায়, তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। কিন্তু আল্লাহ্পাক আশা-দূরাশার প্রভাব থেকে চিরমুক্ত, সতত প্রবিত্র। কারো কৃতজ্ঞতার তিনি মোটেও মুখাপেক্ষী নন। সুতরাং মনে করতে হবে এই বক্তব্যটির মধ্যে রয়েছে একটি শিক্ষণীয় বিষয়। আর সেটি হচ্ছে— উপকারীর প্রত্যুপকার করা উচিত। সুতরাং এই যথাবক্তব্যটি পালন করতে শিখো। আর তোমরা যেহেতু সর্ববিষয়ে আমার মুখাপেক্ষী, তাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যথাবিনিময়ও তোমরা আমার কাছ থেকে আশা করতে পারো। অথবা বলা যেতে পারে, এখানে 'লাআ'ল্লা' অর্থ 'লিআ'ল্লা' (যেনো)। যদি তাই হয়, তবে প্রকাশ ভঙ্গিটি হবে— যেনো তোমরা প্রকাশ করতে পারো তাঁর কৃতজ্ঞতা।

এর পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করান এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করান রাত্রিতে'। একথার অর্থ দিবস ও রজনীর ক্রমাবর্তন সম্পূর্ণতই তাঁর নিয়ন্ত্রণভূত। তিনিই এ দু'টোর সময় পরিসরে ঘটান হ্রাস-বৃদ্ধি। তাই কখনো দিন হয় ছোট এবং রাত হয় বড়। আবার কখনো ঘটে এর বিপরীত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন নিয়মাধীন, প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত'। এখানে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত অর্থ আবর্তনের নির্ধারিত সময় সীমা অনুসারে। অথবা পরিক্রমণের সর্বশেষ সীমারেখা পর্যন্ত। কিংবা মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত। অর্থাৎ মহাপ্রলয় যখন ঘটবে তখনই পরিসমাপ্ত হবে তাদের নিয়মিত পরিক্রমণের।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক। আধিপত্য তাঁরই'। একথার অর্থ— সকল কর্ম সাধিত হয় তাঁরই সদয় নির্দেশে। সুতরাং অবগত হও, তিনিই তোমাদের একমাত্র উপাস্য। তিনিই পালনকর্তা, এই মহাসৃষ্টির একক অধিপতি।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের ডাকো, তারা তো খেজুরের আঁটির আবরণেরও অধিকারী নয়'। এখানে 'ক্বিত্‌মীর' অর্থ খেজুরের আঁটির পর্দা। অর্থাৎ তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তু। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে অংশীবাদী জনগোষ্ঠী! তোমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যে সকল জড়প্রতিমার বন্দনা-অর্চনা করো, সেগুলো তুচ্ছাতিতুচ্ছ। উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা তাদের কই?

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'তোমরা তাদেরকে আহ্বান করলে তারা তোমাদের আহ্বান শুনবে না এবং শুনলেও তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিবে না'। একথার অর্থ— তোমাদের অপ্রাণ প্রতিমাগুলোর তো তোমাদের আর্তি শ্রবণের যোগ্যতাও নেই। তারা আবার তোমাদের উপকার কিংবা অপকার করবে কীভাবে? আবার ইবলিস ও তার দোসরদের শোনার ক্ষমতা আছে বটে, কিন্তু তাদেরও কিছু করার নেই। আর নবী ঈসা ও ফেরেশতারা সপ্রাণ বটে, কিন্তু তোমরা তাদেরকে যে আল্লাহ্‌র শরীক নির্ধারণ করো, তাতে করে তারাও তোমাদের প্রতি ভয়ানক অপ্রসন্ন। সুতরাং তোমাদের আর্তি-আকাঙ্খা পূরণ হওয়া কস্মিনকালেও সম্ভব নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা তাদেরকে যে শরীক করেছো তা তারা কিয়ামতের দিন অস্বীকার করবে'। একথার অর্থ— হে অংশীবাদী জনতা! তোমরা যাদেরকে আল্লাহ্‌র অংশী অথবা সমকক্ষ জ্ঞানে পূজা করো, তারা তো মহাবিচার দিবসের সময় তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে। স্পষ্ট ভাষায় সাক্ষ্য দিবে— 'মা কুনতুম ইয়্যানা তা'বুদূন' (তোমরা তো আমাদেরকে উপাসনা করোনি, তোমরা উপাসক ছিলে তোমাদের প্রবৃত্তির)। স্বকপোলকল্পিত মতাদর্শের। স্বরচিত কল্পনার।

শেষে বলা হয়েছে— 'সর্বজ্ঞের ন্যায় কেউই তোমাকে অবহিত করতে পারে না'। এখানে 'খবীর' অর্থ 'আ'লীম' (সর্বজ্ঞ)। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ই সকল কিছু অবগত। এভাবে কথাটির মর্মার্থ হবে— হে অংশীবাদীরা! তোমরা যারা প্রতারণাকবলিত হয়েছো, তারা ফিরে এসো সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে। তিনি তো সকলকিছুর প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক অবগত। সুতরাং তিনি তোমাদেরকে দিতে পারেন যথার্থ দিক নির্দেশনা। অন্য কেউ নয়।

সূরা ফাতির ঃ আয়াত ১৫, ১৬, ১৭, ১৮

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿١٥﴾
إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٦﴾ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ

بِعَزِيْزٍ ﴿١٧﴾ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى
حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ؕ اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ
يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا
يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٨﴾

r হে মানুষ! তোমরা তো আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী; কিন্তু আল্লাহ্, তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

r তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে অপসৃত করিতে পারেন এবং এক নুতন সৃষ্টি আনয়ন করিতে পারেন।

r ইহা আল্লাহ্র পক্ষে কঠিন নহে।

r কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করিবে না, কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কাহাকেও ইহা বহন করিতে আহ্বান করে তবে উহার কিছুই বহন করা হইবে না— নিকট আত্মীয় হইলেও। তুমি কেবল তাহাদিগকেই সতর্ক করিতে পার যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে না দেখিয়া ভয় করে এবং সালাত কায়েম করে। যে কেহ নিজকে পরিশোধন করে সে তো পরিশোধন করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। আল্লাহ্রই দিকে প্রত্যাবর্তন।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— 'হে মানুষ! সমগ্র সৃষ্টি তাদের অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও জীবনোপকরণ ইত্যাদির ব্যাপারে যেমন আল্লাহ্র সতত মুখাপেক্ষী, তেমনি তোমরাও। বরং তোমাদের মুখাপেক্ষিতা অন্যান্য সৃষ্টি অপেক্ষা আরো অনেক বেশী। কারণ তোমরা অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা না করেই আমানতের গুরুভারকে শিরোধার্য করেছো। সুতরাং তোমরা তো আপনাপন কর্মের হিসাব প্রদান, আমার অসন্তোষ ও নরাকাগ্নি থেকে নিষ্কৃতিপ্রাপ্তির জন্যও আমার মুখাপেক্ষী। আর আমি দ্যাখো, চিরঅভাবমুক্ত, চিরঅমুখাপেক্ষী, চিরপ্রশংসাভাজন।

এখানে 'আলগানিম' (অভাবমুক্ত) শব্দটির অঙ্গীভূত হয়েছে 'আলিফ লাম'। এভাবে অর্থ দাঁড়িয়েছে— ওই পবিত্র সত্তাই আল্লাহ্, যাঁর অমুখাপেক্ষিতা সুবিদিত এবং তাঁর মুখাপেক্ষী সৃষ্টির প্রতি তাঁর দয়াবর্ষণের বিষয়টিও কারো অজানা নয়। আর 'আল হামীদ' অর্থ প্রশংসাভাজন। অর্থাৎ সত্তাগতভাবেই তিনি সমগ্র সৃষ্টির প্রশংসা লাভের যোগ্য। পরের আয়াতদ্বয়ের (১৬, ১৭) মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে মুহূর্তমধ্যে তোমাদের সকলের অস্তিত্ব অবলুপ্ত করতে পারেন,

তদস্থলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নতুন কোনো সৃষ্টি, যারা হবে তোমাদের চেয়ে অধিক অনুগত। আর এরকম করা তাঁর পক্ষে মোটেও অসম্ভব নয়। এখানে 'বিখল্‌ক্বিন জ্বাদীদ' অর্থ এক নতুন সৃষ্টি।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'কোনো বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না'। একথার অর্থ— প্রত্যেককে অভিযুক্ত করা হবে তাদের আপনাপন কৃতকর্মের জন্য। একের পাপের দায় অপরের উপরে বর্তাবে না। তাছাড়া একজনের পাপের ভার অপরজন বহনও করবে না।

একটি সন্দেহ ঃ এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আর তারা অবশ্যই বহন করবে তাদের পাপের বোঝা এবং তাদের বোঝার সঙ্গে বহন করবে অপরের বোঝাও'। একথার অর্থ তা হলে কী?

সন্দেহভঞ্জনঃ বর্ণিত আয়াতে বলা হয়েছে তাদের কথা, যারা নিজেরা পাপী, উপরন্তু অন্যকেও পথভ্রষ্ট করার দায়ে দায়ী। এরকম লোকেরা অবশ্যই বহন করবে একই সঙ্গে পথভ্রষ্ট হওয়ার পাপ ও পথভ্রষ্ট করার পাপ।

সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু মুসা আশআ'রী থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, মহাবিচারের দিবসে কিছুসংখ্যক লোক পর্বতপ্রমাণ পাপরাশি নিয়ে উপস্থিত হবে। আল্লাহ্ তাদেরকে মার্জনা করবেন। আর তাদের পাপগুলো ছুঁড়ে মারবেন ইহুদী-খৃষ্টানদের দিকে। তিবরানী, হাকেম।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্পাক একেকজন মুসলমানের বিপরীতে দাঁড় করাবেন একেকজন ইহুদী অথবা খৃষ্টান। এরপর বলবেন, এটা তোমার জাহান্নামের বদলী। ইবনে মাজা, তিরমিজি। হজরত আনাস থেকে ইবনে মাজা ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, মহাপুনরুত্থান দিবসে একেক জন মুসলামানের সম্মুখে উপস্থিত করা হবে একেক জন পৌত্তলিককে। তাকে লক্ষ্য করে বলা হবে, এ হচ্ছে তোমার নরক থেকে নিষ্কৃতির বিনিময়।

আমি বলি, হাদিসগুলোর তাৎপর্য হচ্ছে, উম্মতে মোহাম্মদীর অন্তর্ভূত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা এমন কতকগুলো পাপ আবিষ্কার করেছে, যেগুলোর দ্বারা তারা নিজেরা তো পাপী হয়েছেই তদুপরি পাপী করেছে অসংখ্য মানুষকে। প্রজন্মপরম্পরায় প্রবাহিত হয়েছে ওই জঘন্য পাপ। আবার মুসলমানেরাও তার প্রভাব থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। ওই সকল পাপী মুসলমান শেষ বিচারের সময় আঁকড়ে ধরবে পরম মার্জনানিধান আল্লাহ্র মার্জনার অঞ্চল। আল্লাহ্পাকও তাদেরকে নিরাশ করবেন না। এটাই হবে আল্লাহ্পাকের বৃহৎমার্জনা (মাগফিরাতে কোবরা)। কিন্তু পাপের প্রবর্তককে তিনি দান করবেন দ্বিগুণ শাস্তি— নিজের পাপের জন্য এবং অপরকে পাপী করানোর জন্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'কোনো ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কাউকেও এটা বহন করতে অনুরোধ করে, তবে তার কিছুই বহন করা হবে না— নিকটাত্মীয় হলেও'। একথার অর্থ— পাপভারাবনত ব্যক্তি তার কোনো স্বজন-পরিজনকে কিছুক্ষণের জন্যও যদি পাপভার বহন করবার জন্য কাকুতি মিনতি করে, তবুও তা প্রত্যাখ্যাত হবে। বাগবী লিখেছেন হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তখন পিতা কিংবা মাতা তাদের পুত্রকে ডেকে বলবে, আমার পাপের বোঝাটা একটু ধরো তো বাবা। সে বলবে, নিজের পাপ বহন করতেই আমি হিমশিম খাচ্ছি। অন্যের বোঝা বইবো কীভাবে?

এরপর বলা হয়েছে— 'তুমি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পারো, যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে এবং সালাত কায়েম করে'। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি ভালো-মন্দ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌কে ভয় করার ও নামাজ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাতে থাকুন। কিন্তু আপনার এমতো উপদেশ মান্য করবে কেবল তারা, যারা আল্লাহ্‌কে না দেখেই ভয় করে। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন আখফাশ।

'বিল গইব' অর্থ না দেখে। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌কে প্রত্যক্ষ না করা সত্ত্বেও তাঁর শাস্তির ভয়ে ভীত থাকে, শাস্তির আলামত দর্শন না করলেও। অথবা তারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে এমন সময় যখন থাকে নিভৃতে, লোকচক্ষুর অন্তরালে।

শেষে বলা হয়েছে— 'যে কেউ নিজেকে পরিশোধন করে, সে তো পরিশোধন করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। আল্লাহ্‌র দিকেই প্রত্যাবর্তন'। এখানে 'নিজেকে পরিশোধন করে' অর্থ নিজেকে পাপমুক্ত রাখে।

সূরা ফাতির ঃ আয়াত ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬

وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ﴿١٩﴾ وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ﴿٢٠﴾ وَ لَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ ﴿٢١﴾ وَمَا يَسْتَوِى الْاَحْيَآءُ وَ لَا الْاَمْوَاتُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُوْرِ ﴿٢٢﴾ اِنْ اَنْتَ اِلَّا نَذِيْرٌ ﴿٢٣﴾ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا ؕ وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ﴿٢٤﴾ وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ

كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَ بِالزُّبُرِ وَ بِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ اَخَذْتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٢٦﴾

r সমান নহে অন্ধ ও চক্ষুষ্মান,

r আর না অন্ধকার ও আলো,

r আর না ছায়া ও রৌদ্র,

r এবং সমান নহে জীবিত ও মৃত। আল্লাহ্ই যাহাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান; তুমি শুনাইতে সমর্থ হইবে না যাহারা কবরে রহিয়াছে তাহাদিগকে।

r তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র।

r আমি তো তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে; এমন কোন সম্প্রদায় নাই যাহার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয় নাই।

r ইহারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে ইহাদের পূর্ববর্তীগণও তো মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল— তাহাদের নিকট আসিয়াছিল তাহাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন, গ্রন্থাদি ও দীপ্তিমান কিতাবসহ।

r অতঃপর আমি কাফিরদিগকে শাস্তি দিয়াছিলাম। কী ভয়ংকর আমার শাস্তি!

প্রথমোক্ত আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! শুনে রাখুন, অন্ধ-চক্ষুষ্মান, অন্ধকার-আলো যেমন বিপরীতার্থক, তেমনি বিপরীত মেরুর বাসিন্দা বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী। আর ছায়া ও রৌদ্র যেমন সমান নয়, তেমনি সমপর্যায়ের নয় তাদের অবশেষ গন্তব্য। একজন গমন করবে ছায়াসদৃশ জান্নাতে এবং অপরজন প্রবেশ করবে রৌদ্র সদৃশ উত্তপ্ত জাহান্নামে। বিশ্বাসীরা জীবিত এবং অবিশ্বাসীরা মৃত। মৃতরা শুনতে পায় না। সুতরাং হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে শুভউপদেশ শোনাতে পারবেন না। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকেই শুভউপদেশ শ্রবণ ও গ্রহণের সামর্থ্য দান করেন।

উল্লেখ্য, এখানে যারা চিরভ্রষ্ট, তাদেরকেই তুলনা করা হয়েছে কবরস্থ মৃতের সঙ্গে। তাদের পথপ্রাপ্তি তো সুদূরপরাহত, অসম্ভব।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল ! আপনার দায়িত্ব হচ্ছে মানুষকে আল্লাহ্র অসন্তোষ ও জাহান্নামের আগুন থেকে সতর্ক করা । হেদায়েত প্রদান করা নয়। হেদায়েত তো সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র অভিপ্রায়নির্ভর।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'আমি তো তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে; এমন কোনো জনপদ নেই, যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি আমা কর্তৃক সত্য ধর্মাদর্শসহ মানুষকে জান্নাতের শুভসমাচার প্রদান ও জাহান্নামের ভীতিপ্রদর্শনের নিমিত্তে প্রেরিত হয়েছেন। আপনি প্রেরিত সমগ্র মানবতার পথপ্রদর্শনার্থে। আর পূর্বের জামানার নিয়ম ছিলো প্রতি সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক পৃথক নবী অথবা নবীর পক্ষের কোনো পুণ্যবান সতর্ককারী প্রেরণ করা। আমার প্রবর্তিত ওই নিয়মের অন্যথা আমি করিনা। সুতরাং এমন কোনো সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব নেই, যাদের প্রতি প্রেরিত হয়নি আমার পক্ষ থেকে কোনো সতর্ককারী।

এখানে 'বাশীর' অর্থ শুভসমাচার প্রদাতা। অর্থাৎ সত্য অঙ্গীকারসহ বিশ্বাসীদেরকে জান্নাতের সুসংবাদদাতা। আর 'নাজীর' অর্থ সতর্ককারী। অর্থাৎ সত্য শপথ সহকারে জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শনকারী। 'নাজীর' অর্থ নবী, অথবা নবীর স্থলাভিষিক্ত কোনো পুণ্যবান বিদ্বান। প্রথমোক্ত বাক্যে 'বাশীর' ও 'নাজীর' উল্লেখিত হয়েছে একত্রে। তাই পরের বাক্যে 'বাশীর' আর পুনরুল্লেখ করা হয়নি। বলা হয়েছে কেবল 'নাজীর'। অথবা পরবর্তী বাক্যে কেবল 'নাজীর' উল্লেখ করার কারণ এই যে, শুভসংবাদ প্রদান অপেক্ষা ভীতিপ্রদর্শন অধিক গুরুত্বপূর্ণ। লাভপ্রাপ্তি অপেক্ষা ক্ষতি থেকে মুক্তি অধিকতর লাভজনক।

শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয় রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অপমন্তব্য ও অশুভ আচরণের কারণে ব্যথিত হবেন না। মনে করবেন যে, এটা কোনো নতুন বিষয় নয়। তাদের চিরাচরিত স্বভাব এরকমই। পূর্ববর্তী যুগের নবী-রসুলগণের সঙ্গেও তারা এরকমই করেছে। আপনি যেমন কোরআন নিয়ে আর্বিভূত হয়েছেন তারাও আর্বিভূত হয়েছিলেন আকাশী গ্রন্থ ও পুস্তিকা সহকারে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তেমনি এখনও আপনার সম্প্রদায়ের অধিকাংশ প্রত্যাখ্যান করে চলেছে কোরআন। পূর্ববর্তী জামানার সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে আমি যথোপযুক্ত শাস্তি দিয়েছিলাম। সে শাস্তি ছিলো অত্যন্ত ভয়ংকর। তেমনি আপনার প্রতি যারা শত্রুতা পোষণ করে চলেছে, তাদের জন্যও অপেক্ষা করছে মহাশাস্তি।

সূরা ফাতির ঃ আয়াত ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا ؕ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيْضٌ وَّ حُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ

أَلْوَانُهَا وَ غَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٢٧﴾ وَ مِنَ النَّاسِ وَ الدَّوَآبِّ وَ
الْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ
الْعُلَمَٰٓؤُا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَٰبَ اللَّهِ وَ
أَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً يَّرْجُونَ
تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَ يَزِيدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ۗ
إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾ وَ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَٰبِ هُوَ
الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾

r তুমি কি দেখ না, আল্লাহ্ আকাশ হইতে বৃষ্টিপাত করেন; এবং আমি ইহা দ্বারা বিচিত্র বর্ণের ফলমূল উদ্‌গত করি। আর পাহাড়ের মধ্যে আছে বিচিত্র বর্ণের পথ— শুভ্র, লাল ও নিকষ কাল।

r এইভাবে রং বেরং-এর মানুষ, জন্তু ও আন'আম রহিয়াছে। আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে যাহারা জ্ঞানী তাহারাই তাঁহাকে ভয় করে; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

r যাহারা আল্লাহ্‌র কিতাব তিলাওয়াত করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাহাদিগকে যে রিয্‌ক দিয়াছি তাহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাহারাই আশা করে এমন ব্যবসায়ের, যাহার ক্ষয় নাই।

r এইজন্য যে, আল্লাহ্ তাহাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে আরও বেশী দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

r আমি তোমার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি তাহা সত্য, ইহা পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের সমস্ত কিছু জানেন ও দেখেন।

প্রথম আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি তো অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন, আল্লাহ্ আকাশে ভাসমান মেঘপুঞ্জ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, ফলে জমিনে গজিয়ে ওঠে বিভিন্ন বৃক্ষ ও লতাগুল্ম, আর সেগুলোতে ধরে বিচিত্র বর্ণের ও স্বাদের ফল ও ফসল। হাল্‌কা ও প্রগাঢ় রঙের গিরিশ্রেণী ও গিরিপথের বৈচিত্র্যও নিশ্চয় আপনার দৃষ্টি না পড়ে পারেনি।

এখানে ‘জুদাদুন’ অর্থ গিরিপথ। ‘বীদুন’ ও ‘হুম্‌রুন’ অর্থ যথাক্রমে শাদা ও লাল। ‘মুখতালিফুন আলওয়ানুহা’ অর্থ বিচিত্রবর্ণের রং। আর ‘গরাবীবু সূদু’ অর্থ নিকষ কালো পর্বতসমূহ।

পরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— ‘এইভাবে রঙ বেরঙের মানুষ, জন্তু ও আনয়াম রয়েছে। আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে’।

একথার অর্থ— আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বহুধা বিচিত্র। আর এই পৃথিবীতেও ঘটেছে অসংখ্য বৈচিত্র্যপূর্ণ সৃষ্টির সমারোহ। বৃক্ষরাজি, ফলমূল, বহুবর্ণের ও প্রকৃতির পর্বতশ্রেণী যেমন এখানে রয়েছে, তেমনি রয়েছে অনেক রকমের ও রঙের মানুষ, বন্য জন্তু ও গৃহপালিত পশু। এসকল কিছু সম্পর্কে যারা চিন্তা ভাবনা করে, তারা জ্ঞানী। তারা বুঝতে পারে, এসকলকিছুর সৃজয়িতা নিশ্চয় কেউ একজন রয়েছেন। তিনি যে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর, তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং তাঁকে বিশ্বাস করা ও তার মহাপরাক্রমকে সমীহ করে চলাই হচ্ছে জ্ঞানের দাবি। তাই যারা জ্ঞানী, তারা এ অপরিহার্য দাবী পূরণের চেষ্টায় সতত শংকিত থাকেন।

শায়েখ শিহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দি লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের বিবরণদৃষ্টে একথাই অনুমিত হয় যে, যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে না, তারা জ্ঞানী নয়। আমি বলি, আল্লাহ্‌র আনুরূপ্যহীন মহিমা, পরাক্রম ও তাঁর গুণবত্তা সম্পর্কীয় পরিচিতি লাভই হচ্ছে আসল জ্ঞান। আর এমতো জ্ঞানের অধিকারী যারা তাদের হৃদয়ে আল্লাহ্‌র ভয় না থাকা অসম্ভব। সুতরাং বুঝতে হবে ভয়শূন্যতা অর্থই জ্ঞানশূন্যতা।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই ব্যক্তিই আল্লাহ্‌কে ভয় করে, যে জানে আল্লাহ্‌র অতুলনীয় প্রতাপ-প্রতিপত্তি ও শক্তিমত্তার কথা। সুতরাং আল্লাহ্‌র সত্তা-গুণবত্তা সম্পর্কে যার জ্ঞান যতো বেশী, সে ততো বেশী আল্লাহভীরু।

বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, জননী আয়েশা বলেছেন, একবার রসুল স. কিছু কর্ম সম্পদান করলেন, অন্যকেও অনুমতি দিলেন এরকম করতে। তৎসত্ত্বেও কিছুসংখ্যক লোক ওই কর্ম থেকে বিরত রইলো। একথা রসুল স. এর কানে যেতেই তিনি স. বাইরে অপেক্ষমান জনতার সামনে গিয়ে ভাষণ দিলেন। বললেন, আমি জানতে পেলাম, কেউ কেউ আমার অনুসরণ পরিত্যাগ করেছে। শপথ আল্লাহ্‌র! আমিই আল্লাহ্‌ সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত এবং আমিই তাঁকে ভয় করি সবচেয়ে বেশী।

অপরিণত সূত্রে মাকহুল থেকে দারেমী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, একজন ইবাদতসর্বস্ব ব্যক্তির তুলনায় একজন জ্ঞানীর মর্যাদা তোমাদের তুলনায় আমার মর্যাদার মতো। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন ‘যারা জ্ঞানী, তারাই তাঁকে ভয় করে’।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার জীবনাধিকারী সেই পবিত্র সত্তার শপথ করে বলি, আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে, তবে হাসতে কম, কাঁদতে বেশী।

বর্ণিত হাদিসসমূহের আলোকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌কে সবচেয়ে বেশী ভয় করেন নবী-রসুলগণ, তারপর অলী আল্লাহ্‌গণ, তারপর সাধারণ আলেমসমাজ। মাসরুক বলেছেন, আল্লাহ্‌ভীতির অধিকারী হওয়ার অর্থ বিশাল জ্ঞানের অধিকারী হওয়া। শা'বীল বলেছেন, সে-ই ব্যক্তিই আলেম, যে আল্লাহ্‌কে অধিক ভয় করে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী বলেই শাস্তিবিধান করেন অবাধ্যদের এবং মহামার্জনাপরবশ বলেই অনুতপ্তজনকে করেন দয়ার্দ্র মার্জনা। সুতরাং অন্তরে আল্লাহ্‌ভীতির লালন অপরিহার্য।

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্‌র কিতাব তেলাওয়াত করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করে এমন ব্যবসায়ের— যার ক্ষয় নেই'।

এখানে 'যারা আল্লাহ্‌র কিতাব তেলাওয়াত করে' অর্থ যে নিয়মিত পাঠ করে কোরআন ও অন্যন্য আসমানী কিতাব। ইতো পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে কোরআন মজীদের প্রতি অসত্যরোপের অপপরিণতিসর্ম্পকে। আর আলোচ্য আয়াতে বলা হলো কোরআন আবৃত্তির শুভপরিণামের কথা। প্রকারান্তরে এখানে কোরআন মজীদের বিধানানুসারে জীবন যাপনকারীদের প্রশংসাই বর্ণনা করা হয়েছে। 'সালাত কায়েম করে' অর্থ যথাগুরুত্ব সহকারে যথানিয়মে আদায় করে নামাজ। 'প্রকাশ্যে ও গোপনে ব্যয় করে' অর্থ, ব্যয় করে সুযোগ-সুবিধা মতো কেবল আল্লাহ্‌র পরিতোষ অর্জনার্থে, কেউ দেখল কিনা এমতো চিন্তা না করে। অথবা ফরজ যাকাত দেয় প্রকাশ্যে এবং নফল দান করে অপ্রকাশ্যে। 'এমন ব্যবসায়ের যার কোনো ক্ষয় নেই' অর্থ কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিবেদিত কোরআন পাঠ, নামাজ, জাকাত ইত্যাদি এমন লাভজনক বাণিজ্য, যার মধ্যে ক্ষতির কোনই আশংকা নেই, আছে শুধু লাভ আর লাভ।

এর পরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'এই জন্য যে, আল্লাহ্ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো বেশি দিবেন'। একথার অর্থ— ওই সকল লোক বর্ণিত পুণ্যকর্মসমূহের পূর্ণ প্রতিফল লাভের আশায় এবং ওই আশায়ও যে, আল্লাহ তাঁর আপন অনুগ্রহে দান করবেন পুণ্যকর্মের তুলনায় অনেক বেশী। এমতোব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে 'লি ইউওয়াফ্‌ফিইয়াহুম' (যেনো তিনি প্রতিফল দিবেন) কথাটির সম্পৃক্তি ঘটবে

একটি উহ্য ক্রিয়ার সঙ্গে। ফলে অর্থ দাঁড়াবে— তারা যা করে, তার পূর্ণ প্রতিফল তারা পাবে। অথবা বলা যেতে পারে, 'লি ইউওয়াফ্‌ফিইয়াহুম' বাক্যের 'লি' (যেনো) অব্যয়টি এখানে পরিণতিসূচক। যদি তাই হয়, তবে এর সম্পৃক্তি ঘটবে পূর্ববর্তী আয়াতের 'ইয়ারজুনা' (তারা আশা করে) বাক্যর সঙ্গে। তখন বক্তব্যটি দাঁড়াবে— ওই আশাবাদী ব্যবসার পরিণতি হবে, আল্লাহ্ তাদেরকে দান করবেন পূর্ণ প্রতিফল। তদুপরি দয়াপরবশ হয়ে দান করবেন আরো অনেক বেশী।

ইবনে আবি হাতেম ও আবু নাঈম উল্লেখ করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, 'পূর্ণ প্রতিফল দিবেন' অর্থ আল্লাহ্ তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে।

এরপর বলা হয়েছে — 'তিনি তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী'। একথার অর্থ পদস্খলন ঘটে যাওয়ার পর যারা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে সত্যাভিমুখী হয়, তাদের জন্য তিনি মহাক্ষমাপরবশ। আর যারা প্রকৃতই আনুগত্যপরায়ণ, তিনি তাদের গুণগ্রাহী।

আবদুল গণির সংকলনে দেখা যায়, আলোচ্য আয়াত অবতরণের প্রেক্ষিত ছিলো হোসাইন ইবনে হারেছ ইবনে আবদুল মুত্তালিব।

এরপরের আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে— 'আমি তোমার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি, তা সত্য এটা পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আমি আপনার প্রতি যে মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি তা বিশ্বাস জ্ঞান, মূল তত্ত্ব এবং অতীতায়িত জাতিসমূহের ইতিবৃত্তের দিক দিয়ে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের অনুরূপ। এগুলোর মধ্যে মৌলিক কোনো প্রভেদ নেই।

শেষে বলা হয়েছে— 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের সবকিছু জানেন ও দেখেন'। একথার অর্থ— প্রাণি ও বস্তুনিচয়ের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। সব কিছুই তাঁর জ্ঞান ও গোচরায়ত্ত।

সূরা ফাতিরঃ ৩২

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ وَ مِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَ مِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ؕ ﴿۳۲﴾

r অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করিলাম আমার বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাদিগকে আমি মনোনীত করিয়াছি; তবে তাহাদের কেহ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেহ মধ্যপন্থী এবং কেহ আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী। ইহাই মহা অনুগ্রহ—

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ছুম্‌মা আওরাছনাল কিতাবাল্‌ লাজীনাস্‌ ত্বফাইনা মিন ইবাদিনা'। একথার অর্থ— 'অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করলাম আমার বান্দাদের মধ্যে থেকে যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি'।

কোনো কিছুর মালিকানা হস্তান্তর করাকে বলে 'ইরছ'। তাই 'আওরাছনা' অর্থ 'আখ্‌খারনা' (পরবর্তীদেরকে দিয়েছি)ও করা হয়েছে। এ কারণেই উত্তরাধিকারকে বলে 'মীরাছ'। এভাবে উদ্ধৃত বাক্যের বক্তব্যার্থ দাঁড়িয়েছে— আমি বিগত উম্মতের কিতাবের উত্তরাধিকারী করে দিয়েছি পরবর্তী উম্মতকে। সকলকে নয়, বরং তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মনোনীত ব্যক্তিত্বকে। 'মিন ইবাদিনা' (আমার বান্দাদের মধ্য থেকে) কথাটির 'মিন' (থেকে, হতে) অব্যয়টি এখানে আংশিক অর্থপ্রকাশক এবং 'আমার বান্দা' কথাটির সঙ্গে এর সম্বন্ধটি এখানে আভিজাত্যপ্রকাশক।

'ইবাদ' (বান্দাগণ) অর্থ এখানে সাহাবায়ে কেরাম। তাঁদের অবর্তমানে ওলামায়ে কেরাম। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সমগ্র ইসলামী উম্মতই 'ইবাদ' এর বলয়ভূত। আল্লাহ্‌ এই উম্মতকে মনোনীত করেছেন মধ্যপন্থীরূপে। সেকারণেই এরা উম্মতশ্রেষ্ঠ। এদেরকে দিয়েছেন পৃথক প্রকৃতির আভিজাত্য। বানিয়েছেন সকল উম্মত সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতা। আর বলা বহুল্য যে, এমতো আভিজাত্য হয়েছে এদের নবী মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর মাধ্যমে। জনৈক কবি তাই বলেছেন—

তুবা লানা মা'শারাল ইসলামি ইন্‌না লানা
মিনাল ই'নায়াতি রুকনান গইর মনিহাদিমী
লাম্‌মা দাআ'ল্লহু দায়ীনা লি ত্বয়াতিহী
বি আকরমির রসুলি কুন্‌না আকরমাল উমামী।

অর্থ ঃ হে ইসলামী উম্মত! আনন্দোল্লাস করো। আমাদের জন্য রয়েছে একটি সুদৃঢ় অবলম্বন, যা প্রকাশিত হয়েছে আল্লাহ্‌র অপার বদান্যতায়, যা অনিঃশেষ। তিনি তাঁর আনুগত্যের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাঁর প্রিয়তম রসুলের মাধ্যমে। সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে আমরাও হয়েছি অভিজাত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবে তাদের কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থী এবং কেউ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী। এটাই অনুগ্রহ—'

এখানে 'নিজের প্রতি অত্যাচারী' অর্থ, ওই সকল উম্মতে মোহাম্মদী যাদের ইবাদত বন্দেগী অসুষ্ঠ ও সংক্ষিপ্ত। এদের সম্পর্কে এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'আর তারা এমতো আশাপোষণ করে যে, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে, অথবা গ্রহণ করা হবে তাদের অনুতাপ'। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে এভাবে— 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা আত্মঅত্যাচার করেছো, তারা আল্লাহ্‌র করুণা থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় তিনি তোমাদেরকে মার্জনা করবেন। তিনি যে মহামার্জনাপরবশ। পরম দয়ার্দ্র।

'মধ্যপন্থী' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে ওই সকল লোককে, যারা কোরআন বাস্তবায়ন করেছে বাহ্যিক পটভূমিকার ভিত্তিতে। কোরআনের জ্ঞানসমুদ্রের গভীর গভীরতর অবগাহনে এরা অনুপস্থিত। এদের সম্পর্কে এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'আর অন্যান্যরা স্বীকৃতি দিয়েছে তাদের পাপের। তারা সৎকর্মের সঙ্গে মিশ্রিত করেছে অসৎকর্ম। আশা করা যায়, আল্লাহ্ তাদের অনুতাপকে গ্রহণ করবেন। অবশ্যই আল্লাহ্ ক্ষমাপরবশ ও দয়াবান'।

'বিইজনিল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্‌র নির্দেশে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়ানুসারে যারা নিমজ্জিত হয়েছে— কোরআনের অন্তর্নিহিত রহস্যসাগরে, মহাকল্যাণকর কর্মে। এদের সম্পর্কে ঘোষিত হয়েছে— 'আস্‌সাবিকুনাল আউয়ালূনা মিনাল মুহাজ্বিরীনা ওয়াল আনসার .....' শেষ পর্যন্ত। আরো ঘোষিত হয়েছে— 'আস্‌সাবিকুনাস্ সাবিকুন..... শেষ পর্যন্ত। এ সকল আয়াতে যে দুই দল লোকের কথা বলা হয়েছে তাঁরাই দক্ষিণ ভাগের লোক।

কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, 'মধ্যপন্থী' তারা, যারা কার্যকর করে কোরআনের অধিকাংশ বিধান। আর 'কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী' তারা, যারা কোরআন বাস্তবায়নের সাথে সাথে পথপ্রদর্শন করে অন্যান্যকে।

স্বসূত্রে বাগবী উল্লেখ করেছেন, আবু ওসমান নাহদী বর্ণনা করেছেন, একবার আমি হজরত ওমরকে এই আয়াত পাঠ করতে শুনলাম। পাঠ শেষে তিনি বললেন, আমাদের মধ্যে অগ্রণী তারা, যারা কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী, যারা মধ্যপথাবলম্বী তারা পরিত্রাণপ্রাপ্ত। আর যারা আত্মঅত্যাচারী, তাদেরকে করা হবে মার্জনা।

হজরত সুহাইব বলেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, মুহাজিরেরা অগ্রসূরী, শাফায়াতকারী। তারা তাদের আল্লাহ্‌র নৈকট্যধন্য। যাঁর অধিকারে মোহাম্মদের জীবন, সেই পবিত্র সত্তার শপথ করে বলছি, মহাবিচারের দিবসে তারা উপস্থিত হবে কাঁধে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। সোজা গিয়ে করাঘাত করবে বেহেশতের দ্বারে। দৌবারিক জিজ্ঞেস করবে, আপনারা কে? তারা বলবে, আমরা মুহাজির।

দৌবারিক বলবে, আপনাদের হিসাব কি সম্পন্ন হয়েছে? একথা শুনে মুহাজিরেরা হাঁটুমুড়ে বসে পড়বে। প্রার্থনা করবে, হে আমাদের প্রভুপালয়িতা। আমরা তোমার তুষ্টির আশায় ঘরদোর ছেড়ে পথে নেমেছি। পরিত্যাগ করেছি পিতা-মাতা, সহায়সম্পদ। তারপরেও কি আমাদেরকে হিসাব দিতে হবে? এর জবাবে আল্লাহ্ তখন তাদেরকে দিবেন স্বর্ণনির্মিত পক্ষ। যা অলংকৃত থাকবে জবরজদ ও মণিমুক্তা দিয়ে। ওই পক্ষগুলোতে ভর করে তারা উড়ে চলে যাবে জান্নাতে। এক আয়াতে এমতো বিবরণের মর্ম প্রতিভাত হয়েছে এভাবে— যাবতীয় স্তব-স্তুতি আল্লাহ্র, যিনি আমাদের নিকট থেকে দূর করে দিয়েছেন দুঃখ যাতনা.......লুগুব পর্যন্ত। রসুল স. বলেছেন, নিজেদের বাড়ী ঘর যেমন অতিপরিচিত তেমনি চেনা-জানা মনে হবে বেহেশতীদের আবাস তাদের নিজেদের কাছে। হজরত ওসমান এই আয়াত শুনে আতঙ্কিত হয়ে বলেছিলেন, আমাদের অগ্রণী ছিলেন যোদ্ধাবৃন্দ। মধ্যপথাবলম্বী ছিলো নগরবাসী। আর আত্মঅত্যাচারীরা হচ্ছে বেদুইন।

আবু কোলাবা বলেছেন, আমি হাদিসটি ইয়াইয়া ইবনে মুঈন সমীপে উপস্থাপন করলে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। বাগবী হাদিসটি উপস্থাপন করেছেন সুপরিণতসূত্রে। সাঈদ ইবনে মনসুর ও বায়হাকী বলেছেন, বক্তব্যটি হজরত ওমরের।

আবু সাবেত সূত্রে বাগবী উল্লেখ করেছেন, এক লোক মসজিদে প্রবেশ করলেন। বললেন, হে আল্লাহ্! কৃপা করো আমার মতো একজন ভবঘুরের উপর। আমার অবর্তমানে তোমার কোনো পুণ্যবান বান্দাকে আমার উপলক্ষ করে দাও। তখন মসজিদে উপস্থিত ছিলেন হজরত আবু দারদা। তিনি বললেন, আমার দ্বারা যদি আপনার মহৎ বাসনা পূর্ণ হয়, তবে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করবো। আপনার সাক্ষাত পেয়ে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করছি। আমি স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. একবার এই আয়াত আবৃত্তি করার পর মন্তব্য করেছিলেন, অগ্রণীগণ তো কোনোরূপ পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্যতিরেকেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। মধ্যপন্থীগণের হিসাব হবে সহজ। আর যারা আত্ম-অত্যাচারী, তাদের কিছুকাল আটকে রাখা হবে। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়বে তারা। অবশেষে তারাও প্রবেশ করবে জান্নাতে। এরকম বলায় তিনি স. আবৃত্তি করলেন, 'যাবতীয় প্রশাংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদের নিকট থেকে অপসারণ করেছেন অনুতাপ। অবশ্যই আমাদের প্রভুপালয়িতা ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী'। হাদিসটি আরো বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ, ইবনে জারীর, তিবরানী, হাকেম ও বায়হাকী। তবে তাঁদের বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— কিন্তু যারা আত্ম-অত্যাচারী তাদেরকে আটক রাখা হবে বিচারপর্বের শেষ সময় পর্যন্ত। এরপর আল্লাহ্ দয়াপরবশ হয়ে মার্জনা

করে দিবেন তাদের পাপরাশি। তখনই তারা বলে উঠবে— 'যাবতীয় স্তব-স্তুতি সেই আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের নিকট থেকে দূর করে দিয়েছেন বিষণ্ণতা। তিনি মহাক্ষমাপরবশ, গুণগ্রাহী'।

বায়হাকী লিখেছেন, হজরত আবু দারদা থেকে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন পদ্ধতিতে। আর যে হাদিস বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়, সে হাদিসে নিশ্চয়ই থাকে কিছু মৌলিকত্ব। বাগবী লিখেছেন, এই আয়াতের প্রেক্ষিতে হজরত উসামা ইবনে জায়েদ কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, এই তিন শ্রেণীর লোক আমারই উম্মতভূত। হজরত উসামা ইবনে জায়েদ থেকে বায়হাকীও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। কা'ব এবং আতা থেকেও বর্ণিত হয়েছে, এই তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এই আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে ইবনে আবিদ্ দুন্‌ইয়া ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই তিন ধরনের লোকই উম্মতে মোহাম্মদীর অন্তর্ভূত। এদেরকেই করা হয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবধারীদের উত্তরাধিকারী। এদের মধ্যে আত্মঅত্যাচারীরা পাবে ক্ষমা, মধ্যপন্থীদের জবাবদিহিতা হবে শিথিল এবং অগ্রণীরা জান্নাত পাবে উপহার হিসেবে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে ইমাম আহমদ ও তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত এবং তিরমিজি কর্তৃক উত্তম আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রসুল স. বলেছেন, এসকল লোক একই দলের। তারা সকলেই গমন করবে জান্নাতে। ফারইয়াবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত বারা ইবনে আজীব 'নিজের প্রতি অত্যাচারী' কথাটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তারাও বেহেশতে যাবে।

হজরত আবু মুসা সূত্রে ইবনে আবী আসেক ও ইসপাহানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ মহাপুনরুত্থান দিবসে সকলকে একত্রিত করবেন। তারপর পৃথক করে দিবেন আলেমগণকে। বলবেন, হে আলেম সমাজ! আমি জেনেশুনেই তোমাদেরকে জ্ঞানদান করেছিলাম। আর শাস্তি দেওয়ার জন্য নিশ্চয়ই তা দান করিনি। যাও, তোমাদেরকে মাফ করে দিলাম।

নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণের মাধ্যমে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, হজরত ছা'লাবা ইবনে হাকাম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে আরশে আনুরূপ্যবিহীনরূপে সমাসীন হয়ে আল্লাহ্‌পাক আলেম সমাজকে লক্ষ্য করে বলবেন, মার্জনা করার উদ্দেশ্যেই আমি তোমাদেরকে দান করেছিলাম এলেম ও হিকমত। শোনো, আমি কারো পরোয়াই করি না।

আবু ওমর সানআনী হাফস্ ইবনে মায়সারার বর্ণনা উল্লেখ করে ইবনে আসাকের বর্ণনা করেছেন এভাবে— মহাবিচারের দিবসে আলেমগণকে রাখা হবে

পৃথক করে। বিচারকর্ম সমাধার পর আল্লাহ্ তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, আমি আমার প্রজ্ঞাকে একটি বিশেষ কল্যাণকর উদ্দেশ্যে তোমাদের কাছে গচ্ছিত রেখেছিলাম। আজ তোমাদের সম্মুখে ঘটাতে চাই তার প্রকাশ। যাও, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো, যা কিছুই করে থাকো না কেনো?

বাকীয়া ইবনে সুবহান বলেছেন, একবার আমি জননী আয়েশা সকাশে নিবেদন করলাম, হে মাতঃ! 'ওয়া আওরাদ্না' থেকে শেষ পর্যন্ত আয়াতখানির মর্মার্থ কী? তিনি বললেন, বৎস! এরা সকলেই জান্নাতে যাবে। অগ্রণীরা হবে রসুল স. এর সমকালের লোক। তিনি তো তাদের জান্নাতী হওয়ার কথা বলেই গিয়েছেন। মধ্যপন্থীগণও অগ্রণীগণের অনুসারী। আর আত্ম-অত্যাচারীদের দৃষ্টান্ত যেমন আমি, তুমি। জননী তাঁর বিনয় প্রকাশ করেছেন এভাবেই।

আমি বলি, এই তিন শ্রেণীই এই উম্মতের ওলী শ্রেণীভূত। অর্থাৎ তাঁরা ওলীআল্লাহ্। প্রথম শ্রেণী নিজের প্রতি অত্যাচার করে। অবলম্বন করে বৈরাগ্য। সিদ্ধ কার্যাবলী থেকেও বিরত থাকে তারা। সতত লিপ্ত থাকে কঠোর সাধনায়। এ ধরনের কঠোরতা আসলে তাদের নিজেদেরই উদ্ভাবন। দ্বিতীয় শ্রেণী মধ্যপন্থী। তারা প্রবৃত্তির বৈধ চাহিদা পরিপূরণে পরাঙ্মুখ হয় না। কিন্তু মত্ত হয় না বিলাসব্যসনে। তারা রসুল স. এর সংসারাদর্শ, উপাসনাদর্শ সবকিছু মেনে চলতে চেষ্টা করে। জননী আয়েশা এদেরকেই চিহ্নিত করেছেন— রসুলানুসারী বলে। রসুল স. এর সঙ্গেই হবে তাদের অবশেষ মিলন। আর তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে অগ্রগামী শ্রেণী। তাঁরা হচ্ছেন রসুল স. এর মহান সাহচর্যস্নাত এবং তার প্রত্যক্ষ অনুসারী সহচরবৃন্দ। তাঁরাই সাহাবী, সিদ্দীক। আর জননী আয়েশা প্রকৃত অর্থেই এক বিদূষী ছিলেন বলেই প্রকাশ করেছিলেন নন্দিত বিনয়। নিজেকে আখ্যা দিয়েছিলেন আত্ম-অত্যাচারী বলে। উপরে বর্ণিত হাদিসসমূহের আলোকে এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত তিনটি শ্রেণীই হচ্ছেন এই উম্মতের জ্ঞানী সম্প্রদায় এবং তাঁরা অবশ্যই আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন। সুতরাং এর পরেও যদি কেউ বলে, এখানে 'নিজের প্রতি অত্যাচারী' বলে বুঝানো হয়েছে কপটাচারীদেরকে, তাহলে বুঝতে হবে তার বক্তব্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সুতরাং তা অবশ্য পরিত্যজ্য, আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপের উপযোগী।

ইমাম আবু ইউসুফকে একবার এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ কী? তিনি বললেন, এখানে যে তিন শ্রেণীর উম্মতে মোহাম্মদীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা সকলেই বিশ্বাসী। কেননা ইতোপূর্বেই সমাপন করা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও কপটাচারীদের প্রসঙ্গ। একথা প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, এখানে 'যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি' বলার পর একে একে বিবরণ দেওয়া হয়েছে মনোনীতদের তিনটি শ্রেণীর। প্রত্যেকের

মর্যাদাগত পার্থক্য নির্ণয় করা হয়েছে পুনঃপুনঃ 'মিনহুম' 'মিনহুম' বলে। অর্থাৎ তাঁরা মর্যাদার দিক দিয়ে পৃথক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হলেও মনোনীত হওয়ার দিক থেকে এক। নিজের প্রতি অত্যাচারীদের সংখ্যা হবে সবচেয়ে বেশী। তাই তাদের উল্লেখ এসেছে সকলের অগ্রে। মধ্যমপন্থীদের সংখ্যা হবে অপেক্ষাকৃত কম। তাই তাদের উল্লেখ এসেছে দ্বিতীয় পর্যায়ে এবং যেহেতু অত্যল্পসংখ্যক হবেন অগ্রগামীগণ, তাই তাঁদের বিবরণ দেওয়া হয়েছে সকলের শেষে।

শেষে বলা হয়েছে— 'এটাই মহাঅনুগ্রহ'। একথার অর্থ— সর্বশেষ উম্মতকে মনোনীত করা এবং তাদেরকে নভজ গ্রন্থের উত্তরাধিকারী করার বিষয়টি নিশ্চয় আল্লাহ্‌র মহান অনুগ্রহ ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

সূরা ফাতির ঃ আয়াত ৩৩, ৩৪, ৩৫

جَنّٰتُ عَدۡنٍ یَّدۡخُلُوۡنَهَا یُحَلَّوۡنَ فِیۡهَا مِنۡ اَسَاوِرَ مِنۡ ذَهَبٍ وَّ لُؤۡلُؤًا ۚ وَ لِبَاسُهُمۡ فِیۡهَا حَرِیۡرٌ ﴿۳۳﴾ وَ قَالُوا الۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الَّذِیۡۤ اَذۡهَبَ عَنَّا الۡحَزَنَ ؕ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوۡرٌ شَکُوۡرُۨ ﴿۳۴﴾ الَّذِیۡۤ اَحَلَّنَا دَارَ الۡمُقَامَةِ مِنۡ فَضۡلِهٖ ۚ لَا یَمَسُّنَا فِیۡهَا نَصَبٌ وَّ لَا یَمَسُّنَا فِیۡهَا لُغُوۡبٌ ﴿۳۵﴾

r স্থায়ী জান্নাত, যাহাতে তাহারা প্রবেশ করিবে, সেথায় তাহাদিগকে স্বর্ণ নির্মিত কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হইবে এবং সেখানে তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হইবে রেশমের।

r এবং তাহারা বলিবে, 'প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করিয়াছেন; আমাদের প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী;

r 'যিনি নিজ আনুগ্রহে আমাদিগকে স্থায়ী আবাস দিয়াছেন যেখানে ক্লেশ আমাদিগকে স্পর্শ করে না এবং ক্লান্তিও স্পর্শ করে না।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যে তিন শ্রেণীর মানুষের কথা আগের আয়াতে বলা হলো, তাদেরকে আল্লাহ্‌পাক দান করবেন 'জান্নাতে আদন' বা স্থায়ী জান্নাত। সেখানে তারা অলংকৃত হবে স্বর্ণকংকন ও মনিমুক্তা দ্বারা। আর পরিধান করবে রেশমী পোশাক।

হজরত আবু সাঈদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার আলোচ্য আয়াত পাঠ করলেন, তারপর বললেন, সেখানে তারা পরিধান করবে স্বর্ণ মুকুট, স্বর্ণকংকন ও মনিমুক্তানির্মিত আভরণ। ওই আভরণের যে কোনো একটি পৃথিবীতে পতিত হলে চিরদিনের জন্য ঘুচে যাবে পৃথিবীর সকল আঁধার। তিরমিজি, হাকেম, বায়হাকী,

হাকেম বলেছেন, বর্ণনাটি শুদ্ধসূত্রসম্বলিত। কুরতুবী লিখেছেন, জান্নাতীদের মধ্যে এমন কেউ-ই থাকবে না, যার হাতে শোভা না পাবে তিন ধরনের অলংকার— সোনা, চাঁদি ও মোতির। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তখন বিশ্বাসীদের হস্ত অলংকার দিয়ে ভরানো হবে ওই পর্যন্ত, যে পর্যন্ত পৌঁছানো হয় ওজুর পানি। বোখারী ও মুসলিম।

হজরত হুজায়ফা বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স.কে আজ্ঞা করতে শুনেছি, তোমরা কখনো রেশমী বস্ত্র পরিধান কোরো না। ব্যবহার কোরো না সামুদ্রিক রত্ননির্মিত অলংকার। আর আহার কোরো না স্বর্ণ-রৌপ্যনির্মিত পাত্রে। এগুলো এই পৃথিবীতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের এবং পরবর্তী পৃথিবীতে তোমাদের। বোখারী, মুসলিম।

হজরত ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি পৃথিবীতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে, সে জান্নাতী জীবনে তা পরতে পারবে না। বোখারী, মুসলিম। হাদিসটি বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেছেন তায়ালাদী। আর হাকেম ও ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে। বর্ণনাটির শেষ বক্তব্যটি এরকম— সে জান্নাতে প্রবেশ করলেও পরিধান করতে পারবে না রেশমী পরিচ্ছদ।

হজরত কা'ব ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া বর্ণনা করেছেন, যদি কেউ দুনিয়ায় জান্নাতের অনুরূপ পোশাক পরে, তবে সে জান্নাতে তা আর পরতে পারবে না।

পরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'এবং তারা জানাবে প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করেছেন'।

এখানে 'কুলু' তারা বলবে, হাদিস শরীফেও জান্নাতীদের এরকম প্রশংসা বর্ণনার কথা বলা হয়েছে। 'যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দিয়েছেন' কথাটিও (আয়াত ৩৫) একথার পরিপোষক। বিশ্বাসীগণ সমাধি থেকে উত্থিত হওয়ার প্রাক্কালেও এরকম বলবে। হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' কলেমার প্রবক্তারা মৃতুর সময় আতঙ্কগ্রস্ত হয় না। আতঙ্কগ্রস্ত হবে না কবর থেকে উত্থিত হওয়ার সময়েও। সে সময়ের দৃশ্য আমার দৃষ্টিতে যেনো ভাসমান। শিঙ্গার ফুৎকার ধ্বনিত হচ্ছে, আর জনগণ তাদের মাথার ধূলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াছে এবং বলছে— যাবতীয় বন্দনা প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদের দুঃখদুর্দশা বিদূরিত করেছেন'। তিবরানী।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'হাযান' অর্থ নরকের দুঃখ-দুর্দশা। কাতাদা বলেছেন, মরণের আতঙ্ক। মুকাতিল বলেছেন, মৃত্যু-আতঙ্কের কারণ হচ্ছে অনিশ্চয়তা। অর্থাৎ তারা জানতে পারবে না, কী আচরণ অপেক্ষা করছে তাদের জন্য। ইকরামা বলেছেন, এরকম উদ্বেগ-আতঙ্কের কারণ হচ্ছে পাপের ভয়, অবাধ্যতার শংকা, আনুগত্য গৃহীত হওয়া না হওয়ার দ্বিধা-জড়তা। সাঈদ

ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এখানে দুঃখদুর্দশা দূর হওয়ার অর্থ অন্নবস্ত্রের চিন্তা দূর হওয়া। কেউ কেউ বলেছেন, ইহকালের জীবনোপকরণ-ভাবনা ও পরকালের শাস্তির সম্ভাবনাকেই এখানে বলা হয়েছে 'হাযান'। প্রকৃত কথা হয়েছে, 'হাযান' বলে যে কোনো ধরনের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও আতঙ্ককে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমাদের প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী'। একথার অর্থ— যারা পীড়ন করেছে আপন সত্তার উপর, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। কারণ তিনি মহাক্ষমাপরবশ। আর তিনি মধ্যপন্থী ও কল্যাণকর কাজে অগ্রগামীদের গুণগ্রাহী।

এরপরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— 'যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দিয়েছেন, সেখানে ক্লেশ আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং ক্লান্তিও স্পর্শ করে না'। একথার অর্থ— তারা আরো বলবে ক্লেশ ও ক্লান্তি থেকে মুক্ত এই চিরনিরাপদ ও স্থায়ী জান্নাতবাস হচ্ছে সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র অনুগ্রহাগত। এই অপার ও অনির্বচনীয় অনুগ্রহ কোনোক্রমেই আমাদের অর্জনায়ত্ত নয়।

এখানকার 'মুক্বামাত' শব্দটি ধাতুমূল। এর অর্থ চিরস্থায়ী আবাস।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী আওফা থেকে নকী' ইবনে হারেছের পদ্ধতিতে বায়হাকী তাঁর 'আলবা'ছ' গ্রন্থে লিখেছেন, ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, এক লোক রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, হে মহাবিশ্বের রহমত! পৃথিবীতে আল্লাহ্ দিয়েছেন শ্রান্তিহারক সুষুপ্তি। বেহেশতে কি তা আমারা পাবো। তিনি স. বললেন, না। নিদ্রা তো মৃত্যুর সহোদর। বেহেশতে তো মৃত্যুর প্রবেশাধিকার নেই। সে বললো, তাহলে বেহেশতে স্বস্তি আসবে কীরূপে? রসুল স. ক্ষণকাল নিশ্চুপ হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, বেহেশতে তো অস্বস্তিরও কোনো প্রবেশাধিকার নেই। সেখানে তো শুধু স্বস্তি আর স্বস্তি। শান্তি, কেবলই অনাবিল শান্তি।

এখানে 'নাসব' অর্থ অবসাদ এবং 'লুগুব' অর্থ ক্লান্তি। শব্দ দু'টো প্রায় সমার্থক। কিন্তু এখানে শব্দ দু'টো বসানো হয়েছে বেগ সৃজনার্থে।

সূরা ফাতির ঃ আয়াত ৩৬, ৩৭

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ۗ كَذٰلِكَ نَجْزِىْ كُلَّ كَفُوْرٍ ﴿٣٦﴾ وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ۚ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ۗ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ۗ فَذُوْقُوْا

فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ﴿٣٧﴾

r কিন্তু যাহারা কুফরী করে তাহাদের জন্য আছে জাহান্নামের আগুন। উহাদের মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হইবে না যে, উহারা মরিবে এবং উহাদিগ হইতে জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হইবে না। এইভাবে আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়া থাকি।

r সেথায় তাহারা আর্তনাদ করিয়া বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে নিষ্কৃতি দাও, আমরা সৎকর্ম করিব, পূর্বে যাহা করিতাম তাহা করিব না।' আল্লাহ্ বলিবেন, 'আমি কি তোমাদিগকে এতো দীর্ঘ জীবন দান করি নাই যে, তখন কেহ সতর্ক হইতে চাহিলে সতর্ক হইতে পারিতে? তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীও আসিয়াছিল। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর; যালিমদের কোন সাহায্যকারী নাই।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'কিন্তু যারা কুফরী করে, তাদের জন্য আছে জাহান্নামের আগুন। তাদের মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হবে না যে, তারা মরবে'।

এখানে 'লা ইউক্বদ্বা আ'লাইহিম ফাইয়ামুতু' অর্থ তাদের উপর কার্যকর করা হবে না মৃত্যুকে। এরকমও বলা হবে না যে, তোমরা মরো। হজরত ইবনে ওমর থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীরা যখন জান্নাত ও জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে রেখে চিরদিনের জন্য মৃত্যু ঘটানো হবে মৃত্যুর। একজন ঘোষক তখন ঘোষণা করবে, জান্নাতবাসীরা শোনো, মৃত্যুর আগমন আর ঘটবে না। আর হে জাহান্নামীরা, তোমরাও শোনো, মৃত্যু এখন চিরঅবলুপ্ত। এমতো ঘোষণা শুনে জান্নাতবাসীরা হবে অত্যন্ত আনন্দিত। আর জাহান্নামবাসীরা হবে দুঃখে দুঃখে জর্জরিত। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী এবং মুসলিমও এরকম বর্ণনা করেছেন, ওই বর্ণনায় একথাও এসেছে যে— চূড়ান্ত মীমাংসার দিন মৃত্যুকে আনা হবে শাদা কালো ডোরাকাটা মেঘের আকারে.....।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না। এইভাবে আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি'। এখানে 'লাঘব করা হবে না' অর্থ এক মুহূর্তের জন্য তাদের শাস্তি বন্ধ রাখা হবে না। বরং উপর্যুপরি শাস্তির কারণে ক্রমাগত পোক্ত ও পুরুষ্ট হতে থাকবে তাদের গাত্রত্বক। পুনঃপুনঃ উসকে দেয়া হতে থাকবে নরকানল।

এখানে 'কাফুর' অর্থ অকৃতজ্ঞ। আল্লাহ্পাক প্রদত্ত নেয়ামতের অবমাননাকারী। প্রকারান্তরে আল্লাহ্কে অস্বীকারকারী।

পরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে নিষ্কৃতি দাও। আমরা সৎকর্ম করবো, পূর্বে যা করতাম তা করবো না'।

এখানে ‘সুরাখ’ অর্থ আর্তনাদ, চিৎকার, কাতর ফরিয়াদ। ‘রব্বানা’ আখরিজনা’ অর্থ হে আমাদের প্রভুপালক! আমদেরকে নরকাগ্নি থেকে নিষ্কৃতি দাও। ‘না’মাল সলিহা’ অর্থ আমরা সৎকর্ম করবো। অর্থাৎ আমাদেরকে পৃথিবীতে পুনরায় পাঠিয়ে দাও। আমরা আর ভুল করবো না। সেখানে গিয়ে শুধু সৎকর্ম করবো। অথবা তারা আক্ষেপানলে জর্জরিত হয়ে বলবে, পৃথিবীতে বসবাসের সময় আমাদের দুষ্কর্মগুলোকেই আমরা মনে করতাম সৎকর্ম। এখন সে ভুল আমাদের ভেঙেছে। সুতরাং প্রকৃত সৎকর্ম সম্পাদনের জন্য আমাদেরকে আর একবার সুযোগ দাও। আগের মতো ভুল আর আমরা কিছুতেই করবো না।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আমি কি তোমাদেরকে এতো দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে’।

এখানে ‘দীর্ঘ জীবন’ অর্থ কতো বৎসরের জীবন, সে সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্নরকম মন্তব্য করেছেন। আতার অভিমত উল্লেখ করে কালাবী মন্তব্য করেছেন, আঠারো বৎসর। হাসান বাসরী বলেছেন, চল্লিশ বৎসর। হজরত আলী ও হজরত ইবনে আব্বাসের মতে ষাট বৎসর। আর এটাই ওই বয়োক্রমকাল, যখন আল্লাহ্‌পাকের দরবারে অজুহাত উত্থাপন করার আর কোনো উপায়ই থাকে না। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, মানুষ যখন ষাট বছর বয়সে উপনীত হয়, তখন আল্লাহ্ সকাশে তার কোনো ওজর আপত্তি উত্থাপনের অবকাশই আর থাকে না। তাঁর নিকট থেকে বায্যার আহমদ ও আবদ ইবনে হুমাইদও এরকম বর্ণনা করেছেন।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিবরানী ও ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে ঘোষণা করা হবে, ষাট বৎসর বয়স যারা পেয়েছিলো, তারা কোথায়? এই বয়স সম্পর্কেই তো আল্লাহ্ বলেছেন ‘আওয়া লাম নুআ’মমির.........।

আমি বলি, বর্ণিত হাদিসের বক্তব্যার্থ এই যে, কেউ ষাট বৎসর বয়সে পৌঁছলে আল্লাহ্‌পাক লোপ করে দেন তার অনুযোগ উত্থাপনের অবকাশ। কারণ এর বয়স আর স্বাভাবিক বয়স নয়। হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি এবং হজরত আনাস থেকে আবু ইয়ালী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের সাধারণ বয়স হবে ষাট থেকে সত্তর বছর। সত্তর অতিক্রম করবে খুব কম সংখ্যক। কিন্তু একথার অর্থ এরকম নয় যে, ষাট বছরের পূর্বের অজুহাত গৃহীত হবে। কারণ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে উন্মেষ ঘটে মতিস্থিরতার। তখন সে পরিগণিত হয় দায়িত্বশীল বলে। তার চিন্তায় তখন আসে সদুপদেশ গ্রহণ করার প্রবৃত্তি। সুতরাং শরিয়তের বিধিবিধান পরিত্যাগ করা তার জন্য হয় তখন একান্ত অশোভন। বিশেষ করে ইমানের ব্যাপারে তার কোনো অজুহাতই আর গৃহীত হয় না। হতে পারে না।

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীও এসেছিলো। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন করো; জালেমদের কোনো সাহায্যকারী নেই'।

'নাজীর' অর্থ সতর্ককারী। এখানে শব্দটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে রসুল স.কে। অধিকাংশ তাফসীরবেত্তা এরকমই বলেছেন। সুদ্দীর উক্তিরূপে ইবনে আবী হাতেম এবং জায়েদের অভিমতরূপে ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে জারীর এরকমই বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'সতর্ককারী' অর্থ আল কোরআন। শব্দটি সাধারণার্থক। তাই সকল নবী-রসুল এবং সকল প্রত্যাদেশিত গ্রন্থই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে এই উম্মতের সতর্ককারী কেবল রসুল স. এবং কোরআন মজীদ। কেননা রসুল স. এবং কোরআন মজীদ অস্বীকারকারীদের উদ্দেশ্যেই অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

কেউ কেউ বলেছেন, 'নাজীর' অর্থ সাধারণ বিবেক। এরকম অভিমতের প্রবক্তা তারাই, যারা মনে করেন কেবল বিবেকই ইমান আনয়নের জন্য যথেষ্ট। তাঁরা বলেন, বয়োপ্রাপ্ত লোক যদি হয় শৈলশিখরবাসী, আর সেখানে যদি নবী রসুলের ইমানের ডাক কখনো না-ও পৌঁছে, তবুও তাকে বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে এক আল্লাহ্‌র উপর ইমান আনতে হবে। যদি সে এরূপ না করে তবে অবশ্যই হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। কিন্তু এ বিষয়টিও প্রণিধাননীয় যে, 'তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীও এসেছিলো' কথাটি সম্পর্কযুক্ত পূর্ববর্তী বাক্যের 'আমি কি তোমাদেরকে এতো দীর্ঘ জীবন দান করিনি' কথাটির সঙ্গে। এখন কথা হচ্ছে, সংযোজ্য ও সংযোজিতের মধ্যে সব সময় থাকে বিপরীত সম্পর্ক। সুতরাং এখানে 'নাজীর' অর্থ যদি 'বিবেক' ধরা হয়, তবে বয়স ও বিবেক কি বৈপরিত্যার্থক? প্রাপ্তবয়স্ক হলেই একজন মানুষ দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। আর যদি সে বিবেকবর্জিত হয়, তাহলে একথা কি বলা যাবে না, তার বয়স হয়েছে? যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তার সাক্ষাতে কেউ উপদেশ প্রদান করলে সে উপদেশ গ্রহণ করে না'।

ইকরামা, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা এবং ওয়াকী বলেছেন, এখানে 'নাজীর' অর্থ বৃদ্ধাবস্থা। আবদ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে মুনজির এই অভিমতটি সংকলন করেছেন কেবল ইকরামা থেকে। আর ইবনে মারদুবিয়া ও বায়হাকী উদ্ধার করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। বলা হয়েছে, বৃদ্ধাবস্থা ও পক্ককেশ হচ্ছে মৃত্যুর বারতা। বাগবী একটি সাহাবীবচন উল্লেখ করে বলেছেন, একটি চুল শাদা হলে সাথীদেরকে বোলো, তোমরাও তৈরী হয়ে নাও। দেখছো না মৃত্যু নিকটতর হচ্ছে। কেউ কেউ বলেছেন স্বজন সতীর্থদের মৃত্যুই 'নাজীর' বা সতর্ককারী।

'জালেমদের কোনো সাহায্যকারী নেই' অর্থ কেউই সীমালংঘনকারীদের পক্ষাবলম্বন করবে না। কারণ সকলেই জানে, আল্লাহ্‌র শাস্তি প্রতিহত করবার সাধ্য কারো নেই। থাকতেও পারে না।

اِنَّ اللّٰهَ عٰلِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٣٨﴾ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِي الْاَرْضِ ۗ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ۗ وَ لَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًا ۚ وَ لَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۚ اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ اِنْ يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلَّا غُرُوْرًا ﴿٤٠﴾ اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَآ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ ۗ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ﴿٤١﴾

r নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় অবগত আছেন। অন্তরে যাহা রহিয়াছে সে সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ অবহিত।

r তিনিই তোমাদগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করিয়াছেন। সুতরাং কেহ কুফরী করিলে তাহার কুফরীর জন্য সে নিজেই দায়ী হইবে। কাফিরদের কুফরী কেবল উহাদের প্রতিপালকের ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফিরদের কুফরী উহাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।

r বল, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক সেই সকল শরীকের কথা ভাবিয়াছ কি? তাহারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করিয়া থাকিলে আমাকে দেখাও; অথবা আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টিতে উহাদের কোনো অংশ আছে কি? নাকি আমি উহাদিগকে এমন কোনো কিতাব দিয়াছি যাহার প্রমাণের উপর ইহারা নির্ভর করে? বস্তুত জালিমরা একে অপরকে মিথ্যাপ্রতিশ্রুতি দিয়া থাকে।

r আল্লাহ্ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন, যাহাতে উহারা স্থানচ্যুত না হয়। উহারা স্থানচ্যুত হইলে তিনি ব্যতিত কে উহাদিগকে সংরক্ষণ করিবে? তিনি তো অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— অবশ্যই আল্লাহ্ জানেন অন্তরীক্ষমণ্ডল ও ধরণীর সকল অদৃশ্য বিষয়। মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে কী ভাবের উদয় হয়েছিলো, হয় ও হবে, সবকিছুই তাঁর জানা। সুতরাং হে মানুষ! সাবধান হও। তোমরা তাঁর অতুলনীয় জ্ঞান ও অপরীমেয় ক্ষমতার বাইরে যেহেতু নও, সেহেতু একান্ত অনুগত হও তাঁর, তাঁর রসুলের এবং তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম ইসলামের।

পরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন। সুতরাং কেউ কুফরী করলে তার কুফরীর জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। কাফেরদের কুফরী কেবল তাদের প্রতিপালকের ক্রোধই বৃদ্ধি করে; এবং কাফেরদের কুফরী তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে'।

এখানকার 'খলাইফা' শব্দটি 'খলিফা'এর বহুবচন। যেমন 'খলীফ' শব্দের বহুবচন 'খুলাফা'। কেউ কারো স্থালাভিসিক্ত হলে তাকে বলে 'খলীফাহ'। এমতাবস্থায় 'খলাইফা' এর সম্বোধ্যস্থল হবে গোটা মানব সমাজ। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির উদ্দেশ্য হবে— তোমাদের পূর্বসূরিদের অতীতায়নের পর তিনি তোমাদেরকে করেছেন তাদের স্থলাভিসিক্ত। প্রতিনিধি।

কেউ কেউ আবার বলেছেন, 'খলীফা' অর্থ প্রতিনিধিত্ব, রাজত্ব, রাষ্ট্রাধিপত্য। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন পৃথিবীর সর্বময় আধিপত্য। তাই তো তোমরা পৃথিবীকে ব্যবহার করতে পারো ইচ্ছামতো। যত্রতত্র নির্মাণ করতে পারো রাষ্ট্র, রাষ্ট্রাধিপত্য।

'মাক্বতুন' অর্থ ক্রোধ, ক্ষোভ, অসন্তোষ, বিরাগ, বিবমিষা। 'ইল্লা খসারা' অর্থ— কেবল ক্ষতি বৃদ্ধি করবে। অর্থাৎ পরলোকে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রত্যাখ্যানপ্রবণতা বাড়িয়ে তুলবে তাদেরই আত্মক্ষোভ, আত্ম-ধিক্কার ও আত্ম-গ্লানি, ফলে এতে করে বৃদ্ধি হতে থাকবে তাদের ক্ষতি। কেবলই ক্ষতি।

এরপরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো, সেই সকল শরীকের কথা ভেবে দেখেছো কি? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করতে চাইলে আমাকে দেখাও; অথবা আকাশমণ্ডলী সৃষ্টিতে তাদের কোনো অংশ আছে কি'?

এখানে 'শুরাকাআ' অর্থ পৌত্তলিকদের দেব-দেবী, বিগ্রহ-প্রতিমা। এখানকার বক্তব্যটি বিশ্লেষিত হতে পরে দু'ভাবে— ১. তোমরা তাদেরকে নির্বাচন করেছো আল্লাহ্র সমকক্ষ ২. তোমরা তোমাদের সম্পদে তাদেরকে করে নিয়েছো অংশীদার। 'আম লাহুম শিরকুন' অর্থ, আকাশ সৃষ্টিতে তোমরা তোমাদের পূজনীয় দেব-দেবীদেরকে অংশী নির্ধারণ করেছো। আর 'আরূনী' অর্থ আমাকে দেখাও, বলো।

এরপর বলা হয়েছে— 'না কি আমি তাদেরকে এমন কোনো কিতাব দিয়েছি, যার প্রমাণের উপর এরা নির্ভর করে'? মুকাতিল 'আমি কি তাদেরকে এমন কোনো কিতাব দিয়েছি' কথাটির অর্থ করেছেন— আমি কি মক্কার পৌত্তলিকদেরকে এমন কোনো গোপন গ্রন্থ দিয়েছি, যা তারা এখন প্রকাশ করছে? আর ওই গ্রন্থের ভিত্তিতে অংশীদার নির্ধারণ করছে তাদের বিগ্রহগুলোকে?

এরপর বলা হয়েছে— 'বস্তুত জালেমরা একে অপরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে'। এ কথার অর্থ—সীমালংঘনকারীদের চিরাচরিত স্বভাব এই যে, তারা একজন অপর জনকে মিথ্যা আশার কথা শোনায়। যেমন তাদের পূর্বসূরীরা বলেছে, পূজিত প্রতিমারা আল্লাহ্‌র দরবারে তাদের পূজকদের জন্য সুপারিশ করবে। আর একথাই নির্বিবাদে ও নির্বিচক্ষণতায় মেনে নিয়েছে তাদের উত্তরসূরীরা। এভাবেই শুরু হয়েছে মিথ্যা আশা ও প্রতিজ্ঞার অপপরম্পরা।

এর পরের আয়াতে (৪১) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন, যাতে তারা স্থানচ্যুত না হয়, তারা স্থানচ্যুত হলে তিনি ব্যতীত কে তাদেরকে সংরক্ষণ করবে'? একথার অর্থ— আল্লাহ্ যেমন আকাশ-পৃথিবীর স্রষ্টা তেমনি এতদুভয়ের সংরক্ষণকারী। সৃজন ও সংরক্ষণ সম্পূর্ণই তাঁর অভিপ্রায় ও ক্ষমতায়ত্ত। যদি এরকম না হতো, তবে এই মহাসৃষ্টিতে সৃষ্টি হতো মহাবিপর্যয়।

শেষে বলা হয়েছে— 'তিনি তো অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ'।

'হালীম' অর্থ ধৈর্যশীল, সহনশীল, সহিষ্ণু। আল্লাহ্‌পাক চরমতম পর্যায়ের সহনশীল বলেই পাপী ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন না। তারা যদি শাস্তিকে ত্বরান্বিত করতে বলে, তবুও না। যদি এরকম না হতো, তবে কেবল আকাশ-পৃথিবীর সংরক্ষণাভিপ্রায় পরিত্যাগ করলেই তো সবকিছু হয়ে যেতো বিশৃঙ্খল। কোনো প্রাণীই আর তখন রক্ষা করতে পারতো না তাদের অস্তিত্ব।

ইবনে আবী হেলালের উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, রসুল স. এর মহাআর্বিভাবের পূর্বের মক্কার পৌত্তলিকেরা বলতো, আল্লাহ্ যদি আমাদের মধ্যে কোনো নবী প্রেরণ করতেন, তবে আমরা হয়ে যেতাম তাঁর একান্ত অনুগত। হয়ে যেতাম তাঁর প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থের একনিষ্ঠ অনুগামী, আমাদের পূর্বজরা যে সৌভাগ্য পায়নি। তাদের এমতোকথার সূত্রেই অবতীর্ণ হয়েছে পরবর্তী আয়াত।

সূরা ফাতির ঃ আয়াত ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ﴿٤٢﴾

اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ
السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ
لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا
فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا
أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا
فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٤﴾ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا
كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿٤٥﴾

r ইহারা দৃঢ়তার সহিত আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলিত যে, ইহাদের নিকট কোন সতর্ককারী আসিলে ইহারা অন্য সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা সৎপথের অধিকতর অনুসারী হইবে; কিন্তু ইহাদের নিকট যখন সতর্ককারী আসিল তখন তাহা কেবল উহাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করিল—

r পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং কূট যড়যন্ত্রের কারণে। কূট যড়যন্ত্র উহার উদ্যোক্তাদিগকেই পরিবেষ্টন করে। তবে কি ইহারা প্রতীক্ষা করিতেছে পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযুক্ত বিধানের? কিন্তু তুমি আল্লাহ্‌র বিধানের কখনও কোনা পরিবর্তন পাইবে না এবং আল্লাহ্‌র বিধানো কোন ব্যতিক্রমও দেখিবে না।

r ইহারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে নাই? তাহা হইলে ইহাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হইয়াছিল তাহা দেখিতে পাইত। উহারা তো ইহাদের অপেক্ষা অধিকতর বলশালী ছিল। আল্লাহ্‌ এমন নহেন যে, আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁহাকে অক্ষম করিতে পারে; তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

r আল্লাহ্‌ মানুষকে তাহাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠে কোন জীবজন্তুকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাহাদিগকে অবকাশ দিয়া থাকেন। অতঃপর তাহাদের নির্দিষ্ট কাল আসিয়া গেলে আল্লাহ্‌ তো আছেন তাঁহার বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা।

বাগবী লিখেছেন, রসুল স. এর মহাপ্রকাশের পূর্বে মক্কার অংশীবাদীরা যখন জানতে পারলো, ইহুদী-খৃষ্টানেরা তাদের প্রতি প্রেরিত নবী-রসুলগণের প্রতি অসত্যারোপ করতো, তখন তারা বললো, তাদের উপরে আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত। তারা তাদের প্রতি প্রেরিত অবতারগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আল্লাহ্‌র শপথ। আমরা হলে নিশ্চয় ওরকম করতাম না। ভবিষ্যতে যদি আমরা আমাদের সম্প্রদায়ভূত কোনো প্রেরিত পুরষ পাই, তবে আমরা হবো তাঁর আন্তরিক অনুরাগী। এরকম আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতাম, যা তারা পারেনি। তাদের এমতো মনোভাবকেই তুলে ধরা হয়েছে প্রথমোক্ত আয়াতে। উল্লেখ্য, ইহুদী ও খৃষ্টানেরা ছিলো পরস্পরের প্রতি ঘোর বিদ্বেষপরায়ণ। তারা সবসময় পরস্পরকে গালি দিতো ধর্মভ্রষ্ট বলে। তাদের এরকম আচরণের কথা জানতে পেরেই মক্কার অংশীবাদীরা এরকম মন্তব্য করেছিলো।

'কিন্তু যখন সতর্ককারী এলো, তখন তা কেবল তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করলো' অর্থ, কিন্তু যখন তাদেরই সমাজে মহাঅভ্যুদয় ঘটলো সর্বশেষ রসুলের, তখন তারা ভুলে গেলো তাদের শপথের কথা। হয়ে উঠলো তাঁর ঘোর প্রতিপক্ষ। মহাসত্যের প্রতি তাদের বৈরী মনোভাব দিন দিন হয়ে উঠতে লাগলো প্রকটতর।

পরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং কূট ষড়যন্ত্রের কারণে'। একথার অর্থ— মুখে তারা যে কথাই বলুক না কেনো, তাদের সত্তাগত অবস্থান ছিলো সত্য থেকে অনেক ব্যবধানে। তাই তো প্রকাশ করতে পারতো ঔদ্ধত্য এবং রচনা করতে পারতো কূটচক্রান্ত। কালাবী বলেছেন, এখানে 'কূট ষড়যন্ত্র' অর্থ অংশীবাদিতায় ঐকমত্য পোষণ করা। আমি বলি, তারা তাদের মন্ত্রণাসভায় পারস্পরিক পরামর্শ বিনিময়ের মাধ্যমে ঠিক করেছিলো, রেসালতের দাবিদার ব্যক্তিটিকে দিতে হবে তিনটি শাস্তির যে কোনো একটি— বন্দী, হত্যা অথবা দেশান্তর। তাদের এমতো অপঐকমত্যকে এখানে বলা হয়েছে 'কূট ষড়যন্ত্র'।

এরপর বলা হয়েছে— 'কূট ষড়যন্ত্র তার উদ্যোক্তাদেরকেই পরিবেষ্টন করে'। একথার অর্থ— কূট ষড়যন্ত্রকারীরা নিজেরাই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়, যেমন অপরের জন্য গর্ত খননকারীরা নিজেরাই পতিত হয় স্বসৃষ্ট গর্তে। বদর যুদ্ধে তাদের সেরকমই অবস্থা ঘটেছিলো। কেউ কেউ নিহত হয়েছিলো। কেউ কেউ হয়েছিলো বন্দী। আর অবশিষ্টকে বরণ করতে হয়েছিলো পরাজয়ের গ্লানি।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবে কি তারা প্রতীক্ষা করছে পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযুক্ত বিধানের'? একথার অর্থ— তারা কি তবে তাদের পূর্ববর্তী সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের অনুসরণেই স্থায়ী হয়ে থাকতে চায়। ধ্বংস হয়ে যেতে চায় তাদের মতো সর্বনাশা গজবে? হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, এটাই কি তাদের চূড়ান্ত অভিপ্রায়?

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু তুমি আল্লাহ্র বিধানের কখনো কোনো পরিবর্তন পাবে না এবং আল্লাহ্র বিধানের কোনো ব্যতিক্রমও দেখবে না'। একথার অর্থ— দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই হচ্ছে আল্লাহ্র চিরাচরিত রীতি। এ রীতির কোনো ব্যত্যয় নেই। সুতরাং হে আমার রসুল! অংশীবাদীদের অপকথন ও অপআচরণে ব্যথিত হবেন না। মক্কাবাসীদেরকে কিছুকাল অবকাশ দিন। নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পরেও যদি তাদের চৈতন্যোদয় না হয়, তবে আল্লাহ্র চিরন্তনরীতি বলবৎ হবেই। মহাশাস্তি নেমে আসবে অংশীবাদীদের উপর।

এর পরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'এরা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি? তাহলে এদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিলো তা দেখতে পেতো। তারা তো এদের চেয়েও বলশালী ছিলো'।

এখানে 'এরা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি' প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন। একটি লুপ্ত বাক্যের সঙ্গে রয়েছে এর বক্তব্যগত যোগসূত্র। ওই লুপ্ত বাক্য সহকারে এখানকার বক্তব্যার্থটি রূপ পরিগ্রহ করবে এরকম— মক্কাবাসী অংশীবাদীরা কি বিগত যুগের অংশীবাদীদের অশুভ পরিণতির চিহ্নসমূহ পরিদর্শন করেনি? অবশ্যই করেছে। বাণিজ্যব্যপদেশে সিরিয়া, ইরাক ও ইয়েমেনে যাতায়াতকালে তারা অবশ্যই লক্ষ্য করেছে ওই দাম্ভিক অংশীবাদীদের ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ। তারা তো ছিলো এদের চেয়েও অধিক প্রতাপশালী। তৎসত্ত্বেও তাদেরকে সমূলে বিনাশ করা হয়েছিলো। স্বচক্ষে তাদের শোচনীয় পরিণাম দেখেও কি এদের চৈতন্যোদয় ঘটবে না?

এরপর বলা হয়েছে—'আল্লাহ্ এমন নন যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কোনোকিছু তাঁকে অক্ষম করতে পারে। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ চিরঅজেয়। তাঁর অভিপ্রায় ও শক্তিমত্তাকে অকার্যকর করতে পারে, এমন কেউ অথবা কোনো কিছুই নেই। তিনি সর্বজ্ঞ, তাই প্রতিটি বিষয়ের মূলতত্ত্ব ও চাহিদা সম্পর্কে তিনি উত্তমরূপে অবগত। আর তিনি সর্বশক্তিধরও। তাই তাঁর নিকটে নতি স্বীকার করা ছাড়া কারো কোনো প্রকার উপায়ই নেই।

শেষ আয়াতে (৪৫) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠের কোনো জীবজন্তুকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন'।

এখানে 'দাব্বাত্' অর্থ ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল প্রাণী। 'নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত' অর্থ মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়—আল্লাহ্ পাপী ও সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে তাৎক্ষণিক শাস্তি দিলে তো ধ্বংস হয়ে যাবে পৃথিবীর বহু নিরপরাধ কীট-পতঙ্গ প্রাণী। তাই অবাধ্যতার ত্বরিৎ শাস্তিদান আল্লাহ্র বিধান

নয়। সেকারণেই তিনি সাধারণভাবে এই নিয়মটি বলবত করেছেন যে, ব্যক্তিগতভাবে মৃত্যু পর্যন্ত এবং সমষ্টিগতভাবে কিয়ামত পর্যন্ত দেওয়া হবে অবকাশ। যদি কেউ এই সময়ের মধ্যে ফিরে আসে। গ্রহণ করে মহাসত্যের আশ্রয়।

শেষে বলা হয়েছে— 'অতঃপর তাদের নির্দিষ্টকাল এসে গেলে আল্লাহ্ তো আছেন তাঁর বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা'।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'ইবাদ' অর্থ আল্লাহ্র সকল বান্দা। সে অনুগত হোক, অথবা হোক অননুগত। এভাবে বক্তব্যার্থটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্পাক তাঁর দাস-দাসীগণের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত সবকিছুই জানেন। সুতরাং এরকম কখনোই হবে না যে, কেউ পাপ করে পার পেয়ে যাবে অথবা কেউ পুণ্য করার পরে হবে বঞ্চিত। সবাইকে যথাসময়ে তিনি যথোপযুক্ত প্রতিফল অবশ্যই দিবেন। শাস্তি অথবা স্বস্তি।

সকল স্তব-স্তুতি আল্লাহ্র । আজ ১১ই সফর ১২০৭ হিজরী সনে সমাপ্ত হলো সুরা ফাতিরের তাফসীর।

সূরা ইয়া-সীন

এই সুরার রুকুর সংখ্যা ৫ এবং আয়াতের সংখ্যা ৮৩। সুরাখানি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়।

হজরত আবু বকর সিদ্দীক কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, সুরা ইয়াসীনের আর এক নাম সুরা মুয়াম্মা। এরকম নামকরণের কারণ এই যে, এই সুরা তার পাঠককে সাধারণভাবে দান করে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ এবং দূর করে উভয় জগতের দুঃখ-দুর্দশা। আরো দু'টি নাম রয়েছে এই সুরার— 'দাফিয়া' ও 'কৃদ্বীয়া'। যেহেতু এই সুরা প্রতিহত করে তার পাঠকের সকল অনিষ্টকে এবং পূরণ করে যাবতীয় প্রয়োজন, তাই এর নাম 'দাফিয়া' ও 'কৃদ্বীয়া'। যে সুরা ইয়া-সীন পাঠ করবে, সে পুণ্যলাভ করবে কুড়িটি হজপালনের সমান। আর যে এর আবৃত্তি শ্রবণ করবে, সে অর্জন করবে আল্লাহ্র পথে এক হাজার দীনার দান করার পুণ্য। যে এই সুরা লিখবে, তার বক্ষাভ্যন্তরে ভরে দেওয়া হবে অপরিমেয় জ্যোতি, অগণীয় প্রত্যয়, অসংখ্য পুণ্য এবং অননুমেয় অনুগ্রহ। আর তার ভিতর থেকে দূর করে দেওয়া হবে অনেক হিংসা ও বহুসংখ্যক ব্যাধি। হজরত আবু বকর সিদ্দীকের অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, কেউ শুক্রবারে তার পিতামাতা অথবা অন্য ব্যক্তির সমাধিস্থলে সূরা ইয়া-সীন পাঠ করলে আল্লাহ্ মাফ করে দিবেন তার এই সুরার বর্ণসংখ্যাসমতুল পাপ।

হজরত আবু বকর সিদ্দীক থেকে ইবনে মারদুবিয়া, খতীব ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সুরা ইয়াসীনের অপর নাম মুআ'ম্মা। কেননা এই সুরা সাধারণভাবে তার পাঠককে প্রদান করে ইহ-পারত্রিক কল্যাণ। এই সুরাকে 'দাফিয়া' এবং 'ক্বদ্বীয়া'ও বলা হয়। কারণ এই সুরা অপসারণ করে তার পাঠকের সকল প্রকার অপকৃষ্টতা এবং পূরণ করে যাবতীয় প্রয়োজন।

সূরা ইয়া-সীন ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يٰسٓ ﴿١﴾ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣﴾ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤﴾ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿٥﴾ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٦﴾ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٧﴾

r ইয়া-সীন,

r শপথ জ্ঞানগর্ভ কুরআনের,

r তুমি অবশ্যই রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত;

r তুমি সরল পথে প্রতিষ্ঠিত।

r কুরআন অবতীর্ণ পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নিকট হইতে,

r যাহাতে তুমি সতর্ক করিতে পার এমন এক জাতিকে যাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে সতর্ক করা হয় নাই, যাহার ফলে উহারা গাফিল।

r উহাদের অধিকাংশের জন্য সেই বাণী অবধারিত হইয়াছে; সুতরাং উহারা ঈমান আনিবে না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ইয়া-সীন'।

আবু নাঈম তাঁর 'দালায়েল' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. প্রায়শ কাবাগৃহ প্রাঙ্গণে উচ্চস্বরে কোরআন পাঠ করতেন। মক্কার মুশরিকেরা তাঁর এ কাজকে খুবই মন্দ মনে করতো। একবার তারা ঠিক করলো রসুল স. যখন এভাবে কোরআন পাঠ করতে শুরু করবেন, তখন তারা একযোগে তাঁকে আক্রমণ করবে। একদিন তারা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। কিন্তু বিস্মৃতি হয়ে দেখলো তাদের প্রত্যেকের হাত আটকে রয়েছে তাদের কণ্ঠদেশের সঙ্গে। আর দৃষ্টিশক্তিও হয়েছে অচল। দিক ঠাহর করতে পারছিলো না তারা। বাধ্য হয়ে তারা রসুল স. এর উদ্দেশ্যে সাহায্যপ্রার্থনা করলো। দোহাই পাড়লো আত্মীয়তার। বলা বাহুল্য, তারা সকলেই ছিলো রসুল স.

এর নিকটজন। দয়াল রসুল স. তাদের দুরবস্থা দেখে ব্যথিত হলেন। দোয়া করলেন তাদের বিপদমুক্তির জন্য। তারা রেহাই পেয়ে গেলো। কিন্তু ইমান আনলো না একজনও। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে এই সুরার শুরু থেকে সপ্তম আয়াত পর্যন্ত।

'ইয়া-সীন' অক্ষর দু'টি অর্থগত ও বিভক্তিগত দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজির মতো, যার মর্ম চিররহস্যাচ্ছন্ন। এধরনের বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজির মর্মার্থ জানেন কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয়তম রসুল। আরো জানেন অত্যল্পসংখ্যক বিদ্বজ্জন যাদের জ্ঞান সুগভীর। তাদেরকেই বলা হয় ওলামায়ে রসিখীন।

কেউ কেউ বলেছেন, বনী তাঈয়ের আঞ্চলিক ভাষায় 'ইয়া ইনসান' এর সংক্ষেপিতরূপ হচ্ছে ইয়া-সীন। এভাবে এর অর্থ দাঁড়ায়— হে মানব। এই অর্থ গ্রহণ করলে বুঝতে হয়, এখানে 'ইয়া-সীন' বলে সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স.কে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, 'ইয়া-সীন' এর মূলরূপ ছিলো 'ইয়া ইনসীন'। অতি ব্যবহারে লোপ পেয়েছে মধ্যবর্তী 'ইন'। এরকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনে যোবয়ের প্রমুখ। আবুল আলীয়া বলেছেন, 'ইয়া-সীন' অর্থ 'ইয়া রজুল' (হে মানুষ)। আবু বকর ওয়ারাক বলেছেন, এর অর্থ 'ইয়া সায়্যিদুল বাশার' (হে গণনায়ক)। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এটি একটি শপথ বাক্য। এখানে শপথ করা হয়েছে 'ইয়া-সীন' এর।

পরের আয়াতদ্বয়ের (২, ৩) মর্মার্থ হচ্ছে— শপথ ওই কোরআনের। যার বক্তব্যশৈলী অভূতপূর্ব, শ্রুতিসুখকর, চিত্তহারক ও গভীর প্রজ্ঞাময়— আপনি অবশ্যই রসুলগণের মধ্যে এক মহামর্যাদাসম্পন্ন রসুল।

এখানকার 'ওয়াও' অব্যয়টি শপথার্থক। আর যদি 'ইয়া-সীন'কে শপথবাক্য ধরা হয়, তবে 'ওয়াও' হবে এখানে যোজক অব্যয়।

একটি দ্বিধা ঃ কোনো বিজ্ঞপিত প্রকাশের পশ্চাতে উদ্দেশ্য থাকে দু'টি— শ্রোতাকে অজানা বিষয়ে জ্ঞানদান এবং বক্তারও অবহিতি লাভ। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে ওই দুটি উদ্দেশ্যের একটিও নেই। কারণ, রসুল স. আগে থেকেই জানতেন যে, তিনি আল্লাহ্র রসুল। আর আল্লাহ্রও একথা অজানা নয়। কারণ তাঁকে রসুল নির্বাচন করেছেন তিনিই। তাহলে এখানে 'তুমি অবশ্যই রসুলগণের অন্তর্ভুক্ত' বলা হলো কেনো?

দ্বিধা-নিরসন ঃ এখানে রসুল স.কে সম্বোধন করে বক্তব্য উপস্থাপন করা হলেও এর উদ্দেশ্য ছিলো সত্যাপ্রত্যাখানকারীদেরকে কথাটি জোরেশোরে জানান। তারা তো রসুল স.কে রসুল বলে মানতো না। তাই তাদেরকে শোনানোর জন্যই আল্লাহ্ এখানে নিঃসন্দিগ্ধ সাক্ষ্য পেশ করেছেন যে, নিশ্চয়

তুমি রসুলগণের অন্যতম। অতএব বুঝতে হবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশকালে সম্বোধিত জন ও সম্বোধনকারীদের অবহিতি ছাড়া তৃতীয় আর একটি উদ্দেশ্যও থাকে। আর তা হচ্ছে অন্য মানুষকে জানানো।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'তুমি সরল পথে অধিষ্ঠিত'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনি একত্ববাদের পথে সুদৃঢ়রূপে অধিষ্ঠিত। অথবা অর্থ— হেদায়েতের পথ সরল। আর আপনি সেই সরল পথাধিষ্ঠিত। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী আয়াতের 'রসুলগণের অন্তর্ভূত' কথাটির মধ্যেই রয়েছে সরল পথে অধিষ্ঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু সেখানে কথাটি এসেছে প্রসঙ্গক্রমে অন্য রসুলগণের সঙ্গে সাধারণভাবে। তাই এখানে পৃথকভাবে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বলা হলো রসুল স.এর সরল পথে অধিষ্ঠিত হওয়ার কথা।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে পরক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নিকট থেকে'। একথার অর্থ— হে আমার সরল পথাধিষ্ঠিত রসুল! যে কোরআন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের গাত্রদাহের কারণ, সেই কোরআন তো আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছেন মহাপরাক্রমশালী ও মহামমতাময় আল্লাহ্।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'যাতে তুমি সতর্ক করতে পারো এমন এক জাতিকে যাদের পিতৃপুরুষদিগকে সতর্ক করা হয়নি, যার ফলে তারা গাফিল'। এখানকার 'লিতুনজিরা' (যাতে তুমি সতর্ক করতে পারো) কথাটির যোগসূত্র রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের 'কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে' কথাটির সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! আপনার উপরে কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে উদাসীন জনগোষ্ঠীকে সতর্ককরণার্থেই। অথবা 'লিতুনজিরা' কথাটির সংযোগ রয়েছে ৩ সংখ্যক আয়াতের 'তুমি অবশ্যই রসুলগণের অন্তর্ভুক্ত' কথাটির সঙ্গে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমি আপনাকে রসুলরূপে একারণেই প্রেরণ করেছি। যেনো আপনি ভীতি প্রদর্শন করতে পারেন পথভ্রষ্টদেরকে।

'মা তুনজিরা' অর্থ যাদেরকে ইতোপূর্বে সতর্ক করা হয়নি। এখানকার 'মা' অব্যয়টি নেতিবাচকার্থক। উল্লেখ্য, হজরত ইসমাইলের মহাতিরোধানের পর থেকে হাজার হাজার বছর ধরে আরব উপদ্বীপ ছিলো নবীশূন্য। অথবা বলা যেতে পারে, এখানকার 'মা' হচ্ছে যোজক অব্যয়। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান, মহাবিচারপর্ব ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ভীতিপ্রদর্শনের জন্য যেমন ইতোপূর্বে নবী প্রেরণ করা হয়েছিলো, তেমনি তাদের পরবর্তী বংশধরদেরকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য পাঠানো হয়েছে আপনাকে। কিংবা

বলা যেতে পারে, ‘মা’ অব্যয়টি এখানে ধাতুমূল। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হে আমার রসুল! তাদের পূর্বপুরুষদেরকে যেমন ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছিলো, তেমনি আপনি ভীতি প্রদর্শন করুন তাদের অধস্তন বংশধরদেরকে।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— ‘তাদের অধিকাংশের জন্য সেই বাণী অবধারিত হয়েছে, সুতরাং তারা ইমান আনবে না’।

এখানে ‘আল ক্বওলু’ অর্থ বাণী চিরন্তন। অপর এক আয়াতে সে বাণী ধ্বনিত হয়েছে এভাবে— ‘আমি জ্বিন ও মানব দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবো’। আর ‘ফাহুম লা ইউ’মিনুন’ অর্থ তারা অধিকাংশই চিরভ্রষ্ট। তাই তারা কস্মিনকালেও ইমান আনবে না।

ইকরামা সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, একবার আবু জেহেল বললো, এবার আমি মোহাম্মদকে ঠিকমতো বাগে পেলে একটা কিছু হেস্তনেস্ত করেই ছাড়বো। তার ওই কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত। বলা হলো—

সূরা ইয়া-সীন ঃ আয়াত ৮, ৯

إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾

r আমি উহাদের গলদেশে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরাইয়াছি, ফলে উহারা ঊর্ধ্বমুখী হইয়া গিয়াছে।

r আমি উহাদের সম্মুখে প্রাচীর ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করিয়াছি এবং উহাদিগকে আবৃত করিয়াছি; ফলে উহারা দেখিতে পায় না।

আলোচ্য আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হয়েছে চিরভ্রষ্ট আবু জেহেলকে উদ্দেশ্য করে। অবতরণের প্রেক্ষাপটটি ছিলো এরকম— একদিন আবু জেহেলের সঙ্গীসাথীরা তাকে বললো, ওই তো কাবাপ্রাঙ্গণে মোহাম্মদ। তুমি তার সম্পর্কে যা বলো তা করে দেখাও দেখি।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আবু জেহেল ও তার সুহৃদ জনৈক মাখজুমীকে লক্ষ্য করে। আবু জেহেল শপথ করে বলেছিলো, আমি এবার মোহাম্মদের দেখা পেলেই পাথরের আঘাতে তার মস্তক চূর্ণ করবো। এরপর একদিন সে রসুল স.কে দেখতে পেলো নামাজ পাঠরত অবস্থায়। সে একটি

প্রস্তরখণ্ড হাতে নিয়ে রসুল স. এর দিকে এগিয়ে পাথরটি নিক্ষেপ করতে গেলো। কিন্তু তার হাত জড়িয়ে গেলো তারই গ্রীবাদেশের সঙ্গে এবং পাথরটি পড়লো তারই অন্য হাতের উপর। সঙ্গে সঙ্গে সে ফিরে এলো তার সাথীদের কাছে। বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলো তাদের কাছে। পরক্ষণেই সে ধপাস করে পড়ে গেলো মাটিতে। মাখজুমী বললো, ঠিক আছে, এবার আমিই যাচ্ছি। কিন্তু কিছুদূর এগিয়ে যেতেই তার দৃষ্টিশক্তি হয়ে গেলো অন্তর্হিত। রসুল স. তখন নামাজে কোরআন পাঠ করছেন। কোরআন পাঠের আওয়াজ শুনতে পেলো সে। কিন্তু তাঁকে দেখতে পেলো না। বাধ্য হয়ে সে ফিরে এলো তার সাথীদের কাছে। কিন্তু তাদেরকেও দেখতে পেলো না। সাথীরা বললো, কী হলো তোমার। সে বললো আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। সাংঘাতিক ব্যাপার! আমি মোহাম্মদের দিকে এগিয়ে যেতেই দেখলাম, এক ভয়ংকর আকৃতির উট তার এবং আমার মধ্যে আড়াল হয়ে মুখব্যাদান করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি মোহাম্মদের কোরআন পাঠ শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। মনে হচ্ছিলো, আর একটু অগ্রসর হলে উটটি আমাকে খেয়েই ফেলবে। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো 'আমি তাদের গলদেশে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি'।

'ফাহিয়া ইলাল আজক্বনি' অর্থ চিবুক পর্যন্ত। গলদেশে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি দেওয়ার কারণেই ঘাড় ঘোরাতে পারছিলো না। বাগবী লিখেছেন, এখানে কথাটি বলা হয়েছে রূপকার্থে। হাতের কথা আর বলা হয়নি। সুতরাং হাতের কথাটা ধরে নিলে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তাদের হাত গলায় জড়িয়ে শিকল দিয়ে বেঁধে দিয়েছি চিবুক পর্যন্ত।

'ফাহুম মুক্বমাহুন' অর্থ ফলে তারা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ চিবুক পর্যন্ত শিকল থাকার কারণে তাদের মুখমণ্ডল ছিলো ঊর্ধ্বমুখী। চক্ষু ছিলো বন্ধ। সে কারণে তারা কিছু দেখতে পারছিলো না।

বায়হাকী তাঁর দারায়েল গ্রন্থে সুদ্দী সগীরের পদ্ধতিতে কালাবী থেকে, তিনি আবু সালেহ থেকে, তিনি হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার মাখজুম গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক ঠিক করলো, তারা রসুল স.কে হত্যা করবে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলো আবু জেহেল ও ওলীদ ইবনে মুগীরা তারা সুযোগ খুঁজতে লাগলো। একদিন রসুল স. নামাজ পাঠ করছিলেন। তাঁর কোরআন পাঠ শুনতে পাচ্ছিলো ওই দুর্বৃত্তরা। তারা পরামর্শ করে ঠিক করলো, প্রথমে এগিয়ে যাবে ওলীদ। সে অগ্রসর হলো। কিন্তু রসুল স.কে দেখতে পেলো না। শ্রুত হচ্ছিলো কেবল তাঁর কোরআন পাঠের আওয়াজ। সে ফিরে এসে সাথীদেরকে সব খুলে বললো। উঠে দাঁড়ালো আর একজন। একটু অগ্রসর হতেই তার অবস্থাও হলো তথৈবচ। সেও কেবল কোরআন পাঠের আওয়াজ শুনলো। কিন্তু দেখতে

পেলো না কোনো কিছু। সামনে অগ্রসর হলে মনে হতো আওয়াজ আসছে পিছনের দিকে। সে দিকে যেতে শুরু করলে শুনতো আওয়াজ আসছে বিপরীত দিক থেকে। তাই বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসা ছাড়া তারও কোনো উপায় রইলো না। সে কথাই বলা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে (৯)।

বলা হয়েছে— 'আমি তাদের সম্মুখে প্রাচীর ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করেছি এবং তাদেরকে আবৃত করেছি; ফলে তারা দেখতে পায় না'।

ভাষ্যকারগণ বলেছেন, এটা একটা দৃষ্টান্ত বা উপমা। বাস্তবে তারা অন্ধ হয়নি। বরং আল্লাহ্পাক তাদের সামনে এক বিভ্রাটপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছিলেন, ফলে তাদের জ্ঞানচক্ষু হয়ে গিয়েছিলো পর্দাবৃত। ফলে তারা বঞ্চিত হয়েছিলো সত্যদর্শন থেকে। হারিয়ে ফেলেছিলো ইমানের পথ। এভাবে আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের পরিপূর্ণ বক্তব্য দাঁড়াবে এরকম— যেমন কোনো লোককে পরিয়ে দেওয়া হলো একটি কঠিন গলবন্ধ যা প্রসারিত ছিলো চিবুক পর্যন্ত। সে ঘাড় ঘোরাতে পারলো না। মুখমণ্ডলকে রাখতে হলো ঊর্ধ্বমুখী। ফলে তার কাছ থেকে সঠিক পথের দিশা গেলো হারিয়ে। চিরদিনের জন্য সে হয়ে পড়লো পথভ্রষ্ট। চিরসত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের দৃষ্টান্ত এরকমই। অথবা কথাটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— তারা যখন আমার রসুলকে সংহার করতে উদ্যোগী হলো, আমি তখন তাঁকে রক্ষার জন্য আততায়ীদের সম্মুখে সৃষ্টি করে দিলাম বিচিত্র বিপত্তি। এভাবে প্রতিহত করলাম তাদের অপঅভিলাষ। অথবা বলা যেতে পারে— এখানকার বক্তব্যটি হবে ভবিষ্যৎকালবোধক এবং এমতাবস্থায় মর্মার্থ দাঁড়াবে— মহাবিচারের দিবসে আমি তাদেরকে প্রবেশ করাবো নরকে। তাদের গলায় চিবুক পর্যন্ত পুরু আগুনের গলবন্ধ পরিয়ে দিব তখন। চতুর্দিকে দাঁড় করিয়ে দিবো আগুনের দেয়াল। এর কোনো অন্যথা হবে না। এই ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করলে বুঝতে হবে বিষয়টি অতি নিশ্চিত। যেনো তা হয়েই গিয়েছে। এই আবহটিকে ফুটিয়ে তুলবার জন্যই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে অতীতকালার্থক বাকভঙ্গিমা।

সূরা ইয়াসীন ঃ আয়াত ১০, ১১, ১২

وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠﴾ اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّ اَجْرٍ كَرِيْمٍ ﴿١١﴾ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَ اٰثَارَهُمْ ۗ وَ كُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْۤ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٢﴾

r তুমি উহাদিগকে সতর্ক কর বা না কর, উহাদের পক্ষে উভয়ই সমান; উহারা ইমান আনিবে না।

r তুমি কেবল তাহাকেই সতর্ক করিতে পার যে উপদেশ মানিয়া চলে এবং না দেখিয়া দয়াময় আল্লাহ্কে ভয় করে। অতএব তাহাকে তুমি ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের সংবাদ দাও।

r আমিই মৃতকে করি জীবিত এবং লিখিয়া রাখি যাহা উহারা অগ্রে প্রেরণ করে ও যাহা উহারা পশ্চাতে রাখিয়া যায়, আমি তো প্রত্যেক জিনিষ স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রাখিয়াছি।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তুমি তাদেরকে সতর্ক করো, অথবা না করো, তাদের পক্ষে উভয়ই সমান; তারা ইমান আনবে না'। এ ব্যাপারে সবিস্তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সুরা বাকারার তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যায়।

পরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'তুমি কেবল তাকেই সতর্ক করতে পারো, যে উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখে দয়াময় আল্লাহ্কে ভয় করে। অতএব তাকে তুমি ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের সংবাদ দাও'।

এখানে 'আজ জিকরু' অর্থ সদুপদেশ। অর্থাৎ আল কোরআন। আর 'মেনে চলে' অর্থ কোরআনের মর্মার্থ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে। শিক্ষণীয় বিষয়াবলীকে কার্যে রূপ দেয়। আর আল্লাহ্কে ভয় করে' অর্থ ভয় করে তাঁর শাস্তিকে। অথবা এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়াবে এরকম— হে আমার রসুল! আপনার ভীতি-প্রদর্শন ফলপ্রসূ হবে তাদের জন্য, যারা কোরআনের অনুগামী এবং যারা ভয় করে আল্লাহ্র শাস্তিকে। তাদেরকেই আপনি সংবাদ দিন মহামার্জনার ও মহাপুরস্কারের।

লক্ষণীয়, এখানে প্রথমে আল্লাহ্কে ভয় করার কথা বলা হয়েছে। অথচ শেষে বলা হয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের কথা। অর্থাৎ বলা হয়েছে, তিনি করুণাময়। এমতাবস্থায় এই প্রশ্নটি উত্থাপিত হতে পারে যে করুণাময় যিনি, তাঁকে ভয় করার অর্থ আসলে কী? এর জবাবে বলা যেতে পারে, তিনি করুণাময় জানা সত্ত্বেও তাঁর সম্পর্কে নির্ভয় হওয়া অনুচিত। চূড়ান্ত পর্যায়ের ইমান একথা স্বীকারও করে না। কেননা পরিপূর্ণ ইমানের অবস্থান হচ্ছে ভয় ও আশার মধ্যখানে।

'বিল গইব' অর্থ না দেখে। অর্থাৎ তাঁকে না দেখেই বিশ্বাস করা এবং তাঁর শাস্তির কথা স্মরণ করে নীরবে নিভৃতে রোদন করা। 'বিমাগফিরাতি' অর্থ ক্ষমা, পাপক্ষয়ের শুভসংবাদ। আর 'আজ্বরিন কারীম' অর্থ মহাপুরস্কার, স্থায়ী জান্নাত।

এরপরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'আমিই মৃতকে করি জীবিত এবং লিখে রাখি, যা তারা আগে প্রেরণ করে ও যা তারা পশ্চাতে রেখে যায়'। একথার

অর্থ— মৃত্যুর পর সকলের পুনরুত্থান ঘটাবো আমিই, অথবা মৃতসম অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতা থেকে জীবনসম জ্ঞান ও পথপ্রাপ্তি দান করি আমিই। আর আমার ফেরেশতাদের দ্বারা লিখে রাখি সকলের ভালো অথবা মন্দ কর্মকাণ্ডসমূহ।

এখানে 'আছার' অর্থ কীর্তি। কীর্তি হতে পারে দু'ধরনের, সু এবং কু। সুকীর্তি হচ্ছে বিদ্যাশিক্ষাদান, অর্থদান, অপ্রচল সুন্নতের সচলায়ন, জনহিতকর কোনো রীতির প্রবর্তনা ইত্যাদি। আর কুকীর্তি হচ্ছে মিথ্যার বিস্তারণ, অত্যাচারের ভিত্তি স্থাপন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকর্মে সহায়তাদান, অপরীতির উদ্ভাবন ইত্যাদি। রসুল স. জানিয়েছেন, কেউ যদি ইসলামে কেনো সুপ্রথা প্রবর্তন করে এবং তা অনুসৃত হতে থাকে প্রজন্মপরম্পরায়, তবে নিজের প্রাপ্য পুণ্যের সঙ্গে সঙ্গে অনুসারীদের পুণ্যও সে পাবে। আবার অনুসারীদের পুণ্যও এতটুকু কমবে না। আবার ইসলামে কুপ্রথার প্রবর্তকেরা নিজের পাপের সঙ্গে সঙ্গে পাবে তার অনুসারীদের পাপের সমান পাপ। কিন্তু অনুসারীদের পাপও এতে করে কিছুমাত্র কমবে না।

কোনো কোনো বিদ্বান এখানকার 'আছার' শব্দটির অর্থ করেছেন— মসজিদের গমন পথের পদচিহ্ন। এমতাবস্থায় 'লিখে যা অগ্রে প্রেরণ করে' কথাটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— নামাজীদের মসজিদের গমনপথের পদচিহ্নও আমি লিখে রাখি। হজরত আবু মুসা আশয়ারী বর্ণনা করেছেন রসুল স. বলেছেন, নামাজের সর্বাধিক পুণ্য পায় সে-ই, যে মসজিদে আসে দূরবর্তী স্থান থেকে। আর যে ইমামের সঙ্গে নামাজ আদায়ের জন্য অপেক্ষমাণ থাকে, সে পায় তার চেয়ে বেশী পুণ্য, যে নামাজের পর হয়ে যায় নিদ্রাভিভূত। বোখারী, মুসলিম।

হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, মসজিদে নববীর কিছু অংশ ছিলো ফাঁকা। বনী সালমার লোকজন সেখানে তাদের বসতবাটি নির্মাণ করতে মনস্থ করলো। বিষয়টি রসুল স. এর কর্ণগোচর হলে তিনি তাদেরকে ডেকে বললেন, শুনলাম তোমরা নাকি মসজিদের পাশে বাড়ি বানাতে চাও? তারা বললো, আপনি ঠিকই শুনেছেন হে আল্লাহ্র রসুল! তিনি স. তখন বললেন, তোমরা যেখানে বসবাস করছো সেখানেই বসবাস করো। শুনে রাখো মসজিদগামী পথের পদচিহ্নও লিখে রাখা হয়। মুসলিম। হজরত আনাস সূত্রে বাগবীও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকেও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন তিরমিজি ও হাকেম। তিরমিজি বলেছেন, বর্ণনাটি উত্তমসূত্রসম্বলিত। আর হাকেম বলেছেন, যথাসূত্রবিশিষ্ট।

শেষে বলা হয়েছে— 'আমি তো প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি'। একথার অর্থ আমি প্রতিটি বিষয় পূর্বাহ্নে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি সুরক্ষিত ফলকে। এখানে 'আহসানাহু' অর্থ লিপিবদ্ধরূপে সংরক্ষিত রেখেছি, অথবা রেখেছি লিপিবদ্ধ আকারে। আর 'ইমামুম মুবীন' অর্থ সুস্পষ্ট কিতাব বা লওহে মাহফুজের সুরক্ষিত ফলক।

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿١٣﴾

r উহাদের নিকট বর্ণনা কর এক জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত; যখন তাহাদের নিকট আসিয়াছিল রাসূলগণ।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি মক্কার সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের নিকট দৃষ্টান্তরূপে বর্ণনা করুন এক জনপদবাসীদের একটি ইতিবৃত্ত। তাদের কাছেও প্রেরণ করা হয়েছিলো আল্লাহ্‌র এক রসুলকে।

এখানে 'দ্বরব' অর্থ একই রকম। অর্থাৎ ওই জনপদবাসীদের ইতিবৃত্তটির সঙ্গে তোমাদের মিল রয়েছে। আর এখানে 'আসহাবাল ক্বরিয়াহ' জনপদের অধিবাসী বলে বুঝানো হয়েছে ইনতাকিয়াবাসীদেরকে।

বাগবী লিখেছেন, ঐতিহাসিকদের বর্ণনা এরকম— হজরত ঈসা তাঁর দুজন সহচরকে প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করলেন বন্দর নগরী ইনতাকিয়ায়। নগরীর উপকণ্ঠে পৌঁছে প্রতিনিধিদ্বয় সাক্ষাৎ পেলেন একজন বৃদ্ধ মেষপালকের। তার নাম ছিলো হাবীব। সে জিজ্ঞেস করলো, আপনারা কে? তাঁরা বললেন আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি। আমরা এসেছি আপনাদেরকে সত্যধর্মের আমন্ত্রণ জানাতে। বৃদ্ধ বললো, আপনাদের নিকটে কি কোনো নিদর্শন আছে? তাঁরা বললেন, অবশ্যই। আল্লাহ্‌র নির্দেশে আমরা ব্যাধিগ্রস্তকে নিরাময় করি। জন্মান্ধকে করি দৃষ্টিদান। আরোগ্য করি কুষ্ঠরোগীকে। বৃদ্ধ বললো, আমার এক সন্তান দু'বছর ধরে শয্যাশায়ী, যদি পারেন, তবে তাকে সুস্থ করে দিন। তাঁরা বললেন, আমরা রাজি। বৃদ্ধ তখন তাঁদেরকে নিয়ে তার বাড়িতে গেলেন। পীড়িত বালকটির গায়ে হাত বুলালেন তাঁরা। সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হয়ে গেলো সে। অল্পক্ষণের মধ্যেই এ ঘটনা ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র। শুরু হলো লোকজনের আনাগোনা। প্রতিনিধিদ্বয়ের করস্পর্শে ভালো হয়ে গেলো অনেক রোগী।

ইনতাকিয়াবাসীদের রাজা ছিলো একজন রোমীয়। সে ছিলো প্রতিমাপূজক। তার কানেও পৌঁছলো প্রতিনিধিদ্বয়ের সংবাদ। সে তখন তাঁদেরকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কে? তাঁরা বললেন, নবী ঈসার প্রতিনিধি। আপনাকে আমরা সত্যধর্মের প্রতি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ত্যাগ করুন অন্ধ ও বধির প্রতিমার উপাসনা। গ্রহণ করুন ওই একক মহাসৃজয়িতা ও মহাপালয়িতা স্রষ্টাকে। যিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। রাজা বললো, দেবপ্রতিমা ছাড়া আবার অন্য কোনো প্রভুপালনকর্তা আছে নাকি? প্রতিনিধিদ্বয় বললেন, নিশ্চয়ই যিনি আপনাকে, আমাদেরকে এবং আপনার পূজনীয় দেবপ্রতিমাসহ অন্য সকলকে এবং সকল

কিছুকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই মহাবিশ্বের একমাত্র সৃজক ও পালক। রাজা বললো ঠিক আছে। তোমরা আজ যাও। আমি তোমাদের ব্যাপারে একটু চিন্তা-ভাবনা করে দেখি। প্রতিনিধিদ্বয় রাজ দরবার থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা করলেন শহরের দিকে। কতিপয় দুষ্কৃতকারী পিছু নিলো তাঁদের । শহরে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই তাঁদেরকে শহীদ করে দিলো ওই দুষ্কৃতকারীরা।

ওয়াহাব বলেছেন, হজরত ঈসা রুহুল্লাহ্ তাঁর দু'জন প্রতিনিধি প্রেরণ করলেন ইনতাকিয়া নামক নগরীতে। প্রতিনিধিদ্বয় ভাবলেন, প্রথমে আমন্ত্রণ জানাতে হবে রাজাকে। এই ভেবে রাজদর্শনের চেষ্টা করতে লাগলেন তাঁরা। কিন্তু কোনো উপায় বের করতে পারলেন না। দিন কাটাতে লাগলেন আশায় অপেক্ষায়। একদিন রাজপ্রাসাদের প্রধান ফটকের অদূরে অপেক্ষমাণ ছিলেন তাঁরা। হঠাৎ দেখতে পেলেন, রাজা বের হয়ে আসছে প্রাসাদাভ্যন্তর থেকে। তাঁরা উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, আল্লাহু আকবর। অতর্কিতে উচ্চকিত তকবীর ধ্বনি শুনে রাজা চমকে উঠলো। বিরক্ত হলো পরক্ষণেই। রেগে গিয়ে বন্দী করলো প্রতিনিধিদ্বয়কে। হুকুম দিলো, এদেরকে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হোক। প্রত্যেককে করা হোক একশত করে বেত্রাঘাত। এ সংবাদ পৌঁছে গেলো নবী ঈসার নিকটে। তিনি তখন বন্দী প্রতিনিধিদ্বয়ের সাহায্যার্থে প্রেরণ করলেন শামউনকে। শামউন সাধারণ জনতার বেশে গিয়ে উপনীত হলেন ইনতাকিয়ায়। রাজার পারিষদবর্গের সঙ্গে প্রথমে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করলেন তিনি। সফলও হলেন। পারিষদেরা মুগ্ধ হয়ে গেলো তাঁর বাগ্মীতায় ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে। রাজ দরবারের আলোচনা প্রসঙ্গে উঠলো তাঁর কথা। রাজা কৌতূহলী হলো। ফলে রাজদরবারে তলব পড়লো তাঁর। শামউন রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে রাজার সঙ্গে বাক্যবিনিময় করলেন। তার কথা শুনে মুগ্ধ হলো রাজা। এরপর থেকে রাজার বিশেষ অতিথিশালায় স্থান পেলেন শামউন। কিছুদিন কেটে গেলো এভাবেই। একদিন সুযোগ বুঝে তিনি বললেন, মান্যবর রাজা! শুনলাম আপনি দু'জন আগন্তুককে বিনা দোষে কারারুদ্ধ করে রেখেছেন। লোকগুলো কে, কোথা থেকে কী উদ্দেশ্যে এসেছে, এসকল কিছু না জেনেই। বিষয়টি অনভিপ্রেত নয় কী? রাজা বললো, আমি তখন রাগান্বিত হয়েছিলাম। তাই রাগের চোটে তাদের সঙ্গে কথাই বলিনি। শামউন বললেন, এখন তো আর আপনার রাগ নেই। সুতরাং এখন তো তাদেরকে তলব করতে পারেন। জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখতে পারেন তাদেরকে। রাজা বললো, ঠিক আছে। তাদেরকে এখানে ডেকে আনা হোক। অল্পক্ষণের মধ্যেই বন্দীদ্বয়কে হাজির করা হলো। শামউনই প্রথমে জিজ্ঞেস করলেন, পরিচয় দাও। কে তোমরা? কে পাঠিয়েছে তোমাদেরকে। প্রতিনিধিদ্বয় বললেন, আল্লাহ্। যিনি সকলের সৃজক ও পালক। তাঁর সমকক্ষ কেউ নয়। শামউন বললেন,

তোমাদের আল্লাহ্‌র পরিচয় বর্ণনা করো। তাঁরা বললেন, আল্লাহ্‌ ইচ্ছাময়। তিনি যেমন ইচ্ছা করেন, তেমনই হয়। তিনি তাঁর অভিপ্রায় নির্ণয় ও প্রয়োগের ব্যাপারে সতত স্বাধীন ও চিরপবিত্র। শামউন বললেন, তোমাদের সঙ্গে কি কোনো নিদর্শন আছে? তাঁরা বললেন, নিশ্চয়ই। আমরা জন্মান্ধকে চক্ষুষ্মান করি। একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে রাজা ডেকে আনলো এক জন্মান্ধ বালককে। বললো, একে চক্ষুদান করো। প্রতিনিধিদ্বয় দোয়া করলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে বালকটি হয়ে গেলো চক্ষুষ্মান। রাজা ও তার পারিষদবর্গের সকলেই অভিভূত হলো। শামউন বললো, হে রাজন! আপনি এবার আপনার পূজনীয় দেব-দেবীদের নিকট প্রার্থনা করে এর চেয়ে বিস্ময়কর কিছু প্রদর্শন করুন। দেখবেন আপনার মর্যাদা বেড়ে যাবে এদের চেয়ে বেশী। রাজা বললো, আপনি তো জানেনই আমাদের প্রতিমাগুলো নিঃসাড়, শ্রুতি-দৃষ্টিহীন। কারো উপকার কিংবা অপকার করবার সাধ্য তাদের আদৌ নেই। সেদিনের মতো দরবার সমাপ্ত হলো এভাবেই।

শামউন যথারীতি রাজ সান্নিধ্যেই দিনাতিপাত করতে লাগলেন। রাজা ও তার সভাসদেরা যখন পূজা-অর্চনায় লিপ্ত থাকতো তখন তিনি মগ্ন থাকতেন দোয়া কালাম পাঠে ও নামাজে। তারা মনে করতো শামউনও বিশেষ নিয়মে পূজা-অর্চনা করে চলেছেন। কিছুদিন পর রাজা কী মনে করে প্রতিনিধিদ্বয়কে পুনরায় রাজ দরবারে ডেকে আনালেন। বললো, তোমাদের আল্লাহ্‌ যদি মৃতকে জীবিত করতে পারে, তবে আমরা তোমাদের ধর্মমত গ্রহণ করবো। প্রতিনিধিদ্বয় বললেন, আল্লাহ্‌ অবশ্যই সর্বশক্তিধর। রাজা বললো, আমার নৈকট্যভাজন এক ভূস্বামীর ছেলে মারা গিয়েছে সাত দিন আগে। তার পিতা প্রবাসী। তার প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় দিন গুণছে তার স্বজনেরা। এদিকে ছেলেটির লাশে ধরেছে পচন। তোমরা যদি পারো, তবে তোমাদের আল্লাহ্‌কে দিয়ে তাকে জীবিত করে দাও। প্রতিনিধিদ্বয় লাশ আনতে বললেন। কিছুক্ষণের মধ্যে লাশ আনা হলো। লাশ তখন ফেটে গিয়ে গলতে শুরু করেছে। প্রতিনিধিদ্বয় উচ্চকণ্ঠে তার পুনর্জীবন দানের জন্য আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে লাগলেন। শামউন প্রার্থনা করতে লাগলেন মনে মনে। একটু পরেই মরদেহে প্রাণ সঞ্চারিত হলো। জীবিত হয়ে উঠে দাঁড়ালো ছেলেটি। বললো, সাতদিন আগে আমি মৃত্যুবরণ করেছিলাম অংশীবাদী হয়ে। এই সাতদিনে আমাকে দেখানো হয়েছে সাতটি আগ্নেয় উপত্যকা। হে উপস্থিত জনতা! আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি, এই মুহূর্তে অংশীবাদিতা পরিহার করো। ইমান আনো এক আল্লাহ্‌র প্রতি। নতুবা অগ্নিশাস্তি থেকে কিছুতেই রেহাই পাবে না। আমি দেখতে পাচ্ছি, আকাশের উন্মুক্ত দরজায় বসে এক সৌম্যকান্তি যুবক তিনজন লোকের জন্য প্রতিক্ষমাণ। রাজা বললো, লোক তিনজন কে? ছেলেটি বললো শামউন ও এই দু'জন প্রতিনিধি। রাজা একথা শুনে বিস্মিত

হলো। শামউন দেখলেন, রাজা অনেকটা প্রভাবান্বিত। তার বিশ্বাসকে প্রবল করার জন্য শামউন বললেন, মান্যবর মহারাজা! আপনি এবার এই দু'জন লোককে বলুন, তারা যেনো আপনার মৃত কন্যাকে জীবিত করে দেখায়। রাজা উতলা হয়ে পড়লো। বললো, হে প্রতিনিধিদ্বয়! ওই দেখা যায় আমার মৃত কন্যার কবর। এবার তাকে জীবিত করো তো দেখি। প্রতিনিধিদ্বয় প্রার্থনা শুরু করলেন। মুহূর্তকাল পরেই কবর ফেটে বেরিয়ে এলো রাজকন্যা। বললো, তোমরা ভালো করে শুনে রাখো, এই প্রতিনিধিদ্বয় সত্য। তবে আমার মনে হয় তোমরা তাদেরকে মানবে না। একথা বলেই রাজকন্যা প্রবেশ করলো তার কবরে।

কা'ব ও ওয়াছারের সূত্রে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, রাজা ইমান গ্রহণ করলো না। বরং সে সভাসদদের প্ররোচনায় প্রতিনিধিদ্বয়কে হত্যা করতে উদ্যোগী হলো। এ সংবাদ পৌঁছে গেলো বৃদ্ধ হাবীবের নিকট। তিনি তখন ছিলেন নগরীর উপকণ্ঠে। এক দৌড়ে তিনি মিশে গেলেন জনতার সঙ্গে। সামনে যাকে পেলেন, তাকেই দিতে লাগলেন সদুপদেশ।

সূরা ইয়াসীন ঃ আয়াত ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১

إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوٓا إِنَّآ
إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿١٤﴾ قَالُوا مَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ أَنزَلَ
الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ ۙ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ
إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَيْنَآ إِلَّا الْبَلَٰغُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾ قَالُوٓا إِنَّا
تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوا طَٰٓئِرُكُم مَّعَكُمْ ۚ أَئِن ذُكِّرْتُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ
مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَٰقَوْمِ
اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْـَٔلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٢١﴾

r যখন উহাদের নিকট পাঠাইয়াছিলাম দুইজন রাসূল, তখন উহারা তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল, অতঃপর আমি তাহাদিগকে শক্তিশালী করিয়াছিলাম তৃতীয় একজন দ্বারা। তাহারা বলিয়াছিল, 'আমরা তো তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছি।'

r উহারা বলিল, 'তোমরা আমাদের মতই মানুষ, দয়াময় আল্লাহ্ তো কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলিতেছ।'

r তাহারা বলিল, 'আমাদের প্রতিপালক জানেন— আমারা অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছি।

r 'স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব।'

r উহারা বলিল, 'আমরা তো তোমাদিগকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি, যদি তোমরা বিরত না হও তোমাদিগকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিব এবং আমাদের পক্ষ হইতে তোমাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি অবশ্যই আপতিত হইবে।'

r তাহারা বলিল, 'তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই সাথে, ইহা কি এইজন্য যে, আমরা তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি? বস্তুত তোমর এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।'

r নগরীর প্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিল, সে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায় তোমরা রাসূলদের অনুসরণ কর;

r 'অনুসরণ কর তাহাদের, যাহারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহে না এবং যাহারা সৎপথপ্রাপ্ত।

ওয়াহাব বলেছেন, ওই দু'জন রসুল বা প্রতিনিধিদ্বয়ের নাম ছিলো ইয়াহ্ইয়া এবং ইউনুস এবং তৃতীয় একজনের নাম ছিলো শামউন। সাঈদ ইবনে যোবয়ের থেকে ইবনে মুনজির ও এরকম বর্ণনা করেছেন। আবদুর রাজ্জাক, আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, কাতাদা বলেছেন, আমার কাছে এই সংবাদটি পৌঁছেছে যে, হজরত ঈসা ইনতাকিয়াবাসীদের পথপ্রদর্শনার্থে পাঠিয়েছিলেন সাদেক ও মাসদুক নামক দু'জন প্রতিনিধিকে। আর তৃতীয় জনের নাম ছিলো সালরম। প্রথমোক্ত আয়াতে ওই তিনজনের কথাই বলা হয়েছে।

প্রতিনিধ প্রেরণ করেছিলেন হজরত ঈসা। অথচ এখানে বলা হয়েছে আল্লাহ্ তাঁদেরকে প্রেরণ করেছিলেন। অতএব, বুঝতে হবে, হজরত ঈসা তাঁদেরকে পাঠিয়েছিলেন আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশে।

পরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, তোমরা আমাদের মতোই মানুষ, দয়াময় আল্লাহ্ তো কিছুই অবতীর্ণ করেননি। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলছো'। একথার অর্থ— রাজা ও তাদের সভাসদেরা বললো, আমরা দেখছি, তোমরাও আমাদের মতো মানুষ। তাহলে তোমরা প্রেরিত পুরুষ হিসেবে দাবি করছো কেনো। দয়াময় আল্লাহ্ তো মানুষকে তাঁর রসুল বানাতে পারেন না। সুতরাং তোমরা যা শোনাচ্ছো তা মিথ্যা।

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, আমাদের প্রতিপালক জানেন, আমরা অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি'। একথার অর্থ— প্রতিনিধিদ্বয় বললেন, শপথ আল্লাহ্‌র। আমরা অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত। আমরা আল্লাহ্‌র নামে তোমাদের সামনে মিথ্যা সাক্ষ্য উপস্থিত করতে পারি না।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব'। একথার অর্থ— তাঁরা আরো বললেন, স্পষ্টভাবে সত্যধর্মের প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব। তোমরা আমাদেরকে মানো অথবা না মানো, তা যাচাই করা আমাদের কাজ নয়। যদি মানো, তবে উপকৃত হবে তোমরাই। আর না মানলে তোমরাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত। উপযোগী হবে মহাশাস্তির। আর তোমরা সত্যের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করবে না কেনো? আমরা কি আমাদের সত্যতার স্বপক্ষে নিদর্শনসমূহ উপস্থিত করিনি? তোমাদের সম্মুখেই কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করে দেখাইনি? জীবিত করে দেখাইনি কি মৃতকে?

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, আমরা তো তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি, যদি তোমরা বিরত না হও, তোমাদেরকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবো এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর অবশ্যই মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হবে'। একথার অর্থ— রাজা ও তার বশংবদেরা সকলেই ছিলো চিরভ্রষ্ট ও মূর্খশ্রেষ্ঠ। একগুঁয়েমিই এধরনের লোকের একমাত্র আরাধ্য। যথার্থ বিচারবিবেচনাবোধ এদের একেবারেই থাকে না। তাই তারা আল্লাহ্‌র সত্য বার্তাবাহকদেরকে প্রত্যাখ্যান করলো। তদুপরি হয়ে উঠলো মারমুখী। বললো, তোমাদের কোনো কথাই আমরা শুনতে চাই না। আমরা মনে করি তোমরাই অনাসৃষ্টি ও অকল্যাণের কারণ। সুতরাং বন্ধ করো অপপ্রচার। নতুবা আমরা তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবো। সেই মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে তোমাদেরকে কেউই রক্ষা করতে পারবে না।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই সাথে, এটা কি এজন্য যে, আমরা তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি? বস্তুত, তোমরা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়'। একথার অর্থ— প্রতিনিধিদ্বয় বললেন, মঙ্গল-অমঙ্গল কীভাবে সূচিত হয়, তা তোমরা জানো না। যদি জানতে, তবে দেখতে পেতে আল্লাহ্‌র বাণীবাহক যাঁরা, তাঁরা অমঙ্গলের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত। কারণ তাঁরা মানুষকে শুভপথ প্রদর্শনকারী। অমঙ্গল তো তাদেরই সার্বক্ষণিক সঙ্গী, যারা তাঁদেরকে অস্বীকার করে। হে ইনতাকিয়াবাসী, তোমরা দেখছি এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

হজরত ইবনে আব্বাস কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— কল্যাণ অথবা অকল্যাণ নির্ধারিত হবে তোমাদের দিক থেকেই। আমাদের এই শুভবারতা গ্রহণ করলেই তোমরা হবে সৌভাগ্যশালী, আর প্রত্যাখ্যান করলে হবে অমঙ্গলের প্রতিভু, চিরদুর্ভাগা।

এখানকার 'আ ইন জুক্কিরতুম' (এটা কি জন্য যে, আমরা তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি?) প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন। এর সরল অর্থ দাঁড়ায়— আমরা তোমাদেরকে দিচ্ছি শুভউপদেশ। আর তোমরা একে মনে করছো অকল্যাণ। শুভ উপদেশকে মান্য করে কোথায় কৃতার্থ হবে, তা না করে উল্টো আমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে সংহার করতে চাচ্ছো। কেনো?

'বাল আন্তুম ক্বওমুম্ মুসরিফুন' অর্থ বস্তুত তোমরা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। অর্থাৎ সত্যের সরাসরি আমন্ত্রণকে প্রত্যাখ্যান করে তোমরা করেছো গর্হিত অপরাধ। হয়ে গিয়েছো সীমালংঘনকারী। তোমরা কি তবে আর ফিরবে না?

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (২০, ২১) মর্মার্থ হচ্ছে— সেই বৃদ্ধ হাবীব তখন ছিলেন নগরপ্রান্তে। প্রতিনিধিদ্বয়কে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে, এই দুঃসংবাদটি তাঁর নিকটেও পৌঁছুলো। তিনি বিচলিত হলেন। যাকে সামনে পেলেন, তাকেই সতর্ক করতে লাগলেন এই বলে যে, হে আমার সম্প্রদায়! যে প্রতিনিধিদ্বয়কে হত্যা করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, তাঁরা কিন্তু আল্লাহ্র সত্য বার্তাবাহক। সুতরাং তোমরা তাঁদের প্রচারিত ধর্মাদর্শকে গ্রহণ করো। তাঁরা তোমাদের কাছে পার্থিব বিনিময়ের প্রত্যাশী নন। সুতরাং বুঝতেই পারছো, তারা সৎপথপ্রাপ্ত এবং সৎপথের পথপ্রদর্শক।

আবদুর রাজ্জাক এবং ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, কাতাদা বলেছেন, লোকটির নাম ছিলো হাবীব। তিনি ছিলেন কাষ্ঠ প্রকৌশলী। সুদ্দী বলেছেন, তিনি ছিলেন বস্ত্রপরিশুদ্ধক। ওয়াহাব বলেছেন, পুণ্যবান হাবীব ছিলেন বস্ত্ররচয়িতা। কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। তাই ডেরা নির্মাণ করেছিলেন শহরের উপকণ্ঠে। তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও দানশীল। দিনভর যা উপার্জন করতেন, তা ভাগ করতেন দুই ভাগে। এক ভাগ রেখে দিতেন নিজের জন্য এবং অপর ভাগ ব্যয় করতেন নিকটাত্মীয়দের জন্য।

আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন ওয়া সাল্লাল্লহু আ'লা খইরি খলক্বিহি মুহাম্মদিঁউ ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমায়ী'ন।

নবম খণ্ড শেষ